স্যার সৈয়দ আমীর আলী

এ শর্ট হিস্ট্রি অব্ দি স্যারাসিন্স

আরব জাতির ইতিহাস



স্যার সৈয়দ আমীর আলী

এ শর্ট হিস্ট্রি অব্ দি স্যারাসিন্স

আরব জাতির ইতিহাস

অনুবাদ ও সম্পাদনা

প্রফেসর মোহাম্মদ নূরনবী

অধ্যক্ষ (অব.), কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা;
সাবেক অধ্যক্ষ, বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ, গোপালগঞ্জ;
সরকারি মহিলা কলেজ, বাগেরহাট;
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ,
সরকারি বি. এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা;
বিভাগীয় প্রধান, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম;
রাজশাহী সরকারি কলেজ, রাজশাহী; দর্শনশাস্ত্রের প্রভাষক,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা; কারমাইকেল কলেজ, রংপুর;
যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, সাদন
মোহন কলেজ, সিলেট

মেরিট ফেয়ার প্রকাশন

এ শর্ট হিস্ট্রি অব্ দি স্যারাসিন্স (আরব জাতির ইতিহাস): স্যার সৈয়দ আমীর আলী
অনুবাদ ও সম্পাদনা : প্রফেসর মোহাম্মদ নূরনবী



মেরিট ফেয়ার □ ১৪৪

প্রকাশক
এম. মহসিন রুবেল
মেরিট ফেয়ার প্রকাশন
১২ বাংলাবাজার (শিকদার ম্যানসন), ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৯১৭৭৪৮৯৪৭, ০১৭১৫৫৬৬৭৫২
e-mail: meritfair@gmail.com
Web: meritfairbd.com

প্রকাশকাল
(প্রথম মেরিট ফেয়ার সংস্করণ)
মার্চ, ২০০৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ
আগস্ট, ২০২১

প্রচ্ছদ : মশিউর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ: মাহতাব উদ্দীন সুমন

মুদ্রণ : প্রেসবাংলা, ৬০ হেমেন্দ্রদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য: ৪৫০ টাকা

মেরিট ফেয়ার-এর যে কোনো বই পেতে ভিজিট করুন www.rokomari.com/meritfair
অথবা ফোনে অর্ডার করতে কল করুন 01519521971 হটলাইন 16297

www.Durbiin.com
অথবা ফোনে অর্ডার করতে কল করুন 01307 452 110, 01773 366266

A short History Of The Saracins Written By Sir Syed Amir Ali, Translated & edited by Professor Mohammad Nur Nobi, Published by M. Mohsin Rubel, Merit Fair Prokashon, 12 Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh.

Price: Tk. 450 Only.US $ 25

ISBN : 984-70131-0143-7

প্রাসঙ্গিকী

"A Short History of the Saracens" (আরব জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) বিচারপতি স্যার সৈয়দ আমীর আলী প্রণীত একখানা বিশ্ববিখ্যাত মৌলিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে আমীর আলী সংক্ষেপে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে 'আরর জাতির ইতিহাস' বর্ণনা করেন। ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে এ পর্যন্ত দেশ-বিদেশে বাংলা ও ইংরেজিতে যে-সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে নিঃসন্দেহে স্যার সৈয়দ আমীর আলী রচিত এ গ্রন্থখানা শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। কী প্রাসঙ্গিকতায়, কী তথ্য উপস্থাপনায় এবং বিশ্লেষণে তিনি যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। ইসলামের ইতিহাস রচনায় নিংসন্দেহে এ পুস্তকখানা আকর (Source of Original Book) গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। ইসলামের ইতিহাসের পাঠক-পাঠিকা, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পণ্ডিত, গবেষক সকলের নিকট এ গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা একে একখানি প্রথম শ্রেণির ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ধরনের একখানি গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশে অনুবাদক ও প্রকাশক উভয়ে প্রশংসার দাবিদার। এক বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। প্রেক্ষাপটটি সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো–

ব্রিটিশ বেনিয়ারা ভারতবর্ষের রাজদণ্ড লাভ করেন পলাশীর প্রান্তরে ২৩ জুন, ১৭৫৭ সালে; সিরাজ-উদ্দৌলার বিশাল বাহিনীকে লর্ড ক্লাইভের ক্ষুদ্র বাহিনী মীরজাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সম্পূর্ণ পরাজিত করে। পলাশীর পরে মীরকাশেমের সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধ, তাদের বিজয় ভারতবর্ষে তাদের আধিপত্যকে প্রায় নিরঙ্কুশ করে তোলে। সুচতুর বেনিয়া শাসকরা বুঝতে পারেন যে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিমদের বিভক্ত (Divide) না করে ভারত শাসন খুবই সুকঠিন হবে। তাই তারা 'Divide and Rule' পলিসি অনুসরণে ভারত শাসন শুরু করেন। প্রথম থেকেই হিন্দুরা তাদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন এবং তারা বেনিয়া শিক্ষা-সংস্কৃতি গ্রহণ করে চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ ও সামাজিকভাবে প্রতিপত্তি লাভ করেন। পক্ষান্তরে, মুসলমানরা এ বিশ্বাসঘাতক ইংরেজদের কোনো ক্ষেত্রেই সহযোগিতা না করে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েন। ইংরেজ শাসকরাও অব্যাহতভাবে 'Divide and Rule' পলিসি অনুসরণ করেন।

কিন্তু এতেও তারা রেহাই পাননি। বাংলার কৃষক, সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীরের কৃষক বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ সালে ভারতব্যাপী সিপাহীদের প্রথম স্বাধীনতার লড়াই বা মহাবিদ্রোহের মোকাবিলা তাদের করতে হয়। ইংরেজরা জানত এসব বিদ্রোহ-সংঘর্ষের পেছনে ছিল মুসলমানদের হাত। তাছাড়া তারা মুসলমানদের হাত থেকেই রাজত্ব কেড়ে নিয়েছিল। কাজেই মুসলমানরা সুযোগ পেলেই হারানো রাজত্বের পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হবে–একথা ইংরেজরা বুঝত। মুসলমানরা সেজন্য তাদের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি এড়িয়ে চলত। পক্ষান্তরে, ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকেই হিন্দুরা ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকে এবং ফলশ্রুতিতে তারা প্রশাসন

থেকে শুরু করে খাজনা আদায় পর্যন্ত বেশকিছু পদ লাভ করে। তাদের শিক্ষিতের সংখ্যাও বেড়ে যায়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৮৫৮-৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যেখানে হিন্দু ডিগ্রিধারীর সংখ্যা ছিল ৩,১৫৫ জন সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৭ জন অর্থাৎ সকল দিক থেকে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েন।

স্যার সৈয়দ আমীর আলী একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজদের তাড়াতে হলে তাদের ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি জানতে হবে। এই জন্য ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নবাব আবদুল লতিফ মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে দানবীর হাজি মুহম্মদ মহসীনের বিশাল সম্পত্তি মুসলিম ছাত্রদের কল্যাণে দান করা হয়। এসবের প্রাসঙ্গিকতায় বিশেষ অবদান রাখে স্যার সৈয়দ আম্মদ খানের আলীগড় আন্দোলন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে 'আলীগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে ইংরেজ পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে প্রগতিশীল মনোভাবের উন্মেষ ঘটানো ছিল এর আরেকটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কিছুকাল পরে কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এভাবেই আলীগড় আন্দোলন ক্রমেই দানা বাধে এবং মুসলিম নবজাগরনের সূচনা করে।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ছিলেন আহম্মদ খানের ভাবশিষ্য। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে তাদের পরিচয় হয়। উভয়ের স্বপ্ন ছিল মুসলমানদের প্রগতিশীল ও আধুনিকীকরণ করা। বস্তুত এমনি এক প্রেক্ষাপটে মুসলিম গৌরবময় ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় ঘটানোর জন্যই স্যার সৈয়দ আমীর আলী 'A Short history of the Saracens' রচনা ও প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে আলীগড় আন্দোলন ও মুসলিম জাগরণের সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়।

সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন মিশরের ইমাম আলী-উর-রেজার বংশধর। চাকরি করেছেন ইংরেজদের সঙ্গে তারতে। ফলে তার মন-মানসিকতা গড়ে ওঠেছিল আরব-পারস্য-ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব সংমিশ্রণে। মুসলমানদের নিকট ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্য তুলে ধরার প্রয়াসেই তিনি 'A Short History of the Saracens' গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুত তার নিজের ধমনীতেও এ ঐতিহ্যের শাণিত ধারা প্রবাহমান ছিল।

আমরা জানি ইসলামের ইতিহাস রচয়িতার বেশির ভাগই খ্রিস্টান। ফলে তারা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের ইতিহাস রচনায় ব্যর্থ হন। তাদের সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট হয়। এই জন্য ইসলামের ইতিহাস পরিপূর্ণরূপে রচনার জন্য তাঁর এ প্রয়াশ। লেখক শিয়াপন্থি বলে হজরত উসমান (রা.) ও উমাইয়াদের প্রতি তার কিঞ্চিৎ বিরোধ মনোভাব এবং হজরত আলী (রা.) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। এছাড়া তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে সকল ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন। কাজেই গ্রন্থটিতে যে তিনি নিরপেক্ষভাবে ঘটনার উন্মেষ ও ব্যাখ্যা করেছেন তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

স্যার সৈয়দ আমীর আলী একজন বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। তিনি রাজনীতি সচেতন, আইনজ্ঞ, প্রতিভাবান সংগঠক ও লেখক। তিনি যে একজন সত্যিকার প্রতিভাধর ইতিহাসকার ছিলেন–আলোচ্য গ্রন্থটি তারই প্রমাণ।

এই গ্রন্থ ছাড়াও তিনি আরও দুটি গ্রন্থ ইসলামের উপর রচনা করেন। এর একটি হলো 'The Spirit of Islam' এবং অন্যটি হচ্ছে–'The Ethics of Islam.' সৈয়দ আমীর আলী কয়েকটি আইনবিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেন। সেইগুলির মধ্যে 'A Student's Hand book of Mohamedans law, 'Personal law of the Mohamedans, 'Mohamedans Law' 'A commentary of the Bengal Tenancy Act,' প্রভৃতি উলে□খযোগ্য।

মহসীন ফান্ডের মুতাওয়াল্লী জনাব কেরামত আলীর একটি উর্দু পুস্তিকার ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে তার গ্রন্থ রচনার হাতেখড়ি হয়। ইংল্যান্ডে আইন পড়ার সময় 'A Ciritical Exaimination of the live Teaching of Mohammad' নামক প্রবন্ধ রচনা করে তিনি পাঠককুলে পরিচিত হন। ইংল্যান্ডের Constable's Religious- Ancient and Modern' নামক গ্রন্থাবলিতে তিনি 'Islam' নামক অধ্যায় লিখেছেন। 'Nineteenth Century And After' নামক বিখ্যাত পত্রিকায় বহুবার তার লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পারস্য বিভাগের প্রতিবাদে তিনি ইংল্যান্ডে 'Times' পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এভাবে আমরা দেখতে পাই বিচারক আমীর আলীর চেয়ে লেখক আমীর আলীর স্থান অনেক উর্ধ্বে। স্যার সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন একজন কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি এবং ইসলামের অক্লান্ত কর্মী।

মোটকথা স্যার সৈয়দ আমীর আলী তাঁর 'এ শর্ট হিস্ট্রি অব দি স্যারাসিন্স'-এ মুসলমানদের গৌরব গাঁথা এবং মুসলিম ঐতিহ্য বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন।

আমরা আগেই বলেছি, ভারতের মুসলমানদের আত্মবিস্তৃতি, অলসতা এবং জ্ঞানের রাজ্য থেকে বিশেষ করে ইংরেজি অধ্যায়ন থেকে বঞ্চিতদের পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াশে তিনি 'আরব জাতির ইতিহাস' রচনায় হাত দেন। তিনি তাঁর এই ইতিহাস কর্মের জন্য অমর হয়ে থাকবেন।

আমি তাঁর এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির অনুবাদ ও সম্পাদনা করে বাংলা ভাষায় প্রচারে প্রয়াসী হয়েছি। আমি আশা করছি ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গবেষণা কর্মী–এই অনুবাদ পাঠে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

এ গ্রন্থটি অনুবাদ ও সম্পাদনায় যেসব অনুবাদ ও মূল ইংরেজি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি কৃতজ্ঞচিত্তে সেসব অনুবাদক, রচয়িতা ও প্রকাশকসহ সকলের ঋণ স্বীকার করছি। মহান আল্লাহর দরবারে তাদের মঙ্গল কামনা এবং ইহধাম ত্যাগকারীদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।

সকল কাজে মহান স্রষ্টার সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং সকল প্রশংসা তারই জন্য।

ঢাকা,
জানুয়ারি, ২০০৯

প্রফেসর মোহাম্মদ নূরনবী

আমাদের প্রকাশিত ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ

- মুসলমানদের ইতিহাস (৫৭০-৭৫০ খ্রি.)
- মুসলমানদের ইতিহাস (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.)
- আরব জাতির ইতিহাস
- স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস [৭১০-১৪৯২ খ্রি.]

এবং সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও মিসর (ফাতেমীয়, আইয়ুবী ও মামলুক বংশ)

- বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৭১)
- স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস
- ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস
- মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ইতিহাস
- মুসলিম ইতিহাসতত্ত্ব
- ইসলামে বিভিন্ন দর্শন ও দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিকাশ
- ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস
- মুসলিম প্রত্নতত্ত্ব ও স্থাপত্য এবং মুসলিম চিত্র ও শিল্পকলার বিকাশ
- ইসলামে ধর্মীয় মূলনীতি, অনুশাসন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ
- পারস্য ও মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের ইতিহাস
- ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস
- বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস
- মুসলিম ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস
- মুসলিম দর্শন ও দার্শনিক
- মুসলিম দর্শনের ভূমিকা
- ধর্মদর্শন
- ইসলামের ইতিহাস

সূ চি প ত্র

অধ্যায়-১ : আরব দেশ/১-৩
অধ্যায়-২ : প্রাচীন ইতিহাস/৪-৮
অধ্যায়-৩ : মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (স.)/৯-১৫
অধ্যায়-৪ : প্রজাতন্ত্র/১৬-৩২
অধ্যায়-৫ : প্রজাতন্ত্র [পূর্বানুবৃত্তি]/৩৩-৪০
অধ্যায়-৬ : সরকার/৪১-৫১
অধ্যায়-৭ : উমাইয়া বংশ [হারবিয়া শাখা]/৫২-৬৬
অধ্যায়-৮ : উমাইয়া বংশ [হাকামের শাখা]/৬৭-৭৬
অধ্যায়-৯ : উমাইয়া বংশ [হাকামের শাখা]-পুনরাবৃত্তি/৭৭-৮৯
অধ্যায়-১০ : উমাইয়া বংশ [হাকামের শাখা]-পূর্বানুবৃত্তি/৯০-১০১
অধ্যায়-১১ : উমাইয়া বংশ [হাকামের শাখা]-পূর্বানুবৃত্তি/১০২-১১৮
অধ্যায়-১২ : উমাইয়া বংশ [হাকামের শাখা]-পূর্বানুবৃত্তি/১১৯-১২৬
অধ্যায়-১৩ : উমাইয়া বংশ [হাকামের শাখা]-পূর্বানুবৃত্তি/১২৭-১৩৯
অধ্যায়-১৪ : পুনরাবৃত্তি/১৪০-১৫৬
অধ্যায়-১৫ : আব্বাসীয় বংশ/১৫৭-১৭২
অধ্যায়-১৬ : আব্বাসীয় বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]/১৭৩-১৭৮
অধ্যায়-১৭ : আব্বাসীয় বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]/১৭৯-১৯৭
অধ্যায়-১৮ : আব্বাসীয় বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]/১৯৮-২১৩
অধ্যায়-১৯ : আব্বাসীয় বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]/২১৪-২২৯
অধ্যায়-২০ : আব্বাসীয় বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]/২৩০-২৪২
অধ্যায়-২১ : আব্বাসীয় বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]/২৪৩-২৫৫
অধ্যায়-২২ : আব্বাসীয় বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]/২৫৬-২৭০
অধ্যায়-২৩ : আব্বাসীয় বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]/২৭১-২৮৯
অধ্যায়-২৪ : পুনরালোচনা/২৯০-৩১৫
অধ্যায়-২৫ : পুনরালোচনা [পূর্বানুবৃত্তি]/৩১৬-৩৩৪
অধ্যায়-২৬ : স্পেনের আরবগণ–উমাইয়া বংশ/৩৩৫-৩৪৯
অধ্যায়-২৭ : স্পেনের আরবগণ [পূর্বানুবৃত্তি]/৩৫০-৩৬৫
অধ্যায়-২৮ : স্পেনের আরবগণ [পূর্বানুবৃত্তি]/৩৬৬-৩৭০
অধ্যায়-২৯ : স্পেনের আরবগণ [পূর্বানুবৃত্তি]/৩৭১-৩৮৫
অধ্যায়-৩০ : স্পেনের আরবগণ [পূর্বানুবৃত্তি]/৩৮৬-৩৯৫
অধ্যায়-৩১ : পুনরালোচনা/৩৯৬-৪০৫
অধ্যায়-৩২ : আফ্রিকায় আরবগণ/৪০৬-৪৩২

অধ্যায়-১
আরব দেশ : আরবের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান : আরবের প্রাচীন অধিবাসী

আরব দেশ

এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আরব একটি বিরাট ভূ-খণ্ডের দেশ। এর উত্তর দিকে সিরিয়ার মরুভূমি, পুবদিকে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর। এই বিশাল ভূ-খণ্ডের বিস্তৃতি এতটাই যে, আকৃতির দিক থেকে তখনকার ফ্রান্স সাম্রাজ্যের দ্বিগুণ। এই রাজ্য—মাটি, জলবায়ু এবং অধিবাসীর আকার আকৃতির ভিত্তিতে অনেক অংশে বিভক্ত।

এর উত্তরে পার্বত্য অঞ্চল, যেখানে বাইবেলে বর্ণিত 'ইডোমীয়' ও 'মিডিয়ানীয়' নামক জাতিরা বসবাস করত। তারপর হিজাজ প্রদেশ। এই প্রদেশের পূর্বে ইয়াছরিব নামে খ্যাত বিখ্যাত শহর মদীনা। যেটা মক্কা সেখানে আরবীয় নবীর জন্মস্থান এবং ইসলামের তীর্থ গমনকারীদের অবরোহণ ভূমি জেদ্দা বন্দর নিয়ে অবস্থিত। হিজাজ উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং লোহিত সাগর এবং সুয়েজ খাল হতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বত শ্রেণী দ্বারা আবৃত। এই উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের নাম ইয়েমেন। হিজাজ ও ইয়েমেনের ভূ-খণ্ডের নিচু অংশকে 'তিহামা' বলে। কখনো কখনো হিজাজের দক্ষিণ অংশকেও এই নামে অভিহিত করা হয়। ইয়েমেনের পূর্ব উপকূল ঘেষে অবস্থিত হাদরামৌত। এর পূর্বদিকের ওমান উপসাগরের বাকি অংশ নিয়ে ওমান ভূ-খণ্ড। হিজাজ প্রদেশের পর্বতমালা হতে পূর্বের ওমান উপসগারের তীরে আল-আহ্সা ও আল-বাহ্রায়ন মরভূমি পর্যন্ত যে উচ্চভূমি বিস্তৃত তাকে 'নজদ' বলে। মরুভূমি ও ক্ষুদ্র পর্বতে ভরা বিরাট ভূ-খণ্ডের মধ্যে স্থানে স্থানে যে গাছ লক্ষ করা যায় এগুলোকে বলা হয় মরুদ্যান। এগুলো মরুভূমির বুকে আশ্রয়স্বরূপ হিসাবে জন্ম নিয়েছে। হিজাজ এখন স্বাধীন আরব রাষ্ট্র। নজদ সউদ রাজবংশ কর্তৃক শাসিত। সুলতান মস্কতের অধীনে ইয়েমেন ও স্বাধীন আরব রাজ্য ওমান।

এই বিশাল ভূ-ভাগে কোনো বাণিজ্যোপযোগী নদী নেই। যে সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নদীর অস্তিত্ব আছে সেগুলো কেবল মাটির উর্বরতার জন্য। এখানে বৃষ্টিপাত খুবই অপর্যাপ্ত। যে স্থানে বৃষ্টি হয়, সে স্থান ব্যতীত অধিকাংশ স্থানে শুষ্ক ও তাপদাহ এবং ফল-ফুল ও গাছলতাদিশূন্য, কিন্তু যে সকল জায়গায় পানি পাওয়া যায়, সে স্থানসমূহ খুবই উর্বর। ইয়েমেনের উচ্চভূমিকে জরলুল-ইয়েমেন বলে। এটা প্রায় আল্পস পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মন্ট ব্ল্যাঙ্কের ন্যায় উঁচু। এই এলাকা কয়েকটি উর্বর ও বিস্তৃত উপত্যকায় অবস্থিত। কফি, নীল, খেজুর, শাকসবজি ও সব ধরনের গাছ জন্মে এই উপত্যকাগুলিতে। এই জায়গার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর; এবং শীতকালে প্রায় তুষারে ঢাকা থাকে। বসন্তকাল ও শরৎকাল—এই দুবার বছরে বৃষ্টিপাত হয়। মক্কার চারদিকের ভূ-ভাগকে হিজাজ বলে। লোহিত

সাগরের পূর্ব উপকূল হতে ৫০ মাইল পূর্বে মক্কা নগরী এবং ৩০ মাইল দক্ষিণে স্ফটিক পর্বত জব্‌লুল কোরা অবস্থিত। এখানে যেসব পাহাড়গুলো আছে তা প্রতিবিম্বিত—তাপে উত্তপ্ত হয়ে তাপ বিকিরণ করে থাকে। রৌদ্রগছ উপত্যাকাগুলোর জায়গায় দু-একটি সামান্য তৃণাচ্ছাদিত মাঠ আছে। এখানকার মেষগুলো চরম কষ্টে খাবার সংগ্রহ করে। শুষ্কপ্রায় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নদীগুলো ধীরে প্রবাহিত হয়। এই অতি উত্তপ্ত পাহাড়, উপত্যকা ও শুষ্কপ্রায় ক্ষুদ্র স্রোতস্বীনীই এদেশের প্রধান আকর্ষণ। শস্য-শ্যামলা ও ছায়াশীতল স্থান অবস্থিত এই দগ্ধ ও শুষ্ক ভূ-খণ্ডের পূর্ব দিকে—এর নাম তায়ফ। এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে আতা, ডুমুর, পিচ এবং আঙ্গুর ফল উৎপন্ন হয়।

আরবের প্রাচীন অধিবাসী

বিভিন্ন জাতির লোক আরব দেশে বসতি স্থাপন করেছিল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। বলা হয়, আরবের পূর্বতন অধিবাসীরা যে বংশ হতে উদ্ভূত প্রাচীন কালদীয় জাতিও সেই বংশোদ্ভূত। তারা সভ্যতার উচ্চ আসনে আরোহণ করেছিল। দক্ষিণ আরবে এর ধ্বংশাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। এরূপ ধারণা করা হয় যে তারা মিসর ও মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। অনেক বড় প্রাসাদ ও মন্দির তাদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল বলেও মনে করা হয়। বিখ্যাত জলাশয়গুলো এখনো আদনের নিকট অবস্থিত—এটা তাদের দ্বারা নির্মিত।

কাহ্‌তন বংশীয় আরব

এ সকল প্রাচীন জাতি ইউফ্রেটিস নদীর পূর্বদিকের কতকগুলো দেশ হতে আগত সেমেটিক জাতি কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেমেটিক জাতি ইয়েমেন ও হাদ্‌রামৌতের কোনো অংশে আবাস স্থাপন করেছিল। কথিত আছে তারা কাহতনের বংশধর। লোকে কাহ্‌তনকে জোক্তানও বলত। এ দেশের নাম হয়েছে পুত্র ইয়ারিবের নামানুসারে। ইয়ারিবের পৌত্র আরদুশ শামসের উপাধি ছিল 'সূর্যের দাস', যার ডাক নাম ছিল 'সাবা'। এই বংশের রাজাদিগকে সাবীয় বলা হয় সাবার নামানুসারে। অনেক দেশ ও বহু শহর তৈরি করেন এই কাহ্‌তন বংশীয় রাজাগণ। ইয়েমেন ও আরবের অন্যান্য অংশে তাঁদের রাজ্য বিদ্যমান ছিল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত।

ইসমাঈল বংশীয় আরব

সবশেষে আরবে এসে বসবাস স্থাপন করেছিল ইসমাঈল বংশীয়গণ। ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র ছিলেন ইসমাঈল (আ.)। তিনি বাসস্থান নির্মাণ করেন মক্কায় এবং হিজাজ প্রদেশে তার বংশধরগণ বসতি স্থাপন করায় প্রকৃতপক্ষে আরবের উন্নতি ও সুন্দর ভিত্তি স্থাপিত হয়। বলা হয় যে, আরবগণ কর্তৃক মর্যাদাপ্রাপ্ত কাবার প্রার্থনাঘর ইসমাঈল কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল সেই আবহমানকাল ধরে। বিখ্যাত কালো পাথর (হজরে আসওয়াদ) এর মধ্যে অবস্থিত, যা প্রাচীনকাল থেকেই আরবরা শ্রদ্ধা করে আসছে। এবং বর্তমানে এটা মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান।

বেদুঈন আরব

আরবের লোকেরা সব সময় দু'ভাগে বিভক্ত—নগরবাসী ও মরুবাসী। মরুবাসী আরবদিগকে বেদুঈন বলা হয়। তারা তাঁবুতে বাস করে পরিবারবর্গ ও মেষপালসহ। তারা মরুভূমি থেকে মালভূমির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়—পশুচারণের স্থান খোঁজার জন্যে। বিদেশিদের শাসনের অধীনে উত্তর ও মধ্য আরব ছিল বলে জানা যায় না। শুধুমাত্র আবিসিনীয়গণ কর্তৃক ইয়েমেন প্রদেশ কিছুদিন অধিকৃত ছিল। অবশেষে আরব দলপতি সাঈফ ইবনে জুল-ইয়েজেন কর্তৃক পারস্য সম্রাটের সহায়তায় আবিসিনীয়রা বিতাড়িত করার পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র ইয়েমেনেই তারা কিছুকাল রাজত্ব করেছিল। সেই সময় থেকে প্রায় শতাব্দীকাল বা তারও অধিক সময় মারজাবান নামের পারস্যের এক রাজপ্রতিনিধির অধীনে ইয়েমেন শাসিত হয়।

আরবদের ধর্মকর্ম

একটা বড় অংশের ইহুদি ও খ্রিষ্টান আরব দেশে বসবাস করে নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ করে চলত; কিন্তু অধিকাংশ আরববাসী প্রতিমা ও নক্ষত্রের পূজা করত। প্রত্যেক নগর ও জাতির লোকদের মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবী, মন্দির ও ভিন্ন ভিন্ন উপাসনাপদ্ধতি বর্তমান ছিল। রোম বা বেনারেসির মতো মক্কা ছিল জাতীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। ক্বাবাঘরে দেব-দেবীর ৩৬০টি মূর্তি ছিল, যাদের আরবরা পূঁজা করত। এমনকি নরবলীর প্রথাও সেখানে প্রচলিত ছিল।

এই বিশাল ভূ-খণ্ডের যারা অধিবাসী ছিল বিশেষ করে ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিমতীরে মরুভূমি এলাকায় যারা ঘুরে বেড়াত তাদেরকে গ্রিক ও রোমানগণ 'সারাসিনি' বলে অভিহিত করত। বিশ্বজয়ের জয়ের জন্য বের হলে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এরা এই নামে পরিচিত হয়। 'সারাসিনি' শব্দটি 'সাহারা' (মরুভূমি) এবং 'নাশীন' (অধিবাসী) শব্দ থেকে অথবা পশ্চিমা 'শারকিন' শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। যা আরবিতে 'শার্ক' অর্থ প্রাচ্য।

অধ্যায়-২

প্রাচীন ইতিহাস : কুরাইশ বংশ : কুসাঈ : আব্দুল মুত্তালিব: আবিসিনিয়া আক্রমণ : হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্ম : নবুয়ত লাভ : হিজরি সাল

প্রাচীন ইতিহাস

আমরা প্রধানত পবিত্র গ্রন্থ কোরআন শরীফ হতে আরব দেশের পাচীন ইতিহাসের বিষয় এবং বংশধারায় সংরক্ষিত প্রাচীন ঐতিহ্য হতে জানতে পারি। আরব ঐতিহাসিকগণ খ্রিস্টীয় অষ্টম ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে এসব ঐতিহ্যসমূহ অতি যত্ন এবং পরিশ্রমের সাথে সংগ্রহ করেছিল। কোরআন শরীফ ও ঐতিহ্য হতে গৃহীত সত্যতা থেকে প্রমাণিত হয় দক্ষিণ ইয়েমেন দেশে পাওয়া শিলালিপিসমূহ থেকে এগুলো জানা যায়।

কুরাইশ বংশ

যাদের সৌভাগ্য ও ইতিহাস আজ আমাদের মূখ্য আলোচনার বিষয় তারা হিজাজ ও ইয়েমেনের অধিবাসী ছিলেন। মধ্যযুগে তারা নিজেদেরকে বিখ্যাত করে তোলে। অধিবাসীদের মধ্যে 'কুরাইশ' বংশই হিজাজের সর্বাপেক্ষা প্রধান। তারা 'কুরাইশ' উপাধিধারী ফিহর (যার পদবী ছিল কুরাইশ) নামক এক ব্যক্তি হতে উদ্ভূত হয়েছিলেন। 'কুরাইশ' শব্দের অর্থ প্রাচীন আরবি ভাষায় বণিক। খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন ফিহর। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর আদনানের পুত্র সাআদ হতে তার সৃষ্টি। কুরাইশগণ সর্বদা গৌরাবান্বিত মনে করতেন নিজেদের বংশমর্যাদা ও অন্যান্য উপজাতি থেকে সামাজিক উচ্চাসনের জন্য এবং আরবগণের মধ্যে তারা সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশ বলে পরিগণিত হতেন।

কুসাঈ

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফিহরের বংশের কুসাঈ প্রথমে মক্কায় এবং পরে ধীরে ধীরে সমস্ত হিজাজ প্রদেশে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল।

তার আগে মক্কা প্রধানত কুঁড়েঘর ও তাঁবুবিশিষ্ট অঞ্চপাড়াগা ছিল। কুসাঈ ক্বাবাগৃহ পুনঃসংস্কার করেন। তিনি নিজের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রধান কক্ষ সর্বসাধারণের কার্যনির্বাহের জন্যে মন্ত্রীগৃহ[১] রূপে ব্যবহার হত। শিলানির্মিত গৃহে তিনি কুরাইশদের বাস করতে বাধ্য করেন। তিনি আইন করেছিলেন জনসাধারণের সুশাসন, কর আদায় এবং আরব দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে উপাসনালয়ে আগত তীর্থযাত্রীদের আহার ও পানীয় সরবরাহের জন্য।

---

১. পরবর্তীকালে যাকে 'দার-উন-নাদওয়া' নামা ডাকা হত।

আবদ উদ-দার

৪৮০ খ্রিস্টাব্দে কুসাঈ-এর মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদ উদ-দার তার স্থলাভিষিক্ত হন। তার মৃত্যুর পর পৌত্রগণ ও তার ভ্রাতা আবদুল মনাফের পুত্রগণের মধ্যে মক্কার শাসন কর্তৃত্ব নিয়ে বিবাদ আরম্ভ হয়। তারা শাসন ক্ষমতা ভাগাভাগি করে উভয়ের মধ্যে বিরোধের অবসান করে। আবদুল মনাফের পুত্র আবদ উস-শামসের-এর হাতে মক্কার পানি সরবরাহ ও কর আদায়ের ভার অর্পন করা হয় এবং ক্বাবা, মন্ত্রণালয়গৃহ ও সামরিক বিভাগের রক্ষকের ভার আবদ উদ-দারের দৌহিত্রগণের উপর অর্পণ করা হয়।

হাশিম, আবদুল মুত্তালিব

আবদ উস-শামস তার সমস্ত ক্ষমতা নিজ ভাই হাশিমের নিকট অর্পন করেন। হাশিম মক্কার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন, এছাড়া তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং অতিথি ও অন্যান্যদের প্রতি দারুণ সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ৫১০ খ্রিস্টাব্দে হাশিমের মৃত্যুর পর তার ভাই 'দয়ালু' উপাধিধারী আব্দুল মুত্তালিব ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ৫২০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তার ভাইয়ের পুত্র শায়বা ক্ষমতা লাভ করেন। শায়বা হাশিমের পুত্র ছিলেন। তিনি 'আব্দুল মুত্তালিব' নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

উমাইয়া

এরই মধ্যে আবদ উদ-দারের পৌত্রগণ সম্পদশালী হয়ে উঠলেন; কিন্তু হাশিম পরিবার সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করায় ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তারা সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করে মক্কার নেতৃত্ব গ্রহণের চেষ্টা করতে লাগলেন। আবদ উস-শামসের-এর উচ্চাভিলাষী পুত্র উমাইয়া এই দলের প্রধান ছিলেন। এসব সত্ত্বেও আব্দুল মুত্তালিব তার উদার চরিত্র ও কুরাইশদের শ্রদ্ধা ও ভক্তিবলে ৫৯ বছর পর্যন্ত মক্কা শাসন করতে সক্ষম হন। তিনি দশটি পরিবার প্রধানের সাহায্য পেতেন শাসনকাজের জন্যে।

হাতির বছর

আব্দুল মুত্তালিবের সময় আবরাহার নেতৃত্বে এক বিরাট আবিসিনীয় সেনাবাহিনী হিজাজ আক্রমণ করে। আবরাহা একটি হাতির পিঠে উঠে সেনাদলের নেতারূপে মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আরববাসীরা এর পূর্বে কখনো হাতি দেখে নি। সেজন্য আবিসিনীয়গণ যে বছর (৫৭০ খ্রিস্টাব্দে) মক্কা আক্রমণ করে আরব ঐতিহ্যে সে বছরকে হাতির বছর বলে। আক্রমণকারী সৈন্যদের কিছু অংশ বিভিন্ন সংক্রামক রোগে এবং কিছু ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আবিসিনীয়গণ যে উপত্যকায় শিবির স্থাপন করে—এই ঝড় ও শিলাবৃষ্টি তার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল।

হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জন্ম

অনেক ছেলেমেয়ে ছিল আবদুল মুত্তালিবের। তার পুত্রদের মধ্যে প্রধানত আবু তালিব নামে পরিচিত আব্দুল মনাফ, আব্বাসী খলিফাগণের পূর্বপুরুষ আব্বাস, হামজা এবং

আদুল্লাহ—এই চারজন পুত্র আরবের ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেন। তার অপর পুত্র আবু লাহাব, যাকে মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে 'ইসলামের উৎপীড়ক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আব্দুল মুত্তালিবের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহ—নবী হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন যার পুত্র। ইয়াসরিববাসী 'আমিনা' নামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের অল্পদিন পরেই পঁচিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন আব্দুল্লাহ্। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট তারিখে আমিনা এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন 'মুহম্মদ' বা 'প্রশংসিত ব্যক্তি'।

মুহম্মদ (স.) ছয় বছর বয়সে তার মা'কে হারান এবং তারপর থেকে তাঁর পিতামহ তাঁকে লালন-পালন শুরু করলেন। অনুমেয় ৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর আবু তালিব তার স্থলে মক্কার অধিপতি হন এবং আব্দুল্লাহর শিশুপুত্রের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চাচা আবু তালিবের গৃহেই মুহম্মদ (স.)-এর শৈশবজীবন অতিবাহিত হয়। শান্তশিষ্ট স্বভাব, মধুর ব্যবহার ও পরদুঃখকাতর মনোবৃত্তির জন্য প্রতিবেশীদের নিকট খুব শীঘ্রই অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। মুহম্মদ (স.)-এর শৈশবজীবন পরিশ্রম হতে মুক্তিলাভ হয়নি; আবু তালিবের অবস্থা তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো স্বচ্ছল ছিল না। তার পরিবারের অল্প বয়স্কদের পালাক্রমে মেষ ও উটের পাল দেখাশুনা করতে হত।

কিশোর বয়স হতে মুহম্মদ (স.) গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি চাচা আবু তালিবের সাথে দু'বার সিরিয়া ভ্রমণ করেন। সেখানে লোকের দুর্ভোগ, খারাপ পথ এবং কলহ-বিবাদ দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি আরবের ইতিহাসে মহৎ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারিনী খাদিজা নামের এক মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের বেশ কয়েজন সন্তান হয়েছিল; কিন্তু সমস্ত পুত্র সন্তানই শৈশবেই মারা যান। তাঁর কন্যারা তাঁর মহৎ ঘটনাবলী কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। সর্ব কনিষ্ঠা 'আজ-জাহরা' অর্থাৎ 'সৌন্দর্যশালিনী' উপাধিধারি, মুসলমানরা যাঁকে 'আমাদের মা' বলে। যিনি আবু তালিবের পুত্র আলীর (রা.) সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

পরবর্তী ১৫ বছরকাল মুহম্মদ (স.) নির্জনে জীবনযাপন করেন। এর মধ্যে এক বা দু'বার লোকসমাজে দেখা গিয়েছিল। বহু বছর পূর্বে গঠিত অনাথ ও এতিমদের জন্য যে সমিতি গঠিত হয়েছিল তা পুনর্জীবিত করেন। তিনি তার সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা ভয়ঙ্কর অনিষ্টকর বিবাদ প্রশমিত করেছিলেন। যদিও আমরা এই সমস্ত কাজ ছাড়া তাঁর জীবনে অন্য কোনো কাজের সন্ধান পাই না তথাপি তিনি তাঁর ভদ্র স্বভাব, বিশুদ্ধ চরিত্র, প্রবল বিশ্বাস ও গভীর কর্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা এই সময় আরববাসীদের কাছ থেকে 'আল-আমিন' বা 'বিশ্বাসী' উপাধি লাভ করেছিলেন। শিশুদের প্রতি ভালোবাসা তার চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল। তিনি যখনই ঘর হতে বের হতেন তখনই শিশুরা তার চারদিক ঘিরে থাকত। তিনি এদের সাথে মৃদু হাসি দিয়ে কথা না বলে কখনোই চলে যেতেন না। মক্কার অনতি দূরে হেরা পর্বতের গুহায় তিনি বছরে একমাস ধ্যানে ও আধ্যাত্মিক মিলনে অতিবাহিত করেন। একদিন রাতেরবেলা বস্ত্রাবৃত অবস্থায় গুহায় শুয়ে ছিলেন তখন সৃষ্টিকর্তা তাঁর আত্মাকে জাগ্রত করলেন এবং লোকজনকে ধর্মোপদেশ দিতে বললেন। তখন থেকেই

তিনি তার জীবনটা নিয়োজিত করলেন মানুষকে অবনতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। তিনি তাদেরকে খারাপ পথ পরিত্যাগ করতে বললেন ও পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীলতা রক্ষার জন্য উপদেশ দিতে লাগলেন।

নবুয়ত লাভ

প্রথমে তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা.) প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেন। পরে হযরত আলী (রা.), হযরত আবুবকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত হামজা (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) নামক কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তি এই ধর্ম গ্রহণ করেন। যখন তিনি লোকদেরকে ধর্মোপদেশ দিতে শুরু করলেন, তখন কুরাইশরা তাঁকে বিদ্রূপ করত; কিন্তু যখন দেখল যে তার নিজের কাজে সে অটল তখন তাকে বিদ্রূপের পরিবর্তে অত্যাচার শুরু করল। তারা তার উপর ও তার অনুসারীদের উপর খারাপ আচরণ শুরু করল। এমনকি কিছু অনুসারীদের তারা শাস্তি দিয়ে মেরে ফেলল। আর কিছু শিষ্য আবিসিনয়ার খ্রিস্টান রাজার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। অন্যরা তাদের ধর্মগুরুর পাশে থেকে অসৎব্যবহার ও উৎপীড়ক সহ্য করতে লাগলেন। অল্পকিছুদিন পর খাদিজা ও চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর অত্যাচার আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেতে থাকল। ফলে মক্কাবাসীদের মধ্যে কৃতকার্য বেশি দেখে তিনি নিজ ধর্মপ্রচারের জন্য অন্য কার্যক্ষেত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। সে অনুসারে তিনি তায়েফের দিকে অগ্রসর হলেন; কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করে শহর থেকে বের করে দিল। মুহম্মদ (স.) মর্মাহত হৃদয় নিয়ে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং কিছুদিন মক্কায় ধর্মোপদেশ থেকে বিরত থাকলেন। কেবল তীর্থের সময় মক্কায় আগত বিদেশি তীর্থযাত্রীদের নিকট মাঝে মাঝে ধর্ম প্রচার করতেন এই ভেবে যে, এ ক্ষেত্রে তিনি আশা করেছিলেন তাঁর উপদেশ শুনে অসৎ ও অমানবিক পথ হতে বিরত থাকবেন।

মক্কায় আগত ইয়াসরিববাসীদের মধ্য হতে কয়েক ব্যক্তিকে এভাবে শিষ্য করে নিতে সমর্থ হন। তারা তাঁর ধর্মে দিক্ষিত হয়ে শপথ করল যে তারা আর মূর্তিপূজা করবে না, চুরি করবে না, কোনো অসৎ কাজ করবে না কিংবা শিশু হত্যা[১] বা পরনিন্দা করবে না। এই ইয়াসরিববাসী নিজ দেশে প্রত্যাগমন করে এটা প্রচার করল যে, তাদেরকে সৎপথে নিয়ে যাবার জন্য আরববাসীদের মধ্যে একজন নবীর আগমন হয়েছে। তারপর কয়েক বছর তাদের আরো কিছু লোক মক্কায় এসে পূর্বের কথা অনুসারে অঙ্গিকারে আবদ্ধ হল। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ (স.)-কে নিমন্ত্রণ করার জন্য ইয়াসরিববাসীগণ তাঁর নিকট কিছু প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল। ইয়াসরিব ও মক্কার মধ্যে বহুদিন ধরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ইয়াসরিববাসীরা নবীর কথায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ায় এবং তাঁকে নিমন্ত্রণ করার সংবাদে নবী (স.) ও তাঁর ভক্তানুসারীদের উপর কুরাইশদের রাগ ভীষণভাবে জ্বলে উঠল। অনুসারীদের মধ্যে অনেক ইয়াসরিববাসী পালিয়ে প্রাণে রক্ষা পেল। সেখানে তাঁরা আন্তরিকভাবে অভ্যর্থিত হল। কুরাইশরা এই সংবাদ শুনে তাঁকে হত্যা করার

---

১. আরবে ইসলাম প্রচারের পূর্বে শিশু হত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

পরামর্শ করল। এই সময় তারা আবু বকর (রা.) ও আলী (রা.)-এর সাথে মক্কায় অবস্থান করছিলেন। ভীষণ বিপদ সংকেত পেয়ে তিনি হযরত আলী (রা.)-কে পেছনে রেখে আবু বকর (রা.)-এর সাথে মক্কার অদূরবর্তী পর্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। যখন তারা দেখল যে তাদের নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা পালিয়েছে তখন তারা হযরত আলী (রা.)-এর সাথে দুর্ব্যবহার করে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর সন্ধানে প্রবৃত্ত হল। যা হোক, পলায়নকারীরা যে গুহায় অবস্থান করেছিল তার সন্ধান কুরাইশরা পায়নি। নবী (স.) ও তাঁর সঙ্গী সেই গুহায় দুদিন অবস্থান করেন। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় তারা সেই স্থান পরিত্যাগ করে দুটি দ্রুতগামী উটের পিঠে উঠে ইয়াসরিব অভিমুখে যাত্রা করল। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ২ জুলাই, শুক্রবার তাঁরা সেখানে উপস্থিত হলেন। পরে হযরত আলী (রা.) এখানে এসে তাঁদের সাথে যোগ দেন।

হিজরি সাল

একেই হিজরত (নির্বাসন) বলা হয়। ইউরোপীয়দের বার্ষিক পঞ্জিকায় একে 'হিজিরা' বা 'মুহম্মদ যাত্রা' বলা হয়। এই হিজরত হতে শুরু হয়েছে মুসলিম পঞ্জিকা বা হিজরি সালের।[১]

১. সতের বছর পর দ্বিতীয় খলিফার সময় থেকে হিজরী সাল প্রবর্তন করা হয়। মক্কা দিন হতে এটার গণনা শুরু হয় নি। হিজরত রবীউল আউয়াল মাসের চার তারিখে হয়। কিন্তু চন্দ্র বৎসরের প্রথম মাস থেকে গণনা শুরু করা হয়। মহররম মাসের প্রথম দিন— যেদিন থেকে এই গণনা আরম্ভ করা হয়, সেদিন জুলাই মাসের পনেরো তারিখ ছিল।

অধ্যায়-৩
[১ম হিজরি-১০ম হিজরি; ৬২২ খ্রিস্টাব্দ-৬৩২ খ্রিস্টাব্দ]
মদীনায় মুহাম্মদ (স.) : মদীনার বিভিন্ন গোত্র ও দল : মদীনার সনদ

মদীনা

বিশ্বনবী তাঁর নিজ ধর্মবিশ্বাসের কারণে তাঁর নিজের গৃহ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ইয়াছরিববাসী অত্যন্ত উৎসাহের সাথে আগত নবী ও তার মক্কার অনুসারীদের সাদরে গ্রহণ করলেন। শহরের প্রাচীন নাম মদীনাতুন্নবী 'নবীর শহর' বা সংক্ষেপে মদীনায় পরিবর্তন করা হল যা এখনো ঐ নামেই পরিচিত। এখানে ইট ও কাদার দেয়াল এবং উপরে খেজুরগাছের পাতার ছাউনিবিশিষ্ট একটি মসজিদ তৈরি করা হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজেও এই অনাড়ম্বর উপাসনাগৃহ নির্মাণে সহায়তা করেছিলেন এবং সেখানেই তিনি সরল ধর্মোপদেশ প্রদান করতেন। তিনি জনসাধারণকে আল্লাহর মহিমা ও বদান্যতা শিক্ষার পাশাপাশি গভীর নৈতিক শিক্ষাও দান করতেন। তিনি বয়স্ক, শিশু, বিধবা ও এতিমদের প্রতি দয়া এবং পশুপাখির প্রতি সুহৃদ হওয়ার শিক্ষা দেন।

নবী (স.)-এর সনদ

এই সময় মদীনায় দুটি ভিন্ন জাতি বাস করত এবং তারা একে অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত থাকত। আরবীয় নবী (স.) সকল জাতিগত বিভেদ দূর করেন এবং সমস্ত মদীনাবাসীকে একসূত্রে আবদ্ধ করে তাদেরকে আনসার বা সাহায্যকারী আখ্যা দিলেন। মক্কা থেকে লোকজন যারা তাঁর অনুসরণ করে এসেছিল তাদেরকে মুহাজিরীন বা 'নির্বাসিত'[১] নামে ডাকা হত। আমরা যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে আরবের কোনো শহরেই কোনো প্রকার আইন বা শৃঙ্খলা ছিল না। বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকত এবং অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা এই উপদ্বীপটির সর্বত্র পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল।

৬২২-৬৩২ খ্রিস্টাব্দ

হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রথমে মদীনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন এবং একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি একটি সনদ প্রকাশ করলেন। যার ফলে সমস্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ হয় এবং অরাজকতা দূরীভূত হয়। মদীনার ভেতর ও বাইরে বসবাসকারী সমস্ত ইহুদীদের সমান অধিকার প্রদান করা হয়। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের শহর রক্ষার্থে সাহায্য করতে ও নিজেদের নিয়োজিত রাখতে বাধ্য থাকে।

---

১. মুহাজাজারিন।

বদরের যুদ্ধ

মদীনাবাসীরা মহানবী (স.) এবং তার অনুসারীদেরকে তাদের মাঝে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর হাতে নিজেদের শহর রক্ষার ভার অর্পণ করেছিল। হযরত মুহাম্মদ (স.) এখন শুধু একজন ধর্মোপদেষ্টাই নন বরং তিনি জনগণের প্রধান শাসনকর্তাও বটে। তার প্রধান দয়িত্ব হয়ে দাঁড়াল সর্বদা সতর্কতার সাথে রাজদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা দমন করা। মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের মক্কাবাসীরা বিপ্লবী মনে করত এবং মদীনাবাসী কর্তৃক তাদের আশ্রয়দানের কারণে তারা মদীনাবাসীদের উপরও ক্ষুব্ধ ছিল। এ কারণে মক্কা ও মদীনার মধ্যে যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। বদর নামক উপত্যকায় প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় যেটা মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। এতে মক্কাবাসীরা পরাজিত হয় এবং তাদের অনেক সৈন্য মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। বন্দিদের সাথে অতি সদয় ব্যবহার করা হয়।

৩ হিজরি, ২৬ এপ্রিল ৬২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ

ওহুদের যুদ্ধ

মদীনায় হিজরির দ্বিতীয় বছর শান্তিপূর্ণভাবেই অতিবাহিত হত যদি না মক্কাবাসী মদিনাবসীকে আক্রমণ করত। তৃতীয় বছরে হাশিমী বংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আবু সুফিয়ান, ইবনে হারব্, ইবনে উমাইয়া, মক্কাবাসী ও তাদের মিত্রদের এক বিরাট সৈন্যদল মদিনা রাজ্যে প্রবেশ করে। যে মুসলিম বাহিনী তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে অগ্রসর হল তার সংখ্যা খুবই কম ছিল। ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে একটা যুদ্ধ সংঘটিত হল। যে যুদ্ধের ফলে মদিনাবসীরা পরাজিত হল। তা সত্ত্বেও মক্কাবাসীদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি হল যে তারা মদীনা শহর আক্রমণ করতে অসমর্থ হল এবং আক্রমণ না করেই মক্কাই ফিরে গেল।

১ থেকে ১০ হিজরি

মদীনার অভ্যন্তরে ও চারপাশের অত্যন্ত সুরক্ষিত গ্রামসমূহে যে সকল ইহুদীরা বসবাস করত তারা গোলযোগ আরম্ভ করল। এই ছোট রাজ্যের পক্ষে তাদের অবস্থান সবসময়ই বিপদের উৎস ছিল। তাদের মধ্যে যারা শহরে থাকত তারা মক্কাবাসীদের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করত। আর তাদের দুর্দান্ত ও অদম্য স্বভাবের জন্য সবসময় যুদ্ধ ও রক্তপাতের সূত্রপাত ঘটত। এ কারণেই শহরের উপকণ্ঠ হতে বনু কায়নুকা ও বনু নজির নামক দুটো ইহুদী গোত্রকে বিতাড়িত করা হয়।

হিজরি ৫ম বর্ষে মক্কাবাসীরা ১০ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে আবার মদীনা আক্রমণ করে। এই বিরাট বাহিনীকে প্রতিহত করতে মুসলমানরা কেবল তিন হাজার সৈন্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। এজন্য তারা মহানবীর নির্দেশে শহরের অরক্ষিত অংশ বরাবর পরিখা খনন করেন এবং শহরের অন্যান্য অংশের ভার বনু কুরায়জা গোত্রের উপর অর্পণ করেন। এই ইহুদী গোত্র মদীনার দক্ষিণ উপকণ্ঠের অনেকগুলো সুরক্ষিত দুর্গের মালিক ছিলেন এবং তারা মুসলমানদের সাথে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা

ইহুদীরা তাদের দেওয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে মক্কাবাসীদের সাথে মদীনা আক্রমণে যোগ দিল। অনেকদিন ধরে অবরোধ চলল এবং মুহাম্মদ (স.)-এর সতর্কতা শুনে মক্কা নগরে প্রবেশের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল। অবশেষে প্রাকৃতিক শক্তি অবরোধকারীদের বিপক্ষে চলে যায়, বৃষ্টি ও ঝড়ে তাদের ঘোড়াগুলো মারা যায়, খাদ্যভাণ্ডার শেষ হতে থাকে এবং সৈন্য বাহিনী যেমন একতাবদ্ধ ছিল ঠিক তেমনি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

বনু কুরায়জা গোত্র

অকৃতজ্ঞ বনু কুরায়জার বিশ্বাসঘাতকতামূলক ব্যবহার যে কোনো মুহূর্তে মদিনার ধ্বংসের কারণ হতে পারে—এই বিবেচনায় তাদেরকে মদিনার নিকটে বসবাস করতে দেওয়া নিরাপদ নয়। সেজন্য তাদেরকে ঐ স্থান ছেড়ে চলে যেতে বলা হল। যেতে রাজি না হওয়ায় তাদেরকে অবরোধ করা হল এবং কোনো প্রকার শর্ত ছাড়াই তাদেরকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করা হল। তারা শুধুমাত্র একটাই শর্ত আরোপ করেছিল যে তাদের বিচারভার আওস দলনেতা হযরত সাদ ইবনে মুয়াজের উপর অর্পিত হোক; কারণ তারা মুয়াজের আশ্রিত ছিল। মুয়াজ একজন দুর্দান্ত বীরপুরুষ সৈনিক ছিলেন। তিনি যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং যুদ্ধে আহত হওয়ার ঠিক পরেরদিনই মৃত্যুবরণ করেন। তাদের (ইহুদি) বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি রাগান্বিত হয়ে মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাদের এই দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের যুদ্ধক্ষম পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে এবং মহিলা ও শিশুরা মুসলমানদের দাস হিসেবে কাজ করবে এবং এই বাক্য শাস্তি হিসেবে কার্যকর করা হয়েছিল। এই শাস্তি আমাদের নিকট অত্যন্ত কঠোর বলে বিবেচিত হতে পারে কিন্তু তখনকার যুদ্ধের রীতি অনুসারে এটা ছিল বিধিসঙ্গত।

মক্কাবাসীদের পরাজয়ের পর এই নতুন ধর্ম আরব উপদ্বীপে দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করতে শুরু করল এবং গোত্রের পর গোত্র তাদের পুরাতন ক্ষতিকর জীবনযাত্রা ত্যাগ করতে শুরু করল এবং ইসলাম ধর্মে আত্মনিয়োগ করল।[১]

খ্রিস্টানদের প্রতি সনদ

হিজরি ষষ্ঠ বর্ষে সিনাই পাহাড়ের নিকটবর্তী সেন্ট কেথারিন নামক মঠের সন্ন্যাসীদেরকে এবং অন্যান্য সকল খ্রিস্টানদেরকে হযরত মুহাম্মদ (স.) এক সনদ প্রদান করেন, যেটা পরম সহিষ্ণুতার কীর্তিস্তম্ভরূপে পৃথিবীতে আলোকজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স.) খ্রিস্টানদেরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও স্বাধীনতা দান করেন এবং মুসলমানদের গুরুতর শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে যদি তারা এই শর্তের কোনো প্রকার অপব্যবহার করে বা ভঙ্গ করে। এই সনদের মাধ্যমে খ্রিস্টানদেরকে রক্ষা করতে, তাদেরকে সকল বিপদে নিরাপত্তা দান করতে এবং তাদের গির্জা ও পুরোহিতদের

---

১. মুহাম্মদ (স.)-এর ধর্মের নাম ইসলাম। এটার অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, মুক্তি। এটা সল্‌ম-এর ধাতু হতে উৎপন্ন । (সালামা অর্থাৎ পূর্ণ শান্তিতে থাকা)।

আবাসস্থল রক্ষা করার জন্য মুহাম্মদ (স.) নিজে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন এবং তার অনুসারীদেরকে এ কাজে যুক্ত থাকতে আদেশ দেন। খ্রিস্টানদেরকে অতিরিক্ত কর প্রদান করতে হবে না, কোনো ধর্মযাজক তার পদ হতে কর্মচ্যুত হবে না। কোনো খ্রিস্টানকে নিজধর্ম ত্যাগে বাধ্য করা হবে না। কোনো মঠ-অধ্যক্ষকে তার মঠ থেকে বিতাড়িত করা হবে না, কোনো তীর্থ যাত্রীকে তার তীর্থ যাত্রায় বাধা দান করা হবে না, অথবা গির্জাগুলোকে মুসলমানদের মসজিদ বা আবাসস্থলে পরিণত করার জন্য ধ্বংস করা হবে না। খ্রিস্টান মহিলারা মুসলমানদের বিবাহ করলেও তারা তাদের নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। এ বিষয়ে তাদের প্রতি কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং তাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া হবে না। যদি খ্রিস্টানদের গির্জা বা মঠ সংস্কার বা অন্য কোনো ধর্মকার্য সম্পাদন করতে মুসলমানদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে মুসলমানরা তাদেরকে সাহায্য করবে।

আরবের চতুর্দিকে দূত প্রেরণ

হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য পারস্যের রাজা ও বাইজান্টাইন সম্রাটের নিকটও দূত প্রেরণ করেন। বাইজান্টাইন সম্রাট দূতকে সাদরে গ্রহণ করলেও পারস্যের রাজা অত্যন্ত ঘৃণার সাথে দূতকে তাড়িয়ে দেন। দামেশকাশের নিকটবর্তী বাইজান্টাইন রাজার অধীনস্থ জনৈক খ্রিস্টান রাজার নিকট অন্য একজন দূত পাঠানো হয় যাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

সপ্তম হিজরি বর্ষে খায়বরের ইহুদীরা বিপ্লব শুরু করেছিল তবে শীঘ্রই তারা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। নির্দিষ্ট ভূমি রাজস্বের বিনিময়ে তাদেরকে তাদের ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার প্রদান করা হল এবং তাদেরকে নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতাও প্রদান করা হল।

মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ বিরতির শর্ত অনুসারে মুসলমানরা ক্বাবা দর্শন করতে পারবে, মক্কার অধিবাসীরা শহর ফাঁকা করে দেবে যাতে করে মক্কাবাসীরা মুহাম্মদ (স.) ও তার অনুসারীদের সংস্পর্শে আসতে না পারে। তিনদিন পর মুসলমানরা মদিনায় প্রত্যাগমন করে এবং মক্কাবাসীরা তাদের ঘরে ফিরে আসে।

তার কিছুদিন পরেই মক্কাবাসীরা এবং তাদের মিত্ররা একত্রিত হয়ে বিশ্বাসঘাতকতামূলকভাবে মুসলমানদের একটি মিত্রাবদ্ধ গোত্রকে আক্রমণ করল এবং তাদের অনেককে হত্যা করল। এসব অত্যাচারিত লোকজন মহানবীর নিকট এর প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল। বহুদিন ধরেই মক্কায় এই অবিচার ও অত্যাচার চলছিল। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে মহানবী (স.) পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধাভিযান করলেন। দুটি গোষ্ঠীর প্রধানদের সামান্য বাধার সম্মুখীন হওয়ার পর প্রায় বিনা প্রতিবন্ধকতায় তারা মক্কায় প্রবেশ করলেন। যে শহরের মানুষ তার উপর নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করেছে সেই শহরে মুহাম্মদ (স.) এভাবেই প্রবেশ করলেন। এই শহর সম্পূর্ণরূপে এখন তার করুণার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই জয়োল্লাসের সময় তিনি সকল খারাপ আচরণের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, সকল অত্যাচার

ভুলে মক্কার জনগণের প্রতি সর্বজনীন ক্ষমা ঘোষণা করলেন। যখন তিনি বিজয়ীরূপে শহরে প্রবেশ করলেন তখন মাত্র চারজন ব্যক্তিকে আইন অনুযায়ী দোষী করে ঘৃণিত শত্রুর তালিকাভুক্ত করেন। সৈন্যদল তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শান্ত ও ধীরগতিতে শহরে প্রবেশ করলেন। কোনো গৃহই লুণ্ঠিত হল না বা কোনো নারীকেই অপমানিত করা হল না। এ বিষয়ে যথার্থ কথাই বলা হয়েছে : সমগ্র বিজয়ের ইতিহাসে এর সাথে আর কারো তুলনা হয় না। কিন্তু এই জাতির পূজারী মূর্তিগুলোকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা হল। বিষণ্নচিত্তে মূর্তিপূজারীরা চারদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের উপাসনাকৃত মূর্তিগুলোর পতন দেখতে লাগল। তারপর যখন তারা সেই পুরাতন কথা শুনতে পেল যা শুনে তারা হাসি ও বিদ্রূপ করত। মূর্তিগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে করতে যখন তিনি চিৎকার করে বললেন, 'সত্যের আবির্ভাব ঘটেছে এবং মিথ্যার ধ্বংস হয়েছে, সকল মিথ্যায় ক্ষণস্থায়ী।' তখন তারা বুঝতে পারল তাদের দেবতাগুলো ভঙ্গুর ও কত অসহায় এবং তাদের সামনে সত্যের উন্মোচন হল!

প্রতিনিধিত্বের বছর

বিভিন্ন দেশের রাজারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট দূত প্রেরণ করার জন্যে মুসলিম ইতিহাসে নবম হিজরি সনকে প্রতিনিধিত্বের বছর বলা হয়। কারণ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রধান প্রধান সহচর ও মদীনার নেতৃত্বদানকারী শহরবাসীগণ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অনুরোধে এই দূতদেরকে তাদের নিজ নিজ গৃহে অতিথিরূপে গ্রহণ করে আরবের চির সম্মানিত আতিথেয়তার রীতি অনুসারে তাদেরকে আপ্যায়িত করেন। বিদায়কালে তারা যাত্রাখরচ বাবদ প্রচুর অর্থ এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী অতিরিক্ত কিছু উপঢৌকন লাভ করতেন। দিক্ষিত গোত্রকে একটি লিখিত সন্ধিপত্র প্রদান করা হত ও বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হত এবং প্রত্যাগমনকৃত অতিথিদের সাথে একজন করে ধর্মীয় শিক্ষক পাঠানো হত, যাতে করে ইসলামে দিক্ষিত নতুন লোকদেরকে তিনি ইসলামের দায়িত্ব ও কর্তব্য শিক্ষা দান করতে পারে এবং তাদের মধ্য থেকে বদ-অভ্যাসগুলো দূর হয়েছে কিনা তা দেখতে পারে। যেসব শিক্ষকদের মুহাম্মদ (স.) বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাতেন তাদেরকে তিনি সবসময়ই নিম্নলিখিত উপদেশগুলো দিতেন :

"জনগণের সাথে ভদ্র ব্যবহার করো এবং কঠোর হয়ো না, তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখো এবং তাদেরকে ঘৃণা করো না। এবং তোমাদের সাথে ঐ গোত্রের অনেক লোক সাক্ষাৎ করতে আসবে, তারা তোমাদের প্রশ্ন করবে, 'স্বর্গের চাবি কি?' উত্তরে তাদের বলবে বেহেশতের চাবি হল, 'আল্লাহর সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করা এবং সৎ কাজ করা।'"

আরাফাত পাহাড়ে প্রদানকৃত উপদেশবাণী

আরবের লোকজন যখন দলে দলে এসে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ধর্মে যোগ দিচ্ছিল তখন তিনি ভাবলেন তার কাজ শেষ হয়েছে এবং তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এবং মৃত্যুর বেশি বাকি নেই এই ভেবে মক্কায় গিয়ে শেষ হজ্জ করার মনস্থ করলেন। জিলক্বদ মাসের

২৫ তারিখে (২৩ ফেব্রুয়ারি ৬৩২) বহুসংখ্যক মুসলমানকে নিয়ে মুহাম্মদ (স.) মদীনা শহর ত্যাগ করেন। জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ (৭ মার্চ) তিনি মক্কায় পৌঁছে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ করার পূর্বেই জবলুল আরাফাতের বা আরাফাত পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সমবেত জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে তিনি যে উপদেশবাণী দিয়েছিলেন তা এখনো প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে সমুজ্জল রয়েছে—

"হে জনগণ! আমার কথা শোনো, আমি জানি না এ বছরের পর আবার আগামী বছর তোমাদের মধ্যে পুনরায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগ আল্লাহ আমাকে দান করবেন কিনা।"

"এই দিন ও মাস সকলের নিকট যেমন পবিত্র তেমনি তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি পরস্পরের নিকট পবিত্র ও হস্তক্ষেপ অযোগ্য যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রভুর সম্মুখে হাজির হও, এবং মনে রাখবে, তোমাদেরকে তোমাদের মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হতে হবে, যিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কাজের জন্য হিসাব গ্রহণ করবেন। হে মানুষগণ তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি যেমন তোমাদের অধিকার আছে তেমনি তোমাদের প্রতিও তাদের একইরূপ অধিকার রয়েছে। তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করো। তোমরা আল্লাহকে জামিন রেখে তাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর আদেশমতোই তাদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করে নিয়েছ।"

"এবং তোমাদের দাসদাসী সম্পর্কে বলছি, তোমরা যা খাবে তাদেরকে তা খেতে দেবে। তোমরা যে কাপড় পরবে তাদেরকেও সেই ধরনের পোশাক পরতে দেবে, এবং তারা যদি এমন কোনো অপরাধ করে যা তোমরা ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক তাহলে তাদেরকে পরিত্যাগ করবে এজন্য যে তারাও আল্লাহর বান্দা বা সেবক এবং তোমাদের দুর্ব্যবহার করা উপযুক্ত নয়।"

"হে জনগণ, আমার কথা শোনো এবং তা বুঝতে চেষ্টা করো। জেনে রেখো প্রত্যেক মুসলমান একে অন্যের নিকট ভাইয়ের মতো। তোমরা এক ভ্রাতৃমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। কোনো জিনিস যদি কোনো ব্যক্তিকে সন্তুষ্টচিত্তে কেউ প্রদান না করে তা গ্রহণ করা অন্যদের প্রতি অবৈধ। তোমরা অন্যায় আচরণ হতে নিজেদের বিরত রাখবে।"

"যারা এখানে উপস্থিত আছো তরা আমার এই বাণী অনুপস্থিতদেরকে জানিয়ে দেবে। হয়তোবা যাদেরকে পরে বলা হবে তারা, আজ যারা শুনেছে তাদের চেয়ে বেশি স্মরণ রাখতে সমর্থ হবে।"

মদীনায় ফেরার পর তিনি রাজ্যকে প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং গোত্রীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রদেশগুলো ও বিভিন্ন গোত্রের লোকদের ইসলামের কর্তব্য শিক্ষাদান, বিচার পদ্ধতির সুপ্রতিষ্ঠা এবং যাকাত সংগ্রহ করার জন্য তাদের নিকট কর্মচারী পাঠানো হল।

মহানবী (স.)-এর মৃত্যুর আগের দিনের মনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত ধীর ও শান্ত, দুর্বল ও অসমর্থ হওয়ার কারণে তার মৃত্যুর তিন দিন আগে পর্যন্ত তিনি সাধারণ নামাযে ইমামের দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ ছিলেন। যেখানে তার পূর্বসহচরীরা চিরনিদ্রায় শায়িত আছে। একদিন মাঝরাতে তিনি সে স্থানে উপস্থিত হয়ে তাদের কবরের পাশে কাঁদতে থাকেন ও প্রার্থনা করতে থাকেন। তিনি তাদের আত্মার চিরশান্তির জন্য আল্লাহর

অনুগ্রহ কামনা করেন। অসুস্থতার কারণে এসময় তিনি মসজিদের পাশে অবস্থিত আয়েশা (রা.)-এর গৃহে থাকতে পছন্দ করলেন এবং যতক্ষণ শক্তি ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সাধারণ প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেন।[১] শেষবার তিনি তাঁর চাচাতো ভাই হযরত আলী (রা.) ও হযরত আব্বাস-এর পুত্র ফজলের উপর ভর দিয়ে তিনি শেষবারের মতো মসজিদে উপস্থিত হন।

নিয়মিত খোদার প্রশংসা এবং স্তুতি বর্ণনার পর তিনি নিম্নলিখিত উক্তিতে উপস্থিত জনসাধারণকে সম্বোধন করেন :

"মুসলমানগণ যদি আমি তোমাদের কারো প্রতি অন্যায় করে থাকি তাহলে আমি তার ক্ষতিপূরণ এখনই দিতে রাজি আছি; যদি আমি কারো নিকট ঋণগ্রস্ত থাকি তবে আমার আজ যা কিছু আছে সবই তোমাদের।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) তারপর নামায শেষ করলেন এবং যারা উপস্থিত আছে ও যারা তাদের শত্রুর অত্যাচারে নিহত হয়েছে তাদেরকে বেহেশতবাসী করার জন্য খোদার নিকট প্রার্থনা করলেন এবং তার অনুসারী সকলকে সঠিকভাবে ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন করতে আদেশ দিলেন এবং সুনাম ও শান্তির সাথে জীবন যাপন করার উপদেশ দিলেন এবং মহাগ্রন্থ আল কোরআনের নিম্নলিখিত বাক্যগুলো দ্বারা তাঁর উপদেশ শেষ করলেন :

"তাদের জন্য পরকালে সুখ রয়েছে যারা ইহকালে স্বার্থপরতা প্রদর্শন করে না অথবা অনর্থ ঘটায় না। ধার্মিকদের জন্য পরকালে সুখ রয়েছে।"

এরপর হযরত মুহাম্মদ (স.) ক্রমশ শক্তি হারাতে থাকল। সোমবার অপরাহ্নে (১২ রবিউল আউয়াল ১১ হিজরি, ৮ জুন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) একান্ত আগ্রহে ও মৃদুস্বরে নামায পড়তে পড়তে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পবিত্র আত্মা তার বেহেশতের প্রিয়তম বন্ধুর নিকট প্রস্থান করল।

দশ বছর পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলামি সাধারণতন্ত্রের প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এসময় আরবের জনগণের চরিত্রের বিরাট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন গোত্র ও শহরে প্রতিনিধি নিযুক্ত করার মাধ্যমে তাদেরকে আন্তঃগোত্রীয় বিবাদ মীমাংসা করার ক্ষমতা প্রদান করেন, বংশানুক্রমিক প্রতিশোধ নেয়ার প্রথা বন্ধ করেন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটে। জীবনধারণ ও পোশাক পরিচ্ছদের পরিধান পদ্ধতিরও অনেক পরিবর্তন হয়। মহিলাদের মধ্যে এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্বরযুগের অবাধ স্বাধীনতা পরিত্যাগ করা হয় এবং আচার-আচরণ সুরুচিপূর্ণ ও কঠোর নিয়মাধীন হয়, নৃত্য ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়। ইতিপূর্বে সেখানকার গৃহে অবাধ প্রবেশের কোনো বাঁধা নিষেধ ছিল না। এ সময় থেকে মহিলাদের জন্য বিশেষ কামরা ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয়।

---

১. বিবি খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর আরবের প্রথা ও প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অনুসারে তিনি কয়েকটি বিবাহ করেছিলেন। কখনো বিবাদমান গোত্রের মাঝে ঐক্য স্থাপন এবং কখনো স্ত্রীলোকদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। হযরত মুহম্মদ (স.)-এর পুরনো বন্ধু হযরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা হযরত আয়েশা (রা.), আবুবকর (রা.) মুহম্মদ (স.)-কে নিজের শিক্ষক মনে করতেন এবং তিনি তাঁর কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়ে তাদের বন্ধুত্বকে আরো সুদৃঢ় করলেন।

অধ্যায়-৪

প্রজাতন্ত্র

[১১-১৩ হিজরি; ৬৩২-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ]

আবু বকর : রিদ্রোহ : পারস্য ও রোমকদের সাথে যুদ্ধ : আবু বকরের মৃত্যু : উমর: কালদীয়া ও মেসোপটেমিয়া বিজয় : পারস্য : রোমকদের পরাজয় : সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর বিজয় : উমরের মৃত্যু

আবু বকর (রা.)

আরব নবীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁর অনুসারীদের মনে এমনভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল যে, প্রথমে কেউ বিশ্বাসই করতে পারেনি তিনি মারা গেছেন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে যিনি আরবের সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটান, তিনিও যে সাধারণ মানুষের মতোই মরণশীল, এটি উপলব্ধি করা আরবদের পক্ষে কঠিন হল। যদি তিনি অনৈতিহাসিক যুগে বাস করতেন কিংবা কথাবার্তার ক্ষেত্রে নিজের সম্পর্কে হতেন কিছুটা অযৌক্তিক, তাহলে সম্ভবত অন্যান্য মহাপুরুষের মতো তিনিও অলৌকিক মর্যাদা লাভ করতেন। শ্রদ্ধেয় হযরত আবু বকর (রা.) জনতার উত্তেজনা প্রশমিত করলেন, যিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁদের ধর্মগুরু সত্যিই মারা গেছেন—মূর্ছা যাননি, কেউ কেউ সে দাবি করছিল। তাই জনতার উদ্দেশে তিনি বললেন : "হে মুসলমানগণ, তোমরা যদি হযরত মুহম্মদ (স.)-এর উপাসনা করে থাক, তাহলে জেনে রাখ তিনি মৃত; কিন্তু তোমরা যার উপাসনা কর তিনি যদি আল্লাহ হন, তাহলে জেনে রাখ তিনি জীবিত–অবিনশ্বর। কোরআনের এই আয়াতটি তোমরা ভুলে যেও না, 'মুহম্মদ (স.) আল্লাহর দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন মানুষ মাত্র, তাঁর আগেও কয়েকজন ঐশী দায়িত্ব পেয়েছিলেন, তাঁরাও মৃত্যুবরণ করেছেন।' – এবং এই আয়াতটিও ভুলো না, 'হে মুহম্মদ, তোমারও মৃত্যু হবে, যেভাবে তোমার আগে মৃত্যু হয়েছে অন্যদের।'

এরপর ভেসে ওঠে শোকাহত বিলাপের রোল সমবেত জনতার মধ্যে– মহান ধর্মগুরু তাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন!

এরপর প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠল। হযরত মুহম্মদ (স.) অনেক সময় হযরত আলি (রা.)-কে তাঁর উত্তরাধিকারী ইঙ্গিত করলেও তিনি এ বিষয়ে কোন নিদিষ্ট নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করে যাননি। এটি ইসলামের পক্ষে ক্ষতিকর, যা ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ প্রশ্রয় দেয় এবং পরবর্তীতে তা গোত্রীয় যুদ্ধ ও ধর্মীয় বিভেদের যথার্থ কারণ হয়ে ওঠে। হযরত আলি (রা.)-কে যদি ইসলামের নেতা হিসাবে নিযুক্ত করা হত, তাহলে যে সর্বনাশা বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে মুসলিম জগতে অজস্র রক্তপাত ঘটেছিল তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হত।

হযরত আবু বরক (রা.)- কে খলিফা নির্বাচন

আরবদের মধ্যে গোত্রীয় নেতৃত্ব বংশানুক্রমিক ছিল না, ছিল নির্বাচনভিত্তিক; পূর্নমাত্রায় স্বীকৃত ছিল সার্বজনীন ভোট অধিকার এবং নেতা নির্বাচনের সময় গোত্রের প্রতিটি লোক

নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করতে পারত। বয়স অনুসারে নেতা নিবাচন করা হত প্রয়াত নেতার পরিবারভুক্ত জীবিত পুরুষদের মধ্যে থেকে। জরুরী অবস্থায় বিলম্ব না করে রসুলুল্লাহ (স.)-এর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে এই পুরনো গোত্রীয় প্রথাই অনুসরণ করা হয়। নিজের বয়স এবং মক্কায় তাঁর মর্যাদার গুণে হযরত আবু বকর (র.) আরবদের কাছে খুবই সম্মানের পাত্র ছিলেন, দ্রুত ভিত্তিতে তিনিই খলিফা বা রসুলুল্লাহ (স.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হলেন। আর তিনি ছিলেন জ্ঞানী ও সংযমী মানুষ হিসাবে সুপরিচিত। ঈমানের বশবর্তী হযরত আলি (রা.) সহ হযরত মুহম্মদ (স.)-এর পরিবারের প্রধান ব্যক্তিরা তাঁর নির্বাচন মেনে নিলেন।

আনুগত্যের শপথ নেওয়ার পরই এই ধর্মীয়নেতা জনতার উদ্দেশে বললেন, "আমার উপর শাসনের গুরু দায়িত্ব-প্রদান করা হয়েছে। আমি আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য নই, আপনাদের সব রকম পরমার্শ ও সাহায্য আমার দরকার। আমি ভালো কাজ করলে, আমাকে সমর্থন করবেন; যদি ভুল করি, তাহলে পরামর্শ দেবেন। শাসন ক্ষমতায় নিযুক্ত ব্যক্তিকে সত্য বলাই প্রকৃত আনুগত্য, আর তা গোপন করা বিশ্বাসঘাতকতা। আমার দৃষ্টিতে সবল ও দুর্বল একই এবং আমি উভয়ের প্রতিই সুবিচার করার আশা রাখি। আমি আল্লাহ ও তাঁর নবীকে মান্য করলে আপনারা আমাকে মেনে নেবেন; আর আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর নবীর নীতি অমান্য করি, তাহলে আপনাদের আনুগত্য লাভের অধিকার আমার থাকবে না।"

গোত্রীয় অভ্যুত্থান

রসূলুল্লাহ (স.) মারা গেছেন—এ খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই আরবদের দুর্দমনীয় স্বভাব আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল; পক্ষান্তরে প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসীরা এক ভয়াবহ আশঙ্কায় পড়ল। কিছু গোত্র, যারা সবেমাত্র পৌত্তলিকতা বর্জন করেছিল, শীঘ্রয় তারা কুপথে প্রর্তাবর্তন করল এবং যেসব প্রবঞ্চক রসুলুল্লাহ (স.) বেঁচে থাকা অবস্থায় দূর প্রদেশ সমূহে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তারা মুসলমানদের হয়রান করতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে ইসলাম প্রায় মদিনাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল এবং এই একটি মাত্র শহরকেই আবার যুদ্ধে নামতে হল উদ্বীপের পৌত্তলিক যাযাবরদের বিরুদ্ধে।

উসামার অভিযান

দুটি কারণে এই গোত্রীয় অভ্যুত্থান ঘটেছিল—প্রথমত, ইসলাম প্রবর্তিত কঠোর নৈতিক অনুশাসন; দ্বিতীয়ত, দরিদ্রদের জন্য কর (জাকাত) প্রদানে অনিচ্ছা। কিন্তু সব দিক দিয়ে চাপের মধ্যে পড়েও মুসলমানরা হতাশ হল না; ঈমান ও উদ্যমের জোরে আবারও তাদের বিজয় হল। রসুলুল্লাহ (স.)-এর অন্তেষ্টিক্রিয়ার পর খলিফার প্রথম দায়িত্ব হল প্রশাসনিক সংগঠন তৈরি করা এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। মুসলিম দূতকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে হযরত মুহাম্মদ (স.) সিরিয়ায় অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে উদ্দেশ্যে মদিনার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে সৈন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। মুতার নিদারুণ বিপর্যয়ের পর অভিযানের প্রয়োজন দ্বিগুণ হয়ে উঠল, কারণ

সে যুদ্ধে বিশ্বস্ত জায়েদ প্রাণ হারান এবং উত্তরাঞ্চলের গোত্রগুলি দল ত্যাগ করে। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে এবং উত্তর সীমান্তে শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভীষণ সংকটের মধ্যেও হযরত আবু বকর (রা.) সেনাবাহিনী পাঠালেন। আর বিদায়ের সময় মুসলমান সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বর্ষীয়ান খলিফা যে বক্তব্য দিলেন তা হল: "দেখ", জায়েদের পুত্র উসামা, যিনি এই অভিযানের অধিনায়ক, তার উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা পরিহার করবে। কোন অবস্থাতেই সৎপথ ত্যাগ করবে না। করবে না কারো অঙ্গহানি; শিশু বা বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কিংবা কোন স্ত্রীলোককে। খেজুর গাছের ক্ষতি করবে না, কিংবা তা পোড়াবেও না এবং এমন কোন গাছ কেটে ফেলবে না, যাতে মানুষ বা পশুর খাদ্য জন্মে। খাদ্যের জন্য অপরিহার্য না হলে মেষ, গবাদি পশু বা উট নিধন করবে না। ওই দেশের লোকেরা পাত্রে করে তোমাদের কাছে যে মাংস আনবে, তা তোমরা আল্লাহর নাম করে খেতে পার। আর যদি মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীরা বশ্যতা স্বীকার করে ,তাদেরকে বিনা উৎপীড়নে ছেড়ে দেবে। এবার মহাপ্রভুর নাম স্মরণ করে এগিয়ে যাও, তিনি তোমাদের তরবারি ও মহামারী থেকে রক্ষা করুন!"

উপদ্বীপে শান্তি প্রতিষ্ঠা

উসামা উত্তরাঞ্চলের পথে যাত্রা করলে, বিদ্রোহীরা মদিনা আক্রমণ করল, কিন্তু তাদেরকে প্রতিহত করে ফিরিয়ে দেয়া হল। উসামাও সিরিয়া অভিযানে জয়লাভ করলেন এবং অনতিবিলম্বে হযরত আবু বরক (রা.)-কে সাহায্য করতে ফিরে এলেন। এবার তিনি বিদ্রোহী গোত্রগুলিকে দমন করার জন্য দূরে সেনাবাহিনী পাঠাতে সমর্থ হলেন। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও রণকুশলী সেনাপতি ওয়ালিদের পুত্র খালিদের ওপর বিদ্রোহ দমনের প্রধান দায়িত্ব দেয়া হল। কয়েকটি গোত্র বিনা যুদ্ধেই বশ্যতা স্বীকার করল; আর যারা তা করল না, তাদের সাথে ভীষণভাবে যুদ্ধ করতে হল, এতে উভয় পক্ষেরই প্রভূত ক্ষতি হল। ইয়ামামার যুদ্ধে দুর্ধর্ষ বনুহানিফা গোত্র সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হল, সেই সঙ্গে তাদের নেতা প্রবঞ্চক (ভণ্ডনবী) মোসায়লিমা নিহত হল। এরপর বিদ্রোহীরা আস্তে আস্তে বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাদেরকে ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে নেয়া হয়।

পারস্যের সাথে যুদ্ধ ঃ এর কারণ : হীরার আত্মসমর্পণ

আরবের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে কয়েকটি ভবঘুরে গোত্রের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ করতে হয়; তারা হীরা নামে একটি অর্ধ-আরব রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সে রাজ্যটি পারস্যের বশ্যতা স্বীকার করত।

কিভাবে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটেছিল তা মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, পরবর্তীকালে যা সাম্রাজ্য দখলের লড়াই হিসাবে বিস্তারলাভ করে। তখনকার পারস্য অধিকৃত কালদীয়া পরিবেষ্টন করে হাজরের অবস্থান ছিল আরবের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, আর পশ্চিমে ছিল আরবীয় 'নফদে'র বর্ধিত অংশ ইউফ্রেটিসের নিম্নভূমিস্থ জলশূন্য ভূ-ভাগ, যা উত্তরদিকে 'মরুসাগর' থেকে বহুদূরব্যাপী হাওরানের উচ্চভূমি ও প্রাচীন তাদমোর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে এখনকার মত তখনো পশুচারী

যাযাবরের দল ঘুরে বেড়াত, যাদের কেবল নামই পরিবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু আচার-আচরণ একই রকম রয়ে গিয়েছিল। তারা প্রধানত খ্রিস্টান ছিল। সিরিয়ার দিকে যারা থাকত তারা ছিল ঘাসসানদের মত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীন; আর পূর্বদিকে যারা থাকত তারা বনু তঘলিবের মত পারস্যের বশ্যতা স্বীকার করত। তারা সকলেই প্রতিবেশী আরব গোত্রগুলির সঙ্গে রক্ত ও আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। ইউফ্রেটিসের ব-দ্বীপে কিছু স্থায়ী বাসিন্দাও বাস করত, যারা মরুবাসী সগোত্রদের যাযাবর জীবন ত্যাগ করে জীবিকা হিসাবে কৃষিকাজকেই বেছে নিয়েছিল।

স্বাভাবিকভাবেই পারস্য উপসাগরের পশ্চিম তীরে বিদ্রোহীদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ পারস্যের অধীনস্থ প্রতিবেশী গোত্রগুলির মধ্যেও প্রভাব ফেলে। প্রতিশোধ নেবার জন্যে উত্তরদিক থেকে আক্রমণ করা হয়, যার ফল দাঁড়ায়, এখন আমরা ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের এবং মধ্য এশিয়ায় রুশদের উন্নতির মধ্যে যা দেখতে পাই তার মত। দুই বিশাল নদী টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের জলধারা বিধৌত এই অঞ্চল স্মরণাতীত কাল থেকে রাজা-রাজড়াদের সাম্রাজ্য বিস্তারের বখরায় পরিণত হয়েছিল। একদিকে আরমেনিয়ার পর্বত থেকে উৎপন্ন টাইগ্রিস (দজলা), অন্যদিকে তৌরাস পর্বতবাহিত ইউফ্রেটিস (ফোরাত) পারস্য উপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়ার কয়েকশ' মাইল আগে একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। এখানে তারা নাম-পরিচয় হারিয়ে আখ্যায়িত হয়েছে 'শাত-ইল-আরব' বলে। দুই নদী বেষ্টিত এই অঞ্চলের ওপরের অংশটি প্রাচীনকালে মেসোপটেমিয়া[১] নামে পরিচিত ছিল। নিচের পাললিক সমভূমিকে বলা হত ব্যাবিলন ও কালদীয়া; আরবদের কাছে এটি 'ইরাক-আরব'[২] নামেই পরিচিত ছিল। এই দুই বিখ্যাত নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল বহু সমৃদ্ধশালী নগরী। শক্তিশালী আসিরীয় রাজাদের শাসনকেন্দ্র প্রাচীন নিনেভা (আধুনিক মুসল নগরীর অনতিদূরে) অবস্থিত ছিল এই টাইগ্রিস নদীর তীরেই; একইভাবে ছিল পারস্য সম্রাটদের রাজধানী মাদায়েন এবং মধ্যযুগীয় খলিফাদের প্রধান নগর বাগদাদ, বর্তমানে যা ইরাকের নতুন শাসক রাজা ফয়সলের রাজধানী। প্রাচীন ব্যাবিলন, হীরা, আরবদের নির্মিত কুফা, কিরকিসিয়া (প্রাচীন কিরকেসিয়াম) এবং রাক্কা নগরীর অবস্থান ছিল ইউফ্রেটিস নদীর তীরে। টাইগ্রিসের অপর তীরে জাগ্রোস পর্বতের পূর্বদিকের ভূখণ্ডকে আরবরা বলত 'ইরাক আজম'– অর্থাৎ পারস্যের কেন্দ্রস্থল। হাজর অভিযানের সেনাপতি খালিদ ও মুসান্না (মুথান্না)[৩] উপদ্বীপে শান্তি স্থাপনের কাজ শেষ করে হীরা অঞ্চলে হানাদারি দমনের কাজে হাত দিলেন। এ সময় কালদীয়ার পারসী শাসনকর্তা সীমান্তে যুদ্ধ বাধান, কিন্তু প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সহ পরাজিত হন এবং সামান্য প্রতিরোধের পর হীরা মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

---

১. কখনো কখনো টাইগ্রিস নদী থেকে জাগ্রস বা জাগ্রোস পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত আসিরিয়াকেও মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২. মেসোপটেমিয়া ও ইরাক-আরব উভয়ই এখন ইরাক রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

৩. বনু বকর গোত্রের হারিসের (শায়বানি) পুত্র মুথান্না ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি এবং সদয়প্রকৃতির মানুষ– দুর্ধর্ষ খালিদের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির।

হীরার লোকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে 'দেহকান' বা কালদীয়ার বৃহৎ ভূস্বামীরা আনুগত্য স্বীকার করল এবং নির্দিষ্ট ভূমি-রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে তাদের মীরকানাও ফিরে পেল (রবিয়ল আওয়াল, ১২ হিঃ; মে-জুন, ৬৩৩ খ্রীঃ)। কৃষকদের ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হল না; তারা তাদের জমি-সম্পত্তি নির্বিঘ্নে ভোগ-দখল করতে লাগল।

হীরা বিজয়ের পর পারস্য সরকারের চোখ খুলে যায় এবং সে আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করতে পারে– ধর্মীয় উদ্যমে অনুপ্রাণিত জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ একটি নতুন ও উদীয়মান শক্তি তাদের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। তারা বিচক্ষণ হলে অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলত এবং পুনর্গঠিত করত গৃহ বিবাদে জর্জরিত সাম্রাজ্যকে। এমনকি আবরদের সাথে তারা একটি চুক্তি করতে পারত। তা সত্ত্বেও পারস্য সাম্রাজ্য ছিল ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিধর। বর্তমান পারস্য, বক্তিয়া, তাতার সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্য এশিয়ার সমস্ত প্রদেশ, ভারতবর্ষ এবং পার্শ্ববর্তী ইরাক ও মেসোপটেমিয়া এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবদের বিতাড়িত করতে কালদীয়া থেকে এক বিরাট সেনাবাহিনী পাঠান হল।

আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যু [২৩ আগস্ট, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ]

খলিফা এ সময় অর্ধেক সৈন্যসহ খালিদকে সিরিয়ায় পাঠাতে বাধ্য হলেন। ফলে অপর সেনাপতি মুসান্নাকে পারসী সৈন্যদের বিরুদ্ধে একাকী নেতৃত্ব দিতে হল মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে। অতিরিক্ত সেনাঘাঁটিগুলি থেকে সৈন্য নিয়ে বাহিনী পুনর্গঠন করার জন্য তিনি দ্রুত মদিনায় ফিরে গেলেন, কিন্তু গিয়ে বর্ষীয়ান খলিফাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখলেন।

মাত্র আড়াই বছর শাসনকালের পর হযরত আবু বকর (রা.) ১৩ হিজরীর ২২ জমাদিউস সানী ইন্তেকাল করেন। তাকে বর্ণনা করা হয়েছে "অত্যন্ত গৌরবর্ণ, পাতলা মুখাবয়ব-বিশিষ্ট কৃশকায় ও ন্যুব্জ-দেহী মানুষ" হিসেবে। রসূলুল্লাহ (স.)-এর শিষ্য হওয়ার আগে অন্যতম প্রধান শাসনকর্তা হিসাবে তিনি কোরায়েশদের মধ্যে বিশাল প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন; বণিক হিসাবে তার সম্পদ এবং দলপতি হিসাবে তাঁর বিচক্ষণতা মক্কাবাসীদের মধ্যে তাকে বিরাট মর্যাদা দিয়েছিল। তিনি তার ধর্মগুরুর মতই আচার-আচরণে একান্ত অনাড়ম্বর, বিনয়ী অথচ দৃঢ়-চেতা হযরত আবু বকর (রা.) সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন নতুন রাষ্ট্রের প্রশাসন ও জনসাধারণের কল্যাণের জন্য। দুঃস্থদের সাহায্য ও নিঃস্বদের পরিত্রাণের জন্য তিনি রাতের বেলায় ঘুরে বেড়াতেন। নির্বাচনের পর কিছুদিন তিনি ব্যক্তিগত আয় থেকেই জীবিকা নির্বাহ করেন, কিন্তু যখন দেখলেন নিজের সম্পত্তি ও ব্যবসায় দেখাশুনা করতে গিয়ে সরকারি কাজে যতেষ্ট মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না; তখন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তিনি বাৎসরিক ৬০০০ দিরহাম গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। জনসাধারণের অর্থগ্রহণ করায় তিনি মৃত্যুশয্যায় এমনই অস্বস্তি বোধ করেছিলেন যে, তার গৃহীত অর্থ রাষ্ট্রকে পরিশোধ করে দেবার জন্য নিজের কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করে দেবার নির্দেশ দিয়ে যান। হযরত মুহম্মদ (স.)-এর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের জীবনধারা এমনই সৎ ও অনাড়ম্বর ছিল !

উমর (রা.)

হযরত আবু বকর (রা.) মৃত্যুর আগে হযরত উমর (রা.)-কে খলিফা পদে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান এবং জনসাধারণ তার নিয়োগ মেনে নেয়। ইসলামে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফত প্রাপ্তির মূল্য অপরিসীম। তিনি ছিলেন কঠোর নীতিজ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন এবং অত্যন্ত কর্মশক্তি ও চরিত্রবলের অধিকারী মানুষ। আরবের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠনের পর তার প্রথম কাজ হল মুসান্নাকে সাহায্য করতে দ্রুত নতুন সেনাবাহিনী পাঠানো। এই বাহিনী আবু ওবায়দের নেতৃত্বাধীন ছিল, যিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু মুসান্নার দূরদর্শিতাপূর্ণ উপদেশ না শুনে পারসীদের সাথে তিনি এমন এক জায়গা যুদ্ধ বাধালেন, যেখানে তিনি রণকৌশল প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়ে মারাত্মকভাবে পরাজিত ও নিহত হলেন। তা তত্ত্বেও পারসীরা এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারল না। শেষ পর্যন্ত তারা নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ল এবং ক্ষয়ক্ষতিসহ ইউফ্রেটিসের পশ্চিম শাখাস্থ বুওয়াইব নামক স্থানে মুসান্নার কাছে পরাজিত হল। মুসান্না অঞ্চলটি দখল করে পুনরায় হীরায় ফিরে গেলেন।

ইয়াজদজর্দ

এক নতুন সম্রাট এ সময় পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন । তরুণ, উদ্যমী ও উচ্চ অভিলাষী ইয়াজদজর্দ আবরদেরকে কেবল হীরা থেকে বিতাড়িত করতেই বদ্ধপরিকর হলেন না, তাদের দেশও জয় করে নিতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১,০০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী কালদীয়ায় পাঠালেন, যারা মুসলমানদের অপ্রস্তুত করে দখলীকৃত স্থানসমূহ থেকে তাদের উৎখাত করতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হল। এই বিশাল বাহিনীর সাথে মুসান্নার নেতৃত্বাধীন আবরদের পক্ষে পেরে ওঠা একেবারেই অসম্ভব হল, তাই আবার কালদীয়া পরিত্যাগ করে তারা সরে গেল মরু সীমান্তে, সেখানে তারা মদিনা থেকে নতুন সৈন্য আসার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

কাদিসিয়ার যুদ্ধ [মহরম ১৫ হিঃ; ফেব্রু-মার্চ ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ]

এভাবে মুসলমানরা যখন পারসীদের আক্রমণের জন্য অপেক্ষমাণ তখনই হারাল তাদের দুর্জয় সেনাপতিকে; তিনি মারা গেলেন কালদীয় জ্বরে আক্রান্ত হয়ে। ওয়াক্কাসের পুত্র সাদ খলিফা প্রেরিত অতিরিক্ত বাহিনী নিয়ে হাজির হয়ে সমগ্র আরব বাহিনীর সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, যে বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা এখন ৩০,০০০। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধ হল। তিনদিন তা স্থায়ী হল এবং উভয় পক্ষই তাদের বীরোচিত কৃতিত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করল। পারসী বাহিনী তৃতীয় দিনে ভেঙে পড়ল। চরম ক্ষয়ক্ষতিসহ তারা পরাজিত হল, সেনাপতি নিহত হল, তারা উত্তরদিকে পালিয়ে গেল । প্রকৃতপক্ষে কাদিসিয়ার যুদ্ধ কালদীয়া ও মেসোপটেমিয়া উভয়েরই ভাগ্য নির্ধারণ করে দিল। কালদীয়া বিনা বাধায় পুনরাধিকৃত হল এবং হীরার অধিবাসী, যারা মুসান্নার সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, এই অপরাধের জন্য বর্ধিত কর আরোপ করে তাদের শাস্তি দেয়া হল।

মাদায়েন অধিকার [সফর ১৬ হিঃ, মার্চ ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ]

হিরার নিকটবর্তী অন্যান্য শহর ও গ্রামগুলোর বশ্যতা স্বীকারের পর সা'দ অগ্রসর হলেন বাবিলের (ব্যাবিলন) দিকে, ছত্রভঙ্গ পারসি সৈন্যদের অবশিষ্ট অংশ যেখানে ফিরুজান, হুরুমুজান ও মিহরানের নেতৃত্বে পুনরায় একত্রিত হয়েছিল। তারা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হল। পারস্যের রাজধানী মাদায়েনে মিহরান আশ্রয় নিলেন; হুরমুজান পালিয়ে গেলেন পারস্যের দূরবর্তী অবস্থান রেখায় তাঁর রাজধানী আহওয়াজে; আর নিহাওয়ান্দে নিজে আশ্রয় নিলেন ফিরুজান, যেখানে পারস্যরাজের কোষাগার ছিল। তা সত্ত্বেও কালদীয়ায় স্থায়ী অধিকার বজায় রাখা সম্ভব হল না, কারণ কালদীয়া এতদিন মাদায়েনের অধীন ছিল, সেখানে এক বিশাল পারসী বাহিনী নিয়ে শিবির গড়ে অপেক্ষা করছিলেন মিহরান। এ কারণে সা'দ রাজধানী শহরটি আক্রমণ করতে বাধ্য হলেন। মনসুরের বাগদাদ নগরীর মত নদী থেকে পনের মাইল উঁচুতে টাইগ্রিসের উভয় তীরে এর অবস্থান। পশ্চিম অংশটি সেলুসিয়া বলে অভিহিত যা আলেকজান্ডারের বিখ্যাত সেনাপতি সেলুকসের বংশধরদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল; আর পূর্ব অংশটি টেসিফোন বলে অভিহিত যা পারস্য সম্রাটরা নির্মাণ করেছিলেন। দুটিকে মিলিতভাবে মাদায়েন (অর্থাৎ দুটি শহর) বলা হত। সেখানকার রাজা ও অভিজাত ব্যক্তিদের প্রাসাদগুলো ছিল বিলাসবহুল ও সুরম্য এবং সেগুলোর প্রাথমিক দৃশ্য সরল আরববাসীদের বেশ মুগ্ধও করেছিল। কিছুদিন অবরুদ্ধ থাকার পর মাদায়েন তার দ্বারদেশ উন্মুক্ত করল এবং তার আত্মসমর্পনের সাথে সাথে টাইগ্রিসের পশ্চিম তীরে অবস্থিত সমগ্র ভূখণ্ড অনুগত্য স্বীকার করল। খসরুর প্রাসাদে সমগ্র সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতায় একটি 'ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রার্থনা'[১] অনুষ্ঠানও করা হল।

জালুলার যুদ্ধ (ডিসেম্বর, ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ)

ইরাকের (বর্তমানে মেসোপটেমিয়াসহ) অসামরিক ও সামরিক প্রধান হিসেবে সা'দ মাদায়েনে তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। তিনি রাজপ্রাসাদে অবস্থান করলেন, যেখানে স্থাপন করা হল সমস্ত দপ্তর এবং সেখানকার প্রধান প্রকোষ্ঠটিতে প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজও অনুষ্ঠিত হতে লাগল। প্রদেশের শাসনকার্য এখান থেকেই তিনি পরিচালনা করতে লাগলেন। কিন্তু বেশিদিন যেতে না যেতেই, মুসলমানদের কাঁধে আরেকটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হল। পর্বতমালার পশ্চিমদিকে হলওয়ান নামক যে স্থানে পারস্যরাজ অবস্থান করছিলেন, সেখান থেকে তিনি এক বিশাল বাহিনী পাঠালেন মাদায়েন পুনরায় দখল করতে। রাজধানী থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পূর্বে জালুলা নামক স্থানে এই বাহিনীর সাথে যুদ্ধ বাধল এবং চরম ক্ষয়ক্ষতিসহ তারা হল পরাজিত। হলওয়ানও জয় হল এবং দুর্গ দ্বারা তা দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত করা হল। কিন্তু জালুলা ও মাদায়েনের লুঠের মাল মদিনায় পৌঁছলে খলিফাকে কাঁদতে দেখা গেল। এর কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি উত্তর দিলেন, এসব লুঠের মালের মধ্যেই তিনি তার লোকদের ভবিষ্যৎ ধ্বংসকে প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি ভুল বলেননি; আরবদের অভূতপূর্ব সাফল্যের পরিণাম স্বরূপ

---

১. মূল আরবর্তীতে 'সালাত-উজ-জাফর' বা 'জয়ের প্রার্থনা'।

তারা মিতব্যয়িতা, অনাড়ম্বরতা ও আত্মত্যাগের মত গুণগুলোকে হারিয়ে ফেলেছিল, যেগুলো প্রথম দিকে তাদের বিজয়ের ক্ষেত্রে বস্তুগতভাবে সহায়তা করেছিল ।

হলওয়ান বিজয়ের পর পারস্য রাজার সাথে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হল, যাতে পারস্য পর্বতমালাকে দুটি সাম্রাজ্যের সীমানা হিসেবে নির্দিষ্ট করা হল এবং খলিফাও এবার চরম আদেশ জারি করলেন যে, আরবরা কোন অবস্থাতেই ওই সীমানা অতিক্রম করতে পারবে না। পারস্য উপসাগরের সম্পূর্ণ অংশসহ পূর্বদিকে পর্বতমালার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইতিমধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছিল এবং উবুল্লার সমুদ্র বন্দরটিও মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। মুসলমানরা যে উদ্যম নিয়ে এই প্রদেশের পুনর্গঠন ও সম্পদ উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল তা বিজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে হযরত উমর (রাঃ)-এর যোগ্যতা বা তার সহযোগী মন্ত্রীসভার দক্ষতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। হযরত আলী (রাঃ)-এর পরামর্শে ব্যাপক জমি-জরিপের কাজ শুরু হল, প্রচলিত হল কর-নির্ধারণের নতুন পদ্ধতি; কৃষকদের করের বোঝা কমানো হল এবং জমিতে তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা হল। পারস্য রাজাদের আরোপিত বৃহৎ ভূস্বামীদের ওপর করের পুনর্মূল্যায়ন করা হল, সেচ-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে খাল-খননের একটি সামগ্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হল এবং প্রয়োজন অনুসারে কৃষকদের ঋণদানের আদেশও দেয়া হল। জমি থেকে স্থানীয় কৃষকদের উচ্ছেদ রোধ করতে জমি বিক্রি নিষিদ্ধ করা হল। পারস্য রাজাদের ভূ-সম্পত্তি, রাজকীয় মৃগয়ারণ্য, পলাতক রাজপুরুষ ও ভূস্বামীদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি এবং যেসব অগ্নি-মন্দিরের পুরোহিতরা পালিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলোর অধিকারভুক্ত সম্পত্তি পরিণত করা হল রাষ্ট্রীয় সম্পদে এবং মদিনা থেকে নিযুক্ত কর্মচারীরা তা পরিচালনা করতে লাগলেন। এসব জসিমহ 'সাওয়াদ' বলে পরিচিত কালদীয়ার সমতলভূমিকে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি হিসেবে নিজেদের মধ্যে বণ্টনের জন্য সৈন্যরা বিবাদ সৃষ্টি করলে হযরত আলী (রা.) ও ইবনে আব্বাসের সহযোগিতায় খলিফা সে দাবি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। সরকারি ব্যয় নির্বাহের পর এসব অধিগৃহীত সম্পদের আয় আরব ঔপনিবেশিকদের মধ্যে বণ্টন করা হল।

পারসিদের চুক্তি ভঙ্গ

খলিফার শালীনতা বা তার সেনাপতিদের সংযম কোনটিই পারসিদের সাথে নতুন সংঘর্ষ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। রাজধানী ও দুটি সমৃদ্ধ প্রদেশ হারিয়ে ইয়াজদর্দ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। শাসনকর্তারা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিলেন এবং তার সেনাবাহিনীও আরবদের বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমন করার দাবি জানাচ্ছিল। এদিকে আহওয়াজ প্রদেশের শাসনকর্তা হুরমুজান আরব উপনেবিশগুলোতে বার বার আক্রমণ করতে লাগলেন; প্রায়শই তিনি পরাজিত হয়ে পিছু হটেন আর শান্তি চুক্তির জন্য আবেদন-নিবেদন করেন, কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্রই তা ভঙ্গ করেন।

এ সময় ইরাকে দুটি নতুন নগর স্থাপন করা হয়। শাত-ইল-আরবের তীরে উত্তর আরবের অন্যতম জনবসতিপূর্ণ বসরা (বুসোরাহ) নগরী উবুল্লার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইরাকের সমুদ্র বন্দরে (১৭ হিজরি; ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ) পরিণত হল। অন্যদিকে হিরা প্রদেশ

থেকে তিন মাইল দক্ষিণে ইউফ্রেটিসের পশ্চিম তীরে ইয়েমেনী-আরব অধ্যুষিত কুফাকে মাদায়েনের স্থলাভিষিক্ত করা হল, যেটি পরিত্যক্ত হয় অস্বাস্থ্যকর বলে (১৮ হিজরি; ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ)। উভয় নগরীই নিয়ম অনুযায়ী নির্মিত হল। বর্গাকারে তৈরি নগরের কেন্দ্রস্থলে থাকে প্রধান মসজিদ এবং তারই লাগোয়া শাসনকর্তার বাসভবন। রাস্তাগুলো সোজা, চওড়া ও বিস্তীর্ণ; বাজারগুলো সুবিধাজনক স্থানে স্থাপিত হল এবং সেখানে বহুসংখ্যক সরকারি উদ্যানও ছিল।

অবশেষে মুসলমানরা পারসিদের বারবার আক্রমণে সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে এবং উত্তরাঞ্চলে তাদের রাজার বিশাল সেনা মোতায়নে গুরুতর আক্রমণের আশংকা করে মেসোপটেমিয়ার আরবরা এই বিপজ্জনক হুমকি প্রতিরোধের অনুমতি চেয়ে খলিফার কাছে প্রতিনিধি পাঠাল। হযরত উমর (রাঃ) প্রতিনিধিদের কাছে পারসিদের এ রকম বারংবার বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করলেন। তিনি বললেন, 'মুসলমানরা সম্ভবত জিম্মিদের[১] সাথে খারাপ ব্যবহার করে, সে জন্যই তারা প্রবলভাবে বিশ্বাসভঙ্গের চেষ্টা করে এবং আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।' তারা জবাব দিলেন, 'তা নয়', 'আমরা তাদের সাথে সততা ও বিশ্বস্ততা ছাড়া অন্য কোন রকম ব্যবহারই করি না।' স্বাভাবিকভাবেই খলিফা জানতে চাইলেন, 'তা কেমন করে হয়?' 'তাদের মধ্যে কি একজনও সৎ লোক নেই?' তখন প্রতিনিধি দলের নেতা বললেন, 'আমীরুল মুমিনিন, আপনি আমাদের রাজ্যের সীমানা বাড়াতে নিষেধ করেছেন; আর ওদিকে তাদের রাজাই তাদেরকে করে তুলছেন উত্তেজিত। একজন আরেকজনকে পরাজিত না করে দু'জন রাজা যুক্তিগতভাবে একসাথে থাকতে পারে না। এমন নয় যে আমরা তাদের সাথে খারাপ আচরণ করি, বরং বশ্যতা স্বীকারের পরও তাদের রাজা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য তাদেরকে উত্তেজিত করছেন। সুতরাং যতক্ষণ না আপনি এই প্রতিবন্ধক অপসারণ করবেন এবং তাদের রাজাকে বিতাড়িত করতে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবেন ততক্ষন এটি চলতেই থাকবে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ষড়যন্ত্র এর আগে শেষ হবে না।'[২]

হুরমুজানও এই অভিমত ব্যক্ত করলেন, যাঁকে বন্দী হিসেবে মদিনায় আনা হয়েছিল এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) স্পষ্ট বুঝলেন যে, পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ার উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে তা এবার প্রত্যাহার করা দরকার। কারণ খসরুকে বিধ্বস্ত করে তাঁর রাজ্য সম্পূর্ণভাবে দখল করা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোন পথ ছিল না।[৩]

নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ [২১ হিজরি; ৬৪২ খ্রিস্টাব্দ]

মরু অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি চূড়ান্ত ও মরীয়া আক্রমণ করার জন্য তাদের যে রাষ্ট্রনায়ককে রাজধানী থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং তাঁর কয়েকটি সমৃদ্ধশালী

---

১. অমুসলমান প্রজা।

২. ইবনুল আসির, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪২।

৩. মুইর এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের যুক্তি ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।

প্রদেশ কেড়ে নেয়া হয়েছিল, পারসিরা তাঁর আহ্বানে সক্রিয়ভাবে সাড়া দিল। শেষ যুদ্ধের জন্য ইয়াজদজর্দের সংগৃহীত সৈন্যের সংখ্যা পূর্ববর্তী সকল সময়ের সংখ্যাকে অতিক্রম করল। পারসিদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির খবরে মদিনাতেও প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল এবং খলিফা দেরি না করে সীমান্তে নতুন সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। দক্ষিণদিকে পারসি বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন নোমান নামে একজন সেনাপতি, আরব বাহিনীর সেনাপ্রধানের দায়িত্ব তাঁকেই প্রদান করা হল। এরপর ইলবুর্জ পর্বতের পাদদেশে নিহাওয়ান্দ নামক স্থানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে এশিয়ারও ভাগ্য নির্ধারিত হয়, আর তা 'সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়'[১] বলে অভিহিত করা হয়। সংখ্যায় আরবদের থেকে ছয় গুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও পারসিরা চরম ক্ষয়ক্ষতিসহ পরাজিত হল। কয়েক বছর পর তুর্কিস্তান সীমান্তের এক দূরবর্তী গ্রামে 'ক্ষুদ্র হস্ত' দারায়ুসের মত তাদের রাজা নিজ লোকের হাতে প্রাণ হারায় এবং এ পর্যন্ত তিনি একস্থান থেকে অন্যস্থানে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

পারস্য দখল : জিম্মি

এভাবেই পারস্য মুসলমানদের দখলে এল। কৃষকদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে খলিফা মেসোপটেমিয়ার মত এখানেও অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তাদেরকে মুক্ত করা হল বৃহৎ ভূস্বামীদের নিষ্ঠুর শোষন থেকে; তাদের করের হার সংশোধন করা হল এবং তা প্রতিষ্ঠা করা হল একটি স্থায়ী ভিত্তির ওপর। ধ্বংশপ্রাপ্ত শহরগুলোকে সংস্কার করা হল এবং খনন করা হল নতুন জল প্রণালীও। 'দেহকান' বা ভূস্বামীরা নির্দিষ্ট কর দানের বিনিময়ে তাঁদের সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকার প্রাপ্ত হল। সকলকে নৈতিক স্বাধীনতা দেয়া হল এবং লোকের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার জন্য মুসলমানদের আদেশ দেয়া হল। যারা তাদের পুরনো ধর্ম পালন করতে লাগল তাদেরকে 'জিম্মি' (সুরক্ষিত ব্যক্তি বা সামন্ততান্ত্রিক প্রজা) নামে আখ্যায়িত করা হল। যদি পার্থক্যের কথা বলা হয় তাহলে ধর্মের ক্ষেত্রে একমাত্র পার্থক্য হল, মুসলমানরা যে কোন সময়ে সৈন্যবিভাগে যোগ দিতে বাধ্য ছিল এবং তারা সরকারকে কেবল জাকাত দিত, আর সামরিক কাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য জিম্মিদের কিছু বেশি কর দিতে হত।[২] বিধর্মী সম্প্রদায়কে ধর্মান্তরিত করার জন্য কিছু আধুনিক জাতি যেরকম বাধ্যবাধকতা আরোপ করে, তা ব্যতিরেকেই বেশিরভাগ লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। এসব ধর্মান্তরিত ও আরববাসীদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল বহুল প্রচলিত, 'মাওয়ালী' (বন্ধু বা অনুগত) রূপে আরবদের গোত্রীয় সৌভ্রাতৃত্ব লাভ করেছিল অসংখ্য পারসী এবং তাদের মধ্যে যাঁরা সম্মানজনক কাজ সম্পাদন করতেন বা অন্য কোনভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতেন, তাঁরা বৃত্তিপ্রাপক হিসেবে সরকারি তালিকাভুক্ত হতেন। দীর্ঘদিন ধরে ম্যাসিডন রাজা আলেকজান্ডারের আমলের মত পুরোহিতরা বিপদ ও অশান্তির কারণ হয়ে

---

১. যুদ্ধে জয়লাভ করলেও আরব সেনাপতি তাতে নিহত হন।

২. সমস্ত প্রভাবশালী জাতির ইতিহাসে এই পার্থক্য সাধারণ ব্যাপার এবং তা আজও দেখা যায়।

উঠেছিলেন। যেসব লোক তখনো পুরনো ধর্ম আঁকড়ে ছিল তাদেরকে এরা অধিকাংশ সময় বিদ্রোহ করতে উস্কানি দিতেন। এসব বিদ্রোহ দমনকালে উভয়পক্ষই নিষ্ঠুর হয়ে উঠত। তা সত্ত্বেও আব্বাসীয় খলিফাদের বিচক্ষণ ও মন জয় করা নীতি, সেই সাথে ইসলামের সাধারণ প্রসারে সমূহ অসন্তোষের কারণগুলো ঠিক সময়মতই দূর হল।

রোমকদের সাথে যুদ্ধ : কারণ

হযরত আবুবকর (রা.) খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই রোমকদের সাথে আরবদের সংঘর্ষ বাধে। মেসোপটেমিয়া ও কালদিয়ার পশ্চিমদিকের সমগ্র অঞ্চল তখন পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ইরাকের মতো প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়াতেও আরবজাতির লোকেরা বসবাস করত, আরবের বেদুইনরা সিরিয়ার 'নফদ' বা মরুভূমিতেও ঘুরে বেড়াত। এভাবে তারা ইসলামি প্রজাতন্ত্রের আওতায় এসে যায়। উসামার শাস্তিমূলক অভিযান সিরীয় গোত্রগুলোকে উত্তপ্ত করে তোলে, তারাও প্রতিশোধমূলক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়। একইসাথে রোমকরা সীমান্তের নিকটবর্তী বালকা নামক স্থানে বিপুল সেনা মোতায়েন করে। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে শিখ আক্রমণের মোকাবিলায় ভারতে ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকার মতো রোমকদের প্রতিরোধ এবং তাদের গোত্রগুলোকে বশ্যতা স্বীকার করানো ছাড়া খলিফার সামনে তখন আর কোনো রাস্তা ছিল না। সাম্রাজ্যের স্বার্থে তা অত্যাবশ্যক ছিল। সৈন্য সংগ্রহের জন্য তাঁর আবেদনে স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া পাওয়া গেল এবং সেনাবাহিনী মদিনায় পৌঁছলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে উত্তরাঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। এই নতুন রণাঙ্গনের কিছু পরিচয় দেয়া আবশ্যক। আরব ভৌগোলিকদের মতে, প্যালেস্টাইনের অবস্থান ছিল কারমেল পাহাড় থেকে গ্যালিলি সাগরের (টাইবেরিয়াস হ্রদ) উত্তর সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত রেখার দক্ষিণাংশ এবং জর্ডন নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ জুড়ে। এখানে রোমকদের কয়েকটি সুরক্ষিত স্থান ছিল, যেমন সমুদ্রতীরে সিজারিয়া, জেরিকো, জেরুজালেম, আসকালন, গাজা ও জাফা। জোগার (সেগের) শহর বা প্রাচীন পেন্টাপলিস এবং মরুসাগরের দক্ষিণ থেকে আরব উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র অঞ্চল ছিল প্যালেস্টাইনের অধীনে। উপরোক্ত সীমারেখার উত্তরাংশ হল জর্ডান প্রদেশ (ওরডুন), সুরক্ষিত 'একর' (প্রাচীন টলেমাইস) এবং 'সর' (টায়ার) নগরী যার অন্তর্ভুক্ত। প্যালেস্টাইনের উত্তরদিকে যে মনোরম ও আকর্ষণীয় ভূখণ্ড, রোমকরা তাকেই সিরিয়া[১] বলত , আর আরবরা বলত 'বার-উশ-শাম' (দক্ষিণের দেশ) বা সংক্ষেপে শাম দামাস্কাস, হিমস (ইমেশা), আলেপ্পো (ক্যালিবন), অ্যান্টিয়ক প্রভৃতি ঐতিহাসিক নগর নিয়ে সে-দেশ সুরক্ষিত ছিল শক্তিশালী রোমক বাহিনী দ্বারা। হাওরাণের পার্বত্যাঞ্চল ছিল জর্ডান উপত্যকার পূর্বদিকে এবং টাইবেরিয়াস হ্রদের দক্ষিণে। হযরত আবুবকর (রা.) সিরিয়ায় প্রথম যে সেনাবাহিনী পাঠান তারা চরম দুর্দশাপূর্ণ পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। কিন্তু প্রবীণ খলিফা হতাশ না হয়ে নতুন উদ্যমে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং নতুন সৈন্যদলকে চারটি দলে বিভক্ত

---

১. প্যালেস্টাইনের কিয়দংশ রোমকদের সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

করে দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠালেন এবং তাদেরকে চারজন সেনাপতির অধীনে পরিচালনা করার নির্দেশ দেয়া হল। জাবিয়ায় প্রধান শিবির স্থাপন করে নম্র ও উদার প্রকৃতির আবু উবায়দাহ হিমস অংশের নেতৃত্বে রইলেন, তাঁদের সঙ্গী হলেন অসংখ্য মদিনাবাসী এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর সহচররা। আল-আসের পুত্র আমরকে নেতৃত্ব দেয়া হল প্যালেস্টাইন অংশের, যিনি বিখ্যাত ছিলেন মিশর জয়ের জন্য এবং পরবর্তীকালে কুখ্যাত হয়েছিলেন হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। আবু সুফিয়ানের পুত্র ইয়েজিদকে দামাস্কাস অংশের নেতৃত্ব দেয়া হল, যিনি (আবু সুফিয়ান) ইসলামের পুরনো শত্রু হলেও এখন এর পতাকা তলেই যুদ্ধ করছেন। প্রধানত মক্কাবাসী ও তিহামার আরব অধিবাসীদের নিয়ে ইয়াজিদের সেনাবাহিনী গঠিত হল এবং তাতে মক্কার বিভিন্ন গোত্রের প্রধান ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত হলেন, যাঁরা নগর বিজয়ের আগে পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (স.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

সিরিয়ার মূল্যবান যুদ্ধলব্ধ গণিমতের মালের লোভে তাঁরা ইয়াজিদের বাহিনীতে যোগ দিলেন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। একদিকে মক্কাবাসী ও তিহামার আরব অধিবাসী, অন্যদিকে মদিনাবাসীদের মধ্যে যে ঘোরতর শত্রুতা ছিল তার পরিণাম পরবর্তীকালে পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ বিভাগটি জর্ডান উপত্যকায় সক্রিয় রইল শোরাহবিলের নেতৃত্বে। আরেকটি বাহিনী মজুত রাখা হল আবু সুফিয়ানের দ্বিতীয় পুত্র মুআবিয়ার অধীনে, পরবর্তীকালে যিনি অন্যায়ভাবে খলিফার পদ দখল করেছিলেন। আল-আসের পুত্র আমর যখন লোয়ার প্যালেস্টাইন দিয়ে অগ্রসর হয়ে গাজা ও জেরুজালেমে আক্রমণ করতে উদ্যত, তখন অন্য তিনটি বাহিনীও আবু উবায়দাহ, শোরাহবিল ও ইয়াজিদের নেতৃত্বে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সৈন্য বিস্তার করল এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বসরা, দামাস্কাস ও টাইবেরিয়াদকে বিপর্যস্ত করে তুলল। কিন্তু তাদের অধীনে সর্বমোট ৩৫,০০০-এর বেশি সৈন্য ছিল না এবং যে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছিল কার্যক্ষেত্রে তার শক্তি ও রসদের কাছে তা নিতান্তই অনুপোযুক্ত বলে মনে হতে লাগল। ইউরোপীয় উপনিবেশগুলো হাত ছাড়া হলে কনস্টান্টিনোপলের রোমক সাম্রাজ্য তখনো বিশাল ছিল। অপরিসীম তার ঐশ্বর্য, সম্পদ এবং যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের ক্ষমতা। তিনটি সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এশিয়া মাইনরের সুবিশাল উপদ্বীপ এবং সম্পদশালী ও সুসজ্জিত সমুদ্র নগরী সিরিয়া, ফনিসিয়া এবং প্যালেস্টাইন; পার্শ্ববর্তী জাতিসমূহের শস্যভাণ্ডার মিশর এবং মিশরের উপকূল থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত "গাত্রাবরণের আলম্বিত আস্তিন" (দ্য লং স্লিভ অব দ্য ম্যান্টল) বলে পরিচিত বিশাল সরু ভূভাগ, সেই সাথে একদা প্রসিদ্ধ সাইরিন ও কার্থেজ রাজ্য—এই সমস্ত এলাকা নিয়ে পূর্বরোমক সাম্রাজ্য গঠিত ছিল।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ [৩০ আগস্ট, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ]

আরব আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করতে রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস সশরীরে হিমসে এলেন এবং সেখান থেকে পৃথক চারটি বাহিনী পাঠালেন আরব সেনাপতিদের বিধ্বস্ত করতে।

রোমকদের এই গতিবিধির খবর পেয়েই মুসলমান আমিররা (সেনাধ্যক্ষ) তাঁদের সমস্ত বাহিনীকে একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত করার সিদ্ধান্ত নিতে দ্রুত পরস্পরের মধ্যে মতবিনিময় করে নিলেন এবং সে অনুযায়ী ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁদের চারটি বাহিনীকেই একত্রিত করল ইয়ারমুক (প্রাচীন হিরোম্যাক্স) নদীর নিকটবর্তী জাউলান নামক স্থানে। ফলে রোমকরাও তাদের সব বাহিনী একত্রিত করল। ইয়ারমুক একটি অখ্যাত নদী, যেটি হাউরানের পার্বত্যভূমি থেকে উৎসারিত হয়ে টাইবেরিয়াস হ্রদের কয়েক মাইল দক্ষিণে জর্ডান নদীতে পতিত হয়েছে। জর্ডানের সাথে সঙ্গমস্থলের তিরিশ মাইল উজানে ইয়ারমুক নদীর উত্তরপার্শ্বে একটি অর্ধ-বৃত্তাকার ফাঁসের সৃষ্টি হয়েছে, যেখানকার সংশ্লিষ্ট বিশাল সমভূমিটি ছিল বিপুল সেনা সমাবেশের পক্ষে উপযুক্ত সমতলভূমি। ইয়ারমুকের উপকূল ভাগ পর্বত সমাকীর্ণ এবং ঢালু; ফাঁসের গলার দিকে রয়েছে একটি গিরিখাত, যা সমভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ তৈরি করেছে। এই স্থানটিকে বলা হয় ওয়াকুসা, ইসলামের ইতিহাসে যা বিখ্যাত। যেহেতু এর সব দিকগুলোই রোমকদের কাছে শিবির স্থাপনের উপযুক্ত মনে হওয়ায় এটিকে তারা বিবেচনা করল সুরক্ষিত স্থান বলে এবং আরবদের সম্পর্কে কোনো ভাবনা-চিন্তা না করেই তাদের সেনাবাহিনী এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। আরবরা অচিরেই শত্রু-সেনার ভুল বুঝতে পারল এবং আরেকটু উজানে নদী পার হয়ে তারা উত্তরদিকে গিরিখাতের খুব কাছেই অবস্থান করতে লাগল। যাতে রোমকরা বের হওয়া মাত্র তাদের ওপর আক্রমণ করতে পারে। দু'পক্ষের সৈন্যবাহিনীই পরস্পরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দু'মাস কাটিয়ে দিল, যতক্ষণ না খলিফা এই কালক্ষেপে বিরক্ত হয়ে ওয়ালিদের পুত্র খালিদকে কালদিয়া থেকে সিরিয়ায় পাঠালেন। রোমকরা তাঁর আগমনের খবর পাওয়ার আগেই মরুভূমি পেরিয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হলেন ওয়ালিদ ইবনে খালিদ। হিরাক্লিয়াসের সৈন্য সংখ্যা ছিল ২,৪০,০০০ অন্যদিকে সারাসিন বা আরবদের সর্বসাকুল্যে ছিল মাত্র ৪০,০০০; কিন্তু রোমকরা ইতোমধ্যেই উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল, কারণ যে ফাঁদে তারা আটকে পড়েছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার প্রতিটি পদক্ষেপেই তারা পরাভূত হচ্ছিল। পরিশেষে জমাদিউস সানি মাসের শেষ দিন (৩০ আগস্ট, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ) সকালে পুরোহিতগণদের উৎসাহে রোমক বাহিনী আরবদের সাথে লড়তে যুদ্ধশিবির থেকে বেরিয়ে এল। এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ইয়ারমুকের যুদ্ধ নামে পরিচিত। ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রোমকরা পরাজিত হয়, তাদের সেনাবাহিনীর একাংশ নদীর দিকে বিতাড়িত হয়ে নদীগর্ভে সলিল সমাধি হল। এর ফলে সমগ্র দক্ষিণ সিরিয়া সারাসিন অর্থাৎ আরবদের অধীনস্থ হল।[১]

আবু বকর (রাঃ)-এর মৃত্যু

এ সময় হযরত আবুবকর (রা.) ইন্তেকাল করেন। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ শুরুর আগেই তাঁর মৃত্যু সংবাদ শিবিরে পৌঁছে যায়। কিন্তু যুদ্ধজয়ের আগে খালিদ তা প্রকাশ করেননি।

---

১. রোমকদের ১,৪০,০০০ সৈন্য ক্ষয় হয়েছিল, পক্ষান্তরে আরবদের ক্ষয় হয়েছিল মাত্র ৩,০০০ (caussin de Perceval)।

হযরত উমর (রা) খালিদের হিংস্রতা কখনো সমর্থন করতেন না বলে তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে সরিয়ে দিলেন এবং বিচক্ষণ ও দূরদর্শী আবু উবায়দাহকে নিযুক্ত করলেন সেনাপতির পদে। খালিদ আবু উবায়দাহর অধীনেই যুদ্ধ চালাতে লাগলেন এবং সিরীয় নগরগুলো একের পর এক মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে লাগল। দামাসকাস, হিমস, হামা (ইপিফানিয়া), কিন্নিসরিন (ক্যালসিস), আলেপ্পো এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর আবু উবায়দাহর সামনে তাদের প্রবেশদ্বার খুলে দিল। পরিশেষে এই সেনাপতি উপনীত হলেন কনস্টান্টিনোপল শহরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী এন্টিয়কে। অন্যান্য স্থান থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যদের ভগ্নাংশের সমাহারে পরিবর্ধিত এক বিশাল বাহিনী সেটি রক্ষা করছিল। জনসংখ্যাও ছিল যথেষ্ট, যদিও তারা বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। নগরের বাইরে সামান্য যুদ্ধেই জয়ী হল মুসলমানরা, এতে নগরবাসীরা এতই হতোদ্যম হয়ে পড়ে যে কয়েকদিন অবরোধের পরই তারা বশ্যতা স্বীকার করে।

আজনাদায়নের যুদ্ধ

আবু উবায়দাহ যেমন উত্তর সিরিয়ার বৃহৎ অংশ দখল করলেন, তেমনি অন্যদিকে আল-আসের পুত্র আমরের প্যালেস্টাইন অভিযানের সাফল্যও কিছু কম ছিল না। আরতাবিন নামক রোমক শাসনকর্তা প্রদেশ রক্ষার জন্য এক বিশাল বাহিনী মোতায়েন করেছিলেন। জেরুজালেম, গাজা ও রামলায় সেনা মোতায়েন করে তিনি নিজে বিশাল বাহিনী নিয়ে শিবির স্থাপন করলেন জেরুজালেমের পূর্বদিকে রামলা ও বায়ত-জিবরিনের মধ্যবর্তী আজনাদায়ন নামক গ্রামে। আরব সেনাপতিরা এবার জেরুজালেম, গাজা, রামলা ও সিজারিয়া দখল রাখার জন্য মূল সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য নিয়ে আরতাবিনের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে যে যুদ্ধ হল রোমকদের কাছে তা হয়ে উঠল ইয়ারমুকের যুদ্ধের মতোই ভয়াবহ। তাদের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হল, অল্প কয়েকজন শুধু পালিয়ে যেতে সক্ষম হল তাদের সেনাপতির সাথে এবং তারা জেরুজালেম প্রাচীরের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নিল। এই বিজয়ের ফলে আরবরা বিনা বাধায় লাভ করল জাফা ও নাবলুস (নিয়াপলিস) নামক শহর দুটির অধিকার। আস্কালন, গাজা, রামলা, একর (টলেমাইস), বেরিটাস, সিডম, লাওডিসিয়া, আপামিয়া এবং গবুলাও বিনা যুদ্ধে তাদের তাদের নগরদ্বার খুলে দিল। শুধুমাত্র জেরুজালেম সাময়িকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলল বিপুল বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে। কিন্তু অল্পকাল অবরোধের পর তাদের নগরাধ্যক্ষ শান্তির জন্য প্রার্থনা করলেন, আর স্বয়ং খলিফা ছাড়া অন্য কারো কাছে নগর সমর্পণ করতে তিনি রাজি হলেন না।

হযরত উমর (রা.) সে অনুরোধ মেনে নিলেন এবং একজন মাত্র পরিচর্যাকারী সঙ্গে নিয়ে দেহরক্ষীবিহীন অবস্থায় বিনা আড়ম্বর বা সমারোহে তিনি জাবিয়ায় পৌঁছলেন। সেখানে তিনি সাক্ষাৎ করলেন জেরুজালেম থেকে আগত প্রতিনিধিদের সাথে। সামান্য কর প্রদানের বিনিময়ে তিনি তাদের স্বাধীনভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও গির্জাগুলোর অধিকার প্রদান করলেন। এরপর তিনি প্রতিনিধিদের সাথে রওনা দিলেন জেরুজালেমের দিকে,

যেখানে ধর্মাধ্যক্ষ সফরনিয়াস তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ইসলাম ধর্মের শীর্ষনেতা ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান এই পবিত্র নগরীর প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে বলতে ভেতরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা.) যীশুর স্মৃতিবিজড়িত গির্জায় (চার্চ অব দ্য রেজ্যারেকশন অর্থাৎ জেরুজালেম গির্জা) নামাজ পড়তে রাজি হলেন না, যেখানে তখন নামাজের সময় হয়েছিল; তিনি নামাজ পড়লেন কনসট্যান্টাইন গির্জার সিঁড়িতে, 'কারণ', তিনি ধর্মাধ্যক্ষকে বললেন, 'যদি আমি তা করতাম, তাহলে আমার দৃষ্টান্তের অজুহাতে মুসলমানরা ভবিষ্যতে চুক্তি লংঘন করত।' অনুরূপ সুব্যবহার পেল রামলা থেকে আগত প্রতিনিধিরাও, পক্ষান্তরে যে সামারীয় ইহুদীরা মুসলমানদের সাহায্য করেছিল, বিনা কর প্রদানে তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করা হল।[১]

৪৭ হিজরি; ২৩ জানু, ৬৩৮ খ্রিঃ হতে ১২ জানু, ৬৩৯ খ্রিঃ

আর্মেনীয় ও কুর্দী উপজাতিদের লুঠতরাজের বিরুদ্ধে মেসোপটেমিয়ায় শাস্তিমূলক অভিযান চালাতে হল, যার ফলে কুর্দিস্তান ও আর্মেনিয়া মুসলমানদের অধীনে চলে এল। এরপর রোমকরা হয়ে ওঠে আরও আক্রমণাত্মক। ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে বসন্তের শুরুতেই পূর্বাঞ্চলের স্বাধীন উপজাতিদের সাথে হাত মিলিয়ে হিরাক্লিয়াস সিরিয়ায় বিপুল সৈন্য মোতায়েন করলেন। যে নগরগুলো মুসলমানদের দখলে এসেছিল, এবার সেগুলো তাঁর সামনে দ্বার উন্মুক্ত করল; সেই সাথে আরবের খ্রিস্টান গোত্রগুলো তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল। মিশর থেকে আগত একটি সেনাবাহিনী সমুদ্র উপকূলে অবতরণ করে উত্তর প্যালেস্টাইন পুনর্দখল করল। এভাবে আরবরা সর্বদিক দিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু দুর্জয় সাহস, দুর্বার গতি এবং নিপুণ সেনাপত্যের সমন্বয়ে গভীর অনুপ্রেরণা ও কাজের প্রতি অবিচল আস্থা তাদেরকে আবার সাহায্য করল। যদিও কয়েকটি জায়গায় সংখ্যার দিক দিয়ে তারা ছিল বিশ ভাগের এক ভাগ, তবুও এই সম্মিলিত দলকে তারা বিরাট ক্ষয়ক্ষতিসহ ছত্রভঙ্গ করল। হিরাক্লিয়াসের পুত্র পরাজিত হলেন এবং সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে কোন মতে পালিয়ে গেলেন। দেশটি আবার মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হল। আর রোমকদের হাতে পড়ে থাকল কেবল উত্তর সিরিয়ার একটি জায়গা। সমুদ্র উপকূলবর্তী সিজারিয়া সমুদ্রপথে মিশরের সাহায্য নিয়ে কিছু দিন মুসলমানদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলমাত্র, কিন্তু হিরাক্লিয়াসের পুত্র কনস্ট্যান্টাইনের পালিয়ে যাওয়াতে প্রতিরক্ষাকারীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলল এবং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে সিজারিয়াও আত্মসমর্পণ করল। এবার দেশ জয় সম্পূর্ণ হল এবং 'পম্পে কর্তৃক ম্যাসিডোনিয়ার শেষ শাসন কর্তাকে সিংহাসনচ্যুত করার সাতশ বছর পর খলিফার শাসনদণ্ডের সামনে সিরিয়া নত হল।' রোমকরা শেষ পরাজয়ের পর বুঝতে পারল যে তাদের জয়ের আশা প্রায় শেষ, তবুও মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর ওপর তারা আক্রমণ অব্যাহত রাখল। আরবদের ও তাদের মাঝে এক দুর্লংঘ প্রতিবন্ধক গড়ে তোলার জন্য তারা তাদের দখলীকৃত এশিয়া সীমান্তের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে এক কৃত্রিম মরুভূমিতে পরিণত করল। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের

---

১. মু'আবিয়ার পুত্র ইয়েজ্জিদ তাদের এই অধিকার বাতিল করে দিয়েছিলেন।

সমস্ত নগরকে ধূলিসাৎ করা হল, দুর্গগুলো থেকে যুদ্ধোপকরণ সরিয়ে নেয়া হল এবং জনবসতিকে সরিয়ে নেওয়া হল আরও উত্তরদিকে। এগুলো আরব যাযাবরদের কাজ বলে মনে হলেও আসলে এগুলো বাইজান্টাইন বর্বরতারই নিদর্শন। কিন্তু এই অদূরদর্শী কাজ ফলপ্রসূ হল না, কারণ উত্তর সিরিয়ায় তখন সেনাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন ইয়াজ, তিনি তরাস পর্বত অতিক্রম করেন এবং প্রাচীন আসিরীয় রাজাদের কীর্তি বিজড়িত রাজধানী টরসাসসহ সিলিসিয়া প্রদেশকে মুসলমান শাসনের অধীনে নিয়ে এলেন। এমনকি তিনি আরব সম্রাজ্যকে বিস্তৃত করলেন কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত। আর তাঁর নাম এশিয়া মাইনরের রোমকদের কাছে ত্রাস সৃষ্টি করল। এ সময় আরবরা তাদের সহজাত উদ্যমের বশবর্তী হয়ে মনোনিবেশ করে যুদ্ধ-জাহাজ তৈরির দিকে এবং অল্পদিনের মধ্যে সমুদ্রেও তাদের কর্তৃত্ব বিস্তার করে। রোমকদের নৌ-বাহিনী পালিয়ে গেল হেলেসপোন্টে এবং গ্রিকদের আর্কিপেলাগো দ্বীপপুঞ্জও একে একে আক্রান্ত ও জয় করা হল। মিশর হতে বারবার সিরিয়ার ওপর আক্রমণ হতে লাগল। সমুদ্র উপকূলের এই হয়রানির জন্য রোমকরা দায়ী ছিল ফলে কিছুটা আপত্তি থাকা সত্ত্বেও খলিফাকে ফারাওদের দেশে অভিযান চালানোর অনুমতি দিতে হল। আল-আসের পুত্র আমর মাত্র ৪,০০০ সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন এবং তিনি সে দেশকে তিন সপ্তাহের মধ্যেই বাইজান্টাইনদের হাত থেকে মুক্ত করলেন। রোমকরা মিশরের অন্যান্য স্থান থেকে পালিয়ে গিয়ে সুরক্ষিত আলেকজান্দ্রিয়ায় আশ্রয় নিল। কিন্তু কিছুদিন অবরুদ্ধ থাকার পর অনুকূল শর্তে এই নগরীও আত্মসমর্পণ করল। ফলে দক্ষিণে আবিসিনিয়া সীমান্ত এবং পশ্চিমে লিবিয়া পর্যন্ত মিশরের সমগ্র অংশ মুসলমানদের দখলে চলে এল। অন্যান্য দেশের মত বিজয়ের সাথে সাথে এখানেও কৃষকদের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। কৃষকদের হাতে তাদের জমি ছেড়ে দেয়া হল, অবহেলিত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত পুরাতন সেচব্যবস্থা পুণঃনির্মাণ করা হল এবং ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে সংযুক্ত প্রাচীন খালটিকেও নতুন করে খনন ও পরিষ্কার করা হল। 'কপ্ট' নামে অভিহিত মিলকি গোত্রের মিশরীয় খ্রিস্টানরা মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করায় বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করল, নির্দিষ্ট ও পরিমিত হারে তাদের কর নিয়ন্ত্রিত করা হল এবং শুল্কের পরিমাণ হ্রাস করে ব্যবসা-বাণিজ্যকেও উৎসাহিত করা হল। ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে রোমকরা আবার আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে নিল। অবশ্য এক বছর পর আরবরা সেটি শেষবারের মত নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী ভস্মীভূত করা সম্পর্কে যে গল্প শোনা যায় তার কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। এ ধরনের বর্বর কার্যকলাপ ওই মহান শাসনকর্তার সহিষ্ণু ও উদার মানসিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে জুলিয়াস সিজার যখন ওই নগর অবরোধ করেন তখনই লাইব্রেরীর অধিকাংশ সংগ্রহ বিনষ্ট করা হয়, আর বাকি অংশ চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট থিয়োডোসিয়াসের রাজত্বকালে নষ্ট হয়। এই সম্রাট একজন চরমপন্থী খ্রিস্টান ছিলেন, তিনি পৌত্তলিকদের লেখা বইগুলো ঘৃণা করতেন ফলে ফিলাডেলফিয়া লাইব্রেরীর অবশিষ্ট মূল্যবান বইগুলোকে ধ্বংস ও বিক্ষিপ্ত করার আদেশ দিয়েছিলেন, আর সে আদেশ এতই নিষ্ঠার সাথে পালন করা হয়েছিল যে, সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য এর সামান্য বা কিছুই

অবশিষ্ট ছিল না।[১] মিশর জয়ের পর আমর পশ্চিমদিকের উপজাতিদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, যা শেষ হল বার্কা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উপকূল ভাগ দখলের মাধ্যমে।

অষ্টাদশ হিজরীতে উত্তর আরব ও সিরিয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়, যাতে ২৫,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়। সেই মহামারীর শিকার হন আবু উবায়দাহ, ইয়েজিদ ও শোরাহবীলসহ মুসলমানদের বেশ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। এ সময় সেখানে যে আর্তনাদ ধ্বনিত হয় তা শুনে স্বয়ং খলিফা মদিনা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন । তখন খলিফার প্রায় সত্তর বছর বয়স ছিল; তবুও সাহসের সাথে না হারিয়ে সেই আগের মতই একজন মাত্র অনুচর সাথে নিয়ে তিনি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি আয়লার বিশপের সাথে আলাপ করে খ্রিস্টানদেরকে নতুন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং তাঁর উপস্থিতি ও বক্তব্য দিয়ে জনসাধারণের মনোবল ফিরিয়ে আনেন।

মদিনায় ফিরে খলিফা নতুন সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও তার সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু একজন আততায়ীর হাত তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাকে নষ্ট করে দিল। একজন বিদেশী[২] খলিফার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত, সে এত মারাত্মকভাবে খলিফাকে জখম করল যে, তিনি আর আরোগ্য লাভ করতে পারলেন না। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের জন্য তিনি একটি ছয় সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করে যান।

উমর (রাঃ)-এর মৃত্যু [৬৩২-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ]

হযরত উমর (রাঃ)-এর মৃত্যু ইসলামে প্রকৃতই খুবই দঃখজনক ঘটনা। কঠোর হলেও এই ন্যায়পরায়ণ, দূরদর্শী, লোকচরিত্র সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞ ব্যক্তি দুর্দান্ত আরবদের নেতৃত্ব দেবার জন্য বিশেষভাবে যোগ্য ছিলেন। তিনি হাল ধরেছিলেন কঠিন হাতে এবং নানাভাবে দমন করেছিলেন নাগরিক বিলাসিতা ও কদাচারের সংস্পর্শে আসা যাযাবর গোত্র ও অর্ধসভ্য লোকদের অধঃপতনের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলোকে। রাজস্ব বিভাগের প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তিনি 'দীওয়ান' বা অর্থবিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রাদেশিক সরকারের জন্য নির্দিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন । তিনি দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ গড়ন এবং গৌরবর্ণের মানুষ ছিলেন। অনাড়ম্বর, কঠোর, আত্মসংযমী ও মিতব্যয়ী এই মানুষটি সবসময় হীনতম প্রজারও নাগালের মধ্যেই ছিলেন; তিনি প্রজাদের অবস্থা অনুসন্ধান করতে রক্ষীহীনভাবে রাতের বেলা ঘুরে বেড়াতেন, সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা এরকমই ছিলেন!

---

১. তুলনীয় ঃ সিডিলট, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯। এতে বলা হয়েছে, পুঁথিগুলো স্থানাগার গরম করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। তখন জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কোন 'হাম্মাম' ছিল না। এর প্রচলন হয় অনেক পরে।

২. কেউ কেউ বলে সে একজন অগ্নি-উপাসক; অন্যেরা, যেমন ডোজী বলেন, সে ছিল কুফার একজন খ্রিস্টান কারিগর।

অধ্যায়-৫
প্রজাতন্ত্র [পূর্বানুবৃত্তি]
[২৪-৪০ হিজরি; ৬৪৪-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ]

উসমান : তাঁর স্বজনপোষণ। উসমানের মৃত্যু : আলী-মু'আবিয়ার বিদ্রোহ : সিফফিনের যুদ্ধ : খারিজী সম্প্রদায় : আলীর হত্যা : প্রজাতন্ত্রের অবসান

উসমান (রা.)

হযরত উমর (রা.) সহজেই হযরত আলী (রাঃ) বা তাঁর নিজের পুত্র ধর্মভীরু আবদুল্লাহ ওরফে ইবনে উমরকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যে বিবেচনাবোধ ছিল, তার বশবর্তী হয়ে তিনি মদিনার ছয় জন বিশিষ্ট ব্যক্তির ওপর খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব প্রদান করলেন। অবশ্য পূর্ববর্তী প্রশাসকদের রীতির পরিবর্তন ঘটাতে গিয়ে তিনি যে ভুল করলেন তা উমাইয়া বংশের ষড়যন্ত্রের পথই সুগম করল। এবার উমাইয়ারা মদিনায় একটি শক্তিশালী দল গঠন করল। দীর্ঘদিন ধরেই তারা নবী-পরিবার হাশিমীদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং তাঁদেরকে তারা অত্যন্ত ঘৃণাও করত। তাদের ক্ষতি করার জন্য তারা হযরত মুহম্মদ (সা.)-কে জঘন্য হিংস্রতার সাথে অনুসরণ করত। মক্কা বিজয়ের পর তারা শুধুমাত্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামের অগ্রগতিতে তারা তাদের ব্যক্তিগত উন্নতির পথ খুঁজে পেয়েছিল । হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যেসকল সরল ও অনাড়ম্বর সাহাবীরা ইসলামকে পরিচালিত করেছিলেন, তাঁদের প্রতি উমাইয়াদের বিদ্বেষ প্রজ্জ্বলিত এবং অনমনীয় ছিল। যেসকল প্রবীণ মুসলমান মিলে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেছিলেন এবং সরকারের প্রধান প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি গোপনে ঈর্ষা পোষণ করা হত। এসব সাধুপুরুষদের বিশুদ্ধ ও অনাড়ম্বর জীবন ছিল তাদের শৈথিল্য ও স্বার্থপরতার প্রতি ছিল তিরস্কার স্বরূপ। আত্মীয়তার সম্পর্কের দরুন তারা বেদুইন গোষ্ঠীগুলোর প্রধানদের সাথে সহজেই মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হল। এমনকি তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হযরত আলী (রা.)-কে খলিফা পদ থেকে সরিয়ে দিতেও সফলকাম হল।

খলিফা নির্বাচন [মহরম, ২৪ হিজরি; ৭ নভেম্বর, ৬৪৪ খ্রিঃ]

কিছুদিনের গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক ও আলোচনার পর নির্বাচকমণ্ডলীরা উমাইয়া বংশের আফফানের পুত্র হযরত উসমান (রা.)-কেই খলিফা হিসেবে মনোনীত করলেন। কিন্তু তাঁকে নির্বাচিত করায় শেষ পর্যন্ত ইসলামের ধ্বংসই প্রতিপন্ন হয়েছিল। ধার্মিক এবং সৎ হলেও হযরত উসমান (রা.) ছিলেন অতিবৃদ্ধ ও দুর্বলচেতা মানুষ, এমনকি প্রশাসনিক কাজেও ছিলেন একেবারেই অনুপযুক্ত। এটা পূর্বেই অনুমান করা হয়েছিল যে তিনি দ্রুত তার পরিবারের লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়বেন এবং তাই হল। তিনি তাঁর সহকারী মারওয়ানের দ্বারা সর্বদা পরিচালিত হতে লাগলেন, আর মারওয়ান ছিল উমাইয়া

বংশের নীতিহীন ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম এবং এক সময় যে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক বহিষ্কৃতও হয়েছিলেন। হযরত উসমান (রা.) নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথে সহজাত স্বদেশপ্রেম ও ঈমানের বশবর্তী হয়ে হযরত আলী (রা.) তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে হাশিমী ও উমাইয়াদের মধ্যে যে তিক্ত বিবাদ শুরু হয়েছিল, তা এক শতাব্দীরও বেশি সময় স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর আমলে শুধু এই অকল্যাণটুকুই সাধিত হয়নি বরং নিত্য অবাধ্য ও দুর্দমনীয় যে আরববাসীরা রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ব্যক্তিত্বের দ্বারা বশীভূত হয়েছিল আর হযরত আবুবকর (রা.) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর দৃঢ়তা যাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিল তারাই এখন কোরায়িশদের আধিপত্যে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল এবং দূরবর্তী স্থানগুলোতে বিদ্রোহের বীজ বুনতে শুরু করল। মুদার ও হিময়ার বংশের মধ্যে যে পুরনো গোত্র বিদ্বেষ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল তা নতুনভাবে ধূমায়িত হয়ে ইসলামের সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠল। হযরত উসমান (রা.) হযরত উমর (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসকদের অপসারণ করলেন এবং তাঁদের স্থানে নিয়োগ করলেন নিজ বংশের অনুপযুক্ত ও অপদার্থ ব্যক্তিদের। তাঁর শাসন আমলের প্রথম ছয় বছর নতুন প্রশাসকদের অত্যাচার সত্ত্বেও জনগন শান্ত ছিল। সীমান্ত প্রদেশগুলোতে সাধারণ শত্রুর আক্রমন সম্পর্কে আরবরা অবহিত ছিল আর সে ব্যাপারে সেনাবাহিনীও কর্মতৎপর ছিল। তুর্কীরা অক্ষু অঞ্চল আক্রমণ করলে মুসলমানরা বলখ জয় করল। আর একইভাবে জয় করল হেরাত, কাবুল ও গজনী। দক্ষিণ পারস্যের দিকে অগ্রসর হলে কিরমান এবং সিস্তানও মুসলমানদের দখলে এল। নববিজিত অঞ্চলের বন্দোবস্তের ব্যাপারে হযরত উমর (রা.)-এর গৃহীত নীতিই অনুসরণ করা হল। বিজিত হওয়ামাত্রই এসব দেশের প্রাসঙ্গিক সম্পদ উন্নয়নের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। পয়ঃপ্রণালী খনন করা হল, রাস্তাঘাট নির্মান করা হল, রোপণ করা হল ফলবান বৃক্ষরাজি এবং নিয়মিত পুলিশ বাহিনী গঠনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হল। বাইজান্টাইনরা উত্তরদিক দিয়ে আক্রমণ করলে মুসলমানরা বর্তমান এশিয়া মাইনর থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত এগিয়ে গেল। জয় করা হল আফ্রিকা মহাদেশের ত্রিপলি, বারকা এবং ভূমধ্যসাগরীয় সাইপ্রাস অঞ্চল। মিশর পুনর্দখল করার জন্যে রোমকরা এক বিরাট নৌ-বাহিনী পাঠালে তা আলেকজান্দ্রিয়ার অদূরে ধ্বংস করা হল ।

এভাবে ইসলাম যখন দূর-দূরান্তে তার ক্ষমতা বিস্তার করছে, হযরত আলী (রা.) তখন মদিনায় আরবজাতির নবলব্ধ চেতনাকে বুদ্ধিবৃত্তির কাজে নিয়োগ করাতে আত্মনিয়োগ করলেন। হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর চাচাতো ভাই আব্বাসের[১] পুত্র আবদুল্লাহ মদিনার জুমা মসজিদ দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, ঐতিহ্য (ইতিহাস), অলংকারশাস্ত্র ও আইন বিষয়ে সাপ্তাহিক বক্তব্য প্রদান করতেন, পক্ষান্তরে অন্যান্য বিষয়গুলো অপর ব্যক্তিরা পর্যালোচনা করতেন। পরবর্তীকালে বাগদাদে বিরাট শক্তি নিয়ে যে বুদ্ধিবাদী আন্দোলন শুরু হয়, তার মূল এভাবেই প্রোথিত হয়েছিল।

---

১. ইবনে আব্বাস নামেই অধিকতর পরিচিত; জন্ম ৬১৯ খ্রিঃ, মৃত্যু ৬৮৭ খ্রিঃ।

৬৪৪-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ

এদিকে 'খলিফার দুর্বলতা ও তাঁর অনুগ্রহভাজনদের দুষ্কর্মে জনসাধারণের মধ্যে ঘোর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাঁর অধীনস্থ শাসনকর্তাদের জোরজবরদস্তি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজধানীতে সোচ্চার প্রতিবাদ স্রোতের মত আছড়ে পড়তে থাকে। যেভাবে অকর্মণ্য প্রিয়ভাজনদের হাতে শাসনভার প্রদান করা হয়েছিল, সে ব্যাপারে হযরত আলী (রা.) বিভিন্ন সময় খলিফার কাছে তাঁর অভিযোগ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু কূচক্রী মারওয়ানের প্রভাবে পড়ে হযরত উসমান (রা.) সেসব পরামর্শে কখনো গুরুত্ব আরোপ করতেন না। অবশেষে প্রতিবিধান দাবি করে প্রদেশগুলো থেকে প্রতিনিধিবর্গ মদিনায় এলেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি পেয়ে ফিরেও গেলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তন কালে খলিফার সীলমোহর সম্বলিত মারওয়ানের একটি চিঠি তাঁদের হাতে এস পড়ল, যাতে প্রতিনিধিবর্গের নেতারা গন্তব্যস্থলে পৌছানোমাত্র স্থানীয় শাসনকর্তাদের প্রতি তাঁদের মস্তক ছেদনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা আবার মদিনায় ফিরে এলেন এবং মারওয়ানের সমর্পণ দাবি করল। এমনকি উমাইয়া গোত্রের লোকেরাও[১] এই দাবি সমর্থন করল। কিন্তু হতভাগ্য হযরত উসমান (রা.) সে দাবি অনমনীয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে দুষ্কর্মের ব্যাপার খলিফারও সমর্থন রয়েছে এই বিশ্বাসে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা খলিফাকে গৃহবন্দী করে ফেলল। এই বিপজ্জনক মুহূর্তে উমাইয়ারা বৃদ্ধ দলপতিকে ত্যাগ করে সিরিয়ায় পালিয়ে গেল, আর তাদেরই গোত্রের মু'আবিয়া সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন । কিন্তু হযরত উসমান (রা.)-কে হযরত আলী (রা.), তাঁর পুত্ররা ও পোষ্যরা রক্ষা করলেন সাহসের সাথে এবং বিদ্রোহীদের জন্য এই প্রতিরক্ষাকারীদের ঠেকানো খুবই কঠিন হয়ে উঠল।

উসমান (রাঃ)-এর মৃত্যু [১৮ জুল হিজ্জা ৩৪ হিঃ; ১৭ জুন ৬৫৬ খ্রিঃ]

অবশেষে দু'জন অবরোধকারী প্রাচীর টপকে বাড়িতে প্রবেশ করল এবং সেখানেই বর্ষীয়ান খলিফাকে হত্যা করল। নিহত হওয়ার সময় হযরত উসমান (রাঃ)-এর বয়স হয়েছিল বিরাশি, অবশ্য কেউ কেউ ছিয়াশি বছর বলেন । চরিত্রে কোন দৃঢ়তা না থাকলেও তিনি মধ্যমাকার, শ্মশ্রুধারী এবং দীর্ঘকায় পুরুষ ছিলেন। ধর্মপরায়ণতাই ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অভ্যাসবশত তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের বড় রকমের দান-ধ্যান করতেন এবং বিভিন্ন সময় কূচক্রী মারওয়ানকেও সাধারণ কোষাগার থেকে অর্থ প্রদান করতেন, যা স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের নিকট তাঁকে অত্যন্ত অপ্রিয় করে তুলেছিল।

২৪ মহরম, ৩৫ হিজরি; ২৩ জুন ৬৫৬ খ্রিঃ

হযরত উসমান (রা.)-এর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.) কোন বাধা ছাড়ায় খলিফা হিসেবে মনোনীত হলেন। পূর্বসূরীদের নিত্য উপদেশ ও পথনির্দেশ দিয়ে সাহায্য করায় পূর্ববর্তী তিনটি প্রশাসনের মন্ত্রী পরিষদেই তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য হয়ে

---

১. মা'সউদী, মুরুজ-উজ-জাহাব।

উঠেছিলেন এবং হযরত উমর (রা.)-এর আমলে তাঁর পরামর্শেই শাসনব্যবস্থা অধিকাংশ নীতি চালু হয়। প্রকৃতপক্ষে ওই রাষ্ট্র প্রধানের অগাধ আস্থা তাঁর ওপর স্থাপিত হয়েছিল এবং তিনি বহির্ভ্রমণে গেলে তাঁকেই নিজের সহকারি হিসেবে মদিনায় দায়িত্ব দিয়ে যেতেন। বরাবরই তিনি নিজের চরিত্রের ব্যাপারে একটি স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য বজায় রাখতেন এবং জ্ঞান-সাধনা ও পুত্রদের শিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করতেন। খলিফা নির্বাচনের পরও তিনি সহজাত সারল্যে পায়ে হেঁটেই জুমা মসজিদে হাজির হলেন এবং সেখানে তার দীর্ঘ ধনুর্বাণে হেলান দিয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তাঁর আনুগত্যের শপথ নিলেন; সেই সাথে ঘোষণা করলেন যে তার থেকে অধিক যোগ্য ব্যক্তির হাতে তিনি প্রশাসনের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।

বিবি ফাতিমা (রা.)-এর স্বামী [হযরত আলী (র.)] উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতার সাথে নির্বাচনের সমন্বয় সাধন করলেন। একজন ফরাসী ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন, 'এমন পবিত্র ও মহান গৌরবের অধিকারীর সামনে সকলেই বিনত হতে পারত, কিন্তু তারা তা করল না।'[১] শুরুতেই তিনি আক্রান্ত হলেন উমাইয়াদের শত্রুতার দ্বারা। সৎ অভিপ্রায়ের জন্য তিনি সর্বদাই সুখ্যাত ছিলেন, আর এ কারণেই আপোসের সকল পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ক্ষমতা প্রাপ্তির সাথে সাথে তিনি হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক নিয়োগ দানকারী দুর্নীতিপরায়ণ শাসনকর্তাদের বরখাস্ত করেন। জনসাধারণের ক্ষতি করে বৃদ্ধ খলিফা তাঁর প্রধান অনুগ্রহভাজনদের যেসব জায়গীর ও ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন সেসব প্রত্যার্পণ এবং হযরত উমর (রা.)-এর প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী রাজস্ব বণ্টন করার আদেশ প্রদান করলেন।[২] বিগত শাসন আমলে যাঁরা সম্পদশালী হয়ে উঠেছিলেন এসব আদেশ তাঁদেরকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করল। হযরত উসমান (রা.) মনোনীত কিছু ব্যক্তি বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁদের পদ ছেড়ে দিলেও অন্যরা বিদ্রোহ করল।

মুয়াবিয়ার বিদ্রোহ (৬৪৪থেকে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ)

বিদ্রোহীদের মধ্যে ছিলেন সিরিয়ার শাসনকর্তা আবু সুফিয়ানের পুত্র মু'আবিয়া; যিনি প্রদেশের ধন-সম্পদের সাহায্যে বিপুল সংখ্যক বেতনভোগী সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং যারা বেতনের জন্য তাঁর অনুগত থাকতে বাধ্য ছিল। আর এভাবে সমর্থন পেয়ে মু'আবিয়া উত্তোলন করলেনর বিদ্রোহের পতাকা।

কিন্তু হযরত আলী (রা.)-কে শুধু এই প্রতিকূলতারই মোকাবিলা করতে হল না বরং দুই বিশিষ্ট কোরাইশ সদস্য তালহা ও জুবাইরকে কুফা ও বসরার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দান করতে অসম্মত হওয়ার কারণে তাঁদের অনিশ্চিত বন্ধুত্ব পরিণত হল ঘোর শত্রুতে এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে অত্যন্ত অপছন্দ করার কারণে বলে হযরত আবুবকর (রা.)-এর কন্যা বিবি আয়েশা (রা.)-ও আগুনকে উসকে দিলেন। তালহা ও জুবাইর তাঁদের আনুগত্যের শপথ ভুলে প্রথমেই মক্কায় পালিয়ে গেলেন, তারপর

---

১. সিডিলট।
২. মা'সউদী।

ইরাকের উদ্দেশ্যে, যেখানে বিবি আয়েশা (রা.)-ও তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। খলিফাকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীরা সেখানে বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করতে সমর্থ হল। এদিকে হযরত আলী (রা.) অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে বহুবার তাদের কাছে এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ পরিহার করতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু কোন ফল হল না।

উটের যুদ্ধ

ফলে খুরায়বা[১] নামক স্থানে অনিবার্য যুদ্ধ সংঘটিত হল, যেখানে তালহা ও জুবাইর নিহত হলেন এবং বিবি আয়েশা (রা.) ও বন্দি হলেন । কিন্তু তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে মদিনায় ফেরত পাঠান হল। এরপর কালদীয়া ও মেসোপটেমিয়ার বন্দোবস্ত করে খলিফা সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন।

সিফফিনের যুদ্ধ

তিনি রাক্কার পশ্চিম দিকে সিফফিন নামক স্থানেও বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করলেন। হযরত আলী (রা.) তাঁর সহজাত মানবিকতাবশত শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু মু'আবিয়া অহঙ্কারে মত্ত হলেন এবং অসম্ভব শর্ত আরোপ করলেন। এমনকি অবাঞ্ছিত রক্তপাত এড়াতে হযরত আলী (রা.) তাঁকে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের মাধ্যমেও এই বিরোধের নিষ্পত্তি করার প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু উমাইয়া বংশধর (অর্থাৎ মু'আবিয়া) সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন। এভাবে প্রতি পদে পদে উত্যক্ত হয়েও খলিফা তাঁর সৈন্যদের শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিলেন, সেই সাথে আশ্রিতদের রক্ষা করতে এবং বন্দীদের সম্মান প্রদর্শন করতেও নির্দেশ দিলেন। পরপর তিনটি যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হল এবং মু'আবিয়া যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল, আর এ সময় তাঁর দুষ্কর্মের সহচর আল-আসের পুত্র আমরের একটি কৌশল তাঁদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করল। তিনি তাঁর বেতনভোগী সৈন্যদের আশ্রয়ের জন্য বর্শা ও পতাকায় কোরআন বেঁধে চিৎকার করার পরামর্শ দিলেন। ফলে খলিফার সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ তাদের পিছু হটানো হতে বিরত হয়ে বিষয়টি সালিশীতে দিতে আহ্বান জানাল। বিদ্রোহীদের এই চক্রান্ত উপলব্ধি করেও সৈন্যদের পীড়াপীড়িতে তাঁদের প্রস্তাবেই খলিফাকে সম্মতি দিতে হল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর পক্ষে সালিশীতে নিযুক্ত হলেন আবু মুসা আশআরি নামে এক দুর্বলচেতা বৃদ্ধ, যিনি গোপনে হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি শত্রুভাবাপন্নও ছিলেন। তিনি কোনভাবেই মু'আবিয়ার প্রতিনিধি আলআসের পুত্র ধূর্ত আমরের সমকক্ষ ছিলেন না। এভাবে তাঁর নিজের সৈন্যদের কারণে বিজয়ের ফললাভ না করেই খলিফা বিরক্তি সহকারে সৈন্যদল নিয়ে কুফায় ফিরে গেলেন।

---

১. প্রকৃতপক্ষে যে স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং যেখানে এই লোকগুলো নিহত হয়, তাকে বলা হয় ওয়াদি-উস-সাবআ বা সিংহের উপত্যকা।

খারিজী বিদ্রোহ

যেসব লোক সিফফিনে সালিশীর জন্য সোচ্চার হয়েছিল, তারাই এখন তা প্রত্যাখ্যান করল এবং তারা এটিকে পাপজনক কাজ হিসেবে ঘোষণা করল। তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ[১] করল এবং মরুপ্রান্তর নাহরওয়ানে সরে গিয়ে আক্রমনের ভাব প্রদর্শন করতে লাগল। তারা কিছুতেই নিজেদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে কিংবা শান্তভাবে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেতে রাজী হল না। তাদের আচরণ শেষ পর্যন্ত এমন গুরুতর হয়ে উঠল যে খলিফা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আক্রমণ করতে বাধ্য হলেন। অধিকাংশই যুদ্ধে নিহত হল; কয়েকজন পালিয়ে গেল বাহরাইন ও আল-আহসায়, সেখানে তারা এক মৌলবাদী ধর্মোন্মত্ত দল তৈরি করল, যারা দিন দিন রক্তক্ষয়ী আক্রমণ দ্বারা সাম্রাজ্যকে অস্থির করে তুলছিল। পূর্বদিকে যখন এসব ঘটনা ঘটছে তখন খলিফার প্রতিনিধি দাউমাত-উল-জনদল নামক স্থানে হয় বিশ্বাসঘাতকতা করলেন, না হয় সম্পূর্ণভাবে প্রতারিত হলেন। আমর তাঁকে মন্ত্রণা দিলেন যে, ইসলামের শান্তির জন্য হযরত আলী (রা.) এবং মু'আবিয়া দুজনকেই অপসারিত করতে হবে; আর এ ব্যাপারে আবু মুসাই হযরত আলী (রা.)-এর পদচ্যুতির ঘোষণা করবেন, তারপর তিনি মু'আবিয়াকে পদচ্যুত করবেন এবং সব শেষে তাঁরা একজন নতুন খলিফা নির্বাচন করবেন। সরলমতি আবু মুসা ফাঁদে পড়ে বেদীতে উঠে ঘোষণা করলেন, 'আমি আলীকে খিলাফত থেকে পদচ্যুত করছি।' তারপর আমর উঠে বললেন, 'আমি আলীর পদচ্যুতি গ্রহণ করলাম এবং তাঁর স্থলে মু'আবিয়াকে নিযুক্ত করলাম।' এই ধৃষ্টতাপূর্ণ ঘোষণা খলিফার অনুগামীদের রাগান্বিত করে তুলল। আর চিরকালীন প্রতিশোধের অঙ্গীকার নিয়ে দুই দলই আলাদা হয়ে গেল; আর মুসা মদিনায় ফিরে গেলেন, যেখানে পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি উমাইয়া দরবার থেকে একটি বৃত্তি পেলেন। এরপর মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ করতে লাগল। কিন্তু পূর্ব সীমান্তের গোলযোগে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে খলিফা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক সৈন্য পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলেন। এই সুযোগে তিনি (মু'আবিয়া) শুধু যে সিরিয়াতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করতে সমর্থ হলেন তাই নয়, মিশরও জয় করলেন।

হযরত আলী (রা.) কে হত্যা [১৭ রমজান, ৪০ হিজরি]

খলিফার বেশিরভাগ বিশিষ্ট অনুচরকেই বিষপান করিয়ে ও ছুরির সাহায্যে হত্যা করা হল এবং খলিফা স্বয়ং ৬৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি কুফার জুমা মসজিদে নামাজ আদায়কালে আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। এভাবেই মধ্য যৌবনে তাঁকে জীবন দিতে হল। কর্নেল ওসবোর্নের বর্ণনা করেন, 'তিনি ছিলেন সর্বকালের মুসলমানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।' দুর্বল ও দুঃস্থকে সাহায্য করতে সদাপ্রস্তুত এই শান্ত, পরোপকারী ও দয়ালু খলিফা তাঁর জীবন ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রিক বৈশিষ্টে হযরত উমর (রা.)-এর মত দৃঢ়তা থাকলে আরবদের মত একটি অবাধ্য জাতিকে তিনি আরও সফলভাবে শাসন করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর এই ক্ষমাপরায়ণতা ও উদারতাকে

---

১. অতঃপর 'খারিজী' বলে অভিহিত।

ভুল বোঝা হল এবং শত্রুরা তাঁর মানবিকতা ও সত্যপ্রিয়তাকে নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করল ।

হযরত আলী (রা.) কে লোহিতবর্ণের মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে; খুব দীর্ঘ না হলেও তাঁর গড়ন ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ, দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী, স্নিগ্ধ ও ধূসর চোখ বিশিষ্ট এবং অতীব মাধুর্যপূর্ণ ও অত্যন্ত দয়ালু। সাহসিকতার জন্য তিনি 'আল্লাহর সিংহ' এবং বিদ্যাবত্তার জন্য 'জ্ঞানের দরজা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। যেহেতু সময়ের পূর্বেই তিনি শাসনকর্তা হিসেবে কাজ করেছিলেন, তাই বীর এবং দয়ালু হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সহিষ্ণুতা দুর্বলতাই পরিণত হয়েছিল। হযরত উমর (রা.) প্রবর্তিত জনকল্যানমূলক কাজগুলোর অধিকাংশই হযরত আলী (রা.) এর পরামর্শে সম্পাদন করা হয়েছিল। দুর্বলকে রক্ষা করতে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে সদাপ্রস্তুত তাঁর নির্ভীকতার কীর্তি-কাহিনী এখনো কায়রোর বাজার থেকে দিল্লির বাজার পর্যন্ত সাগ্রহে বর্ণনা করা হয়। বর্মধারী এই বীর-পুরুষ মরুভূমিতে সিংহবেষ্টিত পথচারীকে কিভাবে উদ্ধার করতেন; তাঁর কাছে কিভাবে দস্যু কবলিত অসহায় স্ত্রীলোক তার আহত ও মুমূর্ষু স্বামীসহ মুক্তির জন্য আর্তনাদ করে কখনো ব্যর্থ হত না, 'আল্লাহর সিংহ' সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে কিভাবে রক্ষা করতেন সেসব কাহিনীতে আরব জাতির বীরত্বের পরিচয়ই বহন করে, আর তা তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষের মধ্যে এভাবেই রূপলাভ করেছিল। মুমূর্ষু অবস্থায়ও বারবার তিনি পুত্রদেরকে বদান্যতা, প্রেম, নম্রতা ও আত্মোৎসর্গের বিষয়ে উপদেশ দান করলেন। তাঁর ঘাতকের প্রতি কোন প্রকার নিষ্ঠুর আচরণ না করার স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন , আর তাকে কষ্ট না দিয়ে একটি মাত্র আঘাতে বধ করতে বললেন। তাঁর গুণাবলীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে মাস'উদী বর্ণনা করেন– 'প্রথম মুসলমান হওয়ার গৌরবজনক নাম, নির্বাসনে নবীর সাথী, জিহাদে তাঁর বিশ্বস্ত সহচর, জীবনে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং তাঁর আত্মীয়; শিক্ষার গূঢ়তত্ত্ব ও কিতাব (কোরআন) সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান; আত্মত্যাগ ও ন্যায়পরায়ণতা; সততা, পবিত্রতা ও সত্যবাদিতা; আইন ও বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠত্ব দাবির মানদন্ড হয়, তাহলে সকলেই হযরত আলী (রা.)-কে অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান বলে সম্মানিত করবেন। আল্লাহ তাঁকে যেসকল গুণাবলীতে গুনান্বিত করেছিলেন, তা তাঁর পূর্বসূরি (একজন ব্যতীত) বা উত্তরসূরিদের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া বৃথা।'

বিবি ফাতিহা (রা.)-এর গর্ভে হযরত আলী (রা.)-এর তিনটি পুত্র এবং চারটি কন্যা জন্মলাভ করেন। তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তেকালের পর বিবি ফাতিমা (রা.) মাত্র কয়েক মাস জীবিত ছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, হযরত আলী (রা.) ততদিন অন্য কোন বিয়ে করেননি, যদিও তা আরব প্রথায় অনুমোদিত ছিল। তাঁর যুগে তিনি একজন অসাধারণ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মার্জিত রুচিসম্পন্ন এবং গুণবতী রমণী ছিলেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথা, সঙ্গীত ও ধর্ম বিষয়ক ব্যাখ্যা, তাঁর চারিত্রিক গুনাবলী ও মানসিক উদারতারই পরিচয় বহন করে। গুণাবলীর জন্য তিনি মুসলমানদের কাছে 'আমাদের জ্যোতির্ময়ী নারী' উপাধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়া ও কৃশাঙ্গিনী এবং অত্যন্ত সুন্দরী, যে কারণে তাঁকে 'আজ-জাহরা' বা 'সৌন্দর্যময়ী' ও বলা হয়। হযরত আলী (রা.)-এর মৃত্যুর সাথে সাথেই ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে।

একজন দার্শনিক লেখক বর্ণনা করেছেন–'সরল ধর্মীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় শাসনতন্ত্র এভাবেই শেষ হয়ে গেল, যা আর কোন মুসলমান জাতির মধ্যেই কখনো দেখা যায়নি; নির্বাচনমূলক সরকারের পতনের পর শুধুমাত্র আইন-কানুন ও কোরআনের শাসননীতিটুকুই বিদ্যমান থাকলো। তবুও প্রজাতান্ত্রিক আবেগে কিছু ক্ষুদ্র রাজ্যকে কিছু আড়ম্বরতা এবং বৃহৎ রাজ্যগুলোকে অধিক ক্ষমতা দান করা হল। শাসন ক্ষমতা দখলকারীদের সেন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও সেগুলো জাতীয় জীবনে বহাল থাকলো।[১]

১. ওয়েলসনার প্রণীত Des Effets de la Religion de Mahomet.

অধ্যায়-৬

পশ্চাৎপট : সরকার : শাসন প্রণালী : প্রশাসন : সেনাবাহিনী : সামাজিক জীবন

পশ্চাৎপট

রসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.) অতিবাহিত মদিনায় জীবনের দশ বছরে যুদ্ধবাজ উপজাতি ও গোত্রগুলো প্রভাবিত হয় এক মহান ভাবধারায় এবং দ্রুত একটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে কাজ সম্পাদন করেন তা ইতিহাসে লেখা অতি বিস্ময়কর কীর্তিগুলোর অন্যতম হিসেবে সবসময় বিদ্যমান থাকবে।

এভাবে বশীভূত গোত্রগুলো হযরত আবুবকর (রা.)-এর শাসনআমলে আগের অবস্থায় ফিরে আসার প্রবল চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এরপর আমরা যা দেখতে পাই, তা শুধুমাত্র নীলনদের বন্যার সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। প্রথমে অনেক দুঃখ ও ক্ষয়ক্ষতি ঘটা সত্ত্বেও যেখানে দিয়ে বন্যা বয়ে যায় সেখানকার মাটি উর্বর হয়ে ওঠে। মূলত প্রতিবেশী জাতিগুলোর শত্রুতায় প্ররোচিত হয়ে আরবদের অগ্রগতি দেশ ও জনসাধারণের ওপর এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তিরিশ বছরের স্থায়ী প্রজাতন্ত্র আরবদের মাঝে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন নিয়ে আসে। সেখানকার সমাজ তখনো প্রাচীনপন্থী ছিল, কিন্তু যেসব আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলোর ফলে প্রথমে উন্নতি ও পরে অবনতি হতে শুরু করে, সেসব বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছিল। প্রধান প্রধান নগরীগুলো সুরম্য হর্ম্যরাজিতে সুসজ্জিত হয়ে উঠছিল এবং মানুষের জীবন বিলাসবহুল হয়ে উঠছিল। উপদ্বীপে প্রচলিত আশ্রয় প্রথা বিজিত দেশগুলোতেও প্রবর্তন করা হয়; পারসী, তুর্কী ও গ্রিকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তারা হয়ে উঠত কিছু আরব পরিবার বা গোত্রের আশ্রিত বা 'মাওলা'[১], এভাবে শেষোক্তদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটত এবং নিজেরাও মর্যাদা লাভ করত । যদিও সকল আরববাসীই ছিল একই ধর্মীয় ভাবধারায় কেন্দ্রীভূত, তবুও কখনোই তাদের সংহতি পরিপূর্ণ হতে পারেনি। আর এ কারণেই প্রজাতন্ত্রের অবসানে আমরা মুসলিম সাম্রাজ্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত হতে দেখি, ঠিক যেমন মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.)-এর আগে ছিল মক্কার অবস্থা–এক দল ছিল তাঁর বংশের (বনু হাশিম) অনুগত, আর অন্য দল ছিল তাঁদের চির শত্রু উমাইয়াদের বশীভূত। যদিও আল-আসের পুত্র আমরের বিশ্বাসঘাতকতায় ইসলামের অবর্ণনীয় ক্ষতি হয় এবং পরিণামে হিময়ার ও মুদার বংশের মধ্যে ঘোর বিরোধিতার সৃষ্টি হয়, তবুও তখনো পর্যন্ত ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি হয় নি, এমনকি প্রধানত খারিজীরাই (ইসলামের সাথে চুক্তিবদ্ধ) আনুগত্যের প্রশ্নে ভিন্নমত পোষণ করত, হযরত উমর (রা.)-এর পর অন্য কোন খলিফাকেই তারা স্বীকার করত না।

---

১. ইউরোপীয় লেখকগণ সাধারণভাবে সকল 'মাওলা'-কে 'মুক্ত দাস' মনে করে ভুল করেছেন। আরবদের মধ্যে দু'ধরনের দাস ছিল–(১) মুক্ত দাস এবং (২) সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ (ওয়ালা-উল-মাওয়ালাত' বলে অভিহিত)। কিছু মাওলা নিঃসন্দেহে মুক্তিপ্রাপ্ত, কিন্তু অধিকাংশই ছিল মৈত্রীবদ্ধ।

সরকার

খলিফাই সরকারের সর্বময় কর্তা ছিলেন, যাঁকে রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রবীণ সহচরদের নিয়ে গঠিত একটি অভিজ্ঞ মন্ত্রী পরিষদ সর্বদা সাহায্য করত; আর প্রায়শই যার অধিবেশন বসত মদিনার প্রধান মসজিদে নগরীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও সমবেত বেদুঈন প্রধানদের সাহায্য নিয়ে। রসূলুল্লাহ (স.)-এর বিভিন্ন সহচরকে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হত। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত আবুবকর (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত উমর (রা.)-এর উপর বিচার ও জাকাত বন্টনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বিদ্বান হিসেবে হযরত আলী (রা.)-কে দায়িত্ব দেয়া হয় যোগাযোগ ব্যবস্থার, যুদ্ধবন্দীদের তত্ত্বাবধান, তাদের চিকিৎসা এবং মুক্তিপণের ব্যাপারে। অন্য আর একজন সহচর সৈন্যবাহিনীর সাজ-সরঞ্জামের দেখাশুনা করতেন। প্রশাসনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় এভাবে লক্ষ করা হত, কিন্তু আলোচনা ছাড়া কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হত না।

শাসন-পদ্ধতি

তিরিশ বছর স্থায়ী এই প্রজাতন্ত্রের শাসন প্রণালী মূলত হযরত উমর (রা.)-এর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যু-পরবর্তীকালে বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছিল। তাঁর শাসন নীতির মূল লক্ষ্য ছিল আরব দেশকে সুগঠিত করা এবং আরব গোত্রগুলোকে একটি জাতি হিসেবে গড়ে তোলা। তিনি পরিস্থিতির চাপে পড়ে বিদেশী রাজ্যজয়ের ব্যাপারে সংযত হয়েছিলেন , তাঁর উদ্বিগ্ন দৃষ্টি ছিল, আরবরা যেন বিদেশী উপনিবেশে তাদের জাতীয়তাবোধ না হারিয়ে ফেলে কিংবা অন্য দেশের জনগোষ্ঠীর সাথে নিজেরা মিশে না যায়। যদি হযরত উমর (রা.) আরও দীর্ঘ সময় জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তায় আরবদের আরও সমভাবাপন্ন করে তুলতে সমর্থ হতেন এবং এভাবে সর্বনাশা গৃহযুদ্ধও প্রতিরোধ করতে পারতেন, যা ইসলামের অধঃপতনের মূল কারণ হিসেবে ধরা হয়।[১]

তাঁর শাসন নীতির বিভিন্ন দিক বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, আরব থেকে সকল প্রকার শত্রু বা বিদেশী প্রবৃত্তির অপসারণ করে এটাকে একান্তভাবেই আরবদের জন্য সংরক্ষিত করা[২]; দ্বিতীয়ত, প্রজাতন্ত্রের মাত্রাতিরিক্তি প্রসার পরিহার করা।

পরবর্তী শাসনকর্তাদের মধ্যে যে দূরদর্শিতার অভাব ছিল, সেই দূরদর্শিতার সাহায্যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও তার বস্তুগত উন্নয়ন নির্ভর করে মূলত কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতির ওপর। সে উদ্দেশ্যকে সফল করতে তিনি বিজিত দেশগুলোতে ইজারা নেয়া ও কৃষিযোগ্য জমি বিক্রি করা নিষিদ্ধ করেন।[৩] আরবদের দখলদারি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্বরূপ তিনি এই নির্দেশ দেন যে,

---

১. একজন ইউরোপীয় লেখক এসব গৃহযুদ্ধ এবং তিক্ত গোত্র-বিবাদকে ইউরোপের পক্ষে মঙ্গলজনক বলে উল্লেখ করেন।

২. একই ধরনের শাসননীতি জারদের রাশিয়াতে প্রচলিত ছিল।

৩. হীরা জেলায় আগে থেকেই অবাধ বিক্রয় প্রথা চালু থাকায় সে অঞ্চলকে এই আইন থেকে ছাড় দেয়া হয়েছিল।

আরবের কোন ব্যক্তি সেখানকার অধিবাসীদের জমি দখল করতে পারবে না। এতে কৃষক সম্প্রদায় ও ভূস্বামীরা উভয়ই উচ্ছেদের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। এসকল আইন প্রণয়নের সময় তিনি সম্ভবত এই বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, আরবরা যেসব জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বসতি স্থাপন করেছিল, সেখানে তারা যেন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য বজায় রাখতে পারে। আর এ ধরণের দৃষ্টান্ত প্রাচীন বা আধুনিক সকল ইতিহাসেই দেখা যায়। কিন্তু তিনি আরবদের যে প্রাধান্য ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছিলেন তা পক্ষপাতমূলক ছিল না; এমনকি তা বর্ণ, বংশ ও জাতিগত সাম্যের অন্তরায় হিসেবেও বিবেচিত হত না। হযরত উমর (রা.)-এর আমলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ বা আশ্রিত প্রথা দ্বারা কোন অনারব (যে আরব জাতিভুক্ত নয়) আরব গোত্রভুক্ত হলে তাকে একজন জন্মগত আরবের সমানই মর্যাদা প্রদান করা হত; আর পরবর্তী সকল শাসনকর্তাদের আমলেও এই নীতি প্রচলিত ছিল। এভাবে বহু পারসী পরিবার তাদের ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন না করেই বিভিন্ন আরব পরিবারের 'মাওলা' শ্রেণীভুক্ত হয়ে ওঠে। একইভাবে সিরিয়া ও মিশরের বহু খ্রিস্টান গোত্র এবং আফ্রিকার বর্বর জাতির লোকেরাও আরব গোত্রগুলোতে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ লাভ করে। অবশ্যই প্রধান ধর্মবিশ্বাসের (ইসলাম) সাথে সংশ্লিষ্ট নানা রকম সুযোগ-সুবিধাগুলো বাস্তব ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ ও সম্প্রদায়ের মধ্যেও সর্বদাই বিদ্যমান ছিল, যা দ্রুত প্রভাব বিস্তার করেছিল তাদের পুরাতন ধর্মবিশ্বাসকে ত্যাগ করাতে। সমাজতন্ত্রের সক্রিয় আভাসযুক্ত গণতন্ত্রের প্রতিই ছিল ইসলামী শাসননীতির মূল প্রবণতা। আল্লাহর চোখে ধনী ও গরীব সব মানুষই সমান এবং তাদেরকে সকল অরাজকতা থেকে মুক্ত করতে শাসনকর্তারা আল্লাহর প্রতিনিধি মাত্র। রাষ্ট্রের রাজস্ব খলিফার উপকার বা তাঁর সমৃদ্ধি সাধনের জন্য নয় বরং তা জনগনের সাহায্য করার জন্য। গরীবদের সাহায্যের জন্য ধনীদের যাকাত প্রদানের আদেশ প্রদান করা হয়েছিল এবং বদান্যতা বাস্তবায়িত হয়েছিল আইনের মাধ্যমে। ফলে প্রজাতন্ত্রের শুরুর দিকে কোষাগারের জন্য কোন প্রহরী বা হিসাবরক্ষণের প্রয়োজন হত না। যাকাত যেমন পাওয়া যেত তেমনই দরিদ্রদের মধ্যে তা সরাসরি বিতরণ করা হত কিংবা তা ব্যয় করা হত দেশরক্ষাকারী সৈন্যদের সাজ-সরঞ্জামের জন্য। যুদ্ধলব্ধ জিনিসপত্রও একই নিয়মে বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রী, পুরুষ, দাস ও স্বাধীন নির্বিশেষে সকলের মাঝে সমান অংশে বিতরণ করা হত। পরবর্তীকালে বাস্তবক্ষেত্রে এই বিতরণ ব্যবস্থা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়লে তা পরিণত হয় নির্দিষ্ট বৃত্তিতে। রাজস্ব হতে গোটা জাতিই মাত্রানুযায়ী বৃত্তি লাভের অধিকারী হত এবং এই সুবিধা শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং আনুগত্য বা বিশ্বস্ত কাজের জন্য সুনাম অর্জন করলে জিম্মী (অমুসলমান প্রজা) ব্যক্তিরাও একই ধরনের সুবিধা ভোগ করত। খলিফাদের সাংসারিক খরচের জন্য কোন নির্দিষ্ট বেতন তালিকা বা কোন অসাধারণ ভাতা প্রদান করা হত না। ভূ-সম্পত্তির অধিকতর বিভাজন রসূলুল্লাহ (স.) বা তাঁর প্রধান প্রতিনিধি হযরত উমর (রা.) পছন্দ করতেন না, কারণ এর পরিণাম স্বরূপ পরিবারগুলো নিঃস্ব হয়ে পড়ত। এই পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য মদিনাবাসীদের জমির অধিকতর বিভাজন ও ওয়াকফের মাধ্যমে হস্তান্তর বন্ধ করা হয় এবং এই একই উদ্দেশ্যে বিজিত দেশের খাস জমিগুলো

সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন না করে রাষ্ট্রের অধিকারে আনা হয়; খরচপত্র মিটিয়ে বাকি আয়টুকু বিতরণ করা হত সংশ্লিষ্ট লোকজনের মধ্যে।

দুর্ভাগ্যবশত হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনআমলে তাঁর এই মহান পূর্বসূরির প্রধান প্রধান নীতিগুলো সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়। হযরত উমর (রা.) কর্তৃক নিয়োগকৃত যোগ্য ও দক্ষ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের তিনি শুধু অপসারণই করেননি বরং আত্মীয়-স্বজনদের অনঢ় দাবির মুখে তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নতুন করে পদগুলো বণ্টন করেন। রাষ্ট্রীয় সম্পদ, প্রকৃতপক্ষে যা জনগনের সম্পত্তি, কুমন্ত্রচালিত খলিফা সেগুলো তাঁর আত্মীয়-স্বজনদেরকে প্রদান করেন। আর এভাবেই মু'আবিয়া দখল করে নেন সিরিয়ার সমস্ত এবং মেসোপটেমিয়ার কোন কোন অংশের জমি। যে সাওয়াদ অঞ্চল হযরত উমর (রা.) রাষ্ট্রের জন্য পবিত্রভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন, তা অন্য এক আত্মীয়কে দেয়া হয়। রাষ্ট্রীয় কোষাগার, যা হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর আমলে ছিল জনগণের সংরক্ষিত তহবিল, তা এসকল অপদার্থ অনুগ্রহভাজনদের জন্য বারবার শূন্য হতে থাকে, আর প্রদেশের সম্পদে উমাইয়ারা ঐশ্বর্যশালী হতে থাকে, যা তাদেরকে ক্ষমতার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতেও সাহায্য করেছিল। হযরত উসমান (রা.) অমুসলিমদের জন্য প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো প্রত্যাহার করে নেন এবং তাঁর পূর্বসূরিদের নীতির বিরোধিতা করে সরাসরি বিভিন্ন প্রকার কঠোর আইন প্রণয়ন করেন। তিনি জমি বিক্রির অনুমোদন প্রদান করেন এবং সর্বপ্রথম সামরিক জায়গীর প্রথাও প্রবর্তন করেন। হযরত আলী (রা.)-এর শাসনকালের বেশিরভাগ সময়ই গৃহযুদ্ধে কেটে যাওয়ায় তাঁর পূর্ববর্তী প্রশাসনের ক্ষতিকর দিকগুলোর প্রতিকার করা সম্ভব হননি, তবুও তিনি পদচ্যুত করেছিলেন বেশিরভাগ দুর্নীতিপরায়ণ শাসনকর্তাকেই এবং হযরত উমর (রা.)-এর শাসন নীতিকে পুনঃ প্রবর্তন করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন; খিলাফতের দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ ও নিরাপদ তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি একটি রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানাও প্রতিষ্ঠা করেন, 'হাজিব' বা কঞ্চুকী এবং 'সাহিব-উস-সুরতা' বা রক্ষীবাহিনীর প্রধান পদ প্রবর্তন করেন; পুলিশ বিভাগ পুনর্গঠন করা হয় এবং তাদের দায়িত্বও নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

প্রশাসন

মক্কার পতন এবং তার ফলে উপদ্বীপে শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠার পর রসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.) সমস্ত প্রধান নগরী ও প্রদেশগুলোতে 'আমীর' আখ্যাধারী শাসনকর্তা নিয়োগ দান করেন। হযরত উমর (রা.), যাকে ইসলামের রাজনৈতিক প্রশাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা প্রদান করা যেতে পারে, তিনিও এই পদবী বহাল রাখেন। তিনি বিজিত দেশগুলোকে সুনিয়ন্ত্রিত সরকারের অধীন করেন, এতে তাঁর সহকারীরা ভারপ্রাপ্ত দেশের সম্পদ উন্নয়নে সমর্থ হন। এভাবেই আহওয়াজ ও বাহরাইন গঠিত হয় একটি প্রদেশ রূপে; অন্য আর একটি প্রদেশ গঠিত হয় সিজিস্তান, মাকরান ও কারমানকে নিয়ে; পক্ষান্তরে তাবারিস্তান ও খোরাসান থাকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হিসেবে। দক্ষিণ পারস্যকে তিনজন শাসনকর্তার অধীনে প্রদান করা হয়, অন্যদিকে ইরাক থাকে দুজন

শাসনকর্তার অধীনে, তাদের একজনকে কুফায় নিয়োগ প্রদান করা হয়, আর অন্যজকে নিয়োগ দেয়া হয় বসরাতে। সিরিয়াতেও একই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সেখানকার উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর শাসনকর্তাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল হিমস্ শহরে, পক্ষান্তরে দক্ষিণাংশের 'ওয়ালি' (শাসনকর্তা) বাস করতেন দামাস্কাসে। প্যালেস্টাইন ছিল আরেকজন শাসনকর্তার অধীনে। আফ্রিকায় সরকার ছিল তিনটি প্রদেশে বিভক্ত; যার একটি আপার (উত্তর) মিশর, অন্যটি খাস মিশর এবং তৃতীয়টি লিবিয়া মরুভূমির সন্নিহিত অঞ্চলে। আরব ছিল পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত। ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোর শাসনকর্তাদেরকে 'ওয়ালি' বা না'য়িব[১] (সহকারী) বলা হত। প্রায় সকল স্থানেই শাসনকর্তারাই তাঁদের পদাধিকার বলে সাধারণ বা জুমার নামাজে ইমামতি করতেন এবং শুক্রবারের বক্তৃতা (খুতবা) প্রদান করতেন, যা প্রায়শই রাজনৈতিক ইশতেহার হয়ে উঠত। শুধুমাত্র সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য পরিচালনা এবং নামাজে ইমামতি করার জন্য হযরত উমর (রা.) প্যালেস্টাইন, দামাস্কাস, হিমস ও কিন্নিসরিনে বিশেষ বিচারকমণ্ডলী নিয়োগ করেন। রাজস্ব আদায় ও বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি 'দীওয়ান' নামে একটি অর্থ বিভাগও গড়ে তোলেন। প্রত্যেক প্রদেশে সংগৃহীত রাজস্বের প্রথম ব্যয় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অসামরিক প্রশাসন-সংক্রান্ত খরচাদি পরিচালনা করা, পরবর্তী ব্যয় ছিল সামরিক প্রয়োজন-সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং উদ্বৃত্ত অংশ জাতীয় কল্যাণে ব্যয় করা হত। তাতে আরব জাতির সকল ব্যক্তি এবং তাদের 'মাওলা'দের যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট অংশ ছিল। আরব, অনারব (যারা আরব জাতিভুক্ত নয়), স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু সকল ব্যক্তির নামের তালিকা সংরক্ষণ করা হত 'দীওয়ানে'। অন্যদিকে শাসনকর্তা ছিলেন প্রদেশের সামরিক ও অসামরিক বিভাগের প্রধান; রাজস্ব ও প্রশাসন-সংক্রান্ত কাজকর্ম মূলত অধীনস্থ কর্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন হত। আর তাদের নিয়োগ করা হত বিশেষত নির্দিষ্ট কাজের জন্যই। অধিকৃত দেশসমূহের প্রশাসনে কৃষক সম্প্রদায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হত। আর এ উদ্দেশ্যে মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও দক্ষিণ পারস্যে সমস্ত জমি জরিপ করা হয় এবং তাতে সমানুপাতিক হারে রাজস্বও ধার্য করা হয়। জরীপ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে এই চমকপ্রদ দলিল একটি উপযুক্ত তালিকা হিসেবে বিবেচনা করা হত; জমির আয়তন ছাড়াও মাটির গুণাগুণ, উৎপাদনের ধরন এবং জমির স্বত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো যাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা থাকত। ব্যাবিলনে খনন করা হয় জালের মত অনেকগুলো খাল এবং খসরুদের দ্বারা নিদারুণভাবে অবহেলিত[২] টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর বাঁধগুলো বিশেষ কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে অর্পণ করা হয়। হযরত উমর (রা.) খাদ্যশস্যের কর হ্রাস করেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উৎসাহিত করেন। মিশর ও আরবের মধ্যে সরাসরি সুগম যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি নীলনদ ও লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী পুরনো অব্যবহৃত খাল পুনরায় খনন করেন। আরবরা এর নাম দেয় 'আমিরুল মুমেনীনের খাল'। আর এক বছরের কম সময়ে এই

---

১. 'নওয়াব' বা 'নবাব' শব্দটির উদ্ভব 'না'য়িব' থেকে।

২. একই কথা পরবর্তী কয়েকজন শাসনকর্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কাজ সম্পূর্ণ হয়। নীলনদ দিয়ে আগত মিশরের পণ্যবাহী নৌকাগুলো ইয়াম্বু ও জেদ্দা বন্দরে পৌঁছলে মক্কা ও মদিনার বাজারে শস্যমূল্য হ্রাস পেত এবং সেগুলোর তুলনায় দেশীয় পণ্যের দাম অধিক বলে মনে হত না।

বিচার ব্যবস্থা

সাধারণত অসামরিক বিচারপতিদের দ্বারা বিচারকার্য পরিচালিত হত, তাঁদেরকে খলিফা নিয়োগ প্রদান করতেন এবং তাঁরা শাসনকর্তাদের অধীনস্থ ছিলেন না। ইসলামে হযরত উমর (রা.)-ই হলেন প্রথম শাসনকর্তা, যিনি বিচারপতিদের বেতন নির্দিষ্ট করে দেন এবং শাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের থেকে তাঁদের পদকে পৃথক করেন।[১] কাজীদের[২] (বিচারপতিগণ) জন্য সংরক্ষিত ছিল 'হাকিম' (অর্থাৎ শাসনকর্তা) উপাধি। ভন হ্যামার বর্ণনা করেন যে, 'তখন বিচারপতিকে বলা হত এবং এখনো বলা হয় 'হাকিম-উস-শরআ', অর্থাৎ আইনের আজ্ঞাবাহী শাসক, কারণ আইন ন্যায়-বিচারের মাধ্যমে শাসন করে এবং এর আদেশেই শাসনকর্তার ক্ষমতা প্রযোজ্য হয়। এভাবে শৈশব থেকেই ইসলামী শাসন নীতি তার কথায় ও কাজে প্রশাসন ও বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণের ঘোষণা প্রদান করেছে।' বিচারকার্য সম্পূর্ণভাবে সমদর্শী ছিল এবং খলিফাগণ নিজেরাই আইনগতভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতির আদেশ মান্য করে সমতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। শুরুতে জনসাধারণই সাধারণত পুলিশের দায়িত্ব পালন করত। হযরত উমর (রা.) নৈশ প্রহরা ও চৌকি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর আমলের আগে নিয়ম মাফিক সংগঠিত পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তিনি 'সুরতা' নামে পৌররক্ষী বাহিনী গঠন করেন, এই বাহিনীর প্রধান 'সাহিবুশ-সুরতা' নামে অভিহিত হত।[৩] হযরত উমর (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর পরামর্শে হিজরী সাল প্রবর্তন করেন এবং সাম্রাজ্যের প্রতিটি অংশে বৃত্তিপ্রদত্ত বিদ্যালয় ও মসজিদ স্থাপন করেন।

সাধাণতন্ত্রের রাজস্ব সংগ্রহ করা হত তিনটি উৎস থেকে : (১) যাকাত প্রদানে সামর্থ্যবান সকল মুসলমান কর্তৃক মাত্রানুযায়ী প্রদেয় যাকাত বা দারিদ্র্য কর; যা রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা কর সংগ্রহে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন এবং অভাবগ্রস্ত মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য ব্যয় করা হত। (২) 'খারাজ' (ল্যাটিন : Tributum Soli) নামে অভিহিত জিম্মীদের (অমুসলমান প্রজা) কাছ থেকে আদায়কৃত ভূমি-রাজস্ব; এবং (৩) 'জাজিয়া' (লাতিন : Tributum Capitis) বা আদায়কৃত মাথাপিছু কর। এই দুই ধরনের করই একই নামে রোমক সাম্রাজ্যেও প্রচলিত ছিল এবং এটি অবিসম্বাদিত সত্য যে, সাসানীয়দের রাজত্বকালে পারস্য সাম্রাজ্যেও মাথাপিছু কর সামগ্রিকভাবে বাধ্যতামূলক ছিল। ফলে মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও পারস্যে এই করগুলো আরবের ক্ষেত্রে মুসলমানরা

---

১. সাবিতের পুত্র জায়িদ ছিলেন মদিনার প্রথম বেতনভোগী বিচারক।
২. ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দায়িত্ব পর্যবেক্ষণকারী।
৩. সুয়ূতি বলেছেন, হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমলে সুরতা গঠিত হয়েছিল; কিন্তু ইবনে খালদুন ও ভন হ্যামার দ্রষ্টব্য।

পুরনো দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেছিলেন। এ দুই ধরনের করই সহজ ও সমতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হত। কিন্তু এগুলোর দায় থেকে কিছু বিশেষ বিশেষ নগর, প্রদেশ ও গোত্রকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল, এমনকি যেখানে কর প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল, সেখানেও এমনভাবে কর আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তা দিতে আদৌ কষ্ট না হয়। 'আহলে কিতাব' হিসেবে অভিহিত ইহুদী, খ্রিস্টান, সামারিটান ও ম্যাগিয়ানরাও সুবিচার ও মানবিক ব্যবহার লাভ করত।

সৈন্য বিভাগ

সেনাবাহিনী গঠিত হত গোত্রীয় পুরুষদের নিয়ে এবং প্রধানত মদিনা, তায়েফ ও অন্যান্য নগরী থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হত। প্রথমে তাদের বেতন দেয়া হত যাকাত হতে; কিন্তু পরবর্তীকালে তা প্রদান করা হত যাকাত ও অন্যান্য কর থেকে। প্রথমে খলিফা শুধু সেনাবাহিনীর প্রধানকে নিয়োগ প্রদান করতেন, আর অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব সেনাপ্রধানের ওপরই প্রদান করা হত। যেহেতু সেনাপ্রধান খলিফার প্রতিনিধিত্ব করতেন, সেহেতু দৈনন্দিন নামাজে তিনিই ইমামতি করতেন। যেখানে অনেকগুলো সেনাবাহিনী একত্রিত হত সেখানে কোন সেনাপতি নামাজে ইমামতি করবেন তা সব সময়ই স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হত, আর এভাবেই তিনি অভিষিক্ত হতেন সর্বাধ্যক্ষের পদে। শাসনকালের শেষদিকে হযরত উমর (রা.) অধস্তন কর্মচারীও মনোনীত করতে থাকেন, যেমন আ'রিফ[১] ও অন্যান্য। শৃঙ্খলাভঙ্গ ও যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষতার জন্য 'পিলোরী' (শাস্তিদানের জন্য কাঠের যন্ত্রবিশেষ, যাতে দণ্ডিত ব্যক্তির হাত ও পা আটকানোর জন্য ছিদ্র থাকত) যন্ত্রের সাহায্যে শাস্তি প্রদান করা হত এবং অপরাধীর মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ ছিন্ন করা হত। সেসময় এসকল শাস্তি এতটাই মানহানিকর ছিল যে, তাতে সম্পূর্ণভাবেই অভীষ্ট ফল পাওয়া যেত। সৈন্যদলে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী থাকত; পূর্বোক্তরা ঢাল, তলোয়ার ও লম্বা বর্শা দ্বারা সমর সাজে সজ্জিত হত এবং শেষোক্তরা ঢাল, বর্শা ও তরবারি কিংবা ঢাল, ধনুক ও তীর দ্বারা সজ্জিত হত। পদাতিকদের মধ্যে তীরন্দাজরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হত। পদাতিক বাহিনীকে সাধারণত তিনটি সারিতে দাঁড় করিয়ে সাজানো হত, যার সামনের দিকে অশ্বারোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে বর্শাধারীরা থাকত এবং পিছনে থাকত তীরন্দাজরা। সাধারণত দু'পাশেই অশ্বারোহী বাহিনী থাকত। যুদ্ধ আরম্ভ হত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবং তা ছিল একক লড়াই। ক্ষিপ্রগতি, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা ছিল আরব সৈন্যদের বিরাট শ্রেষ্ঠত্বের মূল উপকরণ। আর এই উদ্যমী গুণগুলোই তাদেরকে অজেয় করে তুলেছিল। তারা সব সময়ই যথেষ্ট রসদ প্রাপ্ত ছিল, আর তারা উটের পিঠে চড়ে দূরপাল্লার অভিযান করত। শুরুর দিকে শিবির স্থাপনের জন্য সৈন্যরা খেজুর পাতার কুঁড়েঘর তৈরি করত; কিন্তু পরবর্তীকালে হযরত উমর (রা.) স্থায়ী শিবির বা সেনানিবাস স্থাপনের নির্দেশ দেন; এবং এভাবেই ইরাকের বসরা ও কুফা, মিশরের ফুসতাত, আফ্রিকার কাইরোয়ান, সিন্ধুর মনসুরা

---

১. রোমকদের 'ডেকুরিয়ন' পদের সমতুল।

প্রভৃতিতে সেনানিবাসের পত্তন হয়। অন্যান্য স্থানে যেমন—হিমস, গাজা, এডেসা, ইস্পাহান ও আলেকজান্দ্রিয়ায় আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করতে বিরাট সৈন্যবাহিনী রাখা হত। অশ্বারোহী সৈন্যরা লৌহবর্মসহ ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ পরিধান করত, অধিকাংশ সময়ই তা সজ্জিত হত ঈগলের পালক দ্বারা। পদাতিক সৈন্যরা পরিধান করত পা হতে মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত এক ধরনের আঁটোসাঁটো জামা, সালওয়ার (পাজামা) এবং অদ্যাপি আফগান ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে প্রচলিত বুট বা জুতো। স্কটল্যান্ডের কোভেনেপন্টার বা ত্রিশ বছর ধরে যুদ্ধরত প্রোটেস্টান্টদের মত তারা কোরআনের আয়াত আবৃত্তি করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হত এবং উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লাহু আকবার'[১] অর্থাৎ 'আল্লাহ শ্রেষ্ঠ' ধ্বনি দিয়ে শত্রুদেরকে আক্রমণ করত। সে সময় প্রচলন ছিল দামামা ও নাকাড়ার। গোত্রীয় সৈনিকরা প্রায়শই সপরিবারে আসত; তাদেরকে দুর্গ নগরী ও সেনানিবাসে বিশেষ কোয়ার্টার প্রদান করা হত। অশোভন আচরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল এবং মদ্যপানের শাস্তি ছিল চাবুকের আশিটি ঘা। যেসব সৈন্য পরিবারবর্গ ছেড়ে বিদেশে কর্মরত থাকত, তাদেরকে একটানা চার মাসের অধিক কাজ করতে হত না। খলিফা হযরত উমর (রা.) সৈন্যবাহিনীর তালিকার প্রথারও প্রচলন করেন, প্রতিষ্ঠা করেন সীমান্ত দুর্গ এবং অভিযানের সেনাপতি নিযুক্ত করেন।

সামাজিক জীবন

স্থাপত্যকলার কোন পদ্ধতিই প্রথম দিকে প্রচলিত ছিল না। স্থাপত্যের ভণিতায় মক্কাতে কা'বার মত কিছু অট্টালিকা ছিল মাত্র এবং ধনী নগরবাসীদের বাড়িগুলো হয় প্রস্তর নইলে ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। মদিনার বাড়িগুলোর বেশিরভাগই শেষোক্ত উপাদানেই তৈরি হয়েছিল, এমনকি মাটির প্রলেপ দেয়া প্রধান মসজিদের অনাড়ম্বর গাঁথুনিও রোদে শুকানো ইট দিয়ে তৈরি হয়েছিল। কেন্দ্রে উঠোন ও কূপ সংযুক্ত অধিকাংশ বাড়িই ছিল একতলা। কিন্তু দ্বিতীয় খলিফার শাসন আমলের শেষভাগে বিদেশী স্থাপত্যের প্রভাবে ইসলামের রাজধানীতে স্থাপত্যকলার উৎকর্ষ সাধিত হয়। মক্কা ও মদিনা উভয় স্থানের সকল প্রধান ব্যক্তিরাই পাথর ও মার্বেলের তৈরি বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করেন। হযরত উসমান (রা.)-এর জন্য নির্মিত প্রাসাদটি সব থেকে প্রকাণ্ড, সুদৃশ্য ও আকর্ষণীয় বলে মনে করা হত। প্রধান মসজিদটিও ভেঙে ফেলা হয় এবং সে জায়গায় গড়ে তোলা হয় পাথর ও মার্বেলের তৈরি একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা। মাস'উদী বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে রসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সহচরগণ নিজেদের জন্য চমকপ্রদ অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। ৩৫২ হিজরীতে মাস'উদী যখন লিখেছিলেন তখন পর্যন্ত আওয়ামের পুত্র জুবাইর যে বাড়িটি নির্মান করেন তা বিদ্যমান ছিল এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে সেটি বণিক ও ব্যাংকাররা ব্যবহার করতেন। জুবাইর কুফা, ফুসতাত ও আলেকজান্দ্রিয়াতেও বহু অট্টালিকা নির্মাণ করেন এবং এই বাড়িগুলো বাগানসহ মাস'উদীর সময়ও যথাযথ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। এগুলো এবং জাঁকজমকের

১. একে বলে তকবীর।

আরও অনেক নিদর্শন উল্লেখ করে ঐতিহাসিক দীর্ঘশ্বাস সহকারে মন্তব্য করেন, 'হযরত উমর (রা.)-এর মহান দিনগুলোর সরল ও অনাড়ম্বর আদব-কায়দা ও জীবনযাত্রা থেকে এসব কতই না ভিন্ন!' মক্কা যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়, মদিনাবাসীরা তখন উন্নতির জন্য তাদের জমি-সম্পত্তির ওপর নির্ভর করত। এই ঘটনার তিক্ততায় দুই নগরীর মধ্যে দীর্ঘকালীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। এ যেন এথেন্স ও স্পার্টার প্রাচীন কাহিনী। মক্কাবাসীরা জুয়া, মদ ও বিলাসিতায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। আর মদিনাবাসীরা বিশেষত ইসলামী শাসন ও তাদের নেতাদের নজির অনুযায়ী, আদবকায়দায় ছিল একান্ত অনাড়ম্বর এবং জীবনযাত্রাতেও খাঁটি ধর্মপরায়ণ ছিল। মক্কার পতনের পর সেখানকার বিলাসপ্রিয় ও চপলমতি অধিবাসীরা ইসলাম আরোপিত নৈতিক অনুশাসন মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং প্রথম দুই খলিফার সময় পর্যন্ত তা বিদ্যমান ছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর খলিফা হওয়ার সাথে সাথে অভিজাত যুবকরা, প্রধানত যারা উমাইয়া বংশভুক্ত, তারা আবার সেই পুরনো সাড়ম্বর ও বেপরোয়া জীবনযাপন শুরু করে। তাঁর নিজের ভাই এর ছেলেই একটি জুয়ার আড্ডা চালু করেন; মহিলাদের সঙ্গীতরজনী আবার একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়। মক্কার এই অশালীনতা উমাইয়াদের আমলে দামাসকাসে আরও জঘন্যভাবে প্রতিফলিত হয়। মদিনার জনগণ তাদের জীবনকে অধিকতর গুরুত্বের সাথেই গ্রহণ করেছিল। সেখানকার বক্তৃতা-কক্ষগুলো উৎসাহী ছাত্রে ভরে উঠত এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই খলিফার ধর্মোপদেশ শুনতে যেত। তখনো সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, সারা দিনের পরিশ্রমের পর গান গাওয়া এবং বাঁশি ও গীটার বাজানো ছিল লোকজনের চিত্তবিনোদনের প্রধান উপকরণ। উত্তর শহরের মহিলারা সুগায়িকা ছিল এবং ভাষ্যকারদের মতে, কঠোর প্রকৃতির হযরত উমর (রা.) পর্যন্ত টহলদারির সময় প্রায়শই তাদের গান শুনে দাঁড়িয়ে পড়তেন।

ধনী লোকদের বাড়িগুলোর মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকা থাকত। কার্পেটের ওপর এবং ঘরের চারদিকে পশমের কম্বল বিছানো থাকত যদিও সেখানে কোন প্রকার চেয়ার বা টেবিল থাকত না, গৃহকর্তা এবং তাঁর অতিথিরাও বসতেন সেগুলোর উপরই। অ্যাংলো-স্যাকসন ও নরমানদের প্রাথমিক যুগের ইংল্যান্ডের মত মহিলা মহল আলাদা ছিল এবং সুসজ্জিত থাকত একইভাবে। খাবার দেয়া হত দস্তরখানা পেতে, যা কম্বলের সামনের দিকে একটি চামড়ার চাদরের ওপর বিছানো হত। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের মত হাত ধোওয়া হত খাওয়ার আগে ও পরে। তখনও পর্যন্ত ছুরি ও কাঁটার প্রচলন না হওয়ায় তারা খাবার খেত আঙুলের সাহায্যে, কিছুকাল আগেও যেভাবে ইউরোপে খাওয়া হত। কিন্তু তিনটির বেশি আঙুল পাত্রে রাখা অভদ্রতা হিসেবে পরিগণিত হত।

এখনকার মত তখনো একজন শেখের অধস্তন বেদুইনদের পোশাক হিসেবে ব্যবহার করত সাদাসিধা লম্বা জামা, পায়ের গোঁড়ালি পর্যন্ত যার ঢিলেঢালা ভাঁজগুলো ঝুলে থাকত, আর একটি চামড়ার কটিবন্ধ দিয়ে তা আটকানো হত। এটাই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সাধারণ পোশাক ছিল এবং এখনো সেটাই পরিধান করা হয়। সাধারণত জামার ওপরে উটের পশম দিয়ে তৈরি এক ধরনের ঢিলা আবরণী হিসেবে সাধারণভাবে চাপানো থাকতো। যুদ্ধযাত্রা ও অশ্বারোহণের সময় জামার সাথে পাজামা পরিধান করা হত।

সূচিশিল্পায়িত একটি লম্বা-চওড়া রুমাল দিয়ে তাদের মাথা ঢাকা থাকতো, মাথা ও কাঁধের ওপর দিয়ে যার সূত্রগুচ্ছ ঝোলানো থাকত এবং উটের চুলের তন্ত্রী দিয়ে মাথার চারপাশ জড়ানো থাকত।

স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যারা ছিল উন্নত শ্রেণীর লোক ও গোত্রীয় শেখ তাদের পোশাক ছিল সাধারণত পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝোলানো একটি জামা, যা 'শালওয়ার'[১] বা পাজামার নিচে পরিধান করা হত। পরবর্তী পোশাক পায়ের গোঁড়ালি পর্যন্ত লম্বা একটি ঢিলেঢালা অঙ্গাবরণ যা রেশম বা চাদরের কটিবন্ধ জড়ানো। এর উপর পরিধান করা হত একটি আলখাল্লা বা 'জুব্বা'[২] কিংবা 'আবা' নামক এক ধরনের ঢিলেঢালা কোট। আর প্রজাতন্ত্রের শেষ দিক পর্যন্ত বাইজান্টাইনদের কাছ থেকে বা কারও কারও মতে পারসীদের কাছ থেকে গৃহীত শরীরের সঙ্গে মানানসই 'কাবা'[৩] পরিধান করা হয়নি। 'কাবা' ছিল দু'রকমের, এক রকম হল অ্যাংলো-স্যাকসন অভিজাতদের পরিহিত চওড়া আস্তিন বিশিষ্ট লম্বা কোটের মত, অন্যটি কাছাকাছি বোতাম লাগানো আস্তিন বিশিষ্ট একটি আঁটোসাঁটো পোশাক, বর্তমান কালের পারসী অভিজাতরা প্রায়শই যা পরিধান করে থাকেন। তারা বয়স, পদমর্যাদা ও বিদ্যাবত্তার ভিত্তিতে মাথায় পাগড়ি পরিধান করত; আর এর আকারও হত বিভিন্ন। পাগড়ির ওপর চাপানো হত 'তায়লাসাঁ' নামের এক ধরনের রুমাল, যা ঝুলে থাকত কাঁধের ওপর দিয়ে এবং সূর্যের তাপ থেকে গ্রীবাদেশকে রক্ষা করত। আর পায়ে চটি কিংবা জুতো পরিধান করত।

মহিলাদের পোশাক ছিল ঢিলেঢালা শালওয়ার; গ্রীবার দিকে উন্মুক্ত জামা, শীতকালে প্রধানত যার ওপর একটি ঢিলেঢালা লম্বা গাউন পরা থাকতো, যা অনেকটা সম্ভ্রান্ত অ্যাংলো-স্যাকসন মহিলাদের পোষাকের মত দেখতে। বাইরে ভ্রমণের সময় আরেকটি ঢিলা পোশাক এর ওপর পরিধান করা হত, যা চারদিকে টেনে চেহারাকে আড়াল করা যেত কিংবা ধুলোবালি বা কাদা থেকে কাপড়-চোপড়কে রক্ষা করত। আর তাদের মাথা ঢাকা থাকত কপালের চারপাশে বাঁধন দেওয়া একটি রুমাল দিয়ে। প্রাক-ইসলামী যুগের মেয়েরা তাদের বুক খোলা রেখে জামা ও জ্যাকেট পরিধান করত? রাসুলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.)-ই বাইরে চলাফেরার জন্য লম্বা অঙ্গাবরণ ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেন এবং তারপর থেকে পরবর্তী আব্বাসী শাসনআমল পর্যন্ত আইন প্রবর্তন করা হয় যে শরীর সম্পূর্ণভাবে ঢেকে রাখতে হবে, আজকাল আমরা যেটা মিশন ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিতে দেখতে পাই।

তখন আরবদের মধ্যে মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল এবং তা এখনো চালু আছে। বহু মুসলিম-দেশে যে পর্দা প্রথার প্রচলন রয়েছে তা খুব বেশি আগে চালু হয়নি। প্রজাতান্ত্রিক

---

১. কখনো কখনো 'সিরওয়াল' বলা হত। স্পেনীয়রা একে বিকৃত করেছে 'জারাগুয়েলস' (বা 'কারাগুয়েলস') নামে।

২. দেখুন : ডোজি লিখিত Dictionnaire Detaille des noms vetements chez les Arbes, পৃঃ ১০৭

৩. ঐ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩৫২; ইবনুল আ'সির বলেন, নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে আরব সেনাপতি নো'মান কাবা পরিধান করেছিলেন।

মুসলিম মহিলারা স্বাধীনভাবে বাইরে চলাফেরা করত, তারা খলিফা, হযরত আলী (রা.), ইবনে আব্বাস ও অন্যান্যদের ধর্মোপদেশ ও বক্তৃতা শুনতে যেতেন । বাইজান্টাইন ও পারসীদের সংস্পর্শে এসে কোন লোকই প্রাচীন আরবের বীর্যবত্তা হারিয়ে ফেলেনি। প্রাক-ইসলামী যুগের আরববাসীরা প্রাচীন ইহুদীদের মত বহু বিবাহ করতে অভ্যস্ত ছিল। এটি ছিল গোত্রীয় যুদ্ধে পুরুষ মানুষের স্বাভাবিক সংখ্যা কমে যাওয়ার পরিণাম, আর তা না করলে স্ত্রীলোকেরা খাদ্যের অভাবে মারা যেত। রসুলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.) এই প্রথার সীমা নির্দেশ করে পরোক্ষভাবে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেন এবং এই নীতিকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য উপযোগী করে তোলেন। প্রজাতন্ত্রের সময়ে পারিবারিক জীবন পিতৃতান্ত্রিক ছিল। দাস কেনাবেচা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়, প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীতে প্রবলভাবে আদম ব্যবসাকে নিন্দা করা হত। যেসকল লোক আইনসম্মত ভাবে যুদ্ধে বন্দী হত, একমাত্র তাদেরই মুক্তিপণ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দাস হিসাবে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে দাস-দাসীরা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতই মর্যাদা লাভ করত।

অধ্যায়-৭

উমাইয়া বংশ [হারবিয়া শাখা]

হাসান (রা:) : তার পদত্যাগ : মু'আবিয়া : জবর দখল : গোত্র বিবাদ: মুদার বংশ: হিময়ার বা ইয়েমেনী বংশ : ইসলামের উপর গোত্র বিবাদের ফল : সাম্রাজ্যের বিস্তার: মু'আবিয়ার মৃত্যু : প্রথম ইয়েজিদ : হুসাইন (রা:) : কারবালার হত্যাকাণ্ড: হিজাজের উত্থান : হারবার সিরীয় বিজয়: মদিনা লুণ্ঠন প্রথম ইয়েজিদের মৃত্যু : দ্বিতীয় মু'আবিয়া : জুবাইর : পুত্র আবদুল্লাহ : হিজাজে তাঁর আনুগত্যের শপথ

ইমাম হাসান (রা.) [৪০ হিজরি, ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ]

হযরত আলি (রা.)-এর বড় ছেলে হযরত ইমাম হাসান (রা.) কোন প্রকার বাধা ছাড়াই কুফা ও তার অধীনস্থ স্থান সমূহের খলিফা পদে নির্বাচিত হলেন, কিন্তু যেসব হীনমন্য লোকদের অস্থিরতা পিতাকে আশাহত করেছিল শীঘ্রয় তা পুত্রকেও পদচ্যুত করল। নতুন খলিফা ধর্মনেতার আসনে অধিষ্ঠিত হলেন দুঃসহভাবে, কারণ মু'আবিয়া ঠিক সেই সময়ে ইরাক আক্রমণ করলেন। এভাবে হযরত ইমাম হাসান (রা.) তার পদকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার বা পিতার মৃত্যুতে প্রশাসনে যে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছিল তাকে সুসংগঠিত করার পূর্বেই যুদ্ধ করতে বাধ্য হলেন। সিরিয়াবাসীদের প্রতিহত করার জন্যে কায়েস নামে এক সেনাপতিকে আগাম উপসাগরের দিকে পাঠালেন এবং প্রধান বাহিনী নিয়ে তিনি নিজে অগ্রসর হলেন মাদাইনের দিকে। এরপর কায়েসের পরাজয় ও মৃত্যুর সংবাদে তরুণ খলিফার সৈন্যদল উত্তেজিত হয়ে ওঠল; তারা শিবির ভাঙচুর করে মালপত্র লুঠপাঠ করতে থাকে, এমনকি তারা খলিফার লোকজনদেরকে বন্দী করে শত্রুর হাতে তুলে দেবার ফন্দিও আটে। ইমাম হাসান (রা.) নিতান্তই নিরুৎসাহ হয়ে কুফায় ফিরে আসেন এবং এবিষয়েও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন যে তিনি ধর্মনেতার পদ ত্যাগ করবেন।

খিলফাফত ত্যাগ

ইরাকী সমর্থকদের বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিশ্রুতি প্রদানে দৃঢ় অথচ কাজের সময় আনুগত্যহীনতা এগুলো দেখে তিনি মু'আবিয়ার প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত হলেন। আলোচনার মাধ্যমে একটি চুক্তি সম্পন্ন করা হল, যাতে মু'আবিয়াকে সারা জীবনের জন্য খলিফার পদ হস্তান্তর করা হল, যা তার মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.)-এর দ্বিতীয় পুত্র ইমাম হুসাইন (রা.)-এর ওপর অর্পণ করা হবে। পদত্যাগের পর ইমাম হাসান (রা.) সপরিবারে মদিনায় অবসর গ্রহণ করলেন, কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত ভাতা তিনি খুব বেশিদিন ভোগ করতে পারলেন না। কয়েক বছর যেতে না যেতেই মুআবিয়ার পুত্র ইয়েজিদের প্ররোচনায়" তাঁকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা হল।

মুয়াবিয়া [৩০ জুলাই ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ; শাওয়াল, ৪১ হিজরি]

বস্তুতপক্ষে ইমাম হাসান (রা.)-এর পদত্যাগের পর মুয়াবিয়াই ইসলামের শাসনকর্তা হয়ে উঠলেন। আর এভাবে ইতিহাসের নথিভুক্ত হল ভাগ্যের অন্যতম চরম পরিহাস, 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নির্যাতনকারীরাই জবর দখল করল তাঁর দৌহিত্রদের উত্তরাধিকার' এবং তারাই তাঁর ধর্ম ও সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠল"। হযরত আলি (রা.) যে শাসন কেন্দ্র কুফায় স্থাপন করেছিলেন এবার তা দামাসকাসে স্থানান্তর করা হল, আর সেখানে পারস্য ও বাইজান্টাইন রাজাদের মত মুয়াবিয়াও নিজেকে জাকজমক ও আড়ম্বরতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতেন। পরবর্তীকালের বর্গীয়া ও মেডিসিদের মত রাস্তা থেকে বিপদ সৃষ্টিকারী শত্রু বা অসঙ্গত বন্ধুকে সরিয়ে দেবার জন্যে তিনিও বারবার বিষ ও ছুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বা ইসলামের সেবা এসবের কোনটাই বিবেচনা করে বাঁচিয়ে রাখা হত না। আর এভাবে যারা তার উচ্চাকাংক্ষা বা কূটনীতির কাছে উৎসর্গ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে সিরিয়া বিজয়ের মহান নায়ক (অর্থাৎ হযরহ উমর (রা.)-এর পুত্র) আবদুর রহমানও ছিলেন। আবদুর রহমানকে হত্যা করার কারণ ছিল তিনি সিরিয়াবাসীদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং চিন্তাশীল মুসলমারা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। মুয়াবিয়ার চরিত্র এবং যে সকল ঘটনার কারণে সে নিশ্চিত সাফল্য লাভ করেছিল, একজন ইংরেজ লেখক এভাবে তার বর্ণনা প্রদান করেছেন, তাঁর মত অন্তত এ ব্যাপারে পক্ষপাতশূন্য যে; "উমাইয়াদের প্রথম খলিফা ছিলেন ধূর্ত, অবিচেবক ও নিষ্ঠুর এবং তিনি নিজের অবস্থা নিরাপদ করার স্বার্থে যে কোন প্রকার অন্যায় কাজ করতে সংকোচবোধ করতেন না। চরম প্রতিদ্বন্দীকে সরিয়ে দেবার জন্য তিনি চিরাচরিত রীতি হিসেবে হত্যাকেই গ্রহণ করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর দৌহিত্রকে তিনিই বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা করেন, হযরত আলি (রা.)-এর দুঃসাহসী সেনাপতি মালিক-উল-আশতারকেও ধ্বংস করা হয় একইভাবে। এমনকি পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার হিসেবে নিশ্চিত করার জন্য মুয়াবিয়া হযরত আলি (রা.)-এর জীবিত পুত্র হুসাইন (রা.) সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন সেই কথার খেলাপ করতেও তিনি কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করেন নি। তারপরও এই ধীর, হিসেবী ব্যক্তি শাসন করেছিলেন আরবের ইসলামী সাম্রাজ্যকে এবং এই রাজদণ্ড তার পরিবারে প্রায় নব্বই বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা যে দুটি ঘটনার মাধ্যমে পাওয়া যায় তা আমি অনেকবার উল্লেখ করেছি। তার মধ্যে একটি ছিল প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাস ও নিষ্ঠাবান মুসলমানের ধারণা, যার ফলে পার্থিব বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে তিনি আরও সফলভাবে ধর্মীয় কাজ করতে পারবেন। আর অন্যটি হল, আরবদের গোত্রীয় মনোভাব। এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন বিজয়ী আরবরা কখনই তাদের পদমর্যাদার সমান উঁচুতে তাদেরকে অধিষ্ঠিত করতে পারেনি। তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা সত্ত্বেও তারা তাদের ঐশ্বর্যের মধ্যে মরুভূমির আবেগ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তুচ্ছ ঈর্ষাপরায়ণতা ঠিক আগের মতই প্রবল ও তীব্রভাবে বিদ্যমান রেখেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা আবার 'ইসলামের পূর্বেকার আরবদের মতই যুদ্ধ করেছিল।"[১]

---

১. ওসবোর্ণ প্রণীত Islam under the Arabs.

উমাইয়া বংশের মসনদ লাভ : ইসলামের উপর প্রভাব

উমাইয়াদের মসনদে আরোহণ করার ফলে শুধুমাত্র যে একটি রাজবংশেরই পরিবর্তন ঘটল তা নয় বরং এর অর্থ দাড়াল একটি নীতির রদবদল এবং সৃষ্টি হল একটি নতুন অবস্থার, আর আমরা এটাও দেখতে পাব যে এই পরিবর্তন কিভাবে সাম্রাজ্যের ভাগ্য ও জাতির উন্নয়নের ওপর অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই অবস্থা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে এবং ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন আরব গোত্রের অবস্থান এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। যে সমস্ত যুদ্ধের মূল কারণ ছিল ধর্মীয় বিদ্বেষ কিংবা মৌলিক নীতির ব্যাপারে মতভেদ, যেমন স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের লড়াই, সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতার লড়াই এগুলিকে আমাদের বিবেচনার বাইরে রাখলে যা দেখা যায় তা এশিয়া বা ইউরোপে, খ্রীস্টান বা মুসলমানদের মধ্যে মানুষ ও জাতিগুলোতে একে অন্যের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা এবং তাদেরকে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত করানোর পিছনে বর্ণবিদ্বেষের চেয়ে স্থায়ী ও প্রবল কারণ আর নেই। এটি এমনই এক ভাবপ্রবণতা যা শতাব্দীর পর শতাব্দী সব ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিপ্লবের উপর বীভৎস ছায়াপাত করে অবস্থান করে থাকে।

হিময়ার বংশ

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবকালে আরবের লোকজন নিজেদেরকে দুটি ভিন্ন বংশোদ্ভূত বলে দাবি করত। যার একটি বংশ কাহতন থেকে উদ্ভব হয়, আর অপরটি হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশ হতে উদ্ভূত হয়েছে। পূর্বোক্তদের জন্মস্থান ইয়েমেন, আর শেষোক্তদের হিজাজ। পরবর্তীতে কাহতন বংশীয় প্রাচীন রাজা আবদুস শামসের[১] অন্যতম পুত্র হিময়ারের নামানুযায়ী কাহতন বংশীয়রা হিময়ার বংশীয় নামে অভিহিত হয়, যদিও আরব লেখকরা মূল জন্মভূমির সূত্র ধরে তাদেরকে ইয়েমনী নামেই অভিহিত। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমি তাদেরকে হিময়ার অথবা ইয়েমেনী উভয় নামেই পরিচয় দেব। হিমায়ার বংশীয় রাজাদের (তুব্বা)[২] আমলে ইয়েমেনের রাজধানী মারেব বা সাবার ভেতরে ও চারপাশে বন্ধু আজদ অর্থাৎ কাহতনের বংশধর আজদের সন্তানদের নিয়ে যে গোত্র গড়ে ওঠে ঐ গোত্রের লোকজন বাস করত। এটা ধারণা করা হয় যে খুব সম্ভবত খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকের দিকে আজদ বংশীয়রা উত্তরদিকে বসতি স্থানান্তর করেছিলেন যার ফলে অন্য গোত্রগুলিরও স্থানান্তর করে। সবশেষে আজদীয়দের একটি অংশ 'খুজা' (বিচ্ছিন্ন) নাম নিয়ে মক্কার নিকটবর্তী বাতন মার নামক অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে, যেখানে তারা রাসুলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সময়কাল পর্যন্ত বসবাস করত; অন্য

---

১. দ্রষ্টব্য : পূর্বে, পৃঃ ৩ ; হিময়ার ছিলেন আবদুল শামসের উত্তরাধিকারী। যেহেতু তিনি সবসময় একটি লাল আঙরাখা পরতেন হয়তো সেজন্যই উপাধি পেয়েছিলেন হিময়ার (লাল)।

২. বর্গীয় পদবি, যেমন সীজার ইত্যাদি।

দলটি ইয়াসরিবে (মদিনা) অবস্থান করে, আর সময়ের সাথে সাথে সেখানে তারা আউস ও খজরজ নামক দুটি গোত্রে পরিণত হয়, যাদের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি[১]। অন্যান্যরা সিরিয়া ও ইরাকে যাযাবর হয়ে ঘুরতে থাকে; যারা সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করে তাদেরকে বনুগাসসান (গাসসানী বংশধর) বলা হত, আর যারা ইরাকের দিকে ছিল তাদেরকে বনু কালব (কালবী বংশধর) বলা হত। আরেকটি দল তাদের বসতি স্থাপন করে হামাদানে; অন্যদিকে আরেকটি বড় অংশ পূর্বদিকে অগ্রসর হয়, সেখানে তারা পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী ওমান প্রদেশে তাদের আবাসস্থল গড়ে তোলে। মোটামুটিভাবে এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুওত প্রাপ্তির সময়ে হিময়ার বংশীয় আরবদের অবস্থা।

মুদার বংশ

আরবের ইসমাঈলী বংশের লোকদেরকে কখনও কখনও বনু মায়াদ (মায়াদ ইসমাঈলের একজন বংশধর আদনানের পুত্র ছিলেন; আর মুদার মায়াদের পৌত্র ছিলেন) বললেও বেশিরভাগ সময় তাদেরকে বনু মুদার (বা মুদার বংশীয়) বলা হত; এরা মায়াদের পৌত্র মুদারের বংশ হতে উদ্ভূত। এখন থেকে এই বংশের লোকদেরকে আমরা শেষোক্ত নামেই অভিহিত করব; যদিও আরব ইতিহাসসমূহে এই সাধারণ নামের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক নামই অধিক ব্যবহার করা হয়; যেমন : বনু কুরাইশ, বনু কায়স, বনু বকর, বনু তাগলীব এবং বনু তামীম। একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কুরাইশগণ মক্কা এবং এর পার্শবর্তী অঞ্চলসমূহে বসবাস করত। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ছড়িয়ে পড়ে হিজাজে (ইয়াসরিব বা মদীনা ব্যতীত) এবং মধ্য আরবে।

হিময়ার ও মুদার বংশের বিরোধ

হিময়ার ও মুদার এই দুই গোত্রের মধ্যবর্তী তীব্র ও লাগাতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিণত হয় ঘোর শত্রুতায়, যা ইউরোপীয় ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনা করতে যাওয়া একেবারেই নির্বুদ্ধিতা। বছরের পর বছর স্বেচ্ছাচার ও অপশাসনের পরিণাম হিসেবে স্যাকসনদের বিরুদ্ধে কেল্টদের, ইংরেজদের বিরুদ্ধে আইরিশদের, রুশদের বিরুদ্ধে পোলদের শত্রুতার যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়, তাতে সবসময় দুর্বল জাতির লোকজনই নির্যাতিত হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হল গেলফ ও গিবেলাইনদের মধ্যে বিদ্যমান এই জ্বলন্ত বিদ্বেষের মূল চাবিকাঠি। ইউরোপে দুটি জাতির লোকেদের নতুন করে মিলন ঘটানোর পথে বাঁধা হয়ে দাড়ায় তাদের ভাষা, আদব-কায়দা এবং প্রধানত তাদের ধর্মবিশ্বাসের ভিন্নতা; কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায়, কয়েক শতকের অপমান ও গঞ্জনা তাদের পরস্পরকে একত্রিত হতে সাহায্য করে।

---

১. পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১১

কারণসমূহ

হযরত মুহম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের অবস্থা অন্যরকম ছিল। রসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই বনু মুদারদের দ্বারা কথিত বিশুদ্ধ আরবি ভাষা সেমিটিক ও দেশীয় ভাষার মিশ্রণে গড়া ওঠা হিময়ার ভাষার স্থান দখল করেছিল, যা নিশ্চিতভাবে একটি বুদ্ধিবৃত্তিগত প্রাকবিবেচনা লাভ করেছিল এবং সামান্য আঞ্চলিক পার্থক্যসহ তা সমগ্র উপদ্বীপ জুড়ে আরবদের কথা বলার একটি সর্বজনীন ভাষা ছিল। তাদের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি এবং রুচি ও ভাবধারা প্রায় একই রকম ছিল। তারপরও দুটি গোত্রের মধ্যে ছিল স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পার্থক্য। এর কারণ খুঁজতে আমাদের আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে। ইসলামের আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্বেই হিময়াররা পৌঁছেছিল সভ্যতার এক উচ্চশিখরে। যেখানে তারা বসতি স্থাপন করে, সেখানে তারা একটি সুসংগঠিত সরকার গড়ে তুলেছিল, নিঃসন্দেহে তা ছিল প্রাচীন, আর এটা সাধারণ জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নিয়মতান্ত্রিক ছিল। তারা লেখার কৌশল জানত এবং তাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল চাষাবাদের প্রতি। অন্যদিকে কুসাঈয়ের আমলে কুরাইশদের বাদ দিলে, মুদাররা যাযাবর ও পশুচারণবৃত্তিকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এদের প্রত্যেকটি গোত্রই পরস্পরের থেকে ভিন্ন ছিল, আর নিজেদের স্বার্থ ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে ছিল পরস্পর বিভক্ত এবং এক ধরনের গণভোটের মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রধান নেতা নির্বাচন করত। আর স্বাভাবিকভাবেই এই ভাগাভাগি অবস্থায় থাকার কারণে তারা হিময়ার রাজাদের কাছে পরাধীনতা স্বীকার করত, আর খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত বারবার যুদ্ধ বিগ্রহ করা সত্ত্বেও যাদেরকে তারা কর প্রদান করতে বাধ্য থাকে।

হিময়ার ও মুদারদের মধ্যকার বিদ্যমান এই অবিরাম লড়ায়ের কারণ ছিল একদিকে আধিপত্য এবং অন্যদিকে স্বাধীনতা, যা উভয়ের মধ্যেই তিক্ত বিদ্বেষ ও জ্বলন্ত শত্রুতার সৃষ্টি করেছিল, যা তারা চারণ কবিদের মাধ্যমে সর্বদা জীবিত রাখত। তারা সেই সব দিনের গান গাইত, যখন কিনদা সম্প্রদায় লুঠ করেছিল তামীম সম্প্রদায়কে অথবা কায়েস আজদের ওপর আক্রমন করেছিল। হযরত মুহম্মদ (স.)-এর ধর্ম প্রচার এই গোত্র-বিদ্বেষের অবসান করতে শুরু করে এবং চারণদের প্রভাব রোধ করে। যদি রসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.) আরও দীর্ঘজীবী হতেন, তাহলে তাঁর শিক্ষা ও বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব এই গোত্রগুলোকে সকল মানবীয় সম্ভাবনাসহ একই মতাবলম্বী জাতিতে পরিণত করত। দশ বছরের নবুওত জীবনে যতই আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করা হোক না কেন, বহু শতাব্দী ধরে আরব ভূমিতে সক্রিয় থাকা গোত্র-বিদ্বেষের বিষ নির্মূল করার জন্য তা নিতান্তই অপর্যাপ্ত। শুধুমাত্র মদিনাতে তাঁর প্রভাব অপ্রতিহত ও ধারাবাহিকভাবে বিদ্যমান ছিল বলে সেখানে এ বিষয়ের সমন্বয় সাধন সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর বিজয়প্রবাহে আরব গোত্রগুলো পৃথিবীর চারদিকে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। মুদাররা বসতি স্থাপন করে বসরায়, অন্যদিকে কুফা যায় প্রধানত হিময়ারদের দখলে। মুদারদের আধিপত্য বিস্তার করে

ফিলিস্তিন ও দামাসকাস প্রদেশে, অন্যদিকে উত্তর আরবের মতো সিরিয়ার উত্তরাংশ হিময়ারদের আওতায় পড়ে। মিশর ও আফ্রিকা সহ পুবদিকের প্রদেশগুলোতে দুইটি গোত্রই কম-বেশি বিস্তার লাভ করে। কিন্তু তারা যেখানেই বসতি গড়ল, সেখানেই সেই পুরনো বৈরীভাব সাথে নিয়ে গেল। মহান হযরত উমর (রা.)-এর কড়া শাসনামলে তা দমন করা হয়েছিল শক্ত হাতে। সমস্ত জাতি আত্মরক্ষা ও প্রয়োজনীয় আত্মবিস্তৃতির যে কাজে তখন আত্মনিয়োগ করেছিল তাতে পরস্পরের প্রতি সহমর্মী হওয়া ছাড়া অন্য কোনো ধরনের মনোভাব প্রকাশের অবকাশ ছিল না। যদি হযরত আলী (রা.)-কে বিনা বাঁধায় হযরত উমর (রা.)-এর স্থলাভিষিক্ত করা হত, তাহলে সম্ভবত দুটি গোত্র পরস্পরের সাথে একাকার হয়ে একটি জাতিতে পরিণত হত। কিন্তু হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামলে উমাইয়ারা তাদের নিজেরে স্বার্থ রক্ষার জন্য মুমূর্ষু বিদ্বেষের ধূমায়িত ছাইতে উস্কাতে উস্কাতে পরিণত করল এক বহ্নিশিখায়, যা স্পেন ও সিসিলি, আফ্রিকার মরুভূমি, খোরাসানের সমভূমি এবং কাবুলের অনাবাদী অঞ্চলগুলোতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর লেলিহানের সৃষ্টি করল। এই শোচনীয় বিরোধ সর্বনাশ করেছিল এর প্ররোরচনাকারীদেরকেই এবং আরব জাতির সাথে সাথে রোমক ও জার্মান জাতির ভাগ্যের উপরও এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর তাদের সাথে আরবরা অল্প দিনের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। এমন সময় এটি তাদের বিজয়ের পথ রোধ করে দাড়ায়, যে সময় পাশ্চাত্য জগৎ তাদের পাদতলে নেতিয়ে পড়েছিল এবং এর পরিণাম হিসেবে তাদেরকে হারাতে হয় সাম্রাজ্যের একটি বৃহৎ অংশ।

মুআবিয়ার শাসন পদ্ধতি

মুদারদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল থাকলেও তাদের ও হিময়ারদের মধ্যে মোটামুটি ভারসাম্য রক্ষা করা এবং একে অন্যের প্রতি তাদের অত্যাচার ও অন্যায় পীড়ন বন্ধ করার মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মুআবিয়ার ছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনামলে যে দল যখন প্রাধান্য লাভ করেছে সে দলই তখন প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্যাতন করতে হয়ে উঠেছে হিংস্র ও নিষ্ঠুর। কিন্তু উমাইয়া গোত্রের সদস্যরা তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ও স্বার্থের বন্ধনে এমনভাবে আবদ্ধ ছিল যে গোত্র-প্রধানের প্রতি তাদের আনুগত্য কখনো বিচলিত হয়নি এবং বেতনভোগী সিরীয় সৈন্যরাও সবসময় মুআবিয়া ও তাঁর পরিবারের জন্য একটি শক্তির প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল। অধিকতর চিন্তাশীল ও ধর্মপ্রবণ ব্যক্তিরা সরকারি কাজের ব্যাপারে কোন প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করত না। তাঁরা সাহিত্যচর্চায়, ইসলামী আইনশাস্ত্রের অনুধাবনে আত্মনিয়োগ করেন। আর এ সময়েই এর প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয় অথবা তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলো পালন করতে থাকেন। তাঁরা ধর্মপ্রচারে সাহায্য করলেন, কিন্তু সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করলেন না। যে সমস্ত ধর্মান্ধরা হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং নাহরাওয়ানে বিধ্বস্ত হয়েছিল, তারা আশ্রয় নিয়েছিল দুর্গম আল-আহসা ও মধ্য আরবের অন্যান্য অংশে।

এখান থেকেই তারা তাঁদের ধোঁয়াটে হতাশাব্যঞ্জক ও অন্ধ গোঁড়ামিতে ভরা মতবাদগুলো প্রচার করতে থাকে।[১]

তাদের সংখ্যা, হঠকারিতা এবং যা তারা সঠিক বলে মনে করত তার প্রতি নিষ্ঠা তাদেরকে দামাসকাস সরকারের পচরম শত্রুতে পরিণত করে। তারা মুআবিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কালদীয়া আক্রমণ করে এবং হুমকি দেয় ইরাককে, কিন্তু চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় এবং তাদের মরুভূমির ঘাঁটিগুলোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

আফ্রিকায় রাজ্যবিস্তার

মুআবিয়া এবার দামাসকাসের সিংহাসনে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হয়ে আফ্রিকার দিকে মনোযোগ প্রদর্শণ করেন। অবশ্য আরবদের কাছে 'ইফ্রিকিয়া' কথাটি বলতে কেবল মিশরের নিকটবর্তী আফ্রিকার উত্তর অঞ্চলকে উল্লেখ করা হয়, আর সে সময় কথাটি এই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হত। এই বিশাল ভূখণ্ড তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল। যথা: (১) সুদূর পাশ্চাত্য (মাগরিব-উল-আকসা): যা আটলান্টিক মহাসাগরের তীর থেকে লেমসেন হয়ে সাহারার দক্ষিণাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (২) নিম্ন পাশ্চাত্য (মাগরিব-উল-আদনা): যা দেশের ওরান ও বুগিয়া জেলার মধ্যে অবস্থিত ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং (৩) মূল ইফ্রিকিয়া; যা বর্তমান আলজিরিয়ার পূর্বপ্রান্ত থেকে মিশরের সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। লিবিয়া মরুভূমির পশ্চিমে এবং 'নিগ্রো দেশে'র (সুদান) উত্তরে অবস্থিত উত্তর আফ্রিকায় সেমিটিটিক জাতির লোকেরা বসবাস করত এবং আরও যেসকল জাতির লোকেরা এই ভূখণ্ডের সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করত, তারা নিজেদেরকে আরবের দুটি প্রধান গোত্রের শাখা হিসেবে দাবি করত।[২] শক্তিশালী ও সাহসী এই সব জাতির লোকেরাও আরবদের মতো একই ধরনের হিংস্র স্বাধীনতাপ্রিয়তায় উদ্দীপিত ছিল। হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে এই প্রদেশ প্রথম আক্রান্ত হয় ; হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনকালে আরবের সৈন্যরা এগিয়ে যায় বার্কা পর্যন্ত। প্রাচীন কার্থেজের নিকটবর্তী অঞ্চলের এক স্মরণীয় যুদ্ধে বাইজান্টাইন সর্দার গ্রেগোরিয়াস পরাজিত হলে রোমকরা একটি বার্ষিক কর দিতে সম্মত হয় এবং আরবরা জাবিলা ও বার্কায় ছোট একটি সৈন্যদল রেখে সে-দেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। এরপর রোমক শাসনকর্তারা পরিত্যক্ত ভূখণ্ডগুলো আবার দখল করে নেয়; কিন্তু তাঁদের লোভ ও

---

১. তারা কেবল প্রথম দুই খলিফার কর্তৃত্ব স্বীকার করত এবং নিন্দা করত হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) উভয়কেই। উমাইয়াদেরও তারা নিন্দা করত আল্লাহ প্রত্যাখ্যাত উড়নচণ্ডী বলে। তারা দাবি করত যে, গোত্র বা পরিবার নির্বিশেষে সর্বসাধারণের মধ্যে থেকে একজন ইমাম (ধর্মনেতা) নির্বাচনের অধিকার তাদের আছে, সেই সাথে আল্লাহর রাজত্ব স্থাপনেরও। নিজেরা ব্যতীত অন্য সকলকেই তারা নরকভোগী বলে মনে করত। সমস্ত আমোদ-প্রমোদ, তা নির্দোষ হলেও, তাদের সমাজে নিষিদ্ধ এবং প্রদানযোগ্য ছিল। এসব ধর্মান্ধদের নজীর আগে ছিল এবং এখনো আছে অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে।

২. বলা হয় এক হিময়ার বংশীয় রাজা উত্তর আফ্রিকায় অনুপ্রবেশ করেছিলেন এবং স্থাপন করেছিলেন কাহতনীয় উপনিবেশ। আফ্রিকা বিজয়ের জন্য তাঁকে অভিহিত করা হত 'ইফ্রিকিয়াস' বা 'আফ্রিকানাস' বলে।

অত্যাচার এমনই অসহনীয় হয়ে ওঠে যে, সেখানকার অধিবাসীরা তাদেরকে অবিলম্বে বাইজান্টাইন দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য আরবদের নিকট আহ্বান জানায়। মুআবিয়া তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নাফের পুত্র বিখ্যাত উকবার নেতৃত্বে ইফ্রিকিয়ায় একটি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন যারা সেখানে পৌঁছে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন প্রতিহত করে এবং ওই দেশকে পুনরায় আরবদের শাসনাধীনে নিয়ে আসে ।

কাইরোয়ান নগরী প্রতিষ্ঠা (৬৭০ খ্রিস্টাব্দ)

দুর্ধর্ষ ও দুর্দমনীয় বার্বার জাতিকে প্রতিহত করার সাথে সাথে সমুদ্রপথে রোমকদের লুঠতরাজ বন্ধ করার জন্য হিজরি ৫০ সনে উকবা কতৃক তিউনিসের দক্ষিণে বিখ্যাত সামরিক নগরী কাইরোয়ান প্রতিষ্ঠা করা হয়। দীর্ঘদিনের এই বন্য জন্তু ও সরীসৃপ অধ্যুষিত অরণ্যভূমিকে আর সমতল করে সেখানে এক চমৎকার নগরীর পত্তন করা হয়। বার্বার সহযোগীদের সমর্থনে রোমকরা 'মাগরীব' (আধুনিক মরক্কো) দখলে রেখেছিল এবং তারা বারবার ইফ্রিকিয়া আক্রমণ করতে থাকে। ৫৫ হিজরি সনে উকবা পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য মনস্থির করেন। তাঁর আগমনের সাথে সাথে অরক্ষিত নগরীগুলো আত্মসমর্পণ করে আর রোমক ও গ্রিকরা তাঁর সেনাবাহিনীকে পার্শ্বদেশ থেকে আক্রমণ করে বিক্ষিপ্ত সৈন্যদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং পশ্চিমদিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে এক ধরনের বাধার সৃষ্টি করলে উকবা বলপূর্বক পথ করে নিয়ে আটলান্টিকের তীরে পৌঁছলেন। কিন্তু সমুদ্রের যে বিশাল জলরাশি তাঁর যাত্রা পথকে রুখে দাড়াল তা দেখে তিনি হতাশায় নিজের ঘোড়াকে আবক্ষ তরঙ্গমালার বুকে সবেগে তাড়িত করলেন এবং আকাশের দিকে হাত তুলে চিৎকার করে বললেন, 'হে সর্বশক্তিমান! যদি এই সমুদ্র না থাকত তাহলে আমি আরও সুদূর অঞ্চলগুলোতে গিয়ে তোমার নামের মহিমা প্রচার করতে পারতাম এবং দমন করতে পারতাম তোমার শত্রুদেরকে।'

উকবার মৃত্যু

উকবার গৌরব উজ্জল অভিযানে রোমক ও বার্বারদের চূড়ান্ত পরাজয় হয় এবং এর ফলে বহু বছর ধরে দেশ শান্ত ছিল। দামাসকাসে সাময়িক অবস্থানকালের সময়টুকু বাদ দিলে তিনি ইফ্রিকিয়া এবং তার অধীনস্থ পশ্চিমাঞ্চল হিজরি ৬৫ সাল অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত শাসন করেন। এ বছরই আটলাস পর্বত ও তার উপত্যকা বেয়ে বার্বারদের অসংখ্য অসভ্য যাযাবরের দল কাইরোয়ানের অধীনস্ত মুষ্টিমেয় আরবদের উপর আক্রমন করে। এটি স্কটল্যান্ডের গোত্র জমায়েতের মতো ছিল, আহ্বানের পদ্ধতিও ছিল একই রকম এবং বিজয়ীদের বিরুদ্ধেও একই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। উত্তর আফ্রিকার দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধবাজ জাতিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় আরবরা যে অদম্য সাহস ও উদ্যম দেখিয়েছিল তা অন্য কোনো জাতি বা গোত্র দেখাতে সামর্থ হয়নি। তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে আরবরা এক বিশাল দেশ বিজয় করতে প্রয়াসী হয়, যা অধ্যুষিত ছিল হিংস্র, যুদ্ধবাজ জাতিসমূহ দ্বারা এবং তারা মূলত ভারতবর্ষের মত শান্তিপ্রিয় লোকজন ছিল না। বার্বাররা রাজধানী অবরোধ করে রাখে; কিন্তু উকবা ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো

প্রাণত্যাগ করার লোক ছিলেন না। তিনি চিরাচরিত নিয়মেই 'জিতব অথবা মরব' প্রতিজ্ঞা করে তাঁর তরবারীর কোষ ভেঙে ফেলেন এবং অবরোধকারী সেনাদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তার দলের অধিকাংশ সৈন্যই তাঁর সাথে মৃত্যুবরণ করেন। আর কিছু সংখ্যক সৈন্য শত্রু ব্যূহ ভেদ করে মিশরের দিকে পালিয়ে যায়। কাইরোয়ান চলে যায় বার্বারদের অধীনে এবং আফ্রিকা ও পশ্চিমাঞ্চলে আরবদের আধিপত্য বিলুপ্তপ্রায় বলে মনে হতে লাগল।

পূর্বাঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার

উকবা যখন পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধে নিয়োজিত তখন আবু সুফরার পুত্র মুহাল্লিব সিন্ধু প্রদেশ এবং সিন্ধু নদীর অববাহিকা জয় করেন। একই সময় পূর্ব আফগানিস্তানও তাদের শাসনাধীনে চলে আসে। গৃহযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে যে রোমকরা মুসলিম রাজ্যগুলোতে অনুপ্রবেশ করেছিল, তারাও বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং আরব সেনারা তাদের শীতকাল অতিবাহিত করেন কাপাডোসিয়ায়। আরবদের নিকট থেকে রোমক যুদ্ধ জাহাজগুলো পালিয়ে যায়। গ্রিক দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলো দ্বীপ জয় করে সেগুলোকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মুআবিয়া কর্তৃক পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

বসরার শাসনকর্তা মুগিরার প্ররোচনায় পড়ে মুআবিয়া নিজ পুত্র ইয়াজিদকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করার পরিকল্পনা করেন। এটি অবশ্য হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর সাথে করা চুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল, কিন্তু এই পরিকল্পনায় তিনি মদত পান ইরাক ও খোরাসানের শাসনকর্তার, যিনি একজন জারজ[১] সন্তান ছিল। ইরাকীদের ঘুষ, স্তোকবাক্য কিংবা জবরদস্তি করে ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণে বাধ্য করা হয়; সিরীয়রা অবশ্য সর্বদায় মুআবিয়ার প্রস্তাবে রাজি ছিল।

হিজরি ৫১ সালে হিজাজবাসীদের অঙ্গীকারবদ্ধ করানোর জন্য মুআবিয়া মদিনা ও মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এখানেও তাঁর প্রতি ভীতি প্রদর্শনের কলাকৌশল আংশিকভাবে সফল হয়। মুসলমানদের মধ্যে তখন চারজন ব্যক্তি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন যাঁরা কোনো শর্তেই আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না এবং তাঁদের দৃষ্টান্ত হিজাজবাসীদের উৎসাহিত করল। আর ঐ চারজন ব্যক্তি হলেন হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র ইমাম হুসাইন (রা.), হযরত উমর (রা.) (খলিফা)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ, হযরত আবু বকর (রা.)-এর পুত্র আব্দুর রহমান এবং জুবাইর-এর পুত্র আব্দুল্লাহ। জুবাইর-এর পুত্র আব্দুল্লাহকে মুআবিয়া 'কুরাইশদের ধূর্ত শিয়াল' নামে অভিহিত করেন, কারণ খেলাফতের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল, আর নিজের দুষ্কর্মের মাধ্যমে কুখ্যাত হওয়ার কারণে অন্যরা সক্রিয় হন ইয়াজিদের প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা প্রদর্শনের মাধ্যমে।

---

১. জিয়াদ ছিলেন মুআবিয়ার পিতা আবু সুফিয়ানের অবৈধ পুত্র, সেজন্য কোনো নাম উল্লেখ না করে তাঁকে কেবল 'ইবন আবিদ' বা 'তার পিতার পুত্র' বলে অভিহিত করা হত।

মুআবিয়ার মৃত্যু (এপ্রিল, ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ)

মুয়াবিয়া হিজরি ৬০ সনের রজব মাসে (এপ্রিল, ৬৮০) মৃত্যুবরণ করেন। বলা হয় তিনি গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় ও মোটাসোটা ছিলেন। বর্ষপঞ্জির লেখকরা বর্ণনা করেন, 'তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি লোকদের ধর্মোপদেশ দিতেন উপবিষ্ট অবস্থায়, তিনিই প্রথম ব্যক্তিগত যিনি সেবার জন্য খোঁজা (নপুংশক) নিয়োগ করেন এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁর সাথে সভাসদরা অন্তরঙ্গভাবে ঠাট্টা-মস্করা করতেন।' মুআবিয়া ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত, অবিবেচক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কৃপণ অথচ প্রয়োজনের সময় সীমাহীন উদার, বাইরে বাইরে সমস্ত ধর্মীয় কর্তব্যের ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান, কিন্তু পরিকল্পনা বা অভিপ্রায় সাধনের ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রকার মানবিক বা ধর্মীয় রীতিনীতির ব্যভিচার মানতেন না। তবে একবার দৃঢ়ভাবে সিংহাসনে বসার পর তিনি শত্রুদেরকে তার পথ থেকে সরিয়ে দেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে সাম্রাজ্যের সুশাসনে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা

ঐতিহাসিক মাসউদি তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার একটি কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রদান করেন। ফজরের নামাজ আদায়ের পর তিনি নগরাধ্যক্ষের বিবরণী গ্রহণ করতেন। তারপর সরকারি কাজকর্ম নির্বাহ করার জন্য মন্ত্রী ও সভাসদরা আসতেন। সকালের নাস্তা খাওয়ার সময় তিনি প্রদেশসমূহ থেকে আসা চিঠিপত্র কোনো সহকারীর মাধ্যমে পড়িয়ে শুনে নিতেন। মধ্যাহ্নে তিনি বেরিয়ে যেতেন সাধারণ নামাজের উদ্দেশ্যে এবং যারা তাঁর কাছে সরাসরি অভিযোগ জানাতে চায় মসজিদে একটি বেষ্টনীর মধ্যে বসে তিনি তাদের বক্তব্য শুনতেন। সেখান থেকে প্রাসাদে ফিরে আসতেন তারপর অমাত্যদের সাথে দেখা করতেন। সে পর্ব শেষে হলে দিনের প্রধান খাবার পরিবেশন করা হত, তারপর সামান্য বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। আসরের নামাজ আদায়ের পর কার্য-নির্বাহের জন্য মন্ত্রীবর্গের সাথে আর একবার সাক্ষাৎ করতেন। সন্ধ্যাবেলা তিনি সাড়ম্বরে খাবার গ্রহণ করতেন এবং আরেকটি অভ্যর্থনা সভার মাধ্যমে তাঁর দিনের কাজ শেষ হত। সব মিলিয়ে মুআবিয়ার রাজত্বকালে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল এবং বিদেশেও সাফল্য এসেছিল।

মুআবিয়ার সময়ে কনস্ট্যান্টিনোপলের সম্রাটগণ

মুআবিয়ার রাজত্বকালের শুরু থেকেই দ্বিতীয় কনস্টান্স রোমান সাম্রাজ্য শাসন করতেন, যিনি হত্যা করেছিলেন তাঁর ভাই থিয়োডসিয়াসকে। তাঁর পদচ্যুতির পর পগোনেটাস খেতাবধারী তাঁর পুত্র চতুর্থ কনস্ট্যানটাইন সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন। সিজারের এই বংশধর কুখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর ভাই হিরাক্লিয়াস ওস্টাইবোরিয়াসের নাক কাটা এবং চার্চের উচ্চপদস্থ যাজকদের শূলবিদ্ধ করার মাধ্যমে ।

প্রথম ইয়াজিদ (শাবান, ৬১ হিজরি, এপ্রিল ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ)

মুআবিয়ার মৃত্যুর পর পরই তার করা উইল অনুসারে ইয়াজিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। যে নীতির মাধ্যমে 'আমিরুল মুমেনীন' নির্বাচিত হতেন গণভোটের মাধ্যমে

প্রজাতন্ত্রের সে নীতির প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করা হল ইয়াজিদের পদপ্রাপ্তির মাধ্যমে। আরবরা এই নীতির উপর এমনইভাবে অনুরক্ত ছিলেন যে তারা ইসলামের আধ্যাত্মিকও পার্থিব নেতৃত্বের ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পরিবারবর্গের অধিকারও অস্বীকার করেছিল। অতঃপর শাসনরত রাষ্ট্রপ্রধানই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতেন, যার উত্তরাধিকার লাভের দাবি তিনি জীবিত থাকা অবস্থায়ই সেনা ও অমাত্যদের আনুগত্যের শপথ করানোর মাধ্যমে নিশ্চিত করার প্রয়াস চালাতেন। বসরার শ্রদ্ধেয় ইমাম ছিলেন হাসান (রা.), যিনি আলোচ্য শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন যে, 'দুজন ব্যক্তি মুসলমানদের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিলেন; আল-আসের পুত্র আমর, যিনি মুআবিয়াকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বর্শার ফলকে কোরআন ওঠানোর, আর তা ওঠানোও হয়েছিল এবং মুগিরা, যিনি মুআবিয়াকে ইয়াজিদের জন্য আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করানোর ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছিলেন। যদি তা না ঘটত, তাহলে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত নির্বাচনী সভা অব্যাহত থাকত, মুআবিয়ার উত্তরাধিকারীরাই তার নীতি অনুসরণ করার মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ পুত্রদের জন্য শপথ গ্রহণ করাতেন।'

ইয়াজিদ যেমন নিষ্ঠুর ছিলেন, তেমন ছিল বিশ্বাসঘাতক; তার কলুষিত মনে দয়া বা সুবিচারের কোনো স্থান ছিল না। তাঁর আমোদ-প্রমোদের মতই তার সঙ্গীসাথীরাও ছিল অত্যন্ত নিচুস্তরের ও দুশ্চরিত্র। একটি বানরকে মাওলানার পোশাক পরানোর মাধ্যমে তিনি ধর্মীয় নেতাদের বিদ্রূপ করতেন এবং যেখানেই যেতেন সেখানে জন্তুটিকে কারুকার্যময় পোশাকে সজ্জিত করে একটি সিরীয় গাধার পিঠে বসিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতেন । দরবারে মদ্যপানজনিত হাঙ্গামা চলত এবং স্বাভাবিকভাবেই রাজধানীর রাস্তাঘাটেও তার অনুকরণ করতে দেখা যেত। হযরত আলী (রা.)-এর দ্বিতীয় পুত্র ইমাম হুসাইন (রা.) বংশগতভাবেই পিতার গুণাবলী ও বীরোচিত স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। সিডিলট বর্ণনা করেন, 'তাঁর মধ্যে শুধুমাত্র একটি গুণেরই অভাব ছিল, আর তা হল ষড়যন্ত্রের মানসিকতা, যা উমাইয়া বংশের লোকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল।' কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধের সময় তিনি সসম্মানে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিচরিত্রে মধ্যে রসুলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.) ও হযরত আলী (রা.) উভয়ের চারিত্রিক গুনাবলী সমন্বিত হয়েছিল। মুআবিয়া ও ইমাম হাসান (রা.)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তিতে খেলাফতে তাঁর অধিকার সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। ইমাম হুসাইন (রা.) কোন দিনই দামাসকাসের স্বেচ্ছাচারী শাসকের দাবি মেনে নেননি, তিনি তার পাপাচারকে ঘৃণা করতেন এবং তিনি তার চরিত্রকে পরম বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে দেখতেন; পরবর্তীতে কুফার মুসলমানগণ যখন উমাইয়া শাসনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থণা করল তখন তিনি তাদের আবেদনে সাড়া দেওয়াকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করলেন। জুবাইর পুত্র আব্দুল্লাহ ইমাম হুসাইন (রা.)-কে তাঁর রাস্তা থেকে অপসারিত করার উদ্দেশ্যে তাঁকে অভিযান করতে উৎসাহিত করলেন; আর সে ছাড়া ইমাম হুসাইন (রা.)-এর সব বন্ধুই কুফাবাসীদের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস না করতে পরামর্শ দিলেন কারণ তাঁরা ইরাকীদের চরিত্র জানতেন। দূরাকাঙ্ক্ষী,

হিংস্র ও উদ্যমী কুফাবাসীদের চরিত্রে অধ্যাবসায় ও স্থিরতার চূড়ান্ত অভাব ছিল। 'তারা দিন থেকে দিনান্তরে তাদের নিজের মনের খবরই জানত না। কোন বিষয় বা ব্যক্তি-বিশেষের জন্য তারা এই মুহূর্তে আগুনের মতো প্রজ্বলিত তো পরমুহূর্তেই বরফের মতো শীতল এবং মড়ার মতো উদাসীন।' দৃশ্যপটে উপস্থিত হওয়ামাত্রই সমগ্র ইরাক তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল আর এই প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করেই তিনি কুফা অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বিভিন্ন আত্মীয়-পরিজন, দুই সাবালক পুত্র, কয়েকজন ভক্ত অনুগামী এবং ভীতিবিহ্বল মহিলা ও শিশুদের নিয়ে তিনি আরবের দুর্গম মরুভূমি অতিক্রম করলেন, কিন্তু ইরাক সীমান্তে যখন পৌঁছাল তখন কুফার সেনাবাহিনীর কোনো চিহ্নও দেখতে পেলেন না, যারা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এ দেশের নির্জন ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে তিনি বিপদ সংকেত শুনতে পেলেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও উমাইয়াদের মারণাস্ত্রের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে ক্ষুদ্র দল নিয়ে ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরবর্তী কারবালা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ পরিত্যাগ সম্পর্কে ইমাম হুসাইন (রা.)-এর আশঙ্কা চরম সত্য বলে প্রমাণিত হল। জারজের (অবৈধ সন্তান অর্থাৎ জিয়াদ) নিষ্ঠুর ও হিংস্র পুত্রের[১] প্রেরিত উমাইয়া সেনারা তাঁকে অবরোধ করল। কয়েকদিন ধরে তাঁদের তাঁবু ঘেরাও অবস্থায় রইল এবং সেই খুনী দুর্বৃত্তরা ইমাম হুসাইন (রা.)-এর তরবারীর সামনে আসতে সাহস করল না এবং তারা তাদের শিকার এই অল্প সংখ্যক বীরের দলকে অশেষ দুর্ভোগ দেওয়ার জন্য তাদেরকে ইউফ্রেটিসের পানি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

কারবালার হত্যাকাণ্ড

শত্রুপক্ষের প্রধানের সাথে আলোচনা করে ইমাম হুসাইন (রা.) তাদেরকে তিনটি সম্মানজনক শর্তের যে কোনো একটি বেছে নেবার জন্য প্রস্তাব দিলেন: হয় তাঁকে মদিনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক, অথবা তাঁকে তুর্কী সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক, আর তা না হলে তাঁকে সসম্মানে ও নিরাপদে ইয়াজিদের কাছে পৌঁছে দেয়া হোক। কিন্তু উমাইয়া স্বেচ্ছাচারীর আদেশ অত্যন্ত কঠোর ও অপ্রতিরোধ্য ছিল। ইমাম হুসাইন (রা.) বা তাঁর দলের প্রতি কোনো প্রকার সহানুভূতি দেখানো হল না এবং তিনি তাদেরকে অপরাধীর মতো 'খলিফার সামনে হাজির করতে চাইলেন, যেখানে উমাইয়াদের বিচারের নিয়ম অনুযায়ী তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইমাম হুসাইন (রা.) শেষ উপায় হিসেবে এই নররাক্ষসদের কাছে অসহায় মহিলা ও শিশুদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে না দেওয়ার আবেদন করলেন এবং এ কথা বললেন যে বরং এর বিনিময়ে তাঁর প্রাণনাশ করা হোক এবং এই অসম যুদ্ধের অবসান ঘটুক। তাদের কোনো প্রকার দয়া-মায়া ছিল না। তিনি প্রাণ বাঁচানোর জন্য বন্ধুদেরকে সময়মতো পালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু সকলেই তাঁদের প্রিয় প্রভুকে ছেড়ে যেতে বা তাঁকে ছেড়ে বেঁচে থাকতে একবাক্যে অস্বীকার করলেন। শত্রুপক্ষের এক প্রধান সেনাপতি রসুলুল্লাহ

---

১. জিয়াদের পুত্র উবাইদুল্লাহ, যাকে বলা হত নিষ্ঠুর, তিনি ইয়াজিদের সহকারী রূপে কাজ করতেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নাতির বিরুদ্ধে এমন পাপজনক যুদ্ধ করতে শংকিত হয়ে তিরিশ জন অনুগামী সহ দল ত্যাগ করলেন এবং 'অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে মাথা পেতে নেবার অঙ্গীকার করলেন।' প্রতিটি খণ্ড ও সম্মুখ যুদ্ধে ফাতিমা বংশীয়দের অপরাজেয় শৌর্য ছিল। কিন্তু শত্রুপক্ষের তীরন্দাজরা নিরাপদ দূরত্ব থেকে তাদেরকে আক্রমন করতে লাগল। ধরাশায়ী হল একের পর এক প্রতিরক্ষাকারী, অবশেষে শুধুমাত্র রসুলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দৌহিত্র বেঁচে থাকলেন। আহত ও মুমূর্ষু অবস্থায় শেষবারের মতো পানি পান করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে নদীরে ধারে নিয়ে গেলেন, কিন্তু তীর নিক্ষেপ করে সেখান হতে তাঁকে সরিয়ে দেয়া হল। তাঁবুতে ফিরে তিনি শিশুপুত্রকে কোলে তুলে নিতেই তাকেও তীরের ফলায় বিদ্ধ করা হল। তাঁর অন্যান্য পুত্র ও ভাইপোরাও তাঁর কোলেই নিহত হল। নির্দয় শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো আর কোনো শক্ত-সমর্থ লোক নেই দেখে তিনি একাকী অবসন্ন অবস্থায় শিবিরের প্রবেশমুখে বসে পড়লেন। একজন স্ত্রীলোক তাঁর জ্বলন্ত পিপাসার উপশম করতে তাঁর হাতে একপাত্র পানি তুলে দিল; কিন্তু যেই তিনি পান করার জন্য সেটি ওষ্ঠে ধারণ করেছেন অমনি একটি তীর তাঁর মুখে এসে বিঁধল। আকাশের দিকে হাত তুলে তিনি জীবিত ও মৃতদের জন্য শেষবারের মতো প্রার্থনা করলেন। তারপর উমাইয়াদের মধ্যে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, যারা সব দিক থেকেই তাঁর নিকট পরাজিত হতে থাকলো। কিন্তু রক্তপাত দেখে শীঘ্রই তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তারপরই ঘাতকের দল মুমূর্ষু বীরের ওপর ঝাঁয়িয়ে পড়ল। তারা তাঁর ঘাড় মাথা কেটে ফেলল, তাঁর দেহকে পদদলিত করল এবং সর্বতোভাবেই তাঁর অমর্যাদা করা হল একপাশবিক হিংস্রতায়। তাঁর মাথা কুফার দুর্গে নিয়ে আসা হলে মনুষ্যত্বহীন উবায়দুল্লাহ সেটির মুখে বেত্রাঘাত করল। একজন প্রবীন মুসলমান, চেঁচিয়ে উঠলেন 'হায়!' 'এই ওষ্ঠ দুটির ওপর আমি আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর ওষ্ঠ দুটি স্থাপিত হতে দেখেছি।' গিবন বর্ণনা করেন, 'দূরবর্তী সময়ে ও আবহাওয়ায়' হুসাইনের মৃত্যুর মর্মান্তিক দৃশ্য নিরাসক্ত পাঠকেরও সহানুভূতিকে জাগ্রত করে তোলে।' ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শাহাদত বার্ষিকীতে হযরত আলী (রা.) ও তাঁর সন্তানদের অনুগামীরাও দুঃখের উন্মাদনা ও ঘৃণামিশ্রিত শোকের যে পুনরাভিনয় করে তার মর্ম এবার সমবেদনার সাথে সাথে সহজেই বোঝা যাবে।

সে যুগের অন্যতম মহান আত্মা এভাবেই নিহত হলেন এবং তাঁর সাথে বিনাশ ঘটল পরিবারের বৃদ্ধ ও যুবক সকল পুরুষ সদস্যেরই। একমাত্র বেঁচে গিয়েছিল একটি রুগ্ন শিশু, যাকে হযরত হুসাইন (রা.)-এর বোন জয়নাব (জেনোবিয়া) গণহত্যা থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর নামও আলী ছিল এবং পরবর্তী জীবনে তিনি 'জয়নুল আবেদীন' বা 'ধার্মিকের অলঙ্কার' উপাধি পান। তিনি ছিলেন পারস্যের শেষ সাসানীয় রাজা ইয়াজদজর্দের কন্যার গর্ভজাত ইমাম হুসাইন (রা.)-এর পুত্র এবং তাঁর মাধ্যমেই রসুলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বংশ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়। মায়ের স্বত্বাধিকারের ভিত্তিতে তিনি ইরানের সাসানীয় সিংহাসনের দাবিও লাভ করেছিলেন। এই নাবালক সন্তানকে উবায়দুল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি হযরত মুহম্মদ (স.)-এর বংশ নিপাত করার উদ্দেশ্যে তাঁকেও হত্যা করতে চাইলেন, কিন্তু জয়নাবের

বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, ভাইপোর সঙ্গে তাঁর নিজেরও মৃত্যুবরণের সংকল্পে স্বেচ্ছাচারীর হৃদয় ভয়ার্ত হয়ে উঠল। হযরত হুসাইন (রা.)-এর পরিবারের মহিলাদের সাথে নাবালক আলীকেও দামাসকাসে পাঠিয়ে দেয়া হয়; তাদের পাহারাদার সৈন্যরা শহীদের [হযরত হুসাইন (রা.)] মাথা বর্শাফলকে গেঁথে বয়ে নিয়ে গেল। দামাসকাসে পৌঁছে রসুলুল্লাহ (স.)-এর নাতনীরা ছিন্ন ও পথশ্রমে জীর্ণ পোশাকে ইয়াজিদের প্রাসাদের দেয়ালের নিচে বসে পড়লেন এবং যেভাবে আরব রমণীরাই বিলাপ করে সেভাবে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁদের শোকময় কান্নার শব্দে ইয়াজিদ ভয় পেয়ে গেলেন এবং রসুলুল্লাহ (স.)-এর পরিবারের সমর্থনে রাজধানীতে বিদ্রোহ হওয়ার আশঙ্কায় দ্রুত তাঁদেরকে নিজেদের বাড়িতে ফেরত পাঠালেন।

হারবরার যুদ্ধ

কারবালার হত্যাকাণ্ড ইসলামী বিশ্বের সবত্র ত্রাস ও ভয়ের শিহরণ জাগাল এবং পারস্যে সৃষ্টি করল অন্য ধরনের উদ্দীপনা, পরবর্তীকালে যা উমাইয়াদের ধ্বংস করতে আব্বাসের বংশধরদের সাহায্য করেছিল। মদিনায় এই মনোভাব এত তীব্র হয়ে ওঠে যে ইয়াজিদ দ্রুত সেখানে জনগণের শান্ত করতে একজন বিশেষ শাসনকর্তা পাঠান। তাঁরই পরামর্শে মদিনার প্রধান ব্যক্তিরা ইমাম হুসাইন (রা.)-এর পরিবারের প্রতিবিধান চেয়ে দামাসকাসে এক প্রতিনিধি দল পাঠান। যাই হোক, প্রতিনিধি দল নিরুৎসাহিত হয়ে ফিরে আসে ইয়াজিদের জঘন্য জীবনযাত্রা এবং তাঁদের প্রতি তাঁর অমানবিক আচরণ দেখে। তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষুব্ধ মদিনাবাসীরা প্রকাশ্যে ইয়াজিদের পদচ্যুতি ঘোষণা করে এবং তাঁর বিশেষ শাসনকর্তাকে তাড়িয়ে দেয় শহর থেকে। এ খবরে ইয়াজিদ প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হন এবং তখনই উকবার পুত্র মুসলিমের নেতৃত্বে সিরিয়ার বেতনভোগী সেনা ও অনুগত উমাইয়া যোদ্ধাদের এক বিরাট বাহিনী পাঠান, আরবের ইতিহাসে যিনি 'অভিশপ্ত ঘাতক' নামে পরিচিত। মদিনাবাসীরা সিরীয়দের মুখোমুখি হয় হাররা নামক স্থানে, যেখানে এক প্রবল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা অধিকতর শক্তিশালী এবং অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করা সত্ত্বেও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। মদিনার কৃতী বীর যোদ্ধারা এবং রসুলুল্লাহ (স.)-এর মহান সহচর আনসার ও মুহাজিরগণ সেই সর্বনাশা যুদ্ধে নিহত হন—আর একাধিক দিক দিয়ে ইসলামেরও সর্বনাশ ঘটে। যে মদীনা নগরী রসুলুল্লাহ (স.)-কে আশ্রয় দিয়েছিল এবং যা পবিত্র হয়েছিল তাঁর জীবন ও নবুওতের মাধ্যমে, সেই নগরী জঘন্যভাবে লাঞ্ছিত হয় এবং বিপদের দিনে যাঁরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা শিকার হন ন্যাক্কারজনক নিষ্ঠুরতার, যা কেবল ফ্রান্সে কনস্টেবলের সেনাদল এবং অনুরূপভাবে রোম লুণ্ঠনকালে জর্জেস ফ্রানডসবার্গের হিংস্র লুথারান সেনাদের আচরণেই দেখা গেছে। মুসলমানদের মসজিদ পরিণত হয় আস্তাবলে, এমনকি অলঙ্কারের লোভে সৌধগুলোও ধ্বংস করা হয়। অসত্য পুনরায় জয়ী হয় এবং একজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বলেন, 'তার প্রতিক্রিয়া ইসলামের বিজয়কালে তাদের প্রতি প্রদর্শিত দয়া ও সহিষ্ণুতার প্রতিদান দেয়। ইসলামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা হয় নিহত হন অথবা জীবন বাঁচান দূরদেশে পালিয়ে গিয়ে। যে অল্প কয়েকজন নিষ্কৃতি পান, তাদেরকে ইয়াজিদের ক্রীতদাস হতে হল, যাঁরা তা অস্বীকার করলেন তাদের গলায়

অপমানের মার্কা দেয়া হল। এই লাঞ্ছনা থেকে শুধু দুজনকে অব্যাহতি দেয়া হয়, হযরত হুসাইন (রা.)-এর পুত্র দ্বিতীয় আলী এবং আব্বাসের পৌত্র আলী। খলিফাদের আমলে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় এবং অন্যান্য সরকারি প্রাসাদগুলো বন্ধ কিংবা ধ্বংস করা হয় এবং আরব দেশ আবার আদিম অবস্থায় পতিত হয়! পরবর্তীকালে দ্বিতীয় আলীর নাতি জাফর, যার উপাধি ছিল আস-সাদিক বা সত্যবাদী। তিনি মদিনায় তাঁর পূর্বপুরুষ খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর শিক্ষা-পদ্ধতি পুনরায় প্রচলন করেন। কিন্তু তা হল মরুভূমিতে মরূদ্যানের মতো। হতাশা ও অন্ধকারে চারদিক ভারি হয়ে ওঠে। মদিনা আর কখনো তার সমৃদ্ধি ফিরে পায়নি। উমাইয়াদের আমলে সেটি অজ্ঞাত অতীতের নগরী হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয়, কারণ দ্বিতীয় আব্বাসী খলিফা মনসুর যখন সে স্থান পরিভ্রমণ করেন তখন প্রথম যুগের নেতা ও নেত্রীরা কোথায় থাকতেন এবং কাজ করতেন তা খুঁজে বের করার জন্য তাঁর একজন তত্ত্বাবধায়ক বা নির্দেশকের প্রয়োজন হয়েছিল।

প্রথম মক্কা অবরোধ (রবিউল আওয়াল, ৬৪ হিজরি; নভেম্বর, ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দ)

সিরীয়রা মদিনাবাসীদের ওপর চরম প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে অভিযান চালায় মক্কার দিকে, যেখানে নিজেকে খলিফা পদে অভিষিক্ত করেছিলেন জুবাইর পুত্র আবদুল্লাহ। সিরীয়রা মক্কার সন্নিকটে উপনীত হয়েই নগরী অবরোধ করে; তারপর যে যুদ্ধ শুরু হল তাতে কাবা ও অন্যান্য পবিত্র প্রাসাদের মারাত্মক ক্ষতি হল। আর এ সময় ঘটল ইয়াজিদের মৃত্যু, ফলে সিরীয়রা অবরোধ তুলে নিয়ে দ্রুত ফিরে যায় দামাসকাসে।

হারবিয় বংশের পরিসমাপ্তি

ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর শান্ত স্বভাবের পুত্র যুবক মুআবিয়া, তিনি পরিবারের অপকর্মগুলো ঘৃণাভরে পরিহার করতেন। কয়েক মাস রাজত্ব করেই তিনি নির্জনবাস গ্রহণ করেন এবং মারাও যান কিছুকাল পরেই। অনুমান করা হয় তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় মুআবিয়ার মৃত্যুর সাথে সাথেই আবু সুফিয়ানের বংশধারার শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। আবু সুফিয়ানের পিতা হারবের নামানুসারে এই বংশকে বলা হয় হারবীয় বংশ, অন্যদিকে মারওয়ানের পিতা হাকামের নামানুসারে হাকাম বংশের[১] উদ্ভব হয়। আমরা খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাব যে প্রথম মুআবিয়ার অল্প বয়স্ক নাতিকে মারওয়ানই কৌশলে সরিয়ে দিয়েছিলেন সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে।

ইয়াজিদের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর সমগ্র হিজাজ, ইরাক ও খোরাসানের খলিফা বলে স্বীকৃত হন। তিনি যদি এ সময় মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়তেন এবং পূর্বের মতো স্পর্ধা ও সাহস নিয়ে সিরিয়া আক্রমণ করতেন, তাহলে উমাইয়া আধিপত্যের যে চির অবসান ঘটত সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকত না। কিন্তু তিনি অলস ও অকর্মন্যভাবে মক্কায় বসে রইলেন এবং উমাইয়াদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সময় ও সুযোগ দিলেন।

---

১. প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে তাদের প্রায়শ মারওয়ান বংশীয়ও বলা হয়।

অধ্যায়-৮
উমাইয়া বংশ [হাকামের শাখা]
[৬৪-৮৬ হিজরি; ৬৮৩-৭০৫ খ্রিস্টাব্দ]

হাকামের পুত্র মারওয়ান—উমাইয়া বংশের নেতা নির্বাচিত : মারজ রাহাতের যুদ্ধ : সিরীয় মুদারদের ধ্বংসসাধন : মারওয়ানের বিশ্বাসঘাতকতা : প্রায়শ্চিত্তকারী সম্প্রদায় : মারওয়ানের মৃত্যু : সিরিয়ার শাসনকর্তা আব্দুল মালিক : মুখতারের অভ্যুত্থান : হুসাইন (রা.) ঘাতকদের ধ্বংসসাধন : মুখতারের মৃত্যু : মুসআব : আবদুল মালিকের ইরাক আক্রমণ : মুসআবের মৃত্যু : আব্দুল মালিকের সেনাবাহিনী কর্তৃক হিজাজ আক্রমণ : মক্কা অবরোধ : জুবাইর-পুত্র আব্দুল্লাহর মৃত্যু : ইসলামের প্রধান হিসেবে আব্দুল মালিক : অত্যাচারী হাজ্জাজ : আফ্রিকায় অগ্রগতি : রোমকদের সাথে যুদ্ধ : খারিজী সম্প্রদায় : আব্দুল মালিকের মৃত্যু

মারওয়ান

দ্বিতীয় মুআবিয়ার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁর ভাই খালিদের উপর শাসনভার গ্রহণের অধিকারী হয়, কিন্তু সে-সময় তিনি একেবারেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকার কারণে উমাইয়ারা তাঁকে তাদের শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করল এবং গোত্রীয় প্রথানুযায়ী একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে (কবীর) নেতৃত্ব প্রদানের দাবি জানানো হল। উমাইয়ারা এই সংকটে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এমনকি তখনকার গোত্রের সবচেয়ে প্রবীণ সদস্য মারওয়ানও আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর-এর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি প্রথম মুআবিয়ার চাচাতো ভাই ছিলেন এবং উমাইয়াদের মধ্যেও বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল; কিন্তু তাঁর আনুগত্যের সাথে সাথে বংশের সম্মতি প্রদানও অবধারিত ছিল। কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক পুত্র জুবাইর আরব, মিশর, ইরাক ও খোরাসানের কর্তৃত্বে গ্রহণে সন্তুষ্ট হয়ে সিরিয়া যেতে অস্বীকার করলেন। এভাবে অলস ও অকর্মন্য অবস্থায় আব্দুল্লাহ যখন মক্কায় অবস্থান করছেন, তখন কুখ্যাত উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ তাঁর শাসনকেন্দ্র বসরায় নিজেকে খলিফার আসনে অধিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হলেন, কিন্ত সে প্রয়াস ব্যর্থ হতেই তিনি মারওয়ানের নিকট পালিয়ে যান এবং তাঁকে সাম্রাজ্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে প্ররোচনা দেন। কিন্তু মারওয়ান কোন সময়ই কাজের ঝামেলা মুক্ত ছিল না; উমাইয়ারা সর্বদা সন্দেহ প্রবণ এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল; মুদার বংশীয়দের প্রাধান্য গ্রহণের ব্যাপারে সিরিয়ার হিময়ার বংশীয়রা ঈর্ষাতুর ছিল। তারপরও মারওয়ানের বয়স তার ষড়যন্ত্র করার প্রতিভাকে নিষ্প্রভ করতে পারেনি। খালিদকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার

প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি খালিদ[১] পক্ষীয়দের সমর্থন লাভ করেন; একই ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে তিনি তার নিজের চাচাতো ভাই আমরের[২] আনুগত্যও সুনিশ্চিত করলেন, কারণ গোত্রে তাঁর যথেষ্ট অনুগামী ছিল। উদারভাবে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তিনি সিরিয়ার হিময়ার বংশীয় নেতাদেরকেও নিজের বশে আনলেন। এভাবেই মারওয়ান তাঁর কাঙ্ক্ষিত ক্ষমতা লাভ করলেন। মাসউদি বর্ণনা করেন, 'তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সিংহাসন দখল করেছিলেন তরবারীর সাহায্যে।' সিরিয়ার হিময়ার বংশীয়রা আনুগত্য লাভ করার কারণে মারওয়ান জুবাইর-পুত্র আব্দুল্লাহকে সমর্থন প্রদানকারী মুদারবংশীয় নেতা জাহহাকের বিরুদ্ধে অভিযান করতে সক্ষম হন।

মারজ রাহাতের যুদ্ধ

দামাসকাসের উত্তর-পূর্বে কয়েক মাইল দূরে মারজ রাহাত নামক স্থানে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হিময়াররা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও প্রথম যুদ্ধ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়, কিন্তু মারওয়ানের ফন্দিতে বিপক্ষীয় নেতা জাহহাক নিহত হন; তারপর যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে মুদারবংশীয়রা সম্পূর্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এবার গোটা সিরিয়া মারওয়ানের শাসনাধীনে চলে আসে এবং কিছুদিনের মধ্যে মিশরও তার হাতে চলে আসে। নিজের অবস্থা যথেষ্ট মজবুত দেখে মারওয়ান খালিদের প্রতি দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন এবং আমর যাকে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, নিজের পুত্র আবদুল মালিক ও আবদুল আজিজের স্বপক্ষে সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করার জন্য তার প্রতিও বল প্রয়োগ করলেন।

মারজ রাহাতের যুদ্ধের সাথে সাথে হিময়ার ও মুদারবংশীয়দের এতকাল সুপ্ত থাকা ধ্বংসাত্মক গোত্র-বিবাদ আবার প্রতিহিংসার সমস্ত শিখায় প্রজ্জ্বলিত হল। এবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল হিময়ারবংশীয়রা এবং তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করতে লাগল। আর তা মোটামুটিভাবে মারওয়ানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আবদুল মালিকের সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

প্রায়শ্চিত্তকারী সম্প্রদায়

এই সময় ইরাকবাসীদের একটি বড় অংশ ইমাম হুসাইন (রা.) ও তাঁর পরিবারবর্গকে সর্বনাশা কারবালা প্রান্তরে পরিত্যাগ করে আসার কারণে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর হত্যাকরীদের বিরুদ্ধে সমুচিত প্রতিশোধ নেবার শপথ গ্রহণ করে অস্ত্রধারণ করে। এক রাতে তাঁর সমাধির পাশে প্রার্থনা ও অশ্রুপাত করে পরদিন সকালে সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল। তারা নিজেদেরকে 'প্রায়শ্চিত্তকারী সম্প্রদায়' বলত; তাদের নেতা সুলায়মানের[৩] নেতৃত্বে তারা বিনা বাধায় অগ্রসর হলেও মারওয়ান প্রেরিত বিশাল

---

১. ইয়াজিদের ছোট ছেলে।

২. আমর ও মারওয়ানের আত্মীয়তার সম্পর্ক : উমাইয়ার পুত্র আবুল আস; আবুল আস-এর দুই পুত্র যথাক্রমে–হাকাম ও সাঈদ; আর হাকামের পুত্র মারওয়ান এবং সাঈদ-এর পুত্র আমর।

৩. সাররাদের পুত্র সুলায়মান রসূলুল্লাহ (স.)-এর সহচর হিসেবে অীব শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

বাহিনীর কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। সুলায়মান ও তাঁর সহকারীরা নিহত হল এবং 'প্রায়শ্চিত্তকারী সম্প্রদায়'এর বিধ্বস্ত অবশিষ্ট অংশ পশ্চাদপসরণ করে কুফায় ফিরে আসল। এখানে তারা পরবর্তীকালে আর একজন 'প্রতিশোধ গ্রহণকারী' মুখতারের সাথে যোগ দেয়।

মারওয়ানের মৃত্যু (৬৫ হিজরি)

ইয়াজিদের বিধবা স্ত্রীর হাতে মারওয়ানের মৃত্যুতে এক ষড়যন্ত্রময় ও অত্যাচারী শাসকের জীবনের যথাযথ পরিসমাপ্তি ঘটে। খালিদ সমর্থনকারীদের খুশি করার উদ্দেশ্যে মারওয়ান এই মহিলার সাথে বিবাহ করেছিলেন। যে বালককে তিনি সিংহাসন থেকে অপসারিত করেছিলেন, একদিন তাকেই চরমভাবে অপমান করলেন; তারপর সে-রাতেই তার ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ মাতার হাতে তিনি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। সুন্নী সম্প্রদায় তাদের খলিফা (আমিরুল মুমিনীন) হিসেবে মারওয়ানকে স্বীকার করতেন না। তাঁদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিগণ তাঁকে জুবাইর-পুত্র আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীকারী হিসেবে গণ্য করেছেন, শুধুমাত্র সিরিয়া ব্যতীত 'যাঁর (আব্দুল্লাহ) কর্তৃত্ব ইসলামের সমস্ত ধর্মীয় মঞ্চ থেকে স্বীকৃত হয়েছিল।' তাছাড়া তাঁরা 'তাঁর (মারওয়ান) কতৃক পুত্রদের জন্য সম্পাদিত চুক্তিকে আইন সম্মত' বলে মনে করতেন না, তারপরও জুবাইর-পুত্র নিহত হওয়ার পর থেকে তাঁরা আবদুল মালিকের খিলাফত গ্রহণকে ন্যায়সঙ্গত হিসেবে গ্রহণ করেন।

আব্দুল মালিক

মারওয়ানের মৃত্যুর পর আব্দুল মালিককে গোত্রের অধিকাংশ লোক তাদের শাসনকর্তা হিসেবে স্বীকার করে নেয়। উদ্যমী, কুচক্রী ও বিবেকহীন আব্দুল মালিক ছিলেন উমাইয়া বংশের যোগ্য প্রতীক যিনি তাঁর অবস্থাকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে অসাধারণ দক্ষতায় নিজের আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

মুখতার

তিনি (আব্দুল মালিক) যখন এই কাজে ব্যস্ত, মুখতার তখন নিজেকে ইরাকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেখান থেকে ইমাম হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকারীদের খুঁজতে থাকেন। তাদেরকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় এবং কীট-পতঙ্গের মতো হত্যা করা হয়। আব্দুল মালিক 'নরপিশাচের'[১] নেতৃত্বাধীন একটি বাহিনী প্রেরণ করে যা ধ্বংস হল আর সে নিজেও নিহত হল এবং মুখতারের নিকটে তার মস্তক নিয়ে যাওয়া হল। যে উদ্দেশ্যে অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা অস্ত্রধারণ করেছিল তা সিদ্ধ হওয়ার পর 'প্রতিশোধ-গ্রহণকারী'দের মধ্যে দলাদলি দেখা দেয় এবং তারা আবদুল্লাহর ভাই ও ইরাকের শাসনকর্তা মুসআবের কাছে একের পর এক পরাভূত হল। মুখতারের বিরুদ্ধে লড়াই দীর্ঘকালীন ও রক্তক্ষয়ী হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'প্রতিশোধগ্রহণকারীরা' নিহত হলেন,

---

১. উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ।

তাঁর অনুগামীরাও তরবারির তলে পতিত হল এবং মুসআব হয়ে উঠলেন ভূখণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি। জুবাইর-পুত্রের কর্তৃত্ব এবার ইরাক ও মেসোপটেমিয়া উভয় স্থানেই প্রশ্নহীন হয়ে উঠল। খোরাসানও চলে এল তাঁর অধীনে। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা অনিশ্চিত বনিয়াদের উপর স্থাপিত হয়। ইরাকীরা বিশ্বাসঘাতক ছিল, তারা কিছু পুরস্কারের লোভে আব্দুল মালিককে শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য তাঁর সাথে গোপন আলাপ-আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়। ইতোমধ্যে আব্দুল্লাহর সৈন্যদল খারিজীদের সাথে বিরামহীন যুদ্ধ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ে। মরুভূমির ঘাঁটিগুলো থেকে খারিজীরা বেরিয়ে এসে কালদীয়া ও দক্ষিণ পারস্যের নিরাপরাধ অধিবাসীদের উপর লুঠতরাজ ও নৃশংস অত্যাচার চালচ্ছিল। ধর্মীয় উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে এই গোড়া ধর্মান্ধের দল সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সুসংঘবদ্ধ হয়ে জঘন্য নিষ্ঠুরতা চালিয়েছিল। আরব ঐতিহাসিকরা ৭১ হিজরিতে হজের[১] সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যা এ সময়ের মুসলিম জগতের অনৈক্য সম্পর্কে অবগত করে। আরাফাত[২] ময়দানে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে চারটি দলের চারটি আলাদা আলাদা পতাকা প্রদর্শন করা হয়েছিল। যার প্রথমটি জুবাইর-এর পুত্র আব্দুল্লাহর, দ্বিতীয়টি মারওয়ান-পুত্র আব্দুল মালিকের, তৃতীয়টি মুহম্মদ আল-হানাফিয়ার[৩] এবং চতুর্থটি বিদ্রোহী খারিজীদের। দলীয় লোকেরা প্রতিটি পতাকার চারিদিকে সমবেত হয়েছিল, কিন্তু পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও এই পবিত্র যুদ্ধ-বিরতির সময় কালে কেউই অপরকে আক্রমণ করেনি।

আমর-বিন-সাঈদের হত্যা (৭০ হিজরি) :

আবদুল মালিক অবিরাম তরবারি পরিচালনার মাধ্যমে কয়েক বছরের মধ্যেই সিরিয়াকে শত্রুমুক্ত করলেন। সাঈদের পুত্র আমর বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রলোভন দেখিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে আবদুল মালিক তাঁকে নিজের হাতে হত্যা করেন। দামাসকাসে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি মেসোপটেমিয়া ও কালদীয়ার দিকে দৃষ্টি প্রদান করেন, যে অঞ্চলগুলো আব্দুল্লাহ বিন জুবাইয়ের পক্ষে মুসআব দখল করে রেখেছিলেন। ইরাকীদের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে কুফা যাত্রা করতে অনুপ্রাণিত করে। যুদ্ধে মুসআব, তাঁর পুত্র ইয়াহিয়া এবং তাঁর বীর সহকারী আল-আশতারের[৪] পুত্র ইব্রাহিম নিহত হয় এবং ইরাক আবার উমাইয়াদের শাসনাধীনে চলে আসে।

---

১. মক্কায় বাৎসরিক তীর্থযাত্রা।

২. মক্কার নিকটবর্তী পাহাড়, যেখানে (হজের) শেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

৩. হানিফা গোত্রের এক মহিলার গর্ভজাত খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র, ফাতিমা (রা.)-এর মৃত্যুর পর যাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। মহম্মদ (মায়ের গোত্র অনুসারে তাঁকে আল-হানাফিয়া বলা হত) ইমাম হুসাইন (রা.)-এর সাথে সর্বনাশা কারবালা প্রান্তরে উপস্থিত ছিলেন না এবং এভাবে তাঁর পরিবারের হত্যাকাণ্ড থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই আব্বাসীয়রা খিলাফত দাবি করেছিল; পরে দ্রষ্টব্য।

৪. সিফ্ফিনের যুদ্ধে খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। তাঁকে আরবদের মার্শাল নে বলা হয়।

দ্বিতীয়বার মক্কা অবরোধ (৭২ হিজরি; ৬৯১ খ্রিস্টাব্দ)

মুসআবকে ধ্বংস করার পর আব্দুল মালিক আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ইউসুফের পুত্র হাজ্জাজের অধীনে এক বিশাল বাহিনী হিজাজের দিকে অগ্রসর হল। কোন বিশেষ বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই মদিনা দখল করা হল এবং মক্কাকে আবার ঘেরাও করা হল; পবিত্র নগরীতে বর্ষিত হতে লাগল পর্বতরাজীর উপর স্থাপিত ক্ষেপণযন্ত্র থেকে বিশালাকার ক্ষেপণাস্ত্রগুলো, যা চারদিকে সর্বনাশ ও ধ্বংসের করাল গ্রাস বিস্তার করল কিন্তু বারবার বেষ্টনী ভেদ করার মাধ্যমে আব্দুল্লাহ অনেকক্ষণ সিরীয়দের আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। ঘেরাও তখন অবরোধে পরিণত হল, অধিবাসীরা ক্ষুধার তাড়নায় ভুগতে লাগল, অনেক লোক তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেল, আর আব্দুল্লাহ পড়ে রইলেন সামান্য কিছু রক্ষী নিয়ে। শেষবারের মতো অবরোধ ভেদ করার পূর্বে তিনি ঘৃণ্য উমাইয়াদের দাসত্ব স্বীকার করবেন, না যুদ্ধ করে প্রাণ দেবেন তা জানার জন্য তিনি তাঁর মা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা আসমার নিকট পরামর্শ চাইলেন। বর্ষীয়ান মহিলা আরব জননীর বীরোচিত উদ্দীপনায় জবাব দিয়ে বললেন যদি সে নিজের কাজ ন্যায়সঙ্গত হিসেবে বিশ্বাস করে তাহলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করাই তার কর্তব্য; কিন্তু যদি মনে হয় যে সে অন্যায় করছে তাহলে তার জন্য বশ্যতা স্বীকার করাই উচিত। তাঁর (আবদুল্লাহর) মৃত্যুর পর শত্রুরা তার মৃতদেহের অবমাননা করবে এই আশংকা করলে তিনি তাঁকে এই বলে সান্তনা প্রদান করলেন যে, যখন আত্মা সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে যায়, তখন দেহের যে কোন পরিণামই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

আবদুল্লাহর মৃত্যু (জমাদিউস সানি, ৭৩ হিজরি; অক্টোবর, ৬৯২ খ্রিস্টাব্দ)

তিনি বিদায়ের সময় অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে মায়ের ললাট চুম্বন করলেন, তারপর হয় মারব নাইলে মরব এই প্রতিজ্ঞা করে তরবারী হাতে বেরিয়ে পড়লেন। উমাইয়ারা প্রায় সবদিক দিয়েই পিছু হটতে লাগল, কিন্তু বীর যোদ্ধা শেষ পর্যন্ত সংখ্যাধিক শক্তির দাপটে নিহত হলেন। সাধারণত কোন সৈনিক একা যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলে বীরহৃদয় শত্রুরা তাঁকে বীরের মর্যাদা প্রদান করে। কিন্তু সিরীয়দের মধ্যে কোনো বীরোচিত সৌজন্যবোধ না থাকার কারণে তারা 'মৃতকে সম্মান প্রদান করো' রসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর এই আদেশ অগ্রাহ্য করল। আবদুল্লাহর মা পুত্রের দেহ সমাহিত করার জন্য আবেদন করলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করল এবং সেকালের হিংস্র উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তারা তাঁর মৃতদেহকে শূলবিদ্ধ করল। মদিনায়তে আবদুল্লাহ ও তাঁর দলের দুজন নেতার মাথা প্রদর্শিত করানোর পর তা দামাসকাসে পাঠানো হল।

আবদুল্লাহর চরিত্রের অনেক কিছুই প্রশংসনীয় ছিল যার মধ্যে কুশলী ও উচ্চাকাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও বীরোচিত প্রকৃতি ও প্রখর ন্যায়ানুবর্তিতা তাঁকে তাঁর অধিকাংশ সমকক্ষ ব্যক্তিদের থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিল। কৃপণতা তাঁর চরিত্রের একটি অন্যতম প্রধান দোষ ছিল সম্ভবত যা তাঁর পতনেরও কারণ হয়েছিল। এমনকি হাজ্জাজ যখন তাঁর দ্বারদেশে আঘাত হানছেন, তখনো তিনি সেনাদেরকে বেতন প্রদান বা যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ের জন্য তাঁর মজুতকৃত ধন-সম্পদ খরচ করতে অস্বীকার করেছিলেন। দুইটি পবিত্র নগরী

(হারামাইন-শারীফাইন) দখলে থাকার কারণে সুন্নীরা আবদুল্লাহকে ইসলামের একজন আইনসঙ্গত খলিফা হিসেবে স্বীকার করেছিল এবং তাঁর নামে মদিনা ও মক্কার ধর্মীয় মঞ্চ থেকে খুতবা পড়া হত।

আব্দুল মালিক সাম্রাজ্যের অবিসংবাদিত অধিপতি

আব্দুল মালিক এবার হয়ে উঠলেন ইসলামী সাম্রাজ্যের এক অবিসংবাদিত অধিপতি। এরপর দক্ষিণ পারস্যে আবদুল্লাহ বিন জুবাইয়ের সহকারী আবু সুফরার পুত্র মুহাল্লিব আব্দুল মালিকের সাথে বিরোধিতা করা নিরর্থক মনে করে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। খোরাসানের রাজপ্রতিনিধি যিনি মুহাল্লিবের চেয়ে কম বাধ্য ছিলেন তিনি আব্দুল মালিকের বশ্যতা স্বীকারের দাবির জবাবে তাঁর প্রেরিত দূতকে তার প্রভুর পত্র গলাধঃকরণ করিয়ে তাকে দামাসকাসে ফেরত পাঠালেন।

খারিজি সম্প্রদায়

খারিজিরা আবদুল্লাহ ও আব্দুল মালিকের মধ্যে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শক্তি সঞ্চয় করে এবং নিজেদেরকে দক্ষিণ পারস্য ও কালদীয়ায় ছড়িয়ে দেয়। উমাইয়া শাসনকর্তাদের নির্মম নির্যাতনের প্রতিবাদে তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দুর্দান্ত লড়াই করে। উপর্যুপরি এই মুষ্টিমেয়রাই আব্দুল মালিকের বিরাট বাহিনীকে পরাজিতও করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো প্রকার সংহতি বা ঐক্য ছিল না। কেউ কেউ আকাঙ্ক্ষা করত যে তারা হযরত উমর (রা.)-এর আমলের মতো জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত কোনো খলিফার অধীনে থাকবে; তাদের মধ্যে যারা স্বর্গীয় শাসনের সমর্থন করত তারা সব ধরনের ব্যক্তিগত শাসন ব্যবস্থা অস্বীকার করত এবং প্রবীণ মন্ত্রণা পরিষদের অধীনে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি করত। অবশেষে তারাও পরাভূত ও অবদমিত হল। তারা পারস্যের মুহাল্লিবের মধ্যে উপযুক্ত জুড়ির সাক্ষাৎ পায়, আব্দুল মালিক যাঁর সামরিক প্রতিভাকে অত্যন্ত সমাদর করত। তিনি দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর তাদের ঘাঁটিগুলোকে ধ্বংস করেছিলেন এবং তারা তাঁর তরবারীর আঘাতে নিহত হয়েছিল। অবশিষ্টরা আবার আশ্রয় নিয়েছিল আল-আহসার মরুভূমিতে।

রোমকদের সাথে যুদ্ধ

ইসলামী রাজ্যে অনুপ্রবেশ করার জন্য খারিজিদের মতো রোমকরাও গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়েছিল। এবার আবদুল মালিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে পিছু হঠাতে সামর্থ হয় এবং ধারাবাহিকভাবে একের পর এক সফল অভিযানের মাধ্যমে বাইজান্টাইন সম্রাটের নিকট হতে বিশাল অঞ্চল নিজের অধীনে নিয়ে আসে। তাছাড়া পূর্বদিকের আধুনিক কাবুলের অঞ্চলগুলোও দখলে আসে যা রাতবিল নামে একজন হিন্দু রাজার শাসনাধীনে ছিল। একইভাবে উত্তর আফ্রিকার এক বৃহৎ অংশ জয় কিংবা পুনর্বিজয় করা হল।

বার্বারি রাজ্য পুনর্দখল

আরবদের আফ্রিকা বিজয় ছিল রোমান্টিকতায় ভরপুর। আবদুল মালিক ৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে (৬৯ হিজরি) বার্বারি (ইফ্রিকিয়া) রাজ্যকে পুনর্দখল করার জন্য তাঁর সেনাবাহিনী পাঠান। উকবার সুযোগ্য সহকারী জুহাইরের উপর যার নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, যিনি তাঁর নেতা নিহত হওয়ার পর থেকে চরম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বার্কায় আত্মরক্ষা করছিলেন। তিনি তাঁর প্রথম অভিযানেই বিশেষভবে সফল হলেন; বিদ্রোহী নেতা কোসেইলা নিহত হল, ধ্বংস হল বার্বার ও রোমকদের সম্মিলিত বাহিনী এবং শত্রুমুক্ত করা হল সমগ্র প্রদেশ। এবার কিন্তু জুহাইর একটি মারাত্মক ভুল করে বসলেন। বার্কার নিকটবর্তী যে স্থানে তিনি প্রধান সেনানিবাস স্থাপন করেছিলেন, সেখানে একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে নিজের কাছে রেখে তিনি দূরবর্তী অংশগুলো দখল করতে অভিযান পরিচালনা করলেন। এই সংকটপূর্ণ অবস্থায় গোপন খবর সংগ্রহ করতে না পারার কারণে এক বিশাল রোমক বাহিনী জলপথ দিয়ে এসে তাঁকে পেছন থেকে অতর্কিতে আক্রমন করল। বেপরোয়া যুদ্ধ হল; নিহত হলেন আরব সেনাপ্রধান এবং তাঁর সেনারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বার্বারি রাজ্য মুসলমানদের হাত থেকে আবারও ফসকে গেল। কিন্তু আবদুল মালিক যে নিষ্ঠা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে মতলব হাসিলের জন্য প্রয়োগ করেছিল তা তাঁকে সাফল্য এনে দিয়েছিল আর এক্ষেত্রেও তা ব্যর্থ হল না। তিনি নোমানের পুত্র হাসসানের নেতৃত্বে তৃতীয়বারের মত সেনাবাহিনী পাঠালেন, যেটা সময়ের ব্যবধানে এর সামনে আসা সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে ঝাঁটিয়ে সরিয়ে দেয়; কায়রোয়াঁন পুনর্দখল করা হয়; কার্থেজ নগরী আক্রমন করা হল এবং রোমক ও বার্বাররা সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হল। অবশিষ্ট রোমক সেনারা তড়িঘড়ি করে দেশ পরিত্যাগ করে এবং আরবরা আবার আধিপত্য বিস্তার করে বার্কার প্রাচীর থেকে আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত।

কাহিনা

এ সময় বার্বার ও আটলাস পর্বতের বন্য পাহাড়ী অধিবাসীরা এক মহিলার অনুগত্য স্বীকার করত, যাঁকে আরব ঐতিহাসিকরা 'কাহিনা' (দৈবশক্তি-সম্পন্না) নামে অভিহিত করেছেন। এই বার্বার পুরোহিতকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্না হিসেবে ধারণা করা হত এবং তাঁর ডাকে একদল নুমিড ও অন্যান্য অসভ্য লোকজন দ্রুত বিজয়ীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্বাভাবিকভাবেই আরবরা অসহায় হয়ে পড়ল; কয়েকটি বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং প্রধান বাহিনী আর একবার বার্কায় ফিরে যেতে বাধ্য হল। 'কাহিনা' পাঁচ বছর যাবৎ আফ্রিকার রাণী ছিলেন। হিজরি ৭৯ সালে আব্দুল মালিক হাসসানকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আরেকটি বাহিনী পাঠালেন। সে সময়ে একপক্ষ প্রাচীন গাদা বন্দুক বা ততোধিক সেকেলে দীপ-শলাকা বিশিষ্ট মারণাস্ত্রের অধিকারী ছিল না এবং অন্যপক্ষের নিকট দ্রুত অনলবর্ষী মেশিনগান ও রাইফেল বিদ্যমান ছিল । প্রকৃতপক্ষে যেসব অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ হয়েছিল তাতে বার্বার ও আরবরা পরস্পরের সমকক্ষ ছিল; যদিও সাজসজ্জা, সংগঠন ও শৃঙ্খলার দিক দিয়ে শেষোক্তরা বিদ্রোহী শত্রুদের তুলনায় এগিয়ে ছিল। সাহস, উদ্যম, অধ্যাবসায় এবং শৌর্য ও ধর্মবিশ্বাসের উপর সীমাহীন আস্থা এই

গুণগুলোর মধ্যেই তাদের বিশাল উৎকর্ষতা নিহিত ছিল। প্রাচীন বা আধুনিক যুগের ইতিহাসে যার সাথে তুলনা করার মত দৃষ্টান্ত খুব সামান্যই রয়েছে। আব্দুল মালিকের সেনাবাহিনী উত্তাল তরঙ্গ বেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া জলজাহাজের মত নুমিডদের প্রতিরোধ ভেদ করে সামনে অগ্রসর হল। বার্বার পুরোহিত অদম্য আরব নেতার অগ্রগতি রোধ করার জন্য এবং নগরীর ঐশর্য যার প্রতি তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল তা থেকে তাঁকে শেষবারের মতো বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে তিনি দেশকে একটি মরুভূমিতে পরিণত করবেন। তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকা সমগ্র এলাকা বিধ্বস্ত করার হুকুম দিলেন। ধ্বংস করা হল অট্টালিকা ও প্রাসাদগুলো; পর্বত ডিঙিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এমন সব মূল্যবান সামগ্রীও চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হল; গ্রাম ও নগরগুলোকে ধ্বংস করা হল; কেটে ফেলা হল বন ও বাগানগুলো এবং এককালের সমৃদ্ধশালী দেশ কুকুর-শেয়ালের চিৎকারপূর্ণ জনহীন উষর প্রান্তরে পরিণত হল। আরব ঐতিহাসিকগণ রোমকরা বা ভ্যান্ডাল রাজ জেনসেরিকের ধ্বংস ও বিনাশযজ্ঞের কথা বাদ দিলে একেই 'আফ্রিকার প্রথম ধ্বংসযজ্ঞ' বলে অভিহিত করেন।

কাহিনার পরাজয় ও মৃত্যু

যাহোক পুরোহিতের এই বর্বরতা কোন কাজে আসল না। সেখানকার অধিবাসীরা হাস্সানকে তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে অভিনন্দিত করলেন; শীঘ্রই শ্রীহীন ও বিধ্বস্ত নগরীগুলো আবার তার অধীনতা স্বীকার করল এবং একই সাথে সেখানকার লোকজনও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল। আর কাহিনা এক ভয়ংকর যুদ্ধে অ্যাটলাস পর্বতের পাদদেশে পরাজিত ও নিহত হলেন। বার্বাররা আবরদের অদম্য নিষ্ঠা দেখে শ্রান্ত হয়ে শান্তির জন্য আবেদন করলে আরব সেনাপতিকে ২৫ হাজার সহকারী অশ্বারোহী সেনা সরবরাহ করবে এই শর্তে তা মেনে নেওয়া হল । ইসলাম ধর্ম এবার বার্বার জাতির মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পারস্য ও আরব থেকে বিতাড়িত খারিজীরা দলে দলে আফ্রিকায় প্রবেশ করতে শুরু করল। দামাসকাস সরকারের প্রতি তাদের ঘৃণা আর বার্বারদের অনুভূতি ও ভাবধারার সাথে এবার এক সুরে বেজে উঠল তাদের সংকীর্ণ ও গোড়া মনোভাব এবং একক ও প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ। স্বর্গীয় শাসনের সমর্থক ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আব্দুল মালিক ও তাঁর সহকারীদের আক্রমণের শিকার হয়ে এবার প্রতিষ্ঠিত হল সম্মিলিত দলের[১] নেতৃত্বে। সুতরাং তাদের শিক্ষাই ছিল আফ্রিকার বার্বারদের লাগাতার ও রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহের মূল কারণ।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

হিজাজের শাসনকর্তা হাজ্জাজ এক সময় ইরাক, সিজিস্তান, কারমান এবং কাবুল ও ট্রানসক্সিয়ানার অংশবিশেষ সহ খোরাসানে আব্দুল মালিকের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। আর পশ্চিম আরব ইসমাঈলের পুত্র হিশাম নামে একজন পৃথক শাসনকর্তার

---

১. পরবর্তীকালে আফ্রিকার 'মাহদী' সম্প্রদায় প্রাচীন খারিজীদের বংশধর বলে মনে হয়।

অধীনস্থ ছিল, অন্যদিকে মিশর শাসন করতেন আব্দুল মালিকের ভাই আব্দুল আজিজ। হাজ্জাজের অসহ্য ও পাশবিক নির্যাতনের প্রতিবাদে বড় ধরনের বেশ কয়েকটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, যার মধ্যে আল-আসের পুত্র আবদুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহ ছিল অন্যতম যাতে আবদুল মালিক প্রায় সিংহাসন হারাতে বসেছিলেন। কিন্তু সংখ্যা ও অধ্যাবসায় থাকার কারণে সমস্ত বিপত্তি দূর হয় এবং বিদ্রোহীরা বিতাড়িত হয়ে দূরদেশে আশ্রয় নেয়। হাজ্জাজ কতৃক হিজাজের শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব নেবার পর তিনি মদিনাবাসীদের ওপর নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করেছিলেন এবং রসুলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবিত সহচরদের সাথেও দুর্ব্যবহার করেছিলেন। এক সময় তিনি নগরীটিকে ভূমিসাৎ করার কথাও চিন্তা করেছিলেন। ইরাকের দীর্ঘ শাসনকালে তিনি প্রায় ১,৫০,০০০ লোককে হত্যা করেন যার মধ্যে অধিকাংশ লোককেই হত্যা করা হয় মিথ্যা অভিযোগে। এমনকি এর মধ্যে কেউ কেউ আরব জাতির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালে ৫০,০০০ নারী-পুরুষকে কয়েদখানায় পচতে দেখা যায়, যারা অত্যাচারী এই শাসককে অভিশাপ দিচ্ছিল। এসব গণহারে হত্যাকাণ্ডের ফলাফল বর্ণনা করে এম. সিডিলট উল্লেখ করেন, 'আরব জাতি এতে তার মহান ও যোগ্য নেতাদের হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।'

খোরাসানে হাজ্জাজের সহকারী এবং খারিজী সম্প্রদায়কে দমনকারী মুহাল্লিব ৭০৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। জনৈক আরব কবি বর্ণনা করেছেন, 'তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই বদান্যতা ও বন্ধুত্বের মৃত্যু হয়।' তাঁর পদে তাঁর পুত্র ইয়াজিদ অভিষিক্ত হয়েছিলেন, তাঁর প্রতিও হাজ্জাজ কিছুদিন একই অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন।

আব্দুল মালিকের মৃত্যু (৭০৫ খ্রিস্টাব্দ)

আব্দুল মালিক ৬২ বছর বয়সে ৮৬ হিজরি সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন কাব্যপ্রেমী, বিশেষভাবে সে কাব্যে যদিও তাঁর স্তুতি বাক্য থাকত। তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লোভ ও নির্মমতা এবং মাসউদি বর্ণনা করেন, তাঁর সহকারীরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেপরোয়াভাবে রক্তপাত ঘটাতেন। আব্দুল মালিক সম্পর্কে বলা হয় যে, তরুণ বয়সে তিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনে অনেক সময় ব্যয় করতেন; কিন্তু কোরআন পাঠরত অবস্থায় যখনই তাঁর কাছে ঘোষণা করা হয় যে, তিনি তাঁর পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন, তখনই তিনি কোরআন শরীফ এক পাশে সরিয়ে রেখে দিয়ে তিনি মন্তব্য করেন যে, 'তোমার সাথে এটাই আমার শেষ সাক্ষাৎ!' বর্ষপঞ্জি রচয়িতা বলেন, ইসলামে তিনিই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন আর তিনিই প্রথম যে খলিফার সামনে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বিচারের ক্ষেত্রে কোনো পরামর্শ দান এই বলে নিষিদ্ধ করেছিলেন যে, 'কেউ যেন আমাকে আল্লাহর ভয় বা ন্যায়বিচার-প্রেমের কথা বলে আদেশ না দেয়, তাহলে আমি তার ঘাড় থেকে মস্তক কেটে আলাদা করে ফেলব।' চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন শার্লেমানের মত ন্যায়বিচারক, তবে সে বিচার যদি তার বংশের স্বার্থের পরিপন্থী না হত; নির্ভিক ও উদ্যমী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তিনি অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কখনই

কোনো কিছু করতে পিছু পা হতেন না। তবে নিশ্চয়ই শার্লেমানের থেকে তিনি কিছুটা কম নিষ্ঠুর ছিলেন। খ্রিস্টান বা স্যাকসনদেরকে নির্বিচারে হত্যার মতো এমন কোনো নিষ্ঠুর কাজের জন্য তাঁকে দায়ী করা যাবে না। তাঁকে শার্লেমান বা রাশিয়ার পিটার দ্য গ্রেটের সাথে তুলনা করলেও তাঁকেই উত্তম বলতে হবে। তিনি মুসআব ও আব্দুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার পূর্বে তিনি তাঁদের কাছে বারবার সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বংশের স্বার্থরক্ষা ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য ব্যাকুলতাই ছিল তাঁর প্রতিবারের বিশ্বাসভঙ্গের মতো তাঁর নিষ্ঠুরতারও মূল কারণ। তারপরও হিংস্র হাজ্জাজের নিষ্ঠুরতার দায়িত্ব থেকে তাঁকে কোনো কিছুই অব্যাহতি প্রদান করতে পারে নি, যদিও আক্রান্তদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনি মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করতেন। আবদুল মালিকই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামী শাসনব্যবস্থায় টাকশাল প্রবর্তন করেন। তাঁর শাসনামল থেকেই আরব শাসকরা মুদ্রামান ঠিক রাখতে ও জালিয়াতি প্রতিরোধ করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ওঠেন। মুদ্রা জালিয়াতির শাস্তি অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছিল। সমস্ত সরকারি খাতা এবং খাজনার নথিপত্র আব্দুল মালিকের সময় পর্যন্ত গ্রিক কিংবা পারসি ভাষায় লেখা হত। এই ব্যবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার কারণে তিনি এরপর থেকে সমস্ত নথিপত্র আরবি ভাষায় লেখার নির্দেশ দেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি পরামর্শের মাধ্যমে তাঁর পুত্র ওয়ালিদের স্বপক্ষে তাঁর ভাই আব্দুল আজিজকে উত্তরাধিকার ত্যাগ করানোর চেষ্টা করেছিলেন। যদিও আব্দুল আজিজ তা করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন; আর অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হওয়ার কারণে ওয়ালিদ কোন প্রকার বাধা ছাড়ায় সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেন।

আব্দুল মালিকের সমকালীন বাইজান্টিয়াম সম্রাট

কনস্ট্যান্টিনোপলের সিংহাসনে পোগোনেটাসের পুত্র অত্যাচারী দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ান[১] আব্দুল মালিকের সমসাময়িক ছিলেন, নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে শত্রুদের ক্ষমা করে দেবার পরামর্শ দেয়া হলে তিনি ঘোষণা করলেন যে 'ক্ষমা করতে বলছ? আমি যদি আমার শত্রুদের একটি মস্তকও রক্ষা করতে সম্মতি দিই তাহলে আমি যেন এই মুহূর্তেই ধ্বংস হয়ে যাই আর সর্বশক্তিমান আমাকে যেন তরঙ্গমালায় নিমজ্জিত করেন।'

---

১. আরবরা আল-আখরাম বা 'নাক কাটা' বলে অভিহিত করত। এই অত্যাচারী একবার পদচ্যুত হলে তাঁর নাক কেটে ফেলা হয় (৬৯৫ খ্রি.)। কয়েক বছর পর তাঁকে আবার সিংহাসনে বসানো হয় এবং ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। মাসউদি উল্লেখ করেন, ফালানাতের পুত্র লাভ এবং জুরজিস ছিলেন আবদুল মালিক, ওয়ালিদ, সুলায়মান ও দ্বিতীয় উমরের সমসাময়িক।

অধ্যায়-৯

উমাইয়া বংশ [হাকামের শাখা]-পুনরাবৃত্তি

[৮৬-৯৬ হিজরি; ৭০৫-৭১৫ খ্রিস্টাব্দ]

প্রথম ওয়ালিদ : পূর্বদিকে রাজ্য বিজয় : আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তার : পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তা মুসা বিন নুসাইর : স্পেনের অবস্থা : রডারিকের অত্যাচার : তারিক বিন জিয়াদের জিব্রাল্টারে অবতরণ : মেডিনা সিডোনিয়ার যুদ্ধ : রডারিকের মৃত্য : স্পেন বিজয় : ফ্রান্সে অগ্রগতি : মুসা ও তারিকের অপসারণ : স্পেনে আরব প্রশাসনের প্রকৃতি: প্রদেশসমূহ : গোত্র-বিদ্বেষের ফল : প্রথম ওয়ালিদের মৃত্যু : তাঁর চরিত্র

প্রথম ওয়ালিদ ও তাঁর সিংহাসন লাভ—কোতায়াবা ট্রানসক্সিয়ানা বিজয়

প্রথম ওয়ালিদের সিংহাসন লাভের কিছুদিনের মধ্যেই হাজ্জাজ যিনি তখনো পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর শাসনকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি মুহাল্লিবের পুত্র ও তাঁর উত্তরাধিকারী ইয়াজিদকে খোরাসানের সেনা প্রধানের পদ থেকে অপসারিত করেন এবং তিনি তাঁর জায়গায় কোতায়বা নামে এক মুদার বংশীয় প্রধানকে নিয়োগ প্রদান করেন। ইউরোপের ইতিহাসে আমাদের পড়া আরও অনেকের মতো তিনিও একজন রণকুশলী। সুদক্ষ এই সেনাপতিও কঠোর ও নির্মম প্রকৃতির ছিলেন। সোগদীয় জাতির লোকেরা যারা আকসাস নদীর[১] উত্তরে মধ্য-এশিয়ার দেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলমানদের সাথে শান্তিতে বসবাস করত এবং তাদের ঔপনিবেশিকগণকে উৎপীড়ন না করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এমনকি তারা প্রধান নগরগুলোতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আবাসন কর্মী বা 'আমিল' রাখতেও সম্মত হয়েছিল। কিন্তু ইয়াজিদের অপসারিত হওয়া তাদের কাছে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের অনুকূল সুযোগ বলে মনে হয়। সহসা তারা আরবদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, আবাসন কর্মীদের বহিষ্কার করে এবং ঔপনিবেশিকগণের হত্যা করতে থাকে। সে সময়ে অনুরূপ কার্যকলাপ এশিয়া ও আফ্রিকা উভয় দেশেই একই ফলাফলের সৃষ্টি করে এবং দশ বছরের লাগাতার যুদ্ধ সংঘাতের পর উভয়পক্ষের অসংখ্য নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে কোতায়বা মধ্য এশিয়ার কাশগড় সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকা দখল করতে সমর্থ হয়।

---

১. এই স্থানকে বলা হয় 'মা-ওয়ারা-আন-নাহর'—নদীর অপর পার্শ্বস্থ অঞ্চল।

ভারতবর্ষে রাজ্য জয় (৮৯-৯৬ হিজরি; ৭০৮-৭১৫ খিস্টাব্দ)

প্রায় একই সময়ে মাকরানের শাসনকর্তা কাশিমের পুত্র মুহম্মদ লুটেরা গোত্রের দ্বারা উত্যক্ত হয়; যারা সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত; তারা ভারতবর্ষ আক্রমন করে যা শেষ হয় সিন্ধু, মূলতান এবং বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত পাঞ্জাব প্রদেশের অংশ বিশেষ দখলের মাধ্যমে।

এশিয়া মাইনরের প্রধান সেনাপতি মাসলামাহ

ওয়ালিদের সমগ্র রাজত্বকাল জুড়ে তাঁর ভাই মাসলামাহ যাকে বংশেরই একজন যোদ্ধা হিসেবে মনে করা হয় তিনি এশিয়া মাইনরে মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। ওয়ালিদের পুত্র আব্বাসের অধীনস্থ একটি সৈন্যদল তাঁকে সাহায্য করতেন। তাঁদের যৌথ অভিযানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল অধিকৃত হয়। এ সময়ে এশিয়া মাইনরের একটা বিরাট অংশ আরবদের অধীনে চলে আসে।

হিজাজের শাসনকর্তা উমর বিন আব্দুল আজিজ

৮৭ হিজরি সনে ওয়ালিদ তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল আজিজের পুত্র উমরকে হিজাজের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দান করেন। মদিনায় পৌছামাত্রই নগরীর আইনজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে উমর একটি পরিষদ গঠন করেন এবং তাঁদের সাথে পরামর্শ না করে কোনো প্রশাসনিক কাজই নির্বাহ করা হত না। তিনি ইয়াজিদ ও আব্দুল মালিকের শাসনামলে ইসলামের পবিত্র নগরী দুটোর উপর সৃষ্ট ধ্বংসচিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা করেন। তিনি অসংখ্য সরকারি প্রাসাদ নির্মাণ করে, নতুন পয়ঃপ্রণালী তৈরি করে এবং রাজধানীর সাথে হিজাজের শহরগুলোর সংযোগরক্ষাকারী সড়কগুলোর উন্নতি সাধন করে মদিনা ও মক্কা নগরীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলেন। সংযত অথচ দৃঢ়, জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে উৎসুক উমরের শাসন সকল শ্রেণীর লোকজনের জন্যই মঙ্গলকর হয়েছিল।

উমরের নম্র, ন্যায়ানুবর্তী এবং উদার শাসনে আকৃষ্ট হয় বহুসংখ্যক ইরাকী উদ্বাস্তু, যারা পূর্বাঞ্চলের রক্তপিপাসু স্বৈরাচারী শাসকের (হাজ্জাজের) অত্যাচারে পালিয়ে এসে হিজাজে শান্তি ও আশ্রয় লাভ করেছিল। হাজ্জাজ এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং তীব্রভাবে অভিযোগ করে পাঠান তাঁর প্রভু ওয়ালিদের কাছে। পূর্ববর্তী আবদুল মালিক যেমন তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হতেন ওয়ালদীও সেরূপ তাঁর মতোই প্রভাবাধীন ছিলেন। হাজ্জাজের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং ৯২ হিজরিতে (৭১০-১১ খ্রিস্টাব্দে) উমর সর্বজনীন শোক প্রকাশের মধ্য দিয়ে শাসন কর্তৃতত্ব থেকে অপসারিত হন। তাঁর স্থলবর্তী শাসনকর্তা মদিনা ও মক্কা থেকে সমস্ত ইরাকি উদ্বাস্তুদের বহিষ্কার করে তাঁর পদাভিষেককে বিশিষ্টতা দান করেন।

এই সময় মুহাল্লিব-পুত্র ইয়াজিদকে তাঁর ভাইদের সাথে একত্রে হাজ্জাজ কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং তাদের নিষ্ঠুরতম অত্যাচার ভোগ করতে বাধ্য করেন। অবশেষে, নির্যাতিতরা স্বৈরাচারীর কবল থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন এবং ওয়ালিদের ভাই ও উত্তরাধিকারী সুলায়মানের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তার (৮৯ হিজরি; ৭০৭ খ্রিস্টাব্দ)

এবার আমাদের পশ্চিমদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। পুরোহিতের মৃত্যুর পর হাসসান তুলনামূলকভাবে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আফ্রিকা দখলে রাখেন। ৮৯ হিজরিতে তিনি শাসন কর্তৃত্ব থেকে পদচ্যুত হন এবং নুসাইরের পুত্র বিখ্যাত মুসা ইফ্রিকিয়ার রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। মুসার পিতা মুআবিয়ার অধীনে পুলিশ বিভাগের প্রধান (সাহিব-উস-শুরতা) ছিলেন, কিন্তু সিফফিনের যুদ্ধে তিনি হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেন এবং আবু সুফিয়ানের পুত্র অর্থাৎ মুআবিয়া, যিনি মানুষের প্রকৃত মূল্য বুঝতেন, তিনি তাঁর বিবেক দংশনকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। হাসসানের অপসারণে বার্বারদের মধ্যে বিদ্রোহের সংকেত প্রদান করে, কিন্তু তারা নতুন রাজপ্রতিনিধির উদ্যম ও শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেছিল। স্বয়ং মুসা ও তাঁর পুত্রগণের উপর্যুপরি দুঃসাহসিক অভিযানে বার্বারদের সম্মিলিত শক্তি সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয়, গ্রিক ষড়যন্ত্রকারীরা বিতাড়িত হয় এবং সমগ্র দেশে শান্তি স্থাপিত হয়। দলপতিদের প্রতি শান্তিপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে তিনি তাঁদের অগাধ আস্থা অর্জন করেন এবং তাঁদের সহযোগিতা লাভ করেন। জনসাধারণকে ইসলামের মূলনীতি শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র বার্বার জাতি হযরত মুহম্মদ (স.)-এর ধর্মে দীক্ষিত হয়। ভূমধ্যসাগরের দ্বীপপুঞ্জ থেকে বাইজান্টাইনরা আরব উপনিবেশগুলোকে উত্যক্ত বা বিব্রত করে তুলত বলে মুসা তাদের আয়ত্তে আনার জন্য অভিযান চালান। এর ফলে মেজোর্কা, মিনোর্কা ও ইভিকা বিজিত ও ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুসলিম শাসনে এইসব দ্বীপপুঞ্জ খুব তাড়াতাড়ি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও আরবরা স্থাপন করে সুরম্য অট্টালিকা, বিভিন্ন রকম হস্তশিল্প প্রবর্তন করে এবং অন্যান্য কৌশল অবলম্বনে দেশের বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হয়। আয়তনের দিক দিয়ে মুসার শাসন কর্তৃত্বের সীমা এখন প্রায় হাজ্জাজের সমতুল্য, তবে প্রশাসনিক পারঙ্গমতা ও সামরিক নেতৃত্বের দিক দিয়ে এর গুরুত্ব অনেক বেশি। এই রাজ্যের বিস্তার ছিল মিশরের পশ্চিম সীমান্ত থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছিল ভূমধ্যসাগারের পশ্চিম দিকের দ্বীপসমূহ, ব্যতিক্রম শুধু সিউটা নামক অঞ্চলটুকু, যে অঞ্চল রোমক সম্রাটের পক্ষে স্পেনের গথিক বংশীয় রাজার অধীনে ছিল আর যার শাসন ভার ছিল কাউন্ট জুলিয়ানের ওপর। খুব তাড়াতাড়িই এর সঙ্গে ঐশ্বর্যশালী একটি দেশের চমৎকার সংযোজন ঘটে, যে দেশ ছিল স্বয়ং একটি সাম্রাজ্য।

স্পেন

আফ্রিকা যখন সহনশীলতা ও ন্যায়বিচারের সুফল ভোগ করছে এবং মুসলিম শাসনাধীন থেকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে বৈষয়িক উন্নতির পথে, প্রতিবেশী স্পেন উপদ্বীপ তখন গথদের লৌহকঠোর পদতলে পৃষ্ঠ হয়ে আর্তনাদ করছিল। গথ রাজাগণের দাসত্বের নিষ্পেষণ ও উৎপীড়নে দেশ তথা জনসাধারণের এমন সঙ্গীন ও শোচনীয় অবস্থা আর কোনোকালেই ছিল না। রোমান শাসনকালের মতো ধনী, সম্ভ্রান্ত ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর

লোকেরা মুক্ত ছিলেন সাধারণভাবে কর দান থেকে, পক্ষান্তরে ধ্বংস ও দৈন্যের কবলে ফেলে দেয়া হয়েছিল কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর সরকারি করের বোঝা আরোপ করে। অতিরিক্ত শুল্কের গুরুভার চাপিয়ে শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসার উদ্যোগকে নির্মূল করা হয়েছিল, কোনো কারখানা বা ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল না এবং মুসলমানদের বিতাড়নের সময় পর্যন্ত সমগ্র উপদ্বীপ জুড়ে প্রায় একইভাবে বিরাজ করছিল এক নিদারুণ বন্ধ্যাত্ব। দেশ অসংখ্য খণ্ড রাজ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, যার মালিকরা সাধারণ জনগণ বা যাজক যাই হোক, বাস করতেন রাজকীয় প্রাসাদসম অট্টালিকায়, যেখানে তাঁরা উচ্ছৃঙ্খল ও গর্হিত ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করতেন। কৃষিকর্ম ন্যস্ত হয়েছিল জমির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ভূমিদাসদের হাতে কিংবা দুঃস্থ ক্রীতদাস শ্রেণীর ওপর, যারা কাজ করত নিষ্ঠুর তদারককারীদের নির্দয় কশাঘাতের মধ্য দিয়ে। ভূমিদাস বা ক্রীতদাসের জন্য মৃত্যুর এপারে স্বাধীনতার কোনো আশা বা সুখ-স্বাচ্ছ্য উপভোগের উপায় ছিল না। তাদের কেউই কোনো জিনিসের মালিক বলে নিজেকে দাবি করতে পারত না; এমনকি বিয়েও করতে পারত না প্রভুর অনুমতি ছাড়া। যদি পাশাপাশি দুই জমিদারীর ভূমিদাস পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হত, তবে তাদের সন্তানরা সমানভাবে ভাগ হয়ে যেত দুই মালিকের মধ্যে। নিতান্ত কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে তাদের হতভাগ্য বাস্তব অবস্থার মতো নৈতিক অবস্থাও তেমনি বঞ্চিত ও অধঃপতিত হয়ে গেল।

স্পেনের ইহুদি সম্প্রদায়

বহুসংখ্যক ইহুদি, যারা উপদ্বীপে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা রাজা, ধর্মযাজক ও অভিজাতবর্গের অত্যাচারে নিদারুণ দুর্ভোগে পড়েছিল। নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তারা বিদ্রোহী হওয়ার প্রয়াস পায়, তবে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে এবং হঠকারী সম্পাদনার কারণে যা তাড়াতাড়ি ফললাভে ব্যর্থ হয়। এতে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, যা তাদের অধিকারভুক্ত ছিল তার সবই বাজেয়াপ্ত করা হয়; হত্যাকাণ্ডের পর জাতির যেসব মানুষ বেঁচে ছিল তারা গণহারে গণ্য হয় খ্রিস্টানদের দাস হিসেবে। বৃদ্ধ ও যুবক, নারী ও পুরুষ সকলেই খ্রিস্টানদের দাসে পরিণত হয়। বৃদ্ধদেরকে দয়া প্রদর্শন স্বরূপ স্বধর্মে আস্থা রাখতে দেওয়া হলেও বয়োকনিষ্ঠদেরকে খ্রিস্টধর্মানুসারে প্রতিপালন করা হয়। নিজ সম্প্রদায়ে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় এবং সে-কারণে একজন ইহুদি দাসের বিবাহ হয় একজন খ্রিস্টান দাসের সাথে। দেশের সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী বিশপ বা পুরোহিতরা এভাবে ইহুদিদের প্রতি শাস্তি আরোপ করেছিলেন। দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত নাগরিক, হতভাগ্য ক্রীতদাস, অভাবী ভূমিদাস, নির্যাতিত ও উৎপীড়িত ইহুদি সকলেই দূরাগত মুক্তির অপেক্ষায় দিন গুনছিল। তাদের এই নিদারুণ যন্ত্রণার মুহূর্তে এক অপ্রত্যাশিত দিক থেকে মুক্তি নেমে এল। গথ ও ধর্মযাজকদের উৎপীড়নের শিকার হয়ে প্রণালীর অপর দিকের আরবীয় প্রদেশকে তারা নিরাপত্তার স্বর্গ বলে মনে করত এবং রাজা ও পুরোহিতদের অসহ্য নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ পেতে বহু স্পেনবাসী মুসলিম শাসিত আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এ সময় মুসা যখন আফ্রিকা শাসন করেছিলেন, তখন আইবেরিয়ো (স্পেন ও পর্তুগাল) সিংহাসন দখল করেন রডারিকভ যিনি পূর্ববর্তী রাজা

উইটিজাকে পদচ্যুত ও নিহত করেন। সিউটার শাসনকর্তা জুলিয়ান তাঁর কন্যা ফ্লোরিনডার ওপর রডারিকের অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণে তীব্র মনঃকষ্ট অনুভব করায় যে স্পেনীয় উদ্বাস্তুরা তাদের দেশকে জবর-দখলকারীর দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য মুসার কাছে আবেদন করেছিল, তিনিও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

তারিকের জিব্রাল্টারে অবতরণ (৮ রজব, ৯২ হিজরি; ৩০ এপ্রিল, ৭১১ খ্রি; বৃহস্পতিবার)
তাদের আবেদনের উত্তরে ওয়ালিদের অনুমোদন সাপেক্ষে তারিক নামে এক তরুণ ও উদ্যমী কর্মচারীকে মুসা দক্ষিণ উপকূল পর্যবেক্ষণ করতে পাঠান। অনুকূল পর্যবেক্ষণ তথ্য পাওয়া গেলে শুভ রজব[১] মাসে মুসার অন্যতম পারদর্শী সহকারী জিয়াদের পুত্র তারিক ৭০০০ জন বাছাইকরা লোকের একটি ক্ষুদ্র সেনাদল নিয়ে যে স্থানে[২] অবতরণ করেন সেটি এখন তাঁরই নাম বহন করছে। অভিযানের মূল ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে পর্বতটিকে যথাযথভাবে সুরক্ষিত করে তিনি আক্রমণ শুরু করেন পার্শ্ববর্তী আলজিসিরাস[৩] প্রদেশে, যেটি রডারিকের পক্ষে থিয়োডমির কর্তৃক শাসিত হত। গথগণ তাঁর অগ্রগমন প্রতিহত করতে গিয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তারিক টলেডোতে তাঁর স্মরণীয় অভিযান শুরু করেন।

মেডিনা সিডোনিয়ার যুদ্ধ (রমজান মাসের মাঝামাঝি সময় ৯২ হিজরি; সেপ্টেম্বর, ৭১১ খ্রি.)
রাজপ্রতিনিধি মুসা কর্তৃক প্রেরিত কিছু নতুন সেনার সময়োপযোগী উপস্থিতির ফলে ইতোমধ্যে তারিকের সেনাসংখ্যা পরিণত হয় বারো হাজারে। রডারিক তখন উত্তরাঞ্চলে একটি বিক্ষোভ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি আক্রমণের কথা শুনলেন একটুও বিলম্ব না করে সমস্ত সামন্ত-প্রধানদেরকে তাঁদের সেনাবাহিনীসহ কর্ডোভায় তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার আদেশ দিয়ে তিনি দ্রুত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। রাজকীয় সেনাবাহিনীও ছিল বিশাল, সহায়ক সামন্তদের সেনাবাহিনী-সহ রডারিকের অধীনে মোট সেনাসংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষে। দুই সেনাবাহিনী এভাবে অসম অবস্থায় মেডিনা সিডোনিয়ার[৪] পরস্পরের সম্মুখীন হল উত্তরে গুয়াডালেট নদীর তীরে।

গথদের পরাজয় : রডারিকের মৃত্যু
উইটিজার পুত্রগণ রাজার নিপীড়নে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে প্রথম আক্রমণের পরই রডারিকের পক্ষ পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন, কিন্তু তাঁর অধীনস্থ সেনাসংখ্যা ছিল বিপুল,

---

১. রজব মাসটিকে মুসলমানরা বিশেষভাবে শুভ বলে মনে করে, কারণ এটি সেই মাস, যে মাসে রসুলুল্লাহ (স.) মিরাজে গিয়েছিলেন।
২. জিব্রাল্টার, জবল (উ)-তারিক—'তারিকের পাহাড়'; ইবনুল আসির, ৪র্থ খ্রি. পৃ ৪৪৪।
৩. এটি একটি আরবি নাম যা উদ্ভূত হয়েছে 'আল-জাজিরা' অর্থাৎ উপদ্বীপ বা দ্বীপ থেকে।
৪. মক্কারী বলেন, 'সকলে সম্মত হলে সিধুনা জেলার ওয়াদি-লাক্কেন (আনন্দের নদী) নদীর তীরে যুদ্ধ বাধল।' ডোজি বলেন, 'স্মরণীয় যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ওয়াদি-বেক্কা নামে এক ক্ষুদ্র নদীর তীরে, এখন যার নাম সালাডো এবং যা ট্রাফালগার অন্তরীপের অদূরে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। তিনি যুদ্ধের তারিখ দেন ১৯ জুলাই, ৭১১ খ্রিস্টাব্দ।'

সুসজ্জিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সুনিয়ন্ত্রিত; তারা কিছু সময় অবিচলভাবে আরবদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; কিন্তু সবশেষে তারিকের নিজের পরিচালনায় শেষ আক্রমণের প্রচণ্ডতা ছিল অপ্রতিরোধ্য। গথ বাহিনী তাতে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয় এবং গুয়াডালেট নদীর অথৈ পানিতে রাজা রডারিক নিমজ্জিত হন পালিয়ে যাওয়ার সময়। এই বিরাট বিজয়ের নৈতিক ফল হয় সুদূরপ্রসারী। এতে আরবদের সম্মুখীন হওয়ার উদ্যম হারিয়ে ফেলে স্পেনবাসীরা।[১]

সিডোনিয়া ও কার্মোনা তাদের দরজা খুলে দেয়; রডারিকের পরাজিত সেনারা যে ইসিজায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, কিছুকাল প্রতিরোধ মোকাবিলার পর সে স্থানও অধিকৃত হয় সুবিধাজনক শর্তে।

তারিক এবার তাঁর ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীকে চারটি বিভাগে বিভক্ত করেন এবং তাঁর এক সহকারীকে আদেশ দেন কর্ডোভার দিকে অগ্রসর হতে; পক্ষান্তরে আরেকজন মালাগার দিকে অগ্রসর হন, তৃতীয় জন অগ্রসর হন গ্রানাডা ও ইলভিরার দিকে। মূল বাহিনীর প্রধান হিসেবে তারিক নিজে গথদের রাজধানী টলেডোর দিকে ক্ষীপ্রগতিতে অগ্রসর হন। মালাগা, গ্রানাডা ও কর্ডোভা অনায়াসে একের পর এক পতিত হয় এবং অবিলম্বে থিয়োডমির শাসিত সমগ্র আলজিসিরাস অধিকৃত হয়। তারিকের ক্ষীপ্র গতি ও আক্রমণের তীব্রতায় গথরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক বলেন, 'আল্লাহ পৌত্তলিকদের হৃদয় ভয় ও শঙ্কায় পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।' নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ হয় বশ্যতা স্বীকার করেন, না হয় পালিয়ে বেড়াতে থাকেন স্থান থেকে স্থানান্তরে; প্রধান ধর্মযাজকরা আশ্রয় গ্রহণ করেন রোমে; পক্ষান্তরে ইহুদি, ভূমিদাস, দৈন্য-পীড়িত নাগরিকদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষ মুক্তিদাতা হিসেবে মুসলমানদের অভিনন্দন জানায়। তারিখ উপলব্ধি করলেন টলেডোও স্পেনবাসীদের দ্বারা পরিত্যক্ত; অল্প সংখ্যক ইহুদী ও মুসলিম সেনার হাতে নগরীর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে এবং রাজা উইটিজার ভাই অপাসকে এর শাসনভার ন্যস্ত করে তিনি পালিয়ে যাওয়া গথদেরকে এসটর্গা পর্যন্ত ধাওয়া করেন। ইতোমধ্যে অশীতিপর বৃদ্ধ শাসনকর্তা (অর্থাৎ মুসা) প্রতিহিংসা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উত্তেজিত হয়ে আঠারো হাজার লোক নিয়ে স্পেনে অবতরণ করেন তাঁর সুবিখ্যাত সহকারীর আকাঙ্ক্ষিত বিজয় সম্পূর্ণ করতে। তাঁর সেনাদলে ইয়েমেনের শ্রেষ্ঠ পরিবারগুলোর অনেক সম্ভ্রান্ত আরব এবং রসুলুল্লাহ (স.)-এর সহচরদের অনেক বংশধররাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। পূর্বাঞ্চলের পথ ধরে মুসা একে একে অধিকার করেন সেভিল ও মেরিডা (জুন, ৭১২ খ্রি.)। টলেডোতে তারিক তাঁর সাথে মিলিত হন। দুই বিজয়ীর সাক্ষাতে অসঙ্গত বাদানুবাদ ছিল সেকালের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তাঁরা অবিলম্বে নিজেদেরকে মানিয়ে নেন এবং সেনাদলকে একত্রিত করে আরাগনের দিকে অগ্রসর হন। সারাগোসা, টারাগোনা, বার্সিলোনা এবং উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য প্রধান শহরগুলো একে একে তাদের দরজা উন্মুক্ত করে এবং দু'বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পীরেনিজ পর্বতমালা পর্যন্ত সমগ্র স্পেন চলে আসে আরবদের

---

১. এই চমকপ্রদ বিজয়ের শ্রেষ্ঠত্বকে কোনো কিছুই ম্লান করতে পারেন না—এমনকি উইটিজার পুত্রদের দলত্যাগও নয়। কেবল ১'২ হাজার লোক নিয়ে মুসলিম সেনাপতি যুদ্ধের সম্মুখীন হন এবং পরাজিত করেন অন্তত পাঁচ গুণ বেশি একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনাবাহিনীকে।

অধিকারে। কয়েক বছর পর পর্তুগালও অধিকৃত হয় এবং 'আল-গারব'[১] অর্থাৎ (পশ্চিম দেশ) নামে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হয়। কেবল অ্যাস্টুরিয়াস পর্বতমালায় স্পেনীয় খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে।

মুসার রাজ্য জয়

তারিকের ওপর গ্যালিসিয়া দখলের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে মুসা ফ্রান্সে প্রবেশ করেন এবং সহজেই গথ রাজ্যের অন্তর্গত ল্যাঙ্গুয়েডকের অংশবিশেষ দখল করে নেন। পিরেনিজ পর্বতমালার উপর দাঁড়িয়ে এই নির্ভিক রাজপ্রতিনিধি সমগ্র ইউরোপ জয় করার পরিকল্পনা করেন এবং তাঁর পরিকল্পনা সফল করে তুলতে সমস্ত মানবিক সম্ভাব্যতাই তিনি আরোপ করেন। পাশ্চাত্য সম্পূর্ণভাবে তাঁর পদানত হয়; যেসব জাতির মধ্যে কোনো সংহতি বা একতা ছিল না, যারা মুসাকে বিচ্ছিন্ন করেছিল খলিফার রাজ্য থেকে; খ্রিস্ট-সাম্রাজ্যের শক্তিকে সংঘবদ্ধ এবং আরবদের অগ্রগতি রোধ করতে তখনো পর্যন্ত কোনো নেতার আবির্ভাব ঘটেনি। দামাসকাস সরকারের সাবধানী ও দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয়, যার ফলে ইউরোপ আরও আট শতাব্দী ধরে অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ওয়ালিদের একটি আদেশ এসে মুসাকে এমন সময় নিবৃত্ত করে, যখন তিনি ইতালিতে প্রবেশের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের আরও ভেতরে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। অতঃপর তিনি স্পেনের পার্বত্যাঞ্চল সম্পূর্ণভাবে দখল করার জন্য মনোনিবেশ করেন, যেখানকার খ্রিস্টানরা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছিল। তিনি গ্যালিসিয়ায় প্রবেশ করে সেখানকার দুর্গগুলো দখল করেন এবং শত্রুদের বিতাড়িত করেন অ্যাস্টুরিয়াসের প্রস্তরময় গিরিসংকটে। মুসা লুগো নামক স্থান থেকে সেনাপরিচালনা করেছিলেন, যার সবদিকই তখন পরিবেষ্টিত ছিল বিদ্রোহীদের দ্বারা। বৃদ্ধ যোদ্ধার অদম্য উদ্যম ও শক্তিতে ভীত হয়ে গেরিলা দলগুলো একের-পর-এক বশ্যতা স্বীকার করে, শুধু পেলায়ো নামক এক ব্যক্তি কয়েকজন অনুচরসহ বাকি রয়ে যায়। তিনিও অস্ত্র পরিত্যাগ করতেন, কিন্তু জয় যখন প্রায় আসন্ন, ঠিক সে সময় দামাসকাস থেকে জনৈক দূত দুই বিজয়ীর প্রত্যাবর্তনের সুদৃঢ় আদেশ নিয়ে উপস্থিত হন।

মুসা ও তারিকের প্রত্যাবর্তনের আদেশ

মুসা ও তারিককে প্রত্যাবর্তনের আদেশের পেছনে ওয়ালিদের যে উদ্দেশ্যই থাক, ইসলামের পক্ষে তা নিঃসন্দেহে পরম দুর্দশা ও দুঃখজনক হয়েছিল। মুসার প্রত্যাবর্তনে পেলায়ো নিজেকে পার্বত্য অঞ্চলে সুরক্ষিত করতে সক্ষম হন এবং সেখানে যে শক্তির বীজ বপন করেন পরবর্তীকালে তা দক্ষিণাঞ্চলের মুসলিম রাজ্যগুলোকে সমূলে বিধ্বস্ত করেছিল। শ্রেষ্ঠ দুই সেনাধিনায়কের অধিনায়কত্ব হারিয়ে আরবরা এই মুষ্টিমেয় দৃঢ়সঙ্কল্প প্রতিরক্ষাকারীদেরকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করতে থাকে এবং দিনে দিনে তাদের সংখ্যা ও শক্তি বাড়ানোর অবকাশ দেন। মাক্কারী বলেন, 'আল্লাহর অভিপ্রেত হলে মুসলমানরা

---

১. আধুনিক পর্তুগালের একটি প্রদেশকে এখনো 'আল-গারব' বলা হয়।

সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলোকে তখনই নিভিয়ে দিতে পারত, যা ভবিষ্যতে ওইসব অঞ্চলের মুসলিম রাজ্যকে দগ্ধীভূত করেছিল।' মুসা স্পেন পরিত্যাগের আগেই দেশ শাসনের জন্য আবশ্যকীয় সমুদয় বন্দোবস্ত করে যান। তাঁর পুত্র আবদুল আজিজকে নতুন প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, যার রাজধানী হয় সেভিল শহর। ইফ্রিকিয়ার দায়িত্ব অর্পন করেন আরেক পুত্র ও প্রসিদ্ধ যোদ্ধা আব্দুল্লাহর ওপর; অন্যদিকে সর্বকনিষ্ঠ আবদুল মালিককে মরক্কোর (মাগরিব-উল-আকসা) শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং তাঞ্জীর নগরীকে প্রধান সেনানিবাস সহ সমুদ্রোপকূল ও নৌবাহিনীর কর্তৃত্ব পান আবদুস সালেহ নামক এক ব্যক্তি। তাঁর অধীনস্থ রাজ্যের সুশাসনের যথাযথ ব্যবস্থা সম্পন্ন করে তিনি বহুসংখ্যক সহচর নিয়ে দামাসকাসের দিকে যাত্রা শুরু করেন। সময়টা ছিল—৯৫ হিজরি, ৭১৪ খ্রিস্টাব্দে।

বিজয়ের ফলাফল

আরবদের স্পেন বিজয়ের ফলে এই উপদ্বীপে এক নতুন যুগের সূচনা হয়; এতে এক বিরাট সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংঘটিত ফ্রান্সের বিরাট বিপ্লবের অশুভ ও ভয়ংকর প্রতিফলগুলো বাদ দিলে যার সাথে এর শ্রেষ্ঠ ফলাফলসমূহের তুলনা করা যেতে পারে। এতে নিশ্চিহ্ন হয় বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলোর অন্যায় অধিকার ও ক্ষমতা, যাঁদের মধ্যে ধর্মযাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মানের অধিকারী। যে অসহনীয় করপ্রদানে শিল্পব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং ধ্বংস হয়েছিল জনসংখ্যার মধ্যবিত্ত শ্রেণী, এই বিপ্লবে তা বিদূরিত হয়। পীড়াদায়ক এবং খামখেয়ালী করপ্রথার পরিবর্তে এক ন্যায্য, সুসামঞ্জস্য ও সুস্পষ্ট করপ্রথার প্রবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ, অমুসলিমদের ক্ষেত্রে মাথা পিছু ধার্য কর বা জিজিয়া প্রদান করতে হত এবং আবাদী জমির কর প্রদানে সমানভাবে বাধ্য ছিল মুসলিম ও অমুসলিম সবাই। আর জিজিয়ার পরিমাণ ছিল খুবই কম, করদাতার অবস্থা অনুসারে এর তারতম্য ঘটত এবং তা দেওয়া হত বারো মাসের কিস্তিতে।[১]

সন্ন্যাসী, নারী ও শিশুরা সাধারণভাবে এই কর প্রদান থেকে মুক্ত ছিল, একইভাবে মুক্ত ছিল খঞ্জ, অন্ধ, রুগ্ন, ফকির ও দাসেরা। জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে ভূমি-রাজস্ব নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় তা কখনো কৃষিকাজের উপর প্রভাব পড়ত না। বিজয়ের সময় বহু স্পেনীয় নগরী অত্যন্ত সুবিধাজনক শর্ত লাভ করেছিল এবং শর্তগুলো পালিতও হয়েছিল অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে। যেসব অভিজাত সম্প্রদায় ও ধর্মযাজক দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন কিংবা যোগ দিয়েছিলেন গ্যালিসীয় বিদ্রোহীদের দলে, তাদের ধনসম্পত্তি ব্যতীত আর কিছুই বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। বিজেতা সেনাদের ব্যক্তিগত অত্যাচার ও লুণ্ঠন, যে কোনো বিজয়ী সেনাদলের[২] ক্ষেত্রেই যা অবশ্যম্ভাবী, তা শক্ত

---

১. এর মাত্রা ছিল ১২ থেকে ৪৮ দিরহাম। মূল্য অনুসারে এক দিরহাম এক ফ্রাঙ্কের সমান।

২. যুদ্ধে কি ভয়াবহতা ঘটে তা অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে ১৮৭০-৭১ কিংবা ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সুনিয়ন্ত্রিত জার্মান সেনাদলের ফ্রান্স আক্রমণের বিবরণী পাঠ করতে হবে।

হাতে দমন করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী শাসকের বৈশিষ্ট্যবাহী নির্মম অসহিষ্ণুতা, অনুদারতা ও ভয়ংকর নির্যাতনের পরিবর্তে লাভ করেছিল উদারতা ও মহান সহনশীলতা। নির্যাতিত ও পদদলিত ইহুদিরা বিনা বাধা ও প্রতিবন্ধকতায় তাদের স্বধর্ম পালনের অধিকার পেয়েছিল এবং খ্রিস্টানরাও বিনা বাধায় তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় আইনকানুন প্রতিপালন করার সুনিশ্চিত ভরসা পেয়েছিল, তাদের নিজস্ব বিচারকদের ওপরই এসব আইন-কানুন পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ফলে ধর্ম পালনে কারো কোনো অসুবিধা ছিল না এবং কারো ওপর জুলুম করা হত না। প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রীলোক বা শিশুর ইচ্ছা ও খুশিমতো ধর্মপালনের স্বাধীনতা ছিল। কর সংগ্রহ ও বিরোধ মীমাংসার জন্য ছিল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নিজস্ব শাসনকর্তা। সব ধরনের সরকারি চাকরি এবং মর্যাদাপূর্ণ ও লাভজনক সমুদয় পদ মুসলমান, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের জন্য সমানভাবে খোলা ছিল। এ কালের আধুনিক সরকারও স্পেনের মুসলিম শাসন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তবে মুসলিম বিজয়ের সবচেয়ে হিতকর ফল ফলেছিল দাস-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এ যাবৎকাল তারা সাধারণ ভারবাহী পশুর চেয়েও খারাপ ব্যবহার পেয়েছিল, বিজয়ের ফলে তারা লাভ করে মানুষের মতো মর্যাদা। যেসব জমিদারিতে দাস ও ভূমিদাসরা কাজ করত, সেগুলো মুসলমানদের অধিকার আসামাত্র তারা মুক্তি পায় এবং জোতদার-প্রজায় পরিবর্তিত হয়ে সক্রিয়ভাবে নিজেদের জমি নিয়ে মনোযোগী হয়। জমি বস্তুতপক্ষে তাদেরই হয়, শর্ত মাফিক কেবল উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ দিতে হয় মুসলমান জমিদারগণকে। যারা তখনো খ্রিস্টান প্রভুদের অধীনে ছিল তাদের অবস্থারও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়, দুর্ব্যবহারের অভিযোগ জানিয়ে বা ইসলাম ধর্ম কবুল করে তারা আইনের মাধ্যমে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল। এতকাল অত্যাচারিত ও বঞ্চিত ক্রীতদাস ও ভূমিদাসরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল স্বাধীনতা লাভ এবং তাদের অস্তিত্বকে মহিমান্বিত করার জন্য; নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও অভিজাত ব্যক্তিগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল হয় গভীর বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কিংবা সুবিধার জন্য—কিন্তু আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে, যার পরিণাম পরে দেখা গেছে। গথ বা ফ্রাঙ্কদের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে খ্রিস্টান সম্প্রদায় নিজেরাই আরবদের শান্তিপূর্ণ, উদার ও হিতকারী শাসনকে পছন্দ করে এবং আবার ফিরে আসে নগর ও গ্রামগুলোতে, যা তারা অত্যাচারে নিষ্পেষিত হয়ে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। এমন কি ডোজির মতে, 'অন্তত প্রথম অবস্থায় পুরোহিতরাও এই পরিবর্তনে অসন্তুষ্ট ছিলেন না।'

আরেকজন সুপরিচিত লেখক এভাবে নিজের মত ব্যক্ত করেন, 'মুরদের প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভা রাজ্য মধ্যযুগের এক বিস্ময় এবং সমগ্র ইউরোপ যখন বর্বর অজ্ঞতায় ও কলহে নিমজ্জিত তখন তা একাকী পাশ্চাত্য জগতের সামনে উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় জ্ঞান ও সভ্যতার মশাল তুলে ধরেছিল।'

তিনি আরো বলেন, 'এমন ধারণা করা অমূলক যে, পূর্ববর্তী অসভ্য জাতিদের ন্যায় মুররা ধ্বংস ও স্বেচ্ছাচার বয়ে এনেছিল। বিজয়ী আরবদের সময় ব্যতীত আন্দালুসিয়া আর কখনো এত শান্তিপূর্ণ, নম্রতা, ন্যায়পরায়ণতা ও জ্ঞানবত্তার সাথে শাসিত হয়নি। কোথা থেকে তারা প্রশাসনিক দক্ষতা লাভ করেছিল তা বলা শক্ত, কারণ তারা সরাসরি

এসেছিল তাদের আবাসভূমি আরবীয় মরুভূমি থেকে এবং দ্রুত বিজয়ের স্রোতপ্রবাহে ভেসে তারা বিদেশি জাতিসমূহকে পরিচালনা করার মতো কৌশল অর্জন করতে অল্পই সময় পেয়েছিল।'

প্রদেশ বিভাজন

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তাঁরা স্পেনকে চারটি বৃহৎ প্রদেশে ভাগ করেন, প্রতিটি প্রদেশ ছিল রাজপ্রতিনিধির কাছে দায়বদ্ধ একজন শাসনকর্তার অধীনে।

প্রথম প্রদেশটি গঠিত হয় আন্দালুসিয়া নিয়ে অর্থাৎ সমুদ্র ও গুয়াদেলকুইভারের মধ্যস্থলে যার অবস্থান। আর গুয়াদেলকুইভার নদী থেকে কর্ডোভা, সেভিল, মালাগা, ইসিজা, জায়েন ও উয়োসুনা নগরীসহ গুয়াডিয়ানা নদী পযন্ত তার বিস্তার।

সমগ্র মধ্য স্পেন নিয়ে ছিল দ্বিতীয় প্রদেশ। পূর্বে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে লুসিটানিয়া অর্থাৎ আধুনিক পর্তুগাল সীমান্ত এবং উত্তরে ডউরো নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র মধ্য স্পেন নিয়ে গঠিত হয় এই প্রদেশটি। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ট্যাগাসের তীরবর্তী টলেডো, জুকারের তীরে সিনকা এবং ডউরোর একটি শাখা নদীর তীরে অবস্থিত সেগোভিয়া, গুয়াডালাকসারা, ভ্যালেনসিয়া, ডেনিয়া, অ্যালিকানটে, কার্থাজেনা, মুর্সিয়া, লোর্কা ও বায়েজা নামক নগরীগুলো।

আর তৃতীয় প্রদেশটি গঠিত হয়—মেরিডা, ইভোরা, বেজা, লিসবন, কোয়িমব্রা, লুগো, অ্যাসটোর্গা, জামোরা, সালামানকা প্রভৃতি নগরীসহ গ্যালিসিয়া ও লুসিটানিয়া নিয়ে।

চতুর্থ প্রদেশটি বিস্তৃত ছিল—ডউরো নদীর তীর থেকে পিরেনিজ পর্বত পর্যন্ত প্রসারিত ইব্রো নদীর উভয় তীবর্তী ভূভাগ জুড়ে, যার পশ্চিম দিকে সংযুক্ত ছিল গ্যালিসিয়া। সারাগোসা, টরটোসা, টারাগোনা, বার্সিলোনা, গিরোনা, উরগেল, টুডেলা, ভ্যালাডোলিড, হিউয়েসকা, জড, বোবাসট্রো প্রভৃতি নগর এই প্রদশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পরবর্তীকালে যখন আরও বিজয় বিস্তার লাভ করে তখন পিরেনিজ পর্বতের অপরদিকে পশ্চিম প্রদেশটি গঠিত হয়—যার অন্তর্ভুক্ত ছিল নার্বোন, নিমস, কার্কাসোন, বেজিয়ার্স, আগডে, ম্যাগুয়েলোন ও লোডেভ।

আরব ও বার্বারগণদের নগরে বসবাসই পছন্দ করত। এখানে তারা গোত্রের ভিত্তিতে দলবদ্ধ ছিল, যা খ্রিস্টানদের বিচ্ছিন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা দান করলেও মারাত্মক গোত্র-বিদ্বেষ সৃষ্টিতে সহায়ক ছিল।

নিম্নলিখিত তালিকা থেকে গোত্র ও জাতির বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থান এবং তাদের বিভাগের বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে :

ইলভিরা (কর্ডোভা)	দামাসকের সেনাদল
সেভিল, নিবলা	হিমসের সেনাদল
জিন	কিন্নিসরিনের সেনাদল (প্রাচীন কালসিস)

মেডিনা সিডোনিয়া আলজিসিরাস	প্যালেস্টাইনের সেনাদল
রাইয়া এবং মালাগা	জর্ডানের সেনাদল
জেরেস	পারস্যের সেনাদল
টলেডো	ইয়ামেনের সেনাদল
গ্রানাডা	ইরাকের সেনাদল
মেরিডা লিসবন ইত্যাদি	মিশরের সেনাদল

পরিশেষে অনুচরবর্গসহ অভ্যন্তরে বসতি স্থাপন করেছিলেন হিজাজের দশ হাজার যোদ্ধাপুরুষ। মুসার পুত্র আবদুল আজিজ, যিনি পিতার প্রত্যাবর্তনের পর রাজপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছিলেন, তিনি দেশের প্রয়োজন অনুসারে ইসলামি আইন ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে উপযোগী করে তুলতে এবং দুই জাতির মিলন ঘটাতে একটি দিওয়ান বা মন্ত্রণা পরিষদ নিযুক্ত করেন। বিজ্ঞ রাজনীতি এবং দয়ালু ও কল্যাণকর শাসন দ্বারা তিনি সকল শ্রেণীর মন জয় করেন। ভারতের প্রথম মুঘল সম্রাটদের মতো তিনি বিজিত ও বিজেতাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ বন্ধনে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য নিজেও বিয়ে করেছিলেন রডারিকের বিধবা স্ত্রী এজিলোনাকে। আরবরা যাঁকে উম্ম-আসিম নামে অভিহিত করত।

আরবদের অধীনে স্পেনের উন্নতি

স্পেনের আরব ঔপনিবেশিকরা প্রধানত সেইসব দেশ থেকেই এসেছিল, যেগুলো মূলত ছিল কৃষি উপযোগী; যেমন—মিশর, সিরিয়া ও পারস্য। সমস্ত উপনিবেশগুলোতেই ইহুদিদের মতো তাদেরও ব্যবসা-বাণিজ্যের সহজাত প্রবৃত্তি ছিল এবং তারা শিল্প-বাণিজ্যের দিকেও আকৃষ্ট হয়েছিল রসুলুল্লাহ (স.)-এর শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে, যাতে শ্রম একটি ধর্মীয় কর্তব্যের স্থান লাভ করেছিল। অতএব তারা অসামান্য উদ্যমে স্পেনের বৈষয়িক উন্নতি সাধনে হাত দেয়, খ্রিস্টানদের শাসনাধীনে যা এতকাল নিস্ফলা হয়ে পড়েছিল। তারা বহুবিধ কৃষি-বিষয়ক কর্মপদ্ধতি প্রবর্তন করে; পতিত জমিকে করে তোলে উর্বরা। পরিত্যক্ত নগরগুলোকে পুনরায় জনাকীর্ণ করে সেগুলোকে সুশোভিত করা হয় সুন্দর সুন্দর স্মৃতিসৌধ দিয়ে এবং বহুবিধ শিল্প ও বাণিজ্যিক বন্ধনে সেগুলোকে একতাবদ্ধ করা হয়। তারা জনসাধারণকে এমন একটি অধিকার প্রদান করে, যা গথ রাজারা কখনোই অনুমোদন করেন নি, তা হল জমি হস্তান্তরের অধিকার। সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল যে দেশকে এ যাবৎকাল অভিশাপের মতো বেঁধে রেখেছিল তা থেকে মুক্তিলাভ করে স্পেন ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়। তারা স্পেনকে একটি উদ্যানে পরিণত করে; গড়ে তোলে একটি আদর্শ শাসনব্যবস্থা, শিল্প ও বিজ্ঞানে গুরুত্ব আরোপ করে; কিন্তু ওই দূরদেশেও তারা কখনো তাদের মরুভূমির পুরনো গোত্রবিদ্বেষ ভুলে যাওয়া বা দমন করতে পারেনি। স্থায়ী

সাম্রাজ্য স্থাপনের চমৎকার সুযোগ তারা পেয়েছিল, যা নষ্ট হয় তাদের একতা ও সংহতির অভাবে। বিদেশি হস্তক্ষেপের প্রবল বিরোধী দুটি অতিরিক্ত শক্তি স্পেনে এই মতবিরোধ তীব্র করে তুলেছিল। দুর্ধর্ষ বার্বারগণ, আরবের সেনাদলে যারা বিপুল সংখ্যায় ছিল, তারা আরব কর্মচারীদের ঘৃণা করত। বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার এবং তা দমনে কেবল গোত্রবিদ্বেষের তিক্ততাই বেড়ে যেত। স্পেনীয় মুসলমানরা, যাদের বলা হত 'বিলাদিউন' (দেশের অধিবাসী), তারা আরব ও বার্বার উভয় জাতিকেই ঘৃণা করত—পূর্বোক্তদের তাদের অহংকারের জন্য, শেষোক্তদের তাদের উগ্রতার জন্য। ইসলামের গণতান্ত্রিক শিক্ষামালা জাতি ও বর্ণগত সমুদয় স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে সমতা আনলেও দূরদেশে যেখানেই সে তরবারীর সাহায্যে প্রবেশ লাভ করেছিল, আরব জাতি সেখানে কখনোই প্রবল জাত্যাভিমানের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি, যা সর্বদাই তার স্বভাবের একটি আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করেছিল। অ্যাংলো-স্যাকসনদের মতো সে নিজেকে গণ্য করত আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি বলে। আরব ও বিলাদিউনদের সম্পর্ক সেই প্রবল জাতি বিদ্বেষকেই অল্পমাত্রায় স্মরণ করিয়ে দেয় যা লোম্বার্ডিতে অস্ট্রীয় ও ইতালীয়দের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে বলে মনে হয়। আইরিশদের মতো বিলাদিউনরাও পরিবর্তিত আকারে স্বায়ত্তশাসন লাভ করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল; প্রকৃতপক্ষে তারা স্বজাতীয় লোকদের দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হতে চেয়েছিল। আরবদের বিরুদ্ধে তাদের অধিকাংশ বিদ্রোহ ফকিহ অর্থাৎ মুসলমান আইনবেত্তাদিগের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিল। এই আইনবিদ ব্যক্তিগণ ইসলামে পুরোহিতদের স্থান পূর্ণ করেছিল। স্পেনবাসীগণ যে উগ্রতা ও বিবেচনাহীন প্রচণ্ডতার সাথে এককালে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং পরেও গ্রহণ করেছে ঠিক সেভাবেই ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করেছিল। ফকিহগণের প্ররোচনায় তারা প্রায়ই হয় আরবদের বিরুদ্ধে অথবা তাদের ধর্মবিধির উদার ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কিংবা তাদের সাধারণ সহনশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হত। এই সকল বিবাদ-বিসম্বাদ সাম্রাজ্যকে দুর্বলতার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এবং তার ফলে আশি বছর পূর্ণ হবার আগেই বার্সিলোনা পর্যন্ত বিজিত দেশের সমগ্র উত্তরাঞ্চল হস্তচ্যুত হয়ে যায়। ইবন খালদুন অত্যন্ত দুঃখের সাথে এর তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছেন।

আমাদেরকে এবার পুবদিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে; কেননা ওয়ালীদ যে সেনাপতিদ্বয়কে তাদের বিজয়মঞ্চ হতে ফেরত পাঠিয়েছিলেন তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের অবসর তাঁর মিলল না।

ওয়ালীদ তদীয় পিতা আবদুল মালিকের মতো মৃত্যুর পূর্বে হাজ্জাজ, কুতায়বা এবং অধিকাংশ মুদারবংশীয় প্রধানদের সহায়তায় তাঁর পুত্রের অনুকূলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছানোর পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ালীদ নয় বছর সাত মাস গৌরবের সহিত রাজত্ব করার পরে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে দায়ব মাররান নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। মাসউদি এবং ইবনুল আসির উভয়েই তাঁকে স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী বলে মনে করেন; কিন্তু এতদিন পর আমরা শুধু তাঁর সৎ কর্মের কথাই স্মরণ করতে পারি।

জমাদিউস সানি, ৯৬ হিজরি; ফেব্রুয়ারি, ৭১৫ খ্রিস্টাব্দ

ওয়ালিদ যে তাঁর পিতা আবদুল মালিক এবং পিতামহ মারওয়ান অপেক্ষা দয়ালু ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এটা নিশ্চিত যে তাঁর বংশধরগণের অনেকের চেয়ে তিনি সবচেয়ে হৃদয়বান ছিলেন। সিরিয়াবাসীগণ তাঁকে স্বভাবতই সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা বলে মনে করে। তিনি দামাসকের জুমা মসজিদ নির্মাণ করেন, মদীনা ও জেরুজালেমের মসজিদগুলোকে সুশোভিত করেন এবং যে যে শহরে পূর্বে কোনো উপাসনাগৃহ বা মসজিদ ছিল না, তাঁর আদেশক্রমে সেখানে মসজিদ নির্মিত হয়। তিনি সীমান্ত রক্ষার জন্য দুর্গ নির্মান করেন, সাম্রাজ্যের সব জায়গায় রাস্তাঘাট তৈরি ও সুপেয় পানির জন্য কূপ খনন করেন। তিনি বিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজকোষ হতে অক্ষম ও দরিদ্র লোকদের নির্দিষ্ট ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করে অনিয়মিত বদান্যতা বন্ধ করে দেন। তিনি অন্ধ, পঙ্গু এবং উন্মাদ ব্যক্তিদের জন্য আশ্রয়স্থল প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে তাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হত এবং তাদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য পরিচারক নিযুক্ত থাকত! পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র বালক-বালিকাদের লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য তিনি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বয়ং হাটবাজার পরিদর্শন করে দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ করতেন। এছাড়াও উমাইয়া বংশের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্য, কলা ও শিল্পে উৎসাহ প্রদান করেন। ওয়ালীদের রাজত্বকালে মুহম্মদ (স.)-এর বংশের চতুর্থ ইমাম দ্বিতীয় আলী (জয়নুল আবেদীন) মৃত্যুবরণ করেন। শিয়াগণ তাঁকেই প্রকৃত ধর্মনেতা মনে করত। তাঁর পুত্র মুহম্মদ তাঁর ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত হন। বিদ্যান ও জ্ঞানী হওয়ার জন্য একে আল-বাকির অর্থাৎ 'প্রগাঢ়' উপাধি দেয়া হয়েছিল।

কনস্টান্টিনোপলের সিংহাসনে নিষ্ঠুর দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ান ওয়ালীদের সমসাময়িক ছিলেন; তিনি ৭১১ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন। ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে পদচ্যুত হন জাস্টিনিয়ানের উত্তরাধিকারী ফিলিপিকাস এবং ৭১৬ খ্রিস্টাব্দে অ্যানেসটেসিয়ায় তৃতীয় থিওডসিয়ার কর্তৃক নিহত হন।

অধ্যায়-১০
উমাইয়া বংশ [হাকামের শাখা]-পূর্বানুবৃত্তি
[৯৬-১০৫ হিজরি; ৭১৫-৭২৪ খ্রিস্টাব্দ]

সুলায়মানের সিংহাসন লাভ : মুসা ও তারিকের পতন : মুসার পুত্র আব্দুল আজিজের মৃত্যু : গোত্রীয় মতবিরোধ : ইয়েমেনীগণ : মুহাল্লিব পুত্র ইয়াজিদের অভ্যুত্থান : কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ : মুসলিম বিপর্যয়: সুলায়মানের মৃত্যু : দ্বিতীয় উমরের সিংহাসন লাভ : তাঁর বিজ্ঞ ও সাধু রাজত্ব : কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে প্রত্যাবর্তন : উমরের মৃত্যু : দ্বিতীয় ইয়াজিদের সিংহাসন লাভ : মুহাল্লিব পুত্র ইয়াজিদের বিদ্রোহ : ইয়েমেনীদের ধ্বংস সাধন : গোত্রীয় মতবিরোধ : মুসলিম বিপর্যয় : দ্বিতীয় ইয়াজিদের মৃত্যু : আব্বাসী বংশ

সুলাইমানের সিংহাসন লাভ

পিতা আব্দুল মালিকের চুক্তি অনুসারে ওয়ালিদের ভাই সুলায়মান তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত হন, যাঁকে উদার, স্পষ্টভাষী, আমোদপ্রিয়, ন্যায় বিচারক এবং তাঁর পিতৃব্য পুত্র সদাশয় উমর বিন আব্দুল আজিজের বিজ্ঞ ও মহানুভব উপদেশসমূহ পালনকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে—যিনি পরবর্তীকালে সিংহাসনে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত হয়। সুলায়মান সিংহাসনে আরোহণের পরপরই ইরাকের কারা-দ্বার মুক্ত করে দেন এবং হাজ্জাজ যাদের কারাবন্দী করে রেখেছিলেন এরকম হাজার হাজার বন্দীকে মুক্ত করে দেন। তিনি ওই স্বৈরাচারী শাসকের রাজস্ব আদায়কারীদেরকে অপসারিত করেন এবং তাঁর অধিকাংশ পীড়াদায়ক অধ্যাদেশ বিলোপ সাধন করেন। তিনি যদি হাজ্জাজ কর্তৃক জনগণের উপর আরোপিত করভার অপনোদন করেই সন্তুষ্ট থাকতেন তাহলে তাঁর সম্পর্কে অশোভন কোন কিছুই লিপিবদ্ধ করার সুযোগ থাকত না। কিন্তু তিনি তাঁর ন্যায়পরায়ণতার উর্ধ্বে প্রতিশোধ গ্রহণকেই প্রাধান্য দেন এবং ওয়ালিদের উত্তরাধিকার পরিবর্তনের পরিকল্পনাকে সমর্থনদানকারী মুদার বংশীয়দেরকে কঠোর হাতে দমন করেন। এবার ইয়ামেনিরা প্রভাবশালী হয়ে উঠল এবং হাজ্জাজ তাদের ওপর যে নির্যাতন করেছিল তা তাদেরকে সুদে আসলে ফেরত দিল। ইরাকের নতুন রাজপ্রতিনিধি মুহাল্লিব-পুত্র ইয়াজিদ যখন দেখলেন তাঁর শত্রু মৃত্যুর পরপারে চলে গেছেন, তখন তিনি হাজ্জাজের অনুগামী ও আত্মীয়দের ওপর সমুচিত প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। এভাবে সাম্রাজ্যের প্রতিটি অংশেই মুদার বংশীয় ও ইয়ামেনিদের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ নতুনভাবে শুরু হল তাতে বিশিষ্ট সেনাপতি কুতায়বা খোরাসানে নিহত হলেন।

মুসা ও তারিক

স্পেন বিজয়ী মুসা ও তারিক উভয়েই ইয়েমেনি এবং (সুলায়মানের) প্রিয়পাত্র ইয়াজিদের আস্থাভাজন হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সাথে সুলায়মানের আচরণ অনেকটা দুর্বোধ্য মনে হয়। এই দুই প্রখ্যাত পুরুষকে অভাবের তাড়নায় মৃত্যুবরণ করতে হয় আর এটা সেই সার্বভৌম শাসনকর্তার অশেষ কলঙ্কের একটি। এমনকি তাঁর স্পেন শাসন অত্যন্ত সফল ও সমৃদ্ধশালী হওয়া সত্ত্বেও সেভিলে মুসার পুত্র আব্দুল আজিজের হত্যা সম্পর্কে সুলায়মানের উদাসীনতাও সন্দেহজনক ছিল। সিন্ধু ও পাঞ্জাব বিজয়ী কাসিমের পুত্র মুহম্মদ যিনি তাঁর শান্ত ও সমদর্শী শাসনের দ্বারা হিন্দুদের প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন, তাঁকেও শাসনকার্য থেকে প্রত্যাবর্তন করিয়ে আনা হল। মুহম্মদের একমাত্র অপরাধ তিনি হাজ্জাজের ভাইপো ছিলেন এবং সে কারণেই তিনি মুহাল্লিবের পুত্র ইয়াজিদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হলেন। হাবিব নামে ইয়াজিদের এক ভাইকে ভারতবর্ষের সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। সাহসী হওয়া সত্ত্বেও অদূরদর্শিতার জন্য তিনি আধিপত্য হারিয়ে ফেলেন, যা তাঁর পূর্ববর্তী শাসনকর্তা হিন্দুদের মধ্যে অর্জন করেছিলেন।

এই শাসনকালে স্পেনের মুসলমানদেরকে তাদের নিজস্ব পরিকল্পনার ওপরই অধিকাংশ সময় ছেড়ে দেওয়া হয়। আব্দুল আজিজের হত্যার পর সেনাবাহিনী মুসার ভ্রাতুষ্পুত্র আইয়ুব বিন হাবিবকে তাদের শাসনকর্তা হিসেবে নির্বাচিত করে কিন্তু আফ্রিকার রাজপ্রতিনিধি স্পেন যাঁর অধীনস্থ বলে পরিগণিত হত তিনি তাঁর নিয়োগকে সমর্থন করেন নি। মাত্র কয়েক মাস শাসনের পর তিনি রাজধানী সেভিল থেকে কর্ডোভায় স্থানান্তর করেন, আইয়ুবের স্থলাভিষিক্ত হন আল-হুরর নামে এক মুদারবংশীয় ব্যক্তি। আল-হুরর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি সঙ্গী হিসেবে আফ্রিকার প্রধান প্রধান আরব পরিবারের চারশো বংশধরকে নিয়ে এসেছিলেন, যাঁরা স্পেনে মুসলমানদের মহত্বের প্রধান উৎস হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় থেকে আব্বাসীয়দের সিংহাসন লাভের পূর্ব পর্যন্ত উপদ্বীপটি কখনো দামাস্কাসের খলিফা এবং কখনো আফ্রিকার রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত শাসনকর্তাদের দ্বারা শাসিত হয়, যাঁদের রাজধানী ছিল কাইরোয়ানে। কর্তৃত্বের এই বিভাজন এক বিরাট অমঙ্গলের উৎসে পরিণত হয়; এটা প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, হস্তক্ষেপ পড়ে নীতির ধারাবাহিকতায়, অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে এবং সীমান্তের সৈন্যদলের সক্রিয় সাহায্য লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আল-হুরর প্রায় তিন বছরের শাসনকালের মধ্যে উত্তরাঞ্চলে বিশাল রাজ্যবিস্তার করা হল উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বাইজান্টাইন আক্রমণ

ঘটনাক্রমে সুলায়মান ৯৮ হিজরিতে প্রাচীন ক্যালসিসের নিকটবর্তী দাবিক নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। এখানে তাঁর এশিয়া মাইনরে রোমান বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানকারী আইসরিয়ান উপাধিতে ভূষিত লিও নামে এক বাইজান্টাইন সেনাপতির সাথে সাক্ষাৎ হয়। এই দ্বিমুখী বিশ্বাসঘাতক সুলায়মানকে আবেগের রঙে রাঙিয়ে তুলে কনস্টান্টিনোপলকে সহজেই দখল করা যেতে পারে এবং তা দখলের মাধ্যমে আরবীয় সাম্রাজ্যের বিস্তার লাভ করা আরও সহজ হয়ে ওঠে। সাফল্য সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে

তিনি নিজে অভিযানকারীদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করারও প্রস্তাব দেন। আরেকটি স্পেন লাভের আশায় মোহিত হয়ে এবং লিওয়ের আশ্বাসে প্রতারিত হয়ে সুলায়মান মাসলামাহ্‌র অধীনে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, যা কোন প্রকার বাধা ছাড়ায় হেলেসপনট অতিক্রম করে যায়। তারা নগরকে অবরোধ করে কনস্ট্যান্টিনোপল প্রাচীরের পাদদেশে এসে। সুলায়মানের এক পুত্রের অধীনস্থ একটি সেনাবাহিনী থ্রেইস ও সাকালিবাত নামে অভিহিত তার রাজধানী, "স্লাভদের নগরী" দখল করে নেয়। এইভাবে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত হয়ে রোমকরা শংকিত হয়ে উঠে; তারা অবরোধ তুলে নেয়ার জন্য মাসলামাহকে প্রচুর অর্থ প্রদানের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং রোমকরা ঘোর দুর্বিপাকে পড়ে। এই সংকটময় মুহূর্তে কনস্ট্যান্টিনোপলের শাসক তৃতীয় থিয়োডসিয়াস নিহত হয় অথবা পদচ্যুত হন এবং সন্ত্রস্ত রোমকরা লিওকে রাজ-পরিচ্ছদ গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানায়। লিও মুসলমানদের দল থেকে পালিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপলে প্রবেশ করেন এবং সম্রাট হিসেবে ঘোষিত হন। অবরোধকারীদের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়ার কারণে তিনি মুসলমানদের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হন। আংশিক বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তিনি ইতোমধ্যেই তাদের রসদ ভাণ্ডারের বৃহদংশ নষ্ট করে দেন। মুসলিম সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী এবার দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও তুষারপাতে কঠোরভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ে; তবুও তারা অত্যন্ত সাহসের সাথে অবরোধ চালিয়ে যায়। আমিরুল মুমিনীনের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত প্রত্যাবর্তনের কোনো কথাই ওঠে না। ভাই ওয়ালিদের স্থান পূরণে সুলায়মান যে অনুপযুক্ত তা বাইজান্টিয়াম প্রাচীরের পাদদেশে অবস্থানরত মাসলামাহ ও তাঁর সেনাবাহিনীকে অপ্রতুল সাহায্যদানের মতো আর কোনো কিছুতেই এত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নি। যদি তারা যথাযথভাবে সাহায্য পেত তাহলে নিঃসন্দেহে তখনই কনস্টান্টিনোপলের পতন হত।[১]

সুলায়মানের মৃত্যু (সেপ্টেম্বর, ৭১৭ খ্রিস্টাব্দ)

এইসব বিপর্যয়ের মধ্যেও মুহাল্লিব-পুত্র ইয়াজিদ কতৃক কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তাবারিস্তান ও কুহিস্তান[২] দখলে সাফল্য লাভের মাধ্যমে সামান্য ভারসাম্য রক্ষা হয়, ওই সময়ে যেগুলো স্থানীয় শাসনকর্তারা শাসন করত, যাঁরা তাঁদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি থেকে আরব শক্তির ওপর বার-বার আক্রমণ করতেন। অবশেষে উত্তেজিত সুলায়মান মাসলামাহর অভীষ্ট নতুন সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে স্বশরীরে ধাবিত হন; কিন্তু তিনি কিন্নিসরিন জেলার দাবিক অতিক্রম করতে পারেননি এ সময় তিনি যখন তিনি মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হয় এবং সেখানে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতক লিও-এর সাক্ষাৎ হয়। দু বছর পাঁচ মাসের স্বল্পকালীন ও অনতিগৌরবময় রাজত্বকালের পর ২০ সফর ৯৯ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

---

১. অবশ্য গ্রিকরা এই ঘটনাকে উপস্থাপন করেন ভিন্নভাবে।

২. প্রাচীন মেডিয়া।

উমর বিন আব্দুল আজিজের মনোনয়ন

ভাইয়ের মতো সুলায়মানও তাঁর এক পুত্রকে সিংহাসন দিয়ে যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তিনি উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আইয়ুবকে মনোনীত করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন, দ্বিতীয় পুত্র দাউদ ঠিক সে সময় রোমানদের বিরুদ্ধে সেই দুর্ভাগ্যজনক অভিযানে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি জীবিত না মৃত তাও অনিশ্চিত ছিল। এই ভয়াবহ উৎকণ্ঠায় জর্জরিত হয়ে এবং উত্তরাধিকারী রেখে না যাওয়ার কারণে বিভেদ দেখা দেবে বলে তা নিরসনের আগ্রহে তিনি মৃত্যুশয্যায় তাঁর চাচাতো ভাই সদাশয় উমরকে এবং উমরের পর তাঁর ভাই, আব্দুল মালিকের অপর পুত্র ইয়াজিদকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। নাম দুটি এক খণ্ড কাগজের ওপর লেখা হয় এবং তা সীলমোহর করে তুলে দেওয়া হয় আইয়ুবের পুত্র রাজা নামে একজন বিশ্বস্ত সভাসদের হাতে, রাজপরিবারের সকল সদস্যই সেই কাগজের ওপরই আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

সুলায়মানের চরিত্রে কিছু দোষ ছিল। নিজের লোকদের প্রতি উদার হলেও শত্রুদের ক্ষেত্রে তিনি পিতার মতোই নির্মম ছিলেন। আমোদ ও আরামপ্রিয় হলেও তিনি বিখ্যাত ভেনডোমের মতো জরুরি মুহূর্তে দারুণ উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন। তিনি সমগ্র পূর্বাঞ্চলে অত্যাচারী হাজ্জাজের কয়েদখানাগুলির দ্বার উন্মোচন করে দেন আর এ কাজের জন্যই তিনি জনসাধারণের নিকট হতে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন এবং "আশীর্বাদের চাবিকাঠি" (মিফতাহ-উল-খায়ের) উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি বন্দীদের শুধু মুক্তিই দেননি, তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থও দান করেছিলেন।

দ্বিতীয় উমর (সেপ্টেম্বর, ৭১৭ খ্রিস্টাব্দ)

ধার্মিক খলিফা (আল-কলিফাত-উস-সালেহ) আখ্যাধারী দ্বিতীয় উমর ৯৯ হিজরি সালের সফর মাসে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পিতা আব্দুল মালিকের ভাই আব্দুল আজিজ এক সময় মিশরের রাজপ্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, যেখানে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে। তাঁর মা দ্বিতীয় খলিফার দৌহিত্রী ছিলেন। সুন্নীরা উমরকে পঞ্চম "রাশিদীন" বা আইনসম্মত খলিফার[১] মর্যাদা প্রদান করেন।

তাঁর চরিত্র

তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অকৃত্রিম ধার্মিকতা, তীক্ষ্ণ ন্যায়নীতিবোধ, অটল সততা, সংযম আর প্রায় আদিম সারল্যময় জীবন। তাঁর প্রতি যে পদের ভার অর্পণ করা হয়েছিল তার দায়িত্ব তাঁকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিল এবং সে কারণে তিনি খুব

---

১. হযরত আবুবকর (রা.), প্রথম উমর (রা.), উসমান (রা.) ও আলী (রা.)-কে সুন্নীরা 'রাশিদীন' বা আইনসম্মত খলিফার মর্যাদা দেয়।

চিন্তাগ্রস্তও ছিলেন। একদিন নামাজের পর তাঁকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁর স্ত্রী[১] তাঁর দুঃখের কোনো কারণ ঘটেছে কিনা তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'হে ফাতিমা, আমি মুসলমান ও অজ্ঞাতপরিচয় লোকদের শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছি; যে দরিদ্ররা বুভুক্ষু, যে পীড়িতরা নিরুপায়, যে বিবস্ত্ররা দুর্দশাগ্রস্ত, যে নির্যাতিতরা প্রপীড়িত, যে অপরিচিতরা কারারুদ্ধ, যাঁরা শ্রদ্ধাভাজন বয়োজ্যেষ্ঠ আর যার পরিবার বড় কিন্তু আয় অল্প এবং তাদের মতোই যারা রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও দূরবর্তী প্রদেশসমূহে আমি তাদের কথা চিন্তা করছিলাম, আমি অনুভব করলাম যে, শেষ বিচারের দিন সৃষ্টকর্তা আমার কাছে তাদের প্রতি ব্যবহারের হিসাব চাইবেন এবং কোনো আত্মরক্ষাই সেদিন কার্যকর হবে না বলে আমি ভয় পেলাম আর একারণেই আমি কাঁদলাম।'

সিংসাহন লাভের পরপরই তিনি রাজকীয় আস্তাবলের ঘোড়াগুলি নীলামে বিক্রি করে দেন এবং তার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকেও তাঁর পিতা ও ভাইদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মণিমুক্তাখচিত সমুদয় অলংকার এবং মূল্যবান উপহার সামগ্রী কোষাগারে জমা দিতে বলেন এবং সে অনুরোধ প্রসন্নচিত্তেই প্রতিপালিত হয়। উমরের মৃত্যুর পর তাঁর (ফাতিমার) ভাই ইয়াজিদ সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনি অলংকারগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত মহিলা জবাব দিয়েছিলেন যে, 'আমি তাঁর (স্বামীর) জীবদ্দশায় যেসকল জিনিসের প্রতি আসক্ত হইনি, তাঁর মৃত্যুর পর কেন সেগুলির প্রতি আসক্ত হব?' প্রাচীন শর্তানুসারে খ্রিস্টান ও ইহুদীরা যেসব গির্জা ও সিনাগগুলির অধিকারী ছিল এবং যেগুলি তাদের নিকট থেকে অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল সেগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দেন।

রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ফেদাক নামে একটি বাগান ছিল যা মারওয়ান আত্মসাৎ করেছিলেন। উমর তা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পরিবারবর্গকে ফিরিয়ে দেন। উমাইয়াদের শাসনাধীনে তাঁর সিংহাসনে আরোহনের সময় পর্যন্ত ধর্মীয় মঞ্চ থেকে খলিফা আলী (রা.) ও তাঁর বংশধরদের উদ্দেশ্যে অভিশাপ প্রদান করার একটি প্রথা প্রচলন করা হয়েছিল। উমর এই রীতি বন্ধ করার আদেশ দেন এবং এযাবৎকাল ধরে যে অভিশাপ প্রদান করা হত তার পরিবর্তে বদান্যতা, ক্ষমাশীলতা ও পরোপকারিতার প্রতি জনসাধারণের হৃদয় আকর্ষণের জন্য প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেন। নৈতিক শিথিলতাকে তিরস্কার করা হয়, সামান্যতম অত্যাচারকারীকেও সমুচিতভাবে শাস্তি দেওয়া হয় এবং ইরাক, খোরাসান ও সিন্ধুর নবদীক্ষিত মুসলমানদের ওপর হাজ্জাজ ও তাঁর রক্ষীবাহিনী যে করের বোঝা আরোপ করেছিলেন তা প্রত্যাহার করা হয়। দ্বিতীয় উমরের শাসনকাল ছিল উমাইয়া রাজত্বের সব থেকে আকর্ষণীয় সময়। যে শাসকের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করা। আরঐতিহাসিকগণও তাঁর কাজ ও আশা-আকাঙ্খার মূল্যায়ন করেছেন অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে।

---

১. আব্দুল মালিকের কন্যা এবং শেষ দুই শাসনকর্তার বোন ফাতিমা।

তাঁর শাসনামলে আরব ও আফ্রিকা উভয় দেশেই ধর্মান্ধ খারিজীরা তাদের হাত গুটিয়ে নেয়। এমনকি তারা উমরের নিকট এই মর্মে দূত পাঠিয়েছিলেন যে, তাঁর শাসন ব্যবস্থায় তাদের কোনো আপত্তি নেই, তবে তারা সুলায়মান কর্তৃক উমরের উত্তরাধিকারী হিসেবে পাপী ইয়াজিদের মনোনয়ন লাভ করার প্রতিবাদ করেন। তাঁর দায়িত্বে যে বিশাল সাম্রাজ্যকে সমর্পণ করা হয়েছিল উমর তার সম্প্রসারণে না করে বরং দৃঢ়ীকরণেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কনস্ট্যান্টিনোপল প্রাচীরের পাদদেশে শিবির স্থাপনকারী মাসলামাহর সেনাবাহিনীকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়; সব ধরনের সীমান্ত অভিযান বন্ধ করা হয়; জনসাধারণকে উৎসাহিত করা হয় শিল্পবৃত্তিতে এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছে তাঁদের কর্তৃত্বের সঠিক হিসাব চাওয়া হয়। উমর মুহাল্লিব-পুত্র ইয়াজিদকে সবসময়ই একজন অত্যাচারী হিসেবে দেখতেন, আর অন্যদিকে ইয়াজিদ উমরকে কপটচারী বলতেন। তা সত্ত্বেও এই কপটচারী শাসকই প্রজাদের প্রতি নিজের দায়িত্ব পালনে আন্তরিকভাবে যত্নশীল ছিলেন। অতিরঞ্জিত ভাষায় ইয়াজিদ তাঁর মৃত-মালিকের কাছে লুঠ করা দ্রব্যসামগ্রীর যে বর্ণনা পাঠিয়েছিলেন তিনি তার হিসাব দাখিল করার আদেশ দেন। সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান না করা সত্ত্বেও সম্ভাব্য অপরাধীর প্রতি সেকালের রীতি অনুযায়ী অত্যাচার বা অন্য কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার না করে তাকে আলেপ্পোর দুর্গে বন্দী করা হয়, যেখানে তিনি উমরের মৃত্যু পর্যন্ত বন্দী ছিলেন।

উমরের অধ্যাদেশ

কুফার শাসনকর্তাদের উদ্দেশ্য করে প্রদত্ত এক আদেশনামায় উমর সমস্ত অন্যায় বিধি-নিষেধ বন্ধ করতে বলেন এবং অভিযোগের সমুদয় কারণ নিরসন করতে পরামর্শ দেন। সদাশয় খলিফা বলেন, 'কারণ', 'তোমাদের অবশ্যই জানা উচিত যে, ন্যায়বিচার ও বদান্যতার মাধ্যমেই ধর্মের প্রতিপালন করা হয়। কোনো পাপকে তুচ্ছ মনে করবে না; জনবহুল স্থানকে জনশূন্য করতে চেষ্টা করবে না; প্রজাদের নিকট হতে তাদের সাধ্যাতীত কিছু আদায় করতে চেষ্টা করবে না; তাদের কাছ থেকে ততটুকুই নেবে, যা তারা দিতে পারে; সবকিছুই করবে জনগণের কল্যাণ ও তাদের উন্নতি সাধনের জন্য; কঠোরতার সাথে নয়, নম্রভাবে শাসন করবে; উৎসব উপলক্ষে উপহার-সামগ্রী গ্রহণ করবে না; পবিত্র ধর্মগ্রন্থের (জনসাধারণের মধ্যে যা বিতরণ করা হয়) মূল্য নেবে না; পর্যটক, বিবাহাদি বা উটের দুধের ওপর কোন কর ধার্য করবে না এবং যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তাকে জিজিয়া কর প্রদান করার জন্য কোন পীড়াপীড়ি করবে না।' তাঁর সতেরো বছর বয়সী পুত্র প্রতিশ্রুতিবান তরুণ আব্দুল মালিক, যিনি জনসাধারণের কল্যাণ ও মুসলমান সমাজের সংস্কার সাধনে পিতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি একান্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন, আধা-ভর্ৎসনার সুরে তিনি একদিন উমরের কাছে জানতে চান, যেসব পাপাচার মুসলমান সমাজের অন্তর ক্ষয় করছে তার মূলোৎপাটনে তিনি কেন আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। পিতার জবাব, 'প্রিয় বৎস, তুমি আমাকে যা করতে বলছো তা কেবল তরবারীর সাহায্যেই সম্পাদন করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তরবারীর সাহায্যে যে সংস্কার করা হয় তাতে কোনো মঙ্গল নেই।'

আস-সামহকে স্পেনের রাজপ্রতিনিধি নিয়োগ

৭১৯ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে সহসা বিশৃঙ্খলার দেখা দেয় এবং আল-হুর তার প্রতিবিধান করতে অক্ষম এ কথা জানতে পেরে উমর তাঁকে অপসারিত করেন এবং তাঁর স্থলে খাউলান বংশের মালিকের পুত্র আস-সামহ নামে এক ইয়েমেনী নেতাকে নিয়োগ দান করেন। রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্যে যোদ্ধা ও প্রশাসক হিসেবে খ্যাতিসম্পন্ন আস-সামহকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। খলিফার নির্দেশ মতো আস-সামহ দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও ধর্মের লোকদের একটি আদম শুমারী করেন। একই সময়ে জরিপ করা হয় সমগ্র উপদ্বীপ তথা 'নগরীসমূহ, পরবর্তরাজী, নদনদী, সাগরগুলি'; তাছাড়া মাটির গুণাগুণ, ফসলের প্রকারভেদ, জমির উৎপাদন ক্ষমতা মনোযোগ ও যত্নসহকারে নথিভুক্ত করা হয়। সারাগোসায় একটি বিশাল জুমা মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং বহুসংখ্যক সেতু নির্মাণ বা সংস্কার করা হয়।

বিদ্রোহীদের দমন

স্পেনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পর আস-সামহ খ্রিস্টান বিদ্রোহীদের দমন এবং গথ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ল্যাঙ্গুয়েডক[১] ও প্রোভেনসে উপনিবেশ স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিদ্রোহীরা পরাজিত হয় এবং এস্টুরিয়াসের পর্বতময় গিরিসংকটে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেপ্টিম্যানিয়ার ওপর দিয়ে অভিযান পরিচালনা করার সময় নারবোন তার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় এবং অন্যান্য নগরীও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। সমুদ্র থেকে নারবোনে সহজে প্রবেশ করা সম্ভব হওয়ায় দুর্গ ও সৈন্যসামন্ত দিয়ে সেটিকে সুরক্ষিত করা হয়।

ফ্রান্সে অগ্রসর

আস-সামহ অতঃপর অগ্রসর হন অ্যাকুইটেনের রাজধানী টুলোর দিকে, কিন্তু সেনাদল পিছনে রেখে আসায় ও তাঁর অধীনে সেনাসংখ্যা বেশি না থাকায় তা অবরোধ করা হয়। নগরে চরম আক্রমণ হানার পূর্বেই রাজধানীকে মুক্ত করতে অ্যাকুইটেরেন ডিউক ইউডিস বিশাল বাহিনী নিয়ে হাজির হন। দশ গুণ সংখ্যাধিক্যের সম্মুখীন হয়ে এবং দুই শত্রুর মাঝখানে পড়েও আরবরা তাদের স্বাভাবিক দুর্দম্য সাহসের সাথে যুদ্ধ করে। 'জিতব কিংবা মরব' এই পণ করে সৈন্যরা তাদের তরবারীর খাপ ভেঙে ফেলে যুদ্ধ করেন। 'নেপোলিয়নের পুরনো রক্ষীদল সম্পর্কে যা বলা হয় তখনকার আরব সেনানায়কদের সম্বন্ধেও তা বলা যেতে পারে, তাঁরা মৃত্যুবরণ করবে, তবু কোনমতেই আত্মসমর্পণ করবে না।'

---

১. নারবোন, আগডে, বেজিয়ার্স, লডেভ, কারকাসোন, নিমস ও ম্যাগুয়েলন—এই সাতটি নগরের জন্য একে সেপ্টিম্যানিয়াও বলা হত।

টুলোর যুদ্ধ (আস-সামহের মৃত্যু)

যুদ্ধটি অত্যন্ত ভয়ংকর ছিল এবং বিজয় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলে ছিল, একটি তীর সহসা এসে আস-সামহের গ্রীবাদেশ বিদীর্ণ করে এবং তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাদের মহান নেতার পতন দেখে মুসলমানরা পিছু হটতে শুরু করে, কিন্তু আবদুর রহমান যে তৎক্ষণাৎ সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে এমন অসাধারণ নৈপুণ্য ও সাহসিকতার সাথে তাদের প্রোভেনস থেকে অপসারণ করেন যাতে শত্রুরাও তাঁর প্রশংসা করতে উদ্রেক হয়। উমরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে ৭২১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে টুলোর যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে বিপুল সংখ্যক খ্যাতিমান আরব নিহত হয়।

উমরের প্রবর্তিত কঠোর ও নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা উমাইয়াদের বিপক্ষে গিয়েছিল। তারা দেখল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি তাদের হাত থেকে দ্রুত চলে যাচ্ছে। তিনি তাদের উপস্থিতি দ্বারা সরকারি পদকে কলুষিত করার ব্যাপারে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেন এবং আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারের দাবিদার উত্তেজিত সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের ফলে উত্তরাধিকার পরিবর্তনের কথাও তাঁকে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতে হয়। চিরাচরিত প্রথা অবলম্বন করে তাদের গোত্রের পুণ্যবান সদস্যের হাত থেকে মুক্তি পেতে উমাইয়ার বংশধরদের জন্য এটাই উপযুক্ত সময় ছিল। একজন দাস যে খলিফার সেবায় নিযুক্ত ছিল যাকে ঘুষ দিয়ে বিষ প্রয়োগ করা হয়, যার পরিণাম ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। হিমসের নিকটবর্তী দায়র সিমান (সিমেওনের মঠ) নামক স্থানে ১০১ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে উমর নিহত হন।

দ্বিতীয় ইয়াজিদের সিংহাসন লাভ

সুলায়মানের মনোনয়ন অনুসারে আবদুল মালিকের তৃতীয় পুত্র ইয়াজিদ উমরের স্থলাভিষিক্ত হলেন। ইয়াজিদ হাজ্জাজের ভাইয়ের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত পক্ষপাত ও সহানুভূতি মুদারবংশীয়দের পক্ষে চলে যায়। উমর সতর্কতার সাথে সুদার ও হিময়ার এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছিলেন। ইয়াজিদের সময়ে শেষোক্তদেরকে মুদারবংশীয়দের প্রতিহিংসার পূর্ণ গুরুভার সহ্য করতে হয়। সুলায়মানের শাসনামলে ইয়াজিদ-বিন-মুহাল্লিব অবৈধভাবে ধন-সম্পদ আদায়ের জন্য হাজ্জাজের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নির্মম না হলেও যে কঠোর মনোভাব পোষণ করেছিলেন এটা তারই আংশিক প্রতিফলন ছিল। তাদের নিকট হতে সম্পদ কেড়ে নেবার সময় তিনি হাজ্জাজের ভাইয়ের কন্যা ইয়াজিদের পত্নীকেও নিষ্কৃতি দেননি এবং এ ব্যাপারে তাঁর স্বামীর যুক্তি-তর্কও ঘৃণাভরে উপেক্ষা করা হয়, যিনি শপথ করেছিলেন যে, যদি তিনি কখনো ক্ষমতায় আসেন তাহলে তিনি মুহাল্লিবের পুত্রকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবেন, অন্যদিকে আর একজনও অনুরূপ সাহসের সাথে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি এক লক্ষ বর্শাধারী সেনা নিয়ে তাঁর সম্মুখীন হবেন।

ইয়াজিদ বিন মুহাল্লিবের বিদ্রোহ

আলস্পোর কারাগারে থাকা অবস্থায় ইবনে মুহাল্লিব যে মুহূর্তে শুনলেন যে উমর মারাত্মকভাবে অসুস্থ, সে সময়ই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার নামধারী উমাইয়া

বংশধরের কাছে তিনি কি প্রত্যাশ্যা করতে পারেন। তিনি তাঁর প্রহরীদের ঘুষ দিয়ে ইরাকে পালিয়ে যান, যেখানে তিনি তাঁর ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহ গড়ে তোলে। সে সময় ধর্মীয় দর্শনের প্রবর্তক মহান ইমাম হাসান[১] বসরায় বাস করতেন, তিনি তাঁর অনুগত নাগরিকদের 'অভিশপ্তদের' কারো পক্ষই অবলম্বন না করতে অনুরোধন করেন; কিন্তু চপলমতি লোকেরা আবেগের বশে যোগ দেয় মুহাল্লিব পুত্র ইয়াজিদ ও তাঁর ভাইকে সাহায্য করতে এবং এমনকি তাঁর কাছে আনুগত্যের শপথও গ্রহণ করেছিল; যাঁর বীরত্ব ও বদান্যতা আরবদের মনে প্রভুত প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে উমাইয়া বংশের ইয়াজিদ তাঁর বংশের দুই বীরযোদ্ধা মাসলামাহ্ ও ওয়ালিদের পুত্র আব্বাসের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করলেন। ইউফ্রেটিসের দক্ষিণ তীরে আকরা নামক স্থানে যুদ্ধবাজ এই দুই পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হয়। বিদ্রোহীরা নেতৃত্ব হারায় এবং অধিকাংশ লোকজন তাদেরকে পরিত্যগ করায় অবশেষে তিনি ও তাঁর ভাই হাবিব যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়। অন্য ভায়েরা কারমানে পালিয়ে যান, যেখানে দ্বিতীয় যুদ্ধে কয়েকজন নিহত হয়; অবশিষ্টরা তুর্কী নেতা খাকানের কাছে আশ্রয় নেয়। ইয়াজিদ বিন মুহাল্লিবের বিদ্রোহ এক সময় উমাইয়া শাসনের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল, যা দমন করা সম্ভব হলেও তার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

সাম্রাজ্যের অবস্থা

ইয়াজিদ ইয়েমেন বংশের যে আজদ শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাদের মাধ্যমে কারমান ও ইরাকে ধ্বংস সাধনের জন্য সমগ্র আরব জগতে বিশৃঙখলা দেখা দেয়। স্পেন, আফ্রিকা ও পূর্বাঞ্চলে ইয়েমেনি ও মুদরাবংশীয়রা মারাত্মক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং সবদিকেই ইসলামের শত্রুরা জয়লাভ করতে থাকে; অন্যদিকে সার্বভৌম রাষ্ট্রপ্রধান ও তাঁর উপদেষ্টাগণের অক্ষমতা এবং অযোগ্য শাসনকর্তা মনোনয়নে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। খাজার ও কিপচাকরা যারা ককেসাস অঞ্চলে বসবাস করত তারা আজারবাইজানে প্রেরিত একটি অভিযানকে শোচনীয়ভাবে প্রতিহত করে। ট্রানসকসিয়ানার নতুন শাসনকর্তাদের উৎপীড়নে প্রায় সব সময়ই বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান লেগেই ছিল, যা দমন করা হয় বহু কষ্ট ও প্রাণহানির মধ্য দিয়ে। কেবল এশিয়া মাইনরেই আমরা গ্রিকদের বিরুদ্ধে সাফল্যের কথা জানতে পারি। আফ্রিকায় হাজ্জাজের এক পূর্বতন কর্মচারীকে নিয়োগ করা হলে তাঁর প্রভু ইরাকবাসীদের সাথে যে কঠোর ও নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলেন তিনিও বার্বারদের সাথে তা করতে প্রয়াসী হওয়ায় বিদ্রোহের দেখা দেয়, যা অল্পদিনের মধ্যেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে এবং তা দমন করার জন্য ইয়াজিদের উত্তরাধিকারীর আমলের সাম্রাজ্যের সমুদয় সম্পদের প্রয়োজন হয়েছিল। উমরের শাসনামলে স্পেনে সমতার ভারসাম্য এমনভাবে রক্ষিত হয়েছিল যে কোনো দলের জন্যই তা অভিযোগের কারণ হয়নি, কিন্তু আবার আরম্ভ হল গোত্র-বিভেদ ও রেষারেষির পুরনো কাহিনী এবং প্রতিটি শহরই তাদের আভ্যন্তরীণ কলহে অনেকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

---

১. বসরা থেকে তাঁর ডাক নাম হয়েছিল 'বসরী'।

প্রথম ওয়ালিদের শাসনামলে হাজ্জাজের ভাই ইয়মেনে যে যন্ত্রনাদায়ক কর আরেপ করেছিলেন, দ্বিতীয় উমর তা রদ করেন, কিন্তু তা পুনঃপ্রবর্তনের ফলে প্রদেশের জনগণ সম্পূর্ণভাবে বিমুখ হয়ে ওঠে। উমরের জারি করা সমস্ত ন্যায়সঙ্গত অধ্যাদেশই প্রত্যাহার করা হয়। বিগত শাসনে যে খারিজী সম্প্রদায় আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত ছিল, এখন তারা আবার সেই লোকদের যাদেরকে তারা অবিচারী ও আল্লাহ বিবর্জিত স্বৈরাচারী বলে মনে করত তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।

দ্বিতীয় ইয়াজিদের মৃত্যু (রজব, ১০৫ হিজরি, জানুয়ারি, ৭২৪ খ্রিস্টাব্দ)

এইভাবে সাম্রাজ্য যখন সবদিকে বহু-বিভক্ত, ইয়াজিদ তখন তাঁর হারেমে দুই রমণীর[১] সাথে কালাতিপাত করছিলেন, যাদের সাথে তাঁর সান্নিধ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। হাবাবার মৃত্যু তাঁকে এমনভাবে শোকাভিভূত করেছিল যে পরিবারবর্গকে অশেষ দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দিতে কিছুদিন পর তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিকগণ এই রাজার একটিই প্রশংসনীয় সৎকর্মকে নথিভুক্ত করেছেন, যা উল্লেখের দাবি রাখে। তার মদিনার শাসনকর্তা যিনি হাজ্জাজের প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন তিনি শহীদ ইমাম হুসাইন (রা.)-এর কন্যা ফাতিমাকে বিয়ে করার জন্য আকুতি-মিনতি তাঁকে উত্যক্ত করে তুলছিলেন। কিন্তু ভদ্রমহিলা তাঁর পরিবারের অনাথ শিশুদের লালন-পালনের জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন এই যুক্তি দিয়ে তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। এতে অত্যাচারী দুর্ব্যবহার করে তাঁদের ভয় দেখালে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ফাতিমা ইয়াজিদের কাছে আবেদন করেন, যিনি শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁকে কঠোরভাবে শাস্তি দেন।

আব্বাসীয়দের প্রচারণা

এই ভূখণ্ডে আব্বাসের বংশধদের পক্ষে পূর্বাঞ্চলজুড়ে সক্রিয়ভাবে প্রচারণা শুরু হয়। আব্বাসীয় গুপ্তচররা নিরীহ বণিকের বেশ ধরে খোরাসানে উপস্থিত হয়। কিন্তু মুহাম্মদ যে আব্বাসী বংশের তৎকালীন নেতা ছিল তাঁর জন্য তাদের অধ্যবসায়ী প্রচারণা উমাইয়া শাসনকর্তা সাঈদের[২] কানে পৌঁছতে বাকি থাকলো না। তাদেরকে তাঁর সামনে তলব করা হয় এবং তিনি তাদেরকে ব্যাপকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন; তাদের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর এবং যেসব লোকের সাথে তারা বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল তাদের আশ্বাসে সাঈদ তাদের মুক্তি দিতে রাজি হন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা এমন উদার অথবা এত সহজে প্রতারিত হওয়ার পাত্র ছিল না এবং আব্বাসীয় গুপ্তচররাও তাদের ক্রিয়াকলাপ চালাত, যেখানেই তারা যেত, তাদের প্রাণ হাতে নিয়ে; ধরা পড়লেই সে যুগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদেরকে বর্বরোচিত শাস্তি দেওয়া হত। কিন্তু দমন করার সব রকমের প্রয়াস সত্ত্বেও এই বিপদজনক প্রচারণা তলায় তলায় তাদের গোপন কার্যকলাপ অবিরাম গতিতে চালিয়ে যেতে থাকে, তাদের অনুগামীদের সবদিকেই তালিকাভুক্ত করা হয় এবং ঘৃণ্য

---

১. সাল্লাম ও হাবাব। উভয়ের সম্পর্কেই বলা হয় তাঁরা ছিলেন উঁচুদরের সঙ্গীতজ্ঞা।

২. পারস্য রমণীর মতো বেশভূষা করতেন বলে তাঁকে কৌতুকচ্ছলে 'খোজায়না' বলা হত।

বনু উমাইয়া বংশের ধ্বংস সাধনের জন্য স্বল্প সময়ের মধ্যেই পারস্যকে গুপ্ত সংগঠনগুলি মৌচাকের মতো ঝাঁঝরা করে ফেলে। এ সময় বিভিন্ন কারণ একত্রিত হয়ে ষড়যন্ত্র বিস্তার ও চরম বিদ্রোহ প্রকাশের সহায়ক রুপ লাভ করে, কয়েক বছর পর আকস্মিক ও অতিকায় প্লাবনের মতো যা উমাইয়াদের ভীষণ ধ্বংসের কবলে পতিত করে। উমরের ন্যায়বিচার দ্বারা হাজ্জাজের নিষ্ঠুরতার কথা লোকজনের মন থেকে সামান্য মুছে যেতে না যেতেই ইয়াজিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। নামধারী বিদ্রোহীদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাঁর নিষ্ঠুর আচরণ ইয়েমেনিদের মনে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে। এর পাশাপাশি আরেকটি বিশেষ কারণ আব্বাসীদের ক্ষমতায় আসার পথকে পরিষ্কার করে দেয়। দ্বিতীয় ইয়াজিদের পাপাচার ও অপশাসনে অতিষ্ঠ চতুর্দিকের মানুষের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বংশধরদের তাঁদের অধিকার ফিরিয়ে দেবার ব্যগ্র বাসনা জেগে ওঠে। জনসাধারণ এ ব্যাপারে ইমামদের নির্দেশ পেতে ঐকান্তিকভাবে চেয়ে থাকে, কিন্তু এইসব সাধুপুরুষরা সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন; পার্থিব ব্যাপারে তাঁদের আর কোনো আগ্রহ ছিল না। বনু আব্বাস এই সন্দেহজনক ও অশান্ত অবস্থায় তাদের দাবি ও ছলনা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়।

বনু আব্বাস

তারা রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর এক চাচা আব্বাসের বংশধর, যিনি আব্দুল্লাহ, ফজল, উবায়দুল্লাহ ও কায়সান এই চার পুত্রকে রেখে ৩২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ইবনে আব্বাস নামে পরিচিত আব্দুল্লাহ হিজরি সালের তিন বছর আগে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। চার ভাই-ই 'উটের যুদ্ধে' সামিল হন; এবং সিফফিনের যুদ্ধে যেমন পণ্ডিত তেমনই সুদক্ষ যোদ্ধা ইবনে আব্বাস হযরত আলী (রা.)-এর অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তিনি বারবার খলিফার দূত হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং তিনিই সেই ব্যক্তি হযরত আলী (রা.) যাঁকে মুহাম্মদ (স.)-এর পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করতে চেয়েছিলেন, যখন তাঁর অবাধ্য সেনাবাহিনী তাঁর ও মুআবিয়ার মধ্যকার বিরোধ সালিসীর মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে তাঁকে বাধ্য করেছিল। ইমাম হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের পর ভগ্নহৃদয় ইবনে আব্বাস ৬৭ হিজরিতে সত্তর বছর বয়সে তায়েফে পরলোকগমন করেন। তাঁর পুত্র, মহান খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর নামে যার নামকরণ করা হয়েছিল, তিনিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফাতিমা (রা.)-এর বংশধরদের ঐকান্তিকভাবে অনুগত ছিলেন। তিনি ১১৭ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পরিবারের নেতৃত্ব স্থান অধিকার করেন তাঁর পুত্র মহম্মদ।

আব্বাসীয়দের প্রচারণা

অতিশয় ক্ষমতাবান ও অসীম উচ্চাভিলাষী মহম্মদই প্রথম যিনি স্বয়ং নিজের জন্য খিলাফত দখল করার পরিকল্পনা করেন। তিনি নিজ পরিবারের ইমামদের দাবি ন্যায় অনুমোদিত করার জন্য এক নতুন মতবাদের প্রচলন করেন যে, কারবালায় ইমাম

হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের পর ইসলামের ধর্মীয় নেতৃত্ব তাঁর জীবিত পুত্র আলীর (জয়নুল আবেদীন) কাছের না গিয়ে তা মহম্মদ আল হানফিয়ার[১] ওপর আরোপিত হয়; আল-হানাফিয়ার মৃত্যুর পর তা তাঁর পুত্র আবু হাশিমের ওপর অর্পণ করা হয় , যিনি তা মহম্মদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহকে প্রদান করে যান। এই কাহিনী কিছু কিছু স্থানের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়; কিন্তু অধিকাংশ লোকের নিকট, যারা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বংশধরদের প্রতি অনুরক্ত ছিল, আব্বাসীয় গুপ্তচররা[২] তাদেরকে এই বলে শান্ত করেন যে তাঁরা রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পরিবারের (আহলে বায়ত) জন্যই কাজ করছেন। ফাতিমার বংশের অনুগামী লোকজন এই প্রচারণার পিছনে যে বিশ্বাসঘাতকতা লুকিয়ে ছিল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে ইমামদের অগোচরে এবং তাঁদের অনুমোদন ছাড়াই মহম্মদ বিন আলী ও তাঁর দলকে সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকে, যাতে তাঁর কার্যকলাপ ন্যায়সঙ্গত কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত হিসেবে গৃহীত হয়।

১২৫ হিজরিতে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে মহম্মদ যথাক্রমে তাঁর দুই পুত্র ইব্রাহিম আব্দুল্লাহ আবুল আব্বাস (ডাক নাম 'আস-সাফফাহ') এবং আবদুল্লাহ আবু জাফরকে (ডাক নাম আল-মনসুর) তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে যায় এবং যে প্রচারণা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় শুরু করেছিলেন, তা তাঁর মৃত্যুর পরেও একই নিষ্ঠা, ধৈর্য ও সাহসের সাথে চালিয়ে যাওয়া হয়।

---

১. পূর্বে দ্রষ্টব্য।
২. দাইসবা নাকিব বলা হয়।

অধ্যায়-১১
উমাইয়া বংশ [হাকামের শাখা]-পূর্বানুবৃত্তি
[১০৫-১২৫ হিজরি; ৭২৪-৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ]

হিশামের সিংহাসন লাভ : সাম্রাজ্যের গোলযোগপূর্ণ অবস্থা : হিশামের চরিত্র : পূর্বাঞ্চলের ঘটনাসমূহ : আর্মেনিয়ায় : আফ্রিকায় : খারিজী ও বার্বারদের বিদ্রোহ: 'আভিজাতবর্গের যুদ্ধ' : হানজালা বার্বারদের পরাজয় : স্পেন : আভ্যন্তরীণ বিবা-বিসম্বাদ : বারংবার শাসনকর্তা পরিবর্তন : আবদুর রহমান আল গাফেকীর নিয়োগ: উত্তর ফ্রান্স আক্রমণ: টুর্সের যুদ্ধ : সাধুসন্তদের অতিশয়োক্তি : ফ্রান্সের পুনরাক্রমণ: এভিগনন অধিকার : উকবার বিজয় : তাঁর মৃত্যু : বিধ্বংসী কলহ : ফ্রান্সে আরব স্বার্থের ধ্বংস সাধন : খালিদ আল-কাসরীর পতন : ইরাকে জায়েদের অভ্যুত্থান : তাঁর মৃত্যু : আব্বাসীদের প্রচারণা : আবু মুসলিমের আবির্ভাব : হিশামের মৃত্যু

দ্বিতীয় ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই হিশাম[১] গোত্রবিবাদে জর্জরিত এবং ঘরে-বাইরের অশান্তিতে পরিপূর্ণ এক সাম্রাজ্যের অধিপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। অসভ্য তুর্কমান ও খাজার জাতির উত্তরে অগ্রগামীতা, ধর্মান্ধ খারিজীদের গড়ে ওঠা অসন্তোষজনক ক্রোধ এবং আব্বাসী বংশের গুপ্তচরদের গোপনে পরিচালিত কাজকর্ম পূর্বাঞ্চলে সম্মিলিতভাবে উমাইয়া শক্তির মূল ভিত্তি ধ্বংস করে ফেলেছিল। গৃহযুদ্ধ বা ঈর্ষাপরায়ণ রাজদরবারের ষড়যন্ত্রমূলক নীতির ফলে জাতির কৃতী সন্তানেরা ধ্বংস হন। বিগত রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা তাঁর মন্ত্রীবর্গের ওপর অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করার কারণে প্রশাসন অনুপযুক্ত ও স্বার্থপর পদাধিকারী ব্যক্তিদের হস্তগত হয়, যাঁদের অযোগ্যতা ও কুশাসন জনগণকে অস্থির করে তোলে। মাঝে মধ্যে কিছু লোক অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকচক্রবালে নক্ষত্রপুঞ্জের মতো বিক্ষিপ্তভাবে তাঁদের কর্তব্যপরায়ণতার দ্বারা আলো বিকিরণ করা সত্ত্বেও রাজকর্মচারীদের মধ্যে ব্যক্তিক আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আগের সেই দেশপ্রেম ও ধর্মীয় প্রেরণা একেবারেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই সংকটের মধ্যে ধ্বংসোন্মুখ রাষ্ট্রতরণীকে রক্ষা করার জন্য একজন সুদক্ষ কাণ্ডারীর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাধা-বিঘ্ন এই সম্রাজ্যকে এমনভাবে ঘিরে ধরেছিল যে তা মোকাবিলা করার ক্ষমতা বা যোগ্যতা হিশামের চরিত্রে অল্পই বিদ্যমান ছিল। তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধানের চেয়ে উন্নত

---

১. পুত্র ওয়ালিদ অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় সিংহাসন লাভের অল্পকাল পরেই ইয়াজিদ তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে হিশামকে মনোনীত করতে প্ররোচিত হন; হিশামের মৃত্যুর পর সিংহাসন যাবে ওয়ালিদের কাছে। কিন্তু পিতার জীবদ্দশায় তিনি বয়োপ্রাপ্ত হলে ইয়াজিদকে যারা তাঁর পুত্রের উত্তরাধিকারী মুলতুবী রাখার প্ররোচনা দিত, তাদের তিনি প্রায়শই অভিশাপ দিতেন। মাসউদীর মতে, হিশাম উনিশ বছর ন' মাস ও ন' দিন রাজত্ব করেন।

ছিলেন; রাজদরবারের পরিবেশ পবিত্রতর হয়ে ওঠে, বিগত শাসনের শৈথিল্য বিদূরিত করে শিষ্টাচার প্রতিষ্ঠা করা হয়, সমাজের গলগ্রহ শ্রেণীর কবল থেকে রাজধানীকে মুক্ত করা হয় এবং আদব-কায়দা ও সুষ্ঠু জীবন-যাপনের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর অনাড়ম্বরতা বিষণ্নতার নামান্তর ছিল এবং ব্যয় কুণ্ঠতা অর্থলিপ্সার সামিল ছিল এবং এই দুর্বলতাগুলো তাঁর চারিত্রিক দোষ-ত্রুটিকে আরো গুরুতর রূপে বৃদ্ধি করেছিল। নিজের মতবাদে একাগ্রতা, নিজের সহানুভূতির ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা এবং সন্দেহপ্রবণ চরিত্রের কারণে তিনি কাউকেই বিশ্বাস করতেন না এবং শত্রুপক্ষীয় দলাদলি ও ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে প্রধানত গোয়েন্দাগিরি ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজের ওপরই তাঁর অধিক ভরসা ছিল। মিথ্যা সংবাদ দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়ে সামান্য সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তিনি বহুবার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সেবকদের বলি দিয়েছেন এবং বারংবার শাসনকর্তা বদলের মাধ্যমেও সর্বনাশা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন।

ইরাকের রাজপ্রতিনিধি খালিদ আল-কাসরী

তার শাসনামলে যে অল্প কয়েকজন লোক দীর্ঘ সময়ের জন্য রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, আবদুল্লাহ আল-কাসরীর পুত্র খালিদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম, যিনি হিশামের সিংহাসনারোহণের সময় থেকে ১২০ হিজরি পর্যন্ত ইরাকের রাজপ্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি উদার মতাবলম্বী এবং স্বয়ং ইয়েমেন বংশীয় হওয়ার কারণে কৌশল ও সুবিচারের মাধ্যমে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁর সমগ্র শাসনামলে মুদার ও হিময়ার বংশীয়দের মধ্যে প্রায় কোনো প্রকার সংঘাত হয়নি বললেই চলে। তিনি খ্রিস্টান ও ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতিশীল, ন্যায়ানুগ ও উদার ব্যবহার করতেন; তিনি তাদের গির্জা ও সিনাগগুলো মেরামত করে দেন এবং উচ্চতর বেতনসম্পন্ন ও দায়িত্বপূর্ণ পদগুলো তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তিনি তাঁর দূরদর্শী ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ সুলভ সহনশীলতার কারণে ধর্মান্ধদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন, যা কোন বিশেষ দেশ বা সময়ে সীমাবদ্ধ থাকে না, কিন্তু তাঁর প্রভুর অনুগ্রহ তাঁকে শত্রুদের বিদ্বেষ হতে রক্ষা করে। পনেরো বছর ধরে বিদ্যমান তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাফল্য যেমন অভূতপূর্ব, তেমনই তাঁর পতনও ছিল আকস্মিক।

সোগদিয়ানায় বিদ্রোহ

হিশাম কর্তৃক সিংহাসন লাভের অল্পদিনের মধ্যে খোরাসানে মুদার ও হিময়ারদের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ দেখা দেয়, যা দমন করা হয় অত্যন্ত কষ্টের মাধ্যমে। তাঁর সহকারী শাসনকর্তা যিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত লোকদের জিজিয়া কর মওকুফের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যখন দেখলেন যে বিপুল সংখ্যক লোক এই ধর্ম গ্রহণ করেছে তখন তিনি করভার পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করলে সোগদিয়ানার অধিবাসীরা তাঁর অত্যাচারে বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বিদ্রোহীদের সাথে হারিস নামে এক আরব প্রধানের অধীনস্থ কিছু ঔপনিবেশিকও যোগদান করে; যিনি শাসনকর্তা কতৃক বিশ্বাসভঙ্গের কারণে তাঁর নিন্দা

করেন। তাঁরা ট্রানক্সিয়ানার পূর্বদিকে ঘুরে বেড়ান তুর্কমান যাযাবরদের দলপতির নিকট হতেও সাহায্য পায়।

আসাদ আল-কাসরিকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ—আসাদের খুত্তাল আক্রমণ, ১১৯ হিজরি

গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও ইরাকের রাজপ্রতিনিধি খালিদ তাঁর ভাই আসাদকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে গোলযোগপূর্ণ প্রদেশে পাঠানোর পূর্ব পর্যন্ত বিদ্রোহ দমনের কাজ ফলপ্রসূ হয় না। বিদ্রোহীরা ফারগানা থেকে বিতাড়িত হয় এবং তুর্কমানদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই যাযাবররা তাদের আক্রমণ দ্বারা দেশে লাগাতার বিক্ষোভ বজায় রাখত বলে ১১৯ হিজরিতে আসাদ ফারগানার পূর্বদিকে খাকানের[১] বিশেষ রাজ্য খুত্তালের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু তা তাঁর অগ্রগামী সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ প্রতিহত করা এবং প্রচুর পরিমাণে লুটের সম্পদ সংগ্রহ করা ছাড়া শত্রুদের ওপর আর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি; শীতের প্রাদুর্ভাবের কারণে তিনি অবিলম্বে বলখে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। এখানে তিনি শীতকালীন আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেনাদেরকে দেশে পাঠিয়ে দেন। এদিকে তুর্কমানরা এটিকে লুটতরাজের উপযুক্ত সময় মনে করে আবার ট্রানক্সিয়ানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে চারদিকে হত্যা ও লুটপাট করতে থাকে। এভাবে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থাকাকালে শাসনকর্তা তাদের আক্রমণ করেন, যিনি তাঁর লোকদের একত্রিত করেন পর্বত শিখরে আলোক-সংকেত প্রজ্বলিত করে এবং বস্তুতপক্ষে তাদের বিদ্ধস্ত করেন।

খাকান নিহত

খাকানই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পালিয়ে যেতে সমর্থ হন, কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি নিজ দলের একজন সর্দারের হাতে নিহত হয়। হিশাম প্রথমে এই খবর অল্পই বিশ্বাস করেন এবং প্রকৃত সত্য যাচাই করার উদ্দেশ্যে একদল বিশেষ দূত পাঠান। যখন জানা গেল যে ইসলামের এই দুর্দান্ত শত্রুর প্রকৃতই মৃত্যু ঘটেছে, তখন দামাসকাসে বিরাট আনন্দোৎসব চলতে লাগল।

সায়রার পুত্র নাসরকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ

ভাই খালিদ ইরাকের রাজপ্রতিনিধির পদ থেকে পদচ্যুত হওয়ার কিছুদিন আগে হিজরি ১২০ সনে আসাদের মৃত্যু হয়। খোরাসানের শাসনকর্তা হিসেবে সায়য়ারের পুত্র নাসর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, সকল প্রকার ষড়যন্ত্র করা সত্ত্বেও যিনি ১৩০ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। নাসর দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে মধ্যপন্থী মানুষ ছিলেন এবং তাঁর দায়িত্বে সমর্পিত জনগণের মঙ্গল কামনায় তিনি সর্বদা ব্যাকুল থাকতেন। শুরুতে

---

১. তুর্কমান যাযাবরদের নেতার এই খেতাব ছিল। চেঙ্গিস ও তাঁর উত্তরাধিকারীরাও এই উপাধীতেই পরিচিত ছিল আরবদের কাছে।

এবং নতুন করে মুদার ও হিময়ারদের মধ্যে কলহ দেখা দেওয়ার পূর্বে তাঁর শাসন ব্যবস্থা শুধুমাত্র তেজোদৃপ্তই ছিল না, বরং ন্যায়পরায়ণ এবং উদারও ছিল। সোগদিয়ানার বিদ্রোহী অধিবাসীরা যারা তখনো তুর্কমান রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাদেরকে বশ্যতায় স্বীকার করে ফিরে আসার আহ্বান করা হয়। তারা দুটি শর্ত উত্থাপন করে—প্রথমত, কাউকে তার ধর্মের জন্য নির্যাতন করা হবে না কিংবা উপযুক্ত বিচার ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না এবং দ্বিতীয়ত, ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করাকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। নতুন শাসনকর্তা কর্তৃক এই শর্তগুলো মেনে নেওয়া হয় এবং সোগদিয়ানারা তাদের নিজের ঘরে ফিরে আসে।

উত্তর পারস্য ও আর্মেনিয়া

মধ্য এশিয়ায় যখন এসকল ঘটনা ঘটছে তখন উত্তর পারস্য ও আর্মেনিয়া ককেসাস অঞ্চলের অধিবাসীদের আক্রমণে নির্যাতিত হচ্ছে। হিশামের ভাই মাসলামাহ সে সময় মেসোপটেমিয়া (জাজিরা নামে খ্যাত), আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান প্রদেশসহ আর্মেনিয়ার শাসনকর্তার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। হিজরি ১০৮ (৭২৭ খ্রিস্টাব্দ) সনে তুর্কীদের এক বিরাট বাহিনী কর্তৃক পারস্য আক্রান্ত হয়, যারা আরাস পর্বতমালার অপর পার্শ্বের অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসে আজারবাইজানকে বিধ্বস্ত করে; শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয় ও তাদেরকে প্রদেশের বাইরে বিতাড়িত্ করা হয়।

খাজারদের আক্রমণ—আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা জাররাহ নিহত

কিন্তু তাঁরা এত সহজে পারস্যে প্রবেশ করেছিল যে সেটা অন্যান্য গোত্রকেও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে এবং তার চার বছর পর খাজার সম্প্রদায়ের দুর্ধর্ষ তুর্কী যাযাবররা আর্মেনিয়ায় অনুপ্রবেশ করে। আরব শাসনকর্তা জাররাহ যিনি মাসলামাহর স্থলাভিষিক্ত হন তিনি আরদেবিলের নিকট পরাজিত ও নিহত হন এবং বর্বরের দল মসুল পর্যন্ত সমস্ত দেশকে বিধ্বস্ত করে দেয়।

সাঈদ আল-হারশি কর্তৃক খাজারদের পরাজয়

এখানে তারা সাঈদ আল-হারশি কর্তৃক সংগৃহীত মূলত স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত এক সেনাদলের সাথে মিলিত হয়, হিশাম তাঁকে দ্রুত ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেছিল, যাঁর হাতে তারা ভয়ংকর ধ্বংশযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে পরাজিত হয়। হতোদ্যম যাযাবররা তাদের বন্দী ও সংগৃহীত লুটের মাল পিছনে ফেলে আরাস পর্বত অতিক্রম করে পালিয়ে যায়, যেগুলো প্রকৃত মালিকদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

মাসলামাহর পুনর্নিয়োগ—অপসারণ—মারওয়ানের নিয়োগ

বিকৃত বুদ্ধিসম্পন্ন চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিশাম এবার সাঈদকে বরখাস্ত করে মাসলামাহকে পুনর্নিয়োগ করেন। এক বছর পর মাসলামাহকে আবার অপসারিত করা

হয় এবং পদটি মারওয়ানকে[১] দেওয়া হয়, যে পরবর্তীতে সিংহাসন দখল করেন। মারওয়ান খাজারদেরকে তাদের নিজেদের প্রদেশে পরাজিত করার মাধ্যমে তার পদারোহণকে চিহ্নিত করে রাখেন। জর্জিয়া জয় করা হয় এবং লেসগিস ও অন্যান্য পার্বত্য জাতিদের দমন করা হয়। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের যাযাবরদের বিরুদ্ধে মারওয়ানকে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয় , যারা তাঁর ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছিল এবং সাম্রাজ্যের সম্পদের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছিল।

দক্ষিণ আরব

দক্ষিণ আরবেও অত্যন্ত সমস্যা বিদ্যমান ছিল; যখন খারিজীরা কয়েকবার ইরাক আক্রমণ করে এবং তাদের দমন করার জন্য বিশাল সেনাবাহিনী নিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

আফ্রিকায় ও স্পেন—১২২ হিজরিতে সার্দিনিয়া ও সিরাকুজ বিজয়

আফ্রিকা ও স্পেনে কিছু সময়ের জন্য শান্তি বজায় ছিল এবং সাম্রাজ্যেরও কিছুটা বিস্তার ঘটেছিল। কালাভূমি ১১৫ হিজরিতে দখলে আসে এবং পরের বছর সার্দিনিয়া জয় করা হয়। ১২২ হিজরি সনে সিসিলি আক্রান্ত হয় এবং এক তুমুল যুদ্ধের পর সিরাকুজ দখলে আসে। ফ্রান্সেরও কিছু অংশ বিজিত হয় এবং পশ্চিমাঞ্চলে হিশামের ভাগ্য মোটামুটি প্রসন্ন বলেই মনে হয়। কিন্তু বছর অতিবাহিত হতে না হতেই বার্বার ও খারিজীদের ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহের কারণে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা ধ্বংশযজ্ঞে পরিণত হয়। এ সময়েই মরিটানিয়ায় আবির্ভাব ঘটে এক নতুন ধর্মান্ধ সম্প্রদায়ের। তারা নিজেদেরকে সোফারিয়া বলত এবং উগ্রতা ও গোঁড়ামিতে পূর্বাঞ্চলের আজারিকা সম্প্রদায়ের সমতুল্য ছিল। তাদের পূর্বাঞ্চলীয় ভাইদের মতো নির্যাতনে উন্মত্ত হয়ে অত্যাচারীদেরকে তারা কাফেরদের চেয়েও জঘন্য ভাবত এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংশ করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। যারা উমাইয়া শাসনের আনুগত্য স্বীকারকারী সকলকেই তারা অবিশ্বাসী হিসেবে গণ্য করত।

খারিজী ও বার্বারদের বিদ্রোহ—সন্ত্রাস্তদের লড়াই

রাজ প্রতিনিধির পুত্র, যিনি তাঞ্জিরে পিতার ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কাজ চালাচ্ছিলেন, তাঁর অত্যাচারে ও মুসলমানদের ওপর তার জিজিয়া কর আরোপের চেষ্টা দেখে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে বার্বারদের সাথে যোগদান করে, তারা সদলবলে বিদ্রোহী করে শাসকর্তাকে হত্যা করে এবং শহরটি দখল করে নেয়। তাঞ্জির থেকে তারা কাইরোয়ানের দিকে অগ্রসর হয়। পরবর্তী সমস্ত অগ্রগতি এবার সিসিলিতে রুদ্ধ হয়ে যায় এবং ওই দ্বীপে কর্মরত সেনাপতিকে[২] বার্বারদের বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠানো হয়। রাজধানী

---

১. বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম মারওয়ানের পৌত্র। তাঁর পিতার নাম মহম্মদ।

২. উবাইদাহর পুত্র হাবিব।

আক্রমনের পথে বিদ্রোহীরা সিসিলির সেনাপতিপুত্রের সম্মুখীন হয়, যার সঙ্গে বর্বর বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমান সেনাদল ছিল। গুরুতর সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও আরবদের সহজাত দুঃসাহসিকতা ও ধৃষ্ঠতার কারণে তৎক্ষণাৎ তাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বীরোচিত সাহস সংখ্যাধিক্যের বিরুদ্ধে কার্যকরী হয় না; আরব সেনাপ্রধানরা চিরাচরিতভাবে তাঁদের তরবারীর খাপ ভেঙে ফেলেন এবং দাড়ানো অবস্থায়ই যুদ্ধ করতে আরম্ভ করে দেয়। তাদের সেনারাও নেতাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। আরবরা অবরুদ্ধ ও অসহায় হয়ে পড়ে এবং তাদের প্রায় প্রত্যেকেই নিহত হয়। যেহেতু ওইদিন বহু সংখ্যক আরব অশ্বারোহী ও বীরপুরুষ নিহত হয়, সে কারণে ইসলামের ইতিহাসে এই সর্বনাশা যুদ্ধ 'সম্ভ্রান্তদের লড়াই'[১] নামে পরিচিত। ইবনে হাবিবের সেনাবাহিনীর ধ্বংস সমগ্র উত্তর আফ্রিকাকে অরাজকতার মধ্যে পতিত করে। এমনকি স্পেনেও তার প্রভাব পড়ে, সেখানকার লোকজন তাদের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাঁর স্থলে হিশাম কর্তৃক পদচ্যুত একজন কর্মচারীকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। সেনাদলের বিপর্যয়ের সংবাদ হিশামকে ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং তিনি তাঁর ক্রোধবহ্নির পূর্ণ দাহ বিদ্রোহীদের ভোগ করানোর শপথ করেন। যে রাজপ্রতিনিধির পুত্রের অপশাসনের কারণে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটেছিল, তাঁকে বরখাস্ত করা হয় এবং বিপর্যয়ের প্রতিকার করতে তার স্থানে কুলসুম (কুলথুম) নামে এক দক্ষ সেনাপতিকে দ্রুত পাঠান হয়। যুদ্ধের সময় তাঁর দুই সেনাপ্রধানের মধ্যে এক অশোভন কলহের স্বাভাবিক পরিণাম দেখা দেয়; আরবরা পুনরায় পরাজিত হয় এবং তাদের প্রধান নেতৃবৃন্দ নিহত হয়। সিরীয় বাহিনীর একাংশ স্পেনে চলে যায়, আর অবশিষ্টরা গিয়ে পড়ে কাইরোয়ানে, যা তখন বার্বার ও এক বিদ্রোহী নেতা ওকাশা[২] যে কেবস নামক স্থানে অস্ত্রধারণ করেছিল; ধর্মান্ধরা তার নেতৃত্বে যা অবরোধ করে রেখেছিল। বর্বরদের বারবার করে আসা আক্রমণ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রতিহত হয় এবং ওকাশা কিছু সময়ের জন্য মরুভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

হানজালা আফ্রিকার রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত

হিশাম এবার কালব গোত্রের সাফওয়ানের পুত্র হানজালাকে আফ্রিকার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দান করেন। কায়রোয়ানে পৌঁছানোর পর হানজালার প্রথম কাজ হয় দুর্গগুলোতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং প্রতিরক্ষাকারীরদেরকে সাহস দান করা। তিন লক্ষ বার্বার সৈন্য অতর্কিতভাবে আক্রমন করে আফ্রিকার রাজধানীর প্রবেশ ও বহির্গমনের পথ বন্ধ করে দেওয়ায় অবিলম্বে তাঁর সেনাপত্য ও উদ্ভাবনী বুদ্ধির পরীক্ষা দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়। আরবরা শোচনীয় অবস্থায় পড়ে, কিন্তু হানজালা ছিলেন গোষ্ঠীর প্রাচীন বীরপুরুষ। সেই অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার যুগে তিনি হযরত উমর (রা.)-এর দিনগুলোর ধর্মীয় উদ্দীপনার সাথে অন্তরের স্নিগ্ধতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। জুমা

---

১. গাজওয়াতুল আশরাফ।
২. সোফরিয়া শাখার খারিজী।

মসজিদের সামনে বিশাল চত্বরে দাঁড়িয়ে তিনি বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে লোকদের বোঝালেন যে, অবরুদ্ধ মুসলমান ও বাইরে অবস্থানকারী বিদ্রোহীদের এই লড়াই তাদের জীবন ও মৃত্যুর সাথে জড়িত, যাতে বার্বারদের বিজয়লাভের অর্থ হল নগরের নাগরিকদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা, যাতে বয়স বা স্ত্রী-পুরুষ ভেদে কেউই রক্ষা পাবে না। এই সংকট কখনোই ইসলামের ইতিহাসে বিস্মৃত হবার নয়। যখন ক্রোধোন্মত্ত অবরোধকারী সৈনারা নগরীর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন ক্লান্ত রক্ষীবাহিনী ভগ্নহৃদয়ে কেল্লার প্রাচীরে দাঁড়িয়ে তাদের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছিল। হানজালা স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন করলে নগরবাসীরা তৎক্ষণাৎ তার আবেদনে সাড়া দেয়। বিপদে অভ্যস্ত এবং অস্ত্রধারণে সমর্থ আরব রমণীরা যুদ্ধক্ষেত্রে বহুবার স্বামী ও ভাইদের উপযুক্ত সহকারিণী হিসেবে নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করেছিল। হানজালা রমণীদের একটি সংরক্ষিত বাহিনী গঠন করেন, যারা সেনাবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকরা কর্তৃক শত্রুকে আক্রমণ করার সময় নগর রক্ষা করবে। হানজালা ও তাঁর কর্মচারীরা পরবর্তী দিনের যুদ্ধের জন্য সমস্ত রাত অস্ত্র বিতরণ করেন এবং বিভিন্ন আদেশ ও উপদেশ দানে ব্যাপৃত থাকেন। ফজরের নামাজ আদায়ের পর রক্ষীবাহিনী তাদের তরবারীর কোষ ভেঙ্গে ফেলে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। প্রচণ্ড ও ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলতে থাকে যাতে বর্বররা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। বিদ্রোহীদের জোটবদ্ধতা ও প্রতিরোধের সমস্ত ক্ষমতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে অনুসরণ করা হল। বলা হয়ে থাকে যে এই যুদ্ধে প্রধান নেতৃবৃন্দ সহ প্রায় এক লাখ আশি হাজার বার্বার নিহত হয়, পক্ষান্তরে আরবদের গুরুতর ক্ষতি হলেও তা ব্যাপক ছিল না। আরবরা যে কি সমস্যায় পড়েছিল এবং হানজালার বিজয় লাভে যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বিদ্রোহীদের ধ্বংস সাধনের পর কায়রোয়ানের সমস্ত মসজিদে আদায়কৃত শোকরানা (ধন্যবাদসূচ) নামাজের ঘটনার মাধ্যমে আলোকপাত হয়। হানজালা এবার বিদ্রোহী এলাকাগুলোতে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন এবং তিনি যতদিন শাসনকার্য পরিচালানা করেন ততদিন দেশ বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত ছিল; তাঁর শান্ত ও সুশাসনে উত্তর আফ্রিকা আবার তার সমৃদ্ধি দ্রুত ফিরে পায়।

আন্দালুসিয়া বা স্পেন

বিশাল আন্দালুসিয়া উপনিবেশ গ্যাসকনি, ল্যাউয়েডক ও সেভয়ের অংশবিশেষসহ আইবেরিয়ান উপদ্বীপ নিয়ে গঠিত ছিল এবং এটা ছিল উমাইয়া খিলাফত সময়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অন্যান্য দেশ বা অঞ্চলে সচরাচর যেটা দেখা যায়; সেরকমই এই অঞ্চলের অধিবাসীরাও আরবদের রাজত্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজয়ীদের আচার-আচরণ ও সভ্যতা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল থেকে এর দূরত্ব কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে দুর্বল করে তোলে এবং যে পদ্ধতিতে শাসন পরিচালিত হত তাতে সর্বদাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে থাকে। আধুনিক ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত অনুসারে বলা যায়, স্পেন 'ইফ্রিকিয়ার' একটি অধীনস্থ প্রদেশ ছিল এবং খলিফার অনুমোদন ছাড়াই কায়রোয়ানের রাজপ্রতিনিধি আন্দালুসিয়ায় শাসনকর্তা নিয়োগের ক্ষমতালাভ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবে গোত্রীয় বা

পারিবারিক পক্ষপাতিত্বের জন্য জনস্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া হত এবং ঘন ঘন শাসনকর্তা পরিবর্তনের ফলে গৃহযুদ্ধ দেখা দিত।

স্পেনের শাসনকর্তা আনবাসাহ

টুলোস প্রাচীরের পাদদেশে আস-সামহ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর স্থানে সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্বাচিত আব্দুর রহমান (আল গাফেকী) স্থলাভিষিক্ত হন; কিন্তু আফ্রিকার রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক মনোনীত শাসনকর্তা আনবাসাহর উপস্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাত্র কয়েক মাস তিনি ওই পদে নিযুক্ত ছিলেন। 'অত্যন্ত সাহসী, বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন, আচার-আচরণে সৎ এবং বিচারে পক্ষপাতহীন মানুষ' বলে বর্ণিত আব্দুর রহমান তাঁর উত্তরাধিকারীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত উপদ্বীপের বিরোধী শক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ১০৩ হিজরি সনের সফর মাসে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। হিশামের সিংহাসন লাভের অল্প দিনের মধ্যেই আনবাসাহ ফ্রান্সে অভিযান চালান, যার ফলে কারকাসোন, নিমস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান বিজয় করা হয় এবং প্রতিবেশী গথ সম্প্রদায়ের সাথে একটি রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বেজার ইসিডোরের মত অনুসরণ করে রিডন বর্ণণা করেন, 'আনবাসাহর বিজয় লাভ করা অধিক সম্ভবপর হয়েছিল শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগের চেয়ে কৌশল ও সুবন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার কারণে এবং অধিবাসীদের নিকট তাঁর সুনাম অর্জনের চেষ্ঠা যা দক্ষিণ ফ্রান্সে আরবদের অবস্থানকে মজবুত করেছিল।' ফরাসী নগর সমূহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রধদানদেরকে বার্সিলোনায় পাঠান হয়, যেখানে তারা সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার লাভ করে এবং তাদেরকে প্রদেশের অধিবাসীরাও সাহায্য করে ও আরবদের মধ্যে ঐক্য বন্ধন স্থাপিত হয়।

আনবাসাহর মৃত্যু (শাবান, ১০৭ হিজরি; জানুয়ারি, ৭২৬ খ্রিস্টাব্দ)

দুর্ভাগ্যবশত পীরেনিজ গিরি-সংকটে ওঁৎ পেতে থাকা বিদ্রোহী বিসকেয়ানরা আনবাসাহকে হত্যা করে। তাঁর মৃত্যু উপদ্বীপকে আবার বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিক্ষেপ করে, ফ্রান্সের সকল অভিযান বন্ধ হয়ে যায় এবং তাঁর সহকারী উজরাহ (উধরাহ) অধিকাংশ সেনা নিয়ে দ্রুত স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেন। আনবাসাহর মৃত্যু থেকে ১১৩ হিজরি সনে আবদুর রহমানের পুনর্নিয়োগ পর্যন্ত পাঁচ বছরে পাঁচজন শাসনকর্তা প্রদেশ শাসন করেন, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মাত্র কয়েক মাসের জন্য তাঁদের পদে বহাল ছিলেন। এসব পরিবর্তনের ফলে দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে পড়ে এবং এ সময়ে পিলায়োর অধীনস্থ বিদ্রোহীরা শক্তি সঞ্চয় করে। ১১১ হিজরি সনে হায়সেম (হায়থেম) স্পেনে এলে তাঁর শাসনকালে এদের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করার জন্য কয়েকবার চেষ্ঠা করা হয় এবং পীরেনিজের অপর পার্শ্বে রাজ্য বিজয়ের কাজ পুনরায় আরম্ভ করা হয়। অধিকৃত হয় লিয়নস, ম্যাকন ও চ্যালোনস-অন-দ্য-সায়ন, অবরুদ্ধ ও লুণ্ঠিত হয় বিউন ও অটান এবং অন্যান্য স্থানগুলোকেও করের আওতায় আনা হয়। কিন্তু এই আক্রমণ শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় না, কারণ নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কারণে আরবরা এই শহরগুলোতে তাদের অধিকার টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয় এবং যে বার্বাররা আরব সেনাদলের প্রধান

অংশ ছিল, তাদের বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ সেপটিম্যানিয়ানদেরকে ঘোর শত্রুতে পরিণত করে।

আবদুর রহমান আল-গাফেকী স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত

হায়সেমের মৃত্যুর পর হিশাম আবদুর রহমান আল-গাফেকীকে আন্দলুসিয়ার শাসনকর্তার পদ পূরণের জন্য আবহ্বান করা হয়। উপদ্বীপের জন্য শুভ লক্ষণ বিবেচনা করে স্পেনবাসীরা তাঁর নিয়োগকে স্বাগত জানায়; উমাইয়া আমলের শাসনকর্তাদের মধ্যে আবদুর রহমান তুলনাহীনভাবে সবচেয়ে দক্ষ ও দেশপ্রেমী শাসনকর্তা ছিলেন।

তাঁর চরিত্র ও প্রশাসন

তিনি উচ্চ পর্যায়ের বেসামরিক শাসন দক্ষতার সাথে সর্বোচ্চ সামরিক প্রতিভার সমন্বয় সাধন করেছিলেন। হিময়ার ও মুদার উভয় গোত্রের ওপরই তাঁর অপরিসীম প্রভাব ছিল; অন্যদিকে সৈন্যগণের নিকট যেমন শ্রদ্ধেয় ছিলেন, তেমনি তাঁর শান্ত স্বভাব, উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা তাঁকে জনগণের কাছেও আদরণীয় করে তুলেছিল। চতুর্দিক থেকে আসা অভিযোগের নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রাদেশিক নগরসমূহ এবং জেলাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে পরিভ্রমণ করতেন; এমনকি 'কায়িদ' বা স্থানীয় প্রশাসকদের মধ্যে কর্তব্যে অবহেলা বা বিশ্বাসঘাতকতার দোষ দেখা দিলে তাঁদেরকে বরখাস্ত করতেন এবং মর্যাদাসম্পন্ন ও সৎ ব্যক্তিদেরকে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করতেন; সমান ব্যবহার ও বিচার করা হত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর লোকের প্রতি; খ্রিস্টানদের কাছ থেকে যেসব গির্জা অন্যায়ভাবে দখল করা হয়েছিল সেগুলোকে তার ন্যায্য দাবিদারের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়; রাজস্ব ব্যবস্থা যত্নসহকারে সংশোধন করা হয় এবং জনগণের শান্তির বিরোধী বিশৃঙ্খলাসমূহ কঠোরভাবে দমন করা হয়। কিন্তু শাসন-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের কাজ করা সত্ত্বেও উত্তর সীমান্তে প্রতিরক্ষার প্রতি সে যে প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিল তা থেকে তাঁর মনোযোগকে সরিয়ে নিতে পারেনি। টুলোর সামনে আরবদের দুর্ভাগ্যবশত যে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে অণুপ্রাণিত হয়ে এবং তারিক ও মুসার গৌরবময় কৃতিত্বের সমকক্ষ হওয়ার নেশায় তিনি উত্তরাভিমুখী অভিযানে অপ্রতিহত হিসেবে পরিগণিত হতে পারে এমন এক সেনাবাহিনী তৈরি করার জন্য বিরামহীনভাবে চেষ্টা করেন। সে সময়েও ধর্মীয় অনুভূতি ছিল চরম পর্যায়ে এবং একজন অভিজ্ঞ ও সাহসী সেনাপ্রধানের অধীনে কাজ করতে বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক আকৃষ্ট হয়েছিল।

মুনুজার বিদ্রোহ—তাঁর মৃত্যু

সেকালের খ্রিস্টান লেখকরা পীরেনিজ পর্বতের অন্য পার্শ্বে অবস্থিত কার্ডানের মুসলমান শাসনকর্তাকে মুনুজা নামে অভিহিত করতেন, যাঁর আসল নাম উসমান বিন আবু নেসা বা আবু নেজা, তিনি অ্যাকুইটেনের ডিউক ইউডসের সুন্দরী কন্যা ল্যামপেজীকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর সাথে একটি রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ

হয়েছিলেন। শ্বশুরের সাথে মিলিত হয়ে তিনি বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। আবদুর রহমানও বিদ্রোহ উপেক্ষা করার পাত্র ছিলেন না। আল-বাব[১] যেখানে মুনুজা সস্ত্রীক বাস করতেন সেখানে জরুরী ভিত্তিতে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল। বিদ্রোহী নেতা পর্বতের দিকে পলায়ন করলেন। তাঁকে পাকড়াও করে হত্যা করা হয়। তাঁর হতভাগ্য স্ত্রী আব্দুর রহমানের সহকারীর হাতে বন্দী হয় এবং তাঁকে সসম্মানে দামাসকাসে পাঠান হয়, পরবর্তীতে সেখানে তিনি হিশামের এক পুত্রকে বিয়ে করেন। মুনুজার পরাজয় ও মৃত্যুতে তিনি যে সকল খ্রিষ্টান রাজ্যগুলোর সাথে বন্ধুতের সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন সেসব রাজ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং পূর্ব পরিকল্পিত উত্তরাঞ্চল আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আবদুর রহমান যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন।

উত্তর ফ্রান্স আক্রমণ

৭৩২ খ্রিষ্টাব্দের বসন্তকালে তিনি আরাগণ ও নেভারের পথ ধরে বায়গোরাল ও বেয়ার্ন উপত্যকা দিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করেন। আরব লেখকদের বর্ণনা অনুসারে নির্জন বিস্তীর্ণ সমতলে অবস্থিত এবং সমুদ্র থেকে তিন লীগ দূরে একটি নদীর ওপর নির্মিত আর্লস নগরী কর প্রদানে রাজি হয়েছিল। কিন্তু মুনুজার মৃত্যুতে তারা তার সাথে কর সন্ধি মেনে চলতে অস্বীকার করে।

আর্লসের আত্মসমর্পণ : বরডাক্স বিজয়

আবদুর রহমান প্রথম অভিযান পরিচালনা করেন আর্লসের বিরুদ্ধে, রোন নদীর তীরে সংঘটিত এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর নগরীটি আত্মসমর্পণ করে। আর্লস থেকে আবদুর রহমান এবার বরডোক্সের দিকে অগ্রসর হয়, যেটি দখলে আসে সামান্য প্রতিরোধের পর।

দরদোনের যুদ্ধ—ইউডসের পরাজয়

অ্যাকুইটেনের ডিউক দরদোনের যাত্রা অভিমুখে বাধা দিতে গেলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বেজার ইসিডোর বর্ণনা করেন, কি সংখ্যক খ্রিষ্টান যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তা একমাত্র আল্লাহই জানত। এই বিজয়ের সাথে সাথে অ্যাকুইটেনের সমস্ত বিরোধিতার অবসান ঘটে; বারগান্ডি আক্রমন করা হয় এবং লাইয়নস, বেসানকন ও সেনস নগরীর প্রাচীরের উপর ইসলামের গৌরবময় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এসব নগরীতে শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিযুক্ত রাখা হয়, যা তাঁর বাহিনীকে দুর্বলও করতে সক্ষম হয়েছিল, এরপর বিজয়ী সেনাপ্রধান ফ্রাংক রাজ্যের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন।

---

১. 'আল-বাব' অর্থে দ্বার বোঝায় এবং তা ইঙ্গিত দেয় যে, পীরেনিজ পর্বতের অন্যতম পথে নগরটির অবস্থান ছিল। বলা হয় এটি অবস্থান ছিল মাউন্ট লুইসের পশ্চিমে পুইসারডার অদূরবর্তী স্থানে, যেভাবে এটি প্রায়শই চিহ্নিত হয়।

হেরিস্টালের পিপিনের পুত্র চার্লস

দরদোন নদীর তীরে পরাজয়ের পর আক্রমণকারীদেরকে নিজে পরাজিত করতে অসমর্থ হওয়ায় ইউডস হেরিস্টালের পিপিনের জারজ পুত্র চার্লসের[১] কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। মেরোভিনজিয়ান রাজসভায় প্রাসাদ পরিচালক (মেয়র অব দ্য প্যালেস) হিসেবে ফ্রাংকদের ওপর যিনি স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় আচরণ করতেন। দক্ষ ও বিবেকহীন চার্লস ইউডসের আবেদনকে স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাতে সাড়া দেন। দানিয়ুব ও এলব উপকূল এবং জার্মানির বনভূমি অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক অসভ্য সহকারী সেনা সংগ্রহ করে তিনি দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। এরই মধ্যে আরবরা টুর্সের উপর চড়াও হয়ে আক্রমন করে বসে, যা বিজয় করা হয় প্রবল আক্রমণের মাধ্যমে। এরপর কঠোর নির্দেশ সত্ত্বেও অর্ধসভ্য বার্বাররা টুসের প্রতি অমিতাচার প্রয়োগে আরব সৈন্যরা যে সর্বনাশের শিকার হয়েছিল লেখকরা তাকে আল্লাহর গজব হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ফ্রাংকদের শক্তি সম্পর্কে গুপ্তচরদের দ্বারা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে আরব সেনাপতি যখন লয়ের নদী অতিক্রমের চেষ্টা করছিলেন তখন দলবল সহ চার্লসের আগমন দেকে তাঁর ভ্রান্তি দূর হয়। সংখ্যার দিক দিয়ে শত্রুদের ব্যাপকতা প্রত্যক্ষ করে তিনি দ্রুত তাঁর সেনা ছাউনিগুলো তুলে নেন এবং নদী তীর থেকে প্রত্যাবর্তন করে টুরস ও পয়িকটিয়ার্সের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন। নিজের সৈন্যদলের অবস্থাও আবদুর রহমানের গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। গণিমতের সম্পদে পরিপূর্ণ গোত্রীয় বাহিনীগুলো সর্বদাই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপ্রবণ ছিল এবং গোত্রগুলো পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অনিচ্ছুক হয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য দাবি জানাচ্ছিল। উত্তরাঞ্চল অভিযানে তারা যে গণিমতের সম্পদ সংগ্রহ করেছিল এবং তাতে যেভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছিল তাতে তাদের মধ্যে যথেষ্ট অনীহা সৃষ্টি হয় এবং তা শৃঙ্খলার বাঁধনকেও আলগা করে দেয়। স্বভাবতই আবদুর রহমান যেমন ভীত হয়েছিলেন আর চার্লসও আশা করেছিলেন যে, সৈন্যরা যে গণিমতের সম্পদ অর্জন করেছে যুদ্ধের মুহূর্তে তাই আরবদের নিকট চরম অন্তরায় সৃষ্টি করবে এবং তাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তারও কারণ হয়ে উঠবে। অতএব তিনি (আবদুর রহমান) জনসাধারণের বখরার এক অংশ ত্যাগ করতে পরামর্শ দেবার কথা ভাবলেন; সেই সাথে তিনি বাধ্যতার জন্য জেদ ধরে অসন্তোষ সৃষ্টি করতেও চাইলেন না। এটাই ছিল দুর্বলতার ফল, যদি তাকে দুর্বলতাই বলতে হয় তবে তার পরিণাম দেখা যায় অত্যন্ত মারাত্মক।

টুরসের যুদ্ধ

কিছু অশ্বারোহী এবং কিছু নেকড়ে বাঘের চামড়া পরিহিত কাঁধ থেকে লম্বমান বেণীবদ্ধ চুলবিশিষ্ট পদাতিক সৈন্য দ্বারা গঠিত চার্লসের দলবল লয়ের নদী অতিক্রম করে আরবরা

---

১. আরব লেখকদের দ্বারা কারলা বা কালদাস বলে অভিহিত।

যেখানে শিবির স্থাপন করেছিল সেখান থেকে কয়েক মাইল উজানে গিয়ে তাদের পিছনে নদীর তীর ঘেঁষে অবস্থান গ্রহণ করে।[১] কয়েকদিন অতিবাহিত হয় হালকা খণ্ডযুদ্ধের মাধ্যমে, যাতে আরবরাই সুবিধাজনকভাবে এগিয়ে থাকে; নবম দিনে আরম্ভ হয় সর্বাত্মক যুদ্ধ, রাতের ছায়া দুই সেনাদলকে পৃথক না করা পর্যন্ত সে যুদ্ধ প্রবলভাবে চলতে থাকে।

রমযান, ১১৬ হিজরি ; অক্টোবর ৭৩২ খ্রিস্টাব্দ—আবদুর রহমান নিহত :

পরেরদিন সকাল বেলা আবার যুদ্ধ শুরু হল; মুসলিম সৈন্যরা চতুর্গুণ উদ্যমের সাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ফ্রাংকরা উদ্বিগ্ন হতে আরম্ভ করল আর সেই নিশ্চিত বিজয় লাভের সময়ে হঠাৎ একটি রব উঠল যে আরব শিবির তার সমস্ত ধনসম্পদসহ বিপদের সম্মুক্ষীণ হয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে আরবরা তাদেরকে ত্যাগ করে এবং নিজেদের লুটের মাল রক্ষার্থে সেখান থেকে চলে যায়; আবদুর রহমানের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা ব্যহত হয় আর বিফল হয় তাঁর সমস্ত উদ্যম এবং একটি বর্শাবিদ্ধ হয়ে তিনি আক্রান্ত হলেন। সেনাপতির পতনে সমগ্র সেনাদলে শৃঙ্খলাহীনতা দেখা দিল এবং বিশৃঙ্খলার সুযোগে শত্রুরা ভীষণ ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যায়। কিন্তু ফ্রাংকরা আরব কৃপাণের তীক্ষ্ণতা উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং তারা অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল, যা আবার যুদ্ধগ্রস্ত শত্রুদেরকে আলাদা করে দেয়, রাতের অন্ধকারে দুই সেনাবাহিনীই নিজ নিজ শিবিরে ফিরে যায়।

তাঁর সহকারীদের মধ্যে কলহ—আরবদের পশ্চাদপসরণ

আরবরা তাদের নিজ শিবিরে পৌঁছনোমাত্র আবদুর রহমানের সহকারীদের মধ্যে ঘোরবিরোধীতা দেখা দেয় এবং সৈন্যরা একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। ফ্রাংকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ এখন একেবারেই প্রশ্নাতীত, এসময় তাদের সামনে একটিই পথ খোলা ছিল আর তা হল নিরাপদ স্থানে পশ্চাদপসরণ করা। রাতের অন্ধকারে আরব সেনাপ্রধানরা তাঁদের বাহিনীকে নিয়ে সেপটিম্যানিয়ার দিকে নীরবে অগ্রসর হয়। সূর্যোদয়ের সময় শত্রু শিবিরের নিস্তব্ধতা দেখে চার্লস ও তাঁর বন্ধু ইউডসের মনে এক প্রকার গূঢ় রহস্যের সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে।

ফ্রাংকগণ কর্তৃক আহতদের নিধন যজ্ঞ

ভীত ও সতর্কতা সহকারে তারা আরব শিবিরে প্রবেশ করল এবং সেটি খালি ও পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক আহত ব্যক্তি

---

১. যেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার প্রকৃত স্থান নির্দেশ করা অসম্ভব, কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ফ্রাংক ও আরবদের মধ্যে এই স্মরণীয় সংঘর্ষের ঘটনাস্থল পয়িকটিয়ার্স ও টুর্সের মধ্যবর্তী স্থান। এই অঞ্চল লয়ের কয়েকটি শাখা নদী দ্বারা বিধৌত হয়ে একটি তরঙ্গায়িত বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বিক্ষিপ্ত বন, উপবন ও চমৎকার পল্লীগ্রাম নিয়ে, যা ফ্রান্সের নিসর্গ দৃশ্যকে এমন মনোহারিত্ব দান করেছে, কিন্তু সে যুগে এটি কেবল শক্তিশালী সেনাদলের বৃহৎ বিচরণভূমি হিসেবেই ব্যবহৃত হত।

পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যদের সঙ্গে যেতে অসমর্থ হয়েছিল। তাঁরা ফ্রাংকদের হাতে তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছিল। চার্লস তবু পশ্চাদপসরণকারী আরবদের পিছু ধাওয়া করতে সাহস করেননি এবং বিলম্ব না করে উত্তর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন।[১] প্রায় সব কিছুই নিজেদের হস্তগত থাকা সত্ত্বেও টুরসের সমভূমিতে আরবরা তাদের জয় করা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য হারিয়ে ফেলে। অবাধ্যতা ও গোত্রবিবাদ যা বরাবরই মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট অভিশাপের মূল কারণ হয়ে উঠেছিল তাতেই ওই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আবদুর রহমানের সঙ্গে এই যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিহত হয়েছিল; আর একারণেই আরব ইতিহাসে এই যুদ্ধক্ষেত্রকে 'বালাত-উশ-শুহাদা' বা 'শহীদী চরাচর' বলে অভিহিত করা হয়। এবং ধর্মবিশ্বাসীরা এখনো বিশ্বাস করেন যে, সেখানে মাগরিবের নামাজের (সান্ধ্য প্রার্থনা) জন্য বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতি বেহেশতের ফেরেশতাদের আহ্বান শোনা যায়।

সন্ন্যাসী লেখকরা আরবদের ৩,৬০,০০০ লোক মৃত্যুর যে সংখ্যা উপস্থাপন করেন, তা প্রকৃতপক্ষে আবদুর রহমান যে পরিমান লোক-লস্কর নিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করেছিলেন তার চার গুণেরও অধিক। তাঁদের অতিশয়োক্তিতে এই ব্যাপার আরো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কয়েক মাস অতিবাহিত হতে না হতেই আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিশৃঙ্খলা থাকা সত্ত্বেও আরবরা আবারও বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়েছিল, যদিও তা আবদুর রহমানের সেনাবাহিনীর মতো ততটা সুসজ্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না। বলা হয়ে থাকে যে, তাদের মহান সেনাপ্রধানের মৃত্যুতে ক্ষিপ্ত হয়ে আরবরা দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবর্তনের সময় লিমোসিনের সলিগনান মঠটি একেবারে ধ্বংস করেছিল।

স্পেনের শাসনকর্তা আবদুল মালিক

আবদুর রহমানের সহকর্মীরা আফ্রিকার রাজপ্রতিনিধি এবং দামাসকাসের হিশামের নিকট এই নিদারুণ দুর্ঘটনার খবর দ্রুত প্রেরণ করেন। হিশাম বিলম্ব না করে আরব পতাকার মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার নির্দেশ দিয়ে আবদুল মালিক বিন কাত্তানকে নতুন শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। আবদুর রহমানের মৃত্যুতে উপদ্বীপের উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলের

---

১. প্রাচীন ঐতিহাসিকদের অনুসরণ করে অধিকাংশ ইউরোপীয় লেখক ফ্রাংক নেতা ও তাঁর সেনাবাহিনীর ভূয়ষী প্রশংসা করেছেন এবং যুদ্ধের ফলাফলকে বর্ণনা করেছেন ইউরোপের মুক্তিদাতা হিসেবে। বিজ্ঞ গিবন চার্লসের সাফল্যের অপেক্ষাকৃত সত্য মূল্যায়ন করেছেন। সন্ন্যাসী লেখকগণ কর্তৃক বিবৃত আরবদের ক্ষতি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এই অবিশবাস্য কাহিনী যথেষ্টভাবে খণ্ডন করা যায় ফরাসি সেনাপতির সতর্কতা থেকে, যিনি অনুসরণ করতে গিয়ে ফাঁদে পা দেয়া দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন এবং তাঁর জার্মান ভ্রিদের বিদায় দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন তাঁদের দেশীয় অরণ্যে। একজন বিজয়ীর অকর্মণ্যতা তাঁর শক্তি ও রক্তক্ষয়ের কথাই প্রমাণ করে এবং সবচেয়ে নিষ্ঠুর শাস্তি যুদ্ধের মাধ্যমে না দিয়ে দেয়া হয় পলায়মান শত্রুর পিছন থেকে।' এবং এতে কোনো প্রশ্নই ওঠে না যে একদিক দিয়ে যুদ্ধটি ছিল নিষ্পত্তিমূলক। আবদুর রহমানই একমাত্র লোক যিনি মুদার ও হিময়ারদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারতেন; তাঁর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়, কারণ আরব বাহিনীর ওপর তাঁর পর আর কেউই অনুরূপ প্রভাব বিস্তার বা কর্তৃত স্থাপন করতে পারেন নি।

অধিবাসীরা সুবিধালাভের সাথে সাথে আরব শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটানোরও চেষ্টা করছিল। নব নিযুক্ত শাসনকর্তা তাঁর প্রথম অভিযান পরিচালনা করেন আরাগণ ও নেভারের বিরুদ্ধে। পরপর বেশ কয়েকটি যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হওয়ার পর ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়। অতঃপর তিনি ল্যাঙ্গুয়েডেকে প্রবেশ করলেন এবং তিনিই ওই প্রদেশে আরবদের শক্তিকে অত্যন্ত দৃঢ় করেন।

এভিগনন বিজয়

৭৩৪ সালে নারবোনের সহকারী শাসনকর্তা ইউসুফ মুসলমানদের সাথে সন্ধির মাধ্যমে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ মার্সাইলসের ডিউক মরোনটিযাসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রোন নদী পাড়ি দিয়ে সেন্ট রেমি (সে সময়ে ফ্রিট্টা নামে পরিচিত) দখল করেন এবং এভিগননের উদ্দেশ্যে অভিযান চালান। ফ্রাঙ্ক সৈন্যরা ডিউরানস নদীপথে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং কিছুদিন অবরুদ্ধ থাকার পরই এভিগনন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

উকবা স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত

এভিগনন বিজয়ের পর আবদুল মালিক দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়; কিন্তু তাঁর সৈন্যবাহিনী পীরেনিজ গিরিসংকটে বাঁধার সম্মুক্ষীণ হওয়ার কারণেই হোক বা আরব ঐতিহাসিকরা যে রকম বর্ণনা করেন, 'তাঁর নিষ্ঠুর আচরণ ও বিচারের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতার কারণেই হোক' ১১৬ হিজরি সনের রমজান মাসে (নভেম্বর ৭৩৪ খ্রিস্টাব্দ) তিনি পদচ্যুত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন 'অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও প্রশংসনীয় আচরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি উকবা; লেখকের বর্ণনা মতে, 'নৈতিক উৎকর্ষের জন্য তিনি সমগ্র মুসলিমের নিকট শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।' পাঁচ বছরের শাসন জীবনে তিনি কয়েকবার ফ্রান্সে প্রবেশ করেন এবং মুসলিম সেনাবাহিনীকে পূর্বতন সীমা ছাড়িয়ে সুদূর প্রান্তে নিয়ে যান।

ফ্রান্সে আরবদের দুর্গ স্থাপন : নারবোন অস্ত্রাগার নির্মাণ : উকরার ডফিনি আক্রমণ

তাঁর শাসনামলে ল্যাঙ্গুয়েডকের আরবরা রোন নদী পর্যন্ত রক্ষনাবেক্ষণ করা সম্ভব এরূপ সমগ্র ভূভাগকে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করেছিল। এই সামরিক ঘাঁটি বা দুর্গগুলিকে 'বিরাত' বলা হত এবং এগুলিকে রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত। উকবা নারবোনকে এক বিরাট দুর্গনগরীতে পরিণত করেন এবং সেখানে রসদ ও সৈন্যদল মজুত করেন। ১১৮ হিজরি সনে (৭৩৬ খ্রিস্টাব্দ) তিনি ডফিনিতে প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমে সেন্ট পল, ট্রইস চেটেক্স, ডনজার, ভ্যালেনস এবং নিউ লাইয়নস জয় করেন। আরব সেনাবাহিনী বার্গান্ডিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাতে ফ্রান্সের রাজধানীতেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনার এক বছর পূর্বেই পীডমন্ট আক্রমন করা হয় এবং সেখানে অনুকূল অবস্থাতেই সামরিক উপনিবেশ সমূহ স্থাপন করা হয়েছিল।

আরবদের বিরুদ্ধে চার্লস মার্টেলের সম্মিলিত দল গঠন

টুরসের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর চার্লস 'মার্টেল' উপাধি লাভ করে নিজে আরবদের সঙ্গে পেরে উঠতে সমর্থ না হওয়ায় লোম্বার্ডদের রাজা লুটপ্রানডের সাহায্য কামনা করেন। তাঁর ভাই চাইল্ডব্যান্ড ফ্রাঙ্ক রাজ্যের পূর্বাঞ্চল থেকে একদল জংলি সাহায্যকারী সৈন্য নিয়ে আসেন এবং যৌথ বাহিনী সম্মিলিতভাবে আরবদের দখল করা স্থানসমূহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময়ে চার্লস বাস্কও পীরেনিজের গিরিপথ বন্ধ করার মাধ্যমে আরবদের মনোযোগকে দক্ষিণ দিকে আকর্ষণ করানোর উদ্দেশ্যে গ্যাসকনদেরকে প্ররোচিত করতে থাকেন। এইভাবে আরবরা সবদিক দিয়েই আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ করে রাখার পর এক অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে এভিগনন জয় করা হয় এবং সেখানকার সমস্ত মুসলমানকে তরবারির আঘাতে হত্যা করা হয়। নারবোন অবোরোধ করে রাখা হয়, যা থেকে মুক্তি পেতে সমুদ্রপথে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হলেও তারা সম্মিলিত বাহিনীর (ফ্রাঙ্কদের) কাছে চরমভাবে পরাজিত হয়, তবু প্রতিরোধ এমন প্রবল হয় যে চার্লস হতোদ্যম হয়ে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়।

আরবদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে চার্লস মার্টেল কর্তৃক কয়েকটি নগর ধ্বংস

তার পরেও আরবদের পরবর্তী অগ্রগতির বিরুদ্ধে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করতে তিনি লয়ের নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর দেশের এক বিস্তীর্ণ ভূভাগকে যথার্থ মরুভূমিতে পরিণত করেন। বেজিয়ার, আগডে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নগরী, যেগুলোকে আরবরা সুসজ্জিত করে তুলেছিল, সেগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। চমকপ্রদ যুদ্ধক্ষেত্র এবং গৌরবময় প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সহ নিম্‌স নগরীও ধ্বংস করা হয়। এমনকি ফরাসী ইতিহাসবেত্তারা এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্বরতাকে 'অত্যন্ত মন্দ কাজ' বলতে বাধ্য হয়েছেন। যে ম্যাগিলন নগরী উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছিল, গথ বা ফ্রাঙ্কদের শাসনামলে যা করা সম্ভব হয়নি, তাও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়। ফ্রান্সে যখন এইসব ঘটনা ঘটছে, আফ্রিকা তখন বিরাট বার্বার বিদ্রোহে আন্দোলিত, যা আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

স্পেনে বিদ্রোহ : উকবা নিহত : আব্দুল মালিকের ক্ষমতা দখল (ডিসেম্বর, ৭৪০ খ্রিস্টাব্দ)

আফ্রিকার গোলযোগ স্পেনেও বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে তোলে এবং ১২৩ হিজরি সনে পদচ্যুত পূর্বতন শাসনকর্তা আবদুল মালিক বিন কাত্তানের নেতৃত্বে উকবার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, যাতে তাকে বন্দী করা হয় এবং তিনি বিদ্রোহীদের হাতেই নিহত হন। অতঃপর আব্দুল মালিক কতৃক শাসন ক্ষমতা দখল করা হয়।

আব্দুল মালিক নিহত

অন্যায়ভাবে অর্জিত ক্ষমতা তিনি বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়নি, আফ্রিকায় কুলসুমের সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে যে বালজ পালিয়ে এসে প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল তাঁর অধীনস্থ সিরীয়রা স্পেনে এসে উপনীত হয় এবং উপদ্বীপের অন্তর্বিরোধের উপাদানগুলিকে বৃদ্ধি করে তোলে। আবদুল মালিক ও বালজের যুদ্ধে প্রথম জন নিহত হন এবং তাঁর দেহ ক্রুশের ওপর কলঙ্কজনকভাবে বিদ্ধ করা হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর শত্রুও আবদুল মালিকের পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

শাওয়াল, ১২৪ হিজরি

এরপর সিরীয়রা তাদেরই একজন সাল্লামাহর পুত্র সা'আলাবাকে (থালাবা) আন্দালুসিয়ার শাসনকর্তা পদে নির্বাচিত করেন এবং গৃহযুদ্ধও সোৎসাহেই চলতে থাকে। 'বিলাদিউন' বা স্পেনীয় মুসলমানরা আবদুল মালিকের পুত্রদের সঙ্গে যোগ দেয়, সিরীয়রা যোগ দেয় তাদের নির্বাচিত নেতার পক্ষে, অন্যদিকে বার্বাররা তাদের নিজস্ব প্রভাব টিকিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধ করতে থাকে। স্পেনের শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে পড়ে এবং ফ্রান্সের সামরিক ঘাঁটি ও ফাঁড়িগুলোর তত্ত্বাবধানের ভার তাদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। নারবোনের সেনাপ্রধান যিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল নিয়ে আবদুল মালিক ও তাঁর পুত্রদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে নারবোন ত্যাগ করে সিরীয়ার দিকে অগ্রসর হন এবং আরবদের অধিকৃত অন্যান্য নগরীগুলিও সমানভাবে হয়ে পড়ে রক্ষাবিহীন। মেরাভিনজিয়ান প্যালেসের কর্তা হিসেবে তাঁর পিতা চার্লসের স্থলাভিষিক্ত পিপিন দ্য শর্ট যদি সে সময় আরব বসতিগুলি আক্রমণ করতেন তাহলে যাবতীয় বাধাদানের ক্ষেত্রে আরবরা অসমর্থ হয়ে পড়ত। কিন্তু পূর্ববর্তী যুদ্ধগুলির শিক্ষা বিস্মৃত হওয়া যায়নি এবং আরবরা অন্তর্দ্বন্দ্বে সম্পূর্ণভাবে দুর্বল হয়ে না পড়া পর্যন্ত ফ্রাঙ্করা অতর্কিত আঘাত হানার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। স্পেনে যখন মুসলমানরা এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত, তখন এশিয়া মাইনরে কয়েকটি সাফল্য[১] সত্ত্বেও তাদের ঘরোয়া অবস্থা মন্দ থেকে মন্দতর হচ্ছিল।

ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে হিশামের সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে ইরাকের শাসনভার খালিদের উপর আরোপ করা হয়েছিল, যিনি তেজস্বিতা ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে প্রদেশটি শাসন করেছিলেন। তাঁর সফল ও সহনশীল শাসন ব্যবস্থার বিপক্ষে একদল শত্রু সৃষ্টি হয় যারা হিশামের মনকে তাঁর বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলে। তাঁর বিরুদ্ধে সন্দেহের প্রধান কারণ ছিল তিনি হাশিমীদের (হাশিমের বংশধর) সুনজরে দেখতেন। হিশাম সম্ভবত লালসারও বশবর্তী হয়েছিলেন, যেহেতু তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে, পনেরো বছর ধরে ক্ষমতাসীন খালিদ অন্যায়ভাবে প্রভূত ঐশ্চর্য সঞ্চয় করেছেন।

খালিদ আল-কাসরি পদচ্যুত : তাঁর স্থলে ইউসুফ আল ফাজারীর নিয়োগ (১২০ হিজরি)

হিজরি ১২০ সনে ইরাকের রাজপ্রতিনিধিত্ব থেকে খালিদকে অপসারণ করা হয় এবং তাঁর জায়গায় ইউসুফ বিন উমরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়, যাঁকে বর্ণনা করা হয় কপট এবং পরিবর্তনশীল মানসিকতা ও নিষ্ঠুর স্বভাবের লোক হিসেবে। তিনি মুদার বংশীয় ছিলেন এবং তিনি খালিদকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। সন্দেহকৃত সম্পদ তল্লাসীর জন্য পদচ্যুত শাসনকর্তার উপর অত্যাচার করা হলেও অবশেষে তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশে মুক্তি লাভ করেন। এসব সত্ত্বেও ইউসুফের মাধ্যমে হাশিমীরা নির্যাতিত হলে সে ব্যাপারে হিশাম কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নি, তাদের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করা হয়।

---

১. হিশামের এক পুত্র ১২১ হিজরিতে এশিয়া মাইনরে সুদ্রা ও মাতামের জয় করেন।

শহীদ ইমাম হুসাইন (রা.)-এর পৌত্র জায়েদের বিদ্রোহ

ইমাম হুসাইন (রা.)-এর পৌত্র জায়েদ হিশামের কাছে বিচার চাইতে এসে তাঁর সামনে থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে যান। তাঁর দুর্ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে জায়েদ কুফায় আসেন এবং আত্মীয়বর্গ, যাঁরা তাঁকে পাগলামীপূর্ণ কাজ এবং বিশ্বাসঘাতক ইরাকীদের ওপর আস্থা স্থাপন সম্পর্কে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে বিদ্রোহ করেন, যা ব্যর্থ হয়। জায়েদ নিহত হয় এবং অনুগামীরা তাঁর দেহকে গোপনে সমাহিত করলেও প্রতিহিংসাপরায়ণ উমাইয়ারা কবরটি আবিষ্কার করে, মাটি খুঁড়ে মরদেহ তোলা হয় এবং তাঁকে একটি ক্রুশের ওপর বিদ্ধ করা হল; এর কিছুক্ষণ পর সেটিকে নামিয়ে এনে পোড়ানো হয় এবং ইউফ্রেটিস নদীতে ভস্মরাশি নিক্ষেপ করা হয়। এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্বরতা উমাইয়াদের ওপর ভয়াবহ ও নির্মম প্রতিশোধ বয়ে এনেছিল।[১] সতের বছর বয়স্ক উন্নত মানসিকতার যুবক জায়েদের পুত্র ইয়াহিয়া খোরাসানে পালিয়ে যান। জায়েদের মৃত্যুতে আব্বাসীদের রাস্তার এক সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার অপসারণ ঘটে আর তাদের অনুকূলে প্রচারণার কাজ শক্তিশালী হয়ে ওঠে যা আবু মুসলিমের আবির্ভাবের সমসাময়িক ছিল, যিনি পরিশেষে উমাইয়া রাজবংশের পতন ঘটায়। উমাইয়াদেরকে ইসলামের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থেকে অপসারিত করা হয় এবং রসুলুল্লাহ (স.)-এর বংশধরদের স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রকৃত পরিকল্পনাকারী আব্বাসের বিশিষ্ট পৌত্র মহম্মদ হিজরি ১২৪ সনে (৭৪২ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইব্রাহিমকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার ভার অর্পণ করে মৃত্যুবরণ করেন।

আবু মুসলিমের আবির্ভাব

ইস্ফাহানের[২] অধিবাসী হলেও আরব বংশোদ্ভূত আবু মুসলিম মহম্মদের কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রতি আকর্ষিত হয়ে তাঁকে খোরাসানে আব্বাসীর প্রচারণার প্রধান করে প্রেরণ করেন। বাগ্মিতা ও দক্ষতার মাধ্যমে আবু মুসলিম বিপুল সংখ্যক লোককে হাশিমীদের পক্ষে আনতে সক্ষম হয় এবং হিশামের মৃত্যুর ফলে তাঁর কাজ আরও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

হিশামের মৃত্যু : ফেব্রুয়ারি, ৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ

হিজরি ১২৫ সনের ৬ রবিউস সানি কিন্নিসরিন (প্রাচীন ক্যালসিস) জেলার রুসাফায় হিশাম মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর ভাইপো দ্বিতীয় ওয়ালিদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

এই রাজত্বেই ১১৩ হিজরি সনে শ্রদ্ধেয় ইমাম মহম্মদ আল-বাকির ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর ধর্মীয় আসনে তাঁর পুত্র বিখ্যাত জাফর অধিষ্ঠিত হন, যিনি সত্যবাদী (আস-সাদিক) নামে অভিহিত।

---

১. এই সময় শিয়াদের মধ্যে প্রথম দলাদলি ঘটে। জায়েদ ও তাঁর শিষ্যরা (জায়েদীয় বলে অভিহিত) প্রথম তিন খলিফাকে রসূলুল্লাহ (স.)-এর আইনসম্মত প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করতেন। কয়েকজন গোঁড়া কুফাবাসী তাঁদের (প্রথম তিন খলিফা) প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করার ফলে তারা জায়েদকেও ত্যাগ করে। এই কুফাবাসীদের নাম হয় 'দলত্যাগী'। মধ্যপন্থী 'ইমামিয়া' শিয়াগণ কোনো অভিমত প্রকাশ করেন নি বা বিদ্রোহে যোগও দেননি।

২. হামজা ইস্ফাহানীর মতানুসারে।

অধ্যায়-১২

উমাইয়া বংশ (হাকামের শাখা) (পূর্ব অনুবৃত্তি)

[১২৫-১২৬ হিজরি; ৭৪৩-৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ]

হিশামের মৃত্যুকালে সাম্রাজের আয়তন : উত্তরাধিকারীর চরিত্র : আত্মীয়বর্গের প্রতি তাঁর নিষ্ঠুরতা : খালিদ আল-কাসরী নিহত : ইয়াহিয়া বিন জায়েদের বিদ্রোহ ও মৃত্যু : খোরাসানের জনসাধারণের ওপর এর ফলাফল : স্পেনের ঘটনাবলী : হুসাম (আবুল খাত্তার) স্পেনের শাসনকর্তা : সকল দলের আনুগত্য : সুচনায় তাঁর শান্ত ও ন্যায় শাসন: ইয়েমনীয়দের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব : মুদারদের বিদ্রোহ : শেকুনদার যুদ্ধ : সা'লাবার নির্বাচন : তাঁর মৃত্যু : ইউসুফের নির্বাচন : আন্দালুসিয়ার নাইট : তাঁর মৃত্যু : হিশামের পৌত্র আবদুর রহমানের স্পেনে আগমন : পিপিন দ্য শর্টের আক্রমণ : আরবদেরকে নির্বিচারে হত্যা : নারবোন অবরোধ : বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা অধিকার : ফ্রান্সে আর-শক্তি নিশ্চিহ্ন : ইফ্রকার ঘটনাবলী : দ্বিতীয় ওয়ালিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ : তাঁর মৃত্যু : তৃতীয় ইয়াজিদ খলিফা বলে ঘোষিত : তাঁর মৃত্যু: ইব্রাহিমের উত্তরাধিকার : মারওয়ানের বিদ্রোহ: আইনুল জারের যুদ্ধ : ইব্রাহিমের পলায়ন : মারওয়ান খলিফা বলে ঘোষিত

আরব সাম্রাজ্যের বিস্তার

৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে হিশামের মৃত্যু হলে আরব সাম্রাজ্য তার চরম সীমায় উপনীত হয়। ইউরোপে ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চল এবং যে কয়েকটি গিরিসঙ্কটে আক্রমণকারীরা গেরিলা যুদ্ধ চালাচ্ছিল সেগুলো ব্যতীত সমগ্র আইবেরিয়ান উপদ্বীপ মুসলিমদের অধীনে ছিল। ভূমধ্যসাগরে মেজোর্কা, মিনোর্কা, ইভিকা, কর্সিকা, সার্দিনিয়া, ক্রীট, রোডস এবং সিসিলির একাংশ সহ তারা সাইপ্রাস অধিকার করে নেয়, সেই সঙ্গে গ্রিক দ্বীপপুঞ্জের বহু দ্বীপও তাদের অধীনে চলে আসে। আফ্রিকায় জিব্রাল্টার প্রণালী থেকে সুয়েজ খালের সংযোগস্থল পর্যন্ত, এশিয়ার সিনাইয়ের মরুভূমি থেকে মঙ্গোলিয়া সীমান্ত পর্যন্ত তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু পুবদিকে যেমন এক সীমাহীন ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র কর্তৃত্বের বাঁধন শিথিল করেছিল, আত্মকলহ ও বিবাদ-বিসংবাদে পশ্চিম দিকেও বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছিল। এই চরম সঙ্কটজনক সময়ে হিশামের মৃত্যু এমন এক শাসকের সমাপ্তি ঘটায় যিনি সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও অন্তত ধার্মিক ও সতর্ক ছিলেন।[১]

---

১. বলা হয় দ্বিতীয় আব্বাসী খলিফা মনসুর ঘোষণা করেছিলেন যে, হিশাম ছিলেন উমাইয়া বংশের এক মহান ব্যক্তি (ফাতাউল কাওম)। এই মত অবশ্য কিছুটা অতিরঞ্জিত।

তাহার উত্তরাধিকারীর চরিত্র

তাঁর উত্তরাধিকারী ছিল একেবারেই ভিন্ন চরিত্রের,[১] কিছুটা উড়নচণ্ডী, সাধারণ নৈতিক বিধি-নিষেধে চরমভাবে বিস্মৃত এবং মদ্য পানে আসক্ত হওয়ায় তাঁর শৃঙ্খলাহীনতা ও গর্হিত জীবন শীঘ্রই জনসাধারণকে উত্যক্ত করে তোলে। হিশাম উত্তরাধিকার পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাইয়ের[২] চুক্তি ছিল বাধ্যতামূলক এবং তা থেকে সরে আসা সম্ভব হয়নি। কিছুটা কঠোরতার সাথে হলেও তিনি তার ভাইয়ের ছেলের মন্দ স্বভাবগুলো দমন করার চেষ্টাও করেছিলেন, যা শুধুমাত্র অশোভন ঝগড়া ও বিবাদেরই সৃষ্টি করেছিল। হিশামের দরবারের নিরানন্দ কঠোরতা ছিল এই তরুণের স্বভাব-বিরুদ্ধ এবং তিনি জর্ডান (উরদুন) জেলার আররাক নামক স্থানে পালিয়ে যান, সেখানে তিনি অধীর হয়ে পিতার মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

দ্বিতীয় ওয়ালিদ : আত্মীয়বর্গের প্রতি নিষ্ঠুরতা

মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি দ্রুত দামাসকাসে হাজির হন এবং রাজপ্রাসাদ থেকে হিশামের পরিবারবর্গকে বিতাড়িত করে রাজত্ব আরম্ভ করেন। এমনকি অশোভন হস্তক্ষেপ ছাড়া মৃত সম্রাটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করারও অনুমতি দেয়া হয়নি। রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেই বয়স্ক পিতৃব্য ভাই, অর্থাৎ প্রথম ওয়ালিদ ও হিশামের পুত্রদেরকে নির্যাতন করায় তাঁর প্রতি জনাসাধারণের ঘৃণাকে আরও গভীর করে তোলে। সৈন্যদের ভাতা বৃদ্ধি করে এবং জনসাধারণের মধ্যে চমকপ্রদ পুরস্কার বিতরণ করে প্রথমেই তিনি তাদের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেছিলেন। জনসমর্থন লাভের জন্য তিনি দরিদ্র, অসহায় ও অসুস্থদের জন্য ভাতা বাড়িয়ে দেন। কিন্তু চঞ্চলমতি ও চরিত্রহীন হওয়ার কারণে প্রায়শই তিনি নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপ করতেন, ফলে তাঁর সব প্রচেষ্টা স্বভাবত কারণেই ব্যর্থ ও নিস্ফল হয়।

খালিদ আল-কাসরি নিহত

হিশামের আদেশে মুক্ত হওয়ার পর থেকেই ইরাকের শাসনকর্তা শুধুমাত্র দামাসকাসে অবসর জীবন যাপন করছিলেন; এবার তাঁকে তাঁর নিষ্ঠুর শত্রু ইউসুফের হাতে তুলে দেয়া হয়, যিনি তাঁকে হত্যা করেন।

ইয়াহিয়ার বিদ্রোহ ও মৃত্যু

তেজস্বী যুবক ইয়াহিয়ার সমস্ত পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয়, অবশেষে তিনি সশস্ত্রভাবে রুখে দাঁড়ান। কারণ তিনি কীটপতঙ্গের মতো মরার চেয়ে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে তরবারি হাতে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার সংকল্প করেন। তিনি শেষ লক্ষ্য মৃত্যুরই সম্মুখীন হন; তাঁর দেহ থেকে মাথাকে কেটে ফেলা হয় এবং সেটি ওয়ালিদের নিকট পাঠানো হয় এবং

---

১. সুয়ূতী তাঁকে বর্ণনা করেছেন 'উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপায়ী এবং স্বর্গীয় বিধান ভঙ্গকারী' বলে।
২. দ্বিতীয় ইয়েজিদ।

দেহটিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। ইয়াহিয়ার পরিণতিতে খোরাসানে প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দেয় এবং উমাইয়াদের পতনকে ত্বরান্বিত করে তোলে। জনসাধারণ সর্বজনীন শোক পালন করে; ইয়াহিয়ার মৃত্যুর দিনে জন্মলাভকরা প্রতিটি শিশুপুত্রের নামকরণ করা হয় তাঁর নামানুসারে এবং 'নবী পরিবারের প্রতিশোধ গ্রহণকারী' রূপে আবু মুসলিম যখন দণ্ডায়মান হন তখন কালো পোশাক পরিধান করে তারাও তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়; অতঃপর যা আব্বাসীয়দের নিজস্ব রঙ বলে পরিগণিত হয়। যেসব উমাইয়া ইয়াহিয়া-হত্যায় অংশগ্রহণ করেছিল তালিকা থেকে তাদের নাম নেওয়া হয় এবং তাদেরকে অনুসরণ করা হয় এবং তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

স্পেন : সা'লাবার নির্বাচন অনুমোদিত : মুদার বিদ্রোহ

কয়েকমুহূর্তের জন্য আমি স্পেনের অব্যাহত ঘটনাবলীর দিকে ফিরে যাব। শাসনকর্তা হিসেবে সা'লাবা নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে হিশামের অনুমোদন লাভ করে; কিন্তু ইয়েমেনীয়দের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব মুদারদের বিদ্রোহের কারণ হয়ে ওঠে, যাদের সাথে বার্বার ও বিলাদিউনরা যুক্ত হয়। মেরিডার প্রাচীরের পাদদেশে তিনি সম্মিলিত বিদ্রোহীদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। বলা হয়ে থাকে যে সেসময় তার হাতে প্রায় দশ হাজার লোক বন্দী হয়েছিল এবং সা'লাবা পরদিনই তাদের সকলকে তরবারির আঘাতে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল। সকাল হলে প্রত্যেকেই সেই নিষ্ঠুর ঘটনা আরম্ভ হওয়ার আশা করেছিল, এমন সময় হঠাৎ দূরে খলিফার পতাকা দেখতে পাওয়ায় সমাবেশে শিহরণ জেগে ওঠে। শাসনকার্যে দুর্বলতা দেখা দেয়া সত্ত্বেও খলিফার নামে তখনো সম্মান প্রদর্শন করা হত এবং এক অবিস্মরণীয় মোহনীয় শক্তি বিস্তার লাভ করত।

হুসাম (আবুল খাত্তার) স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত (মে, ৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ)

যে পতাকা দেখামাত্র হৃদয়হীন জল্লাদের হাতও নিরস্ত্র হয়েছিল যা হুসাম (কালব গোত্রীয় আবুল খাত্তার) নামে এক নতুন ইয়েমেনী শাসকের আগমন বার্তা ঘোষণা করেছিল, হিশামের আদেশে সাধারণ শান্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যুদ্ধগ্রস্থ গোত্রগুলোতে উসকে দেয়া গোলযোগের নিরসন করতে তাঁকে আফ্রিকার রাজপ্রতিনিধি হানজালা পাঠিয়েছিলেন। হিশামের মৃত্যুর ৫ মাস পর ১২৫ হিজরি সনের রজব মাসে হুসাম (আবুল খাত্তার) কর্ডোভায় প্রবেশ করেন এবং বলেন, 'তিনি আন্দালুসিয়ায় পদার্পণ করতে না করতেই সমস্ত দল অবিলম্বে তাদের অস্ত্র সম্বরণ করেছিল।' সা'লাবা নিজেই আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে এবং সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে।

মুদার বিদ্রোহ

প্রথমদিকে আবুল খাত্তাবের শাসন পদ্ধতি ছিল শান্ত ও ন্যায়পরাণয়; কিন্তু তিনিও গোত্রীয় পক্ষপাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি। স্পেনের হিময়ার গোত্রীয়দের প্রতি তাঁর একচোখাভাব এবং মুদার বংশীয় এক নেতাকে অপমান করায় পরবর্তীতে বিদ্রোহ দেখা

দেয়। নতুন করে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় এবং তা চলতে থাকে পূর্বের চেয়ে আরও প্রবলভাবে।

আবুল খাত্তারের মৃত্য : সাওয়াবাহর নির্বাচন (১২৭ হিজরি; ৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ)
কর্ডোভার নিকটে (সেকুনদাহ নামে পরিচিত) এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইয়েমনীয়রা পরাজিত হয় এবং আবুল খাত্তার সে যুদ্ধে নিহত হয়। তারপর মুদার বংশীয়রা সাওয়াবাহ নামে একজন ইয়েমনীকে তাদের শাসনকর্তা হিসেবে নির্বাচিত করে, একই সাথে তাদের অন্যতম গোত্রীয় নেতা আস-সুমাইলকে তাঁর সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করল।

ইউসুফের নির্বাচন (রবিউস সানি, ১২৯ হিজরি; ডিসেম্বর ৭৪৬ খ্রিস্টাব্দ)
সাওয়াবাহ যে ষোলো মাস শাসনকার্য পরিচালনা করেন তা ছিল নামমাত্র এবং তাঁর মৃত্যুর এক বৎসর পর সৈন্যদল ইউসুফ নামে আফ্রিকা বিজয়ী উকবার এক বংশধরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে। আস সুমাইলের প্রস্তাব অনুসারেই তাঁকে নির্বাচিত করা হয়, ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলো পরস্পরের সাথে পুনরায় মিলিত হয়। উভয় দলই অস্ত্র ত্যাগ করে এবং দামাসকাসের অনুমোদন বা স্বদেশের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই ইউসুফ প্রায় দশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। তার পরও তাঁর শাসনব্যবস্থা কোনো দিক দিয়েই শান্তিপূর্ণ ছিল না।

দ্য নাইট অব আন্দালুসিয়া
আবদুর রহমান (যার পিতার নাম আল-কুমান। তিনি 'লখম' গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর সে কারণেই তাঁকে আবদুর রহমান আল-লখমী নামে ডাকা হত।) নারবোনের নামধারী সহকারী শাসক তাঁর অসাধারণ শারীরিক শক্তির সাথে শৌর্যবীর্য ও নির্ভিক ক্রিয়াকলাপের সংযোগ ঘটিয়ে 'দ্য নাইট অব আন্দালুসিয়া' (আল-ফারিসুল আন্দালুস) উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি বিদ্রোহ করলেও তাঁর নিজের লোকেরা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে হত্যা করে। আর একজন দলনেতা বেজায় বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলেন, একই সাথে তৃতীয় জন বিদ্রোহ করেন আলজিসিরাসে এবং চতুর্থ জন করেন সেভিলে। তারপরও ইউসুফ এসব বিদ্রোহ সফলভাবেই দমন করতে সক্ষম হয়।

হিশামের পৌত্র আব্দুর রহমানের স্পেনে আগমন
যদি হিশামের পৌত্র আব্বাসী প্রতিশোধ গ্রহণকারীদের হাত থেকে পালিয়ে ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে স্পেন উপকূলে গিয়ে অবস্থান না করত, তাহলে ইউসুফ সম্ভবত স্পেনে তাঁর নিজস্ব রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারত। উমাইয়া গোত্রের এই যুবক বংশধরদের আগমনের ঘটনার দৃশ্যপট সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়ে যায়। উচ্চ পর্যায়ের কর্মপ্রেরণা, তেজস্বিতা ও শাসন যোগ্যতার বলে এবং নিজের নামের মহিমায় উমাইয়া বংশের এই যুবরাজ সব ধরনের বাধা-বিপত্তি জয় করতে সক্ষম হয় এবং শেষ পর্যন্ত

স্পেনে একটি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং এই সময় থেকেই আইবেরিয়ান উপদ্বীপে আরব শাসনের ইতিহাস কেন্দ্রীয় খিলাফতের ইতিহাস থেকে আলাদাভাবে আলোচিত হবে।

পিপিন দ্য শর্ট কর্তৃক মুসলিম ফ্রান্স আক্রমণ (৭৫২ খ্রিস্টাব্দ)

পিপিন দ্য শর্ট ফ্রান্স আক্রমণের পূর্বে সেখানকার আরবদের পূর্ণরূপে দুর্বল হয়ে পড়ার অপেক্ষা করছিলেন, এ অবস্থায় ইউসুফ যখন তাঁর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছে, সে সময় তিনি তখনো আরবদের দখলে থাকা ল্যাঙ্গুয়েডক, সেপটিম্যানিয়া এবং পশ্চিম সেভয়ের উপর এক বিশাল অসভ্য সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণ করে বসেন। সুদৃশ্য শহরগুলোতে অগ্নি সংযোগ করা হল; মসজিদ, হাসপাতাল ও বিদ্যালয়গুলো পুড়িয়ে ধ্বংস করা হল, নারী-পুরুষ, বালক বৃদ্ধসহ নির্বিচারে আরবদেরকে হত্যা করা হল এবং সমগ্র দেশ গণহত্যা ও ধ্বংসের এক বীভৎস দৃশ্যে পরিণত হয়। ফ্রাঙ্কদের লুঠপাতের ফলে বিধ্বস্ত হওয়ায় পর সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যাতে অনেক লোক প্রাণ হারায়। সহায়হীন হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ ফ্রান্সের আরবরা তিন বছর পর্যন্ত অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আত্মরক্ষা করে এবং চরম প্রতিকূলতার মূহুর্তেও ইঞ্চি পরিমাণ জমির জন্যও লড়াই চালিয়ে যায়। ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তারা শুধুমাত্র নারবোনকে তাদের দখলে রাখতে সক্ষম হয় এবং পিপিন তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন যাবতীয় যুদ্ধ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা অবরোধ করে রাখে।

বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা নারবোন অধিকৃত (৭৫৯ খ্রিস্টাব্দ)

অবরোধ চার বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়, শেষ পর্যন্ত নগরের অভ্যন্তরীণ খ্রিস্টানরা একদিন প্রহরীদের অসতর্কতার সুযোগে তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং কয়েকজনকে হত্যা করে তাদের বাইরের ভাইদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। বর্বরের দল নগরে প্রবেশ করে মুসলমান, নারী-পুরুষ ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করে সেখানকার মুসলিম সভ্যতার যাবতীয় চিহ্ন ধূলিস্যাৎ করা হয় এবং ইউরোপের খ্রিস্টানরা তখন যে সর্বব্যাপী অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, ল্যাঙ্গুয়েডক ও প্রভেনস তাতে সমাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

স্পেন

এভাবে পিপিন যখন ফ্রান্সে আরবদেরকে তাদের দখলকৃত এলাকাসমূহ থেকে বিতাড়িত করছিলেন তখন স্পেনেও তারা যে বিপদে জড়িয়ে পড়ে তাতে বিসক উপসাগরের উপকূলসহ পার্বত্য অঞ্চল পরিত্যক্ত হয়, যেখানে বিদ্রোহীরা এক ভয়ঙ্কর রাজ্যের বীজ বপন করতে সক্ষম হয়।

আফ্রিকা

আফ্রিকার কাইরোয়ানের সামনে বার্বাররা পরাজিত হওয়ার পর হানজালা অসামান্য সাফল্যের সাথে তাঁর ওপর ন্যস্ত বিশাল প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। বার্বার ও খারিজী উভয় জাতিই তাঁর উদ্দেশ্যের সততা এবং শাসনের ন্যায়পরায়ণতা স্বীকার

করে নেয়। দেশব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সেখানে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

হানজালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

আব্দুর রহমান বিন হাবিব নামে একজন নির্বাচিত কর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় দেশে আবারও কলহ ও বিবাদ বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। হিজরি ১২৭ সনে তিনি তিউনিসে আক্রমণ করেন এবং তাঁকে এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে হানজালা যে কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে বন্দী করে তিনি কাইরোয়ানের দিকে অগ্রসর হয়। কোন প্রকার আক্রমন করা হলে তিনি বন্দীদেরকে হত্যা করার হুমকি দেন। হানজালা বরাবরই রক্তপাত পছন্দ করতেন না, আর এ কারণে এশিয়ায় অবসর গ্রহণের মাধ্যমে তিনি নিরিবিলি জীবন যাপন করতে থাকেন।

আব্দুর রহমান বিন হাবিব আফ্রিকার রাজপ্রতিনিধি

কাইরোয়ান বিদ্রোহীর জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, যিনি নিজেকে আফ্রিকার রাজপ্রতিনিধির পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এভাবে বিশ্বাসঘাতকতার সাথে যে শাসনের সূত্রপাত হয় তা লাগাতার বিদ্রোহ ও যুদ্ধ বিশৃঙ্খলায় ভরপুর ছিল। তা সত্ত্বেও ১৩৭ হিজরি সনে আপন ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আব্দুর রহমান বিন হাবিব ক্ষমতাসীন ছিলেন।

ইতিপূর্বে যে বর্ণনা করা হয়েছে তার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে আমি আগেই কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছি; কারণ হুসামের (আবুল খাত্তার) আইবেরিয়ান উপদ্বীপে আগমন এবং নারবোন মুসলমানদের হাত থেকে চলে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে উমাইয়া রাজবংশ এশিয়া থেকে বিতাড়িত হয় এবং আরেকটি বংশ তার স্থান দখল করে। সুতরাং যে রাজনৈতিক বিক্ষোভের ফলে উমাইয়া বংশের পতন হয় তা আমাকে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করতে হবে।

দ্বিতীয় ওয়ালিদ

এ পর্যন্ত দামাসকাস উমাইয়াদের সুরক্ষিত দুর্গ হিসেবে পরিগণিত হত এবং শাসনরত রাষ্ট্রপ্রধান যে চরিত্র বা স্বভাবেরই হোক না কেন গোত্রের লোকজন তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে কোনরূপ ইতস্তত করত না। আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা উদ্ভূত এবং নিজের স্বার্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত তাদের আনুগত্য বংশের মর্যাদা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। দ্বিতীয় ওয়ালিদের আমলেই সর্বপ্রথম এর মারাত্মক পরিবর্তন ঘটে। সঙ্গীত ও ঘোড়দৌড়ে আসক্তি থাকার কারণে তিনি রাজকার্যে অবহেলা করতেন, যা তাঁকে রাজধানীর গোঁড়া লোকদের কাছে অপ্রিয় করা সত্ত্বেও বংশের প্রধান ব্যক্তিরা তাঁর প্রতি

আসক্তই ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসবেত্তারা বর্ণনা করেন যে, তাঁর লাম্পট্য এবং সাধারণ নৈতিক অনুশাসনের প্রতি প্রকাশ্য অবমাননা তাঁর শ্রেষ্ঠ সমর্থকদেরকেও তার প্রতি বিমুখ করে তোলে এবং উমাইয়া বংশের অধিকাংশ লোকই শেষ পর্যন্ত তাঁকে ত্যাগ করে। ১২৬ হিজরি সনের (৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ) মহরম মাসে নির্দয় ইউসুফ কর্তৃক ইরাকের প্রাক্তন শাসনকর্তা খালিদের বর্বরোচিত হত্যা সম্পর্কে তাঁর উপেক্ষা সিরিয়ার হিময়ার বংশীয়দের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। যেসব রাষ্ট্রপ্রধান এই নৃশংস কাজে অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে তারা উত্তেজক বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আব্দুল মালিকের পৌত্র এবং প্রথম ওয়ালিদের অন্যতম পুত্র ইয়েজিদ নিজেই তাদের নেতৃত্বে দেন। তাঁদের সাথে দামাসকাসের সাধারণ লোকজনও যোগ দেয় এবং ওয়ালিদকে রাজধানীর উপকণ্ঠে একটি দুর্গে অবরোধ করে রাখা হয়। তিনি বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করলেও তারা এই বলে তা চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেন যে, তাঁর ধর্মহীনতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবনযাত্রাই প্রজাদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলেছে।

তাঁর মৃত্যু (জমাদিউস সানি, ১২৬ হিজরি, এপ্রিল ৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ)

প্রাসাদের দরজা ভেঙে ফেলা হয় এবং হতভাগ্য সম্রাটকে অনুসরণ করা হয়, আর তাঁকে তাঁর নিজের প্রাসাদের মধ্যেই হত্যা করা হয়; শরীর থেকে তাঁর মাথা আলাদা করে দামাসকাসের রাস্তায় রাস্তায় তা প্রদর্শন করানো হয়। ওয়ালিদের মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী এবং তাঁর নিষ্প্রাণ দেহের প্রতি কলঙ্কজনক আচরণে সেই মহিমাময় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় যা এযাবৎকাল 'অবিসম্বাদিতভাবে নির্বাচিত খলিফা'র ব্যক্তিত্বকে ঘিরে থাকত।

ইব্রাহিম

তৃতীয় ইয়াজিদের ভ্রাতা ইব্রাহিম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন; কিন্তু ইব্রাহিমের ক্ষমতা রাজধানী এবং এর চারপাশের স্থান ছাড়া আর কোথাও স্বীকৃত হত না। এর স্থায়িত্বও ছিল মাত্র দু মাস দশ দিন। ইব্রাহিমকে খলিফাদের শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। মারওয়ান পুনরায় ওয়ালীদের পুত্রদেরকে মুক্তিদানের প্রকাশ উদ্দেশ্য নিয়ে অস্ত্রধারণ করলেন এবং দামিশকের দিকে অভিযান করলেন। বালবাক হতে রাজধানীর পথে লেবানন এবং এন্টি-লেবাননের মধ্যবর্তী আইন-আল-জাররা নামক ক্ষুদ্র শহরে তিনি ইব্রাহিম কর্তৃক প্রেরিত প্রধানত ইয়ামেনিদের নিয়ে গঠিত এক বিশাল সেনাদল দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত কিন্তু মারওয়ানের সেনাদল অভিজ্ঞ ছিল এবং দীর্ঘকাল বাইজান্টাইনদের ও তুর্কী যাযাবরদের সাথে যুদ্ধ করে সুশিক্ষা লাভ করেছিল। বিশৃঙ্খল ইয়ামেনি সেনাদল পরাজিত এবং বিজেতার সম্মুখে দামিশকের পথ উন্মুক্ত হইল। মারওয়ান যখন রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলেন তখন ইব্রাহিম ও তাঁর নিষ্ঠফুর সেনাদল ওয়ালীদের পুত্রদেরকে হত্যা করে পলায়ন করেন। তাঁরা বৃথা আশা পোষণ করেছিলেন যে এদেরকে হত্যা করলে এদের রক্ষাকর্তার

অগ্রগতি স্থগিত হবে। খালিদের হত্যাকারী যিনি এদের সাথে কারারুদ্ধ ছিলেন তিনিও খালিদের পুত্রের হস্তে প্রাণ হারালেন। এরূপে তিনি উপযুক্ত দণ্ডপ্রাপ্ত হলেন। ওয়ালীদের পরিবার রক্ষকগণ এখানে বিদ্রোহী হয়ে পলাতক ইব্রাহিম ও তাঁর মৃত ভ্রাতার অনুচরগণের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ করল, তাদের কয়েকজনকে হত্যা করল এবং তাদের বাসস্থান লুণ্ঠন করল। তৃতীয় ইয়াজিদের মৃতদেহ সমাধি হতে উত্তোলন করে নগরের এক ফকটদ্বারে বিদ্ধ করল।

দ্বিতীয় মারওয়ান, সফর, ১২৭ হিজরি, নভেম্বর, ৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ

দামিশকে তখন পূর্ণ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল এবং মারওয়ানের আগমন সন্ত্রান্ত নগরবাসীগণ কর্তৃক সাদর সংবর্ধনা লাভ করে। তিনি অনতিবিলম্বে খলিফা বলে ঘোষিত হন এবং জনসাধারণ তৎক্ষণাৎ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল। তারা আশা করল যে তাঁর ন্যায় একজন সুদক্ষ সৈনিক অশান্তিজর্জরিত দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হবেন।

অধ্যায়-১৩
উমাইয়া বংশ [হাকামের শাখা]-পূর্বানুবৃত্তি
[১২৭-১৩২ হিজরি; ৭৪৪-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ]

দ্বিতীয় মারওয়ান : দ্বিতীয় মারওয়ানের চরিত্র : বিদ্রোহসমূহ : খোরাসানে বিদ্রোহ: আবু মুসলিম পারস্য বিদ্রোহ : খোরাসানের শাসনকর্তা নাসরের পরাজয় ও মৃত্যু : আব্বাসী ইমাম ইব্রাহিমের মৃত্যু : নিহাওয়ানদে উমাইয়াদের পরাজয় : ইরাকের রাজপ্রতিনিধির পরাজয় : সাফফাহ খলিফা বলে ঘোষিত : জবের যুদ্ধ : মারওয়ানের পরাজয় : তাঁর পলায়ন : দামাসকাস অধিকার : আব্বাসীদের প্রতিহিংসা পরায়ণতা: মারওয়ানের মৃত্যু: শেষ উমাইয়া : উমাইয়া বংশের পতনের কারণ

দ্বিতীয় মারওয়ান

দ্বিতীয় মারওয়ান ছিল হাকাম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার পৌত্র। যিনি তাঁর আর্মেনিয়া প্রদেশটি অত্যন্ত তেজস্বিতা ও দক্ষতার সঙ্গে শাসন করতে সক্ষম হয় এবং যেসব যাযাবর জাতি উত্তর দিক থেকে তাঁকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করেছিল তিনি তাদেরকেও অনেকবার বিতাড়িত করেন।

মারওয়ানের চরিত্র

অসাধারণ সহনশীলতার জন্য তিনি যে আল-হিমার উপাধি লাভ করেছিলেন, তা হাস্যকর ছিল না বরং তা ছিল তাঁর শারীরিক শক্তি ও মনোবলের স্বীকৃতি স্বরূপ। বেশিরভাগ পূর্বপুরুষের ব্যতিক্রম হিসেবে জীবনযাত্রা ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে তিনি সাধু প্রকৃতির ছিলেন। শিবিরে বা অভিযানের সময় তিনি সৈনিকদের মতই জীবন-যাপন অতিবাহিত করতেন এবং তাদের সাদাসিধা চালচলন ও দুঃখ-কষ্টের সাথে অংশীদার হতেন; এমনকি তিনি প্রাসাদেও এ ধরনের বিলাসিতায় মত্ত হতেন না, যা তাঁর পরিবারের রাষ্ট্রপ্রধানদের অভ্যাসে পরিণত হয়। অতীত ইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রে তিনি অনুরক্ত ছিলেন, যে বিষয়ে তিনি তাঁর সহকারী ও সহচরদের সাথে প্রায়ই আলোচনা করতেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁর বেশ বয়স হয়েছিল (বলা হয় এ সময় তাঁর বয়স ষাট বছরেরও বেশি ছিল), কিন্তু তাঁর চলাফেরা এবং চারদিকে যেসব শত্রু মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তাদের দমনে ক্ষিপ্রতা এটাই প্রমাণ করে যে বয়স তাঁর উদ্যমকে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি। এতকিছু সত্ত্বেও এই সংকটের সময় উমাইয়া শক্তিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সৈনিকের গুণ ছাড়াও আরও কিছু বিষয় অধিক প্রয়োজন ছিল, যেমন গোত্রীয় পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতা যা বংশের অধিকাংশের মতো মারওয়ানের মধ্যেও বিশেষ অভাব ছিল। যদি তিনি রাজনীতিবিদের উপযোগী উদার

মতবাদ ও সম্প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা ভূষিত হতেন এবং যে মনোরঞ্জন ক্ষমতাই কেবল যুদ্ধগ্রস্থ দলগুলোর মধ্যে ঐক্য আনতে পারে তার দ্বারাও, তাহলে এশিয়ার ইতিহাসও লেখা হত অন্যভাবে। জেদ ও কঠোরতার সাথে দুর্দমনীয় প্রকৃতিই ছিল অধিকাংশ উমাইয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা দোষ-ত্রুটিকে প্রবল করে তুলেছিল। যে দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্ব আর জাতিকে করেছিল দ্বিধাবিভক্ত তা রোধ করতে সচেষ্ট না হয়ে তিনি পক্ষভুক্ত লোকের অন্ধ ভাবাবেগ নিয়ে গোত্র-কলহে ঝাঁপিয়ে পড়েন; নিষ্ঠুর হিসেবে গন্য না হলেও ইয়েমেনীদের প্রতি তিনি যে কঠোর আচরণ করেন তাতে তাদের দিক থেকে এক অনমনীয় বিদ্বেষ সঞ্চারিত হল। সুতরাং পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্তমান অন্যায় দ্বারা তিক্ততর হয়ে কবিদের আক্রমণে প্রচণ্ড রোষে পরিণত হল। কুমাইত নামে একজন মুদার বংশীয় কবি এক দীর্ঘ কবিতায় (নাম 'হাশিমিয়ে') তাঁর গোত্রের শৌর্যবীর্য, মহত্ব এবং হাশিমীদের গুণাবলী ও দুর্ভোগের ভূয়শী প্রশংসা করেন। দিবলি নামের এক ইয়েমেনী কবি একই সুরে তার প্রত্যুত্তর দিলেন যে মুদার বংশীয়দের আক্রমণ করে এবং হিময়ার বংশীয় ও তাদের শাসনকর্তাদের প্রশস্তি গেয়ে। এসকল কবিতা শহর থেকে শিবিরে বয়ে আনা হত এবং সেগুলোর উপহাস ও ব্যঙ্গ করা হত যা নগরবাসী ও যাযাবরদেরকে সমানভাবে উত্তেজিত করে। (এ বিষয়ে মাস'উদীর সুচিন্তিত অভিমতের উদ্ধৃতি মূল্যবান—'ইয়েমেনীদের বিরুদ্ধে নিজ বংশের প্রতি মারওয়ানের অন্ধ অনুরাগ ইয়েমেনীদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যাতে আব্বাসী প্রচারণা করতে সুবিধা হয় এবং শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে উমাইয়ার বংশীয়দের কাছ থেকে হাশিমের বংশধরদের হাতে ক্ষমতা চলে যায়। পরবর্তীতে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই জাইদার পুত্র মাআনকে ইয়েমেন আক্রমণে প্ররোচিত করে, যিনি মুদার বংশীয়দের প্রতি অনুরাগবশত ইয়েমেনীদের হত্যা করেন এবং হিময়ার ও মুদার বংশীয়দের যে পুরাতন চুক্তি ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তা ভঙ্গ করেন। আর এ কারণে উকবা বাহরাইন ও ওমানে বসবাসকারী মুদার গোত্রের বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী অভিযান চালান।') এ অবস্থায় মুদার ও হিময়ার বংশীয়রা পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন উন্মত্ততার সাথে অবতীর্ণ হয় যা তুলনাতীত।

বিদ্রোহ

এ সময় পশ্চিম এশিয়া বিশৃঙ্খলায় ভরা একটি রাজ্য ছিল। ধার্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক কোন্দল শুরু হয়েছিল তার ফলে তাঁরা অবিবেচক বা স্বার্থান্বেষী লোকদের হাতে প্রশাসনিক ও সরকারি কাজকর্ম ছেড়ে দেন। চতুর্দিকেই বিদ্রোহের জন্য একটি সমাগত প্রতীক্ষা দানা বেঁধে উঠছিল। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই মারওয়ানের বিরুদ্ধে হিমস ও প্যালেস্টাইনে প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসময়ই ধর্মান্ধ খারিজীরা তাদের মরুভূমির সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলি হতে বেরিয়ে আসে এবং অধার্মিক উমাইয়া শাসনের প্রকাশ্য নিন্দা করতে থাকে। এমনকি লোকজনকে সত্যের দিকে আহ্বান জানানো হয়। স্বর্গীয় চুক্তির দাবিদার এসকল তেজস্বী লোকের মতবাদ সম্পর্কে যাই বলা হোক না কেন, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে

তারা ছিল একেবারেই অকপট এবং তারা এমন এক কর্তব্য বোধে উদ্দীপ্ত হয়েছিল যে তারা সকল প্রকার বাধা-বিঘ্নকেই অগ্রাহ্য করেছিল। তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় অল্প হলেও কিছুদিনের জন্য তারা ইয়েমেন গ্রাস করতে সক্ষম হয়েছিল, হিজাজ ও সমগ্র ইরাককে এবং সেগুলিও তারা দখলে রেখেছিল। এসকল বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে মারওয়ান প্রশংসনীয় যুদ্ধকৌশল এবং সৈনিকোচিত তৎপরতা প্রদর্শন করেন। তিনি ক্রমান্বয়ে হিমস ও প্যালেস্টাইনে ঝাপিয়ে পড়ে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করেন এবং তাদের নেতৃবৃন্দকেও শূলবিদ্ধ করেন। তারপর তিনি ইরাকে ফিরে আসেন এবং কয়েকটি কঠিন যুদ্ধের পর ধর্মান্ধদেরকে টাইগ্রিস নদীর অপর তীরে বিতাড়িত করেন। আবু হামজার নেতৃত্বে খারিজীরা হিজাজে এক যুদ্ধে নগরবাসীদের পরাজিত করে মদিনা দখল করে নেয় এবং লোকজনের প্রতি এমন সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করে, যা তারা উমাইয়াদের কাছ থেকেও পায়নি। 'সত্যের দিকে আহ্বানকারী' 'দাই-উল-হাক্ক' (এই ব্যক্তি হাদরামাউতের অধিবাসী, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন ইয়াহিয়া হাদরামী।) উপাধিপ্রাপ্ত এক ব্যক্তির হাতে ইয়েমেন চলে আসে।

ধর্মান্ধদের পরাজয়

মারওয়ানের সহকারি, যিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কোরআনের অনুশাসন মানতে বাধ্য নন, যাঁর মতো বেপরোয়া ও অধার্মিক সৈন্য, সচরাচর মধ্যযুগীয় ইউরোপে দেখা যায়, তিনি কয়েকটি ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় যুদ্ধে ধর্মান্ধদেরকে পরাজিত করে হিজাজ ও ইয়েমেনকে মুক্ত করেন। অধিকাংশ খারিজী ইরাক থেকে বিতাড়িত হয়ে পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, যেখানে তারা ইতিমধ্যে বিদ্যমান বিবাদ ও বিশৃঙ্খলায় নতুন ইন্ধন যোগায়; অন্যদিকে হিজাজ ও ইয়েমেনে পরাজিতরা হাদরামাউতে আশ্রয় গ্রহণ করে। শান্তি পুনঃস্থাপন করে মারওয়ান পূর্বাঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর বংশের ভক্ত অনুগামী ইয়েজিদ বিন উমর বিন হোবায়রাকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর পুত্র আব্দুল মালিক ও আব্দুল্লাহকে তার শাসন সংক্রান্ত ব্যবহারিক কাজকর্মের দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি হাররানের প্রিয় বাসভবনে অবসর গ্রহণ করেন। যে অভিযানে তিনি ও তাঁর রাজবংশের দুর্দশাপূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটে, তা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এখানেই বসবাস করেছিলেন।

মারওয়ান যখন সিরিয়ায় বিদ্রোহ দমন করছেন এবং ইরাক ও আরবে ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তখন মুদার ও হিময়ার বংশীয়দের মধ্যে বিদ্যমান তিক্ত গোত্র-বিবাদ এশিয়ায় উমাইয়া সাম্রাজ্যকে নিয়ে যাচ্ছিল ধ্বংসের পথে। খোরাসানের শাসনকর্তা নাসর ছিলেন মুদ্রার বংশীয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে সমগ্র হিময়ার গোষ্ঠী একাত্ম ঘোষণা করেছিল। বিভিন্ন গোত্রের জনসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত আরব জাতির দুই শাখা যে মারাত্মক সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল আব্বাসী প্রচারণার নেতারা তাকে অতি সন্তর্পণে স্থাপিত মাইনে অগ্নিসংযোগ করার বহুপ্রত্যাশিত সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করে।

আবু মুসলিম : খোরাসানে বিদ্রোহ (১২৯ হিজরি; ৭৪৭ খ্রিস্টাব্দ)

আব্বাস বংশের ইমাম কর্তৃক ন্যস্ত কাজ করার জন্য বিদ্রোহের নেতা আবু মুসলিম অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। অনুভূতিহীন এক বাহ্যিক অবয়ব, যাতে লেশমাত্র সাফল্য বা ব্যর্থতা প্রদর্শিত না হলেও তার ভেতর লুকিয়ে ছিল নির্দয় ও নির্মম হৃদয়। একজন প্রাচীন লেখক বর্ণনা করেন, 'সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর মুখমণ্ডলের প্রশান্ত ভাব নষ্ট করতে পারত না।' 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ের সংবাদও তিনি সামান্যতম আনন্দের লক্ষণ প্রকাশ না করেই গ্রহণ করতেন; বৃহত্তম ভাগ্য বিপর্যয়ের পরেও তিনি বিন্দুমাত্র অস্বস্তি প্রকাশ করতেন না এবং রাগান্বিত হলেও কখনো আত্মসংযম হারাতেন না।' তাঁর অপরিবর্তনীয় শিষ্টাচার ও সৌজন্য শত্রুদেরও মন জয় করত এবং সমর্থন লাভে সহায়তা করত; পক্ষান্তরে তার সৈন্যবাহিনী গঠন ও শাসনকার্য পরিচালনার দক্ষতাও প্রশংসা আদায় করত। যে অহংকার ও তিক্ততা মুদার ও হিময়ার বংশীয়দের উত্তেজিত করেছিল, উভয় পক্ষ থেকে যথেষ্ট নিরাপদে থেকেও ম্যাকিয়াভেলীয় কৌশলে তা কাজে লাগিয়ে তিনি তার আত্মসিদ্ধি সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইতিপূর্বেই আব্বাসীয় প্রচারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং বর্ণনা করেছি যে কিভাবে তা ক্রমশ একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ধর্মীয় ইমামগণ কর্তৃক বলপ্রয়োগের নিন্দা তাদের অপেক্ষাকৃত অনেক উগ্র অনুগামীদের নিকট নিষ্ক্রিয়তা বলেই মনে হয়েছিল এবং উমাইয়ার ঘৃণ্য বংশ ধ্বংস করতে প্রয়োজনীয় নেতৃত্বের জন্য তাদের মনে অন্য কোথাও দৃষ্টিপাতের বাসনা জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু যে বিদ্রোহ সাফল্য-প্রবাহে ভাসিয়ে আব্বাসীদেরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল তার গুরুত্ব ব্যাখার জন্য কেবল এই কারণগুলোই যথেষ্ট নয়, মারওয়ানের মতো রণনিপুণ ও সুশিক্ষিত সৈনিকদের নেতৃত্বাধীন উমাইয়া শক্তির উচ্ছেদ সাধনে তারা নিজেরা যথেষ্ট ছিল না। আব্বাসী বংশের বিস্ময়কর উত্থানের চাবিকাঠি জুগিয়ে ছিল হাজ্জাব প্রবর্তিত শাসন পদ্ধতি, যা দ্বিতীয় উমর কর্তৃক পরিবর্তনের প্রয়াস সত্ত্বেও উমাইয়া বংশের পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধানদের আমলেও চিরাচরিত প্রথা হিসেবে চলে আসছিল। বিভিন্ন গোত্রের প্রজাদের সাথে শাসকরা ছিলেন সম্পর্কশূন্য, তাঁদের ও জনসাধারণের মধ্যে কোনোরকম সহানুভূতির বন্ধন ছিল না।

কারণসমূহ

গোত্রীয় অহমিকায় আরবরা স্থানীয় অধিবাসীদের থেকে দূরে থাকত এবং ইসলামের শিক্ষা সত্ত্বেও তাদেরকে ঘৃণা করত নিকৃষ্ট জাতি বলে, পরিণামে নিজেরাও হয়ে উঠেছিল ঘৃণার পাত্র। অসামরিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত অধঃস্তন দপ্তরগুলোর অধিকাংশই ছিল পারসীদের হাতে; কিন্তু সামরিক পদ এবং রাষ্ট্রের উচ্চতর দপ্তরগুলো থেকে তাদের বাদ দেয়া হয়েছিল। যখন মানুষে মানুষে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব ঘোষণাকারী মুক্তির সনদ কোরআনের নামে আবেদন করা হত তখন হয় তা অবজ্ঞা করা হত কিংবা এড়িয়ে যাওয়া হত বাক-চাতুরির সাহায্যে। যাঁদের নাম মহান উমর (রাঃ)-এর তালিকায় নথিভুক্ত

হয়েছিল কিংবা প্রসিদ্ধ কাজে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, সেইসব মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া প্রজাবর্গের আর কেউই শাসকদের সামাজিক সমাবেশ বা আনন্দোৎসবে অংশগ্রহণ করত না, বরং তাদের হৃত গৌরবের জন্য গভীর চিন্তায় মগ্ন হত চাপা ক্রোধ ও ঘৃণার সাথে। কিন্তু সিরীয় আরবগণ, মুদার এবং হিময়ার উভয়েই, আসন্ন ঝড়ের বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে নিজেদের আমোদ-প্রমোদ বা গোত্র-কলহে লিপ্ত হয়। রাজনৈতিক অক্ষমতা এবং অবাঞ্ছিত সামাজিক বৈষম্য পারসীদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে অবিচারের এক প্রবল ও স্বাভাবিক ধারণা। জাতীয় উদ্দীপনায় অগ্নিসংযোগ করতে কেবল একটি সংকেত-ধ্বনিরই প্রয়োজন ছিল এবং তা দেখা যায় "আহলুল বায়েতের (রসুলুল্লাহ স. এর বংশধর) অধিকার"—এই কথার মধ্যে, যা পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন জাতির প্রজাদের পুনর্মিলনের আওয়াজ হয়ে ওঠে। হিময়ার গোত্রগুলি এবং হিজাজ ও ইরাকের অধিকাংশ আরবগণ, যারা খোরাসানে বসতি স্থাপন করেছিল, তারাও ছিল সমানভাবে অসন্তুষ্ট। সচরাচর যা ঘটে তেমনি ক্ষমতাসীন দল প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কর্মস্থানের সুযোগ তাদের হাতে একচেটিয়া করে রাখতে এবং অন্যদের তার অংশীদার হওয়া বন্ধ করতে প্রবলভাবে চেষ্টা করেছিল, যাতে সূত্রপাত ঘটে তিক্ত বিদ্বেষ ও বিবাদের। এইসব অসন্তোষ ও অসৎ ভাবের কারণগুলোর মধ্যেই আবু মুসলিম তাঁর বিদ্রোহের উপাদান খুঁজে পান। এবং খোরাসান হয়ে ওঠে বনু আব্বাসের অনুগামীদের (বনু আব্বাসের 'শিয়ীয়ান') কেন্দ্রস্থল।

খোরাসানের শাসনকর্তা নাসর ছিলেন দক্ষ ও তেজস্বী প্রশাসক এবং অপেক্ষাকৃত সুখী অবস্থায় থাকলে তিনি সম্ভবত প্রদেশের উপর তাঁর প্রভাব রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর প্রভু যখন পশ্চিমাঞ্চলে ধর্মান্ধদের সঙ্গে সংগ্রামরত তিনি তখন জন্মভূমি সূত্রে কিরমানী নামে অভিহিত একজনের নেতৃত্বাধীন একটি ইয়েমেনী দলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন। এইভাবে আরব দুর্গগুলোকে প্রহরীশূন্য দেখে আবু মুসলিম জারি করেন তাঁর দীর্ঘ-পরিকল্পিত বিদ্রোহের ইশতেহার। অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারী বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে 'আহলুল বায়েতের অধিকার' প্রতিষ্ঠাই এর উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়; এবং নিজেকে 'আল-হাশিম' অর্থাৎ 'হাশিমের বংশধর' বলে প্রচার করে বিদ্রোহের নেতা এই দ্ব্যর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে ফাতিমীদের অনুগামীদের সমর্থনও সুনিশ্চিত করে।

রমযান, ১২৯ হিজরি

১২৯ হিজরির ২৫ রমজান জমায়েত ঘটে এবং তাতে জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হয় পর্বত শিখরে বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে। যুদ্ধক্ষেত্রে হত বা ঘাতকের হাতে নিহত প্রধানদের জন্য শোক প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ কালো পোশাক পরিহিত বিশাল জনতা দলে দলে নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়; এবং কয়েক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতে না হতেই 'মেঘ' ও 'ছায়া' বলে অভিহিত আব্বাসীদের রাজপদে অভিষেকের ধারক কালো পতাকা তাদের পশ্চিমুখী অভিযানে নগর থেকে নগরে উড়তে থাকে। উমাইয়া দুর্গরক্ষীদেরকে বিতাড়িত করা হল হিরাত ও দূরপ্রাচ্যের অন্যান্য স্থান থেকে। মুদার বংশীয়রা ওঁৎ পেতে কিরমানির মৃত্যু ঘটানোয় তাঁর পুত্ররা আবু মুসলিমের সাথে যোগ দেয়; এবং তাদের সম্মিলিত

বাহিনী নাসরকে বিতাড়িত করে মার্ভ থেকে। আল-হাশিমের অশুভ কালো পতাকা এযাবৎকাল দলাদলিতে বিভক্ত সিরীয়দের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেয়; তারা সহসা জেগে ওঠে বিপদের গুরুত্ব সম্পর্কে এবং জোড়াতালি দিয়ে বাহ্যিক ঐক্য সাধনের চেষ্টা করে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বিদ্রোহ এখন বিপ্লবে পরিণত এবং তাতে হিজাজ ও ইরাকের বহু নেতৃস্থানীয় আরব যোগ দেয়। উত্তরোত্তর সংখ্যা ও শক্তিতে বর্ধিষ্ণু আবু মুসলিমের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর একাকী মোকাবিলায় অসমর্থ হয়ে হতভাগ্য রাজপ্রতিনিধি তাঁর রাষ্ট্রপ্রদানের সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু মারওয়ান তখন মেসোপটেমিয়ায় ধর্মান্ধদের দ্বারা চাপের মধ্যে থাকায় তিনি কোনো প্রতিউত্তর পান না। মার্ভ ত্যাগ করার আগে নাসর শেষবারের মতো মারওয়ানের কাছে করুণ আবেদন করেন সাহায্যের জন্য। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিদ্রোহের আগুন এখনো ভ্রূণাবস্থায় এবং এখনো তা নিভিয়ে দেওয়া যায়, তারপর যে হতাশাব্যঞ্জক সুরে তিনি আবেদন শেষ করেন তা ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, 'হায়, যদি আমি জানতাম উমাইয়ার সন্তানরা জাগ্রত না নিদ্রায় নিমজ্জিত! যদি তারা এই ঘোর সংকটকালেও ঘুমিয়ে থাকে, তাদের বলো : 'জাগ্রত হও, সময় এসেছে।'

১৩০ হিজরি; ৭৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দ

এই জরুরি আবেদনে সাড়া দিয়ে মারওয়ান নাসরের সাহায্যের জন্য ইরাকের রাজপ্রতিনিধিকে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানোর নির্দেশ দেন, কিন্তু তারা অকুস্থলে পৌঁছানোর আগেই ফারগনা ও খোরাসান সম্পূর্ণভাবে নিপতিত হয় আবু মুসলিমের হাতে এবং তাঁর রসদও সেই পরিমাণে বেড়ে যায়। এমন বিচক্ষণতাপূর্ণ লোক নির্বাচনের যোগ্যতা এই অসাধারণ পুরুষের ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই প্রতিপন্ন করে না; যেসব সেনাপতিকে তিনি নিয়োগ করেছিলেন, তারা ছিলেন সেকালের সবচেয়ে দক্ষ ব্যক্তি।

খোরাসানের শাসনকর্তা নাসরের পলায়ন ও মৃত্যু

কাহতবা বিন শাব্বি নামে ফার্সে বসবাসকারী হিজাজের এক আরব নাসরকে সাররাখস পর্যন্ত অনুসরণ করেন এবং তাঁকে পরাজয়ের আঘাত হানেন, যাতে সিরীয় সৈন্যদল আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে সম্পূর্ণভাবে। নাসরের বয়স তখন পঁচাশি বছর, তিনি জুরজানে পশ্চাদপসরণ করেন, যেখানে তাঁকে আরেকবার পরাজয় ভোগ করতে হয়, অতঃপর তিনি পালিয়ে যান ফার্সের দিকে, কিন্তু পথিমধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন।

পূর্বাঞ্চলে যখন এসব ঘটনা সংঘটিত হচ্ছিল মারওয়ান তখন সেই হাশিমীর তল্লাসে প্রয়াসী ছিলেন, যাঁর স্বার্থে উড্ডীন হয়েছিল বিদ্রোহের পতাকা। এই সময় আব্বাসের বংশধররা দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের হুমায়ম নামক গ্রামে বাস করছিলেন। অনুচরদের দ্বারা ইমাম (দর্মীয় নেতা বলে আখ্যায়িত ইব্রাহিমই এই বিদ্রোহের হোতা—গুপ্তচরদের মাধ্যমে এ কথা জানতে পেরেই তিনি অবিলম্বে তাঁকে গ্রেপ্তার করান এবং নিয়ে আসেন হাররানে। এখানে ইব্রাহিম হাশিমী ও উমাইয়া উভয় বংশের আরও অনেকের সঙ্গে কারারুদ্ধ হন। পূর্ববর্তীদের (উমাইয়া) মধ্যে ছিলেন দ্বিতীয় উমরের পুত্র আবদুল্লাহ এবং

প্রথম ওয়ালিদের পুত্র আব্বাস, যাঁদেরকে মারওয়ান বিদ্রোহ ঘটাতে সচেষ্ট বলে সন্দেহ করেছিলেন। তবু ইব্রাহিমের গ্রেপ্তার আবু মুসলিমের সেনাদলের গতিবিধির ওপর কোনো প্রভাবই ফেলতে পারে না।

কাহতবার বিজয়সমূহ

জুরজানে নাসরকে পরাজিত করে কাহতবা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন পশ্চিম দিকে। তাঁর সঙ্গী হন খালিদ বিন বারমেক নামে এক পারসী, যাঁর বংশধররা পরবর্তীকালে আরবের ইতিহাস ও সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। দেশের চারদিকেই তখন চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজমান। রায়ে (প্রাচীন র‍্যাজেস) প্রবেশ করে কাহতবা প্রদেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন, অন্যদিকে তাঁর পুত্র হাসান এবং সহকারি আবু আয়ুন, যিনি জন্মসূত্রে ছিলেন পারসী, তাঁরা বিতাড়িত করেন উমাইয়া ও ধর্মান্ধ খারিজীদেরকে। যেখানে পারস্য বিজয়ের বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সেই নিহাওয়ান্দ সুরক্ষিত ছিল একটি শক্তিশালী সিরীয় বাহিনী দ্বারা। হাসান বিন কাহতবা নগরটি অবরোধ করেন, অন্যদিকে তাঁর পিতা প্রতিহত করেন এর সাহায্যার্থে প্রেরিত মারওয়ানের এক বিশাল বাহিনীকে এবং সেটিকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করা হয়। দুটি সেনাবাহিনীর একটি মারওয়ানের পুত্র আবদুল্লাহর নেতৃত্বে উত্তর মেসোপটেমিয়া থেকে, অন্যটি রাজপ্রতিনিধি ইয়েজিদের অধীনে নিহাওয়ান্দে মিলিত হয়, কাহতবা কঠিনভাবে অবরোধের ওপর জোর দেন এবং নগরীটি আত্মসমর্পণ করে উভয় দিক থেকে সাহায্য আসার আগেই। কাহতবা এবার আব্দুল্লাহকে বাধা দেওয়ার জন্য আবু আয়ুনের নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে আলাদা করেন, অন্যদিকে প্রধান বাহিনী নিয়ে তিনি অতিক্রম করেন কুফা থেকে আগত রাজপথের উপর জালোলা নামক স্থানে শিবির স্থাপনকারী ইয়েজিদকে এবং সোজা ইরাকের রাজধানীর দিকে ধাবিত হন। তাঁর এই অভিসন্ধি জানতে পেরে ইয়েজিদ তৎপর হন কুফা ও শত্রুর মধ্যবর্তী স্থানে নিজেকে স্থাপন করতে। কাহতবা ইয়েজিদের পর ইউফ্রেটিসের তীরে উপনীত হন এবং কয়েক মাইল উজানে নদী পার হন বিপক্ষ বাহিনীর নাগালের বাইরে। যেখানে ইমাম হুসাইন (রা.) নিহত হয়েছিলেন সেই একই স্থানে দুই সেনাদল মিলিত হয়, এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর উমাইয়ারা হয় পরাজিত, কিন্তু কাহতবাও নদীতে ডুবে যান কিংবা প্রাণ হারান যুদ্ধক্ষেত্রে।

ইরাকের রাজপ্রতিনিধির পরাজয়

অতঃপর তাঁর পুত্র হাসান নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং পিতার সাফল্য অনুসরণ করে ইয়েজিদকে বিতাড়িত করেন তাঁর শিবির থেকে এবং তাঁকে ওয়াসিতে (হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক স্থাপিত দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত একটি দুর্গ নগরী, কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং সেই কারণেই বলা হয় 'ওয়াসিত'—মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।) প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করেন। কুফা এভাবে অরক্ষিত অবস্থায় বিশেষ বাধা ছাড়াই চলে আসে হাসানের হাতে।

আব্বাসী ইমাম ইব্রাহিমের মৃত্যু

এই বিপর্যয়ের সংবাদ মারওয়ানকে ক্রোধে উত্তেজিত করে তোলে এবং তিনি প্রবৃত্ত হন এমন এক বর্বরোচিত কাজে, যা উমাইয়া বংশধরদের ওপর ভয়াবহ প্রতিশোধ বয়ে এনেছিল। আবু মুসলিমের সেনাদলের সাথে যোগাযোগ আছে জানতে পেরে তিনি তাঁকে হত্যার আদেশ দেন কলিচুনে পূর্ণ চামড়ার থলেতে তাঁর মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে। অন্যান্য বন্দীদেরও একই সময় হত্যা করা হয়। (ইবনুল আসির ভিন্ন বিবরণ দেন। তাঁর মতে, ইব্রাহিমের উপর একটি বাড়ি ধ্বসে পড়ায় কিংবা বিষমিশ্রিত দুদের পেয়ালা পান করায় তাঁর মৃত্যু ঘটে; অন্যান্য বন্দীরা মারা যান প্লেগ রোগে। আমরা আশা করি এই মতই যেন সত্য হয়।) মৃত্যুর আগে হতভাগ্য ইব্রাহিম তাঁর ভাই আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহর কাছে একটি ইচ্ছাপত্র রেখে যেতে সফল হয়েছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি আব্বাসী ইমামতের উত্তরাধিকার লাভ করেন। আবুল আব্বাস প্রতিশোধের জন্য এক ভীষণ শপথ গ্রহণ করেন এবং এমন নিষ্ঠার সাথে তা পালন করেন যে তিনি অর্জন করেন 'আস-সাফফাহ' বা রক্তপাতকারী নামে এক অবাঞ্ছিত উপাধি, যে নামে তিনি ইতিহাসে পরিচিত। ইব্রাহিমের মৃত্যুতে তাঁর ভাইরা কুফায় পালিয়ে যান এবং সেখানে গোপনে অবস্থান করেন হাসান বিন কাহতবা নগরটি দখল না করা পর্যন্ত। যে আন্দোলনের মাধ্যমে উমাইয়াদের হাত থেকে পারস্যকে কেড়ে নেওয়া হয় তার চরম উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনো কিছুই প্রকাশ করা হয়নি। 'আহলে বায়েত' হল একটি সংকেত ধ্বনি, যা কালো পতাকার চারদিকে সকল শ্রেণীর মানুষকে সমবেত করেছিল এবং সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেছিল বনু ফাতিমার অনুগামীদের (শিয়া)। কুফায় প্রবেশ করলে হাসান বিন কাহতবার সাথে যোগ দেন আবু সালমা (এটি তাঁর পৈত্রিক নাম। তাঁর নিজের নাম ছিল জাফর; পিতার নাম সুলায়মান আল-খাল্লাল, তিনি সির্কা বিক্রেতাদের এলাকায় বাস করতেন বলে এই নামে অভিহিত হন।) আল-খাল্লাল, 'রওজাত-উস সাফা'র লেখক বলেন, 'তিনি মুহম্মদ (স.)-এর বংশধরগণের মন্ত্রদাতা বলে আখ্যায়িত হতেন।' পারিবারিক প্রধানের প্রথাগত অনুমোদন করতেন। তাঁকে অন্তত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন আব্বাসী সেনাপতি, 'যিনি তাঁর হস্ত চুম্বন করেন এবং বসান সম্মানজনক আসনে', সেই সঙ্গে বলেন যে, সমস্ত ব্যাপারে তাঁকে মান্য করার জন্য আবু মুসলিমের আদেশ রয়েছে। আবু সালমার অহমিকাকে তোষামোদ করা হয়। আবু সালমা ও হাসান বিন কাহতবার যুগ্ম নামে একটি ঘোষণা প্রচারিত হয় পরদিন 'মসজিদ-উল-জামআ' (প্রধান মসজিদ)-তে একজন খলিফা নির্বাচনের জন্য কুফাবাসীদের সমবেত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে। ওইদিন কুফায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। বনু আব্বাসের কালো পোশাক পরিহিত বিশাল জনতা প্রতিটি এলাকা থেকে দ্রুত 'মসজিদ-উল-জামআ'র দিকে ধাবিত হল বহু প্রতীক্ষিত ঘোষণা শুনতে। যথাসময়ে আবু সালমা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং বিস্ময়করভাবে সেই একই বিষাদময় কালো পোশাক পরিধান করে। আবুল আব্বাসের পক্ষভুক্ত লোকজন ছাড়া অল্প লোকই জানত যে কিভাবে তিনি আব্বাসীদের স্বার্থের কাছে নিজেকে বিক্রি করতে যাচ্ছেন। প্রভুর স্বার্থের জন্য তিনি নিজের মাথা উৎসর্গ করাই শ্রেয় মনে করেন। নামাজে ইমামতির পর তিনি সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন সমবেত জনতার

কাছে। তিনি বলেন, ধর্মের রক্ষক এবং আহলে বায়েতের স্বার্থ রক্ষাকারী আবু মুসলিম অনাচারের শীর্ষ থেকে উমাইয়াদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন; এখন প্রয়োজন একজন ইমাম ও খলিফা নির্বাচন; এই পদের জন্য ধার্মিকতা, দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় সর্বগুণে আবুল আব্বাস আবদুল্লাহর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি আর কেউ নেই এবং তাঁকে নির্বাচনের জন্যই তিনি লোকদের কাছে প্রস্তাব করেন। জনতার মধ্যে এর কি সম্ভাব্য প্রতিফল দেখা দেবে সে সম্পর্কে আবু সালমা এবং আব্বাসীরা তখনো ছিলেন সন্দিহান। তাঁদের ভয় ছিল এমনকি কুফাবাসীরাও হয়তো হযরত আলী (রা.)-এর বংশধরদের প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকতা অনুমোদন করবে না। কিন্তু ইরাকীদের প্রবাদতুল্য পরিবর্তনশীল মানসিকতাই এক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়। ফাতিমীদের স্বার্থে তারা বারবার অস্ত্রধারণ করেছে, যাদের সাহায্য করতে তারা ছিল অঙ্গীকারবদ্ধ কিংবা তারাই যাদের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। ক্ষণিকের খেয়ালে দোলায়িত হয়ে তারা একইভাবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছে বিশ্বাসঘাতক ও সত্যের রক্ষক হিসেবে।

সাফফাহ্ খলিফা বলে ঘোষিত

আবুল আব্বাসকে খলিফা হিসেবে প্রস্তাবের কথা আবু সালমার ওষ্ঠ থেকে নিঃসৃত হতে না হতেই সহসা তারা উচ্চস্বরে 'তকবীর' (আল্লাহু আকবর—আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) ধ্বনি দিয়ে তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করে। দ্রুত একজন দূতকে পাঠানো হয় আবুল আব্বাসকে তাঁর গোপন আস্তানা থেকে বের করে আনতে এবং তিনি মসজিদে উপনীত হলে জনতার একাংশ তাঁর করমর্দন ও আনুগত্যের শপথের জন্য অস্থিরভাবে ছোটাছুটি করতে থাকে।

১৩ রবিউস সানি, ১৩২ হিজরি; ২৫ নভেম্বর ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ

নির্বাচন সমাপ্ত হয়। তিনি আরোহণ করেন ধর্মীয় মঞ্চে, খুতবা (ইমাম, খলিফা বা ধর্মীয় সমাবেশের নেতা প্রদত্ত সাধারণ ধর্মোপদেশ। ইবনুল আসিরের গ্রন্থে গাফফার বক্তৃতা বিস্তারিতভাবে রক্ষিত আছে এবং তাতে রয়েছে আব্বাসের বংশধরদের দীর্ঘ প্রশস্তি, খিলাফতের ওপর তাদের অধিকার এবং ধর্ম ও আইন রক্ষায় অধার্মিক উমাইয়ার বংশধরদের বিরুদ্ধে তাদের প্রয়াসের কথা।) পাঠ করেন এবং তখন থেকেই তিনি হন মুসলমানদের ইমাম (ধর্মীয় প্রধান) ও খলিফা। এভাবেই আব্বাসীরা ফাতিমা (রা.)-এর বংশধরদের জনপ্রিয়তার সুযোগে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, পরবর্তীকালে যাঁদেরকে তারা বিপরীত প্রতিদানই দিয়েছিল।

ইতোমধ্যে উত্তরাঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহ অগ্রসর হচ্ছিল দ্রুতগতিতে। ছোট জাব নদীর পূর্বতীরে শাহরজুর নামক স্থানে আবু আয়ুন মারওয়ানের পুত্রকে আক্রমণ করেন এবং তাঁকে পরাজিত করেন ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। পুত্রের পরাজয় মারওয়ানের মধ্যে তাঁর বিগত তৎপরতা জাগিয়ে তোলে। ১২০,০০০ সেনা নিয়ে টাইগ্রিস নদী অতিক্রম করে তিনি অগ্রসর হলেন বৃহত্তর জাবের দিকে। ইতোমধ্যে আবু আয়ুন কুফা

থেকে নতুনভাবে সেনা সাহায্য পেয়ে যান এবং সাফফাহর অন্যতম পিতৃব্য নিষ্ঠুর আব্দুল্লাহ বিন আলী, যিনি নতুন সেনা নিয়ে এসেছিলেন, তিনি আবু আয়ুনকে সহকারী হিসেবে বহাল রেখে আব্বাসী বাহিনীর সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জাবের যুদ্ধ : মারওয়ানের পরাজয়

(১১ জমাদিউস সানি, ১৩২ হিজরি; ২৫ জানুয়ারি ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)

জাব (মসুল ও আরবেলার মধ্যবর্তী নদী) নদীর বাম তীরবর্তী কুশাফ নামক গ্রামে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উপদেশ অগ্রাহ্য করে মারওয়ান একটি সেতু নির্মাণ করেন নদীর ওপর এবং তাঁর সহজাত স্পর্ধায় যুদ্ধ করতে এগিয়ে যান। আপাদমস্তক কালো পোশাকে আচ্ছাদিত সাফফাহর সেনাদল তাদের পতাকা, অশ্ব এবং উটগুলিকেও কৃষ্ণবর্ণে সজ্জিত করে নীরবে দলবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছিল মূক শবযাত্রীদের মতো, যা সিরীয়দের মধ্যে অবশ্যই ভয়ের উদ্রেক করেছিল। পরস্পরের বিরোধী সেনাদল ঠিক যখন আদেশের অপেক্ষায় প্রস্তুত তখনই একটি অস্বাভাবিক ঘটনাকে উমাইয়ারা গ্রহণ করে ভবিষ্যতের জন্য অমঙ্গলজনক বলে। এক ঝাঁক দাঁড়কাক সিরীয় বাহিনীর ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে কালো পোশাক পরিহিত সেনাদলের (মুসাওয়িদাহ বা 'কালো পোশাক পরিধানকারী' বলে অভিহিত) কালো পতাকার উপর বসে পড়ে। মারওয়ান এই ঘটনার প্রতি ভ্রূক্ষেপই করেন না, কিন্তু এর স্পষ্ট প্রভাব দেখতে পান তাঁর কুসংস্কারচ্ছন্ন সৈনিকদের ওপর। মারওয়ানের প্রথম আক্রমণ সফল হয় এবং পিছু হটল আব্বাসীরা। কিন্তু আবু আয়ুন তাঁর সেনাদের অবতরণ (অশ্বপৃষ্ঠ হতে) ফরান এবং তাদের বর্শাগুলি পুঁতে ফেলেন মাটিতে; অন্যদিকে খোরাসানের বীরপুরুষ বলে অভিহিত করে আব্দুল্লাহ বিন আলী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তাদের উত্তেজিত করেন। তিনি চিৎকার করেন 'ইয়া মহম্মদ! ইয়া মনসুর!' বলে এবং সেই রণধ্বনি সমস্ত সৈনিক কর্তৃক প্রতিধ্বনিত হয়। বংশের গৌরব রক্ষায় মারওয়ানও তাঁর সেনাদের উজ্জীবিত করেন তাদের পূর্ব গৌরবের কথা উল্লেখ করে। যাই হোক, তাঁর আবেদনে কোনো ফল হয় না। সিরীয়রা পিছু হটল প্রচণ্ড আক্রমণের ধাক্কায় এবং মারওয়ানের আরোহীহীন অশ্ব, যা বেরিয়ে এসেছিল সহিসের হাত ফস্কে, সেই দৃশ্য সিরীয় সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই স্মরণীয় যুদ্ধ, যাতে উমাইয়া রাজবংশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় তা সংঘটিত হয় ১৩২ হিজরির ১১ জমাদিউস সানি। মারওয়ান মসুলের দিকে পালিয়ে যান, কিন্তু নগর-দ্বার তাঁর জন্য রুদ্ধ হয়। তিনি অতঃপর ছোটেন হাররানে, যেখানে কিছুকাল অপেক্ষা করে আরেকটি সেনাদল গঠনের বৃথা চেষ্টা করেন। কিন্তু নির্মম আব্বাসীরা ধাওয়া করে তাঁর পিছনে; তিনি হাররান থেকে হিমসে পালিয়ে যান এবং সেখান থেকে দামাসকাসে। সেখানেও কোনো নিরাপত্তা না দেখে তিনি দ্রুত প্যালেস্টাইনের দিকে চলে যান। কিন্তু অনুসরণ ছিল তীব্র ও শৈথিল্যহীন এবং আব্দুল্লাহ বিন আলী মিকারী কুকুরের মতো মারওয়ানের পিছু ধাওয়া করছিলেন। মসুল, হাররান ও হিমস বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করে সাফফাহর কাছে।

দামাসকাস অধিকার (৫ রমজান, ১৩২ হিজরি, মার্চ ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)

দামাসকাসে উমাইয়ারা কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলে, কিন্তু নগর আক্রান্ত হয় প্রবলভাবে; সেখানকার শাসনকর্তা মারওয়ানের জামাতা নিহত হন; আর সেই সাথে সিরিয়ার রাজধানী এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র সাম্রাজ্য চলে যায় আব্বসীদের হাতে। কুফায় প্রবেশের পাঁচ মাস এবং জাবের যুদ্ধের তিন মাস পর ১৩২ হিজরির ৫ রমজান উমাইয়া প্রাসাদের উপর সগৌরবে কালো পতাকা উড়তে থাকে। ইতিহাসে বিরল—দৃশ্য নৃশংসতায় আব্দুল্লাহ বিন আলী জীবিতদের ওপরই তাঁর জিঘাংসা চরিতার্থ করে খ্যান্ত হননি, তাঁর আদেশে মৃতদেরও তোলা হয় তাদের অন্তিম বিশ্রাম-স্থল, জীর্ণ তাদের অস্থিগুলো পোড়ানো হয় (ইবনে খাল্লিকান উদ্ধৃত একজন প্রত্যক্ষদর্শী এই ভয়াবহ প্রতিহিংসাপরায়ণতার কারণ নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন যে, উমাইয়ারা জায়েদ ও তাঁর পুত্রের প্রতি যে বর্বর আচরণ করেছিল, তাই আব্দুল্লাহ বিন আলিকে এই প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত করেছিল।) এবং ভস্মরাশি ছড়িয়ে দেয়া হয় বাতাসে। অতঃপর আব্দুল্লাহ দ্রুতবেগে মারওয়ানের পিছু ধাওয়া করেন, যিনি প্যালেস্টাইন ত্যাগ করে বাইজান্টাইন রাজ্যে ঢুকে কনস্ট্যানটাইনের উত্তরাধিকারীর কাছে সাহায্য প্রার্থনার কথা ভাবছিলেন। তিনি জানতেন কিভাবে এক পারস্যরাজ (খসরু পারভেজ সম্রাট মরিসের মাধ্যমে তাঁর রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন) বাইজান্টাইন সম্রাটের মাধ্যমে ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর পৈতৃক রাজ্য এবং তিনিও যে অনুরূপ সমর্থন পাবেন সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাঁকে এই পদক্ষেপ থেকে নিরস্ত করে কিছু বিশ্বস্ত অনুচর, যাঁরা তখনো তাঁর নিয়তির সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা পরামর্শ দেন মিশর বা আফ্রিকায় চলে যেতে, যেখানে তিনি পূর্বাঞ্চলেল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করার জন্য আরেকটি সেনাদল গঠন করতে পারবেন কিংবা পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন একটি নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী সাম্রাজ্য। অতঃপর মারওয়ান উত্তর মিশরের ফাইয়ুমের দিকে দ্রুত অগ্রসর হন। আব্দুল্লাহ বিন আলী তাঁর ভাই সালেহ এবং আয়ূনকে পাঠান পলাতকের অনুসরণে।

মারওয়ানের মৃত্যু (২৬ জুলহিজ্জ, ১৩২ হিজরি; ৫ আগস্ট, ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)

ফুসতাতে এসে আবু আয়ুন মারওয়ানের সন্ধান পান এবং অনুসরণ এবার পরিণত হয় শিকারে। অনুসরণকারীরা নীলনদের পশ্চিম তীরে বুসির বা বুসিরিস নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র খ্রিস্টান গির্জায় পরাজিত নৃপতিকে দেখতে পান, যেখানে তিনি শায়িত ছিলেন বিশ্রামের জন্য। অতি উচ্চমূল্যে নিজের জীবন বিকিয়ে দেওয়ার কৃতসংকল্প নিয়ে হতভাগ্য রাষ্ট্রপ্রধান তরবারী হাতে বেরিয়ে আসেন এবং নিহত হন বর্শাবিদ্ধ হয়ে। এভাবে তাঁর বংশের অন্যতম সাহসী ও শ্রেষ্ঠ পুরুষের জীবনাবসান হয় এবং তাঁর সাথেই পতন ঘটে উমাইয়া বংশের। 'হাশিমীদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী' উপাধিধারণকারী সাফফাহর আদেশে ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার সাথে পরাজিত বংশের লোকদের অনুসরণ করা হয়। হিংস্র প্রতিশোধপরায়ণতা চরিতার্থ করতে সমস্ত মানবিক অনুভূতিকে করা হয় শ্বাসরুদ্ধ। লোকগুলোকে খোঁজা হয় তন্ন তন্ন করে এবং যেখানেই দেখা গেল সেখানেই তাদের হত্যা করা হয়; তল্লাসী চলে দূরবর্তী স্থানে, গোপন ধ্বংসস্তূপে, পার্বত্য এলাকার

নির্জন গুহায় এবং প্রতিটি পলাতককে পাওয়া মাত্র মেরে ফেলা হয়। বনু আব্বাস প্রদর্শিত নিষ্ঠুরতা ও বর্বর বিদ্বেষ উপলব্ধি করতে হলে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে পরবর্তীকালে 'গোলাপের যুদ্ধে' সংঘটিত ভয়ংকর দৃশ্যপটে, যখন সমগ্র পরিবারগুলোই ধ্বংস হয়েছিল। প্যালেস্টাইনে আবু ফুতরুস নদীর তীরে আব্দুল্লাহ বিন আলী মারওয়ানের আশি জন আত্মীয়-কুটুম্বকে প্রলুব্ধ করে তাঁর শিবিরে নিয়ে আসেন সাধারণ ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেন। তবু অনেকেই পালিয়ে বাঁচে 'প্রতিশোধ গ্রহণকারী'র তরবারীর আঘাত থেকে (মদিনায় ফাতিমা (রা.)-এর বংশধরদের দ্বারা অনেকেই রক্ষা পায়; ইরাকে সাফফাহর পিতৃব্য সুলায়মান বিন আলী একটি সাধারণ নিরাপত্তার আদেশ পান, যাতে অধিকতর হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়।) এবং পরবর্তীকালে তারা সাফফাহর উত্তরাধিকারীদের মানবিকতায় আশ্রয় ও সাহায্য পায়। যারা অনুসরণকারীদের কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন হিশামের এক দৌহিত্র আবদুর রহমান, যিনি স্পেনে পালিয়ে যান। মারওয়ানের কন্যাগণ, যাঁরা ওই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন, পরিবারের অন্যান্য লোকের সঙ্গে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় হাররানে। এখানে তাঁরা মাহদীর সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় বাস করেন, তিনিই তাঁদের জন্য উদারভাবে বৃত্তি নির্ধারণ করে দেন এবং তাঁদের সঙ্গে মর্যাদা ও দুর্ভাগ্যের উপযোগী সহানুভূতিশীল ব্যবহার করেন।

মারওয়ানের সঙ্গেই পূর্বাঞ্চলে শক্তিশালী উমাইয়া বংশের শাসনের অবসান ঘটে। এই বংশের কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধান নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, পক্ষান্তরে অন্যান্যরাও পাশ্চাত্য জগতে তাঁদের সমসাময়িকদের চেয়ে মন্দ ছিলেন না। দ্বিতীয় উমর, যিনি সমুচিতভাবেই আরবদের মার্কাস অরেলিয়াস বলে অভিহিত হন, তিনি ছিলেন তাঁর সময় অপেক্ষা অনেক প্রগতিশীল শাসক; এবং তাঁর সঙ্গে একই আসনে বসার উপযুক্ত না হলেও প্রথম ওয়ালিদ ও হিশাম সুদক্ষই ছিলেন, যথার্থভাবেই তাঁরা উৎসাহী ছিলেন জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে। দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি না ঘটলে মারওয়ান নিজেও পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর শাসক বলে পরিগণিত হতে পারতেন। তিনি ছিলেন সাহসী ও বিজ্ঞ; কিন্তু ইবনুল আসির বলেন, যেহেতু নিয়তি তাঁর রাজত্বের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিল, তাই তাঁর শৌর্য ও জ্ঞান উভয়ই ব্যর্থ হয়।

পরাজিত বংশের ভাগ্য উপদেশবিহীন নয়। মারওয়ানের পরিবারভুক্ত এক ব্যক্তি, যিনি তাঁর রাজত্বে রাজ্যের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরবর্তীকালে সাম্রাজ্য যখন বনু আব্বাসের হাতে চলে যায়, তখন তিনি এভাবে উমাইয়া শক্তির পতনের কারণ বর্ণনা করেছেন—'যে সময়টা সরকারি কাজে নিয়োজিত করা আমাদের কর্তব্য ছিল সেটি আমরা আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করেছি; জনসাধারণের ওপর যে গুরুভার আরোপ করেছিলাম তা তাদের বিমুখ করেছিল আমাদের শাসন থেকে; পীড়াদায়ক অসুখে আক্রান্ত হয়ে এবং তার প্রতিকারে নিরাশ হয়ে তারা আমাদের কবল থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিল; আমাদের রাজ্য অনাবাদী এবং রাজকোষ শূন্য হয়ে উঠেছিল; আমরা মন্ত্রীদের বিশ্বাস করেছিলাম, আর তাঁরা আমাদের স্বার্থকে বলি দিয়েছিলেন তাঁদের স্বার্থপর উদ্দেশ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাছে এবং আমাদের অংশগ্রহণ ছাড়াই আমাদের

অজ্ঞাতসারে প্রশাসন চালাচ্ছিলেন। সেনাবাহিনী, যাদের বেতন সব সময়ই বকেয়া থাকত, বিপদের সময় তারা চলে যেত শত্রুর পক্ষে; এবং বিশেষ প্রয়োজনের সময় মিত্ররা আমাদের ত্যাগ করত। কিন্তু শাসনকার্য ও চারদিকের ঘটনাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতাই আমাদের সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম প্রধান কারণ (মাসউদী)।

খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর হত্যা থেকে দ্বিতীয় মারওয়ানের মৃত্যু পর্যন্ত উমাইয়া বংশের মোট শাসনকাল একানব্বই বছরের কিছু কম। কিন্তু মাসউদী ওই সময় থেকে ইমাম হাসান (রা.)-এর ধর্মীয় শাসনকাল এবং আব্দুল্লাহ বিন জুবাইয়ের খলিফা হিসেবে স্বীকৃতির সময়টুকু বাদ দিয়েছেন এবং তাদের সন্দেহাতীত সাম্রাজ্যের মেয়াদ এক হাজার মাস বা তিরাশি বছর চার মাস বলে উল্লেখ করেছেন। আব্বাসী ও উমাইয়াদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ বর্বর ও স্বার্থপ্রণোদিত হলেও তা এমন বিষয় সমূহের জন্ম দিয়েছিল, যা আরব-জগতে চিন্তার উৎকর্ষের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছিল এবং বহু প্রখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছিল সামনে।

অধ্যায়-১৪
পুনরাবৃত্তি

[সরকার : রাজস্ব : শাসন : সামরিক চাকরি : আবদুল মালিকের মুদ্রা সংস্কার : দামেসক : দরবার : সমাজ : স্ত্রীলোকের স্থান : অবরোধপ্রথার প্রবর্তন : পোশাক : অভ্যাস : সাহিত্য : ধর্মীয় এবং দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহ।]

সরকার

সাধারণতন্ত্রের অধীনে মদীনার সমস্ত অধিবাসীর ভোটে খলিফা নির্বাচিত হতেন; এই নির্বাচন বাইরের আরবগণ কর্তৃক বিনা দ্বিধায় গৃহীত হত। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত জুমা মসজিদে; সেখানে সমবেত হয়ে মুসলমানগণ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করত। মু'আবিয়ার সময় হইতে শাসনরত রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতেন এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সামরিক প্রধানগণ রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মুখে অঙ্গীকারবদ্ধ হতেন এবং প্রদেশসমূহে ভবিষ্যৎ খলিফার পক্ষে শাসনকর্তাগণ কর্তৃক শপথ গ্রহণ করা হত। এই প্রথায় গণতন্ত্র ও স্বেচ্ছাতন্ত্র উভয়ের ত্রুটিসমূহ মিশ্রিত ছিল, কোনোটারই সুবিধা এতে পাওয়া যেত না। একবার শপথ গ্রহণ হয়ে গেলে লোকের মতো বলপ্রয়োগে, তোষামোদ দ্বারা অথবা উৎকোচ প্রদানে, যেভাবেই গ্রহণ করা হোক না কেন নির্বাচনকে ধর্মীয়ভাব প্রদান করেছে বলে মনে করা হত।

আবু বকর, উমর এবং আলীর সময় সাধারণ ধনাগার (বাতুল-মাল-ইল-মুসলিমীন) প্রকৃতই জনসাধারণের সম্পত্তি ছিল এবং ইসলামি সাধারণতন্ত্রের প্রত্যেক লোক রাষ্ট্রের আয় হতে বৃত্তির অধিকারী ছিল। মুআবিয়ার অধীনে স্বেচ্ছাতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পর সাম্রাজ্যের রাজস্ব রাষ্ট্রপ্রধানের পূর্ণ শাসনাধীনে তাঁরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে পরিগণিত হল। এভাবে তিনি তাঁকে খলিফা আলীর বিরুদ্ধে সাহায্য করার প্রতিদানস্বরূপ আমর ইবনুল-আসকে মিসরের সম্পূর্ণ আয় দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুত আমর এর বিন্দুমাত্রও কম নিতে অস্বীকার করেন এবং তিনি 'শিং ধরে থাকবেন আর অন্যে গরু দোহন করবে' এরূপ অবস্থায় থাকতে তীব্র ভাষায় অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

রাজস্ব

সাধারণতন্ত্রের আমলের মতো রাজস্ব একই পথে সংগৃহীত হত। যেমন : ১. ভূমিরাজস্ব (খারাজ), ২. অমুসলিমদের উপর জিজিয়া, ৩. যাকাত, ৪. আমদানি-রফতানি শুল্ক ও আবগারি কর, ৫. সন্ধি অনুসারে গৃহীত কর এবং ৬. গণিমাতের (যুদ্ধের সময় প্রাপ্ত) এক-পঞ্চমাংশ। প্রত্যেক প্রদেশে সংগৃহীত রাজস্ব সেই সেই প্রদেশের কোষাগারে জমা দেয়া হত। বিকেন্দ্রীকরণ সাধারণ নিয়ম ছিল। প্রাদেশিক শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়

প্রাদেশিক কোষাগর হতে নির্বাচিত হত। সৈনিকগণ, বৃত্তিভোগীগণ এবং সরকারি কর্মচারীগণ যার প্রদেশের মধ্যে অবস্থিথ অথবা প্রদেশের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল তাদের প্রাপ্য প্রদেশের রাজস্ব হতেই আদায় করা হত। সাধারণের মঙ্গলজনক সকল কাজ যেমন : রাস্তা নির্মাণ ও খাল খনন এবং সাধারণের দালান-কোঠা, যেমন মসজিদ ও স্কুল প্রভৃতি কোনো বিশেষ প্রদেশের প্রয়োজনে সেখানকার রাজস্ব দ্বারাই নির্মাণ করা হত। রাজস্ব আদায়ের ভার 'আমিল' উপাধিধারী কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকত। আমিলগণ শাসন সংক্রান্ত কাজও নির্বাহ করতেন বলে মনে হয়। ব্রিটিশ-ভারতের কালেক্টরগণের অনুরূপ স্থান তাঁরা দখল করেছিলেন। সময় সময় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ আপন কর্তব্যের সাথে সাহিব-উল-খারাজের পদ একত্র করতেন; দ্বিতীয় উমরের পর সচরাচর এরূপ ঘটত। এ সময় তাঁরা সাধারণ নিয়ম ভেঙে স্বীয় কাতিবের অর্থাৎ কর্মসচিবের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করতেন। এর ফলে সরকারি অর্থ অপহৃত হত এবং তজ্জন্য গুরুতর শাস্তি প্রদান করা হত; অনেক সময় শাস্তিস্বরূপ অপরাধীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যেত।

রাষ্ট্রপ্রধান ও তাঁর সাথে রক্তসম্পর্কযুক্ত রাজপুত্রগণ তাঁদের ব্যক্তিগত অধিকারবলে অনেক ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। দ্বিতীয় ওয়ালীদের সিংহাসনারোহণকাল পর্যন্ত এই ভূসম্পত্তির চাষাবাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হত। আবদুল মালিকের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে যে গৃহবিবাদ সংঘটিত হয়েছিল তার ফলে কালদিয়ায় উমরের নির্মিত সেচব্যবস্থাগুলো অবহেলিত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে দেয়া হয়; বিস্তীর্ণ অঞ্চল এভাবে জলাভূমিতে পরিণত হয়। হিশামের ভাই মাসলামা সাওয়াদের (নিম্ন ফুরাত উপত্যকা) যে প্রধান অংশ জায়গির হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তিনি ঐ অঞ্চলের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে ভূমিগুলোকে পুনরুদ্ধার করেন।

সর্বত্র এক নিয়মে কর বসান হত না, বরং প্রত্যেক প্রদেশে আরোপিত শর্তানুসারে অথবা প্রাথমিক খলিফাগণ কর্তৃক সময়ে সময়ে মঞ্জুরিকৃত সুযোগ-সুবিধা অনুসারে এর তারতম্য ঘটত। মাঝে মাঝে এ সকল নিয়মের ব্যতিক্রমের চেষ্টা করা হলে বিদ্রোহের সৃষ্টি হত।

রাজপ্রতিনিধিশাসিত অঞ্চলগুলো

সাম্রাজ্য পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল। হিজাজ, ইয়ামন এবং মধ্য আরব এক রাজপ্রতিনিধির শাসনাধীন ছিল; উচ্চ এবং নিম্ন মিসর আর একজনের অধীন ছিল। দুই ইরাক, ইরাকে আরব (প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় এবং কালদিয়) এবং ইরাকে আজম (পারস্য ও তৎসহ উমান, আল-বাহরায়ান, কিরমান, সিস্তান, কাবুল, খুরাসান, সম্পূর্ণ ট্রান্সক্সিয়ানা, সিন্দু প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের কিছু অংশ ইরাকের রাজপ্রতিনিধির অধীনে একটি বিরাট প্রদেশ বলে পরিগণিত হত। কুফায় এর রাজধানী ছিল। খুরাসান এবং ট্র্যান্সক্সিয়ানা একজন সহকারী শাসকর্তা দ্বারা শাসিত হত; তিনি সচরাচর মারবে অবস্থান করতেন; আল-বাহরায়ান এবং উমান বসরার সহকারী শাসকর্তার অধীন ছিল; সিন্ধু ও পাঞ্জাব একজন ভিন্ন কর্মচারী কর্তৃক শাসিত হত।

মেসোপটেমিয়া (আরবজের জাজিরা), তৎসহ আর্মিনিয়া, আজারবাইজান এবং এশিয়া মাইনরের কতক অংশ নিয়ে আরেকটি প্রদেশ গঠিত ছিল; কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল ইফ্রিকিয়া; মিসরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ সমস্ত উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চল, তৎসঙ্গে সিসিলি, সার্ডিনিয়া এবং বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কায়রোয়ান এর রাজধানী ছিল। তাঞ্জিরে এবং ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপসমূহে এক একজন সহকারী শাসকর্তা ছিলেন। স্পেন একজন শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হত এবং তাঁর রাজধানী ছিল কর্ডোভা।

রাজনৈতিক ও সামরিক শাসন

প্রত্যেক অঞ্চলেল রাজনৈতিক ও সামরিক শাসন রাজপ্রতিনিধির হস্তে ন্যস্ত ছিল; কিন্তু রাজস্ব-শাসন 'সাহিব-উল-খারাজ' নামক অন্য একজন কর্মচারীর অধীন ছিল। তিনি শাসনকর্তা হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন এবং সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। প্রধান প্রধান নগরীর বিচারকগণ নিজেদের সহকারী নিযুক্ত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হতেন। অমুসলমান সম্প্রদায়সমূহের বিচারকার্য তাদের স্বজাতীয় শাসক অথবা পুরোহিতগণের উপর ছেড়ে দেয়া দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল। জনসাধারনের নামাজে ইমামের দায়িত্ব পালন করা একটি প্রধান কাজ বলে বিবেচিত হত এবং এর ভার শাসনকর্তা অথবা প্রধান কাজীর উপর ন্যস্ত ছিল।

পুলিশ বিভাগের প্রধান (সাহিত-উশ্-শুরতা) শাসনকর্তার অধীন ছিলেন। হিশামের রাজত্বের প্রারম্ভে 'আহ্দাস' নামক এক প্রকার নতুন সেনাদলের সৃষ্টি হয়েছিল; এর বেসামরিক নগররক্ষী দলের কাজ করত এবং পুলিশ ও নিয়মিত সেনাদলের মধ্যবর্তী স্থান দখল করেছিল।

মুআবিয়া কর্তৃক সেরেস্তা-বিভাগ প্রবর্তন

বিশাল সাম্রাজ্যে রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগের সুব্যবস্থার জন্য এবং মেকি অনুশাসন প্রচারের বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য মুআবিয়া একটি সেরেস্তা বিভাগ সৃষ্টি করলেন; এর নাম ছিল সিলমোহর বিভাগ (দিওয়ান-উল-খাতিম)। খলিফা কর্তৃক প্রকাশিত প্রত্যেক অনুজ্ঞার নকল রেজিস্টারি বইতে রেখে মূল আদেশপত্র সিলমোহরাঙ্কিত করে গন্তব্যস্থলে প্রেরণ করা হত। তিনি ডাকবিভাগও স্থাপন করেন; পরবর্তীকালে আব্বাসীয়গণ কর্তৃক এর পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। সে যা হোক, উমাইয়াদের শাসননীতি বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহের শাসননীতি মুআবিয়ার নিকট হতে উদ্ভূত হয় নি, কারণ আবদুর মালিকই ঐ শাসননীতির জনক। রাজকার্য হতে বৈদেশিক প্রভাব দূরীকরণ মানসে তিনি আদেশ করলেন যে শুধু আরবদিগকেই শাসনকার্যে নিযুক্ত করা হোক। ইরাকে তাঁর প্রতিনিধি কুখ্যাত হাজ্জাজ কর্তৃক এই বর্জননীতি চূড়ান্তভাবে প্রতিপালিত হয়েছিল। হাজ্জাজ সরকারি চাকরি হতে শুধু অমুসলমানগণকেই দূরে রাখেন নি বরং অনারব মুসলমানগণকেও বাদ দিয়েছিলেন। এমনকি, অনারব মুসলমানদের উপর অমুসলমানগণ কর্তৃক প্রদত্ত জিজিয়া করও পুনরায়

ধার্য করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই বর্জননীতি কৃতকার্যতা লাভ করে নি; কারণ বেশিদিন যেতে না যেতেই পারস্যবাসীগণ এবং খ্রিস্টানগণ পুনরায় নিম্ন বেসামরিক ও অর্থনৈতিক পদসমূহে বহু সংখ্যায় প্রবেশ লাভ করেছিল। কিন্তু তা দেশব্যাপী এক তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় মারওয়ানের সময় এর বিষময় ফল ফলে।

আবদুল মালিকের মুদ্রা সংস্কার

আবদুল মালিক কর্তৃক প্রবর্তিত আরও দুটি ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে দেশহিতৈষীণী দ্বারা প্রণোদিত এবং দূরদর্শিতা ও রাজনীতিজ্ঞান দ্বারা নির্দেশিত হয়েছিল। তখন পর্যন্ত সারাসিন সাম্রাজ্যে কোনো নিয়মিত ও স্বীকৃত মুদ্রাপ্রথা প্রচলিত ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের নিজস্ব টাকশাল ছিল; এতে স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য মুদ্রা তৈরি হত। মুদ্রার ছাপ ও মূল্য নির্ণয় একেবারেই অনির্ধারিত ছিল এবং সেজন্য জাল মুদ্রা সচরাচর প্রচলিত ছিল। সাধারণ কার্যনির্বাহের জন্য প্রাচীন পারস্য দেশীয় ও রোমক মুদ্রা সচরাচর ব্যবহৃত হত। সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে স্থায়ী ও একবিধ মানের মুদ্রাপ্রথা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। আবদুল মালিক এক রাজকীয় টাকশাল স্থাপন করেন এবং দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা তুলে নিয়ে তৎপরিবর্তে নিজ নামে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় প্রকারের মুদ্রা প্রচার করেন (প্রথম আরব স্বর্ণমুদ্রা যে যথার্থতার সাথে বের করা হয় তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এর ওজন ছিল ৪.২৫ গ্রেন। স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার ওজনের তারতম্য ছিল ১০:৭; রৌপ্যমুদ্রার প্রকৃত ওজন ছিল ২.৯৭ গ্রেন)। তাঁর মুদ্রা সংস্কার রোমান ও সাসানীয় নামের সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। রোমান সলিডি (Solidi) নামক মুদ্রাকে স্বর্ণমুদ্রার এবং মহান উমর কর্তৃক প্রবর্তিত দিরহামকে রৌপ্যমুদ্রার আদর্শ নামক মুদ্রাকে স্বর্ণমুদ্রার এবং মহান উমর কর্তৃক প্রবর্তিত দিরহামকে রৌপমুদ্রার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। মুদ্রা জাল করার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হল।

সরকারি দফতরে আরবি ভাষার প্রবর্তন

আবদুল মালিক প্রবর্তিত দ্বিতীয় সংস্কার সমভাবে প্রসিদ্ধ ও স্থায়িত্বসম্পন্ন হয়েছিল। তাঁর পূর্বে সরকারি হিসাবপত্র ফারসি, গ্রিক অথবা সিরীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হইত; এতে দুর্নীতির সুবিধা হত। আবদুল মালিক এক আদেশ জারি করলেন যে এখন হতে সরকারি হিসাবপত্র আরবি ভাষা ও অক্ষরে লিখিত হবে।

দ্বিতীয় ইয়াজিদের সিংহাসনারোহণের পূর্বে প্রধানত রাজনৈতিক অথবা শাসনসংক্রান্ত যোগ্যতার বিবেচনায় প্রাদেশিক চাকরিতে নিয়োগ করা হত এবং রাজপ্রতিনিধি ও সহকারী শাসনকর্তাগণকে হয় তাঁরা ঐ সব পদের উপযুক্ত বলে না হয় তাঁদের কার্যকলাপ দ্বারা খ্যাতিলাভ করেছিলেন বলে কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান ও তাঁর বংশের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণে মনোনয়ন করা হত। দ্বিতীয় ইয়াজিদের আমলে প্রিয়পাত্রগণের প্রভাবই সরকারি পদে নিযুক্তির পথপ্রদর্শক নীতি বলে পরিগণিত হল। মনোনীত ব্যক্তিদের যোগ্যতার বিচার-বিবেচনা না করে প্রিয়পাত্রগণের প্রভাবের ফলেই

উচ্চপদসমূহ প্রদান করা হত। এমন কি হিশামও এই বাহ্যিক প্রভাব হতে মুক্ত ছিলেন না। এ সময় শাসনকাজে আর একটি দুর্নীতি প্রবেশ করে ভবিষ্যতে অনেক অমঙ্গলের সূচনা করেছিল। এতকাল যাবৎ দূরবর্তী প্রদেশের শাসনকর্তাগণকে তাঁদের শাসিত প্রদেশের মধ্যে ওই সব পদে নিযুক্ত হয়েও সচরাচর রাজধানীতেই বাস করতে থাকেন; এরা কোনো সহকারী অথবা প্রতিনিধির হাতে শাসনভার ছেড়ে দিতেন এবং শেষোক্তদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকত তাঁদের প্রধানকে এবং নিজেকে প্রদেশসমূহের অর্থসম্পদ দ্বারা সম্পদশালী করা।

অন্যদিকে উমাইয়া শাসন কাঠামো প্রাচীন পদ্ধতির ছিল। আব্বাসীয় আমলের মতো পরিবর্ধিত ছিল না। কর্মদক্ষতা বাড়তে পারে কর্তব্যকাজের এমন কোনো— শ্রেণীবিভাগ এতে ছিল না।

শাসনযন্ত্র

শাসনকার্য বস্তুত চারটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত ছিল : ১. দিওয়ান-উল-খারাজ (ভূমিরাজস্ব বিভাগ)); এটা বর্তমান অর্থবিভাগের মতো ছিল; ২. দিওয়ান-উল-খাতিম বা সীলমোহর বিভাগ; এখানে সরকারি অনুজ্ঞাসমূহ তৈরি অনুমোদিত ও সীলমোহরাঙ্কিত হত; ৩. দিওয়ান-উল-রাসায়িল বা পত্রবিনিময় বিভাগ; প্রাদেশিক ব্যাপারসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনকর্তাগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ভার এ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল; ৪. দিওয়ান-উল-মুসতাগীল্লাত বা বিবিধ রাজস্ব সংগ্রহ বিভাগ। এটা ব্যাতীত রাজস্ব বিভাগের অধীনে আরও দুটি দফতর ছিল বলে মনে হয়; এগুলোর উপর পুলিশ ও সেনাদের বেতন দেয়ার ভার ছিল।

সামরিক কার্যক্রম

সাম্রাজ্যের প্রত্যেক আরবের জন্য সামরিক কাজ এক প্রকার বাধ্যতামূলকই ছিল। এদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সেনাদলে প্রবেশ করতে হত। সেনাগণ যুদ্ধকাজে ব্যাপৃত থাকাকালীন অন্য সময় অপেক্ষা বেশি বেতন পেত; তদুপরি যুদ্ধকার্যের উপযুক্ত ব্যক্তি রাষ্ট্র-তহবিল হতে বৃত্তি পাওয়ার অধিকারী ছিল। আব্বাসীয় যুগের আলোচনাকালে সারাসিনদের সামরিক সংস্থা (Military Organisation) সম্বন্ধে পুরোপুরি আলোচনা করব; ওই যুগেই যুদ্ধ ও শান্তি উভয় ধরনের রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল। আমীর-উল-বাহর (নৌসেনাধ্যক্ষ) নামক কর্মচারী নৌবহরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

শহরসমূহের অবস্থা

হেফাজতের জন্য শহরগুলো প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। বিভিন্ন ব্যবসা ও ব্যবসাসমিতি শহরের বিভিন্ন অঞ্চল অথবা রাস্তায় অবস্থিত থাকত এবং এদের নামানুসারে ঐগুলোর নামকরণ হত; কিন্তু শহরের এই আঞ্চলিক বিভাগ শুধু ব্যবসার উপর নির্ভর করে হত না। আরবগণ কেন্দ্রীভূতকরণের বিরোধী বলে সর্বদাই খ্যাত ছিল; এজন্য তারা যেখানেই বাস

করত সেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক পৃথকভাবে দলবদ্ধ হয়ে থাকত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর লোকের নির্দিষ্ট অঞ্চল, বাড়িঘর, মসজিদ, বাজার এবং কবরস্থান ছিল। এভাবে দলবদ্ধ হয়ে বাস করার প্রবৃত্তির ফলে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের সহায়তা করত। এই দলসমূহ যাতে একতাবদ্ধ হতে না পারে সে জন্য প্রত্যেক অঞ্চলকে—যা ছেটখাটো শহরের মতো ছিল—সুদৃঢ় প্রবেশদ্বার দ্বারা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করা হত; ওই দ্বারে এক প্রহরী মোতায়েন থাকত; আগমন ও বহির্গমনের অনুমতি দেয়াই ঐ প্রহরীর কর্তব্য ছিল; বিশেষ করে রাতে অধিক বিলম্বে যারা চলাফেরা করত তাদের জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু গোলযোগের সময় প্রবেশদ্বারগুলো বন্ধ করে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগযোগ ছিন্ন করে দেয়া যেত।

দামেসক

মুসলমানদের বিজয়ের সময় দামেসক একটি সমৃদ্ধ শহর ছিল এবং রোমান শাসনকর্তার রাজধানী ছিল। উমাইয়াগণের আমলে শহরটি পৃথিবীর অন্যতম মনোরম নগরী ও মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিগণিত হয়। তারা একে জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকা, ঝরণা, উয়ারী (তাঁবু) এবং প্রমোদভবন দ্বারা সুসজ্জিত করেছিল। মুআবিয়া কর্তৃক নির্মিত 'সবুজ প্রাসাদ' বা 'আল-কাসরুল খাদরা' দ্বারা নগরীর শোভাবর্ধন আরম্ভ হয়েছিল। সবুজ রং কারুকার্য হতে ঐ প্রাসাদের এই নামকরণ হয়েছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীগণের আমলে নগরীটি অসংখ্য প্রাসাদ ও মসজিদের শ্বেতগম্বুজ এবং মিনার দ্বারা ঝলমল করত। বিশেষ করে প্রথম ওয়ালীদ দামেসক এবং এর চারপাশকে সর্বসাধারণের অট্টালিকা দ্বারা সুসজ্জিত করেছিলেন এবং দামেসকের বড় মসজিদে নিজের জন্য একটি চিরস্থায়ী কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন।

মসুল ১০৬ হিজরি হতে ১১৭ হিজরি

কেবল যে শাসকগণ অট্টালিকা নির্মাণ করতে ভালোবাসতেন তা নয়, তাঁর আত্মীয়বর্গ ও সাম্রাজ্যের অভিজাতমণ্ডলী দামেসক এবং অন্য বড় বড় নগরীকে অলঙ্কৃত করতে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। হুর্র (হুর্রের পিতা ইউসুফ প্রথম মারওয়ানের পিতা হাকামের পৌত্র ছিলেন। তাই তিনি শাসক পরিবারের লোক ছিলেন।) নামক এক ব্যক্তি, যিনি হিশামের অধীনে এগারো বছর পর্যন্ত মসুলের শাসনকর্তা ছিলেন, সেখানে একটি কলেজ, একটি পান্থশালা এবং নিজের অবস্থানের জন্য অপরিসীম সৌন্দর্যশালী এক প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই অট্টালিকাটি বিশুদ্ধ শ্বেতপাথর দিয়ে নির্মিত ছিল এবং দেয়ালগুলো নানাবর্ণের পাথরে খোদাইয়ের কাজ দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। ছাদগুলো বেশ বাঁকা ভারতীয় সেগুন কাঠের নির্মিত কড়িকাঠের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সুন্দরভাবে চিত্রিত ও স্বর্ণমণ্ডিত ছিল। এজন্য একে মানকুশা অর্থাৎ চিত্রিত প্রাসাদ বলা হত। মসুলের অধিবাসীদের উত্তম পানীয় পানির অভাব দেখে তিনি একটি খাল খনন

করেন; বহু শতাব্দী পর আজও প্রবাহিত রয়েছে উক্ত খাল। এর পাশের রাস্তার ধারে বৃক্ষ রোপণ করে দেয়া হয়েছিল। এই রাস্তা নগরবাসী ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য সন্ধ্যার বিশ্রামস্থলে পরিণত হয়।

দামেসকের পানি সরবরাহ

দামেসকের পানি সরবরাহ প্রণালী আজও প্রাচ্যে অতুলনীয় এবং তা উমাইয়া শাসকগণের অমর কীর্তি। বারাদা খাল, যার গ্রিক নাম ক্রিসোরোস, প্রাচীন শহরে অবশ্য প্রচুর পানীয় পানি সরবরাহের বন্দোবস্ত করেছিল কিন্তু পয়ঃপ্রণালীর উন্নতি বিধানের সকল কৃতিত্ব উমাইয়া বংশের শাসকগণেরই প্রাপ্য, যার ফলে আজ পর্যন্ত দরিদ্রতম গৃহটিতেও পানির ফোয়ারা বিদ্যমান রয়েছে। নগরীর মধ্য দিয়ে সাতটি প্রধান খাল প্রবাহিত ছিল। এছাড়াও অসংখ্য পয়ঃপ্রণালী প্রত্যেক গৃহকে প্রধান পানি সরবরাহ কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করেছিল। খলিফার প্রাসাদ স্বর্ণ ও মার্বেল পাথরে জ্বলজ্বল করত; মেঝে ও দেয়ালগুলো মূল্যবান কারুকার্য খচিত ছিল; বেগবান ফোয়ারা জলপ্রপাত অঙ্গনসমূহের চারদিকে মনোরম শীতলতা ছড়িয়ে দিত। উদ্যানগুলো দুষ্প্রাপ্য এবং ছায়াঘন বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল এবং অগনিত পাখির কলতানে উজ্জীবিত হয়ে উঠত। ঘরের ছাদগুলো সোনালি ও শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত অথবা মণিমুক্ত খচিত ছিল। উজ্জ্বলবর্ণের ডোরাকাটা রেশমি পোশাকে সুসজ্জিত ভৃত্যগণ কর্তৃক প্রকোষ্ঠসমূহ পরিপূর্ণ ছিল; দামেসকে ঐ পোশাক অদ্যবধি প্রচলিত আছে। বিশেষ সাক্ষাৎকারের জন্য হিশাম মার্বেল প্রস্তরে আচ্ছাদিত গৃহতলবিশিষ্ট একটি বৃহৎ প্রকৌষ্ঠ ব্যবহার করতেন; এর প্রতি প্রস্তরফলক স্বর্ণবন্ধনী দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল; এ সময় তিনি মিশক ও আম্বারে সুবাসিত এবং লাল রেশমি পোশাকে সজ্জিত হয়ে স্বর্ণখচিত লাল কার্পেটে উপবেশন করতেন। ছয়টি তোরণদ্বারের (স্বর্গের তোরণ বা বাব-উল-ফারাদিস, জাবিয়া তোরণ, পূর্ভ তোরণ, তুমা তোরণ, ক্ষুদ্র তোরণ এবং কায়সান তোরণ) মধ্য দিয়ে নগরে প্রবেশ করতে হত এবং এদের অত্যুচ্চ চূড়াগুলো দূর হতে আগন্তুকের দৃষ্টিপথে পতিত হত। যখন আরবগণ সিরিয়া জয় করেন তখন স্বকীয় স্থাপত্যপদ্ধতিকে রূপদানের সময় তাদের ছিল না, কিন্তু শীঘ্রই তারা এমন এক পদ্ধতির বিকাশ সাধন করলেন যা উত্তম পরিকল্পনা ও পরিপূর্ণ প্রণালীতে পারসিক ও বাইজান্টাইন উভয় পদ্ধতিকে অতিক্রম করল। কোন জাতির স্থাপত্যপদ্ধতি ঐ জাতির লোকগণের প্রাথমিক বাসস্থান ও তাদের আদিম জীবনযাপনের অবস্থা হতেই বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়। সারাসিনীয় স্থাপত্যশিল্পের খিলান, স্তম্ভ, মিনার এবং গম্বুজের কারুশিল্প আবরদের অতি প্রিয় খর্জুরকুঞ্জের তোরণ ও গম্বুজাকৃতির ঘনিষ্ট সাদৃশ্য বহন করে বলে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথমে সিরীয় গৃহগুলো নব-রোমান পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছিল এবং ইরাকের শহরে গৃহগুলোতে পারসিক নমুনা ও রুচির ছাপ সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়।

কালের প্রবাহ অট্টালিকার নির্মাণপদ্ধতিতে অথবা মোটামুটি গৃহের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন সাধন করে নি। ধনবানদিগের গৃহদ্বারে এখনকার মতো

তখনও একজন দারওয়ান (বাওয়াব) অভ্যাগতদিগকে গৃহে প্রবেশ করাত। এর আসন ছিল সচরাচর দ্বারদেশে একটি পাথরের নিচু মঞ্চ অথবা কাঠের বেঞ্চি। দরিদ্র লোকদের গৃহে একটি লোহা অথবা অন্য ধাতুর নির্মিত কড়া দরজার সাথে এঁটে দেয়া হত; এর দ্বারে আঘাত করার জন্য ব্যবহৃত হত। দ্বারপথ একটি আয়তক্ষেত্রের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত চলে গেছে; ঐ প্রাঙ্গণ প্রায়ই স্তম্ভ-বিশোভিত বারান্দা পরিবৃত ছিল। বিচিত্র বর্ণের প্রস্তর, মার্বেল ও নুড়ি দ্বারা সুরুচিসম্মত নকশায় প্রস্তুত শান প্রাঙ্গণের চারদিকে বিস্তৃত ছিল। এর মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র বাগানবেষ্টিত একটি ফোয়ারা ছিল। ঐ বাগান সুগন্ধি পুষ্পপ্রদায়ী গুল্ম দিয়ে পূর্ণ এবং কমলালেবু ও অন্যান্য লেবুজাতীয় বৃক্ষ দ্বারা ছায়াযুক্ত ছিল। প্রাঙ্গনের এক পাশে একটি উঁচু হলঘর (আইওয়ান) ছিল; এর মেঝেও প্রাঙ্গণের মতো মার্বেল অথবা রঙিন পাথরে বাঁধান ছিল এবং গ্রীষ্মের সময় এটা অভ্যর্থনা গৃহরূপে ব্যবহৃত হত। ধনাঢ্যদের অট্টালিকাগুলো মাঝে মাঝে দোতলা হত এবং এতে বিভিন্নরূপে সজ্জিত একাধিক হল থাকত। হলঘরগুলোর ডানে ও বামে ভারী পর্দাবিশিষ্ট দরজা অভ্যর্থনা ও বাসগৃহে চলে গেছে। শীতকালে হলঘর ও কামরাগুলোর মার্বেলপাথরের মেঝে গালিচা দ্বারা জমকালভাবে আচ্ছাদিত থাকত; গ্রীষ্মকালে ঐগুলো মাদুরাবৃত থাকত। চারদিকে দেয়ালের ধার ঘেঁষে দিওয়ান বা লম্বা গদীযুক্ত আসন রাখার পদ্ধতি তখনও প্রচলিত হয় নি, কারণ আব্বাসীয়দের আমলেই আমরা প্রথম এর কথা শুনি। যদি গৃহকর্তা উচ্চপদস্থ লোক হতেন তবে উপর্যুপরি কম্বল স্থাপন করে তাঁর আসন উচ্চ করা হত। দরজার বিপরীত দিকে মার্বেলপাথরের থাম দ্বারা সজ্জিত একটি তাক থাকত, এতে একটা পিকদান ও অজুর পাত্র রাখা হত এবং সম্ভবত বর্তমান সময়ের মতো প্রাচীরগাত্র সংলগ্ন একটি কারুকার্যখচিত দীর্ঘায়ত তাকে নিত্যব্যবহার্য ও বিলাসদ্রব্য রাখা হত। ছাদগুলো আরবীয় কায়দায় লতাপাতা দ্বারা চিত্রিত ও জমকালভাবে স্বর্ণমণ্ডিত ছিল। শীতকালে কামরাগুলোকে মাঝখানে অঙ্গারদানি (মানহাল) রেখে এর সাহায্যে গরম করা হত; আর গ্রীষ্মকালে ফোয়ারাগুলো এবং উন্মুক্ত জানালাগুলো কামরাগুলোকে ঠাণ্ডা রাখত।

রাজদরবার জীবন

রাষ্ট্রপ্রধান শুক্রবারে জুমা নামাজ এবং দৈনন্দিন অন্যান্য নামাজে ইমামতি করবেন আশা করা হত। এই কর্তব্য মু'আবিয়া, আবদুল মালিক এবং দ্বিতীয় উমর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন; কিন্তু অন্যান্যরা প্রায়ই শেষোক্ত নামাজে যোগদান না করে তা এড়িয়ে চলত। যাহোক, জুমআর নামাজে শাসকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল, সেখানে তিনি ধর্মপ্রধান হিসেবে বক্তব্য প্রদান করতেন। এসব অনুষ্ঠানে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে তিনি জামআ মসজিদে প্রায় সব সময়ই সাদা পোশাক এবং চোখা মাথা-বিশিষ্ট এক প্রকার সাদা টুপি পরিধান করে উপস্থিত হতেন, মাঝে মাঝে যা মণি-মুক্ত দ্বারা সুসজ্জিত থাকত। পদটির (খলিফা) একমাত্র পরিচয় চিহ্ন ছিল রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সীল মোহর যুক্ত আংটি এবং ব্যবহৃত লাঠি (আসা)। নামাজের পর তিনি মিম্বরে আরোহণ করতেন এবং সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে ধর্মোপদেশ প্রদান করতেন। এ

বংশের কয়েকজন শাসক যারা লঘুচিত্ত ও অপেক্ষাকৃত চটুল প্রকৃতির রাষ্ট্রপ্রধান ছিল তারা অবশ্য শুক্রবারের নামাজে যোগদানও বিরক্তিকর মনে করতেন। উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় ইয়াজিদ প্রায়ই জুমার নামাজে তাঁর দেহরক্ষীদের প্রধানকে (সাহিব-উশ-শুরতা) তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করতেন; আর দ্বিতীয় ওয়ালিদ তো একবার এমন এক অশ্লীল কৌতুক করে বসেন যা রাজধানীর ধর্মপ্রাণ জনগনকে প্রচন্ড রাগান্বিত করে তুলেছিল। তিনি মসজিদে পাঠিয়েছিলেন তাঁর (ওয়ালিদের) পোশাক পরিহিতা হারেমের এক সুন্দরী মহিলাকে, যার সাথে তিনি বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকতেন এবং তাঁর পরিবর্তে মহিলা সম্পূর্ণ তামাশার ভাব নিয়েই শুক্রবারের নামাজে ইমামতি করতে এসেছিলেন।

এসকল ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম ছাড়াও রাষ্ট্রপ্রধান উচ্চ আপিল আদালতের কাজও সম্পাদন করতেন এবং রাজ্যের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিবেশী রাজা-রাজড়া কর্তৃক প্রেরিত রাষ্ট্রদূতদের সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হতেন। তাদেরকে কখনও সাধারণ (আম) আবার কখনও বিশেষ (খাস) অভ্যর্থনা দেওয়া হত। সাধারণ সাক্ষাৎকারের সময় রাষ্ট্রপ্রধান বিশাল অভ্যর্থনা কক্ষে তাঁর সিংহাসনে আরোহন করতেন, আর তাঁর ডানদিকে রাজকীয় রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত শাহজাদারা সারিবদ্ধ হয়ে বসতেন এবং বামদিকে থাকতেন সভাসদ, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও দরবারের সাধারণ লোক–লস্কররা। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিল্প ও শিল্প-সমিতির প্রধান, কবি, আইনজ্ঞ প্রমুখ সমস্ত লোকজন দরবারে প্রবেশ করতেন এবং সকলেই রাষ্ট্রপ্রধানকে অভিবাদন করার অধিকারী ছিলেন, তাঁরা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। রাজপরিবারের সদস্যবর্গ, রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং বিশেষ প্রিয়ভাজনদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ সাক্ষাৎকারের রীতি শুধুমাত্র উমাইয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এসব অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপ্রধানরা কারুকার্যখচিত পোশাক পরিধান করতেন। দ্বিতীয় ওয়ালিদ যাকে উমাইয়াদের সারদানাপালাস বলা হত তিনি সোনালী বুটিদার টিউনিক (প্রাচীন রোমকদের পরিহিত এক ধরনের জামা) এবং দামাসকীয় পাজামা পরিধান করতেন, অন্যদিকে তাঁর পিতৃব্য সুলায়মান দামাসকীয় পোশাক ছাড়া আর কিছুই পরিধান করত না এবং এই পোশাকেই তাঁর শেষ কৃত্তি সম্পাদন করা হয়েছিল।

উমাইয়া বংশের প্রথম দিকের শাসকরা ইসলামী অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী আরবদের যুদ্ধবিগ্রহ, দুঃসাহসিক অভিযান ও বীরত্বের কীর্তি কাহিনী শুনে তাঁদের অবসরের অধিকাংশ সময় কাটাতেন। তাঁদের আমোদ-প্রমোদকে উজ্জীবিত করার আর একটি মাধ্যম ছিল কবিতা আবৃতি করা। প্রথম ইয়াজিদের শাসনামলে মদ্যপানের রীতি চালু করা হয়। তিনি নিজেও অধিক পরিমানে মদপান করতেন এবং দ্বিতীয় ইয়াজিদ ও দ্বিতীয় ওয়ালিদের মতোই তাঁর বিশেষ সম্মেলনগুলোতে আনন্দ-ভোজের থেকে মদপানের তাণ্ডবই বেশি হত। এর মধ্যেই আবৃত্তি থেকে আরম্ভ হয় গান-বাজনা। সে সময়ের সঙ্গীত শিল্পের কেন্দ্রভূমি মক্কা ও মদিনা থেকে শ্রেষ্ঠ গায়করা দলে দলে দামাসকাসে চলে আসত। তখনো দাবা ও পোলো খেলার প্রচলন হয়নি, কিন্তু স্পষ্টতই পাশা ও তাসখেলা করা হত। প্রথম ওয়ালিদ ও দ্বিতীয় উমর কর্তৃক নিষিদ্ধ হলেও মোরগের লড়াই সে সময়ে ইংল্যান্ডের মতোই জাঁকজমকপূর্ণ বিনোদনের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

ঘোড়দৌড়

ঘরের বাইরের আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের মধ্যে ঘোড়দৌড় ছিল সব ধরনের মানুষের নিকটই প্রিয় খেলা ছিল। বলা হয়ে থাকে অশ্বজাতির উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে হিশামই প্রথম ঘোড়দৌড়ের প্রবর্তন করেন। তাঁর নিজের এবং অন্যান্যের আস্তাবল থেকে চার হাজার ঘোড়া তাঁরই আয়োজিত ঘোড়দৌড়ে ছুটত, মাসউদীর মতে যা ছিল অভূতপূর্ব। এমনকি রাজকুমারীরাও প্রশিক্ষণ নিয়ে অশ্ব চালনা করতেন। দ্বিতীয় ওয়ালিদও সমানভাবে ঘোড়দৌড়ে আসক্ত ছিলেন এবং ঘোড়ার ব্যাপারে তাঁর ও হিশামের মধ্যে চরম প্রতিযোগিতাও লক্ষ করা যায়।

সঙ্গীত

এই রাজ্যে সঙ্গীতের প্রতি আসক্তি প্রায় পাগলামীতে পরিণত হয় এবং বিখ্যাত গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞদের জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হত, যাঁরা দূরবর্তী অঞ্চল থেকে দরবারে আমন্ত্রিত হতেন।

হারেম প্রথা

সঙ্গীত ও নৃত্যের পেশায় যোগদানের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমানে দাস শ্রেণীর লোকের রাজধানীতে আসার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সমাজে অধঃপতন দেখা দেয় এবং এর কারণেই মহিলা সমাজের সম্মানিতদের জন্য ধীরে ধীরে অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হয়। একজন চিন্তাশীল ঐতিহাসিক[১] বর্ণনা করেন, "প্রকৃত 'হারেম' প্রথার সূত্রপাত ঘটে দ্বিতীয় ওয়ালিদের শাসনামলে, যিনি বাইজান্টাইন রীতি নীতির অনুকরণে তাঁর অন্তঃপুরে খোঁজা নিয়োগের চালু করেন। তখন থেকেই প্রাচ্যের রাজদরবারে এই হতভাগ্য মানুষগুলো বিশ্বস্ত ভৃত্য এবং মহিলাদের ইজ্জত রক্ষাকারী হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের অভিনয় করে আসছিল। গ্রিকদের দ্বারা সংঘটিত অঙ্গচ্ছেদের মত জঘন্য প্রথা আরম্ভ করা হয়, পরবর্তী সময়ে যারা লালসার বশবর্তী হয়ে নিজেদেরকে নিয়ে ব্যবসা করতে থাকে।" এরও অনেক পরে হিজরী তৃতীয় শতকে আরব পণ্ডিত ও সুপরিচিত যুক্তিবাদী (মুতাজিলাপন্থী) আল-জাহিদ[২] তীব্র ভাষায় এই প্রথার নিন্দা করেন। কিন্তু মুসলিম পণ্ডিত ও ধর্মনেতাদের তিরস্কার ও নিন্দা করা সত্ত্বেও উমাইয়া রাজ দরবারে এই প্রথা শিকড় গেড়ে বসে।

---

১. ভন ক্রেমার।

২. কিনানা গোত্রের আবু উসমান আমর, সাধারণভাবে যিনি তাঁর পদবী আল-জাহিজ নামেই পরিচিত; ইবনে খাল্লিকান বলেন, "বিদ্যাবত্তা এবং বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার ওপর অসংখ্য গ্রন্থ প্রনয়ণের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।" ২৫৫ হিজরীত (৮৬৮-৮৬৯) তাঁর মৃত্যু হয়।

বৈদেশিক রীতির আমদানি

উমাইয়া বংশের রাজপ্রধানরা যেমন বাইজান্টাইন দরবার থেকে খোঁজা নিয়োগের মত নিকৃষ্ট প্রথা আমদানি করেছিলেন, বিশেষভাবে তাঁদের অন্দরমহলে কাজ করার জন্য, তেমনি প্রাচীন পারস্য রাজপ্রধানদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন আচার-আচরণ এবং আদব-কায়দাও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। রাষ্ট্রপ্রধানদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে গিয়ে একদিকে মদ্যপান যেমন পুরুষের মধ্যে সর্বজনীন হয়ে ওঠে, পক্ষান্তরে অদ্যবধি দামাসকাস ও বেইরুটের বাজারে বিক্রীত 'গোলাপ-চিনির সরবত' নামে এক ধরনের পানি, যা গোলাপ, চিনি ও জল দ্বারা দ্রবীভূত এবং গ্রীষ্মকালে বরফ দিয়ে শীতল করা হত, তা গ্রহণে মহিলারাও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। রাজপরিবারের মহিলারা বিশেষভাবে এই পানির প্রতি আসক্ত ছিলেন বলে ধারণা করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে বাগদাদের ধনাগারে বিপুল সংখ্যক স্ফটিক ও স্বর্ণ নির্মিত পানপাত্রের সন্ধান মেলে, হিশামের স্ত্রী উম্মে হালিম এসকল পাত্রে সরবত পান করত। উমাইয়া বংশের দ্বিতীয় খলিফা প্রথম ইয়াজিদ প্রায় প্রতিদিনই প্রাচীন পারস্য রাজাদের মত মদপানে প্রমত্ত হতেন এবং কদাচিৎ প্রকৃতিস্থ থাকতেন। বলা হয়ে থাকে আবদুল মালিক মাসে অন্তত একবার অবাধে মদপান করতেন, কিন্তু রোমক সম্রাটদের ব্যবহৃত এক প্রকার প্রতিষেধক ব্যবহার করার মাধ্যমে তিনি রাতের মাতাল ভাব মুছে ফেলে পরদিন ভোরেই সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতেন।

প্রথম ওয়ালিদ একদিন পরপর মদপান করলেও তাঁর ভাই দ্বিতীয় ইয়াজিদ এবং ভাতিজা দ্বিতীয় ওয়ালিদ প্রায় নিয়মিত এবং অবিরতভাবে মদপানপান করতেন।

উমাইয়া বংশের রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে মাত্র তিনজন মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন না–ধর্মপরায়ণ দ্বিতীয় উমর, হিশাম এবং তৃতীয় ইয়াজিদ। রাজপ্রাসাদসহ ধনীদের অট্টালিকায় মদ্যপানের আরসগুলো গান-বাজনায় প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠত। এসব অনুষ্ঠানে হলঘরের মধ্যস্থলে ঝুলত একটি পাতলা পর্দা, যার দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধানের মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বিকতাকে সমবেত সভাসদ, গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞদের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখার ভান করা হত।

নারী সমাজ

আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, আদিকাল থেকে পারসীদের মধ্যে নারীদের জন্য যে পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল[১] তাই দ্বিতীয় ওয়ালিদের রাজত্বকালে মুসলমান সমাজে প্রবর্তিত হয়। সিরিয়ার অনুকূল ভূমিতে গর্ব ও অনুকরণ বশে যে প্রথা পুনরাবৃত্ত হয়েছিল, এই রাষ্ট্রপ্রধানের চরিত্র ও আচার-ব্যবহার তার উদ্ভব ও বিকাশে সহায়ক হয়। সামাজিক রীতিনীতির প্রতি তাঁর চরম উপেক্ষা এবং পরিবারসমূহের পারিবারিক গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ব্যাপারে তাঁর দুঃসাহস ও নির্বিকারচিত্ততা বাইরে অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ আরোপ করতে বাধ্য করে, একবার প্রবর্তনের পর যা প্রথা হিসেবে স্বীকৃত

---

১. তুলনীয় ঃ দ্য স্টোরি অব ইসথার, পদসংখ্যা ৯ ও ১২।

হয়ে ওঠে। অমার্জিত মননের অধিকারীদের কাছে অনুভূতির মহত্ত্ব ও হৃদয়ের পবিত্রতার চেয়ে প্রাচীর ও প্রহরীই অধিক কার্যকরী রক্ষাব্যবস্থা বলে প্রতীয়মান হয়।

এসব প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও আব্বাসী বংশের দশম খলিফা মুতাওয়াক্কিলের সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত মহিলারা অসাধারণ স্বাধীনতা ভোগ করতে থাকেন। পুরুষদের মধ্যে প্রাচীন শৌর্য তখনো জাগ্রত ছিল; বাইজানটাইন স্বেচ্ছাচার ও পারস্য বিলাসিতা তখনো নষ্ট করতে পারেনি মরুভূমির সাল্য ও স্বাধীনতা। পিতারা তাঁদের গুণান্বিতা ও সুন্দরী মেয়েদের নামে নিজেদের উপনাম রাখতে তখনো গর্ববোধ করতেন[১] এবং ভাই ও প্রেমিকরা যুদ্ধে ছুটত তাদের বোন ও প্রেমিকাদের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে। উচ্চবংশজাত আরব কুমারী তখনো নির্দ্বিধায় এবং অন্যায় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা অবস্থায় পুরুষদের সাথে কথোপকথন চালাতে পারত। ফেরদৌসী[২] লিখিত সুন্দর লাইনগুলো তখনো তার প্রতি প্রযোজ্য ছিল–

ঠোঁটে টুম্বুর মধুর হাসি, আননে নম্রতা,
পুতময় তার চাল ও চলন, বলনে তেজস্বিতা।[৩]

অসংকোচে সে তার অতিথিদের আপ্যায়ণ করত এবং যেহেতু সে নিজের মূল্য বুঝত, সেহেতু তাকে মর্যাদা দিত চারপাশের সবাই। একজন সুপরিচিত লেখক[৪] বর্ণনা করেন যে; একদা মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি মদিনার অনতিদূরে একটি জলসত্রে থামেন। সূর্যের খরতাপের জন্য তিনি বাধ্য হন নিকটবর্তী একটি গৃহে আশ্রয়প্রার্থী হতে, যেটিকে দূর থেকে বেশ ভাল বলেই মনে হয়। তিনি অঙ্গনে প্রবেশ করেন এবং অন্তবর্তীদের কাছে জানতে চান তিনি উট থেকে নামবেন কিনা। একটি নারী কণ্ঠ তাঁকে অনুমতি দেয়।[৫] অতঃপর তিনি গৃহে প্রবেশের অনুমতি চান এবং অনুমতি পেয়ে প্রবেশ করেন হলঘরে, যেখানে তিনি কোন গৃহকাজে নিযুক্ত 'সূর্যের চেয়ে সুন্দর এক কুমারী'কে দেখতে পান। তাঁকে তিনি বসতে বলেন এবং কথাবার্তা বলেন দুজনে– 'কথাগুলো মুক্তার মত তাঁর ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ছিল।' তাঁরা যখন কথাবার্তা বলছিলেন তখন তাঁর (কুমারীর) মাতামহী প্রবেশ করেন এবং তাঁদের পাশে বসে সহাস্যে আগন্তুককে সাবধান করে দেন সুন্দরী বালিকার কুহক থেকে।

---

১. যেমন আবু সুফরা, আবু লায়লা ইত্যাদি।
২ পারস্যের হোমার।
৩ দো লাভ পুর জে খান্দাহ, দোরুখ পুর জে শরম, বা-রাফতার নিকো, বা-গাফতার গরম।
৪. আবু তাইয়েব মহম্মদ আল-মুফাজ্জাল ৩০৮ হিজরীতে (৯২০ খ্রিঃ) তাঁর মৃত্যু হয়; আল-খায়ারিতী তাঁর 'ইতিলাল-উল-কুলুব' গ্রন্থে এর কথা উল্লেখ করেছেন। এই কাহিনীতে প্রথম যুগের আব্বাসী আমলের আচার-ব্যবহার ও প্রথা সমানভাবে প্রতিপন্ন হয়। ইবনে খাল্লিকানও দেখুন– 'জুর-রুম্মা' শিরোনামে।
৫. মূলে আছে, 'গৃহকর্ত্রী' (রাব্বাতুল বায়েত) আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'নামুন।'

খার্কা

লেখকের পিতা কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি ঘটনা সে যুগের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির ওপর আরো কিছু আলোকপাত করে। তিনি মক্কায় যাওয়ার পথে অবস্থান করেছিলেন এক বন্ধুর বাড়িতে, যিনি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন উমাইয়া যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি, যে বিখ্যাত মহিলা সম্পর্কে তিনি প্রশংসা কীর্তন করেছিলেন সেই খার্কার সাথে তিনি পরিচিত হতে ইচ্ছুক কিনা। তিনি সুন্দরীর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাঁসে সংবর্ধনা জানান দীর্ঘকায়া এবং অতীব সুন্দরী 'পূর্ণবয়স্ক' এক মহিলা। তিনি তাঁকে সালাম করেন এবং অনুমতি দেন উপবেশনের। 'আমরা কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললাম' বর্ণনাকারী বলে যা, 'তিনি আমাকে সহাস্যে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কি কখনো হজ্জ করেছেন?' আমি বললাম, 'একাধিকবার।' মহিলা বললেন, 'তাহলে আমাকে দেখতে আপনি কিসে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন? আপনি কি জানেন না হজ্জের সময় আমি অন্যতম দর্শনীয় বস্তু?' আমি বললাম, 'এবং তা কিভাবে হল?' তিনি বললেন, 'আপনার পিতৃব্য জুরু-রুম্মা কি বলেছেন তা আপনি কখনো শোনেননি ঃ হজ্জ সমাপণ করতে হলে কাফেলাকে খার্কার কাছে (বাসস্থানে) থামা উচিত, যখন তিনি থাকেন অবগুণ্ঠনমুক্ত অবস্থায়?"

সাইয়েদা সুকায়না

হাকাম বংশীয়দের প্রাথমিক শাসনকালে কারবালার শহীদ ইমাম, হুসাইন (রাঃ)-এর কন্যা আস-সাইয়েদা'[১] সুকায়ানা[২] বা সাকিনা, যিনি "তাঁর সময়ের মহিলাদের মধ্যে বংশ-মর্যাদা, সৌন্দর্য, বিচারবুদ্ধি ও পবিত্রতায় সর্বশ্রেষ্ঠ" বলে বিবেচিত হতেন, তিনি উন্নতি লাভ করেছিলেন। তাঁর বাসস্থান ছিল কবি, ফকিহ (আইনজ্ঞ) এবং সর্বশ্রেণীর বিদ্বান ও ধার্মিক লোকের আশ্রয়স্থল। তাঁর গৃহের সম্মেলনগুলো ছিল অত্যুৎকৃষ্ট ও প্রাণচঞ্চল এবং তাঁর বুদ্ধিদীপ্তি প্রত্যুত্তরে সেগুলো সবসময় উজ্জীবিত থাকত।

প্রথম ওয়ালিদের পত্নী এবং দ্বিতীয় উমরের ভগ্নী উম্মুল বানীন সেকালের আরেকজন বিশিষ্ট মহিলা। স্বামীর ওপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং তা সবসময়ই প্রযুক্ত হতো জনসাধারণের মঙ্গল সাধনে। একবার হজ্জাজের প্রতি তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। একবার তিনি ওয়ালিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন এবং

---

১. "সাইয়েদা" (সম্ভ্রান্ত মহিলা) হল "সাইয়েদ" (সর্দার) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ এবং হযরত আলি (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ)-এর বংশধরদের এই উপাধি দেয়া হয়।

২ তাঁর প্রকৃত নাম বলা হয় উমায়মা, সুকায়না তাঁর মাতা প্রদত্ত উপনাম। সুকায়না হিশামের রাজত্বকালে ১১৭ হিজরীর রবিউল আওয়াল (এপ্রিল ৭৩৫ খ্রিঃ) মাসে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। সদ্যযুবতী বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর প্রথম স্বামী মুস'আব বিন জুবাইরের মৃত্যু (পূর্বে দ্রষ্টব্য) ঘটায় তিনি বিধবা হলে আবদুল্লাহ হিজামী নামে একজনের সাথে তাঁর বিয়ে হয়, যাঁর ঔরসে কুরায়ন নামে তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অল্পকাল পরে আবদুল্লাহ হিজামীরও মৃত্যু হয়। এর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় উমরের এক ভাই তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে প্রথম ওয়ালিদ সে বিয়ে নিষিদ্ধ করে দেন। অতঃপর তিনি খলিফা উসমান (রাঃ)-এর এক পৌত্রকে বিবাহ করলে উমাইয়া বংশীয় সুলমানের আদেশে এই বিয়েও বিচ্ছেদ করে দেয়া হয়।

ধৃষ্টতাপূর্বক উপদেশ দিয়েছিলেন মহিষীর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে। যখন উম্মুল-বানীন তা শোনে, তিনি ওয়ালিদকে বলেন, হজ্জাজকে তাঁর খেদমতে পাঠিয়ে দিতে। হজ্জাজ মহিষীর কক্ষে প্রবেশ করেন। তাঁকে গ্রহণ করা হয় ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞার সাথে এবং দীর্ঘসময় অপেক্ষামন রেখে। অতঃপর পরিচারিকাবৃন্দসহ উন্মুল-বানীন অভ্যর্থনাগৃহে প্রবেশ করেন। তাঁর অভিবাদন গ্রহণ করা হয় গাম্ভীর্যের সাথে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মহিষীর হস্তক্ষেপ অনুমোদন না করতে রাষ্ট্রীয় প্রধানকে তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়। সত্যের আলাপমূলক প্রত্যুত্তরে প্রদত্ত হয় এক স্মরণীয় বক্তৃতা। রাজমহিষী একের পর এক তাঁর অপকর্মের উল্লেখ করেন এবং তিনি কিভাবে তাঁর প্রভুদেরকে নিষ্ঠুর কাজে প্ররোচিত করে শ্রেষ্ঠ ধর্মবিশ্বাসীদের বলি দেন এবং কিভাবে তিনি নিজেকে উমাইয়া বংশের কুমন্ত্রণাদাতা বলে প্রমাণিত করেছেন সবই খুলে বলেন তাঁর সম্মুখে। অতঃপর তাঁর কাপুরুষতার জন্য ভর্ৎসনা করে অনুচরদেরকে তাঁকে বলপূর্বক বের করে দেওয়ার আদেশ দেন।

কবিতা ও আবৃত্তি ছিল আরব মহিলাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং তাঁদের বেশ কয়েকজন অতীব প্রতিভামণ্ডিত রচনাবলী রেখে গেছেন।

তাপসী রাবেয়া

সেই নতুন যুগে প্রসিদ্ধ তাপসী রাবেয়া[১] জীবিত ছিলেন। সেকালের ধার্মিকলোকদের মধ্যে তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

পোশাক-পরিচ্ছদ

প্রাচীনকাল থেকে পুরুষের পোশাক বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি, কিন্তু এখন লক্ষণীয়ভাবে আঁটোসাঁটো 'কাবা'র প্রচলন শুরু হয়। পরিধানকারীর সামর্থ্য অনুযায়ীই শুধু পোশাকের প্রকার ও সংখ্যার তারতম্য ঘটত না, বরং পেশা অনুযায়ীও তার আকৃতি ও প্রকৃতিতে পার্থক্য ঘটত। 'ফকিহ' (আইনজ্ঞ বা বিচারক) বা 'কাতিবে'র (করণিক) পোশাকের সাথে সৈনিকের পোশাকের ছিল বিরাট পার্থক্য। বিভিন্ন কাজের জন্য পোশাকও বিভিন্ন ছিল; অশ্বারোহণের জন্য পরা হত আঁটোসাঁটো ও খাটো ধরনের পুরু কোর্তা এবং আঁটোসাঁটো পাজামা, পক্ষান্তরে বাড়িতে এরা হত ঢিলেঢালা লম্বা পোশাক।

দামাসকাস যখন ঐশ্বর্যশালী ও বিলাসপরায়ণ রাজদরবারের রাজধানী, গুরুত্বপূর্ণ ফৌজি ঘাঁটি এবং বিশাল সাম্রাজ্যের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল তখন তার জমকালো ও সতেজ রূপ সহজেই অনুমান করা যায়। মূল্যবান সঞ্চয় ভূষিত অভিজাতবর্গ কারুকার্যময় আচ্ছাদনে সুশোভিত অশ্বে আরোহণ করে এবং অনুচর পরিবেষ্টিত হয়ে দ্রুত চলেছেন প্রাসাদের দিকে; বেদুইন প্রধানরা তাদের চিত্রায়িত পোশাক পরে সগর্বে অশ্বারোহণে রাস্তায় গমন করছেন; সূর্যের খরতাপে দগ্ধ মরুভূমির আরবরা লাল ও হলুদে ডোরকাটা

---

১. "উম্মুল খাইর" বা "সৎকর্মের জননী" উপাধিপ্রাপ্ত, ১৩৫ হিজরীতে (৭৫২-৭৫৩ খ্রিঃ) পরলোকগতা এবং জেরুজালেমের পূর্বদিকে তির পর্বতে সমাহিতা। তাঁর সমাধি এখন তীর্থস্থান।

'কুফিয়া'র (মস্তকাবরণ) সাথে উটের পশম নির্মিত পিঙ্গল ও শ্বেতবর্ণের ঢিলা কোর্তা পরিধান করে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে (নগরীর) কোলাহল ও ব্যস্ততার দিকে; দলবদ্ধভাবে সিরিয়ার লোকজন তাদের বেগুনী রঙের লম্বা আলখাল্লা, ঢিলা পাজামা, লাল-ঠুঁটো জুতো এবং বিরাট সাদা বা নীল রঙা পাগড়ী পরে দেশীয় মাল বোঝাই গাধা, খচ্চর ও উটগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব ও সম্ভ্রান্ত আকৃতির জন্য ঈর্ষণীয় হাশিমীরা লম্বা পোশাক পরে ধীর পদক্ষেপে পথ চলছে; মহিলারা ঘোমটা করছেন তাদের পরিচারিকবেষ্টিত হয়ে– এসব নিশ্চয়ই খুব চিত্তকার্ষক ও প্রাণবন্ত দৃশ্যের অবতারণা করত।

খাওয়ার পদ্ধতি

এ সময় আমরা চামচ ও তোয়ালের উল্লেখ করতে পারি। তোয়ালেটি গলায় জড়ানো থাকত কিংবা 'খাফতানে'র সাথে থাকত ভাঁজ করা, যে রীতি ইউরোপ মহাদেশের অনেক অংশে এখনো দেখা যায়। পেয়ালা থেকে সরবত পানের জন্য লম্বা হাতল যুক্ত চামচগুলো ছিল কাঠের তৈরি, নতুবা চীনামাটির এবং তা চীন থেকেই আমদানি করা হত। অবস্থাপন্নদের দিন শুরু হত সাধারণত এক পেয়ালা মধুমিশ্রিত দুধ বা চিনি ও দুধ দিয়ে। সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর ভেতরের কামরায় প্রাতরাশ পরিবেশন করা হত, যেখানে উপস্থিত থাকত পরিবারের সবাই; প্রাতরাশের পর গৃহস্বামী আপন কাজে মন দিতেন। দুপুরই ছিল মধ্যাহ্ন ভোজের সাধারণ সময়, যা অভ্যর্থনা কক্ষে পরিবেশন করা হত। এ আহারে অতিথিরাও উপস্থিত থাকতেন সবসময়। আসরের নামাজের[১] পর পরিবেশিত হত নৈশভোজ এবং তা সবাই মিলে আহার করতো। সবাই চেয়ার বসতেন; এক পায়ার ওপর স্থাপিত একটি টেবিল ঢেকে দেয়া হত সাদা কাপড় দিয়ে। প্রথমে মধুমিশ্রিত দুধের পেয়ালা এবং অন্যান্য পানীয় পরিবেশিত হত, তারপর সুপক্ক মাংসের থালা। নৈশভোজের পর আপ্যায়ণকারী ও অতিথিবৃন্দ এশার[২] নামাজ পড়তেন, তারপর সমবেত হতেন আরেকটি কামরায় এবং আলাপচারিতায় সন্ধ্যা যাপন করতেন।

আরব সমাজের ওপর বাইজানটাইন ও পারসী প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে নারী-পুরুষের মেলামেশা ক্রমশই বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে।

দাসপ্রথা

ইসলামে দাস কথাটি ওই পরিচয়বাহী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অল্পই প্রযোজ্য, কারণ মুসলমান সমাজের দাসত্ব প্রথা অন্য জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রথাটির সাদৃশ্য বহন করে না। আরব পয়গম্বর মানুষকে অস্থাবর সম্পত্তির মত ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করেছেন; তিনি আদেশ করেছেন যে পিতামাতাকে তাদের সন্তান থেকে বা এক আত্মীয়কে আরেকজনের কাছ থেকে পৃথক করা চলবে না; তিনি নির্দেশ দিয়েছেন প্রভু ও প্রভুপত্নীদের মত 'দাসদের'

---

১. বিকেল চারটে থেকে সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী যে কোন সময় আসরের নামাজ পড়া যায়।

২. সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাতের মধ্যবর্তী যে কোন সময় এশার নামাজ পড়া যায়।

অন্ন ও বস্ত্র দিতে হবে এবং কখনই তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা চলবে না। তারা মুক্তিপণ বা শ্রমের বিনিময়ে নিজেদের দাসত্ব মোচন করতে পারবেন। 'দাসদের' মুক্তি দেয়া সর্বোচ্চ পুণ্য বলে ঘোষিত হল। প্রকৃতপক্ষেই 'দাসরা' ছিল পরিবারের লোক। অন্য আইন ব্যবস্থার চেয়ে তাদের উন্নততর অবস্থা থাকলেও বিপুল সংখ্যায় তাদের উপস্থিতি আরব সমাজের ওপর অনিষ্টকর প্রভাব ফেলেছিল; এতে আদর্শের মান নিচু হয় এবং নৈতিক বন্ধন হয় শিথিল। এ সময় আরেকটি অনিষ্টকর ফল ঘটতে দেখা যায়। প্রবাসে বসবাসকারী আরবরা প্রায় শাসক শ্রেণীর মেয়েদেরকে বিয়ে করত, যাতে ইতিহাসে প্রায়শই পরিলক্ষিত ফলেরই সৃষ্টি হয়। এসব লোকরা যদি গথ, ফ্রাঙ্ক, পারসী, এমনাক গ্রিকদের মত উন্নততর জাতির মধ্যে বসতি গড়ে তুলতো তাহলে তাদের উত্তরাধিকারীরাও ২৩ উন্নত; আর যদি তারা ইথিওপীয়দের মত নিকৃষ্ট জাতির সঙ্গে বিবাহ করতো তাহলে তাদের বংশধররাও হত মন্দ প্রকৃতির।

সাহিত্য

সঙ্গীত, শিল্পকলা বা কবিতার মত সাহিত্য উমাইয়াদের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। দ্বিতীয় উমরের আমলে আইনজ্ঞরা সম্মান ও সমাদর পেয়েছিলেন এবং সাধারণভাবে বিদ্বান লোকরাও লাভ করেছিলেন পৃষ্ঠপোষকতা। কিন্তু উমাইয়াদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হয়নি; তাঁদের সমগ্র শাসনকালে কেবল একজন বিদ্বানের আবির্ভাব ঘটেছিল, তিনি হলেন প্রথম ইয়াজিদের পুত্র খালিদ, যিনি বিজ্ঞান ও সাহিত্যে জ্ঞানার্জনের জন্য সুনাম অর্জন করেছিলেন।[১] ব্যাবসা-বাণিজ্য ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সন্দেহভাজন পরিবারের লোকজন এবং আরব গোত্রগুলোর আশ্রিত ব্যক্তিরাই।

ধর্মীয় ও দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহ

আব্বাসী আমলের মত এমন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেনি; রাষ্ট্র থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত আইনজ্ঞ লোকেরা তখনো এত সীমাহীনভাবে ধর্মীয় নেতৃত্বে অভিষিক্ত হয়ে নিজেদের স্বার্থে নিরঙ্কুশ আধিপত্যের জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেননি। তখনো বিভেদ ছিল মুখ্যত আধা-রাজনৈতিক বা বংশগত। ইমামত বা ইসলামের ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রশ্নই প্রত্যেক গোষ্ঠীর মত-পার্থক্যের প্রধান বিষয় ছিল। বিশ্বাস না করলেও উমাইয়া বংশীয় লোকেরা দাবি করত যে তারাই এর অধিকারী; মুহম্মদ (সঃ)-এর বংশধরদের অনুগামীরা তা নবী বংশেরই অধিকার বলে মত পোষণ করত; আব্বাসীয়রা তা দাবি করত তাদের বংশের জন্য; অন্যদিকে খারিজীরা ইমাম নির্বাচনের অধিকার জাতি, গোত্র বা পরিবার নির্বিশেষে সব মানুষের বলে ঘোঁ ধরেছিল। উমাইয়াদের মধ্যে একটি মৌলিক নীতি ছিল, যেমন হযরত আলি (রা.) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ, বাকিরা প্রত্যেকেই নিজেদের প্রথা অনুযায়ী আচরণবিধি অনুসরণ করত। যারা হযরত আলি (রা.) ও তাঁর

---

১. চিকিৎসা বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে সুদক্ষ খালিদ এসব বিষয়ে বই লিখে গেছেন। ৮৫ হিজরীতে (৭০৪ খ্রিঃ) তাঁর মৃত্যু হয়।

বংশধরদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ, বাকিরা প্রত্যেকেই নিজেদের প্রথা অনুযায়ী আচরণবিধি অনুসরণ করত। যারা হযরত আলি (রা.)-এর পরিবারের শত্রু, তারা অভিহিত হতেন 'নাওয়াসিব' ('নাসাবী'র বহুবচন, অর্থাৎ বিদ্রোহী) বলে, অন্যদিকে তাঁদের পক্ষভুক্তরা 'আশশিয়াতুলি-আহলিল বায়েত' অর্থাৎ 'পরিবারের অনুগামী লোক' বলে আখ্যায়িত হতেন। কেবল ফাতিমীদের মধ্যেই দেখা যায় ধর্মীয় ভাবধরা একটি দার্শনিক প্রবণতা পরিগ্রহ করেছিল। বিদ্যার সাধারণ প্রসার মুক্ত করেছিল অনুসন্ধিৎসার স্পৃহা। দার্শনিক আলোচনা প্রত্যেক জনাকীর্ণ কেন্দ্রে সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল এবং তার নেতৃত্ব দেয়া হত খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর নাতী 'সাদিক' উপাধেয় ইমাম জাফর (রা.) কর্তৃক মদিনায় বিকাশপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মাধ্যমে। অনুসন্ধিৎসু মনের মানুষ এবং প্রগাঢ় চিন্তাশীল, সেকালের অধিকাংশ জ্ঞানে সুপণ্ডিত তিনিই প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দার্শনিক মতবাদগুলোর প্রতিষ্ঠাতা। যেসব ব্যক্তি পরবর্তীকালে আইন সংক্রান্ত মতবাদগুলো গড়ে তুলেছিলেন কেবল তাঁরাই তাঁর অভিভাষণ শুনতে আসতেন না, বরং অনেক দূরের দেশ থেকেও আসতেন দার্শনিক ও ছাত্ররা। ইমাম হাসান আল-বসরী, যিনি তাঁর আবাস-নগরে (বসরা) একটি দার্শনিক সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন,[১] তিনিও ছিলেন তাঁর অন্যতম শিষ্য।[২] গুরুত্বপূর্ণ মু'তাজিলা মতবাদের প্রবর্তক ওয়াসিল বিন আতা[৩] একই উৎসমূল থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ফাতিমী ইমামের মত ওয়াসিলও শিক্ষা দিতেন মানবীয় ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতার বিষয়ে।[৪]

তৃতীয় ইয়াজিদ এবং দ্বিতীয় মারওয়ান উভয়েই ছিলেন মু'তাজিলা পন্থী, সেই সঙ্গে তৃতীয় ইয়াজিদের ভাই ইব্রাহিমও। দামাসকাসে মা'বাদ আল-জুহনী, জিলান দিমাশকী এবং ইউনাস আল-আসওয়ারী এই তিনজন ওয়াসিলের মানুষের নিরঙ্কুশ স্বাধীন প্রবৃত্তির দাবির চেয়ে আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন, অন্যদিকে জাহম বিন সাফওয়ান সমর্থন করতেন নিয়তিবাদকে।

---

১. যেমন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক।

২. হাসান ১১০ হিজরীর রজব মাসে (অক্টোবর ৭২৮ খ্রি.) পরলোক গমন করেন।

৩. ওয়াসিল বিন আতা ৮০ হিজরীতে (৬৯৯-৭০০ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১ হিজরীতে (৭৪৮-৭৪৯ খ্রি.) মারা যান।

৪. মামুনের রাজত্বকাল সম্পর্কে আলোচনাকালে আমি এই মতবাদের বিস্তারিত বিবরণ দেব।

অধ্যায়-১৫
আব্বাসীয় বংশ
[১৩২-১৫৮ হিজরি; ৭৪৯-৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ]
সাফফাহ ও মনসুর

সাফফাহর শাসনকাল : মৃত্যু : মনসুরের সিংহাসন আরোহণ : চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : আব্দুল্লাহ বিন আলির বিদ্রোহ : আবু মুসলিমের মৃত্যু : বাগদাদ স্থাপন : মহম্মদ ও ইব্রাহিম আল-হাসানির আত্মপ্রকাশ : তাঁদের পরাজয় ও মৃত্যু : স্পেন আক্রমণ ও ব্যর্থতা : খাজারদের অতর্কিত আক্রমণ : বাইজান্টাইন আক্রমণ : মনসুরের মৃত্যু

আব্বাসিদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার ভাগ্যও বদলে যায়। সিরিয়া থেকে ইরাকে শাসনকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়; এ যাবৎকাল সিরিয়রা যে প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল তা হারাতে হল এবং প্রগতির স্রোত পশ্চিম থেকে পূর্বগামী হল। কিন্তু চিরতরে খেলাফতের ঐক্য বিনষ্ট হল। স্পেন প্রথম থেকেই আব্বাসিদের বশ্যতা স্বীকার করল না এবং সহজেই পলাতক আবদুর রহমানের কাছে অবনমিত হল, যিনি জাঁকজমকের দিক দিয়ে আব্বাসি পরিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী এক রাজবংশের সূচনা করেন। প্রথম যুগের আব্বাসিরা পশ্চিম আফ্রিকার ওপর প্রবলভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তা নামমাত্র আনুগত্য স্বীকার করে ক্ষান্ত হয়। যেহেতু আব্বাসি খলিফাদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে, সম্পদকে কাজে লাগাতে এবং প্রজাদের বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতি সাধন করতে তা সহায়ক হয়েছিল, তথাপিও সাম্রাজ্যের সংকোচন ঠেকাতে পারেনি । একজন বাদে এ বংশের প্রথম নয় জন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ এবং উচ্চপর্যায়ের রাজনীতি ব্যক্তিত্ব—যারা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য আত্মনিবেদিত। তাঁদের সবাই সামরিক গুণাবলীর সাথে উচ্চপর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয় সাধন করেছিলেন, যদিও কারো কারো রাজত্বকাল নিষ্ঠুর কার্যকলাপে কলঙ্কিত হয়েছিল—তবু তা ছিল পরিচিত বিশ্ব জুড়ে সে যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং বংশগত নীতির পরিণাম। একজন প্রখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক বলেন, 'প্রথম যুগের আব্বাসিদের রাজত্বকাল ছিল প্রাচ্যের আরবদের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। রাজ্যবিস্তারের যুগ অতিক্রান্ত হয়ে শুরু হয় সভ্যতার যুগ।'

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ, আস সাফফাহ
[১২ রবিউল আওয়াল ১৩২-১৩৬ হি.; ২০ অক্টোবর ৭৪৯-৭৫৪ খ্রি.]

আমি আগেই উল্লেখ করেছি, আবুল আব্বাস কিভাবে খলিফা হলেন এবং কিভাবে শত্রু ও সন্দেহভাজনদের বেপরোয়াভাবে হত্যা করে 'সাফফাহ' উপাধি লাভ করেন। সে যুগে

প্রাচ্য বা প্রতীচ্য সব জায়গায় মানুষের জীবনের মূল্য ছিল অতি নগণ্য[১] এবং মানুষের সহজাত পাশবিক প্রবৃত্তি দমনে ধর্মের নিয়ন্ত্রণ অল্পই ছিল। তবু সমূহ নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও সাফফাহ বিবেচিত হতেন সাধারণ, কর্তব্যপরায়ণ, ভোগ-আসক্তিবিহীন এবং মহৎ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। সে যুগের লোকসমাজে প্রচলিত আচারের বিপরীত ঘটনা—তাঁর একমাত্র স্ত্রী ছিলেন উম্মে সালমা, যাঁর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং খলিফার ওপর তাঁর প্রভাবও ছিল অপরিসীম। তা সত্ত্বেও অনেক সময় তিনি উমাইয়াদের বিরুদ্ধে তাঁর উন্মত্ত ক্রোধ প্রশমনে অসমর্থ হতেন।

সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় বিদ্রোহ

এ নিষ্ঠুর আচরণের স্বাভাবিক পরিণাম বিষময় হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের অনুকূলে দেখা দেয় ভাবান্তর এবং ক্ষমতাচ্যুত বংশের (উমাইয়া) অনুগামীরা দামাসকাস, হেমস, কিন্নিসরিন, ফিলিস্তিন ও মেসোপটেমিয়ায় সাফফাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এসব উপলক্ষে সাধারণ রীতি ছিল পুরুষদের দাড়ি-গোফ কেটে আব্বাসি বংশের আনুগত্য অস্বীকার করা। পূর্বের প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে অনেক সুচতুর উপায়ে বিদ্রোহগুলো দমন করা হয় এবং বিদ্রোহীরাও সুবিধাজনক শর্ত পেয়ে অস্ত্রশস্ত্র পরিহার করে।

ইয়াজিদ বিন হুবাইরার আত্মসমর্পণ

ইরাকে মারওয়ান কর্তৃক রাজপ্রতিনিধি ইয়াজিদ বিন হুবাইরা তখনো ওয়াসিতে ক্ষমতাসীন ছিলেন, হাসান বিন কাহতবা এবং সাফফাহর ভাই ও উত্তরাধিকারী আবু জাফর যেখানে তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। অবরোধ এগারো মাস স্থায়ী হয়। নগরে আগুন লাগাতে অবরোধকারীরা জ্বলন্ত নৌকা ভাসিয়ে দেয় নদীতে, কিন্তু রক্ষীরা লোহার আংটা দিয়ে নৌকাগুলো ধরে ফেলে বা সরিয়ে নেয়। পরাজিত উমাইয়া বংশের পুনরুদ্ধার সুদূর পরাহত দেখে ইয়াজিদ নিজে হযরত আলি (রা.)-এর এক বংশধরকে[২] খেলাফত গ্রহণ করতে এবং বনু আব্বাসের বিরোধীদেরকে তাঁর চারদিকে সম্মিলিত হওয়ার সুযোগ দিতে আহ্বান জানান। সময় মতো কোনো উত্তর না পেয়ে এবং দীর্ঘক্ষণ টিকে থাকার ব্যাপারে হতাশ হয়ে, বিশেষভাবে সাফফাহর গুপ্তচরদের প্ররোচনায় ইয়েমেনিরা দল ত্যাগ করায় তিনি আবু জাফরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন—নিজের, পরিবারের এবং অনুচরবর্গের সমুদয় জান-মালের নিরাপত্তা সম্পর্কে কঠোর অঙ্গীকার পেয়ে। নিজের অঙ্গীকার পালনে আবু জাফরের পূর্ণ ইচ্ছা থাকলেও সাফফাহ পরিচালিত হন আবু মুসলিমের পরামর্শে। এই নির্দয় লোকটি ইয়াজিদের মধ্যে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে পান। তখনো ইবনে হুবাইরার বহুসংখ্যক অনুগামী ছিল এবং নিজের গোত্রের (ফিজারা) ওপর তাঁর প্রভাব ছিল

---

১. সিসমনদি বলেন, 'মধ্যযুগীয় রাজার কাছে মানুষের রক্তপাত সাধারণভাবে আদৌ কোন ন্যক্কারজনক কাজ ছিল না।

২. খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর পুত্র প্রথম হাসানের পুত্র দ্বিতীয় হাসানের পুত্র আবদুল্লাহ।

অপরিসীম। আবু মুসলিম ইবনে হুবাইরাকে হত্যা করার জন্য সাফফাহকে পরামর্শ দেন এবং তাঁর ভাইকে চিঠি লেখা হয় তা সমাধা করতে।

তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা ও ইয়াজিদের হত্যা (১৩২-১৫৮ হি.)

আবু জাফর বারবার এই নিষ্ঠুর আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন, কিন্তু অবশেষে বাধ্য হন সম্মতি দিতে। ইয়াজিদের বাড়িতে একদল সৈন্য পাঠিয়ে, তাঁকে, বড় ছেলে এবং তাঁর বহুসংখ্যক অনুগামীসহ হত্যা করা হয়।

শাসনকর্তার পদসমূহ

সাফফাহ এখন এশিয়া ও মিশরের একচ্ছত্র অধিপতি এবং পশ্চিম আফ্রিকাও তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে। প্রাদেশিক শাসন কর্তা নিয়োগের ব্যাপারে তিনি সাবধানতা অবলম্বন করেন। বিশেষ করে তাঁর নিজের পরিবারের লোকজন কিংবা যেসব লোক তাঁর পক্ষে কাজ করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাদের ওপর। আবু জাফর ছিলেন মেসোপটেমিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের রাজপ্রতিনিধি; হিজাজ, ইয়েমেন ও ইয়ামামায় অধিষ্ঠিত হন তাঁর চাচা দাউদ বিন আলি; সিরিয়ায় আব্দুল্লাহ বিন আলি; বসরা ও তার অধীনস্থ অঞ্চলে[১] সুলায়মান বিন আলি; খোরাসানে আবু মুসলিম এবং মিশরে আবু আয়ূন শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। খালিদ বিন বারমাক হলেন রাজস্ব মন্ত্রী, অন্যদিকে যে আবু সালমা সাফফাহকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করতে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। তিনি নিযুক্ত হন উজীর পদে এবং সম্ভবত বিশ্বস্ত উপদেষ্টার ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কাজ করতেন।

আবু সালমার হত্যা

আবু সালমার প্রতিপত্তি আবু মুসলিমের ঈর্ষা জাগিয়ে তোলে, একদিন রাতে তিনি যখন সাফফাহর প্রাসাদ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তখন তাঁর ওপর চড়াও হয় আবু মুসলিমের দুর্বৃত্ত বাহিনী এবং তিনি নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর দায় বর্তায় খারিজীদের ওপর।

বাইজান্টাইন আক্রমণ

নতুন শাসকের নতুন ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যে তখনো শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়নি এবং বাইজান্টাইনরা এই সুযোগে মুসলিম সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে লুঠতরাজ চালাতে থাকে। শান্তিপূর্ণ অধিবাসীরা নিহত হয় কিংবা বন্দী করা হয় এবং দেশ শ্বশানে পরিণত হয়।

সাফফাহর মৃত্যু [জিলহজ্জ, ১৩৬ হি.; ৯ জুন ৭৫৪ খ্রি.]

সাফফাহর মৃত্যু হয় হীরার অনতিদূরে আনবর নামক স্থানে; মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান মুহম্মদ নামে এক পুত্র এবং রাইতা নামে এক কন্যাকে, যিনি পরবর্তীকালে তাঁর চাচাতো

---

১. আল-বাহরাইন, আল-হাসসা, ওমান, আহওয়াজ প্রভৃতি।

ভাই মুহম্মদ আল-মাহদীকে[১] বিয়ে করেন। মৃত্যুর আগেই তিনি তাঁর ভাই আবু জাফরকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান এবং তাঁর ভাইয়ের ছেলে ঈসাকে তৎপরবর্তী ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

আবু জাফর আবদুল্লাহ, আল-মনসুরের (বিজয়ী) সিংহাসন-আরোহণ [জিলহজ্জ ১৩৬ হি. জুন ৭৫৪ খ্রি.]

আবু জাফর উক্ত সময়কালে মক্কায় হজ্জ উপলক্ষে অনুপস্থিত থাকার কারণে ঈসাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। সাফফাহ বনু আব্বাসের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হলেও আবু জাফরকেই রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে স্বীকার করতে হবে। এই রাজপরিবারের স্থায়িত্ব, তাঁদের ক্ষমতাবৃদ্ধি, এমনকি সাময়িক প্রাধান্য লোপের পরও তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই হয়েছিল তাঁর দূরদর্শিতার গুণে।

সুন্নি ধর্মীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠা

তিনি এ সময় সুন্নি ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—যা একই সাথে খিলাফতের মর্যাদার, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিসাধন করেছিল এবং তা পরবর্তীকালে এর শক্তির উৎস ও প্রতিপত্তির শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। মানব চরিত্র সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান থাকায় সুদীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি ধীরে ধীরে এই মতবাদগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ঘটান, যা একদিকে জনসাধারণের কল্পনায় রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে দল-বিশেষকে রাষ্ট্রের সমর্থক শ্রেণীভুক্ত করে সাহায্য করে নতুন রাজবংশের প্রতি বাধ্য ও অনুরক্ত এক ক্ষমতাশালী মোল্লাতন্ত্র গড়ে তুলতে।

গোঁড়া মতবাদের প্রতিষ্ঠা

'ইজমা'র সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় ভাবই ছিল এই সুদূরপ্রসারী নীতির প্রধান অবলম্বন। যেসব মহিমান্বিত খলিফার নাম ধারাবাহিকভাবে এশিয়ায় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, মনসুরকে দিয়েই তার সূত্রপাত। আবুল আব্বাসের প্রথম উত্তরাধিকারীদের তুলনা করা হয়েছে অ্যানটোনাইন ও মেডিসিদের সাথে। তারা জাতির উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের জন্য নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। 'প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা অর্জন করে তাঁরা সক্রিয় ও উদার প্রশাসন এবং মহান ও হিতকারী কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে প্রজাসাধারণের ভক্তি ও ভালোবাসা অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন।' তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ

---

১. আবু জাফরের পুত্র, যিনি পরে খলিফা হন। আলি নামে একটি পুত্র রেখে হারুন-অর-রশিদের রাজত্বের প্রান্তে ১৭০ বা ১৭১ হিজরীতে তিনি (রাইতা) মৃত্যুমুখে পতিত হন। মনসুরের রাজত্বকালে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে আমরা বহুবার সাফফাহর পুত্রের কথা জানতে পারি। সাফফাহকে কোথায় সমাহিত করা হয় কেউ জানে না। পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের মৃত্যুদেহের প্রতি তারা যে আচরণ করেছিল সেই আচরণ তাদের মৃতদেহের প্রতিও করা হবে বলে আব্বাসীদের আশঙ্কা ছিল। এবং সে জন্য সতর্কতার সাথে তাদের কবরগুলো লুকিয়ে রাখত। এই বংশের একমাত্র একদাশ খলিফার (মুনতাসির) জন্য একটি সমাধি সৌধ নির্মিত হয়।

করেছিলেন নতুন নতুন নগরী নির্মাণ; সড়ক, সরাইখানা, খাল ও ফোয়ারা তৈরি; দাতব্য ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গঠন; জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ ও নিরাপত্তা প্রদান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও সবরকম সুস্থ শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে। রাজ্যজয়ের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছিল। সিডিলট বলেন, 'রণলিপ্সা পরিহার করতে গিয়ে আব্বাসি খলিফারা তাঁদের যুগধর্মেরই অনুসরণ করেছিলেন; পূর্বদেশিয় আরবরা সভ্যতার উপকারিতা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল এবং সুনিয়ন্ত্রিত প্রশাসন প্রদান যথোপযুক্ত বিচারব্যবস্থা স্থাপনে শিক্ষাবিস্তার ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশকে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্কে আবদ্ধ করে বাগদাদের অধিপতিরা জনমতের অনুকূলেই সায় দিয়েছিলেন।'

আবু জাফরের চরিত্র

দোষে-গুণে মিশ্রিত ছিল আবু জাফরের চরিত্র। রাজনীতিবিদ, প্রশাসক এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। দূরদর্শিতা গুণে বা জনকল্যাণে মনোযোগ প্রদানে তিনি কারো চেয়ে কম ছিলেন না। পিতা হিসেবে তিনি ছিলেন সন্তান-বৎসল। তা সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে তিনি একাধারে বিশ্বাসঘাতক ও নৃশংস হত্যাকারী ছিলেন। সাফফাহর নিষ্ঠুরতা ছিল প্রবল প্রতিহিংসাজাত; কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীর হত্যাকাণ্ড শত্রু-মিত্র বিবেচনা করে দেখতেন না। তিনি বিবেকহীন ছিলেন বলে, অতি নির্মম, শত্রু-মিত্র বাছাইকারী এবং নিজের বা বংশের পক্ষে কাউকে সামান্য বিপজ্জনক মনে করলে তাকেও রেহাই দিতেন না। খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর বংশধরদের প্রতি তাঁর আচরণ আব্বাসিদের ইতিহাসে কালো অধ্যায় রচনা করেছে। সুয়ুতী বলেন, 'মনসুরই প্রথম আব্বাসি ও আলী (রা.)-এর বংশধরদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেন, কারণ পূর্বে তারা ছিলেন একতাবদ্ধ।'

আবদুল্লাহ বিন আলির বিদ্রোহ [সফর ১৩৭ হি.; নভেম্বর ৭৫৪ খ্রি.]

তিনি সাফফাহর মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র দ্রুত কুফায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাজত্বের শাসনভার গ্রহণ করেন 'আল-মনসুর' বা বিজয়ী উপাধি ধারণ করে। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করতে-না-করতেই তাঁর পিতৃব্য সাফফাহর আমলে সিরিয়ার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ বিন আলি বিদ্রোহ করেন। এখন থেকে আমরা তাকে 'মনসুর' নামেই অভিহিত করব, আবু মুসলিমকে নির্দেশ দেন বিদ্রোহ দমন করতে। নাসিবিন নামক স্থানের সন্নিকটে এক তুমুল যুদ্ধের পর আবু মুসলিম আবদুল্লাহ বিন আলিকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন, তিনি সপরিবারে বসরায় পালিয়ে যান তাঁর ভাই সুলায়মানের কাছে এবং শাসন কর্তৃত্ব থেকে সুলায়মানের অপসারণ পর্যন্ত সেখানে অজ্ঞাতবাস করলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ও তাঁর বড় দুই ছেলে পতিত হন মনসুরের কবলে এবং হাশমিয়াহর[১] অনতিদূরে এক দুর্গে বন্দী হন। কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করা হয় 'জাব' যুদ্ধের বিজয়ীকে রাজধানীর এত নিকটে রাখা।

---

১. হাশমিয়াহ বা মদিনাতুল হাশমিয়াহ হল কুফার অনতিদূরে সাফফাহ কর্তৃক নির্মিত হাশিমা গোত্রের নগরী।

আবদুল্লাহ বিন আলির মৃত্যু

তাঁর জন্য একটি নতুন বাড়ি তৈরি করা হয় লবণের ভিত্তির ওপর এবং আবদুল্লাহকে মহাসমারোহে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর প্রথমেই প্রবল বৃষ্টিতে ভিত ধসে যায় এবং হতভাগ্য বন্দী বিধ্বস্ত বাড়ির তলায় চাপা পড়ে প্রাণ হারান। আর এ পরিণাম তাঁর যথার্থই প্রাপ্য ছিল—উমাইয়াদের প্রতি বর্বর আচরণের জন্য।

আবু মুসলিম নাসিবিনের যুদ্ধের পর তাঁর শাসনকেন্দ্র খোরাসানে স্থানান্তর করতে চাইলেন, কার্যত তিনি যেখানে রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন। প্রদেশে তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা ছিল এবং নিশ্চিতভাবেই তিনি আব্বাসিদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন বিপদের কারণ হিসেবে। তাঁর বিপুল সংখ্যক অনুচর ছিল এবং ছিল কিছু উপদলও, যারা তাঁকে নবী বলে মনে করত। তিনি যেমন আব্বাসি বংশকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তেমনি তা ধ্বংসও করতে পারতেন নিজের আঙ্গুলের ইশারায়। তাঁর আচরণও কঠোর ও অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। নাসিবিনে রাজদূত লুণ্ঠিত বস্তুর তালিকা প্রস্তুত করতে এলে বিচক্ষণ রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি তাঁর উক্তি মোটেই সম্মানজনক বা বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। এমন বিপজ্জনক ব্যক্তিকে অপসারণ করাই এবার হয়ে ওঠে মনসুরের প্রথম লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁকে খোরাসানে ফিরে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়াই সমীচীন হবে বলে মনে করে; কারণ সেখানে তিনি নিজের ভক্ত ও অনুচরদের মধ্যে গিয়ে পড়বেন। তাঁকে সিরিয়া ও তাঁর অধীনস্থ সমগ্র অঞ্চলের শাসনভার দেয়ার প্রস্তাব করা হয়; কিন্তু এভাবে ফাঁদে পড়ার লোক ছিলেন না আবু মুসলিম। তিনি ছিলেন অতিশয় সুচতুর ও সতর্ক। যে সৈন্যদলের সাহায্যে আবদুল্লাহ বিন আলিকে দমন করেছিল তাদের নিয়ে তিনি খোরাসানের দিকে যাত্রা করতে উদ্যত হলেন। মনসুরের পক্ষে তাঁকে বাধা দেয়া ছিল অসম্ভব; অতএব তিনি প্রিয় অস্ত্রটির সাহায্য গ্রহণ করেন। যেসব লোক অন্যের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে, অনেক সময়ই তারা সহজেই তার শিকারে পরিণত হয়। আবু মুসলিম তাঁর যাত্রা স্থগিত রাখেন, মনসুরের নামে দেয়া প্রভূত প্রতিশ্রুতিতে প্রলোভিত হয়ে অতঃপর দরবারে হাজির হন।

আবু মুসলিমের মৃত্যু [১৩৭ হিজরি]

যথাযথ সম্মানের সাথে তিনি অভ্যর্থিত হন এবং তাঁর প্রতি প্রায় রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হয় বেশ কিছুদিন। প্রাসাদে অবস্থানকালে কোন এক অশুভ দিনে তাঁর দেহ-রক্ষীদেরকে নিরস্ত্র করা হয় এবং রাষ্ট্রপ্রধানের সামনেই তিনি নিহত হন।

আবু মুসলিম যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মনসুর নিজেকে সিংহাসনে নিরাপদ মনে করতে পারেননি; এবার তিনি নিজেকে প্রকৃত শাসক বলে অনুভব করেন এবং নতুন রাজধানীর জন্য নতুন স্থান খুঁজতে শুরু করেন। দামাসকাসের প্রতি আব্বাসিদের কেবল আকর্ষণের অভাবই ছিল না, বরং স্থানটি ছিল বিপজ্জনক, অন্যদিকে বসরা ও কুফার লোকদের অনিশ্চিত ও চঞ্চল গতিবিধি ওই নগরীগুলোকে রাজধানী হওয়ার অনুপযুক্ত

করে তুলেছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর নদীপথে বসরা থেকে ছয় দিনের সফর শেষে তিনি স্থান নির্বাচন করেন, যেখানে এখনকার বাগদাদ নগরী অবস্থিত।

বাগদাদ ছিল বিখ্যাত পারস্য সম্রাট কিসরা নওশিরওয়ানের গ্রীষ্মাবাস এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তাঁর যে সুখ্যাতি ছিল তা থেকেই এর নাম হয়েছে 'ন্যায়বিচারের উদ্যান'। পারস্য সাম্রাজ্যের অধঃপতনেরর সাথে সাথে ধ্বংস হয়েছে বিখ্যাত উদ্যানটিও, এশিয়ার অধিপতি যেখানে বসে তাঁর অসংখ্য প্রজার প্রতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর ন্যায়বিচার সম্পাদন করতেন। কিংবদন্তীতে নামটুকু রয়ে গেছে এখনও। কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং স্বাস্থ্যকর এই মনোরম স্থানটি মনসুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেকালের শ্রেষ্ঠ স্থপতিদের যাদুকরিস্পর্শে তরঙ্গায়িত সমুদ্র-দেবতার মতো আত্মপ্রকাশ করে খলিফাদের গৌরবময় এই নগরী।

বাগদাদ

টাইগ্রিস নদীর পশ্চিম তীরে স্থাপিত হয় মনসুরের বাগদাদ নগরী। কিছুদিন পরই খেলাফতের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী মহামান্য যুবরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব তীরে গড়ে ওঠে আরেক নগরী—এক নতুন বাগদাদ এবং তাঁর নামেই শহরটির নামকরণ হয় মাহ্‌দিয়াহ। সুরম্য স্থাপত্য শৈলীতে এই নতুন নগরী 'মনসুরিয়া'র (মনসুরের নগরী) সৌন্দর্য ও জাঁকজমকের সাথে পাল্লা দেয়। পশ্চিম এশিয়ার ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে প্রবাহিত চেঙ্গিস খানের বিধ্বংসী সেনাদল আরব সভ্যতার প্রতিটি চিহ্ন বিলীন করার আগের গৌরবময় দিনগুলোতে সুদৃশ্য ও জমকালোভাবে বাগদাদ বিদ্যমান ছিল—ছিল ইসলামী খলিফাদের উপযুক্ত রাজধানী। নগরটি ছিল বৃত্তাকার এবং চারদিকে দুই-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। রাজপ্রাসাদের অবস্থান ছিল কেন্দ্রস্থলে, রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে ছিল জুমা মসজিদ। সেনাবাহিনী পরিদর্শনের জন্য সংরক্ষিত স্থান ছাড়িয়ে রাষ্ট্রের প্রধান কর্মচারীদের অট্টালিকাগুলো অবস্থিত ছিল। রাস্তাগুলো ছিল সুবিন্যস্ত এবং চল্লিশ হাত চওড়া। বাজার বা দোকানগুলো ভবঘুরে ও সন্দেহজনক চরিত্রের লোকজনের আড্ডায় পরিণত হত বলে সেগুলো প্রাচীরের বাইরে স্থাপন করা হয়েছিল; কিন্তু প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে ছিল পুলিশ-প্রহরায় বিশেষ ধরনের খাদ্য-বিক্রেতারা ছিল। সেনানিবাসগুলো ছিল নদীর পূর্ব পাশে এবং সেগুলো তিনটি বিভাগে বিভক্ত—একটি মুদারবংশীয়, অন্যটি ইয়েমেনি এবং তৃতীয়টি খোরাসানি সৈন্যদের জন্য। এই অঞ্চলগুলো প্রতিটি একে অপরের সম্পর্কে সংযত থাকত। নগরাভিমুখে ছিল সুউচ্চ বুরুজবিশিষ্ট অনেকগুলো তোরণ, যেগুলোতে সেনারা দিনরাত পালাক্রমে পাহারা দিত।

খোরাসানে বিদ্রোহ [১৪১ হি.] : বাইজান্টাইন আক্রমণ

বাগদাদের নির্মাণ কাজ শেষ হতে ১৫০ হিজরি (৭৬৭-৬৮ খ্রি.) পর্যন্ত সময় লেগেছিল। ইতোমধ্যে ঘটে যায় নানা ঘটনা, আর সবগুলোই কার্যত মনসুরের জন্য সাফল্য নিয়ে

আসে। আবু মুসলিমের হত্যার ফলে খোরাসানে তাঁর অনুগামীরা[১] বিদ্রোহ করে, কিন্তু তারা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়। যে রাওয়ান্দিয়া[২] সম্প্রদায় আব্বাসি খলিফাদের স্রষ্টার অবতার বলে মনে করত, আর এ সময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে হাশিমিয়ায়। এই বিদ্রোহের ফলে বাস্তবিকই মনসুরের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্প্রদায়কে বহিষ্কার করা হয় নগর থেকে। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে একটি বাইজান্টাইন আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের সম্রাট বাধ্য হন সাত বছরের যুদ্ধ বিরতির শর্তে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করতে। এরপর মনসুর খ্রিস্টান আক্রমণকারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোর পুনরুদ্ধার, বিনষ্ট ও পরিত্যক্ত নগরগুলোর পুনর্বাসন এবং যথোপযুক্তভাবে সীমান্ত প্রতিরক্ষা করতে মনোনিবেশ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই প্রদেশগুলো সফর করেন এবং হাসান বিন কাহতবাকে[৩] বিশাল সেনাবাহিনীসহ পাঠিয়ে দেন কাপাডোসিয়ায়। মালাতিয়া (Melitene), ম্যাসিসা (Mopsuesta) এবং আরো অনেক নগরী এভাবে পুনর্নির্মিত, পুনর্বাসিত এবং সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত হয়। বাইজান্টাইন আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ক্লডিয়া এবং সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য স্থানে নতুন নতুন দুর্গ নির্মিত হয়।

তাবারিস্তান অধিকার [১৪২-৩ হিজরি; ৭৫৯-৭৬০ খ্রি.]

কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত তাবারিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীগণ তখনো ছিল প্রাচীন ধর্মানুসারী এবং তারা নিজেদের সর্দারগণের দ্বারা নামমাত্র খলিফার অধীনে শাসিত হত। হঠাৎ তারা আরবদের ওপর চড়াও হয় এবং হত্যা করে তাদের বহুসংখ্যক লোককে। ফলে অভিযান চালানো আবশ্যক হয়ে ওঠে। স্থানীয় সর্দাররা নিহত কিংবা বিতাড়িত হন এবং তাবারিস্তান ও গীলান নিশ্চিতভাবেই আব্বাসি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ বিজয় সম্পন্ন হতে-না-হতেই প্রাচীন ম্যাগিয়ান ধর্মাবলম্বী এবং নামমাত্র মুসলিম শাসনাধীন দায়লমের[৪] অধিবাসীবৃন্দ আরব রাজ্যে হানা দেয়।

---

১. মাস'উদী বলেন, আবু মুসলিমের অনুগামীরা নিজেদের নিয়ে 'খুররামী' নামে একটি সম্প্রদায় গঠন করেছিল। এরা তাঁকে ইমাম ও মুক্তিদাতা বলে গণ্য করত এবং এরা বিস্তার লাভ করেছিল প্রধানত খোরাসান ও আগের পার্বত্য অঞ্চলে। আবু মুসলিমের মৃত্যুর পর তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে; একদল বিশ্বাস করত যে তিনি এখনো জীবিত এবং পৃথিবীতে ন্যায়বিচার স্থাপন করতে শীঘ্রই আবার আত্মপ্রকাশ করবেন; অন্যদলের বিশ্বাস ছিল, সত্যিই তাঁর মতো হয়েছে এবং ইমামত বর্তেছে তাঁর কন্যার ওপর। বিদ্রোহের নেতা সানফাদ ছিলেন এই দলের অন্যতম প্রধান সমর্থক। তব ইবনুল আসির ও মীরখন্দ বলেন, তিনি ছিলেন ম্যাগিয়ান।

২. রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় মনসুরকে 'খাদ্য ও পানীয়দাতা ঈশ্বর' বলে মনে করত। তাঁর প্রধান দেহরক্ষীকে মনে করত জিবরাইল ফেরেশতার (দেবদূত গ্যাব্রিয়েল) অবতার। তাদের অনভিপ্রেত ও নাস্তিকতাপূর্ণ উম্মাদনায় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, যার ফলে মনসুর তাদের অনেককে বন্দী করেন, আর সে জন্যই ঘটে বিদ্রোহ, সে যাত্রা মনসুরের জীবনরক্ষা হয় মা'য়ান বিন জায়দাহ (উদারতার জন্য বিখ্যাত) নামে মারওয়ানের এক অনুচরের দ্বারা, যার মাথার জন্য আব্বাসীরা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। এই ঘটনার পর তিনি কেবল অনুগ্রহভাজনই হন না, যথাক্রমে ইয়ামামা ও সিজিস্তানের শাসনকর্তাও নিযুক্ত হন।

৩. পূর্বে দৃষ্টব্য, পৃ. ১৭২।

৪. কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে উত্তর গীলানের পার্বত্য অঞ্চল। পরবর্তী আব্বাসীদের আমলে দায়লমীদের সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারব।

কিছুদিন কঠোর যুদ্ধের পর তারা বিতাড়িত হয় এবং সতর্কতার সাথে সামরিক ঘাঁটিগুলো স্থাপিত হওয়ায় তাদের পরবর্তী আক্রমণগুলোও প্রতিহত হয়।

১৪৩ হিজরি; ৭৬০-১ খ্রিস্টাব্দ

হিজরি ১৪৩ সালে প্রাদেশিক শাসনকর্তৃত্বের পুনঃবন্টন করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদেশের সকল ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রবর্তিত হয় সংবাদ লেখক নিয়োগের প্রথা। গোয়েন্দা ও গুপ্তচরদের এত শাখা বিস্তার যে কোনো আধুনিক সরকারকে হার মানাবে, রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দল-বৃদ্ধির ব্যাপারে লক্ষ রাখতে তাঁকে সাহায্য করলেও নিশ্চিতভাবেই তা জনসাধারণের মধ্যে নিরাপত্তার ভাব বৃদ্ধি করতে পারেনি।

বনু হাসান–তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার [১৪৪ হি.; ৭৬১ খ্রি.]

আমরা এখন এই অসাধারণ রাজপুরুষের জীবন-ইতিহাসের এমন এক অধ্যায়ে উপনীত হব যাতে তাঁর মহৎ হৃদয় কিংবা ক্ষমাশীল স্বভাবের কিছুই প্রতিফলিত হয় না। পরবর্তী ঘটনাসমূহ সম্যক উপলব্ধি করতে হলে এ সময় হযরত আলি (রা.)-এর বংশধরদের[১] অবস্থার দিকে কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। পঞ্চম খলিফা হাসানের[২] বংশধরগণ বনু হাসানরা এযাবৎকাল রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি এবং বারবার দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও কখনোই প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেষ্টা করেননি। স্বগোত্রীয় আব্বাসি বংশধররা যে রাজনৈতিক উত্তেজনায় লিপ্ত ছিল তা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে দাঁড়িয়ে ইমাম হুসাইন (রা.)-এর[৩] পুত্র দ্বিতীয় আলির বংশধররা সাহিত্য ও দর্শন চর্চায় আত্মনিয়োগ করে ততোধিক নিরিবিলি জীবন-যাপন করছিলেন। জায়েদ ও তাঁর পুত্র নিষ্ঠুর ও নির্মম ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে হিশাম ও দ্বিতীয় ওয়ালিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং তাঁদের প্রাণ হারান। বনু হাসান ও বনু হুসাইন মদিনায় বাস করতেন, যেখানে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ হত তাদের জন্য রেখে যাওয়া সামান্য সম্পত্তির আয় দিয়ে। আর সাথে ব্যবসার লভ্যাংশ বা ততোধিক অনিশ্চিত শিক্ষাদানের সংযোজিত আয় থেকে। তবে অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিবিহীন হওয়া সত্ত্বেও নগরবাসীদের নিকট তাঁরা সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম তিন খলিফা, জুবাইর এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর অন্যান্য প্রধান সহচরদের বংশধররাও এখানে বসবাস করতেন, তাঁরা সকলেই নানাদিক দিয়ে ছিলেন আলাবীগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শেষোক্তদের প্রভাব এবং অর্জিত শ্রদ্ধা মনসুরের দুর্বোধ্য ও সন্দিগ্ধ স্বভাবকে বিচলিত করে তোলে এবং মারওয়ানের বংশ যে অবলীলাক্রমে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল, নিজের বংশ সম্পর্কেও তিনি একই আশঙ্কা করছিলেন। কোনো ষড়যন্ত্র দানা বেধেছে কিনা তা আবিষ্কার করতে তিনি বিভিন্ন গুপ্তচর

---

১. আলাবী (অ্যালাইড), অর্থাঃ হযরত আলি (রা.)-এর বংশধর।
২. প্রথম হাসান (রাঃ)। বংশের অনুগামীদের কাছ থেকে তিনি 'মুজতবা' (সুনির্বাচিত) উপাধি লাভ করেছিলেন।
৩. কারবালার শহীদ।

পদ্ধতির আশ্রয় নেন; গুপ্তচরদের এই পরামর্শ প্রদান করা হয় যে, তারা যেন সুকৌশলে আলাবীদের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে এবং তাঁদেরকে প্ররোচিত করে অসতর্কভাবে কথাবার্তা বলতে, যাতে পরে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পটভূমি রচনা করা সহজ হয়। কিন্তু মনসুরের রাজত্বকালে আলাবীদের প্রতি অত্যাচারের এটিই একমাত্র কারণ ছিল না। উমাইয়া খিলাফত যখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ছিল তখন রসূলুল্লাহ (স.)-এর বংশ স্বাভাবিকভাবেই সে ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিল। এ উপলক্ষে মদিনায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যাতে স্বয়ং মনসুরসহ বনু হাশিমের অধিকাংশ লোকজনই উপস্থিত ছিলেন।[১]

আন-নাফস-উদ্-জাকিয়া–'পবিত্র আত্মা'

ঐ সমাবেশে বনু হাশিমের প্রায় সকল লোক উপস্থিত ছিল। এ সমাবেশে বনু হাসানের নেতা বলে স্বীকৃত হাসানের প্রপৌত্র[২] তাঁর পিতা জীবিত থাকা সত্ত্বেও খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। তাঁর মহৎ ও পবিত্র চরিত্র, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ পর্যায়ের গুণাবলির জন্য তিনি 'আন্-নাফস-উদ্-জাকিয়া' বা 'পবিত্র আত্মা' উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর যোগ্যতা ও অগ্রগণ্যতা বিষয়ে সবাই একমত ছিল এবং আবু জাফর-সহ সভার সবাই তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তা সত্ত্বেও আমরা দেখেছি খেলাফত শেষ পর্যন্ত কিভাবে আব্বাসীয়দের হস্তগত হয়েছিল। মনসুর যখন খেলাফতের মসনদে আসীন হন তখন ঐ অবিস্মরণীয় শপথের স্মৃতি তাঁর জীবনকে অন্ধকারময় করে তোলে এবং সন্দেহকে ঘনীভূত করে তোলে। বনু হাসানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ জানিয়ে গুপ্তচররাও তাঁর মনকে বিষিয়ে তোলে। তিনি মুহম্মদ ও তাঁর ভাই ইব্রাহিমকে বন্দী করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁরা পালিয়ে যান। তারপর বৃদ্ধ পিতা আব্দুল্লাহসহ পরিবারের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকেই গ্রেফতার করেন এবং সেইসাথে খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর বংশধরদের নেতা মুহম্মদ আল-উসমানীকেও,[৩] (যাঁর কন্যার সাথে ইব্রাহিমের বিয়ে হয়েছিল) শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাঁদের কুফায় পাঠানো হয় এবং বন্দী করা হয় হুবাইরার দুর্গে। মুহম্মদ আল-উসমানী সিরীয়দের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন বলে তাঁর মতো একজন লোককে আব্বাসী সিংহাসনের জন্য বিপজ্জনক মনে করা হয়। তাঁকে বেত্রাঘাত করে ঠেলে দেয়া হয় মৃত্যুর দিকে। অন্যদের প্রতিও এতই নিষ্ঠুর আচরণ করা হয় যে, হতভাগ্য ভুক্তভোগীরা স্বীকার করেন উমাইয়া আমলে তাঁরা অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যবহার পেয়েছিলেন। এবার মুহম্মদ ও ইব্রাহিমের অনুসন্ধান করা হয় চতুর্দিকে। জলপথগুলোতে অনুসন্ধানের জন্য গুপ্তচর হিসেবে বেদুইনদের নিয়োগ করা হয়; প্রতিটি গণ্ডগ্রাম থেকে সম্ভাব্য আশ্রয়স্থান—সর্বত্রই চলল পলাতকদের তল্লাশী এবং তাদেরকে আশ্রয় দিতে পারে এমন সন্দেহজনক প্রত্যেক ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করে বেত্রাঘাত করা হয়।

---

১. ধর্মগুরু ইমাম জাফর আস-সাদিক উপস্থিত ছিলেন না।

২. হযরত আলি (রা.)-এর পুত্র ইমাম হাসান (রা.), তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হাসান (মুসসানা), তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ, তাঁর পুত্র মহম্মদ।

৩. খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর পুত্র উমর, তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ, তাঁর পুত্র মহম্মদ।

মুহম্মদ ও ইব্রাহিম আল-হাসানীর আত্মপ্রকাশ

বিতাড়নের ফলে উপায় খুঁজে না পেয়ে মুহম্মদ তাঁর ভাই ইব্রাহিমকে আহওয়াজ ও বসরায় বিদ্রোহ পতাকা উত্তোলন করতে পাঠান এবং অন্যদিকে তিনি স্বয়ং মদিনায় আত্মপ্রকাশ করেন। বসরা ও মদিনায় একযোগে মনসুরের পদচ্যুতি ঘোষণা করার কথা ছিল। এই পরিকল্পনা কার্যকরি হলে সম্ভবত আব্বাসীয় শাসনের অবসান ঘটত। কিন্তু আপন ভাইয়ের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই মুহম্মদ বাধ্য হন নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করতে; আর এভাবেই মনসুর তাঁদেরকে পর্যায়ক্রমে আক্রমণ করার সুযোগ পান।

মুহম্মদ প্রথমে তাঁর সামনে থেকে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অপসারণ করেন। তারপর মদিনায় মনসুরের প্রতিনিধি ধরা পড়েন ও বন্দী হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র হিজাজ ও ইয়েমেন মুহম্মদকে গ্রহণ করে ইসলামের খলিফা হিসেবে। সুন্নীদের মধ্যে দুটি মহান বিধানের প্রবর্তক ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক মুহম্মদের দাবির বৈধতার সপক্ষে মতপ্রকাশ করেন। আন্দোলনটিকে আশাতীতরূপে বিপজ্জনক দেখতে পেয়ে মনসুর আশ্রয় নেন তাঁর অভ্যাসগত ছল-চাতুরির। তিনি 'আন্ নাফস-উদ্-জাকিয়া'কে পরিপূর্ণ অভয় 'আমান', ইচ্ছেমতো বসবাসের অনুমতি, মোটা অংকের ভাতা এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসীম অনুগ্রহ প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি চিঠি লেখেন। এর জবাবে মুহম্মদ বলেন, যেহেতু তিনিই খেলাফতের প্রকৃত অধিকারী সেহেতু ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন তাঁরই কাজ এবং পরিশেষে জানতে চান, মনসুর আবু মুসলিম, আবদুল্লাহ বিন আলি এবং ইয়াজিদ বিন হুবাইরাকে যে অভয় প্রদান করেছিলেন এটিও সেই ধরনের কিনা। এর প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত মর্মাহত মনসুর পাল্টা নালিশ জানিয়ে 'নাফস-উদ্-জাকিয়া'কে একটি লম্বা চিঠি লেখেন, যাতে লেখা হয় আব্বাসিয় রাজবংশ শেষ পর্যন্ত কোন কোন নীতির ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছে। তিনি যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন তা অগ্রাহ্য করেন এবং বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, যেহেতু রসূলুল্লাহ (স.) কোনো পুত্র সন্তান না রেখে প্রয়াত হয়েছেন সেহেতু তাঁর কন্যার সন্তানরা তাঁর উত্তরাধিকারী হতে পারেন না, এই উত্তরাধিকার তাঁর পিতৃব্য আব্বাসের বংশধরগণের ওপর বর্তায়। বিরাট সেনাবাহিনীসহ মনসুর তাঁর ভাইপো ঈসাকে দ্রুত পাঠিয়ে দেন নাফস-উজ-জাকিয়াকে দমন করতে। যুদ্ধের আগে মুহম্মদ তাঁর অনুগামীদের বলে দেন যে, তাদের নিজেদের ইচ্ছেমতো চলে যেতে বাধা নেই কিংবা বাধা নেই তাঁর সঙ্গে থাকতেও; এতে তাঁর অধিকাংশ সমর্থক যারা তাদের পরিবার-পরিজনদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, তারা চলে যায় নিজ নিজ বাড়িতে এবং মনসুরের বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করতে তাঁর সঙ্গে তিনশ' জন লোক থেকে যায়।

মুহম্মদ নিহত [১৫ রমজান, ১৪৫ হি.; ৭৬২ খ্রি.]

বীরোচিত যুদ্ধের অবসান ঘটে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে; তাঁর অনুগামীরাও নিঃশেষে নিহত হয় এবং প্রথামতো তাদের লাশগুলোকে ঝোলানো হয় ফাঁসিকাষ্ঠে। নবী-পরিবারের একজন মহিলা তাদেরকে সমাধিস্ত করার জন্য ঈসার অনুমতি পান এবং তাদেরকে কবর দেয়া হয় মদিনার নিকটবর্তী 'শহীদী কবরস্থানে'।

ইব্রাহিম তাঁর ভাইয়ের অসময়ে বিদ্রোহে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও ইব্রাহিম এক বিরাট সেনাদল সংগ্রহে সমর্থ হন, যার সাহায্যে বহুবার তিনি মনসুরের বাহিনীকে পরাজিত করেন। পরিশেষে আব্বাসীয়দের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে ওঠে যে তিনি (মনসুর) কুফা থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নেন। নিরুপায় হয়ে তিনি ঈসাকে পাঠান ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে। ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সংঘটিত এক যুদ্ধে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আব্বাসিয় বাহিনী বিতাড়িত হয়; কিন্তু অবশেষে মানবতাবোধ সম্পর্কে 'আলাবী'দের সতর্কতায় আবার নস্যাৎ হয় তাঁদের স্বার্থ।

ইব্রাহিম নিহত [২৪ জিলক্বদ, ১৪৫ হি.]

শত্রুকে পলায়নরত দেখে ইব্রাহিম তাদের পশ্চাৎ অনুসরণ বন্ধ করেন। আব্বাসীয়রা তা দেখামাত্রা ঘুরে দাঁড়ায় এবং তাদের বহুলোক যারা আহত হওয়ার ভান করে ধরাশায়ী হয়েছিল তারা পুনরায় লাফিয়ে ওঠে। এরপর যে যুদ্ধ হয় তাতে ইব্রাহিম তীরবিদ্ধ হয়ে নিহত হন এবং তাঁর অনুচররাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।[১]

মনসুর এবার মদিনা ও বসরা নগরদুটির ওপর তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন। বসরার বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যাঁরা ইব্রাহিমের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন তাঁরা ধরা পড়েন ও নিহত হন। তাঁদের ঘরবাড়ি ধুলিস্যাৎ করা হয়, কেটে ফেলা হয় খেজুর বাগান। মদিনায় বনু হাসান ও বনু হুসাইনের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, প্রত্যাহার করা হয় মদিনার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা এবং মিশর থেকে প্রাপ্ত সকল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। এমনকি নিজের সম্পত্তি ফেরত চাওয়ায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম জাফর আস-সাদিককেও তিনি মৃত্যুর হুমকি দেন। নিষ্ঠুরভাবে বেত্রাঘাত করে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিককে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। হুবাইরা দুর্গের কয়েকজন বন্দীকে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়, অন্যদেরকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয় কারাগৃহের বিষাক্ত বাতাস নির্গমনের দ্বারা। ইব্রাহিমের মুণ্ডু হাতে পেয়েই মনসুর তা নিহতের পিতার কাছে পাঠিয়ে দেন তাঁর দুঃখের জ্বালা আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্য। তার জবাবে আবদুল্লাহর বাণী বিশেষভাবে স্মরণীয়। মিনসুরের দূতকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'তোমার প্রভুকে বলো যে তাঁর সুখের দিনের মতো আমাদের দুঃখের দিনও দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে এবং আমরা শীঘ্রই উপনীত হব শাশ্বত বিচারকর্তার সামনে, যিনি তাঁর (মনসুরের) ও আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করবেন।' বর্ণনাকারী আরো বলেন যে, এই সংবাদ পাওয়ার পর মনসুরকে তিনি যেভাবে ভেঙে পড়তে দেখেছেন তেমনটি আর কাউকে কখনো দেখেননি।

মনসুরের ক্ষমতা এবার পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকায় স্বীকৃত হয় এবং স্পেন তাঁর সামরিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত না হলেও সেখানেও তাঁর নামে 'খুতবা' পাঠ করা হয়, এবং পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরীদ্বয়ের তিনিই ছিলেন শাসক ও রক্ষক।

---

১. ইবনে খালদুন এই ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন । আমার বর্ণনা তারই সার-সংক্ষেপ।

১৪৬ হিজরি; ৭৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দ

তিনি তাঁর পুত্র জাফরকে ১৪৬ হিজরিতে মসুলের শাসনকর্তারূপে পাঠালেন, সেইসঙ্গে বিখ্যাত যোদ্ধা হরব বিন আব্দুল্লাহকে পাঠান তাঁর সহকারি হিসেবে। এই শহরের সন্নিকটে হরবের যে সুন্দর প্রাসাদ[১] ছিল জাফর সেটিকেই তাঁর বাসস্থান রূপে গ্রহণ করেন এবং এখানেই তাঁর কন্যা জুবাইদা[২] জন্মগ্রহণ করেন।

স্পেন

এ সময় আফ্রিকায় শাসনকর্তা একবার স্পেন বিজয়ের চেষ্টা করেন। উমাইয়া বংশীয় আব্দুর রহমান আক্রমণকারী সেনাদলকে পরাজিত করেন। আব্বাসিয় সেনাপতির ছিন্ন মাথা গুপ্তচরের সাহায্যে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং মনসুর যখন মক্কায় দরবার করছিলেন তখন ঐ মাথাটি তাঁর সম্মুখে নিক্ষেপ করা হয়। কে যে এই মাথা এনেছে তা কেউই জানত না।

এই উদ্ধত ব্যবহারে মনসুর এমনই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন যে তাঁর ও 'কোরাশিয়দের বাজপাখি' আবদুর রহমানের মাঝখানে প্রশস্ত সমুদ্র স্থাপন করার জন্য তিনি মহাপ্রভুর (অর্থাৎ আল্লাহ) কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন; আবদুর রহমানকে তিনি এভাবেই অভিহিত করতেন।

খাজারদের সহসা আক্রমণ

জর্জিয়ায় খাজারগণের একটি আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এবং ব্যবস্থা নেয়া হয় যাযাবর গোষ্ঠীর পরবর্তী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে। কুর্দগণ ঝামেলা পাকাতে শুরু করলে মনসুর তাঁর রাজস্ব-বিভাগের প্রধান খালিদ বিন বারমাককে মেসোপটেমিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। খালিদ দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়ণতার মিশ্রণ ঘটিয়ে প্রদেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং দুর্ধর্ষ কুর্দগণকে সফলভাবে দমন করেন।

মুহম্মদ আল-মাহদী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত

মনসুর এবার তাঁর ভাইয়ের ছেলে ঈসাকে জোর করে খিলাফতের উত্তরাধিকার ত্যাগ করানোর কথা ভাবেন। এ উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ করে দমনমূলক ব্যবস্থা এবং ঈসা তাঁর দাবি মুলতবী রাখতে বাধ্য হন, যার ফলে মনসুর তাঁর পুত্র মুহম্মদকে 'আল-মাহদী'

---

১. ইবনুল আসির যখন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ (আল-কামিল) রচনা করেন তখন প্রাসাদটি বিদ্যমান ছিল। হারবের প্রাসাদ সম্পর্কে ইবনুল আসির এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। 'এ সময় এটির খুব কাছে আমার একটি গ্রাম রয়েছে, যেটি একান্তভাবে আমারই সম্পত্তি। আমি সুফীদের 'রিবাত' (মঠ)-এর জন্য এই উৎসর্গ করেছি। এই গ্রামে আমার একটি সুন্দর বাড়ি রয়েছে, যেখানে আমি এই গ্রন্থের বৃহত্তর অংশ প্রণয়ন করেছি।'

২. হারুন-অর-রশিদের বিখ্যাত মহিষী। তাঁর আসল নাম আম্মাতুল আজিজ। 'জুরদা' (ননী) শব্দের ক্ষুদ্রত্বব্যঞ্জক জুবাইদ নামটি তাঁর পিতামহ মনসুর দিয়েছিলেন আদর করে।

উপাধি দিয়ে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আর এই মনোনয়ন জনসাধারণ কর্তৃক মনোনীত হয় এবং যথাযথভাবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা হয়।

ইমাম জাফর আস-সাদিকের মৃত্যু (১৪৮ হিজরি; ৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ)

ধর্মীয় নেতা ইমাম জাফর আস-সাদিক ১৪৮ হিজরিতে মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদগ্ধ মতবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে না। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী 'আল-কাজিম' উপাধিধারী মুসার তত্ত্বাবধানে তা আরও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হতে থাকে।

মুসা আল কাজিম (ধৈর্যশীল) উত্তরাধিকার মনোনীত

এখানে আরেকটি বিভেদ দেখা দেয় শিয়া বা হযরত আলি (রা.)-এর বংশধরগণের সমর্থকদের মধ্যে। ইমাম জাফর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন তাঁর বড় ছেলে ইসমাঈলকে, যিনি তাঁর আগেই মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তিনি মুসাকে উক্ত পদে নিয়োগ করেন। তবু কিছু অনুগামী মুসার বশ্যতা অস্বীকার করে এবং তাঁর জায়গায় ইসমাঈলের পুত্র হাবিবকে তাদের ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে। ইসমাঈলী-সম্প্রদায়ের এখানেই শুরু, যাঁরা পরবর্তীকালে মিশরে ফাতিমী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

উস্তাদ সীসের বিদ্রোহ [১৫১ হিজরি]

উস্তাদ সীস নামে পরের বছর খোরাসান প্রদেশের এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নেতৃত্বে সেখানে এক ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ দেখা দেয়। গোলযোগ দমন করা হয়; উস্তাদ সীস ও তাঁর পরিবারবর্গকে বন্দী হিসেবে নিয়ে আসা হয় বাগদাদে, যেখানে তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়।

আফ্রিকা

মনসুরের জন্য আফ্রিকা হয়ে উঠেছিল অবিরাম গোলযোগের কারণ। তমীম গোত্রের আগলাব নামে এক ব্যক্তি ১৪৮ হিজরিতে শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে প্রায় দু'বছর সফলভাবে আফ্রিকা শাসন করেছিলেন, কিন্তু তিউনিসের নিকট খারিজীদের সাথে এক সংঘর্ষে তিনি নিহত হন। তাঁর উত্তরাধিকারী হাফসের পুত্র উমর তিন বছর পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থেকে নিজেকে প্রমাণ করেন সৎ ও দক্ষ শাসনকর্তা হিসেবে। খারিজীগণ পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে কায়রোয়ান অবরোধ করে, যাতে নগরীর অবস্থা হয়ে ওঠে অত্যন্ত শোচনীয়।

অবরোধকালে উমর নিহত হন এবং আফ্রিকার রাজধানী বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়। মনসুরের ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তিনি দ্রুত আরেকটি ইয়েজিদ মুহাল্লিবী[১] নামে

---

১. আবু সুফরার পুত্র কবীসা, তাঁর পুত্র হায়সাম, তাঁর পুত্র (ইয়েজিদ মুহাল্লিবী)। কবীসা ছিলেন বিখ্যাত মুহাল্লিবের (পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ. ৯৩) ভাই, তা থেকেই মুহাল্লিবী উপাধির উদ্ভব।

অদম্য শক্তি ও বিশেষ শাসনক্ষমতা সম্পন্ন নতুন শাসনকর্তার অধীনে আরেকটি সৈন্যদল পাঠিয়ে দেন। তিনি খারিজীগণদের পরাজিত করেন, নিহত করেন তাদের দলপতিকে, তাদের পলায়মান দলকে স্থান হতে স্থানান্তরে খুঁজে বেড়ান এবং কয়েক মাসের মধ্যেই বিক্ষুব্ধ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। ১৭০ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত পনের বছর তিনি আফ্রিকার শাসন ক্ষমতায় আসীন ছিলেন, পরবর্তীতে তাঁর পুত্র দাউদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৫৫ হিজরিতে মনসুর রফিকা নগরটি নির্মাণ করেন এবং প্রাচীর ও পরিখা দিয়ে পরিবেষ্টিত করেন কুফা ও বসরাকে। তিনি আদম শুমারীরও আদেশ প্রদান করেন।

রোমক সম্রাট তাঁর সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করেন এবং ভোগ করেন এক শোচনীয় পরাজয়। তাঁর করদানের অঙ্গীকারে নতুন সন্ধি সম্পাদিত হয়। ১৫৬ হিজরিতে মনসুর প্রাদেশিক শাসনকর্তৃত্বের বিলি-বণ্টন করেন নতুনভাবে এবং যথার্থভাবেই ইমাম হাসান (রা.)-এর বংশের জনৈক ব্যক্তিকে[১] মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

তিনি যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সাম্রাজ্য গড়ার কাজ করেছিলেন তাতে তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল এবং তিনি অনুভব করেন যে তাঁর জীবনের আর বেশি বাকি নেই। যুবরাজকে ডেকে তিনি সাম্রাজ্য শাসন সম্পর্কে তাঁর শেষ উপদেশ প্রদান করেন। তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীকে যেসব উপদেশ প্রদান করেন তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'যে কাজ আজ করতে হবে তা কখনো আগামীকালের জন্য ফেলে রেখো না।' 'জনসাধারণ ও সেন্যবাহিনীকে সন্তুষ্ট রেখো।' 'শাস্তিবিধানের ব্যাপারে কখনো সংযমের মাত্রা অতিক্রম করো না।' 'কখনো শূন্য করো না তোমার কোষাগার।' 'যা কিছু তোমাকে করতে হবে তা তুমি নিজেই করো।' 'কাজে তোমার যাবতীয় শক্তি নিয়োগ করো।' 'যাদের নিকট থেকে তুমি সৎ উপদেশ ও পরামর্শ পেতে পার তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবে।' 'তোমার বন্ধু ও আত্মীয়দের কখনো অবহেলা করো না।' 'অতি নিষ্ঠার সাথে সীমান্ত রক্ষা করো।' 'ধর্মপরায়ণতা ব্যতীত আর কিছুই খলিফাকে গুণান্বিত করে না, কর্তব্যপরায়ণতা ব্যাতীত আর কিছুই রাজার শোভা পায় না, ন্যায়পরায়ণতা ব্যাতীত আর কিছুতেই জনসাধারণের সংস্কার বিধান করা যায় না; এবং যে ব্যক্তি তার অধীনস্থ লোকজনের উপর অত্যাচর করে সে সবশেষে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য।' 'সম্যকভাবে চিন্তা না করে কোনো কাজে অগ্রসর হয়ো না, কারণ জ্ঞানী লোকের চিন্তা দর্পণস্বরূপ, যাতে তাঁর ভালো ও মন্দ প্রতিফলিত হয়।' 'কৃতজ্ঞতা দ্বারা বদান্যতা, ক্ষমা দ্বারা ক্ষমতা, মনোজয়ী স্নেহ দ্বারা আনুগত্য এবং মানুষকে বিনয় ও তিতিক্ষা দ্বারা বিজয় অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করো।'

---

১. জায়েদ।

মনসুরের মৃত্যু [৬ জিলহজ্জ, ১৫৮ হি.; অক্টোবর; ৭৭৫ খ্রি.]

পিতা ও পুত্রের মধ্যে মর্মস্পর্শী বিচ্ছেদের পর পিতার জীবনের অন্তিম দিনগুলো পবিত্রভূমি মক্কায় অতিবাহিত করার জন্য বাগদাদ ছেড়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন, কিন্তু যাত্রাপথে মক্কা থেকে কয়েক ঘণ্টার পথ বির মায়মুনা নামক স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্য শতাধিক কবর খনন করা হয় এবং সেগুলোরই একটিতে তাঁকে সমাহিত করা হয় অতি সঙ্গোপনে, যাতে কোথায় তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে তা যেন লোকে না জানতে পারে ।

মনসুর প্রায় বাইশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি ক্ষীণাকৃতি, দীর্ঘকায় ও সুশ্রী চেহারার মানুষ ছিলেন; জীবনযাপন এবং আচার-আচরণেও আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন। অশোভন বা অশ্লীল কোনো কিছুই কখনো তাঁর দরবারে দেখা যেত না। 'দিনের প্রথম ভাগের বেশিরভাগ সময় তিনি কাটাতেন ফরমান জারি, কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত, গিরি-সংকট ও সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থাপনা, রাস্তাঘাট সংরক্ষণ, প্রজাদের অবস্থা ও বাসস্থানের উন্নতি সাধন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে;[১] দিনের অপরভাগ কাটাতেন পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে, যাদের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। মাগরিবের নামাজের পর তিনি দিনের খবরাখবর শুনতেন এবং পরামর্শ নিতেন তাঁর মন্ত্রীবর্গদের, রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে তিনি বিশ্রামের জন্য অবসর নিতেন। তিনি খুব অল্প ঘুমোতেন এবং খুব প্রত্যুষে উঠতেন ফজরের নামাজের জন্য। তিনি নিজেই সৈন্যবাহিনী এবং দুর্গসমূহ পরিদর্শন করতেন; সর্বত্রই সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত থাকত উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম দিয়ে। তিনি ছিলেন কার্যনির্বাহী কর্মচারীদের হিসাবপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার ব্যাপারে অতি-সতর্ক, 'এমনকি দিরহাম ও শস্যের অণু-পরমাণু পর্যন্ত পরীক্ষা করতেন, এ জন্য তিনি 'আবুদ-দাওয়ানিক' বা 'আদ-দাওয়ানিকি'[২] উপাধি লাভ করেছিলেন।

এই স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেও তাঁর প্রজাদের সামনে আইন অনুযায়ী স্থাপিত বিচারবিভাগের প্রতি যথার্থ আনুগত্যের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। কয়েকজন উট-মালিকের অভিযোগক্রমে মদিনার কাজীর পরোয়ানা পাওয়ামাত্র তাঁর হাজিবকে সঙ্গে নিয়ে তিনি স্বয়ং সাধারণ বিবাদীর মতো উপস্থিত হন কাজীর সামনে। কাজী খলিফাকে অভ্যর্থনা জানাতে একবার উঠেও দাঁড়াননি। মামলার রায় হয় ফরিয়াদির পক্ষে এবং মনসুর এই বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে কাজীকে বিপুল অর্থ ও পারিতোষিক দান করে বিচারকের স্বাধীনতা ও নিষ্ঠাকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি রেখে যান একটি পরিপূর্ণ কোষাগার এবং নিজ পুত্রকে বলে যান যার পরিমাণ দশ বছরের ব্যয়-নির্বাহের জন্য যথেষ্ট।

---

১. ইবনুল আসির, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭।

২. দানিক হল দিরহামের এক ষষ্ঠাংশ।

অধ্যায়-১৬
আব্বাসীয় বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]
[১৫৮-১৭০ হিজরি; ৭৭৫-৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ]
মাহদী ও হাদী

মাহদীর সিংহাসন আরোহণ : তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ রাজত্ব–তাঁর মানবতাবোধ : জিনদিক সম্প্রদায় : রোমকদের সাথে যুদ্ধ : আইরিনের করদানে সম্মতি : মাহদীর মৃত্যু : হাদির সিংহাসন আরোহণ : মরিটানিয়া বিচ্ছিন্ন : হাদির মৃত্যুর

মহম্মদ, 'আল-মাহদী' (সুপথপরিচালিত) [১৫৮-১৬৯ হি.; ৭৭৫-৭৮৫]

মনসুরের স্থলাভিষিক্ত হন 'আল-মাহদী' উপাধিধারী তাঁর পুত্র মহম্মদ, যিনি মায়ের দিক থেকে ইয়েমেনের প্রাচীন হিময়ার রাজ-বংশোদ্ভূত।[১] মাহদীর নীতি ছিল তাঁর পিতার নীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বভাববতই তিনি দয়ালু ও মহানুভব ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই পিতার রূঢ় ও কঠোর শাসনের প্রতিকার সাধনে প্রয়াসী হন। হত্যার জন্য প্রাণদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত দাগী আসামী অথবা অমার্জনীয় অপরাধে কারাবাস যাপনকারীরা ছাড়া অন্য সমস্ত লোককে মুক্তি দিয়ে তিনি রাজত্বের সূচনা করেন। তিনি ইব্রাহিমের পুত্র হাসানকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং পর্যাপ্ত বৃত্তি প্রদান করেন। পবিত্র নগরদ্বয়কে (মক্কা ও মদীনা) ফিরিয়ে দেন তাদের পুরনো সুযোগ-সুবিধা, যেগুলো তাঁর পিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, সেই সাথে মিশর থেকে দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করার অনুমতি দেন। তিনি ফিরিয়ে দেন মনসুর কর্তৃক রসূলুল্লাহ (স.)-এর বংশধরদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তিও। বলপূর্বক অর্থ আদায় এবং তহবিল অপচয়ের অভিযোগে পদচ্যুত সরকারি কর্মচারীদের মনসুর সময় সময় গুরুতর জরিমানা করতেন। এগুলো জমা থাকত 'বায়তুল মাল-ইল-মাজালিম'[২] নামক এক পৃথক কোষাগারে, যাদের কাছে জরিমানা আদায় করা হয়েছিল তাদের নাম আঁটা থাকত ওই অর্থের সাথে। মাহদী এসব টাকা-পয়সা ফেরত দেন, এমনকি মৃত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারীবর্গকেও।[৩]

রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান কালে তিনি খ্যাতনামা মাসলামাহর প্রাসাদের পাশ দিয়ে গমন করেন। তাঁর পিতামহ মুহম্মদের প্রতি প্রয়াত যোদ্ধার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে তিনি মাসলামাহর বংশধর ও অনুচরদেরকে ডেকে পাঠান এবং মূল্যবান জায়গীরসহ ২০,০০০ দিনার পারিতোষিক বা বকশিস প্রদান করেন।

---

১. তাঁর মায়ের নাম উম্ম মুসা।
২. নির্যাতিতদের কোষাগার।
৩. বলা হয় যে, মনসুর তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রে মাহদীকে এসব অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেহেতু এতে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

১৬০ হিজরি

১৬০ হিজরিতে মক্কায় তাঁর হজ্জ পালন অভূতপূর্ব আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে সুসম্পন্ন হয়। তিনি প্রায় ৩০,০০০,০০০ দিরহাম দান হিসেবে বিতরণ করেন হিজাজের লোকদের মধ্যে এবং কেবল মক্কাতেই ১৫০,০০০ পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশে 'মসজিদ-ই-নববী' (মস্ক অব দ্য প্রফেট) পুনর্নির্মিত ও সুশোভিত হয়; প্রধান প্রধান নগরে বিদ্যমান বিদ্যালয় ও মসজিদগুলোকে করা হয় সম্প্রসারিত এবং যেখানে এর একটিও ছিল না সেখানে এগুলো নতুন করে নির্মাণ করা হয়। মাহদী মদিনার আনসারদের মধ্যে থেকে ৫০০ লোককে তাঁর দেহরক্ষী হিসেবে মনোনীত করে পিতার চেয়ে অধিকতর বিচক্ষণভাবে।[১]

তিনি কুষ্ঠরোগী ও ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ লোকদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করে দেন। সাফফাহর আমলে মক্কাগামী রাস্তায় কেবল কাদেসিয়া ও জুবালার মধ্যে (৩০০ মাইলের দূরত্ব) বিশ্রামাগার নির্মিত হয়েছিল। এরপর মাহদীর আদেশে সমুদয় রাস্তাকে পাকা ও প্রশস্ত করা হয়; পবিত্র নগরীদ্বয়ের (মক্কা ও মদীনা) সমস্ত গমনপথ জুড়ে কূপ ও জলাধারসহ বৃহৎ ও আরামদায়ক বাড়িঘর নির্মিত হয় এবং তীর্থযাত্রী ও পথিকদের নিরাপত্তার জন্য প্রহরী নিয়োগ দেয়া হয়।

দ্বিতীয় মারওয়ানের জনৈক পুত্র সিরিয়ায় বিদ্রোহ দেখাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। মাহদী তাঁকে কিছুকালের জন্য আটক রাখেন কারাগারে, তারপর মোটা রকম বৃত্তি দিয়ে মুক্ত করে দেন। রাজপ্রাসাদে মারওয়ানের বিধবা স্ত্রী মজুনার জন্য প্রকোষ্ঠ নির্ধারণ করে দেন মাহদীর রাজমহিষী খায়জুরান, যেখানে রাজপরিবারের সবাই তাঁর সাথে সম্মানজনক ও ভালো ব্যবহার করতেন। বলা হয় স্বামীর ওপর খায়জুরানের বিশেষ প্রভাব ছিল। ফলে তাঁর অভ্যর্থনাগৃহ সভাসদ, উচ্চ পদাধিকারী কর্মচারী এবং পদ বা অনুগ্রহ-প্রার্থীদের ভিড়ে পূর্ণ থাকত। সাফফাহর ভাইয়ের ছেলে হতভাগ্য ঈসাকে উত্তরাধিকারের দাবি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করতে রাজি করানো হয় এবং মাহদী তাঁর পর পর্যায়ক্রমে খিলাফতের আসনে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন খায়জুরানের গর্ভজাত তাঁর দুই পুত্র মুসা ও হারুনকে; উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁদের প্রতি যথাযথভাবে আনুগত্যের শপথও করানো হয়।

মুকান্না [১৫৮-১৬১ হিজরি]

মাহদীর রাজত্বকালে মূরের কবিতায় 'লালরুখ' বলে অভিহিত 'খোরাসানের অবগুণ্ঠনাবৃত পয়গম্বর' প্রতারক হাশিম বিন হাকিমের আবির্ভাব ঘটে। খোরাসানে সবসময়ই ধর্মসম্প্রদায়ের প্রাচুর্য ছিল এবং এ সময় উক্ত অঞ্চল ছিল এক অসাধারণ উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায়। হাশিম ছিলেন ছোটোখাটো আকৃতির ও অপ্রিয়দর্শন পুরুষ এবং

---

১. যদি তাঁর উত্তরাধিকারীরা এই রক্ষীদলকে বহাল রাখতেন তাহলে তুর্কী রক্ষীরা পরবর্তীকালে যে অনিষ্টকর প্রাধান্য লাভ করেছিল তা কখনোই সম্ভব হত না। কিন্তু পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধানরা বোধহয় মনসুর কর্তৃক অনুসৃত আরবদের মর্যাদা-হানিকর নীতির দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন; অথচ আরবরা তখনো নিজেদের মুসলিম বীরত্বের শিরোমণি বলে মনে করত।

নিজের কুৎসিত চেহারা আড়াল করতে তিনি সবসময় একটি সোনালি মুখোশ পরে থাকতেন। সে জন্যই তাঁকে 'মুকান্না' বা 'অবগুণ্ঠনাবৃত' নামে আখ্যায়িত করা হত। তিনি তাঁর অনুগামীদের শিক্ষা দেন যে, মানবজাতির মধ্যে আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে স্রষ্টা স্বয়ং মাঝে মাঝে অবতাররূপ পরিগ্রহ করেন; আদম (আঃ), নূহ (আঃ), আবু মুসলিম এবং তিনি নিজে আল্লাহর সেই অবতাররূপী। আর বিশ্বাসের মধ্যেই ধর্ম নিহিত, কর্মে নয়। তাঁর অন্য মতবাদগুলোও দারুণ বিপ্লবাত্মক এবং নীতিবিগর্হিত ছিল। বহুলোক তাঁর অনুসরণ করে এবং কিছুদিন তিনি রাজকীয় সেন্যবাহিনীকে উপেক্ষা করতে সমর্থ হন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত ও নিহত হন 'কিশ' নামক স্থানে।

জিনদিক মতবাদ

খ্রিস্টান ট্যাবোরাইটদের মতো মুকান্নার অনুগামীরা সাদা পোশাক পরিধান করত বলে তাদের 'মুবাইয়িদ'–'শ্বেতবস্ত্র পরিহিত' বলা হত। অনুরূপ খামখেয়ালী ও নীতি বিগর্হিত মতবাদ নিয়ে শীঘ্রই 'মুহাম্মির' বা 'লোহিতবস্ত্র পরিহিত' নামে এক নতুন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে কাস্পিয়ান সাগরের পুবদিকে জুরজাঁ নামক স্থানে এবং তারা সেখানে গোলযোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু তাদের দমন করতে কোনো অসুবিধা হয় না। মাজদক-এর প্রাচীন নিহিলিসটিক বা নাস্তিক্যপূর্ণ সাম্যবাদের সাথে ম্যানিকিয়ান মতবাদ মিশ্রিত হয়ে বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মাজদক খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে কিসরা নওশিরওয়ানের (মহান খসরু) আমলে বেঁচে ছিলেন। তিনি এক উৎকট ও ভয়ঙ্কর অরাজকতাপূর্ণ সাম্যবাদ প্রচার করেছিলেন। পারস্যরাজের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে এই সম্প্রদায় অবদমিত হয়েছিল। কিন্তু এতে বিষধর সাপ তাতে সামান্য আহত হয়েছিলমাত্র, নিহত হয়নি। এরপরে আত্মপ্রকাশ করেন ম্যানেস বা মনি[১] যিনি ছিলেন একজন দার্শনিক। মাহদীর রাজত্বকালে মাজদকের নিহিলিজম ম্যানেসের দর্শনের সাথে কম-বেশি মিশ্রিত হয়ে খোরাসানে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং তা পথ খুঁজে পায় পশ্চিম পারস্য ও ইরাকের বিভিন্ন জায়গায়। এতে সমাজের বন্ধন শিথিল হয়, শাসন কর্তৃত্ব দুর্বল এবং মানব-রিপুকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদত্ত হয়। এ মতের অনুসারীদের 'জিনদিক' বলা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ হল, তারা প্রকাশ্যে রাস্তা থেকে শিশুদের অপহরণ করত। এটি সত্য হোক-বা-নাহোক, বাক্‌চাতুর্যের আড়ালে জিনদিকরা বাহ্যিক আনুগত্যের ভান করে গোপনে সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করছিল। মাহদী এসব নিহিলিস্টদের প্রতি কোনো অনুকম্পা প্রদর্শন করেননি; তাদেরকে নির্দয়ভাবে অনুসরণ করা হয় এবং তাদের প্রতি নৈতিকতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও শাসন কর্তৃত্বের শত্রু বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

---

১. ম্যানিকিয়ান কথাটির উদ্ভব হয়েছে ম্যানেস থেকে।

বাইজান্টাইন আক্রমণ

১৬৩ হিজরিতে (৭৭৯-৭৮০ খ্রিস্টাব্দ) বাইজান্টাইনরা মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে এবং সীমান্ত প্রদেশের বহুদূর পর্যন্ত ধ্বংসাত্মক লুঠতরাজ চালায়। তারা মার'আশ (জার্মানিসিয়া) অধিকার করে নেয় এবং লোকজনকে মেরে ফেলে সেটিকে ভস্মীভূত করে। হাসান বিন কাহতবার আগমনে তারা পশ্চাদপসরণ করে এবং তিনি স্বয়ং প্রতিশোধ গ্রহণ করেন কয়েকটি রোমান শহর ধ্বংস করে। একটি নতুন আক্রমণের মোকাবেলায় মাহদীকে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হতে হয়। তাঁর পুত্র মুসাকে বাগদাদে অন্তবর্তীকালীন রাজপ্রতিনিধি হিসেবে রেখে তিনি মসুল হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অভিযান শুরু করেন। আলেপ্পোকে করা হয় রাজকীয় বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র এবং ঈসা বিন মুসা, আবদুল মালিক বিন সালেহ ও হাসান বিন কাহতবা প্রমুখ সেনাপতিবৃন্দসহ হারুনকে পুরোগামী রূপে রোমকদের সামনে বিরোধিতার জন্য পাঠানো হয়। ইয়াহিয়া বিন খালিদ হন সেন্যবাহিনীর সহযোগী সেনাধ্যক্ষ। সামালিয়ন ও অন্যান্য স্থান হয় আত্মসমর্পণ করে, নয়তবা অধিকৃত হয় বলপূর্বক আক্রমণে। অতঃপর মাহদী তীর্থ সম্পাদনের জন্য জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হন। আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানসহ পশ্চিমাঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয় হারুনকে। সাবিত বিন মুসাকে তাঁর অর্থসচিব করা হয়, অন্যদিকে ইয়াহিয়া বিন খালিদকে মন্ত্রীর কার্যভার দেয়া হয়। কিন্তু রোমকদের অস্থিরতা শান্তি স্থাপন করতে দেয় না।

৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ

'মেগাথাকোমিস' নামে অভিহিত এক সেনাপতির নেতৃত্বে রোমক বাহিনী আবার আরব রাজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং চারদিকে চালাতে থাকে ধ্বংসযজ্ঞ। হারুন দ্রুত অগ্রসর হন আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে। হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে রোমকরা ছত্রভঙ্গ হয় এবং আরব বাহিনী কনসট্যান্টিনোপলের দিকে অভিযান শুরু করে। চতুর্থ লিওর বিধবা রানী আইরিন, যিনি পুত্র ষষ্ঠ কনস্ট্যান্টাইনের নামে বাইজান্টিয়ামের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষাই প্রেরণা জুগিয়েছিল এই নতুন যুদ্ধে, তিনি এবার বসফোরাস উপকূলে আরবদের শিবিরাগ্নি প্রজ্বলিত হতে দেখেন। আর একবার গুরুতর পরাজয়ের পর আইরিন আবেদন করেন শান্তির জন্য, বিজয়ী সেনাদলের প্রত্যাবর্তনে পথপ্রদর্শক ও রসদ সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণ বাৎসরিক করদানে সম্মত হওয়ায় তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়।

১৬৮ হিজরিতে (৭৮৪-৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ) মরুভূমিতে বিচরণরত যাযাবরদের মধ্যে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা কাফেলা লুণ্ঠন করে, 'ত্যাগ করে নামাজ' এবং তীর্থযাত্রীদের প্রতি ঘৃণ্য ব্যবহার করে। বিদ্রোহ দমন করা হলেও অপরাধীদের প্রতি খুবই উদার আচরণ প্রদর্শন করা হয়েছিল বলে মনে হয়।

করেছিলেন নতুন নতুন নগরী নির্মাণ; সড়ক, সরাইখানা, খাল ও ফোয়ারা তৈরি; দাতব্য ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গঠন; জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ ও নিরাপত্তা প্রদান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও সবরকম সুস্থ শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে। রাজ্যজয়ের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছিল। সিডিলট বলেন, 'রণলিপ্সা পরিহার করতে গিয়ে আব্বাসি খলিফারা তাঁদের যুগধর্মেরই অনুসরণ করেছিলেন; পূর্বদেশিয় আরবরা সভ্যতার উপকারিতা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল এবং সুনিয়ন্ত্রিত প্রশাসন প্রদান যথোপযুক্ত বিচারব্যবস্থা স্থাপনে শিক্ষাবিস্তার ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশকে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্কে আবদ্ধ করে বাগদাদের অধিপতিরা জনমতের অনুকূলেই সায় দিয়েছিলেন।'

আবু জাফরের চরিত্র

দোষে-গুণে মিশ্রিত ছিল আবু জাফরের চরিত্র। রাজনীতিবিদ, প্রশাসক এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। দূরদর্শিতা গুণে বা জনকল্যাণে মনোযোগ প্রদানে তিনি কারো চেয়ে কম ছিলেন না। পিতা হিসেবে তিনি ছিলেন সন্তান-বৎসল। তা সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে তিনি একাধারে বিশ্বাসঘাতক ও নৃশংস হত্যাকারী ছিলেন। সাফফাহর নিষ্ঠুরতা ছিল প্রবল প্রতিহিংসাজাত; কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীর হত্যাকাণ্ড শত্রু-মিত্র বিবেচনা করে দেখতেন না। তিনি বিবেকহীন ছিলেন বলে, অতি নির্মম, শত্রু-মিত্র বাছাইকারী এবং নিজের বা বংশের পক্ষে কাউকে সামান্য বিপজ্জনক মনে করলে তাকেও রেহাই দিতেন না। খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর বংশধরদের প্রতি তাঁর আচরণ আব্বাসিদের ইতিহাসে কালো অধ্যায় রচনা করেছে। সুয়ুতী বলেন, 'মনসুরই প্রথম আব্বাসি ও আলী (রা.)-এর বংশধরদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেন, কারণ পূর্বে তারা ছিলেন একতাবদ্ধ।'

আবদুল্লাহ বিন আলির বিদ্রোহ [সফর ১৩৭ হি.; নভেম্বর ৭৫৪ খ্রি.]

তিনি সাফফাহর মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র দ্রুত কুফায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাজত্বের শাসনভার গ্রহণ করেন 'আল-মনসুর' বা বিজয়ী উপাধি ধারণ করে। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করতে-না-করতেই তাঁর পিতৃব্য সাফফাহর আমলে সিরিয়ার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ বিন আলি বিদ্রোহ করেন। এখন থেকে আমরা তাকে 'মনসুর' নামেই অভিহিত করব, আবু মুসলিমকে নির্দেশ দেন বিদ্রোহ দমন করতে। নাসিবিন নামক স্থানের সন্নিকটে এক তুমুল যুদ্ধের পর আবু মুসলিম আবদুল্লাহ বিন আলিকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন, তিনি সপরিবারে বসরায় পালিয়ে যান তাঁর ভাই সুলায়মানের কাছে এবং শাসন কর্তৃত্ব থেকে সুলায়মানের অপসারণ পর্যন্ত সেখানে অজ্ঞাতবাস করলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ও তাঁর বড় দুই ছেলে পতিত হন মনসুরের কবলে এবং হাশমিয়াহর[১] অনতিদূরে এক দুর্গে বন্দী হন। কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করা হয় 'জাব' যুদ্ধের বিজয়ীকে রাজধানীর এত নিকটে রাখা।

---

১. হাশমিয়াহ বা মদিনাতুল হাশমিয়াহ হল কুফার অনতিদূরে সাফফাহ কর্তৃক নির্মিত হাশিমা গোত্রের নগরী।

আবদুল্লাহ বিন আলির মৃত্যু

তাঁর জন্য একটি নতুন বাড়ি তৈরি করা হয় লবণের ভিত্তির ওপর এবং আবদুল্লাহকে মহাসমারোহে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর প্রথমেই প্রবল বৃষ্টিতে ভিত ধসে যায় এবং হতভাগ্য বন্দী বিধ্বস্ত বাড়ির তলায় চাপা পড়ে প্রাণ হারান। আর এ পরিণাম তাঁর যথার্থই প্রাপ্য ছিল—উমাইয়াদের প্রতি বর্বর আচরণের জন্য।

আবু মুসলিম নাসিবিনের যুদ্ধের পর তাঁর শাসনকেন্দ্র খোরাসানে স্থানান্তর করতে চাইলেন, কার্যত তিনি যেখানে রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন। প্রদেশে তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা ছিল এবং নিশ্চিতভাবেই তিনি আব্বাসিদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন বিপদের কারণ হিসেবে। তাঁর বিপুল সংখ্যক অনুচর ছিল এবং ছিল কিছু উপদলও, যারা তাঁকে নবী বলে মনে করত। তিনি যেমন আব্বাসি বংশকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তেমনি তা ধ্বংসও করতে পারতেন নিজের আঙ্গুলের ইশারায়। তাঁর আচরণও কঠোর ও অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। নাসিবিনে রাজদূত লুণ্ঠিত বস্তুর তালিকা প্রস্তুত করতে এলে বিচক্ষণ রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি তাঁর উক্তি মোটেই সম্মানজনক বা বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। এমন বিপজ্জনক ব্যক্তিকে অপসারণ করাই এবার হয়ে ওঠে মনসুরের প্রথম লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁকে খোরাসানে ফিরে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়াই সমীচীন হবে বলে মনে করে; কারণ সেখানে তিনি নিজের ভক্ত ও অনুচরদের মধ্যে গিয়ে পড়বেন। তাঁকে সিরিয়া ও তাঁর অধীনস্থ সমগ্র অঞ্চলের শাসনভার দেয়ার প্রস্তাব করা হয়; কিন্তু এভাবে ফাঁদে পড়ার লোক ছিলেন না আবু মুসলিম। তিনি ছিলেন অতিশয় সুচতুর ও সতর্ক। যে সৈন্যদলের সাহায্যে আবদুল্লাহ বিন আলিকে দমন করেছিল তাদের নিয়ে তিনি খোরাসানের দিকে যাত্রা করতে উদ্যত হলেন। মনসুরের পক্ষে তাঁকে বাধা দেয়া ছিল অসম্ভব; অতএব তিনি প্রিয় অস্ত্রটির সাহায্য গ্রহণ করেন। যেসব লোক অন্যের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে, অনেক সময়ই তারা সহজেই তার শিকারে পরিণত হয়। আবু মুসলিম তাঁর যাত্রা স্থগিত রাখেন, মনসুরের নামে দেয়া প্রভূত প্রতিশ্রুতিতে প্রলোভিত হয়ে অতঃপর দরবারে হাজির হন।

আবু মুসলিমের মৃত্যু [১৩৭ হিজরি]

যথাযথ সম্মানের সাথে তিনি অভ্যর্থিত হন এবং তাঁর প্রতি প্রায় রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হয় বেশ কিছুদিন। প্রাসাদে অবস্থানকালে কোন এক অশুভ দিনে তাঁর দেহ-রক্ষীদেরকে নিরস্ত্র করা হয় এবং রাষ্ট্রপ্রধানের সামনেই তিনি নিহত হন।

আবু মুসলিম যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মনসুর নিজেকে সিংহাসনে নিরাপদ মনে করতে পারেননি; এবার তিনি নিজেকে প্রকৃত শাসক বলে অনুভব করেন এবং নতুন রাজধানীর জন্য নতুন স্থান খুঁজতে শুরু করেন। দামাসকাসের প্রতি আব্বাসিদের কেবল আকর্ষণের অভাবই ছিল না, বরং স্থানটি ছিল বিপজ্জনক, অন্যদিকে বসরা ও কুফার লোকদের অনিশ্চিত ও চঞ্চল গতিবিধি ওই নগরীগুলোকে রাজধানী হওয়ার অনুপযুক্ত

করে তুলেছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর নদীপথে বসরা থেকে ছয় দিনের সফর শেষে তিনি স্থান নির্বাচন করেন, যেখানে এখনকার বাগদাদ নগরী অবস্থিত।

বাগদাদ ছিল বিখ্যাত পারস্য সম্রাট কিসরা নওশিরওয়ানের গ্রীষ্মাবাস এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তাঁর যে সুখ্যাতি ছিল তা থেকেই এর নাম হয়েছে 'ন্যায়বিচারের উদ্যান'। পারস্য সাম্রাজ্যের অধঃপতনেরর সাথে সাথে ধ্বংস হয়েছে বিখ্যাত উদ্যানটিও, এশিয়ার অধিপতি যেখানে বসে তাঁর অসংখ্য প্রজার প্রতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর ন্যায়বিচার সম্পাদন করতেন। কিংবদন্তীতে নামটুকু রয়ে গেছে এখনও। কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং স্বাস্থ্যকর এই মনোরম স্থানটি মনসুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেকালের শ্রেষ্ঠ স্থপতিদের যাদুকরিস্পর্শে তরঙ্গায়িত সমুদ্র-দেবতার মতো আত্মপ্রকাশ করে খলিফাদের গৌরবময় এই নগরী।

বাগদাদ

টাইগ্রিস নদীর পশ্চিম তীরে স্থাপিত হয় মনসুরের বাগদাদ নগরী। কিছুদিন পরই খেলাফতের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী মহামান্য যুবরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব তীরে গড়ে ওঠে আরেক নগরী—এক নতুন বাগদাদ এবং তাঁর নামেই শহরটির নামকরণ হয় মাহ্‌দিয়াহ। সুরম্য স্থাপত্য শৈলীতে এই নতুন নগরী 'মনসুরিয়া'র (মনসুরের নগরী) সৌন্দর্য ও জাঁকজমকের সাথে পাল্লা দেয়। পশ্চিম এশিয়ার ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে প্রবাহিত চেঙ্গিস খানের বিধ্বংসী সেনাদল আরব সভ্যতার প্রতিটি চিহ্ন বিলীন করার আগের গৌরবময় দিনগুলোতে সুদৃশ্য ও জমকালোভাবে বাগদাদ বিদ্যমান ছিল—ছিল ইসলামী খলিফাদের উপযুক্ত রাজধানী। নগরটি ছিল বৃত্তাকার এবং চারদিকে দুই-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। রাজপ্রাসাদের অবস্থান ছিল কেন্দ্রস্থলে, রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে ছিল জুমা মসজিদ। সেনাবাহিনী পরিদর্শনের জন্য সংরক্ষিত স্থান ছাড়িয়ে রাষ্ট্রের প্রধান কর্মচারীদের অট্টালিকাগুলো অবস্থিত ছিল। রাস্তাগুলো ছিল সুবিন্যস্ত এবং চল্লিশ হাত চওড়া। বাজার বা দোকানগুলো ভবঘুরে ও সন্দেহজনক চরিত্রের লোকজনের আড্ডায় পরিণত হত বলে সেগুলো প্রাচীরের বাইরে স্থাপন করা হয়েছিল; কিন্তু প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে ছিল পুলিশ-প্রহরায় বিশেষ ধরনের খাদ্য-বিক্রেতারা ছিল। সেনানিবাসগুলো ছিল নদীর পূর্ব পাশে এবং সেগুলো তিনটি বিভাগে বিভক্ত—একটি মুদারবংশীয়, অন্যটি ইয়েমেনি এবং তৃতীয়টি খোরাসানি সৈন্যদের জন্য। এই অঞ্চলগুলো প্রতিটি একে অপরের সম্পর্কে সংযত থাকত। নগরাভিমুখে ছিল সুউচ্চ বুরুজবিশিষ্ট অনেকগুলো তোরণ, যেগুলোতে সেনারা দিনরাত পালাক্রমে পাহারা দিত।

খোরাসানে বিদ্রোহ [১৪১ হি.] : বাইজান্টাইন আক্রমণ

বাগদাদের নির্মাণ কাজ শেষ হতে ১৫০ হিজরি (৭৬৭-৬৮ খ্রি.) পর্যন্ত সময় লেগেছিল। ইতোমধ্যে ঘটে যায় নানা ঘটনা, আর সবগুলোই কার্যত মনসুরের জন্য সাফল্য নিয়ে

আসে। আবু মুসলিমের হত্যার ফলে খোরাসানে তাঁর অনুগামীরা[১] বিদ্রোহ করে, কিন্তু তারা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়। যে রাওয়ান্দিয়া[২] সম্প্রদায় আব্বাসি খলিফাদের স্রষ্টার অবতার বলে মনে করত, আর এ সময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে হাশিমিয়ায়। এই বিদ্রোহের ফলে বাস্তবিকই মনসুরের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্প্রদায়কে বহিষ্কার করা হয় নগর থেকে। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে একটি বাইজান্টাইন আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের সম্রাট বাধ্য হন সাত বছরের যুদ্ধ বিরতির শর্তে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করতে। এরপর মনসুর খ্রিস্টান আক্রমণকারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোর পুনরুদ্ধার, বিনষ্ট ও পরিত্যক্ত নগরগুলোর পুনর্বাসন এবং যথোপযুক্তভাবে সীমান্ত প্রতিরক্ষা করতে মনোনিবেশ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই প্রদেশগুলো সফর করেন এবং হাসান বিন কাহতবাকে[৩] বিশাল সেনাবাহিনীসহ পাঠিয়ে দেন কাপাডোসিয়ায়। মালাতিয়া (Melitene), ম্যাসিসা (Mopsuesta) এবং আরো অনেক নগরী এভাবে পুনর্নির্মিত, পুনর্বাসিত এবং সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত হয়। বাইজান্টাইন আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ক্লডিয়া এবং সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য স্থানে নতুন নতুন দুর্গ নির্মিত হয়।

তাবারিস্তান অধিকার [১৪২-৩ হিজরি; ৭৫৯-৭৬০ খ্রি.]

কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত তাবারিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীগণ তখনো ছিল প্রাচীন ধর্মানুসারী এবং তারা নিজেদের সর্দারগণের দ্বারা নামমাত্র খলিফার অধীনে শাসিত হত। হঠাৎ তারা আরবদের ওপর চড়াও হয় এবং হত্যা করে তাদের বহুসংখ্যক লোককে। ফলে অভিযান চালানো আবশ্যক হয়ে ওঠে। স্থানীয় সর্দাররা নিহত কিংবা বিতাড়িত হন এবং তাবারিস্তান ও গীলান নিশ্চিতভাবেই আব্বাসি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ বিজয় সম্পন্ন হতে-না-হতেই প্রাচীন ম্যাগিয়ান ধর্মাবলম্বী এবং নামমাত্র মুসলিম শাসনাধীন দায়লমের[৪] অধিবাসীবৃন্দ আরব রাজ্যে হানা দেয়।

---

১. মাস'উদী বলেন, আবু মুসলিমের অনুগামীরা নিজেদের নিয়ে 'খুররামী' নামে একটি সম্প্রদায় গঠন করেছিল। এরা তাঁকে ইমাম ও মুক্তিদাতা বলে গণ্য করত এবং এরা বিস্তার লাভ করেছিল প্রধানত খোরাসান ও আগের পার্বত্য অঞ্চলে। আবু মুসলিমের মৃত্যুর পর তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে; একদল বিশ্বাস করত যে তিনি এখনো জীবিত এবং পৃথিবীতে ন্যায়বিচার স্থাপন করতে শীঘ্রই আবার আত্মপ্রকাশ করবেন; অন্যদলের বিশ্বাস ছিল, সত্যিই তাঁর মতো হয়েছে এবং ইমামত বর্তেছে তাঁর কন্যার ওপর। বিদ্রোহের নেতা সানফাদ ছিলেন এই দলের অন্যতম প্রধান সমর্থক। তব ইবনুল আসির ও মীরখন্দ বলেন, তিনি ছিলেন ম্যাগিয়ান।

২. রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় মনসুরকে 'খাদ্য ও পানীয়দাতা ঈশ্বর' বলে মনে করত। তাঁর প্রধান দেহরক্ষীকে মনে করত জিবরাইল ফেরেশতার (দেবদূত গ্যাব্রিয়েল) অবতার। তাদের অনভিপ্রেত ও নাস্তিকতাপূর্ণ উন্মাদনায় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, যার ফলে মনসুর তাদের অনেককে বন্দী করেন, আর সে জন্যই ঘটে বিদ্রোহ, সে যাত্রা মনসুরের জীবনরক্ষা হয় মা'য়ান বিন জায়দাহ (উদারতার জন্য বিখ্যাত) নামে মারওয়ানের এক অনুচরের দ্বারা, যার মাথার জন্য আব্বাসীরা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। এই ঘটনার পর তিনি কেবল অনুগ্রহভাজনই হন না, যথাক্রমে ইয়ামামা ও সিজিস্তানের শাসনকর্তাও নিযুক্ত হন।

৩. পূর্বে দৃষ্টব্য, পৃ. ১৭২।

৪. কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে উত্তর গীলানের পার্বত্য অঞ্চল। পরবর্তী আব্বাসীদের আমলে দায়লমীদের সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারব।

কিছুদিন কঠোর যুদ্ধের পর তারা বিতাড়িত হয় এবং সতর্কতার সাথে সামরিক ঘাঁটিগুলো স্থাপিত হওয়ায় তাদের পরবর্তী আক্রমণগুলোও প্রতিহত হয়।

১৪৩ হিজরি; ৭৬০-১ খ্রিস্টাব্দ

হিজরি ১৪৩ সালে প্রাদেশিক শাসনকর্তৃত্বের পুনঃবন্টন করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদেশের সকল ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রবর্তিত হয় সংবাদ লেখক নিয়োগের প্রথা। গোয়েন্দা ও গুপ্তচরদের এত শাখা বিস্তার যে কোনো আধুনিক সরকারকে হার মানাবে, রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দল-বৃদ্ধির ব্যাপারে লক্ষ রাখতে তাঁকে সাহায্য করলেও নিশ্চিতভাবেই তা জনসাধারণের মধ্যে নিরাপত্তার ভাব বৃদ্ধি করতে পারেনি।

বনু হাসান–তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার [১৪৪ হি.; ৭৬১ খ্রি.]

আমরা এখন এই অসাধারণ রাজপুরুষের জীবন-ইতিহাসের এমন এক অধ্যায়ে উপনীত হব যাতে তাঁর মহৎ হৃদয় কিংবা ক্ষমাশীল স্বভাবের কিছুই প্রতিফলিত হয় না। পরবর্তী ঘটনাসমূহ সম্যক উপলব্ধি করতে হলে এ সময় হযরত আলি (রা.)-এর বংশধরদের[১] অবস্থার দিকে কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। পঞ্চম খলিফা হাসানের[২] বংশধরগণ বনু হাসানরা এযাবৎকাল রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি এবং বারবার দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও কখনোই প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেষ্টা করেননি। স্বগোত্রীয় আব্বাসি বংশধররা যে রাজনৈতিক উত্তেজনায় লিপ্ত ছিল তা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে দাঁড়িয়ে ইমাম হুসাইন (রা.)-এর[৩] পুত্র দ্বিতীয় আলির বংশধররা সাহিত্য ও দর্শন চর্চায় আত্মনিয়োগ করে ততোধিক নিরিবিলি জীবন-যাপন করছিলেন। জায়েদ ও তাঁর পুত্র নিষ্ঠুর ও নির্মম ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে হিশাম ও দ্বিতীয় ওয়ালিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং তাঁদের প্রাণ হারান। বনু হাসান ও বনু হুসাইন মদিনায় বাস করতেন, যেখানে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ হত তাদের জন্য রেখে যাওয়া সামান্য সম্পত্তির আয় দিয়ে। আর সাথে ব্যবসার লভ্যাংশ বা ততোধিক অনিশ্চিত শিক্ষাদানের সংযোজিত আয় থেকে। তবে অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিবিহীন হওয়া সত্ত্বেও নগরবাসীদের নিকট তাঁরা সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম তিন খলিফা, জুবাইর এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর অন্যান্য প্রধান সহচরদের বংশধররাও এখানে বসবাস করতেন, তাঁরা সকলেই নানাদিক দিয়ে ছিলেন আলাবীগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শেষোক্তদের প্রভাব এবং অর্জিত শ্রদ্ধা মনসুরের দুর্বোধ্য ও সন্দিগ্ধ স্বভাবকে বিচলিত করে তোলে এবং মারওয়ানের বংশ যে অবলীলাক্রমে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল, নিজের বংশ সম্পর্কেও তিনি একই আশঙ্কা করছিলেন। কোনো ষড়যন্ত্র দানা বেধেছে কিনা তা আবিষ্কার করতে তিনি বিভিন্ন গুপ্তচর

---

১. আলাবী (অ্যালাইড), অর্থাঃ হযরত আলি (রা.)-এর বংশধর।

২. প্রথম হাসান (রাঃ)। বংশের অনুগামীদের কাছ থেকে তিনি 'মুজতবা' (সুনির্বাচিত) উপাধি লাভ করেছিলেন।

৩. কারবালার শহীদ।

পদ্ধতির আশ্রয় নেন; গুপ্তচরদের এই পরামর্শ প্রদান করা হয় যে, তারা যেন সুকৌশলে আলাবীদের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে এবং তাঁদেরকে প্ররোচিত করে অসতর্কভাবে কথাবার্তা বলতে, যাতে পরে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পটভূমি রচনা করা সহজ হয়। কিন্তু মনসুরের রাজত্বকালে আলাবীদের প্রতি অত্যাচারের এটিই একমাত্র কারণ ছিল না। উমাইয়া খিলাফত যখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ছিল তখন রসূলুল্লাহ (স.)-এর বংশ স্বাভাবিকভাবেই সে ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিল। এ উপলক্ষে মদিনায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যাতে স্বয়ং মনসুরসহ বনু হাশিমের অধিকাংশ লোকজনই উপস্থিত ছিলেন।[১]

আন-নাফস-উদ্-জাকিয়া–'পবিত্র আত্মা'

ঐ সমাবেশে বনু হাশিমের প্রায় সকল লোক উপস্থিত ছিল। এ সমাবেশে বনু হাসানের নেতা বলে স্বীকৃত হাসানের প্রপৌত্র[২] তাঁর পিতা জীবিত থাকা সত্ত্বেও খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। তাঁর মহৎ ও পবিত্র চরিত্র, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ পর্যায়ের গুণাবলির জন্য তিনি 'আন্-নাফস-উদ্-জাকিয়া' বা 'পবিত্র আত্মা' উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর যোগ্যতা ও অগ্রগণ্যতা বিষয়ে সবাই একমত ছিল এবং আবু জাফর-সহ সভার সবাই তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তা সত্ত্বেও আমরা দেখেছি খেলাফত শেষ পর্যন্ত কিভাবে আব্বাসীয়দের হস্তগত হয়েছিল। মনসুর যখন খেলাফতের মসনদে আসীন হন তখন ঐ অবিস্মরণীয় শপথের স্মৃতি তাঁর জীবনকে অন্ধকারময় করে তোলে এবং সন্দেহকে ঘনীভূত করে তোলে। বনু হাসানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ জানিয়ে গুপ্তচররাও তাঁর মনকে বিষিয়ে তোলে। তিনি মুহম্মদ ও তাঁর ভাই ইব্রাহিমকে বন্দী করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁরা পালিয়ে যান। তারপর বৃদ্ধ পিতা আব্দুল্লাহসহ পরিবারের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকেই গ্রেফতার করেন এবং সেইসাথে খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর বংশধরদের নেতা মুহম্মদ আল-উসমানীকেও,[৩] (যাঁর কন্যার সাথে ইব্রাহিমের বিয়ে হয়েছিল) শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাঁদের কুফায় পাঠানো হয় এবং বন্দী করা হয় হুবাইরার দুর্গে। মুহম্মদ আল-উসমানী সিরীয়দের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন বলে তাঁর মতো একজন লোককে আব্বাসী সিংহাসনের জন্য বিপজ্জনক মনে করা হয়। তাঁকে বেত্রাঘাত করে ঠেলে দেয়া হয় মৃত্যুর দিকে। অন্যদের প্রতিও এতই নিষ্ঠুর আচরণ করা হয় যে, হতভাগ্য ভুক্তভোগীরা স্বীকার করেন উমাইয়া আমলে তাঁরা অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যবহার পেয়েছিলেন। এবার মুহম্মদ ও ইব্রাহিমের অনুসন্ধান করা হয় চতুর্দিকে। জলপথগুলোতে অনুসন্ধানের জন্য গুপ্তচর হিসেবে বেদুইনদের নিয়োগ করা হয়; প্রতিটি গণ্ডগ্রাম থেকে সম্ভাব্য আশ্রয়স্থান—সর্বত্রই চলল পলাতকদের তল্লাশী এবং তাদেরকে আশ্রয় দিতে পারে এমন সন্দেহজনক প্রত্যেক ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করে বেত্রাঘাত করা হয়।

---

১. ধর্মগুরু ইমাম জাফর আস-সাদিক উপস্থিত ছিলেন না।

২. হযরত আলি (রা.)-এর পুত্র ইমাম হাসান (রা.), তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হাসান (মুসসানা), তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ, তাঁর পুত্র মহম্মদ।

৩. খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর পুত্র উমর, তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ, তাঁর পুত্র মহম্মদ।

মুহম্মদ ও ইব্রাহিম আল-হাসানীর আত্মপ্রকাশ

বিতাড়নের ফলে উপায় খুঁজে না পেয়ে মুহম্মদ তাঁর ভাই ইব্রাহিমকে আহওয়াজ ও বসরায় বিদ্রোহ পতাকা উত্তোলন করতে পাঠান এবং অন্যদিকে তিনি স্বয়ং মদিনায় আত্মপ্রকাশ করেন। বসরা ও মদিনায় একযোগে মনসুরের পদচ্যুতি ঘোষণা করার কথা ছিল। এই পরিকল্পনা কার্যকরি হলে সম্ভবত আব্বাসীয় শাসনের অবসান ঘটত। কিন্তু আপন ভাইয়ের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই মুহম্মদ বাধ্য হন নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করতে; আর এভাবেই মনসুর তাঁদেরকে পর্যায়ক্রমে আক্রমণ করার সুযোগ পান।

মুহম্মদ প্রথমে তাঁর সামনে থেকে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অপসারণ করেন। তারপর মদিনায় মনসুরের প্রতিনিধি ধরা পড়েন ও বন্দী হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র হিজাজ ও ইয়েমেন মুহম্মদকে গ্রহণ করে ইসলামের খলিফা হিসেবে। সুন্নীদের মধ্যে দুটি মহান বিধানের প্রবর্তক ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক মুহম্মদের দাবির বৈধতার সপক্ষে মতপ্রকাশ করেন। আন্দোলনটিকে আশাতীতরূপে বিপজ্জনক দেখতে পেয়ে মনসুর আশ্রয় নেন তাঁর অভ্যাসগত ছল-চাতুরির। তিনি 'আন্ নাফস-উদ্-জাকিয়া'কে পরিপূর্ণ অভয় 'আমান', ইচ্ছেমতো বসবাসের অনুমতি, মোটা অংকের ভাতা এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসীম অনুগ্রহ প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি চিঠি লেখেন। এর জবাবে মুহম্মদ বলেন, যেহেতু তিনিই খেলাফতের প্রকৃত অধিকারী সেহেতু ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন তাঁরই কাজ এবং পরিশেষে জানতে চান, মনসুর আবু মুসলিম, আবদুল্লাহ বিন আলি এবং ইয়াজিদ বিন হুবাইরাকে যে অভয় প্রদান করেছিলেন এটিও সেই ধরনের কিনা। এর প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত মর্মাহত মনসুর পাল্টা নালিশ জানিয়ে 'নাফস-উদ্-জাকিয়া'কে একটি লম্বা চিঠি লেখেন, যাতে লেখা হয় আব্বাসিয় রাজবংশ শেষ পর্যন্ত কোন কোন নীতির ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছে। তিনি যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন তা অগ্রাহ্য করেন এবং বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, যেহেতু রসূলুল্লাহ (স.) কোনো পুত্র সন্তান না রেখে প্রয়াত হয়েছেন সেহেতু তাঁর কন্যার সন্তানরা তাঁর উত্তরাধিকারী হতে পারেন না, এই উত্তরাধিকার তাঁর পিতৃব্য আব্বাসের বংশধরগণের ওপর বর্তায়। বিরাট সেনাবাহিনীসহ মনসুর তাঁর ভাইপো ঈসাকে দ্রুত পাঠিয়ে দেন নাফস-উজ-জাকিয়াকে দমন করতে। যুদ্ধের আগে মুহম্মদ তাঁর অনুগামীদের বলে দেন যে, তাদের নিজেদের ইচ্ছেমতো চলে যেতে বাধা নেই কিংবা বাধা নেই তাঁর সঙ্গে থাকতেও; এতে তাঁর অধিকাংশ সমর্থক যারা তাদের পরিবার-পরিজনদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, তারা চলে যায় নিজ নিজ বাড়িতে এবং মনসুরের বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করতে তাঁর সঙ্গে তিনশ' জন লোক থেকে যায়।

মুহম্মদ নিহত [১৫ রমজান, ১৪৫ হি.; ৭৬২ খ্রি.]

বীরোচিত যুদ্ধের অবসান ঘটে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে; তাঁর অনুগামীরাও নিঃশেষে নিহত হয় এবং প্রথামতো তাদের লাশগুলোকে ঝোলানো হয় ফাঁসিকাষ্ঠে। নবী-পরিবারের একজন মহিলা তাদেরকে সমাধিস্ত করার জন্য ঈসার অনুমতি পান এবং তাদেরকে কবর দেয়া হয় মদিনার নিকটবর্তী 'শহীদী কবরস্থানে'।

ইব্রাহিম তাঁর ভাইয়ের অসময়ে বিদ্রোহে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও ইব্রাহিম এক বিরাট সেনাদল সংগ্রহে সমর্থ হন, যার সাহায্যে বহুবার তিনি মনসুরের বাহিনীকে পরাজিত করেন। পরিশেষে আব্বাসীয়দের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে ওঠে যে তিনি (মনসুর) কুফা থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নেন। নিরুপায় হয়ে তিনি ঈসাকে পাঠান ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে। ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সংঘটিত এক যুদ্ধে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আব্বাসিয় বাহিনী বিতাড়িত হয়; কিন্তু অবশেষে মানবতাবোধ সম্পর্কে 'আলাবী'দের সতর্কতায় আবার নস্যাৎ হয় তাঁদের স্বার্থ।

ইব্রাহিম নিহত [২৪ জিলক্বদ, ১৪৫ হি.]

শত্রুকে পলায়নরত দেখে ইব্রাহিম তাদের পশ্চাৎ অনুসরণ বন্ধ করেন। আব্বাসীয়রা তা দেখামাত্রা ঘুরে দাঁড়ায় এবং তাদের বহুলোক যারা আহত হওয়ার ভান করে ধরাশায়ী হয়েছিল তারা পুনরায় লাফিয়ে ওঠে। এরপর যে যুদ্ধ হয় তাতে ইব্রাহিম তীরবিদ্ধ হয়ে নিহত হন এবং তাঁর অনুচররাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।[১]

মনসুর এবার মদিনা ও বসরা নগরদুটির ওপর তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন। বসরার বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যাঁরা ইব্রাহিমের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন তাঁরা ধরা পড়েন ও নিহত হন। তাঁদের ঘরবাড়ি ধুলিস্যাৎ করা হয়, কেটে ফেলা হয় খেজুর বাগান। মদিনায় বনু হাসান ও বনু হুসাইনের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, প্রত্যাহার করা হয় মদিনার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা এবং মিশর থেকে প্রাপ্ত সকল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। এমনকি নিজের সম্পত্তি ফেরত চাওয়ায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম জাফর আস-সাদিককেও তিনি মৃত্যুর হুমকি দেন। নিষ্ঠুরভাবে বেত্রাঘাত করে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিককে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। হুবাইরা দুর্গের কয়েকজন বন্দীকে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়, অন্যদেরকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয় কারাগৃহের বিষাক্ত বাতাস নির্গমনের দ্বারা। ইব্রাহিমের মুণ্ডু হাতে পেয়েই মনসুর তা নিহতের পিতার কাছে পাঠিয়ে দেন তাঁর দুঃখের জ্বালা আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্য। তার জবাবে আবদুল্লাহর বাণী বিশেষভাবে স্মরণীয়। মিনসুরের দূতকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'তোমার প্রভুকে বলো যে তাঁর সুখের দিনের মতো আমাদের দুঃখের দিনও দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে এবং আমরা শীঘ্রই উপনীত হব শাশ্বত বিচারকর্তার সামনে, যিনি তাঁর (মনসুরের) ও আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করবেন।' বর্ণনাকারী আরো বলেন যে, এই সংবাদ পাওয়ার পর মনসুরকে তিনি যেভাবে ভেঙে পড়তে দেখেছেন তেমনটি আর কাউকে কখনো দেখেননি।

মনসুরের ক্ষমতা এবার পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকায় স্বীকৃত হয় এবং স্পেন তাঁর সামরিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত না হলেও সেখানেও তাঁর নামে 'খুতবা' পাঠ করা হয়, এবং পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরীদ্বয়ের তিনিই ছিলেন শাসক ও রক্ষক।

---

১. ইবনে খালদুন এই ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন । আমার বর্ণনা তারই সার-সংক্ষেপ।

১৪৬ হিজরি; ৭৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দ

তিনি তাঁর পুত্র জাফরকে ১৪৬ হিজরিতে মসুলের শাসনকর্তারূপে পাঠালেন, সেইসঙ্গে বিখ্যাত যোদ্ধা হরব বিন আব্দুল্লাহকে পাঠান তাঁর সহকারি হিসেবে। এই শহরের সন্নিকটে হরবের যে সুন্দর প্রাসাদ[১] ছিল জাফর সেটিকেই তাঁর বাসস্থান রূপে গ্রহণ করেন এবং এখানেই তাঁর কন্যা জুবাইদা[২] জন্মগ্রহণ করেন।

স্পেন

এ সময় আফ্রিকায় শাসনকর্তা একবার স্পেন বিজয়ের চেষ্টা করেন। উমাইয়া বংশীয় আব্দুর রহমান আক্রমণকারী সেনাদলকে পরাজিত করেন। আব্বাসিয় সেনাপতির ছিন্ন মাথা গুপ্তচরের সাহায্যে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং মনসুর যখন মক্কায় দরবার করছিলেন তখন ঐ মাথাটি তাঁর সম্মুখে নিক্ষেপ করা হয়। কে যে এই মাথা এনেছে তা কেউই জানত না।

এই উদ্ধত ব্যবহারে মনসুর এমনই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন যে তাঁর ও 'কোরাশিয়দের বাজপাখি' আবদুর রহমানের মাঝখানে প্রশস্ত সমুদ্র স্থাপন করার জন্য তিনি মহাপ্রভুর (অর্থাৎ আল্লাহ) কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন; আবদুর রহমানকে তিনি এভাবেই অভিহিত করতেন।

খাজারদের সহসা আক্রমণ

জর্জিয়ায় খাজারগণের একটি আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এবং ব্যবস্থা নেয়া হয় যাযাবর গোষ্ঠীর পরবর্তী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে। কুর্দগণ ঝামেলা পাকাতে শুরু করলে মনসুর তাঁর রাজস্ব-বিভাগের প্রধান খালিদ বিন বারমাককে মেসোপটেমিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। খালিদ দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়ণতার মিশ্রণ ঘটিয়ে প্রদেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং দুর্ধর্ষ কুর্দগণকে সফলভাবে দমন করেন।

মুহম্মদ আল-মাহদী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত

মনসুর এবার তাঁর ভাইয়ের ছেলে ঈসাকে জোর করে খিলাফতের উত্তরাধিকার ত্যাগ করানোর কথা ভাবেন। এ উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ করে দমনমূলক ব্যবস্থা এবং ঈসা তাঁর দাবি মুলতবী রাখতে বাধ্য হন, যার ফলে মনসুর তাঁর পুত্র মুহম্মদকে 'আল-মাহদী'

---

১. ইবনুল আসির যখন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ (আল-কামিল) রচনা করেন তখন প্রাসাদটি বিদ্যমান ছিল। হারবের প্রাসাদ সম্পর্কে ইবনুল আসির এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। 'এ সময় এটির খুব কাছে আমার একটি গ্রাম রয়েছে, যেটি একান্তভাবে আমারই সম্পত্তি। আমি সুফীদের 'রিবাত' (মঠ)-এর জন্য এই উৎসর্গ করেছি। এই গ্রামে আমার একটি সুন্দর বাড়ি রয়েছে, যেখানে আমি এই গ্রন্থের বৃহত্তর অংশ প্রণয়ন করেছি।'

২. হারুন-অর-রশিদের বিখ্যাত মহিষী। তাঁর আসল নাম আম্মাতুল আজিজ। 'জুরদা' (ননী) শব্দের ক্ষুদ্রত্বব্যঞ্জক জুবাইদ নামটি তাঁর পিতামহ মনসুর দিয়েছিলেন আদর করে।

উপাধি দিয়ে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আর এই মনোনয়ন জনসাধারণ কর্তৃক মনোনীত হয় এবং যথাযথভাবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা হয়।

ইমাম জাফর আস-সাদিকের মৃত্যু (১৪৮ হিজরি; ৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ)

ধর্মীয় নেতা ইমাম জাফর আস-সাদিক ১৪৮ হিজরিতে মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদগ্ধ মতবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে না। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী 'আল-কাজিম' উপাধিধারী মুসার তত্ত্বাবধানে তা আরও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হতে থাকে।

মুসা আল কাজিম (ধৈর্যশীল) উত্তরাধিকার মনোনীত

এখানে আরেকটি বিভেদ দেখা দেয় শিয়া বা হযরত আলি (রা.)-এর বংশধরগণের সমর্থকদের মধ্যে। ইমাম জাফর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন তাঁর বড় ছেলে ইসমাঈলকে, যিনি তাঁর আগেই মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তিনি মুসাকে উক্ত পদে নিয়োগ করেন। তবু কিছু অনুগামী মুসার বশ্যতা অস্বীকার করে এবং তাঁর জায়গায় ইসমাঈলের পুত্র হাবিবকে তাদের ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে। ইসমাঈলী-সম্প্রদায়ের এখানেই শুরু, যাঁরা পরবর্তীকালে মিশরে ফাতিমী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

উস্তাদ সীসের বিদ্রোহ [১৫১ হিজরি]

উস্তাদ সীস নামে পরের বছর খোরাসান প্রদেশের এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নেতৃত্বে সেখানে এক ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ দেখা দেয়। গোলযোগ দমন করা হয়; উস্তাদ সীস ও তাঁর পরিবারবর্গকে বন্দী হিসেবে নিয়ে আসা হয় বাগদাদে, যেখানে তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়।

আফ্রিকা

মনসুরের জন্য আফ্রিকা হয়ে উঠেছিল অবিরাম গোলযোগের কারণ। তমীম গোত্রের আগলাব নামে এক ব্যক্তি ১৪৮ হিজরিতে শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে প্রায় দু'বছর সফলভাবে আফ্রিকা শাসন করেছিলেন, কিন্তু তিউনিসের নিকট খারিজীদের সাথে এক সংঘর্ষে তিনি নিহত হন। তাঁর উত্তরাধিকারী হাফসের পুত্র উমর তিন বছর পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থেকে নিজেকে প্রমাণ করেন সৎ ও দক্ষ শাসনকর্তা হিসেবে। খারিজীগণ পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে কায়রোয়ান অবরোধ করে, যাতে নগরীর অবস্থা হয়ে ওঠে অত্যন্ত শোচনীয়।

অবরোধকালে উমর নিহত হন এবং আফ্রিকার রাজধানী বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়। মনসুরের ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তিনি দ্রুত আরেকটি ইয়েজিদ মুহাল্লিবী[১] নামে

---

১. আবু সুফরার পুত্র কবীসা, তাঁর পুত্র হায়সাম, তাঁর পুত্র (ইয়েজিদ মুহাল্লিবী)। কবীসা ছিলেন বিখ্যাত মুহাল্লিবের (পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ. ৯৩) ভাই, তা থেকেই মুহাল্লিবী উপাধির উদ্ভব।

অদম্য শক্তি ও বিশেষ শাসনক্ষমতা সম্পন্ন নতুন শাসনকর্তার অধীনে আরেকটি সৈন্যদল পাঠিয়ে দেন। তিনি খারিজীগণদের পরাজিত করেন, নিহত করেন তাদের দলপতিকে, তাদের পলায়মান দলকে স্থান হতে স্থানান্তরে খুঁজে বেড়ান এবং কয়েক মাসের মধ্যেই বিক্ষুব্ধ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। ১৭০ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত পনের বছর তিনি আফ্রিকার শাসন ক্ষমতায় আসীন ছিলেন, পরবর্তীতে তাঁর পুত্র দাউদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৫৫ হিজরিতে মনসুর রফিকা নগরটি নির্মাণ করেন এবং প্রাচীর ও পরিখা দিয়ে পরিবেষ্টিত করেন কুফা ও বসরাকে। তিনি আদম শুমারীরও আদেশ প্রদান করেন।

রোমক সম্রাট তাঁর সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করেন এবং ভোগ করেন এক শোচনীয় পরাজয়। তাঁর করদানের অঙ্গীকারে নতুন সন্ধি সম্পাদিত হয়। ১৫৬ হিজরিতে মনসুর প্রাদেশিক শাসনকর্তৃত্বের বিলি-বন্টন করেন নতুনভাবে এবং যথার্থভাবেই ইমাম হাসান (রা.)-এর বংশের জনৈক ব্যক্তিকে[১] মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

তিনি যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সাম্রাজ্য গড়ার কাজ করেছিলেন তাতে তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল এবং তিনি অনুভব করেন যে তাঁর জীবনের আর বেশি বাকি নেই। যুবরাজকে ডেকে তিনি সাম্রাজ্য শাসন সম্পর্কে তাঁর শেষ উপদেশ প্রদান করেন। তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীকে যেসব উপদেশ প্রদান করেন তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'যে কাজ আজ করতে হবে তা কখনো আগামীকালের জন্য ফেলে রেখো না।' 'জনসাধারণ ও সেন্যবাহিনীকে সন্তুষ্ট রেখো।' 'শাস্তিবিধানের ব্যাপারে কখনো সংযমের মাত্রা অতিক্রম করো না।' 'কখনো শূন্য করো না তোমার কোষাগার।' 'যা কিছু তোমাকে করতে হবে তা তুমি নিজেই করো।' 'কাজে তোমার যাবতীয় শক্তি নিয়োগ করো।' 'যাদের নিকট থেকে তুমি সৎ উপদেশ ও পরামর্শ পেতে পার তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবে।' 'তোমার বন্ধু ও আত্মীয়দের কখনো অবহেলা করো না।' 'অতি নিষ্ঠার সাথে সীমান্ত রক্ষা করো।' 'ধর্মপরায়ণতা ব্যতীত আর কিছুই খলিফাকে গুণান্বিত করে না, কর্তব্যপরায়ণতা ব্যাতীত আর কিছুই রাজার শোভা পায় না, ন্যায়পরায়ণতা ব্যাতীত আর কিছুতেই জনসাধারণের সংস্কার বিধান করা যায় না; এবং যে ব্যক্তি তার অধীনস্থ লোকজনের উপর অত্যাচর করে সে সবশেষে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য।' 'সম্যকভাবে চিন্তা না করে কোনো কাজে অগ্রসর হয়ো না, কারণ জ্ঞানী লোকের চিন্তা দর্পণস্বরূপ, যাতে তাঁর ভালো ও মন্দ প্রতিফলিত হয়।' 'কৃতজ্ঞতা দ্বারা বদান্যতা, ক্ষমা দ্বারা ক্ষমতা, মনোজয়ী স্নেহ দ্বারা আনুগত্য এবং মানুষকে বিনয় ও তিতিক্ষা দ্বারা বিজয় অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করো।'

---

১. জায়েদ।

মনসুরের মৃত্যু [৬ জিলহজ্জ, ১৫৮ হি.; অক্টোবর; ৭৭৫ খ্রি.]

পিতা ও পুত্রের মধ্যে মর্মস্পর্শী বিচ্ছেদের পর পিতার জীবনের অন্তিম দিনগুলো পবিত্রভূমি মক্কায় অতিবাহিত করার জন্য বাগদাদ ছেড়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন, কিন্তু যাত্রাপথে মক্কা থেকে কয়েক ঘণ্টার পথ বির মায়মুনা নামক স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্য শতাধিক কবর খনন করা হয় এবং সেগুলোরই একটিতে তাঁকে সমাহিত করা হয় অতি সঙ্গোপনে, যাতে কোথায় তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে তা যেন লোকে না জানতে পারে ।

মনসুর প্রায় বাইশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি ক্ষীণাকৃতি, দীর্ঘকায় ও সুশ্রী চেহারার মানুষ ছিলেন; জীবনযাপন এবং আচার-আচরণেও আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন। অশোভন বা অশ্লীল কোনো কিছুই কখনো তাঁর দরবারে দেখা যেত না। 'দিনের প্রথম ভাগের বেশিরভাগ সময় তিনি কাটাতেন ফরমান জারি, কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত, গিরি-সংকট ও সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থাপনা, রাস্তাঘাট সংরক্ষণ, প্রজাদের অবস্থা ও বাসস্থানের উন্নতি সাধন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে;[১] দিনের অপরভাগ কাটাতেন পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে, যাদের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। মাগরিবের নামাজের পর তিনি দিনের খবরাখবর শুনতেন এবং পরামর্শ নিতেন তাঁর মন্ত্রীবর্গদের, রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে তিনি বিশ্রামের জন্য অবসর নিতেন। তিনি খুব অল্প ঘুমোতেন এবং খুব প্রত্যুষে উঠতেন ফজরের নামাজের জন্য। তিনি নিজেই সৈন্যবাহিনী এবং দুর্গসমূহ পরিদর্শন করতেন; সর্বত্রই সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত থাকত উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম দিয়ে। তিনি ছিলেন কার্যনির্বাহী কর্মচারীদের হিসাবপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার ব্যাপারে অতি-সতর্ক, 'এমনকি দিরহাম ও শস্যের অণু-পরমাণু পর্যন্ত পরীক্ষা করতেন, এ জন্য তিনি 'আবুদ-দাওয়ানিক' বা 'আদ-দাওয়ানিকি'[২] উপাধি লাভ করেছিলেন।

এই স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেও তাঁর প্রজাদের সামনে আইন অনুযায়ী স্থাপিত বিচারবিভাগের প্রতি যথার্থ আনুগত্যের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। কয়েকজন উট-মালিকের অভিযোগক্রমে মদিনার কাজীর পরোয়ানা পাওয়ামাত্র তাঁর হাজিবকে সঙ্গে নিয়ে তিনি স্বয়ং সাধারণ বিবাদীর মতো উপস্থিত হন কাজীর সামনে। কাজী খলিফাকে অভ্যর্থনা জানাতে একবার উঠেও দাঁড়াননি। মামলার রায় হয় ফরিয়াদির পক্ষে এবং মনসুর এই বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে কাজীকে বিপুল অর্থ ও পারিতোষিক দান করে বিচারকের স্বাধীনতা ও নিষ্ঠাকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি রেখে যান একটি পরিপূর্ণ কোষাগার এবং নিজ পুত্রকে বলে যান যার পরিমাণ দশ বছরের ব্যয়-নির্বাহের জন্য যথেষ্ট।

---

১. ইবনুল আসির, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭।

২. দানিক হল দিরহামের এক ষষ্ঠাংশ।

অধ্যায়-১৬
আব্বাসীয় বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]
[১৫৮-১৭০ হিজরি; ৭৭৫-৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ]
মাহদী ও হাদী

মাহদীর সিংহাসন আরোহণ : তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ রাজত্ব–তাঁর মানবতাবোধ : জিনদিক সম্প্রদায় : রোমকদের সাথে যুদ্ধ : আইরিনের করদানে সম্মতি : মাহদীর মৃত্যু : হাদির সিংহাসন আরোহণ : মরিটানিয়া বিচ্ছিন্ন : হাদির মৃত্যুর

মহম্মদ, 'আল-মাহদী' (সুপথপরিচালিত) [১৫৮-১৬৯ হি.; ৭৭৫-৭৮৫]

মনসুরের স্থলাভিষিক্ত হন 'আল-মাহদী' উপাধিধারী তাঁর পুত্র মহম্মদ, যিনি মায়ের দিক থেকে ইয়েমেনের প্রাচীন হিময়ার রাজ-বংশোদ্ভূত।[১] মাহদীর নীতি ছিল তাঁর পিতার নীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বভাববতই তিনি দয়ালু ও মহানুভব ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই পিতার রূঢ় ও কঠোর শাসনের প্রতিকার সাধনে প্রয়াসী হন। হত্যার জন্য প্রাণদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত দাগী আসামী অথবা অমার্জনীয় অপরাধে কারাবাস যাপনকারীরা ছাড়া অন্য সমস্ত লোককে মুক্তি দিয়ে তিনি রাজত্বের সূচনা করেন। তিনি ইব্রাহিমের পুত্র হাসানকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং পর্যাপ্ত বৃত্তি প্রদান করেন। পবিত্র নগরদ্বয়কে (মক্কা ও মদীনা) ফিরিয়ে দেন তাদের পুরনো সুযোগ-সুবিধা, যেগুলো তাঁর পিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, সেই সাথে মিশর থেকে দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করার অনুমতি দেন। তিনি ফিরিয়ে দেন মনসুর কর্তৃক রসূলুল্লাহ (স.)-এর বংশধরদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তিও। বলপূর্বক অর্থ আদায় এবং তহবিল অপচয়ের অভিযোগে পদচ্যুত সরকারি কর্মচারীদের মনসুর সময় সময় গুরুতর জরিমানা করতেন। এগুলো জমা থাকত 'বায়তুল মাল-ইল-মাজালিম'[২] নামক এক পৃথক কোষাগারে, যাদের কাছে জরিমানা আদায় করা হয়েছিল তাদের নাম আঁটা থাকত ওই অর্থের সাথে। মাহদী এসব টাকা-পয়সা ফেরত দেন, এমনকি মৃত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারীবর্গকেও।[৩]

রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান কালে তিনি খ্যাতনামা মাসলামাহর প্রাসাদের পাশ দিয়ে গমন করেন। তাঁর পিতামহ মুহম্মদের প্রতি প্রয়াত যোদ্ধার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে তিনি মাসলামাহর বংশধর ও অনুচরদেরকে ডেকে পাঠান এবং মূল্যবান জায়গীরসহ ২০,০০০ দিনার পারিতোষিক বা বকশিস প্রদান করেন।

---

১. তাঁর মায়ের নাম উম্ম মুসা।
২. নির্যাতিতদের কোষাগার।
৩. বলা হয় যে, মনসুর তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রে মাহদীকে এসব অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেহেতু এতে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

১৬০ হিজরি

১৬০ হিজরিতে মক্কায় তাঁর হজ্জ পালন অভূতপূর্ব আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে সুসম্পন্ন হয়। তিনি প্রায় ৩০,০০০,০০০ দিরহাম দান হিসেবে বিতরণ করেন হিজাজের লোকদের মধ্যে এবং কেবল মক্কাতেই ১৫০,০০০ পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশে 'মসজিদ-ই-নববী' (মস্ক অব দ্য প্রফেট) পুনর্নির্মিত ও সুশোভিত হয়; প্রধান প্রধান নগরে বিদ্যমান বিদ্যালয় ও মসজিদগুলোকে করা হয় সম্প্রসারিত এবং যেখানে এর একটিও ছিল না সেখানে এগুলো নতুন করে নির্মাণ করা হয়। মাহদী মদিনার আনসারদের মধ্যে থেকে ৫০০ লোককে তাঁর দেহরক্ষী হিসেবে মনোনীত করে পিতার চেয়ে অধিকতর বিচক্ষণভাবে।[১]

তিনি কুষ্ঠরোগী ও ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ লোকদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করে দেন। সাফফাহর আমলে মক্কাগামী রাস্তায় কেবল কাদেসিয়া ও জুবালার মধ্যে (৩০০ মাইলের দূরত্ব) বিশ্রামাগার নির্মিত হয়েছিল। এরপর মাহদীর আদেশে সমুদয় রাস্তাকে পাকা ও প্রশস্ত করা হয়; পবিত্র নগরীদ্বয়ের (মক্কা ও মদীনা) সমস্ত গমনপথ জুড়ে কূপ ও জলাধারসহ বৃহৎ ও আরামদায়ক বাড়িঘর নির্মিত হয় এবং তীর্থযাত্রী ও পথিকদের নিরাপত্তার জন্য প্রহরী নিয়োগ দেয়া হয়।

দ্বিতীয় মারওয়ানের জনৈক পুত্র সিরিয়ায় বিদ্রোহ দেখাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। মাহদী তাঁকে কিছুকালের জন্য আটক রাখেন কারাগারে, তারপর মোটা রকম বৃত্তি দিয়ে মুক্ত করে দেন। রাজপ্রাসাদে মারওয়ানের বিধবা স্ত্রী মজুনার জন্য প্রকোষ্ঠ নির্ধারণ করে দেন মাহদীর রাজমহিষী খায়জুরান, যেখানে রাজপরিবারের সবাই তাঁর সাথে সম্মানজনক ও ভালো ব্যবহার করতেন। বলা হয় স্বামীর ওপর খায়জুরানের বিশেষ প্রভাব ছিল। ফলে তাঁর অভ্যর্থনাগৃহ সভাসদ, উচ্চ পদাধিকারী কর্মচারী এবং পদ বা অনুগ্রহ-প্রার্থীদের ভিড়ে পূর্ণ থাকত। সাফফাহর ভাইয়ের ছেলে হতভাগ্য ঈসাকে উত্তরাধিকারের দাবি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করতে রাজি করানো হয় এবং মাহদী তাঁর পর পর্যায়ক্রমে খিলাফতের আসনে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন খায়জুরানের গর্ভজাত তাঁর দুই পুত্র মুসা ও হারুনকে; উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁদের প্রতি যথাযথভাবে আনুগত্যের শপথও করানো হয়।

মুকান্না [১৫৮-১৬১ হিজরি]

মাহদীর রাজত্বকালে মূরের কবিতায় 'লালরুখ' বলে অভিহিত 'খোরাসানের অবগুণ্ঠনাবৃত পয়গম্বর' প্রতারক হাশিম বিন হাকিমের আবির্ভাব ঘটে। খোরাসানে সবসময়ই ধর্মসম্প্রদায়ের প্রাচুর্য ছিল এবং এ সময় উক্ত অঞ্চল ছিল এক অসাধারণ উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায়। হাশিম ছিলেন ছোটোখাটো আকৃতির ও অপ্রিয়দর্শন পুরুষ এবং

---

১. যদি তাঁর উত্তরাধিকারীরা এই রক্ষীদলকে বহাল রাখতেন তাহলে তুর্কী রক্ষীরা পরবর্তীকালে যে অনিষ্টকর প্রাধান্য লাভ করেছিল তা কখনোই সম্ভব হত না। কিন্তু পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধানরা বোধহয় মনসুর কর্তৃক অনুসৃত আরবদের মর্যাদা-হানিকর নীতির দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন; অথচ আরবরা তখনো নিজেদের মুসলিম বীরত্বের শিরোমণি বলে মনে করত।

নিজের কুৎসিত চেহারা আড়াল করতে তিনি সবসময় একটি সোনালি মুখোশ পরে থাকতেন। সে জন্যই তাঁকে 'মুকান্না' বা 'অবগুণ্ঠনাবৃত' নামে আখ্যায়িত করা হত। তিনি তাঁর অনুগামীদের শিক্ষা দেন যে, মানবজাতির মধ্যে আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে স্রষ্টা স্বয়ং মাঝে মাঝে অবতাররূপ পরিগ্রহ করেন; আদম (আঃ), নূহ (আঃ), আবু মুসলিম এবং তিনি নিজে আল্লাহর সেই অবতাররূপী। আর বিশ্বাসের মধ্যেই ধর্ম নিহিত, কর্মে নয়। তাঁর অন্য মতবাদগুলোও দারুণ বিপ্লবাত্মক এবং নীতিবিগর্হিত ছিল। বহুলোক তাঁর অনুসরণ করে এবং কিছুদিন তিনি রাজকীয় সেন্যবাহিনীকে উপেক্ষা করতে সমর্থ হন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত ও নিহত হন 'কিশ' নামক স্থানে।

জিনদিক মতবাদ

খ্রিস্টান ট্যাবোরাইটদের মতো মুকান্নার অনুগামীরা সাদা পোশাক পরিধান করত বলে তাদের 'মুবাইয়িদ'–'শ্বেতবস্ত্র পরিহিত' বলা হত। অনুরূপ খামখেয়ালী ও নীতি বিগর্হিত মতবাদ নিয়ে শীঘ্রই 'মুহাম্মির' বা 'লোহিতবস্ত্র পরিহিত' নামে এক নতুন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে কাস্পিয়ান সাগরের পুবদিকে জুরজাঁ নামক স্থানে এবং তারা সেখানে গোলযোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু তাদের দমন করতে কোনো অসুবিধা হয় না। মাজদক-এর প্রাচীন নিহিলিসটিক বা নাস্তিক্যপূর্ণ সাম্যবাদের সাথে ম্যানিকিয়ান মতবাদ মিশ্রিত হয়ে বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মাজদক খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে কিসরা নওশিরওয়ানের (মহান খসরু) আমলে বেঁচে ছিলেন। তিনি এক উৎকট ও ভয়ঙ্কর অরাজকতাপূর্ণ সাম্যবাদ প্রচার করেছিলেন। পারস্যরাজের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে এই সম্প্রদায় অবদমিত হয়েছিল। কিন্তু এতে বিষধর সাপ তাতে সামান্য আহত হয়েছিলমাত্র, নিহত হয়নি। এরপরে আত্মপ্রকাশ করেন ম্যানেস বা মনি[১] যিনি ছিলেন একজন দার্শনিক। মাহদীর রাজত্বকালে মাজদকের নিহিলিজম ম্যানেসের দর্শনের সাথে কম-বেশি মিশ্রিত হয়ে খোরাসানে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং তা পথ খুঁজে পায় পশ্চিম পারস্য ও ইরাকের বিভিন্ন জায়গায়। এতে সমাজের বন্ধন শিথিল হয়, শাসন কর্তৃত্ব দুর্বল এবং মানব-রিপুকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদত্ত হয়। এ মতের অনুসারীদের 'জিনদিক' বলা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ হল, তারা প্রকাশ্যে রাস্তা থেকে শিশুদের অপহরণ করত। এটি সত্য হোক-বা-নাহোক, বাক্‌চাতুর্যের আড়ালে জিনদিকরা বাহ্যিক আনুগত্যের ভান করে গোপনে সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করছিল। মাহদী এসব নিহিলিস্টদের প্রতি কোনো অনুকম্পা প্রদর্শন করেননি; তাদেরকে নির্দয়ভাবে অনুসরণ করা হয় এবং তাদের প্রতি নৈতিকতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও শাসন কর্তৃত্বের শত্রু বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

---

১. ম্যানিকিয়ান কথাটির উদ্ভব হয়েছে ম্যানেস থেকে।

বাইজান্টাইন আক্রমণ

১৬৩ হিজরিতে (৭৭৯-৭৮০ খ্রিস্টাব্দ) বাইজান্টাইনরা মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে এবং সীমান্ত প্রদেশের বহুদূর পর্যন্ত ধ্বংসাত্মক লুঠতরাজ চালায়। তারা মার'আশ (জার্মানিসিয়া) অধিকার করে নেয় এবং লোকজনকে মেরে ফেলে সেটিকে ভস্মীভূত করে। হাসান বিন কাহতবার আগমনে তারা পশ্চাদপসরণ করে এবং তিনি স্বয়ং প্রতিশোধ গ্রহণ করেন কয়েকটি রোমান শহর ধ্বংস করে। একটি নতুন আক্রমণের মোকাবেলায় মাহদীকে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হতে হয়। তাঁর পুত্র মুসাকে বাগদাদে অন্তবর্তীকালীন রাজপ্রতিনিধি হিসেবে রেখে তিনি মসুল হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অভিযান শুরু করেন। আলেপ্পোকে করা হয় রাজকীয় বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র এবং ঈসা বিন মুসা, আবদুল মালিক বিন সালেহ ও হাসান বিন কাহতবা প্রমুখ সেনাপতিবৃন্দসহ হারুনকে পুরোগামী রূপে রোমকদের সামনে বিরোধিতার জন্য পাঠানো হয়। ইয়াহিয়া বিন খালিদ হন সেন্যবাহিনীর সহযোগী সেনাধ্যক্ষ। সামালিয়ন ও অন্যান্য স্থান হয় আত্মসমর্পণ করে, নয়তবা অধিকৃত হয় বলপূর্বক আক্রমণে। অতঃপর মাহদী তীর্থ সম্পাদনের জন্য জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হন। আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানসহ পশ্চিমাঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয় হারুনকে। সাবিত বিন মুসাকে তাঁর অর্থসচিব করা হয়, অন্যদিকে ইয়াহিয়া বিন খালিদকে মন্ত্রীর কার্যভার দেয়া হয়। কিন্তু রোমকদের অস্থিরতা শান্তি স্থাপন করতে দেয় না।

৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ

'মেগাথাকোমিস' নামে অভিহিত এক সেনাপতির নেতৃত্বে রোমক বাহিনী আবার আরব রাজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং চারদিকে চালাতে থাকে ধ্বংসযজ্ঞ। হারুন দ্রুত অগ্রসর হন আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে। হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে রোমকরা ছত্রভঙ্গ হয় এবং আরব বাহিনী কনসট্যান্টিনোপলের দিকে অভিযান শুরু করে। চতুর্থ লিওর বিধবা রানী আইরিন, যিনি পুত্র ষষ্ঠ কনস্ট্যান্টাইনের নামে বাইজান্টিয়ামের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষাই প্রেরণা জুগিয়েছিল এই নতুন যুদ্ধে, তিনি এবার বসফোরাস উপকূলে আরবদের শিবিরাগ্নি প্রজ্বলিত হতে দেখেন। আর একবার গুরুতর পরাজয়ের পর আইরিন আবেদন করেন শান্তির জন্য, বিজয়ী সেনাদলের প্রত্যাবর্তনে পথপ্রদর্শক ও রসদ সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণ বাৎসরিক করদানে সম্মত হওয়ায় তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়।

১৬৮ হিজরিতে (৭৮৪-৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ) মরুভূমিতে বিচরণরত যাযাবরদের মধ্যে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা কাফেলা লুণ্ঠন করে, 'ত্যাগ করে নামাজ' এবং তীর্থযাত্রীদের প্রতি ঘৃণ্য ব্যবহার করে। বিদ্রোহ দমন করা হলেও অপরাধীদের প্রতি খুবই উদার আচরণ প্রদর্শন করা হয়েছিল বলে মনে হয়।

মাহদীর মৃত্যু [২১ মহরম, ১৬৯হি.; ৩ আগস্ট ৭৮৫ খ্রি.]

পরের বছর মাহদী পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণের জন্য বের হন, কিন্তু পথিমধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন 'মাসানদান' নামক স্থানে, যেখানে তিনি মৃগয়া উপভোগের জন্য অবস্থান করেছিলেন, যার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আসক্তি। তিনি শিকারী কুকুর কর্তৃক অনুসৃত একটি হরিণের পিছু অনুসরণ করছিলেন; ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত তাঁর ঘোড়া তাঁকে নিয়ে ধাক্কা মারে একটি ধ্বংসীভূত প্রাসাদের তোরণে এবং এই প্রচণ্ড আঘাতের ফলে তাঁর মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। আর ওইদিনই তিনি মারা যান।

মৃত্যুর সময় মাহদীর বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর এবং তিনি দশ বছর রাজ্য শাসন করেছিলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, উজ্জ্বল বর্ণ, সুঠাম দেহবিশিষ্ট অমায়িক চেহারাবিশিষ্ট।

রাজত্বের শুরুর দিকে আবু উবায়দুল্লাহ মাহদীর উজীর (ওয়াজীর) হিসেবে কাজ করেছিলেন। পরে তিনি ইয়াকুব বিন দাউদকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। ইয়াকুবের পরামর্শেই এই রাজত্বের অধিকাংশ বড় বড় জনহিতকর কাজগুলো গৃহীত ও সম্পাদিত হয়েছিল। শেষদিকে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে খলিফার মন বিষিয়ে দেয়া হয় এবং আলাবীদের সাথে ষড়যন্ত্রের সন্দেহে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয় মাতবাক[১] নামক রাজনৈতিক কারাগারে, ইয়াকুব সেখানে বহু বছর অবরুদ্ধ ছিলেন হারুন কর্তৃক মুক্তি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

মুসা 'আল-হাদী'র (পথপ্রদর্শক) সিংহাসন আরোহণ

পিতার মৃত্যুকালে হারুন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন; প্রয়াত সম্রাটের অনুজ্ঞা অনুসারে তিনি সঙ্গে সঙ্গে খলিফা বলে ঘোষণা করেন মুসা 'আল-হাদী'কে এবং নিজেই প্রথম আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তিনি হাদীর কাছে রাজকীয় সিলমোহর এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর ষষ্ঠি ও জামা পাঠিয়ে দেন।

সিংহাসনে আরোহণের সময় হাদীর বয়স ছিল ২৪ বছর এবং দু'বছরেরও কম সময় তিনি রাজ্য শাসন করেন। উগ্র, একগুঁয়ে ও কঠোর হৃদয় অথচ সাহসী, উদ্যমী, উদার ও সাহিত্যানুরাগী বলে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদী তাঁর ভাইয়ের আনুগত্যের মর্যাদা দেননি এবং স্বল্পকালীন রাজত্বের মধ্যেই তিনি প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর পুত্র জাফরের অনুকূলে উত্তরাধিকার পরিবর্তন করতে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি হারুনের প্রধান উপদেষ্টা ইয়াহিয়া বিন খালিদ বারমেকী এবং ভাইয়ের অন্যান্য যেসব আজ্ঞাবহ তাঁর ইচ্ছের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয় তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করেন। হাদী ও তাঁর মা খায়জুরানের মধ্যেও বিবাদ ঘটে। এই মহিলা পুত্রের রাজত্বকালেও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে একই প্রভাব প্রয়োগ করতে চান, যা তিনি স্বামীর রাজত্বকালেও করেছিলেন। হাদী তাঁর হস্তক্ষেপে ক্ষুব্ধ হন এবং যেসব সভাসদ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর (মায়ের) অভ্যর্থনা সভায় যাতায়াত করতেন তাঁদেরকে তাঁর অসন্তোষের ভয়

---

১. আব্বাসীদের ব্যাসটিল।

দেখান। এভাবে দরবারে দুটি গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়—এক গোষ্ঠী দাঁড়ায় তরুণ খলিফা ও তাঁর পুত্রের পক্ষে, অন্য গোষ্ঠী হারুন ও তাঁর বাজমাতার পক্ষে। হারুন তাঁর একগুঁয়ে ভাইয়ের মনোরঞ্জনের জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টা করেন এবং পরিশেষে ইয়াহিয়ার পরামর্শক্রমে নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করেন।

মদিনার শাসনকর্তা মদ্যপানের মিথ্যা অভিযোগে বনু হাসানের স্বল্প সংখ্যক লোকের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিলেন। এর ফলে প্রথম হাসানের প্রপৌত্র হুসাইনের[১] নেতৃত্বে এক বিদ্রোহ শুরু হয়, যাতে এই পরিবার এবং অন্যান্য পরিবারের বহু লোকজন নিহত হয়। হুসাইনের পিতৃব্যপুত্র ইদ্রিস[২] মরিটানিয়ায় পালিয়ে যান, যেখানে তিনি সমর্থন পান বার্বারদের এবং তাদের সহায়তায় বিখ্যাত ইদ্রিসী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 'মাগরিব-আল-আকসা' (দূর পশ্চিম) আব্বাসীয় সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন থেকেই।

হাদীর মৃত্যু [বৃহস্পতিবার, ১৫ রবিউল আওয়াল, ১৭০ হি. ; ৭৮৬ খ্রি.]

বাগদাদ থেকে একদিনের ভ্রমণ পথ ঈসাবাদ নামক স্থানে সাময়িকভাবে প্রবাসযাপনকালে হাদী এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অন্তিম সময় সন্নিকটে দেখে তিনি মাকে ডেকে পাঠান। মাতা-পুত্রের এই সাক্ষাৎকার ছিল উদ্বেগজনক ও হৃদয়স্পর্শী। তিনি মাকে বলেন, সময় হলে তিনি এমন সব কাজকে তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন যা তাঁর (মায়ের) অপছন্দনীয় ছিল, কিন্তু তিনি কখনো অকৃতজ্ঞ পুত্র ছিলেন না এবং তিনি সবসময় তাঁর (মায়ের) প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। অতঃপর তিনি মায়ের হাত ধরে নিজের বুকের ওপর রাখেন।[৩] তিনি আরো নির্দেশ প্রদান করেন যে, হারুনই হবেন তাঁর উত্তরাধিকারী। তিনি ১৫ রবিউল আওয়াল মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি পিতার মতোই দীর্ঘকায় ও গৌরবর্ণ ছিলেন। তিনি সাত পুত্র ও দুই কন্যা সন্তান রেখে যান। উম্মে মুসা নামের এক কন্যার সাথে পরবর্তীকালে হারুনের পুত্র মামুনের বিয়ে হয়।

---

১. খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর পুত্র প্রথম হাসান (রা.), তাঁর পুত্র হাসান, তাঁর পুত্র আলি, তাঁর পুত্র হুসাইন।

২. ইদ্রিস হলেন নাফস-উজ-জাকিয়ার এক ভাই।

৩. মাস'উদী।

অধ্যায়-১৭
আব্বাসীয় বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]
[১৭০-১৯৮ হিজরি; ৭৮৬-৮১৪ খ্রিস্টাব্দ]
রশীদ ও আমীন

হারুন-অর-রশিদের সিংহাসন আরোহণ : তাঁর চরিত্র : গৌরবময় রাজত্বকাল : বারমেকী বংশ : ইফ্রিকিয়াকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান : এশিয়ার ঘটনাবলী : খেলাফতের উত্তরাধিকারের ব্যবস্থাপনা : আমিন ও মামুন উত্তরাধিকারী মনোনীত : সাম্রাজ্যের বিভাগ : বারমেকী বংশের পতন : আরবিয় জোয়ান অব আর্ক : রোমকদের যুদ্ধ : নাইসফোরাসের বিশ্বাসঘাতকতা : তাঁর পরাজয় : নতুন সন্ধি : বাইজান্টাইনদের বিশ্বাসঘাতকতা : এর ফলাফল : রশিদের মৃত্যু : আমিনের সিংহাসনারোহণ : তাঁর চরিত্র : মামুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা : তাহির কর্তৃক আমিনের সৈন্যবাহিনীর পরাজয় : বাগদাদ অবরোধ : মক্কা ও মদিনায় মামুন খলিফা বলে স্বীকৃত : আমিনের মৃত্যু : ১৭০-১৯৮ হিজরি; ৭৮৬-৮১৪ খ্রিস্টাব্দ

হারুণ-'অর-রশিদ'-এর (ন্যায়পরায়ণ হারুন) সিংহাসন আরোহণ

পিতা মাহদীর অনুজ্ঞা অনুসারে ভাইয়ের মৃত্যুর পর হারুন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং হাদীর অল্পবয়স্ক পুত্র জাফর উত্তরাধিকারের সকল দাবি প্রত্যাহার করে নেন।

এরপর থেকে ইতিহাসে যিনি রশিদ বলে অভিহিত, তাঁর রাজত্বকাল এশিয়ায় আরব শাসনের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। 'আরব্যোপন্যাস'-এর গল্পমালা এক মোহিনী শক্তি সঞ্চার করেছে এই অসাধারণ খলিফার নামের সাথে, অন্যায়ের প্রতিকার এবং নিপীড়িত ও নিঃস্বদের দুঃখমোচন করার জন্য রাতে বাগদাদের রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো যাঁর অভ্যাস ছিল। উপন্যাসের চমকমুক্ত খাঁটি মানুষটি সন্দেহাতীতভাবেই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে পূর্ব-পুরুষদের যথোচিত প্রশংসাভাজন হয়েছেন। ধর্মীয় কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান, জীবনযাপনে মিতভাষী, সাধুতা ও দানশীলতায় অনাড়ম্বর অথচ রাজকীয় আড়ম্বর ও ঝাঁকজমকে পরিবৃত থাকতে ভালোবাসতেন বলে জনসাধারণের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ প্রতিফলিত হয়েছিল এবং সমাজের ওপরও তাঁর চরিত্রের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। সহজাত নৈপুণ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকরূপে বারবার তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন; অরাজকতা প্রতিরোধ করতে এবং স্বয়ং প্রজাসাধারণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে প্রায়ই তিনি ঘুরে বেড়াতেন রাজ্যের চারদিকে; ব্যক্তিগতভাবে সীমান্ত ও গিরিপথগুলো পরিদর্শন করতেন এবং কখনোই শাসনকাজে কষ্ট স্বীকার বা পরিশ্রম করতে পিছপা হতেন না। বিশাল রাজ্য জুড়ে ব্যবসায়ী, সওদাগর, পণ্ডিত ও তীর্থযাত্রীরা যেভাবে বিপদ-আপদ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার

সাথে পরিভ্রমণ করতেন তাই তাঁর প্রশাসনের উৎকর্ষতা ও দক্ষতার সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি তাঁর অধীনস্থ রাজ্যগুলোকে যেসব মসজিদ, কলেজ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, দাতব্য ঔষধালয়, সরাইখানা, রাস্তা, সেতু ও খাল দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন, তা জনকল্যাণে তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগের পরিচয় বহন করে। শিল্প ও সাহিত্যের অনুরক্ত পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খলিফা রশিদের সমভাবে প্রতিভাবান ও গরীয়ান পুত্র তাঁকে অতিক্রম করে গেলেও চরিত্রবল এবং বুদ্ধির মাহাত্ম্যে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ ছিলেন না। একক ব্যক্তি কর্তৃক সীমাহীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ক্ষমতা ভোগের ফলে প্রায়ই যেসব দোষের উদ্ভব হয়, মামুনের আমল ছাড়া তাঁর রাজত্বকাল যদিও তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না, তথাপি প্রজাবর্গের সাধারণ সমৃদ্ধি এবং তাঁর রাজত্বকালে শিল্পকলা ও সভ্যতার অভূতপূর্ব উন্নতি স্বেচ্ছাতন্ত্রের বহু দোষত্রুটির প্রতিকার সাধন করতে সমর্থ হয়।

বারমেকী বংশ

রশিদ তাঁর রাজত্বের প্রথম ১৭ বছর যেসব লোকের হাতে সাম্রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত করেছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের বিচক্ষণতা ও দক্ষতার জন্যই তাঁর প্রশাসনের গৌরব ও খ্যাতি অর্জিত হয়েছিল। সাফফাহ ও মনসুরের আমলে খালিদ বিন বারমাক যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন ইতোপূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। খালিদের পুত্র ইয়াহিয়া, এক সময় যিনি আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন, মাহদী তাঁর ওপর রশিদের শিক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যখন তাঁর ছাত্র বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে খেলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত হন, তখন তিনি তাঁর উপদেষ্টা ও উজির নিযুক্ত হন। অপার শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ রশিদ তাঁকে সম্বোধন করতেন 'পিতা' বলে এবং সবসময় তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ মেনে চলতেন, যা সবসময়ই প্রদত্ত হত তরুণ যুবরাজ ও প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য, আর সে জন্যই তাঁকে শাসনকাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছিল। আর সে কারণে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া মাত্র রশিদ ইয়াহিয়াকে সাম্রাজ্যের উজির নিযুক্ত করেন এবং তাঁর হাতে ন্যস্ত করেন সকল ক্ষমতা। ইয়াহিয়ার প্রশাসন ছিল বিচক্ষণ, দৃঢ় ও প্রজাকল্যাণ; সামান্যতম ঘটনাও উপেক্ষিত হত না এবং জনসাধারণের মঙ্গলবিধানই প্রাথমিক কর্তব্য ছিল। ইয়াহিয়ার পুত্র ফজল, জাফর, মুসা এবং মুহম্মদও ছিলেন অতিশয় দক্ষ এবং উচ্চপর্যায়ের শাসনক্ষমতা-সম্পন্ন পুরুষ। ফজল ছিলেন যথাক্রমে খোরাসান ও মিশরের শাসনকর্তা এবং তিনি ইয়াহিয়া-বিন-আবদুল্লাহকে[১] বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছিলেন, যিনি দায়লেম প্রদেশে (প্রাচীন মিডিয়ার উত্তরাংশ) নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে জাফরও ছিলেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের শাসনকর্তা এবং মুদার ও হিময়ারদের মধ্যে পুরনো দ্বন্দ্ব সিরিয়ায় নতুনভাবে দেখা দিলে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের মধ্যে শান্তি স্থাপনের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে বার্ধক্যজনিত কারণে ইয়াহিয়া যখন উজিরের পদে ইস্তফা দেন তখন ওই পদের দায়িত্ব অর্পন করা হয় জাফরের ওপর। জাফর বিশেষ সফলতার সাথে ঐ পদের সকল দায়িত্ব

---

১. খলিফা হাসান (রা.)-এর এক প্রপৌত্র।

সম্পাদন করেন। ১৭ বছর ধরে এই প্রখ্যাত ও অনন্যসাধারণ গুণসম্পন্ন পরিবার বিশ্বস্ততার সাথে রশিদের সাম্রাজ্য শাসন করে। স্বেচ্ছাতন্ত্রের অধীনে গোপন ষড়যন্ত্র কিভাবে সক্রিয় হয় সে সম্পর্কে শিক্ষণীয় উপদেশ পাওয়া যায় তাঁদের আকস্মিক পতনে। কিন্তু যে সময়ের কথা আমি আলোচনা করছি তখন বারমেকীগণ বংশ গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিলেন।

আফ্রিকা

আমরা পূর্বেই লক্ষ করেছি যে, মরিটানিয়া আব্বাসি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। পশ্চিম আফ্রিকা পুনরাধিকার করতে ইফ্রিকিয়ার শাসনকর্তারা বহুবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৭০ হিজরিতে ইয়াজিদ বিন হায়শাম মুহাল্লিবির মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইফ্রিকিয়া ছিল তাঁর দখলে। এরপরই গোলযোগ দেখা দেয়, আর যা দমন করেন তাঁর ভাই রুহ, রশিদ যাঁকে ১৭১ হিজরিতে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি বেশ কয়েক বছর সাফল্যের সাথে প্রদেশ শাসন করে মৃত্যুবরণ করেন। রুহের পুত্রের বিরুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে রশিদ বিদ্রোহ দমন করতে পাঠান হারসামা[১] নামে একজন বিখ্যাত সেনাপতিকে। ফলে শৃঙ্খলা ফিরে আসে আর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হারসামা প্রায় তিন বছর বহাল থাকেন তাঁর পদে। তাঁর পদত্যাগের পর রশিদ এমন একজন কর্মচারিকে নিয়োগ করেন, যিনি এই অবাধ্য প্রদেশ শাসন করার ক্ষেত্রে একেবারেই অযোগ্য ছিলেন। সে সময় পর্যন্ত ইফ্রিকিয়া থেকে কোনো রাজস্ব আমদানি হওয়ার পরিবর্তে অবিরামভাবে তা সাম্রাজ্যের ধনসম্পদ নিঃশেষ করে দিচ্ছিল এবং মিসরের রাজস্ব থেকে বছরে ১০০,০০০ দিনার পাঠাতে হচ্ছিল ইফ্রিকীয় সরকারের খরচ-নির্বাহের জন্য। আঘলাবের পুত্র ইব্রাহিম রশিদের নিকট প্রস্তাব করেন, যদি তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর স্থায়ীভাবে শাসনভার অর্পণ করা হয় তাহলে তিনি প্রদেশে কেবল শান্তি ও শৃঙ্খলাই ফিরিয়ে আনবেন না, অধিকন্তু রাজকীয় কোষাগার থেকে অর্থ সাহায্য চাওয়ার বদলে বাগদাদে বছরে ৪০,০০০ দিনার করে পাঠাবেন। প্রদেশের ভাবধারা এবং সরকারের সংকটের কথা জানতেন বলে হারসামা রশিদকে ইব্রাহিমের প্রস্তাবে সম্মত হতে পরামর্শ দেন। আর সে অনুসারে ইব্রাহিম ইফ্রিকিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং এ পদ তাঁর পরিবারে বংশানুক্রমিক করা হয় রাষ্ট্রধান কর্তৃক প্রত্যেক নতুন উত্তরাধিকারী নিযুক্ত ও অনুমোদিত হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে। আর তখন থেকেই ইফ্রিকিয়া স্বায়ত্তশাসিত এলাকা বলে গণ্য হয়।

এশিয়ার ঘটনাবলি

এশিয়ায় শাসনকাজ পরিচালিত হচ্ছিল নির্ধারিত নিয়মে, পূর্নোদ্যমে ও নির্বিঘ্নে। ১৭১ হিজরিতে সমগ্র কাবুল ও সানহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত সীমান্ত বিস্তৃত হয়। একই সময় রশিদ এশিয়া মাইনরের সীমান্ত অঞ্চলগুলোকে সাধারণ

---

১. আরবদের উচ্চারণের হারশামা।

শাসন কর্তৃত্ব থেকে আলাদা করেন এবং 'আওয়াসিম' নামাধীনে সেগুলোকে ন্যস্ত করেন একজন বিশেষ সামরিক শাসনকর্তার অধীনে। সিলিসিয়ার টরসাসে আবার বসতি স্থাপন করা হয় এবং তাকে একটি শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করা হয়।

১৭৩ হিজরি; ৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ

রশিদের মা খায়জুরান দু'বছর পর মারা যান এবং তাঁর মৃত্যুতে ইয়াহিয়া বিন খালিদ হারান এমন একজন মিত্রকে, যিনি তরুণ খলিফার ওপর তাঁর জ্ঞানগর্ভ ও বিশেষ প্রভাব বজায় রাখতে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই রশিদ তাঁর মাকে সেসব সুযোগ-সুবিধা প্রত্যার্পণ করেছিলেন, যেগুলো তিনি ভোগ করতেন মাহদীর আমলে এবং যেগুলো থেকে হাদী তাঁকে বঞ্চিত করেছিলেন; ফলে স্বামীর রাজত্বকালের মতো তাঁর প্রাসাদ পুনরায় সভাসদ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের অধিবেশনস্থলে পরিণত হয়েছিল। খায়জুরানের মৃত্যুর অল্প পরই রশিদ ইয়াহিয়ার নিকট থেকে রাজকীয় সিলমোহর ফিরিয়ে নেন এবং তা ফজল বিন রাবীকে অর্পণ করেন। আর তখন থেকে তৎকালীন ইতিহাসে তিনি বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেন এবং প্রসিদ্ধি অর্জন করতে থাকেন।

মহম্মদ 'আল-আমিন' উত্তরাধিকারী মনোনীত [১৭৫ হিজরি; ৭৯১ খ্রিস্টাব্দ]

হিজরি ১৭৫ সনে সমগ্র আব্বাসি গোত্রের মদতপ্রাপ্ত সম্রাজ্ঞী জুবাইদা ও তাঁর ভাই ঈসা বিন জাফরের চাপে পড়ে রশিদ তাঁর পুত্র মুহম্মদকে 'আল-আমিন' (বিশ্বাসী) উপাধি দিয়ে, খেলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন তখন যাঁর বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর।

আবদুল্লাহ 'আল-মামুন' এর মনোনয়ন

৭ বছর পর আর এক পুত্র আবদুল্লাহও ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত হন এবং এও নির্দেশ করা হয় যে, তিনি সিংহাসনের অধিকারী হন মুহম্মদ আল-আমিনের মৃত্যুর পর। আবদুল্লাহ 'আল-মামুন' বা বিশ্বস্ত উপাধি পান। পরবর্তীকালে তৃতীয় পুত্র কাসিমকেও 'আল-মুতামিন'[১] উপাধি দিয়ে মামুনের পর উত্তরাধিকারী প্রদান করা হয়। তিন পুত্রকেই তাঁদের জীবদ্দশায় সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ শাসন করবে; পশ্চিমাঞ্চল আমিনের নিয়ন্ত্রণে, মামুনের অধীনে পূর্বাঞ্চল, অন্যদিকে মেসোপটেমিয়া ও সীমান্ত অঞ্চলগুলো থাকবে কাসিমের শাসনাধীনে, যেভাবে আমি পরামর্শ দিয়ে যাব। রশিদ মামুনের সুবিচার ও বিশ্বস্ততার ওপর এমনই সর্বাত্মকভাবে নির্ভর করেন যে সমীচীন বোধ করলে কাসিমকে তাঁর উত্তরাধিকার থেকে অপসারণ করার ক্ষমতাও তিনি তাঁকে (মামুনকে) প্রদান করেন। মামুনকে জাফর বিন ইয়াহিয়ার শিক্ষকতায় সমর্পণ করা হয়, অন্যদিকে কাসিমকে খলিফার পিতৃব্য পুত্র আবদুল মালিক বিন সালেহর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

---

১. যার উপর বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে।

৮০২ খ্রিস্টাব্দ

১৮৬ হিজরিতে আমিন ও মামুনকে সঙ্গে নিয়ে রশিদ মক্কায় হজ্জ পালন করেন এবং পিতার ব্যবস্থাপনা মেনে চলার শপথ দ্বারা সম্বলিত দুই ভাইয়ের সম্পাদিত দুটি দলিল যথাক্রমে ক্বাবাগৃহে গচ্ছিত রাখেন। আমিনের দুর্বল ও অনিশ্চিত চরিত্র পিতার কাছে ইতোপূর্বেই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠায় তাঁর (আমিনের) দলিলটিতে ইবনুল আসির কর্তৃক পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয় এবং ভাইয়ের সাথে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করতে তাঁকে ঐকান্তিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ করার জন্য রশিদের উৎকণ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

জুবাইদার মক্কা ও মদিনা পরিদর্শন

ওই বছরই সম্রাজ্ঞী জুবাইদার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হিজাজ পরিদর্শন সংঘটিত হয়, যার স্মৃতিচিহ্ন এখনো বিদ্যমান। মক্কার অধিবাসীরা ব্যাপকভাবে পানির অভাবে কষ্ট পাচ্ছে দেখে তিনি নিজ খরচে একটি বিখ্যাত নহর বা পঃয়োপ্রণালি খনন করান, যা তাঁর নামই বহন করছে এবং তা নগরীর জন্য এক অপরিমেয় আশীর্বাদ বলেই প্রমাণিত হয়েছে।[১]

খাজার আক্রমণ [১৮৩ হিঃ; ৮৯৯ খ্রি.]

১৮৩ হিজরি সালে গ্রিকদের সাথে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ[২] অসভ্য খাজার জাতি তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আবার উত্তর দিক থেকে আর্মেনিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের নিষ্ঠুর ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অশ্রুতপূর্ব ও অতুলনীয় বলে বর্ণিত হয়েছে। রশিদ বর্বরদের শায়েস্তা করতে তাঁর দুজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতিকে প্রেরণ করেন এবং তাদের ভয়াবহ ও কঠোর শাস্তি দেয়া হয় বলে মনে হয়।

ইমাম মুসা আল-কাজিমের মৃত্যু

সে বছরই ধর্মগুরু ইমাম মুসা আল-কাজিম মৃত্যুবরণ করেন। ইবনুল আসির বলেন যে, তিনি তাঁর বিনয় ও ধৈর্যের জন্য এবং মন্দ কাজের প্রতিদানে সর্বদা মঙ্গল করার জন্য 'আল-কাজিম' উপাধি পেয়েছিলেন। মদিনায় তিনি বিপুলভাবে সম্মানিত হতেন এবং এই সাধুপুরুষ বিদ্রোহী হতে পারেন এই আশঙ্কায় উত্তরাধিকার সূত্রে আংশিকভাবে পিতামহের সন্দিগ্ধ স্বভাবপ্রাপ্ত রশিদ তাঁকে হিজাজ থেকে নিজের সঙ্গে বাগদাদে নিয়ে আসেন। এখানে তাঁকে সমর্পণ করা হয় কারাগারের অধ্যক্ষ সিন্দী ইবনে শাহিকের বোনের হেফাজতে। ঐতিহাসিক বলেন, তিনি ছিলেন 'একজন পুণ্যবতী মহিলা', যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁর বন্দীর তত্ত্বাবধান করতেন। বিবেকের দংশনে রশিদ দু'বার এই নির্দোষ সাধুপুরুষকে মদিনায় তাঁর স্বগৃহে ফিরে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং প্রতিবারই তাঁর অন্তরের সুকুমার বৃত্তির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে জয়ী হয়েছিলে।

---

১. এই নহরটির জন্য পনের লক্ষ দীনারেরও বেশি খরচ হয়েছিল।

২. কনস্ট্যান্টিনোপলের সম্রাটরা খাজার প্রধানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

অবশেষে ইমামের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং তিনি সেই মহিলার ঘরেই মৃত্যুবরণ করেন, যিনি কয়েক বছর ধরেই ছিলেন তাঁর কারাগারের রক্ষাকর্ত্রী।[১] আর-রিজা[২] (সন্তুষ্ট) উপাধিপ্রাপ্ত তাঁর পুত্র আলি, তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে পবিত্র ইমামের পদে অধিষ্ঠিত হন। সম্ভবত তিনি সেকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।

বারমেকি বংশের পতন [৮০৩ খ্রিস্টাব্দ]

১৮৭ হিজরি এমন এক ঘটনার জন্য উল্লেখযোগ্য যা কেবল রশিদের রাজত্বকালের উজ্জ্বলতাকেই ম্লান করেনি, বরং মনস্তাপ ও অকৃতজ্ঞতাজনিত বিবেকানুভূতি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকেও সমাচ্ছন্ন করে থাকবে। সতের বছর অবিচল নিষ্ঠা ও অসাধারণ যোগ্যতার সাথে বারমেকী পরিবার সম্রাটের সেবা করেছিল। জনসাধারণ ছিল সুখী ও সমৃদ্ধ, সাম্রাজ্য হয়ে উঠেছিল ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিমান, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সব জায়গায় সভ্য জীবনধারার কলাকৌশলের অনুশীলন হত। কিন্তু যে আড়ম্বর ও জাঁকজমক, পরোপকারিতা ও অপরিসীম দানশীলতা তাঁদেরকে জনসাধারণের মধ্যে পূজনীয় করে তুলেছিল, তা-ই এমন একদল শত্রু সৃষ্টি করে যারা সর্বতোভাবে তাঁদের ধ্বংস সাধন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। পরিণামে যে অদৃষ্ট তাঁদের উপর অর্পিত হয়েছিল তার বহু কারণ নির্দেশ করা হয়েছে। এই সহজাত গুণসম্পন্ন পরিবারের প্রতি রশিদের আচরণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কয়েকজন ঐতিহাসিক সে সময় প্রচলিত যেসব কিংবদন্তী ও উপাখ্যান গ্রহণ করেছিলেন ইবনে খালদুন সেগুলো পরীক্ষা করেছেন। রশিদের বোন আব্বাসার সাথে জাফর বিন ইয়াহিয়ার বিয়ের গল্পকে তিনি উপহাস করেছেন অলীক কল্পনা বলে। বারমেকীদের পতনের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, দেখা যাবে 'যে কায়দায় তাঁরা সমস্ত ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন এবং দখল করেছিলেন সরকারি রাজস্বের নিরংকুশ তদারকি যার ফলে রশিদ প্রায়শই প্রয়োজনের তাগিদে অর্থ চাইতে বাধ্য হতেন এবং কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে সামান্য অর্থও পেতেন না। তাঁদের প্রভাব ছিল অপরিসীম এবং তাঁদের খ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজ্যের সমস্ত সামরিক বা অসামরিক উচ্চ পদগুলো তাঁদের পরিবার বা অনুগামীদের মধ্যে থেকে মনোনীত কর্মচারীদের দ্বারা পূরণ করা হত। সমস্ত মুখগুলো আবর্তিত হত তাঁদের দিকে; সকল মাথানত হত তাঁদের সামনে; আবেদনকারী ও প্রার্থীদের প্রত্যাশা কেবল তাঁদের উপরই ন্যস্ত থাকত; তাঁদের দানশীলতা বর্ষিত হত সবদিকে, সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে, নগর ও গ্রামে সব জায়গায়; সবাই তাঁদের প্রশংসা করত এবং তাঁদের প্রভুর চেয়েও তাঁরা ছিলেন অনেক বেশি জনপ্রিয়।' এসব ব্যাপার সভাসদ ও সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে বিরাগ জাগিয়ে তুলেছিল; 'এবং রাজকীয় সিংহাসনের শীতল ছায়ায় তাঁরা যে নরম বিছানায় শুয়েছিলেন তা অপবাদে পরিণত হয়ে তাঁদেরকে বৃশ্চিকের মত দংশন করতে লাগল।' তাঁদের সবচেয়ে ঘোরতর শত্রু প্রাসাদাধ্যক্ষ ফজল বিন রাবী নিজের পদমর্যাদার মাধ্যমে

---

১. কেউ কেউ বলেন তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল।

২. পরে দ্রষ্টব্য।

প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগিয়ে বারমেকীদের বিরুদ্ধে রশিদের মনকে বিষিয়ে তোলেন এবং ইবনে খালদুনের মতে তাঁর এমন সব বন্ধু ছিল, যাঁরা জ্বলন্ত ঈর্ষার বশে আত্মীয়তার বন্ধন পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিলেন। রশিদের কাছে গুঞ্জন তোলা হয় যে বনু আব্বাসের পতন ঘটাতে বারমেকীরা ষড়যন্ত্র করছে। সন্দেহের অন্ধ রোষ ও স্বৈরাচারী ক্রোধ অবিরাম কুৎসার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বহু প্রজন্মের বিশ্বস্ত সেবাকে বিস্মৃত হয়। সহসা একরাতে উজির জাফরকে হত্যা এবং বৃদ্ধ ইয়াহিয়া ও তাঁর অন্যান্য পুত্র ফজল (রশিদের দুধ ভাই), মুসা ও মহম্মদকে কয়েদ করার আদেশ জারি হয়। নগরীতে রশিদ ও তাঁর উজিরের নৈশ টহলদারীর অনুচর মসরুরের দ্বারা সংঘটিত হয় জাফরের হত্যাকাণ্ড; অন্যরা রাক্কায় (প্রাচীন নাইসফোরিয়াম) বন্দী হন এবং বাজেয়াপ্ত করা হয় তাঁদের সম্পত্তি। প্রথমে তাঁদের কষ্ট দেওয়া হত না, তাঁদের ভৃত্যদেরকে কারাগারে তাঁদের খিদমত করতে দেওয়া হত এবং দৃষ্টি দেওয়া হত তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি। এক বছর পর আবদুল মালিক-বিন সালেহ[১] তাঁর কর্মসচিব তথা পুত্র কর্তৃক খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অভিযোগ করা হয় যে বারমেকীরা জড়িত না থাকলেও তাঁর ষড়যন্ত্রের কথা অবগত ছিল। এর ফলে রশিদ তাঁর সব বন্দীর সাথেই নিষ্ঠুর আচরণ করেন এবং এ যাবতকাল তাঁদের প্রতি যে সৌজন্য প্রদর্শন করা হত তা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়।

ইয়াহিয়া বারমেকীর মৃত্যু [৮০৬ খ্রিস্টাব্দ]

বৃদ্ধ ও বিশ্বস্ত ইয়াহিয়া ১৯০ হিজরীতে কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এবং তাঁর গুণান্বিত পুত্র ফজল তিন বছর পরই তাঁর মৃত্যুকে অনুসরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর মুসা ও মহম্মদ মুক্তি পেলেও আবদুল মালিক কারারুদ্ধ ছিলেন আমিনের সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত, যিনি তাঁকে মুক্তি দেন এবং নিযুক্ত করেন সিরিয়ার শাসনকর্তা। মামুন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি বারমেকীদের পদমর্যাদাসহ সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন।

খারিজী সম্প্রদায়

এই রাজত্বে খারিজীরাও যথারীতি বহুবার বিদ্রোহ করে, কিন্তু তাঁদের বিদ্রোহ দমন করা হয় বিনা ক্লেশে।

আরব্য জোয়ান অব আর্ক

বিদ্রোহীদের নেত্রী হিসেবে লায়লা[২] নামে এক তরুণীর আত্মপ্রকাশের জন্য একটি বিদ্রোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মৃত্যু হলে তিনি (লায়লা) সৈনাপত্যের ভার গ্রহণ করেন এবং বারবার যুদ্ধ করেন রশিদের সৈন্যবাহিনীর সাথে, যতক্ষণ না রাজকীয় বাহিনীর

---

১. আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের পৌত্র, সুতরাং মাহদীর পিতৃব্য পুত্র।
২. ইবনুল আসীর। ইবন খাল্লিকান তাঁর নাম দিয়েছেন 'আল-ফারিয়া'।

সেনাপতি তাঁর এক আত্মীয়[১] অস্ত্র ত্যাগ করে তাঁকে কুমারী সুলভ জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে প্রবৃত্ত করেন। এই 'আরব্য জোয়ান অব অর্ক' সুন্দরী ও কবি হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

মসুল নগরীর প্রাকাররাজী ধ্বংসীভূত

মসুল নগরীর জনসাধারণের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের শাস্তিস্বরূপ রশিদ তাদের নগরীর প্রাচীরগুলো ধ্বংস করে দেন। মুদার ও হিময়ারদের কলহে দামাসকাসও হয়ে পড়েছিল বিপর্যস্ত। সিরীয়রা তাঁর বংশের প্রতি সুপ্রসন্ন নয় জেনে রশিদ কিছু সময়ের জন্য গোত্রদ্বয়কে তাদের অভ্যন্তরীণ কলহে দুর্বল হতে দিয়েছিলেন। পরিশেষে তিনি হস্তক্ষেপ করেন এবং কঠোর হাতে বন্ধ করেন তাদের গোলযোগ।

বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধ

কিন্তু বাইজান্টাইনদের সাথে রশিদের যুদ্ধই হল তাঁর রাজত্বকালের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা। ১৮১ হিজরীতে তারা মাহদীর সময়ে রানী আইরিনের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে এবং আক্রমণ করে মুসলিম রাজ্য। ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাদের সৈন্যবাহিনী পরাভূত হয়, অধিকৃত হয়; মাতারা ও আনসিরা নগরী গৃহযুদ্ধের ফলে যে সাইপ্রাস দ্বীপ আরবদের অধীনতাপাশ ছিন্ন করেছিল তা পুনরধিকৃত হয় এবং ক্রীট দ্বীপও হয় বিজিত। একটি নতুন চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং গ্রিকরা পুনরায় পূর্ব শর্তানুযায়ী নিয়মিত কর দানে বাধ্য হয়। পরস্পরের বন্দী বিনিময় ঘটে এবং কিছুদিনের মতো শান্তি স্থাপনের সব রকম সম্ভাবনা দেখা দেয়।

১৮২ হিজরি; ৭৯২ খ্রিস্টাব্দ

নীতিহীন ও নির্মম আইরিন ১৮২ হিজরীতে তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র ষষ্ঠ কনস্ট্যান্টাইনকে অন্ধ করে দিয়ে অগাস্টা ('আতাসা' রূপে আরবীকৃত) উপাধি ধারণ করে সিংহাসন দখল করেন। তাঁর প্রিয়পাত্র খোজা এটিয়সের সহায়তায় তিনি পাঁচ বছর শাসন চালান, যে সময় অস্থিরমতি গ্রিকরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তিনি অপসারিত ও নির্বাসিত হন এবং নাইসফোরাস[২] নামে তাঁর কোষাধ্যক্ষ হন রাজসজ্জায় বিভূষিত। স্বভাবগত বিশ্বাসঘাতকতার সাথে তিনি 'আইরিন ও মুসলমানদের মধ্যে সংস্থাপিত শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করতে'[৩] বদ্ধপরিকর হন এবং একটি অপমানজনক বার্তা পাঠান রশিদের কাছে। 'রোমক সম্রাট নাইসফেরাসের নিকট হতে আরবদের রাষ্ট্রপ্রধান হারুনের নিকট : সত্যই আমার পূর্ববর্তী সম্রাজ্ঞী তোমাকে রুখের (কিশতী) আসনে বসিয়েছেন আর নিজেকে স্থাপন করেছেন বোড়ের আসনে[৪] এবং তাঁর বিস্তর ঐশ্বর্য তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, আর তা ঘটেছে তাঁর রমণীসুলভ দুর্বলতা ও

---

১. ইয়েজিদ বিন মাজাইদ।
২. আরবদের দ্বারা নিকফুর বলে অভিহিত।
৩. ইবন খালদুন।
৪. হারুন-অর-রশিদ পশ্চিম এশিয়ায় সম্প্রতি যে দাবা খেলার প্রবর্তন করেন এতে তার ইঙ্গিত রয়েছে।

নির্বুদ্ধিতার জন্য। এক্ষণে তুমি আমার পত্রপাঠমাত্র তাঁর (আইরিন) নিকট হতে গৃহীত সমুদয় সম্পদ প্রত্যর্পণ কর, অন্যথায় তরবারিই তোমার ও আমার মধ্যে মীমাংসা করবে।' ঐতিহাসিক বলেন, 'রশিদ এই চিঠি পড়ে ক্রোধে এতই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন যে কথা বলা দূরে থাক, কেউ তাঁর মুখের দিকে তাকাতেও সাহস করে না, ভয়ে তাঁর সভাসদরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান এবং তাঁর অমাত্যবর্গ নির্বাক হয়ে মন্ত্রণা দানে নিবৃত্ত হন।'

অতঃপর তিনি গ্রিকের পত্রের উল্টো পৃষ্ঠায় লেখেন 'আমিরুল মুমেনীন হারুনের নিকট হতে রোমক কুকুর নাইসফোরাসের নিকট : যথার্থই আমি তোমার চিঠি পড়েছি; জবাবটা চোখেই দেখবে, কানে শুনবে না!' এবং তাঁর যে কথা সেই কাজ। তিনি সেদিনই সসৈন্যে যাত্রা করেন এবং বাইজান্টাইনদের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি হিরাক্লিয়া[১]তে না পৌছানো পর্যন্ত পথে কোথাও বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করেন না। দাম্ভিক গ্রিক এই স্থানেই খলিফার সম্মুখীন হন এবং বরণ করেন শোচনীয় পরাজয়।[২] 'আরবদের দুর্দমনীয় যুদ্ধবেগ কেবলমাত্র প্রতারণা ও লোক দেখানো অনুতাপের কলাকৌশল দ্বারাই রোধ করা সম্ভব ছিল।' নাইসফোরাস শান্তি প্রার্থনা করেন এবং অঙ্গীকারবদ্ধ হন বর্ধিত কর দানে, যা তিনি প্রতি বছর মিটিয়ে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। এটি গৃহীত হয় এবং বিজয়ী খলিফা প্রত্যাবর্তন করেন রাক্কায়। সেখানে গিয়ে রশিদ থিতু হতে না হতেই প্রতিকূল ঋতুতে খলিফার পক্ষে পুনরায় যুদ্ধ করা অসম্ভব বিবেচনা করে নাইসফোরাস তাঁর চুক্তি ভঙ্গ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ সম্পর্কে তিনি ভুল ধারণা করেছিলেন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা শোনামাত্র রশিদ আবার যাত্রা করেন। 'প্রচণ্ড শীতে টরাস পর্বতের তুষারপুঞ্জ অতিক্রম করে আমিরুল মুমেনীনের দুঃসাহসিক ও দ্রুত অভিযানে নাইসফোরাস বিস্মিত হন; তাঁর ফন্দিবাজী ও যুদ্ধ-কৌশল ব্যর্থ হয় এবং বিশ্বাসঘাতক গ্রীক তিন স্থানে গুরুতর আঘাত নিয়ে তাঁর চল্লিশ হাজার অনুচরসহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন।'[৩] নাইসফোরাস পুনরায় শান্তি ভিক্ষা করেন এবং তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। বাইজান্টাইন চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে রশিদ ফ্রিজিয়া ত্যাগের আগে এমন বন্দোবস্ত করেন যাতে আর চুক্তি ভঙ্গ না হয়। কিন্তু 'যখনই হারুন অন্যত্র ব্যাপৃত থাকতেন, তখনই নাইসফোরাস ভঙ্গ করতেন তাঁর চুক্তি এবং প্রায়শই পরাজিত হতেন।'[৪] রাইয়ের (প্রাচীন রাজেস) শাসনকর্তা অবাধ্যতার পরিচয় দিলে তাঁকে বশে আনার জন্য ১৮৯ হিজরীতে রশিদ সেখানে গমন করেন, এটি ছিল গ্রীকের (নাইসফোরাস) জন্য উত্তম সুযোগ, যা তিনি ছাড়তে পারেন না এবং তিনি নতুনভাবে আক্রমণের চেষ্টা করেন, তাঁকে মোকাবিলা করতে হয় রশিদের পুত্র কাসিমের সাথে, যাঁকে খলিফা এই সময় সীমান্ত প্রদেশের সৈন্যধ্যক্ষ পদ প্রদান করে 'তাঁকে আল্লাহর রাহে জেহাদের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন'। খলিফা পুনরায় চুক্তিভঙ্গের অপরাধ মার্জনা করেন।

---

১. আরব ঐতিহাসিকরা হিরাক্লিয়াকে যুদ্ধস্থল বলে বর্ণনা করলেও একজন আধুনিক লেখকের মতে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল থিমব্রিস নদীর তীরে ডরিলিয়াম নামক স্থানে।

২. সয়ুতি এটিকে অভিহিত করেন 'বিখ্যাত যুদ্ধে এবং প্রকাশ্য বিজয়' বলে।

৩. গিবন।

৪. মুর।

নাইসফোরাসের বিশ্বাসঘাতকতা

রাইয়ে অবস্থানকালে রশিদ দায়লম ও তাবারিস্তানের বিবদমান ম্যাগিয়ানদেরকে সাক্ষাৎ দান করেন। উদার ও বিবেচনাপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তাদের আনুগত্য সুনিশ্চিত হয় এবং লাভ করেন তাদের রাজভক্তি। অতঃপর রশিদ রাক্কার পথে বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করেন, যা এক্ষণে হয়ে ওঠে তাঁর স্থায়ী আবাসস্থল। এখান থেকে তিনি গ্রীক, উত্তরাঞ্চলের যাযাবর, সেই সঙ্গে অর্ধ-অনুগত সিরীয় গোত্রসমূহের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারতেন এবং এখানেই পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন রাষ্ট্রনায়ক আসতেন ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম ভোগ করতে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক গ্রীক (নাইসফোরাস) তাঁকে শান্তি দেয়নি। ট্রান্সক্সিয়ানায় একটি বিদ্রোহ নাইসফোরাসকে সুযোগ করে দেয়, তিনি যার অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি খলিফার রাজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ধ্বংস ও সর্বনাশে ভরে তোলেন সীমান্ত রাজ্যগুলোকে। এই বিশ্বাসঘাতকতা রশিদ আর বরদাস্ত করতে পারেন না। রাক্কার প্রতিনিধিরূপে মামুনকে পূর্ণ শাসনক্ষমতা প্রদান করে তিনি অভিযান চালান উত্তর দিকে। গ্রীকরা শপথপূর্বক যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তা প্রতিপালন এবং শান্তিরক্ষার জন্য এক্ষণে এটি 'জিহাদ' অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধে পরিণত হয়। এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার বেতনভোগী সৈন্য[১] তাঁর পতাকার অনুগমন করে, অধিকন্তু সামরিক তালিকায় যাদের নাম ছিল না এমন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও। তারা উত্তরে বিথিনিয়া পর্যন্ত সমগ্র এশিয়া মাইনর এবং পশ্চিমে মিসিয়া ও কারিয়া পর্যন্ত দখল করে নেয়। নগরীর পর নগরী তাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় রশিদের সেনাপতিদের সামনে; ইয়াজিদ বিন মাখলাদ লিডিয়া প্রদেশের কুনিয়া[২] (আইকোনিয়াম) ও ইফিসাস অধিকার করেন; মা'আন বিন জাইদার পুত্র শুরাবিল কর্তৃক বিজিত হয় সাকাল্লিয়া, থিবাসা (দাবসা), মালিকোপিয়া, সাইডারোপলিস, আন্দ্রাসাস এবং নাইসিয়া[৩]। অতঃপর বিজয়ী সেনাবাহিনী কৃষ্ণসাগরের তীরে হিরাক্লিয়া পন্টিকা অবরোধ করে। নাইসফোরাস প্রেরিত একটি সৈন্যবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং প্রবল আক্রমণে অধিকৃত হয় হিরাক্লিয়া।

রশিদের অদূরদর্শী বদান্যতা

গ্রিক (নাইসফোরাস) আবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং খলিফা তাঁর অদূরদর্শিতাবশত তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। বাইজান্টাইন শাসনের অবসান ঘটিয়ে আরবরা তখন কনস্ট্যান্টিনোপল দখল করলে তা পৃথিবীর শান্তি ও সভ্যতার পক্ষে কতই না মঙ্গলজনক হত! নাইসফোরাস, তাঁর পরিবারের রাজকুমাররা এবং সাম্রাজ্যের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ শপথপূর্বক একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যাতে তাঁরা বর্ধিত কর প্রদান ছাড়াও রাজা ও তাঁর পরিবারের প্রত্যেকের জন্য ব্যক্তিগত কর প্রদান করতে রাজী হন।

---

১. 'মুরতাজাকা'। এরা ছিল পেশাদার সৈনিক।

২. ইবনে খালদুন এই নাম দিয়েছেন; অন্য ঐতিহাসিকরা একে অভিহিত করেন 'মালকুনিয়া' বলে।

৩. শেষ চারটি নগরীর নাম থিয়োফেনস কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছে; আরব। ঐতিহাসিকরা কেবল অল্প কয়েকটি নাম উল্লেখ করেন।

১৯২ হিজরি; ৮০৮ খ্রিস্টাব্দ

কিন্তু ১৯২ হিজরীতে গ্রিকরা আবার তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে। মূইর বলেন, 'এসব যুদ্ধের তিক্ত পরিণতিতে জ্বলে ওঠে ধর্মীয় বিদ্বেষানল।' ঠিক সেই সময় খোরাসানে গোলযোগ দেখা দিলে রশিদকে পূর্বাঞ্চলে চলে যেতে হয় এবং কিছুদিন তিনি সমুচিত শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করতে বাধ্য হন। খুজায়মা বিন খাজিম নামে এক অভিজ্ঞ সেনাপতিকে সহকারী নিযুক্ত করে কাসিমকে রাক্কায় এবং আমিনকে বাগদাদে রেখে ক্লান্ত সম্রাট পূর্বাঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন। মামুন পিতার সঙ্গী হন; কিন্তু পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে পারস্যে ঢুকেই তিনি একদল সৈন্যসহ এগিয়ে যান মার্ভের দিকে, পক্ষান্তরে মূল বাহিনীসহ খলিফা ধীরগতিতে যাত্রা করেন। রাক্কা পরিত্যাগের পর থেকে তিনি যে পীড়ায় ভুগছিলেন তুস[১] নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত সানাবাদ নামক গ্রামে পৌঁছে তা গুরুতর আকার ধারণ করেন। অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসছে উপলব্ধি করে রশিদ সৈন্যদলে অবস্থানরত তাঁর পরিবারের লোকজনকে (হাশিমীদেরকে) ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে সম্বোধন করেন এভাবে : 'সব যুবকই বৃদ্ধ হবে, যারা পৃথিবীতে এসেছে তাদের সবারই হবে মৃত্যু। আমি তোমাদেরকে তিনটি নির্দেশ দিচ্ছি : বিশ্বস্ততার সাথে তোমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, ইমামদের (খলিফাদের) অনুগত থাকবে এবং পরস্পরের মধ্যে থাকবে একতাবদ্ধ; আর মহম্মদ ও আবদুল্লাহর (আমিন ও মামুন) প্রতি লক্ষ্য রাখবে; যদি একে অপরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় তাহলে তার বিদ্রোহ দমন করবে এবং তার অবাধ্যতাকে চিহ্নিত করবে কলঙ্কের কালিমায়।' অতঃপর তিনি অনুচর ও সৈন্যদের মধ্যে প্রচুর উপঢৌকন বিতরণ করেন।

১৯৩ হিজরি; ৮০৯ খ্রিস্টাব্দ

দুদিন পরই ঘনিয়ে আসে অন্তিম মুহূর্ত; তেইশ বছর ছয় মাস গৌরবময় রাজত্বের পর ৪ জমাদিউস সানী শনিবার রশিদ যৌবনেই পরলোক গমন করেন।

তাঁর চরিত্র ও শাসনের মূল্যায়ন

ঐতিহাসিক সমালোচনার তুলাদণ্ডে তাঁকে যত সূক্ষ্মভাবেই বিচার করা হোক, হারুন-অর-রশিদ সবসময় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপ্রধান ও শাসকদের স্থান গ্রহণ করবেন। বর্তমানের সাথে অতীতের তুলনা, ঊনবিংশ শতাব্দীর মনুষ্যত্ব, কৃষ্টি ও সভ্যতার সঞ্চিত উত্তরাধিকার এবং যুগ-যুগব্যাপী সমৃদ্ধি ও উন্নতির অবদানের সাথে সহস্র বছর আগের নির্মমতা ও কঠোরতার তুলনা করা ভুল। রশিদের চরিত্রের দোষ, মাঝে মাঝে তাঁর সন্দেহপ্রবণতা বা উগ্র মেজাজের আত্মপ্রকাশ ছিল স্বৈরাচারেরই স্বাভাবিক ফলস্বরূপ। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি যে এত আত্মসংযমী, জনসাধারণের উন্নতি বিধানে এত মনোযোগী এবং প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণে এত যত্নবান ছিলেন, তা তাঁর বিচক্ষণতারই পরিচয় বহন করে। কর্তব্য সম্পাদন করতে তিনি নিজেকে সামান্যতম বিরামও দিতেন না; অনিষ্টের

---

১. কবি ফেরদৌসীর জন্মস্থান।

প্রতিকার, অন্যায়ের প্রতিবিধান এবং ব্যক্তিগতভাবে জনসাধারণের অবস্থা অবহিত হতে তিনি বারবার সাম্রাজ্যের পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিভ্রমণ করতেন। নয়বার তিনি স্বয়ং পবিত্র নগরীদ্বয়ে (মক্কা ও মদিনা) তীর্থযাত্রীদের কাফেলার নেতৃত্ব দেন এবং এভাবে তিনি অধীনস্থ জাতিসমূহকে তাঁর ব্যক্তিত্ব স্বীকার করতে এবং ইসলামের ঐক্যসূত্রের সুযোগ-সুবিধার মূল্য হৃদয়ঙ্গম করতে প্রবৃত্ত করেছিল। সে যুগে তাঁর দরবারই ছিল সবচেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ; সেখানে পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চল থেকে বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা সমবেত হতেন, যাঁরা সবসময় অভ্যর্থনা পেতেন মহানুভবতাপূর্ণ বদান্যতার সাথে। শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিমূলক প্রতিটি শিক্ষার ক্ষেত্রে অবাধ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করা হত। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মত মর্যাদা ও সম্মান আরোপ করে তিনিই প্রথম সঙ্গীতকলাকে এক অভিজাত পেশায় উন্নীত করেন।

হানাফী মজহাবের বিধি-বিধান

তাঁর রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি[১] আবু ইউসুফের নেতৃত্বে আইনজ্ঞ দলের সহায়তায় হানাফী মজহাবের বিধি-বিধান একটি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। হানাফী মজহাব আবু হানিফার নামে অভিহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে সেটি রশিদের প্রধান বিচারপতিরই সৃষ্টি। আবু ইউসুফ ক্লেনমায়ের নমনীয়তার সাথে বেকনের জ্ঞানলিপ্সার সমন্বয় সাধন করেন। আবু ইউসুফ যে দর্মবিধির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তা শৈশবের যৌর্য ও তারুণ্য কিংবা বিরুদ্ধে-শক্তির অবিদ্যমানতাবশত তখনো পর্যন্ত পরবর্তীকালের দৃঢ়তা অর্জন করেনি। কোন ধর্মমতকে যে পরিমাণে বিরুদ্ধ-শক্তির সাথে সংগ্রাম করতে হয় তা সেই পরিমাণে আপন মতাবলম্বীদেরও একবিধ আচরণের জন্য পীড়াপীড়ি করে। এ সময় কূটতত্ত্বের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ধর্মবিধি ছিল স্থিতিস্থাপকতা-সম্পন্ন এবং তাতে উন্নতির নিঃসন্দেহ লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু আইনজ্ঞদের প্রতি রশিদ যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং তাঁদের আইন বিশ্লেষণের প্রতি যে গুরুত্ব দিতেন তাতে এমন এক মোল্লাশ্রেণীর উদ্ভবের পথ প্রশস্ত করে যাঁদের গুরুতর প্রতিপত্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল খলিফাদের সময়ে সমৃদ্ধির শ্বাসরোধ করেছিল এবং প্রগতির সমূহ পথকে করছিল অবরুদ্ধ। মনসুরের আমলে যে বৃহৎ সুন্নী মজহাবের বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল এভাবে তার বাহ্যিক কাঠামো তৈরি হয়, যদিও পরবর্তী আব্বাসী খলিফারা যে পর্যন্ত তাঁদের পার্থিব ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে ধর্মীয় প্রতিপত্তি রক্ষায় আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য না হয়েছিলেন সে পর্যন্ত তার পূর্ণতা সাধিত হয়নি। রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনে জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ শাস্ত্রানুমোদিত হয় এবং এভাবে নির্বাচিত ব্যক্তি এক্ষণে সাধারণ-তন্ত্রের ধর্মীয় নেতা বা ইমাম রূপে স্বতন্ত্র পদপ্রাপ্ত হন। তাঁরা নিজেদেরকে অভিহিত করেন 'আহলুস-সুন্নাত-ওয়াল জামায়াত বা ঐতিহ্য (হাদীস) ও জনসাধারণের সর্ববাদীসম্মত মতের অনুগামী বলে।'

---

১. কাজী-উল-কুজ্জাত।

বিজ্ঞান ও সাহিত্য

রশিদ তাঁর পিতামহ মনসুর কর্তৃক বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি আরবী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য স্থাপিত বিভাগটির সম্প্রসারণ করেন এবং বৃদ্ধি করেন কর্মচারীর সংখ্যা, যদিও মামুনের আমলে তা যে বিশাল আকার ধারণ করেছিল তাঁর আমলে সেরূপ হয়নি। তাঁর রাজত্বের সমগ্র দিনব্যাপী কিংবা অংশ বিশেষে যেসব প্রখ্যাত ব্যক্তি উন্নতি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁর পুত্রদের শিক্ষাদানের জন্য ভারপ্রাপ্ত বৈয়াকরণ আসমাঈ, শাফিঈ, আবদুল্লাহ বিন ইদ্রিস, ঈসা বিন ইউনুস, সুফিয়ান বিন সূরী, সঙ্গীতজ্ঞ ইব্রাহিম মসূলী, চিকিৎসাবিদ বখতিয়াশুর পুত্র গ্যাব্রিয়েল প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ইবনে খালদুন বলেন, একমাত্র কৃপণতা ব্যতীত রশিদ সব বিষয়ে তাঁর পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, কারণ উদারতা ও বদান্যতায় কোন খলিফাই তাঁকে অতিক্রম করতে পারেননি। নিজে কবি[১] হিসেবে কবিদের প্রতি তিনি ছিলেন বিশেষভাবে উদার। তাঁর রাজত্বকালে পাশ্চাত্য ও দূরপ্রাচ্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তিনিই প্রথম তাঁর দরবারে চীনের 'ফগফুর' (সম্রাট) এবং শার্লিমান প্রেরিত রাজদূতদের অভ্যর্থনা জানান। শেষের জনের কাছ থেকে প্রেরিত জমকালো উপঢৌকনসমূহের বর্ণনা এখনো রক্ষিত আছে, যাতে খলিফার রাজ্যের সাংস্কৃতিক অবস্থার কিছু আভাস পাওয়া যায়। উপহারসমূহের মধ্যে একটি ঘড়ি প্রেরিত হয়েছিল, যেটিকে বর্ণনা করা হয়েছে একটি অদ্ভুত শিল্পকাজ বলে।[২] তাঁর পুত্রদের মধ্যে যাঁরা বেঁচেছিলেন তাঁদের মধ্যে চারজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ : মহম্মদ 'আল-আমিন', আবদুল্লাহ 'আল-মামুন', কাসিম 'আল-মুতামিন' এবং আবু ঈশাক মহম্মদ 'আল-মুতাসিম'।

মহম্মদ আল-আমিন [১৯৩-১৯৮ হিজরি; ৮০৯-৮১৩ খ্রি.]

রশিদের মৃত্যু হয় যখন তখন আমিন ছিলেন রাজধানীতে, মামুন ছিলেন প্রাদেশিক সরকারের রাজধানী মার্ভে, কাসিম ছিলেন তাঁর কর্মস্থল কিন্নিরীনে, অন্যদিকে সম্রাজ্ঞী জুবাইদা ছিলেন রাক্কায়। হামাওয়াইহ নামক ডাক-বিভাগের প্রধান (সাহিবুল রবীদ) কর্তৃক খলিফার মৃত্যু সংবাদ বাগদাদে প্রেরিত হয় এবং পরদিনই আমিনের কাছে রাজকীয় সীলমোহর, তরবারি ও রাজপোশাক পাঠিয়ে দেন তাঁর ভাই সালেহ, যিনি মৃত্যুকালে রশিদের কাছে ছিলেন। আমিন সঙ্গে সঙ্গে য 'কসরুল-খুলদে' (স্বর্গীয় প্রাসাদ) বাস করছিলেন সেখান থেকে 'কসরুল

---

১. হেলেনকে সম্বোধন করে রচিত রশিদের কিছু কবিতা উত্তম। হেলেন বাস্তবিক বা কাল্পনিক যাই হোক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি জনৈকা সম্ভ্রান্ত রোমকের কন্যার প্রতি ছিলেন গভীরভাবে প্রেমাসক্ত, যাকে হিরাক্লিয়া থেকে সঙ্গে এনেছিলেন। রফিকা থেকে কয়েক মাইল দূরে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে তিনি তাঁর জন্য একটি প্রাসাদ বানিয়েছিলেন; তাঁর পূর্ববর্তী বাসস্থানের সম্মানার্থে এটিকে অভিহিত করেছিলেন 'হিরাক্লিয়া' বলে এবং তাকে পরিব্যাপ্ত করেছিলেন যাবতীয় বিলাসব্যসনে। মাস'উদির সময় প্রাসাদটি বিদ্যমান ছিল।

২. একটি পিতলের থালার উপর বলগুলি পতিত হয়ে এই ঘড়িতে বিভিন্ন ঘণ্টা বাজত, তখনই সহসা একটি দরজা খুলে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত কয়েকজন ঘোড়সওয়ার (ঘণ্টার সংখ্যানুপাতে) এবং ঘণ্টা থামামাত্র তারা আবার ঢুকে যেত দরজার ভেতরে, যেটি তাদের পিছন থেকে বন্ধ হয়ে যেত। (ম্যারিগনি দেখুন)

খিলাফতে' (খলিফার প্রাসাদ) স্থানান্তরিত হন। পরের দিন জামাতের নামাজে ইমামতি করেন, প্রদান করেন ধর্মীয় উপদেশ এবং সৈন্যসামন্ত, আমীর ওমরাহ ও জনসাধারণের নিকট থেকে চিরাচরিত বশ্যতার শপথ গ্রহণ করেন। মামুনও তাঁর খলিফা-ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করেন আনুগত্যসূচক অভিনন্দন ও উপঢৌকনাদি। রশিদের মৃত্যু সংবাদ পেয়েই জুবাইদা বাগদাদের উদ্দেশ্যে রাক্কা ত্যাগ করেন এবং তাঁর পুত্র কর্তৃক আনবারে অতীব জাঁকজমক ও সমারোহ সহকারে অভ্যর্থিত হয়ে রাজপ্রাসাদে নীত হন, যেখানে তিনি অবস্থান করেছিলেন আমিনের মর্মান্তিক মৃত্যুর সময় পর্যন্ত।

আমিন ও মামুনের চরিত্র

যে দুই ভাই শীঘ্রই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু হয়ে উঠেছিলেন এ ক্ষেত্রে তাঁদের চরিত্রগত পার্থক্য উল্লেখ করা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হবে। উভয়েই সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মাধ্যমে যত্নসহকারে শিক্ষালাভ করেছিলেন; আমিন ছিলেন তাঁর মা ও মাতুল ঈসার তত্ত্বাবধানে; মামুনের মা ছিলেন জনৈকা পারসী মহিলা, যিনি তাঁর শৈশবে প্রয়াত হওয়ায় তিনি (মামুন) হতভাগ্য উজির জাফরের অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত হন। উভয়েই একই ধরনের শিক্ষালাভ করেছিলেন; অলঙ্কার শাস্ত্র, সুকুমার সাহিত্য, আইন ও হাদীস–তৎকালে প্রচলিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে তাঁদেরকে শিক্ষাদান করা হয়েছিল নিষ্ঠাসহকারে; কিন্তু মামুনের গ্রহণেচ্ছু মন যেখানে তাঁর কাছে প্রদত্ত জ্ঞান হজম করে তাকে মর্মে স্থান দিয়েছিল, সেখানে আমিনের চপলমতি ও আমোদপ্রিয় চরিত্রে বাহ্যিক চাকচিক্য ব্যতীত এর আর কোন ফল হয়নি। আরব রাজকুমারের জন্য একটি আবশ্যকীয় গুণ বলে বিবেচিত বাগ্মিতায় উভয়েই ছিলেন সমপর্যায়ের, উপরন্তু মামুন ছিলেন আইনজ্ঞ ও দার্শনিক। কুরআন তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল এবং এর তফসিরেও (বিশ্লেষণ) তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। রশিদ তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্যের কথা অবহিত ছিলেন এবং অতি যত্নসহকারে তাঁদের জন্য যে ব্যবস্থাপনা করে রেখেছিলেন সম্ভবত মৃত্যুর পূর্বাহ্নেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার ভাবী ফল। তিনি ইচ্ছাপত্র সম্পাদন করেছিলেন, খোরাসানে তিনি ধন-সম্পদসহ যে সৈন্যদল নিয়ে এসেছিলেন মামুন হবে তার মালিক। পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোর প্রতিরক্ষার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। আর পিতা বাগদাদে যে বিশাল ধনভাণ্ডার রেখে গিয়েছিলেন আমিন তা আগেই দখল করেছিলেন। পিতার সাথে সম্পাদিত চুক্তি মেনে চলার ইচ্ছা সম্ভবত আমিনের ছিল না, রশিদের মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখেই তিনি সৈন্যদলকে হাত করতে গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন।

ফজল বিন রাবীর বিশ্বাসঘাতকতা

রাজপরিবারের অধ্যক্ষ ফজল বিন রাবী যিনি মৃত্যুর সময় রশিদের সঙ্গে ছিলেন এবং জাফর বারমেকীর পতনের পর থেকে যিনি কার্যত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, তিনি আমিনের পক্ষাবলম্বন করেন। তিনি তাঁর চরিত্রের দুর্বলতা জানতেন এবং নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর সঙ্গে থাকলে তিনিই হবেন প্রকৃত শাসনকর্তা। রশিদ যে সৈন্যদলকে মামুনের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়েছিলেন, তিনি তাদেরকে দ্রুত তাঁর সঙ্গে রাজধানীতে ফিরে

যেতে প্ররোচিত করেন। সৈন্যবাহিনী ও ধনভাণ্ডার নিয়ে ফজল রাবী চলে আসেন আমিনের কাছে, যিনি তাঁকে তৎক্ষণাৎ উজির পদে অধিষ্ঠিত করেন এবং দু'বছরের বেতন আগাম বণ্টন করে দেন সৈন্যদলের মধ্যে।

এভাবে ফজল বিন রাবীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে অর্থসম্পদ ও লোক-লস্কর উভয় দিক দিয়ে বঞ্চিত হয়ে মামুন সংকটজনক অবস্থায় পড়েন, বিশেষ করে জায়গীরদাররা হয়ে ওঠে বিদ্রোহপ্রবণ, কিন্তু কয়েকজন সুযোগ্য পরামর্শদাতার সাহায্যে তিনি তাঁর প্রদেশের সর্দাররা ও জনসাধারণের প্রীতি অর্জন করতে সর্বশক্তি দিয়ে আত্মনিয়োগ করেন। এই সংকটকালে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন ফজল বিন সহল নামে একজন পারসিক, যিনি অতীব যোগ্যতা সম্পন্ন হলেও তরুণ রাজকুমারের উপর নিজের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। প্রখ্যাত হারসামা এবং তাহির বিন হুসাইন (আল-খুজায়ী) নামে একজন উদীয়মান সৈনিকও ছিলেন তাঁর পক্ষে। মামুন গণ্যমান্য লোকদের সাথে বিবেচনাপূর্ণ ও উদার ব্যবহার করেন এবং হ্রাস করেন রাজকর। এসব এবং অন্যান্য ব্যবস্থায় তাঁর প্রতি দেশবাসীদের শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় এবং তারা তাঁর চারদিকে সংঘবদ্ধ হয় 'তাদের ভগিনীর পুত্র' হিসেবে। এ সময় পর্যন্ত খলিফা ভ্রাতার প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল দায়িত্বশীল, আনুগত্যমূলক এবং সতর্ক।

আমিনের অমিতব্যয়িতা

এভাবে মামুন যখন তাঁর অধীনস্থ প্রদেশে শাসনশৃঙ্খলা সম্পাদনে নিয়োজিত, আমিন তখন তাঁর শাসনাধীন রাজ্যকে দ্রুত ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছিলেন। অশ্ব শোষণকারী জোঁকের মত তাঁর অর্থালোপুপ সৈন্যদল, যারা যত পায় তত বেশি পাওয়ার জন্য চিৎকার করে, তাদের অনিশ্চিত ও স্বার্থপ্রণোদিত আনুগত্য লাভের উদ্দেশ্যে মুক্তহস্তে দান করে তিনি রাজকোষ নিঃশেষ করে ফেলেন। রাজ্যের সকল স্থান থেকে যাদুকর ও বিদূষক, জ্যোতিষী ও দৈবজ্ঞদের ডেকে পাঠানো হয় এবং অপরিমিত অর্থ ব্যয়িত হয় অতীব সুন্দরী নর্তকী, প্রখ্যাত গায়িকা এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত মানবতার হতভাগ্য নিদর্শনসমূহ নিয়োগে, যারা নব্য রোমের অভিজাতবর্গ কর্তৃক তাঁদের মহিলাদের প্রহরার জন্যই কেবল নিযুক্ত হত না, শাসনকাজের জন্যও নিযুক্ত হত।

একটি আরব্য নৃত্যনাট্য

এই রাজত্বকালে আমিনের ব্যক্তিগত পরিচালনায় অনুষ্ঠিত একটি প্রকৃত নৃত্যনাট্যের বিষয় আমরা জানতে পারি। খেজুর গাছের পাতা দুলিয়ে মোতিখচিত ও হীরকশোভিত চমকপ্রদ পোশাকে একশত সুন্দরী বালিকা মৃদু-মধুর সঙ্গীত লহরীর ঐকতানের সাথে নৃত্য করত একবার আগে একবার পিছে গমনাগমন করে, তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ হয়ে ঘন ঘন গোলক ধাঁধার মত ব্যূহ রচনা করে তার ভেতরে আসা-যাওয়া, আবর্তন ও অঙ্গভঙ্গি করত– যেন আলো ও রঙের এক সুদৃশ্য বৃত্ত বিশেষ। টাইগ্রিস (দজলা) নদীতে আনন্দোৎসবের জন্য তিনি সিংহ, হাতী, ঈগল, সাপ ও অশ্বাকৃতি পাঁচটি পর্যাপ্ত স্বর্ণমণ্ডিত ও সুসজ্জিত বজরা তৈরি করেন। পানোৎসবে সময় কাটিয়ে, আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হয়ে,

ইন্দ্রিয়পরায়ণ বাইজান্টাইন দরবার থেকে আনীত নর্তকী, গায়িকা এবং সচরাচর প্রাপ্ত পরান্নভোজীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আমিনসমূহ শাসনকার্য ছেড়ে দেন উচ্চাভিলাষী অথচ অনুপযুক্ত ফজল বিন রাবীর হাতে এবং ইসলামের শত্রুদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। বুলগেরীয়দের সাথে যুদ্ধে নাইসফোরাস (রোমক সম্রাট) নিহত হন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র ইসতিব্রাক (স্টরাসিয়াস)। তাঁর মৃত্যু হলে কিছুদিন রাজত্বের পর বাইজান্টাইনরা জর্জের (জুর্জিস) পুত্র মাইকেলকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে, যে জর্জ বিয়ে করেছিলেন ইসতিব্রাকের বোনকে। তা সত্ত্বেও মাইকেল তাঁর জনৈক সেনাপতি লিওর অনুকূলে সিংহাসন পরিত্যাগ এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বাধ্য হন। সিংহাসনে আরোহণ করেই অনতিবিলম্বে লিও মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেন এবং শুরু করেন তাদের উপর হামলাবাজী। কিন্তু প্রজাদের দুর্দশার প্রতি আমিন কর্ণপাত করেন না। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য নিজের শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করার পরিবর্তে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন তাঁর ভাইয়ের সাথে। মামুন যদি কখনো সিংহাসনে আরোহণ করেন তাহলে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত শাস্তি প্রদান করবেন এই ভয়ে ফজল বিন রাবী তাঁর ভাইয়ের (আমুনের) উত্তরাধিকার খারিজ করার জন্য আমিনকে প্ররোচিত করেন। প্রথমে তরুণ খলিফা এ পরামর্শে কান দেননি, কিন্তু ফজল অবিচল নিষ্ঠার সাথে এ কাজে আত্মনিয়োগ করায় এবং আলি বিন ঈসা বিন মাহান নামে অনুরূপ আরেকজন নীতিহীন সভাসদের মন্ত্রনার দ্বারা চালিত হয়ে আমিন সম্মত হন মারাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে।

আমিন ও মামুনের মধ্যে বিচ্ছেদ

মামুনকে বাগদাদে আসার জন্য পরোয়ানা পাঠান হয়; কিন্তু তিনি আপত্তি করেন প্রদেশকে নিরাপদে রেখে যেতে পারবেন না বলে। এর ফলে আমিন তাঁকে শাসন কর্তৃত্ব থেকে বরখাস্ত করেন এবং আদেশ জারি করেন ধর্মীয় মঞ্চ থেকে খুৎবার সময় তাঁর নামোল্লেখ নিষিদ্ধ করে। কাসিমও সেসব প্রদেশ থেকে বঞ্চিত হন, যেগুলোর শাসনভার রশিদ তাঁকে দিয়েছিলেন।

১৯৫ হিজরি; ৮১১ খ্রিস্টাব্দ

মামুনকে বঞ্চিত করে আমিন তাঁর শিশুপুত্র মুসাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন 'নাতিক বিল-হক'[১] নামক জমকালো উপাধিতে ভূষিত করে এবং কিছুদিন পর 'কায়িম বিল-হক'[২] উপাধি দিয়ে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকে করেন তাঁর (মুসার) পরবর্তী উত্তরাধিকারী। পশ্চিম সীমান্তে অবরোধ গড়ে তুলে মামুন এই বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দেন। বাগদাদের কোন গুপ্তচর যাতে তাঁর প্রজাবর্গকে ফুসলিয়ে হাত করতে না পারে সে জন্য খানাতল্লাসি ছাড়া কোন ব্যক্তিকেই প্রদেশে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। দুই ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ এবার সম্পূর্ণ হয়। কাবাগৃহে সাড়ম্বরে ঝুলিয়ে রাখা অঙ্গীকার পত্র দুটি আমিন চেয়ে পাঠান এবং সেগুলো ছিঁড়ে ফেলেন টুকরো টুকরো করে। আলি বিন ঈসা বিন মাহানের

---

১. সত্য বিঘোষক।
২. ঈমানে নিষ্ঠাবান।

পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক শক্তিশালী বাহিনী রাইয়ে পাঠান হয়। এখানে তারা মামুনের পক্ষে পাহারাত তাহির বিন হুসাইনের সম্মুখীন হয় এবং পরাজিত হয় শোচনীয়ভাবে। আলি বিন ঈসা নিহত হন এবং তার লোক-লস্কর হয় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, না হয় যোগ দেয় তাহিরের পক্ষে। তাহিরের বিজয়বার্তা রোমান সিনেটে প্রেরিত জুলিয়াস সিজারের বিজয়বার্তার মতই ছিল সংক্ষিপ্ত। তিনি কেবল লিখেছিলেন, 'আলি বিন ঈসার শির আমার সম্মুখে, তাঁর অঙ্গুরীয় আমার পরণে (অর্থাৎ বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ তাঁর আঙুলে) এবং তাঁর সেনাবাহিনী আমার অধীনে।' ২৫০ ফারসাং (৭৫০ মাইল) দূরত্ব অতিক্রম করে সংবাদটি পৌঁছে দেয়া হয়েছিল তিনদিনে।

মামুনকে তাঁর পিতা কর্তৃক ব্যক্তিগত দান-হিসেবে প্রদত্ত ১০০,০০০ দিরহাম এবং তাঁর দুই শিশুপুত্রের অভিভাবক নওফলের হেফাজতে রেখে যাওয়া তাঁর নিজস্ব সম্পত্তির সবই এবার ফজল বিন রাবী বাজেয়াপ্ত করেন। এই স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যকলাপের ফলে দুর্বল খলিফা ও লালসাপরায়ণ উজিরের বিরুদ্ধে বর্ষিত হয় অজস্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। আমিনের গলগ্রহ ব্যক্তিরা এমন পরামর্শও দেয় যে মামুনের পুত্রদ্বয়কে জামিনরূপে রাখা হোক এবং তিনি বশ্যতা স্বীকার না করলে তাদেরকে হত্যা করা হোক; কিন্তু তিনি (আমিন) এ উপদেশ শুধু বর্জনই করেন না বরং যেসব লোক এই লজ্জাকর পরামর্শ দিতে সাহসী হয়েছিল তাদেরকে তিনি কারারুদ্ধ করে শাস্তি দেন।

মামুন খলিফা বলে স্বীকৃত

বাগদাদ থেকে প্রেরিতে আরও কয়েকটি সৈন্যদলও প্রথমটির মতই একই ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে এবং পার্বত্য অঞ্চল শত্রুমুক্ত করে কাজবীন দখল করে তাহির পৌঁছে যান হলওয়ানে, যেখানে তিনি সেনানিবাস গড়ে তোলেন। হারসামাকে উত্তর প্রদেশে রেখে সেখান থেকে তাঁকে পাঠান হয় আহওয়াজে। মামুন এবার 'আমীরুল মুমিনীন' অর্থাৎ 'বিশ্বস্তদের সর্বাধিনায়ক উপাধি গ্রহণ করেন এবং সমগ্র পারস্য তাঁকে স্বীকার করে খলিফা হিসেবে। ফজল বিন সহলকে 'তিব্বত থেকে হামাদান এবং ভারত মহাসগর থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত' সমগ্র অঞ্চলের পূর্ন কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। তিনি সমর সচিব (আমীরুল হারব) ও রাজস্ব সচিবের (আমীরুল খারাজ) পদদ্বয় সংযুক্ত করেন। আলি বিন হিশামের উপর সমর বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত হয়, অন্যদিকে রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন নুয়াইম বিন খাজিম, যাঁকে হাসান বিন সহল সাহায্য করতেন সহকারী হিসেবে।

পূর্বাঞ্চলে যখন এসব ঘটনা ঘটছিল তখন সিরিয়ায় গোলযোগ দেখা দেয় প্রথম মু'আরিয়ার এক বংশধরের[১] নেতৃত্বে, যিনি নিজেকে খলিফা হিসেবে গ্রহণ করতে জনসাধারণকে আহ্বান জানান। বীরপ্রবর মাসলামাহর এক পৌত্রও একই সময় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিদার রূপে আবির্ভূত হন; কিন্তু তাঁদের সমর্থকরা শীঘ্রই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং দুই ভূয়া দাবিদার যেভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই অদৃশ্য হয়ে যান।

---

১. সুফিয়ানী নামে পরিচিত আলি বিন আবদুল্লাহ বিন খালিদ বিন ইয়াজিদ বিন মু'আবিয়া। তাঁর মায়ের নাম নফিসা; তিনি হুসাইনের সাথে নিহত আলির পুত্র আব্বাসের দৌহিত্র।

ইতিমধ্যে মামুনের সেনাপতি আহওয়াজ, ইমামা, বাহরাইন ও ওমান অধিকার করেন, তারপর উত্তরদিকে ঘুর পথে গমন করে দখল করেন ওয়াসিত। তাঁর দ্রুতগতি এবং পূর্ব আরব উপকূল ভাগের বশ্যতা স্বীকার অন্যান্য স্থানের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কুফায় নিযুক্ত আমিনের শাসনকর্তা হাদীর পুত্র আব্বাস মামুনের আধিপত্য স্বীকার করেন। তাঁকে অনুসরণ করেন মাহদীর পুত্র বসরার শাসনকর্তা মনসুর এবং ঈসার[১] পুত্র পবিত্র নগরীদ্বয়ের (মক্কা ও মদিনা) শাসনকর্তা দাউদ। তাঁরা সবাই উত্তম ব্যবহার পান এবং নিজ নিজ পদে বহাল হন স্থায়ীভাবে।

বাগদাদ অবরোধ [১৯৭ হিজরি, ৮১৩ খ্রি.]

অতঃপর তাহির উত্তর দিকে ফিরে গিয়ে মাদাইন দখল করেন, যা তখনো পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল; তারপর তিনি উপনীত হন বাগদাদের উপকণ্ঠে, পক্ষান্তরে উত্তরদিক দিয়ে হারসামা রাজধানীতে এসে পড়েন। একই সময় উপস্থিত হন মুসাঈবের পুত্র জুহাইর নামে আরেকজন সেনাপতি এবং এই তিনজন মিলে এবার বাগদাদ অবরোধ করেন। আম্বর ফটকের একটি বাগানে তাহির অবস্থান করেন, অন্যদিকে হারসামা অবতীর্ণ হন নূরবীন নামে নদীর একটি নিষ্ক্রমণ-পথে। কয়েক মাস ধরে অবরোধ চলে; আমিন তাঁর সৈন্যদের জন্য এবং যেসব লোক তাঁর চারদিকে সমবেত হয়েছিল তাদের জন্য রাজকোষ শূন্য করে ফেলেন; অবশেষে সোনা ও রূপার পাত্রগুলো গলিয়ে বিলি করে দেন সমর্থকদের মধ্যে। অবরোধের সময় বাগদাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়; যেসব প্রাসাদ ও অট্টালিকা আক্রমণ বা প্রতিরোধের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় উভয়পক্ষই সেগুলোকে ভেঙে ফেলে; অর্ধেক নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং জনসাধারণের দুর্ভোগ হয় হৃদয়বিদারক। বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আমিনের পক্ষ ত্যাগ করতে থাকেন, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকেরা লড়াই চালিয়ে যায় অতীব দৃঢ়তা সহকারে। অবশেষে আমিন তাঁর মা ও পরিবারবর্গসহ নদীর (দজলা) পশ্চিম তীরে মনসুর নির্মিত দুর্গে[২] আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এখানেও শীঘ্রই তাঁর অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে এবং তখনো যে সামান্য সংখ্যক পরামর্শদাতা তাঁর পক্ষে ছিলেন তাঁরা তাঁকে উপদেশ দেন সিরিয়ার দিকে ধাবিত হতে। কিন্তু আত্মসমর্পণের পর তাঁকে মামুনের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে এমন একটি প্রস্তাব তাঁর মনপুত হয়, কারণ ভাইয়ের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তিনি অবহিত ও আস্থাবান ছিলেন। সেই অনুসারে আলোচনা চলতে থাকে; কিন্তু তাহির গোঁ ধরেন যে আমিনকে তাঁর হাতেই আত্মসমর্পণ করতে হবে পক্ষান্তরে হতাভাগ্য খলিফাও জেদ ধরেন, সেই একচক্ষু লোকের[৩] ক্ষমতায় নিজেকে সোপর্দ না করতে যাঁকে তিনি অবিশ্বাস করতেন এবং মনে করতেন তাঁর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে শত্রুভাবাপন্ন বলে। তিনি তাঁর পিতার পুরাতন ও বিশ্বস্ত সেনাপতি হারসামার কাছে আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব দেন। পরিশেষে বিষয়টির

---

১. সেই ঈসা, যাঁকে মনসুর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন।

২. মদিনাতুল মনসুর' বলা হত (দ্রষ্টব্য ২২শ অধ্যায়)।

৩. তাহিরের মাত্র একটি চোখ ছিল, কিন্তু ঐতিহাসিকরা বলেন, এই শারীরিক ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছিল তাঁর সব্যসাচীর মত কর্মক্ষম দুই হাত।

মীমাংসা হয় এভাবে: আমিন হারসামার কাছেই আত্মসমর্পণ করবেন, পক্ষান্তরে অঙ্গুরীয়, অঙ্গাবরণ ও তরবারি তুলে দেয়া হবে তাহিরের কাছে। এভাবে উভয় সেনাপতিই তাঁর বশ্যতা স্বীকারের গৌরবের অংশীদার হবেন।

আমিন নিহত [২৩ মহরম, ১৯৮ হিজরি, ৮১৪ খ্রি.]

১৯৮ হিজরীর ২৩ মহরম রবিবার রাতে আমিন তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে করুণ বিদায় গ্রহণের পর বেরিয়ে আসেন হারসামার নৌকায় আরোহণ করতে। সেনাপতি তাঁকে যথোচিত মর্যাদা ও শ্রদ্ধা সহকারে অভ্যর্থনা করেন এবং মাঝিদের আদেশ দেয়া হয় হারসামার শিবিরের দিকে দ্রুত নৌকা চালাতে। কয়েকজন নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন পারসী সৈন্য, যারা এই ঘটনা লক্ষ করছিল, তারা নৌকার দিকে বড় বড় পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করে; তাদেরই একজন টাইগ্রিসের (দজলার) দুর্বল কেলিনৌকায় নৌকায় আঘাত করলে তাতে জল ঢুকে উল্টিয়ে যায়। জনৈক মাঝির সহায়তায় হারসামা রক্ষা পান অল্পের জন্য; আমিন এবং তাঁদের সহযাত্রী নগরাধ্যক্ষ সাঁতার দিয়ে কূলে পৌছান। তাঁরা পারসী সৈন্যের হাতে ধরা পড়েন এবং নীত হন নিকটবর্তী একটি কাঠের বাড়িতে (দুর্গ), যেখানে তাঁদের বন্দী করা হয়। আমিন শীতে কাঁপছিলেন, কিন্তু নগরাধ্যক্ষ তাঁকে আচ্ছাদিত করে দেন নিজের অঙ্গাবরণ দিয়ে এবং উভয়েই সামান্য বিশ্রামের জন্য শয়ন করেন। গভীর রাতে কয়েকজন পারসী দরজা ভেঙে ফেলে এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে হতভাগ্য আমিনের উপর। তিনি একটি বালিশের সাহায্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন, কিন্তু হত্যাকারীরা তাঁকে কেটে ফেলে। পরদিন সকালে ঘাতকদের দ্বারা হতভাগ্য শিকারের (আমিন) শির প্রদর্শিত হয় বাগদাদের দেয়ালে।

মামুন তাঁর ভাইয়ের মর্মান্তিক জীবনাবসানের সংবাদ পেয়ে শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে তাঁদের বিবাদের ফল হবে এত ভয়াবহ। তিনি অবিলম্বে হত্যাকারীদের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করেন এবং কিছু পরিমাণে পিতার ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি আমিনের পুত্রদেরকে দত্তকরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে জুবাইদার তত্ত্বাবধানে রেখে দেন, বয়োপ্রাপ্ত হলে তাঁদের বিয়ে দেয়া হয় তাঁর কন্যাদের সাথে। তাঁদের একজন অল্প বয়সেই মারা যায়। তিনি আমিনের পরিবার ও পরিচারকদের তাদের নিজস্ব সম্পত্তি ভোগ-দখল করারও অধিকার দান করেন।

এভাবে চার বছর আট মাসের গোলযোগপূর্ণ রাজত্বের পর আটাশ বছর বয়সে আমিনের মৃত্যু হয়।

অধ্যায়-১৮
আব্বাসীয় বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]
[১৯৮-২৩২ হিজরি; ৮১৩-৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ]
মহামতি মামুন : মু'তাসিম : ওয়াসিক

মার্ভে মামুন : বাগদাদে গোলযোগ : ইমাম আলী আর-রিজার মৃত্যু : বাগদাদে মামুন : গ্রিকদের সাথে যুদ্ধ : যুক্তিবাদ : মামুনের মৃত্যু : তাঁর চরিত্র : মামুনের শাসনামলে আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি : মু'তাসিমের সিংহাসনারোহণ : রাজধানী পরিবর্তন : তুর্কী দেহরক্ষী বাহিনী গঠন : বাবেকের বন্দিকরণ : তাঁর চরিত্র : তাঁর মৃত্যু

মার্ভে মামুন

যদি মামুন তৎসময় পর্যন্ত বাগদাদে গমন করতেন তাহলে পরবর্তী কয়েক বছরের বিশৃঙ্খলা এড়ানো যেত। কিন্তু তিনি উজির ফজল বিন সহলের ওপর ভরসা করেন এবং শাসনকাজের পুরোপুরি কর্তৃত্ব তাঁর ওপর ছেড়ে দিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর জ্ঞানী ও পণ্ডিত সভাসদদের সঙ্গে দার্শনিক কথপোকথনে নিজের সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। ফজলও তাঁর দিক দিয়ে রাষ্ট্রনায়ককে মার্ভে রাখতেই ইচ্ছুক ছিলেন, যেখানে তিনি সম্পূর্ণভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রীর প্রভাবাধীনে থাকবেন। রাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের সঠিক অবস্থা সম্পর্কে কোন তথ্য খলিফার নিকট পৌঁছতে দেয়া হত না এবং এভাবে ইরাক ও সিরিয়ায় যেসব ঘটনা ঘটছিল সেগুলো সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ রয়ে যান।

ইরাক ও আরবে বিশৃঙ্খলা

আমিনের মৃত্যুর কয়েকদিন পর নসর[১] নামক উমাইয়াদের এক অনুগামী মেসোপটেমিয়ায় মামুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং পাঁচ বছর ধরে রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা চালান। ইরাকে বেদুঈনরা প্রতিবেশী মন্দ-স্বভাবের লোকদের সাথে যোগদান করে হাসান বিন সহলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যিনি তাঁর ভাই কর্তৃক ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর বংশের অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকদের ওপর সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলোর সাধারণ বিশৃঙ্খলার প্রভাব পড়তে বাকি রইল না। তাঁরা এবং তাঁর ভাই 'তায়য়ার' উপাধিধারী জাফরের কিছুসংখ্যক বংশধর, যাঁরা এ যাবত অখ্যাত অবস্থায় ছিলেন, তাঁরা সম্ভবত উপলব্ধি করেন যে তাঁদের দাবি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় এসেছে।

জমাদিউস-সানী, ১৯৯ হি., ৮১৪ খ্রি.

সাধারণভাবে ইবন ত'াবা-তা'বা' নামে পরিচিত আলী (রা.)-এর এক বংশধর কুফায় আবির্ভূত হন এবং রসূলের পরিবারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে জনসাধারণকে আহ্বান জানান। তিনি আবু সারায়া নামক একজন প্রাক্তন দস্যুর সমর্থন পেয়েছিলেন। তাদের শক্তিকে পুঞ্জিভূত করে তাঁরা হাসান বিন সহলকে পরাজিত করেন এবং নিজেদেরকে সমগ্র দক্ষিণ ইরাকের অধীশ্বর করে তোলেন। শ্রীঘ্রই বিন তা'বা-তা'বা

---

[১]. উকাইল গোত্রের শাবাসের পুত্র।

বিষপ্রয়োগে তাঁর সমর্থক কর্তৃক নিহত হন এবং তাঁর স্থানে মনোনীত করেন আলী (রা.)-এর বংশের এক তরুণ বালককে।

যখন টাইগ্রিসের তীরে এসব ঘটনা ঘটছিল, তখন হিজাজে খলিফা নির্বাচিত হন ইমাম জাফর আস-সাদিক (রা.)-এর এক পুত্র। পারস্যের প্রান্তসীমা থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত সমস্ত দেশ এভাবে মারাত্মক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং দেশজুড়ে লুণ্ঠন ও হত্যার তাণ্ডব চলতে থাকে। কিন্তু এসব কোন খবরই মামুনের নিকট পৌঁছতে দেয়া হয় না। শেষ পর্যন্ত ইরাকে বিদ্রোহ এমন ভয়াবহ রূপ লাভ করে যে ঈর্ষা থাকা সত্ত্বেও ফজল হারসামাকে আবু সারায়ার বিরুদ্ধে প্রেরণ করতে বাধ্য হন। বিদ্রোহী পরাজিত ও নিহত হন এবং যে কিছুসংখ্যক বালককে তিনি খলিফা নির্বাচিত করেছিলেন তাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হয় মার্ভে এবং সেখানে সে মামুনের একজন আশ্রিত বলে গণ্য হয়। ইরাকে বিদ্রোহ দমনের পর হারসামাকে আদেশ দেয়া হয় মিশরে পৌঁছতে, কিন্তু চারদিকের বিপদাপদের দিকে খলিফার চোখ উন্মীলিত না করে প্রবীণ যোদ্ধা উজিরের আদেশ মানতে অস্বীকার করেন। তিনি দ্রুত মার্ভে চলে আসেন এবং সহসা খলিফার সামনে উপনীত হন। উভয়পক্ষের মধ্যে ক্রুদ্ধ বাক্যবর্ষণ হয় এবং বীরসুলভ সরলতার সহিত হারসামা মামুনকে বলেন, সাম্রাজ্য কীভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে।

হারসামার মৃত্যু

খলিফার নিকট থেকে নিজের আবাসস্থলে ফেরার পথেই উজির-নিযুক্ত ঘাতকদের দ্বারা তিনি আক্রান্ত হন এবং এমন সাংঘাতিকভাবে আহত হন যে সেই আঘাতের ফলে কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যু ঘটে। মামুনের অনুসন্ধানের উত্তরে বলা হয় তিনি পীড়িত অবস্থায় বাড়িতে রয়েছেন এবং বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত খলিফা জানতেই পারলেন না রাষ্ট্র কীভাবে একজন অমূল্য সেবককে হারিয়েছে। যে হারসামা সৈন্যদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন তাঁর মৃত্যু সংবাদে বাগদাদে সৈন্যদের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং চারদিকে নতুন করে যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয়। লোকেরা হাসান বিন সহল বা তাঁর ভাই ফজলকে মান্য করতে অস্বীকার করে। হাসানকে তারা আখ্যায়িত করে 'ম্যাজিয়ানের পুত্র ম্যাজিয়ান' বলে এবং মনসুর বিন মাহদীকে হাসানের স্থলে শাসনকর্তা রূপে নির্বাচিত করে, যিনি সাময়িকভাবে এই শর্তসাপেক্ষে শাসনভার গ্রহণ করেন যে, মামুন যতক্ষণ নিজে না আসবেন কিংবা কোনো প্রতিনিধি নিযুক্ত না করবেন ততক্ষণ পর্যন্তই তিনি এই পদে বহাল থাকবেন।

২০০ হিজরি; ৮১৫ খ্রিস্টাব্দ, খলিফা হিসাবে ইমাম আলী আর রিজার মনোনয়ন [২ রমজান ২০১ হিজরি]

২০০ হিজরিতে মামুন হয়রত মুহম্মদ (সা.)-এর বংশধরগণের হাতে খিলাফত তুলে দেয়ার দীর্ঘকালীন পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে শুরু করেন। এই উদ্দেশে তিনি মুসা আল-কাজিমের পুত্র ফাতিমী বংশের ইমাম তৃতীয় আলীকে[১] মদীনা থেকে ডেকে পাঠান। তিনি প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন যে, তিনি তাঁর নিজের গোত্রে[২] এবং আলী

---

[১] পূর্বে দ্রষ্টব্য

[২] এই সময় আব্বাসীয়দের এক আদমশুমারীতে দেখা যায় যে, পুরুষ, নারী ও শিশুসহ তাদের সংখ্যা ছিল ৩৩,০০০।

(রা.)-এর গোত্রে একজন উত্তরাধিকারীর অনুসন্ধান করেছেন এবং মুসার পুত্রের মত খলিফা পদের জন্য এত উপযুক্ত আর কাউকে দেখতে পাননি। তদনুসারে ২০১ হিজরির ২ রমজান খিলাফতের উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁকে 'আর-রিজা মিন-আল মুহম্মদ' বা 'মুহম্মদ (সা.)-এর বংশধরদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য'– সংক্ষেপে 'আর-রিজা' বা 'গ্রহণযোগ্য' উপাধি দিয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা হয়। এরপর থেকে ইতিহাসে তিনি আর রিজা নামেই পরিচিত হন। এই সময় মামুন নির্দেশ দেন যে, তাঁর বংশের প্রতীক কৃষ্ণবর্ণ পরিত্যক্ত হবে এবং ফাতিমা বংশের প্রতীক সবুজ বর্ণ গৃহীত হবে রাজকীয় পরিচ্ছদের বর্ণ হিসেবে।

বাগদাদে বিশৃঙ্খলা

খিলাফতের উত্তরাধিকারী হিসেবে আলী আর-রিজার মনোনয়ন বাগদাদের আব্বাসী গোত্রকে ক্রোধে উন্মত্ত করে তোলে। তারা ইব্রাহীম বিন মাহদীকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে হাসানের কর্মচারীদেরকে রাজধানী থেকে বিতাড়িত করেন। বাগদাদ ও এর পার্শ্ববর্তী নগরগুলোতে বিশৃঙ্খলা ভয়াবহ হয়ে ওঠে, সম্পূর্ণরূপে অরাজকতা দেখা দেয় এবং এবং দস্যু ও দুশ্চরিত্ররা প্রকাশ্য দিবালোকে লুণ্ঠন ও অত্যাচারে ব্রত হয়। অবশেষে পরিস্থিতি এতই গুরুতর হয়ে ওঠে যে, সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং শান্তিরক্ষার জন্য তাঁরা গড়ে তোলেন প্রহরা সমিতি; সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ করার সময় কোন দুর্বৃত্ত ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হতো। মামুনের বাগদাদ আগমন অবধি এই সমিতিগুলো কর্মতৎপর ছিল। দক্ষিণ ইরাক এবং হিজাজের অবস্থারও অনুরূপ অবনতি ঘটে; ইব্রাহীম অথবা হাসান বিন সহল– কারও কোন কর্তৃত্ব রইল না এবং প্রতিটি নগরে হত্যাকাণ্ড ও গৃহদাহের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলতে থাকে। পারসিক উজিরের স্বার্থপর অব্যবস্থাপনার ফলে মামুনের সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যাবে বলে প্রতীয়মান হয়। এই সংকটকালে ইমাম আলী আর-রিজা স্বেচ্ছায় উপস্থিত হন মামুনের কাছে এবং রাষ্ট্রের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন; উজিরের পক্ষে সত্য গোপন, ইব্রাহীমের নির্বাচন, মামুনের উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর মনোনয়নে আব্বাসীদের মধ্যে অসন্তোষ এবং আমিনের শোচনীয় মৃত্যুর পর থেকে এ যাবত সমস্ত ঘটনার ইতিবৃত্ত তিনি ব্যক্ত করেন। খলিফা হতভম্ব হন এবং স্বাভাবিকভাবেই জানতে চান রিজা যেসব ঘটনার কথা তাঁকে বলেছেন তা আর কেউ জানে কিনা। ইমাম কয়েকজন সেনাপতির নাম বললেন; তাঁদের ডেকে পাঠান হয় এবং উজিরের প্রতিশোধ থেকে রক্ষার আশ্বাস পেয়ে ইমামের প্রতিটি কথাকেই তারা সমর্থন করে সত্য বলেন; তাঁরা বলেন, ফজলের নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণতার কারণে খিলাফত কীভাবে হারসামার মত একজন বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত সেবককে হারিয়েছে এবং উজির যেভাবে ইব্রাহীম বিন মাহদীকে মামুনের প্রতিনিধিরূপে প্রতিপন্ন করছেন তা হওয়া তো দূরের কথা, বরং মামুনের পরিবর্তে বিসদৃশভাবে বনু আব্বাসীয়রা তাঁকে সুন্নী খলিফা বলে স্বীকার করেছেন, যারা মামুনকে মনে করে ধর্মবিরোধী।

মামুনের বাগদাদের উদ্দেশে যাত্রা

খলিফার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো; অবিলম্বে পশ্চিমদিকে যাত্রার আদেশ জারি হয় এবং পরদিনই মামুন তাঁর সমস্ত সভাসদকে নিয়ে বাগদাদের উদ্দেশে রওনা হন। দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হয়েছে দেখে এবং স্বীয় পদমর্যাদাবলে সুরক্ষিত ইমাম আর-রিজার কোন অনিষ্ট

সাধনে অসমর্থ হয়ে ফজল তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন সেসব লোকের উপর, যারা কোন-না-কোনভাবে তাঁর অধীনে ছিল। তিনি কয়েকজনকে বেত্রাঘাত করেন; অন্যদের অবরুদ্ধ করেন কারাগারে; আবার বেশ কয়েকজনের শ্মশ্রুরাজী উৎপাটিত করা হল। ইমাম আর-রিজা পুনরায় যান মামুনের কাছে এবং তাঁকে উজিরের নিষ্ঠুরতার কথা বলেন। প্রত্যুত্তরে খলিফা বলেন যে, ফজলকে তিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবেন না, তবে অবশ্যই তা করবেন ধীরগতিতে। মামুন কর্তৃক ফজলকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পূর্বেই নিজেরই সৃষ্টি করা একজন বেপরোয়া শত্রু ঐ পারসির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং মার্ভ থেকে একদিনের পথে অবস্থিত সাররাখ নামক স্থানে নিজেরই হাম্মাম খানায় তিনি নিহত হন। আততায়ীগণ ধরা পড়ে এবং প্ররোচনাকারীদের সাথে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করে।

ইমাম আলী আর-রিজার মৃত্যু; সফর, ২০৩ হিজরি; আগস্ট ৮১৮ খ্রিস্টাব্দ

তুস নগরে পিতার সমাধির পাশে মামুন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। এখানে তিনি হারান তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু ও উপদেষ্টা ইমাম আর-রিজাকে, যিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাম্রাজ্যকে রক্ষা করছিলেন। অকস্মাৎ[১] ইমামের মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র মুহম্মদ 'জাওয়াদ' (দানশীল) ও 'তকী' (ধার্মিক) উপাধি ধারণ করে আমির পদে অধিষ্ঠিত হন। মামুন অকৃত্রিমভাবে তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর সমাধির উপর নির্মাণ করলেন একটি স্মৃতিসৌধ, যা তখন থেকে পৃথিবীর সকল অংশের শিয়া তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে এবং বর্তমানে তা 'মেশেদ' (মাশ-হাদ বা মাশ-হাদ মুকাদ্দাস- পবিত্র সমাধিস্থান) বলে পরিচিত। ইমামের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের পর প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থামতে থামতে খলিফা আবার রাজধানীর দিকে এগিয়ে যান। নগরীর গুরুত্ব অনুসারে ঘটত অবস্থানের স্থায়িত্বভেদ। নাহরওয়ানে তিনি আট দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন সামরিক বিভাগের প্রধানরা, বাগদাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এবং তাঁর বংশের (বনু আব্বাস) লোকজনরা। তখন পর্যন্ত প্রত্যেকেই সবুজ পোশাক পরতেন; মামুনের সংবর্ধনার জন্য রাক্কা থেকে আগত তাহির এবং অনান্য প্রধান ব্যক্তিদের অনুরোধক্রমে আব্বাসী বর্ণ পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

মামুনের বাগদাদে আগমন [২০৪ হিজরি, ৮১৯ খ্রিস্টাব্দ]

বিজয়ীর সাজে মামুন বাগদাদে প্রবেশ করেন। রাস্তাগুলোকে সুসজ্জিত করা হয়েছিল, জনসাধারণ পরেছিল উৎসবের পোশাক এবং খলিফার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনে চারদিক উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। মামুনের আগমনে সমস্ত বিশৃঙ্খলা থেমে যায় এবং ভেঙে দেয়া হয় নাগকিদের রক্ষার জন্য গঠিত প্রহরা সমিতিসমূহকে। শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন এবং অবরোধকালে সংঘটিত নগরীর ধ্বংস সংস্কারের কাজে মামুন নিজে বিপুল উদ্যমে আত্মনিয়োগ করেন। একদা নগর পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু খালিদের[২] পুত্র তাঁর প্রাসাদাধ্যক্ষ আহমেদ বিন আবু খালিদ, যিনি তাঁর কাছে তৎকালীন সাধারণ

---

[১] মামুন ফজলকে হত্যার প্ররোচনা যুগিয়েছিলেন অথবা ইমাম আর-রিজাকে তিনি বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিলেন বলে প্রচলিত গল্পটি বিদ্বেষমূলকভাবে উদ্ভাবিত; ঘটনার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান বা সামান্যতম ঐতিহাসিক সমালোচনার সম্মুখে তা টিকে থাকতে পারে না।

[২] তিনি 'আহওয়াল' অর্থাৎ 'ট্যারা চোখ' নামে অভিহিত হতেন। পরে তিনি মামুনের উজির হন।

দূরাবস্থার কথা বর্ণনা করেন। দেখেশুনে মামুন প্রত্যুত্তর দেন যে, বাগদাদে তিন শ্রেণীর লোক আছে; এক শ্রেণী অত্যাচারিত (মজলুম), অন্য শ্রেণী অত্যাচারী (জালিম), পক্ষান্তরে তৃতীয় শ্রেণী কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এই শেষোক্ত শ্রেণীটিই সকল অনর্থের মূল। এটি যথার্থই সত্য বলে ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন।[১]

তাহির পূর্বাঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত [২০৫ হিজরি, ৮২০-৮২২ খ্রিস্টাব্দ]; তাহিরের মৃত্যু [জমাদিউল আওয়াল, ২০৭ হিজরি]

পবিত্র নগর দু'টির শাসনভার আলী (রা.)-এর বংশধরদের উপর ন্যস্ত হয়; কুফা ও বসরা দেয়া হয় খলিফার দুই ভাইকে– পক্ষান্তরে দেহরক্ষীদের নেতৃত্বের ভার অর্পিত হয় তাহিরের উপর। পরের বছর তাহির আবেদন করে পূর্বাঞ্চলের রাজপ্রতিনিধিত্ব লাভ করেন। দুই বছর পরে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতপর তাঁর পুত্র তালহা তাঁর স্থানে নিযুক্ত হন এবং সাত বছরকাল তিনি প্রদেশটি শাসন করেন।

আবদুল্লাহ নামক তাহিরের অপর পুত্র– যিনি সেনাপতি হিসেবে অনুরূপ দক্ষ ছিলেন কিন্তু মানুষ হিসেবে ছিলেন অধিকতর সদাশয়, তাঁর উপর সিরিয়া ও মিশরের শাসনভারসহ নসর উকায়লীকে বশীভূত করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। কয়েকটি কঠোর যুদ্ধের পর বিদ্রোহী বাধ্য হয় আশ্রয় প্রার্থনা করতে। তার কাইসানের দুর্গ ভূমিসাৎ করা হয় এবং তাকে প্রেরণ করা হয় দরবারে, যেখানে মামুন তাঁর স্বাভাবিক সহনশীলতাবশত তাকে ক্ষমা করেন। মেসোপটেমিয়ায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পর আবদুল্লাহ বিন তাহির এগিয়ে যান মিশরের দিকে, যেখানে আরও একটি বিদ্রোহ চলছিল। একটি যুদ্ধেই তিনি বিদ্রোহীদের দমন করেন ।

ক্রিট বিজয় [২১০ হিজরি, ৮২৫ খ্রিস্টাব্দ]

বহু সংখ্যক স্প্যানিশ মুসলমান ঐ দেশের উমাইয়া খলিফা কর্তৃক আন্দালুসিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে সপরিবারে মিশরে চলে আসে এবং তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে আলেকজান্দ্রিয়ার শান্তি ভঙ্গ হয়। আবদুল্লাহ তাদেরকে অস্ত্র পরিহার করতে অথবা প্রদেশ ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দেন। তারা ক্রিট (ইকরিটাস) দ্বীপে চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তা মঞ্জুর হয়। প্রত্যাগমনকালে এই অনাহূত অতিথিরা জিনিসপত্র ও দ্বীপজয়ের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। তারা এবং তাদের সাথে দুঃসাহসিক কাজে যোগদানকারী একদল স্বেচ্ছাসেবক সমুদ্রপথে ক্রিট যাত্রা করে সহজেই সেখানে অবতরণ করে; কিছুদিন যুদ্ধের পর দ্বীপবাসীদের অধিকাংশই আত্মসমর্পণ করে এবং আক্রমণকারীরা তাদের বিজিত স্থানে বসতি স্থাপন করে, যেখানে তারা এবং তাদের বংশধররা তখন থেকেই বসবাস করে আসছে এবং স্যাক্সন ঔপনিবেশিকগণ যেভাবে ইংল্যান্ডে বসবাসের অধিকার প্রাপ্ত হয় তারাও সেইভাবে সেখানকার অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সিসিলি বিজয় [২০৮ হিজরি; ৮২৩ খ্রিস্টাব্দ]

দু'বছর পূর্বে জিয়াদাতুল্লাহ আগলাব দ্বীপকে খলিফার কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসেন। ইয়েমেন ও খোরাসানের বিদ্রোহীদের বিনাক্লেশে দমন করা হয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্রোহীগণ অভাবনীয় উদার ব্যবহার প্রাপ্ত হন।

---

[১] সুশাসিত নগরের প্রত্যেক নাগরিকই শৃঙ্খলা রক্ষায় আগ্রহী থাকে। যেসব লোক কপটতার সাথে জনসাধারণের কার্যাবলি থেকে সরে দাঁড়ায়, তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বেপরোয়াভাবে আইন ভাঙার সুযোগ দেয়।

এ সময় কয়েকজন আব্বাসীয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত মামুনের হত্যার এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তিনি বিস্মিত হয়ে ওঠেন। প্রধান ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের অপরাধের সমুচিত সাজাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করা হয়।

বুরানের সাথে বিবাহ, রমজান, ২১০ হিজরি; ৮২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দ

এই বছর রমজান মাসে মামুন তাঁর উজির হাসান বিন সহলের সুন্দরী কন্যা বুরান নামে অভিহিতা খাদিজাকে বিবাহ করেন। মার্ভে অবস্থানকালে তার সাথে খলিফার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়েছিল। বিবাহের আড়ম্বর থেকেই তৎকালীন বাগদাদ দরবারের জাঁকজমক সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়।

মহা আনন্দোৎসবের মধ্যে দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন হয় ফাম উস-সিলহ[১] নামক স্থানে, যেখানে হাসান তখন বাস করতেন। উজির এখানে বিলাসবহুল আড়ম্বরতার সাথে সকল বরযাত্রীদের সতের দিন[২] পর্যন্ত আপ্যায়িত করেন। এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন জুবাইদা ও তাঁর কন্যাসহ রাজপরিবারের অন্যান্য মহিলারা; উৎসবে নিমন্ত্রিত কবিগণ তাঁদের অনুপম সৌন্দর্য ও চমকপ্রদ পরিচ্ছদের প্রশংসা কীর্তন করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিলেন নবপরিণীতা বধূ নিজেই। উৎসবে তাঁর (কন্যার) মাতামহী খলিফা ও বধূর উপর সোনার থালা থেকে অতুলনীয় আকৃতি ও সৌন্দর্যমণ্ডিত এক হাজার মুক্তা বর্ষণ করেছিলেন। তাঁর (খলিফার) আদেশে সেগুলো সংগৃহীত হয় এবং তৈরি হয় একটি কণ্ঠহার এবং তা নবপরিণীতা মহিষীকে উপহার দেয়া হয়। বিবাহ মজলিশ আলোকিত করা হয়েছিল স্বর্ণের শামদানের উপর রক্ষিত আশি পাউন্ড ওজনের তৈল স্ফটিক দ্বারা প্রস্তুত প্রদীপ শিখায়। রাজকীয় যাত্রীদল যখন বিদায় গ্রহণ করছিল তখন উজির রাজকর্মচারীগণকে সম্মানজনক খিলাত উপহার দেন এবং খলিফার সাথে সমাগত শাহজাদা ও প্রধান রাজকর্মচারীদের উপর বর্ষণ করেন মৃগনাভীর গোলাসমূহ। এসব গোলার প্রত্যেকটির সাথে ছিল একটি করে টিকিট, যাতে একটি জায়গীর, একটি ক্রীতদাস, একপাল ঘোড়া অথবা অনুরূপ কিছু দানের নাম উল্লেখ ছিল; অতঃপর তার প্রাপক সেটি নিয়ে যান একজন প্রতিনিধির কাছে, যিনি তাকে ঐ সম্পদ প্রদান করেন, যা তাঁর ভাগ্যে পড়েছিল। সাধারণ লোকদের মধ্যেও তিনি (উজির) ছড়িয়ে দেন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, মৃগনাভীর গোলা এবং ডিম্বাকার তৈল-স্ফটিক। এই ব্যয় নির্বাহের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মামুন হাসানকে ফারস্ ও আহওয়াজের (প্রাচীন সুসিয়ানা) এক বছরের রাজস্ব প্রদান করেন। বুরান ইসলাম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রমণী। সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও সৌন্দর্যের সাথে তাঁর রুচিবোধ ও সদগুণরাজীর সমাহার ঘটিয়ে তিনি স্বামীর উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা তিনি সব সময়ই প্রয়োগ করতেন অন্যদের মঙ্গলের জন্য। তাঁর দানশীলতা ছিল প্রচুর এবং তিনি বাগদাদে অনেকগুলো হাসপাতাল ও মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

---

[১] 'সিলহের মুখ'– এটি ওয়াসিতের কয়েক মাইল উর্ধ্বদিকে টাইগ্রিসের সাথে মিলিত হয়েছে। এমন একটি খালের নাম আস-সিলহ। নদী ও খালের সঙ্গমস্থলে ফাম উস-সিলহ অবস্থিত ছিল।

[২] হাসানের ব্যয় হয়েছিল পাঁচ কোটি দিরহাম।

করেছিলেন। মামুনের মৃত্যুর পরও তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর বেঁচেছিলেন এবং এভাবে তিনি কেবল সাম্রাজ্যের চরমোৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করেননি, দেখে গেছেন এর অধোগতির সূচনা-পর্বও।[১]

নাস্তিক বাবেক [২০১ হিজরি ৮১৬ খ্রিস্টাব্দ]

মামুনের রাজত্বের সূচনালগ্নে সাম্রাজ্য যখন চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধবিগ্রহে উদ্বেলিত তখন বাবেক নামক এক দস্যু মাজেন্দ্রানের সর্বাপেক্ষা দুর্গম গিরিসংকটে অবস্থিত একটি দুর্গে নিজের প্রভুত্ব কায়েম করে। সে ছিল খুররামী সম্প্রদায়ের ম্যাজিয়ান শাখার অন্তর্ভুক্ত, যারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করত এবং ইহুদি, খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্ম কর্তৃক প্রবর্তিত নৈতিক বিধানগুলো স্বীকার করত না। পার্বত্য দুর্গ থেকে সে তার নিকটবর্তী অঞ্চলে লুণ্ঠন চালাত, লোকজনকে হত্যা করত এবং খ্রিস্টান ও মুসলমান রমণীদের ধরে নিয়ে ঘৃণ্য দাসত্বে আবদ্ধ করত। তার বিরুদ্ধে একের পর এক সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়, কিন্তু তার দুর্ভেদ্য স্থান থেকে বহু বছর ধরে তাকে পর্যুদস্ত করার সব প্রয়াস উপেক্ষিত হয়। একবার রাজকীয় বাহিনী কর্তৃক কঠোরভাবে নিষ্পিষ্ট হয়ে সে গ্রিকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনীর গতি তার পক্ষে নিয়ে আসার জন্য প্ররোচনা চালায়।

বাইজান্টাইনদের সহিত যুদ্ধ

বাইজান্টিয়ামের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তোতলা মাইকেলের[২] পুত্র থিউফিলাস। নাস্তিক দস্যুর সাথে হাত মিলিয়ে খ্রিস্টান সম্রাট আরব রাজ্য আক্রমণ করেন এবং হত্যা করেন বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে। এই অহেতুক ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণ প্রতিরোধ করতে মামুন নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং পর্যায়ক্রমে তিনটি যুদ্ধে শত্রুকে সর্বাত্মকভাবে এরূপ পর্যুদস্ত করেন যে তিনি (থিউফিলাস) বাধ্য হন সন্ধির জন্য আবেদন করতে। এসব অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ আরব ও গ্রিকদের মধ্যে ঘোরতর শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং রেখে যায় ঘৃণা ও তিক্ততার উত্তরাধিকার, যার চিহ্ন পাশ্চাত্যে এখনো বিদ্যমান। গ্রিকদের পরাজিত করে খলিফা মিশরের দিকে অগ্রসর হন; আফ্‌শিন নামক একজন তুর্কী সেনাপতি যিনি এই সময় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। উচ্চ মিশরের শেষ প্রান্তবর্তী আল-ফারামা অঞ্চলে নিম্ন মিশর হতে বিতাড়িত বিদ্রোহী দল আশ্রয় গ্রহণ করেছিল ।

মামুনের মৃত্যু, ১৮রজব, ২১৮ হিজরি; ৯ আগস্ট, ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ

গ্রিকদের পৌনপুনিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রহরা স্থাপন এবং তাদের আরও সম্যকভাবে প্রতিরোধ করার উদ্দেশে মামুন তরসাস থেকে সত্তর মাইল উত্তরে তায়ানা নামক স্থানে

---

[১] তিনি ৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

[২] ইবনুল আসির এই মাইকেলকে জুরজিসের পুত্র বলেও অভিহিত করেন এবং বলেন যে তিনি নয় বছর রাজত্ব করেছেন। ২০৯ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র থিউফিলাস (তোফিল) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। বাইজান্টাইন ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি কীভাবে তোতলা মাইকেল (থিউফিলাসের পিতা) সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন আর্মেনিয়ান লিওর একজন সেনাপতি; তিনি (লিও) তাঁকে একটি ব্যক্তিগত স্থানাগারের মধ্যে জীবন্ত দগ্ধ করার আদেশ দেন, কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য সুযোগ পেয়ে দণ্ডিত সেনাপতির সমর্থকরা সম্রাটকে হত্যা করে এবং মাইকেলকে সিংহাসনে বসাতে সক্ষম হন।

একটি শক্তিশালী সুরক্ষিত সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলতে শুরু করেন। এটি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন । তরসাসের অনতিদূরে বিদানদুন নামক স্থানের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করে শরৎকালের এক উষ্ণ দিনে মামুন ও তাঁর ভ্রাতা যে নদীর নামানুসারে এই শহরের নামকরণ হয়েছিল তার তীরে বসে বরফ-শীতল জলে তাঁদের পদযুগল সিক্ত করছিলেন। ঐ রাতেই তাঁরা ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন। ঐ অবস্থাতেই মামুনকে নিয়ে আসা হয় তরসাসে, যেখানে কিছুদিন পরই তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁকে সমাহিত করা হয় তাঁর পিতার এক বিশ্বস্ত ভৃত্যের উদ্যানে। মুতাসিম আরোগ্য লাভ করেন এবং ভাইয়ের মৃত্যুকালীন উপদেশ গ্রহণে সমর্থ হন। অন্তিম নিঃশ্বাসের সহিত মামুন তাঁর উত্তরাধিকারীকে সতর্কভাবে প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে, অত্যাচার থেকে তাদের রক্ষা করতে, ন্যায়-বিচার করতে এবং অপরাধের শাস্তি বিধানে কখনো আইনের সীমালঙ্ঘন না করতে আদেশ দেন। ১৭০ হিজরিতে তাঁর পিতা হারুন যেদিন সিংহাসনে আরোহণ করেন ঠিক সেদিনই জন্ম হয় মামুনের এবং তিনি ২৬ বছর ছয় মাস রাজত্ব করেন; কেবল এই সময়টুকু ব্যতীত 'যখন আমিন বাগদাদে অবরুদ্ধ হন এবং মক্কা ও মদীনায় তাঁর (মামুনের) জন্য মোনাজাত করা হয়।'

তাঁর চরিত্র

তিনি সুঠাম, প্রভুত্বব্যঞ্জক ও সুদর্শন চেহারার মানুষ বলে বর্ণিত হয়েছেন। একজন ঘটনাপঞ্জিকাকার বলেন, 'তাঁর প্রজ্ঞা, দৃঢ় সংকল্প, ক্ষমাশীলতা, ন্যায়বিচার, বিচক্ষণতা, সম্ভ্রম উদ্রেককারী প্রকৃতি, নির্ভীকতা, রাজকীয় মহিমা এবং বদান্যতার জন্য তিনি আব্বাসী বংশের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অনেক মহৎ গুণ ছিল এবং তাঁর বহু স্মরণীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়ছে। আব্বাসী বংশের মধ্যে তাঁর চেয়ে বিজ্ঞ আর কেউ খিলাফত পরিচালনা করেননি।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি

মামুনের খিলাফত আরব ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ এবং যথার্থভাবেই তাকে বলা হয়েছে ইসলামের অগাস্টান যুগ। তাঁর বিশ বছরের শাসনকাল চিন্তাধারার প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতার স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছে। তাঁদের সাফল্য বিজ্ঞান বা সাহিত্যের কোন বিশেষ শাখায় সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা প্রসার লাভ করেছিল বুদ্ধিবৃত্তির সকল শাখায়; প্রকৃত বিজ্ঞানের চর্চার মত ঐকান্তিক আগ্রহের সাথে অনুধ্যান-দর্শন এবং সুকুমার সাহিত্যের অনুশীলন হত। এশীয় সভ্যতার এই গৌরবময় যুগে অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রচণ্ড গতিতে উন্নতি লাভ করেছিল। এর বিদগ্ধ উত্তরাধিকার আরব প্রভাবিত স্পেন এবং খ্রিস্টান প্রভাবিত কনস্ট্যান্টিনোপল উভয় স্থান অতিক্রম করে আধুনিক ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। মামুন মনে করেছিলেন যে তাঁর রাজ্যের লোকদের প্রকৃত সুখ নিহিত রয়েছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে। খলিফা কিংবা রাষ্ট্রের অভিজাতবর্গের ব্যক্তিগত সাময়িক বদান্যতার উপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি নির্ভর করুক তা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের মর্যাদাকে যথার্থ সম্মান দিয়ে তার উন্নতি ও সাহায্যের জন্য স্থায়ী বৃত্তি সৃষ্টি করে সাময়িক দান থেকে তিনি তাকে করে তুলেছিলেন স্বনির্ভর। সর্বত্র স্কুল ও কলেজ খোলা হয়েছিল এবং দান করা হয়েছিল প্রভূত অর্থ। ওয়েলসনার বলেন, 'সম্ভবত আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম দেখতে পাই যে, একটি ধর্মীয় ও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা জ্ঞান-চর্চার সাথে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে তার উন্নতিবিধানে যাবতীয় প্রস্তুতি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে।

মামুনের রাষ্ট্র-পরিষদ

দূরদর্শী সহনশীলতার গুণে মামুন ধর্ম বা বর্ণের কোন পার্থক্য স্বীকার করতেন না; তাঁর সমস্ত প্রজাসাধারণকে রাজকীয় পদের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সকলপ্রকার ধর্মীয় বিভেদকেই নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। সাধারণতন্ত্রের পতন এবং স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠার পর মামুন তাঁর অধীনস্থ সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে একটি যথার্থ রাষ্ট্রপরিষদ গঠন করলেন। এতে অন্তর্ভুক্ত হয় মুসলমান, ইহুদী, খ্রিস্টান, সাবিয়ী এবং জোরোয়াস্ট্রীয়গণ। ইসলামী শাসনে অমুসলমানগণ সব সময়ই বিবেক-বুদ্ধির মুক্তি ও ধর্মানুশীলনের স্বাধীনতা ভোগ করত; স্থানীয় শাসনকর্তার স্বভাব বৈশিষ্ট্যের ফলেই কখনো কখনো এই নীতির ব্যতিক্রম ঘটত। মামুনের আমলে অন্য ধর্মের প্রতি উদারতা ছিল সুদূরপ্রসারী ও আদর্শস্থানীয়। তাঁর রাজত্বকালে আমরা শত শত সিনাগগ (ইহুদী উপাসনালয়) ও অগ্নি-মন্দির (পারসি ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়) ছাড়াও এগারো হাজার খ্রিস্টান গির্জার কথা শুনতে পাই। জেরুজালেম ও এন্টিয়কের ধর্মাধ্যক্ষগণ ছিলেন খ্রিস্ট ধর্মের নেতা। ধর্মাধ্যক্ষের (পেইট্রিআর্ক) পরে ছিলেন জাসলিক (ক্যাথোলিকোস), তৎপর মেত্রান (মেট্রোপলিটান), তারপর ইসকাফ (বিশপ) এবং সবশেষে কিসিস (পুরোহিত)। তাঁরা স্বধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রপ্রধানদের অধীনে যেসব সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা উপভোগ করত তার সমস্তই মুসলিম শাসনে বজায় ছিল।

মামুনের শাসনকালে যুক্তিবাদ

মামুন যে ধর্মের নেতা (খলিফা) ছিলেন তার মধ্যে যে মতবাদ ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করছিল, কালের আবর্তে ঐ মতবাদ যে কঠোরতা অর্জন করছিল এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর তার অন্তিম পরিণাম কি হবে বিজ্ঞ দৃষ্টিতে মামুন পূর্বাহ্নেই তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর বিচারে এসব মতবাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ছিল রাষ্ট্রদোহীতার চেয়েও ক্ষতিকর, কারণ যাবতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গতি রোধ করে শেষে সাধারণতন্ত্রের ধ্বংস সাধন করাই তাদের লক্ষ্য ছিল। মানুষের মনকে অপরিবর্তনীয় মতবাদের বন্ধনে আবদ্ধ করার ফল তিনি আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। সুতরাং রাজত্বের শেষ চার বছর তিনি রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করে তুলতে এবং পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞরা মানুষের বুদ্ধিকে যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন তা ছিন্ন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এই বিরাট সংস্কারকার্যের জন্য তাঁর চেয়ে বেশি উপযুক্ত আর কেউ ছিলেন না। হাদীস ও আইন শাস্ত্রের জ্ঞানে তিনি তৎকালীন অধিকাংশ পণ্ডিতগণকেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন; তাঁর কুরআন অধ্যয়ন ছিল গভীর ও মনোযোগপূর্ণ; তিনি ছিলেন ধর্মগুরু ইমাম আর-রিজার শিষ্য, যাঁর নিকট হতে তিনি বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতি অনুরাগ এবং 'হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর বংশের দার্শনিকগণের' শিক্ষার খ্যাতিসূচক উদারতা লাভ করেছিলেন। হিজরির দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধেই সংঘটিত হয় ওয়াসিল বিন আতার[১] মতবিরোধ। ওয়াসিল প্রথমে ছিলেন ইমাম জাফর আস-সাদিকের শিষ্য, যাঁর নিকট থেকে তিনি মানবীয় যুক্তির মূল্য সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেছিলেন। পরে তিনি হাসান আল্-বসরীর[২] বক্তৃতা শোনেন, কিন্তু কোন এক ধর্মীয় মতবাদের প্রশ্নে তাঁর নিকট হতে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।

---

[১] পূর্বে দ্রষ্টব্য।

[২] পূর্বে দ্রষ্টব্য।

মজহাবুল-ইতিজাল বা ভিন্ন মত

এই বিচ্ছেদের ফলে তাঁর অনুগামীরা মুতাজিলা[১] বা ভিন্ন মতাবলম্বী বলে অভিহিত হন এবং তাঁর প্রবর্তিত মত আখ্যায়িত হয় মজহাবুল-ইতিজাল বা ভিন্ন মত বলে। প্রতিষ্ঠিত ধর্মে এমন অনেক মতবাদের শিক্ষা দেয়া হত যেগুলো ওয়াসিল কেবল মানবীয় যুক্তির বিরোধী বলেই মনে করতেন না, বরং মনে করতেন কুরআন ও রসুল (স.)-এর শিক্ষার পরিপন্থী বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এ রকম শিক্ষা দেয়া হত যে, মানুষের প্রত্যেক কাজ পূর্বনির্ধারিত– অন্য কথায় মানুষ নিজের ইচ্ছানুসারে কাজকর্ম করতে পারে না; আরো শিক্ষা দেয়া হয় যে, শেষ বিচারের দিন আত্মার পুনরুত্থান ঘটবে এবং মানবীয় চোখে আল্লাহ পরিদৃশ্য হবেন; আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তা থেকে পৃথক এবং কুরআন শরীফ সৃষ্ট বস্তু নয়, স্রষ্টার অস্তিত্বের সহিত আদিকাল থেকে তা বিদ্যমান। শেষোক্ত মত থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আদিম ও পরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজনে প্রদত্ত সাময়িক বিধানসমূহকে চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তীয় আইনে পরিণত করতে হবে।

মুতাজিলাগণ

অন্যদিকে মুতাজিলাগণ প্রাথমিক ধর্মগুরুদের সাথে একমত পোষণ করে বলতেন যে, মানুষ ভালো ও মন্দের বিচার করে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার অধিকারী; আত্মার কোন পুনরুত্থান ঘটবে না, মানবীয় চোখে আল্লাহকে দেখা যাবে না; কারণ তাতে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হবে যে আল্লাহ স্বয়ং দেহধারী; তাঁর গুণাবলী তাঁর সত্তা থেকে পৃথক নয় এবং কুরআন সৃষ্ট বস্তু। পরে তাঁরা আরও দৃঢ়ভাবে প্রচার করেন যে, মানুষের কাজকর্ম সম্পর্কে কোন চিরস্থায়ী বিধান নেই; যে স্বর্গীয় অনুশাসনসমূহ মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে তা উন্নতি ও পরিবর্ধনেরই ফলস্বরূপ[২] এবং স্রষ্টা নিখিল বিশ্বকে যে পরিবর্তনের অধীন করেছেন তাও (স্বর্গীয় অনুশাসন) ঐ একই পরিবর্তনের অধীন। মামুন মুতাজিলা মতবাদ গ্রহণ করেন এবং চেষ্টা করেন তা নিজের সাম্রাজ্যে প্রবর্তন করতে। কারণ ইসলামের নিরাপত্তা ও প্রগতির সকল আশা এই মতবাদের বহুল প্রচারের উপর নির্ভর করে বলে তিনি মনে করতেন। ২১৭ হিজরিতে বাগদাদের শাসনকর্তার কাছে তিনি এই মর্মে এক ফরমান[৩] জারি করেন যে, তিনি যেন নেতৃস্থানীয় পণ্ডিতদেরকে আহ্বান করেন এবং প্রয়োজনীয় মতবাদ সম্পর্কে তাঁদেরকে যাচাই করে তাঁদের উত্তরগুলো সম্বন্ধে বিবরণী পাঠান। বাগদাদের অধিকাংশ বিচারক ও পণ্ডিত দৃঢ় প্রত্যয়বশত কিংবা কৌশলের খাতিরে খলিফার মতে মত প্রকাশ করেন। সামান্য কয়েকজন ছিলেন অনমনীয় ও বিদ্রোহপ্রবণ। তাঁদের সকলের মধ্যে আহমেদ বিন হাম্বল[৪] সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বলে প্রমানিত হন। যদি মামুন আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতেন তাহলে তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা দ্বারা যে কতিপয় লোক উন্নতির যাবতীয় চিহ্নকে বিদ্বেষ অথবা ভয়ের চোখে দেখতেন তাঁদের সেই একগুঁয়ে প্রতিবন্ধকতাকে পরাজিত করতে পারতেন।

---

[১] Weil মুতাজিলাবাদীদের ইসলামের প্রোটেস্ট্যান্ট ও যুক্তিবাদী বলে অভিহিত করেছেন।

[২] মুতাজিলা মতবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলামের* নতুন সংস্করণ, পৃ. ৪১৬-৪২২ দ্রষ্টব্য।

[৩] তাঁর ফরমান একটি উল্লেখযোগ্য দলিল এবং তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

[৪] ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বল চতুর্থ সুন্নী আইন মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে ওঠেন। পরবর্তী খলিফাদের আমলে তাঁর অনুগামীদের অন্ধ গোঁড়ামী অবিরত বিশৃঙ্খলা, দাঙ্গা ও রক্তপাতের কারণ হয়ে উঠেছিল।

তাঁর অব্যবহিত পরের দু'জন উত্তরাধিকারী তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং চেষ্টা করেন তাঁর কাজ চালু রাখতে, কিন্তু তাঁদের কারোরই তাঁর ন্যায় যোগ্যতা বা জ্ঞানের প্রসারতা ছিল না। তাঁদের আমলে যুক্তিবাদ যেভাবে প্রাধান্য অর্জন করেছিল সম্ভবত আধুনিক কালের ইউরোপীয় দেশসমূহও তা লাভ করেনি। যুক্তিবাদীরা মসজিদে প্রচার করতেন এবং বক্তৃতা দিতেন মহাবিদ্যালয়গুলোতে। তাঁদের হাতেই জাতির তরুণ সম্প্রদায়ের চরিত্র গঠিত হত; তাঁরা ছিলেন খলিফাদের প্রধান উপদেষ্টা এবং এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে তাঁরা তাঁদের প্রভাব বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করতেন। অধ্যাপক, প্রচারক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, উজির কিংবা প্রাদেশিক শাসনকর্তারূপে তাঁরা আরব জাতির পরিবর্ধন ও উন্নতির জন্য সাহায্য করেছিলেন।

বিজ্ঞান ও সাহিত্য

মামুনের রাজত্বকাল সন্দেহাতীতভাবেই ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল ও গৌরবময় যুগ। মানবীয় বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও চর্চাই হল জাতীয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। মামুনের দরবার বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক, সভ্য জগতের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের কবি, চিকিৎসক ও দার্শনিকদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত। জাতিগত বিবেধ না রেখে প্রত্যেক আগন্তুককে সমাদার করা হত, ঐ সমাদর রাজধানীতে সমাগত ঐতিহাসিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, বৈয়াকরণিক এবং হাদীস সংগ্রাহক সকলেই সমভাবে প্রাপ্ত হতেন। আরব প্রতিভার প্রতি একজন প্রখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিকের সহানুভূতি যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি তাদের সভ্যতা ও মানসিক উৎকর্ষ সম্পর্কে তাঁর মূল্যবোধ অত্যন্ত প্রখর ও অকপট। তাঁরই অভিব্যক্তি প্রয়োগ করে বলা যায়, মামুন যে শতাব্দীর সাহিত্যিক গৌরব সুনিশ্চিত করেছিলেন সেই শতাব্দী তাঁর নামেই ধন্য হয়েছে। হারুন-পুত্রই (অর্থাৎ মামুন) পিতামহ মনসুরের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার গৌরবাধিকারী। শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও শিল্পীগণ পরিবেষ্টিত থেকে আলেকজান্দ্রিয়া শিক্ষাকেন্দ্রের লিপিগুলো নতুনভাবে সংগ্রহ করেন এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের সম্রাটদের সাথে তাঁর সম্পর্ক থাকার সুবাদে তিনি অ্যাথেন্স থেকে তুলে আনেন প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিক গ্রন্থসমূহ। এগুলো বাগদাদে আনীত হওয়া মাত্র উপযুক্ত পণ্ডিতগণ কর্তৃক সেগুলো অনূদিত হয় এবং প্রকাশিত হয় সর্বসাধারণের মধ্যে। লিউকের পুত্র কোস্টার তত্ত্বাবধানে গ্রিক, সিরীয় ও কালদীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকের তরজমা; ইয়াহিয়া বিন ও হারুনের তত্ত্বাবধানে প্রাচীন পারসি তরজমা; ব্রাহ্মণ দুবানের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত ভাষা থেকে তরজমার কাজ সংসাধিত হত। মৌলিক গবেষণামূলক ও সৃষ্টিধর্মী কাজেও ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করা হত; জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখার উন্নতি ও অধ্যয়নের জন্য উপযুক্ত অধ্যাপকের অধীনে বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তির মাধ্যমে গ্রন্থ প্রণয়নকেও উৎসাহিত করা হত।

মামুনের রাজত্বকালে নক্ষত্রবিজ্ঞানে যে পরীক্ষাকার্য চালানো হয় তার মধ্যে বিষুবরেখা, গ্রহণ, ধূমকেতুর ছায়া নির্ণয় এবং আকাশ-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোহিত সাগরের উপকূল থেকে ডিগ্রীর পরিমাণ ধরে পৃথিবীর আকৃতি নির্ণয় করা হয়– এটি ঠিক সেই সময়ের ঘটনা যখন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইউরোপ পৃথিবী চ্যাপটা বলে জোরদার প্রচার চালাচ্ছিল। আবুল হাসান টেলিস্কোপ উদ্ভাবন করেন, যা সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি একটি নল বিশেষ, যার উভয় প্রান্তে রয়েছে আলোর প্রতিফলক। এই নল-এর উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং পরবর্তীকালে বিশেষ সাফল্যের সাথে তা ব্যবহৃত হয় মারাগা ও কায়রোর মানমন্দিরে। অংক, জ্যামিতি,

দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আবহবিজ্ঞান, দৃষ্টিবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণীত হয়ে জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের চর্চায় বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হয় এবং যেসব খ্যাতনামা চিকিৎসক রাষ্ট্রপ্রধানের সহচর হিসেবে পরিচিত ছিলেন তাঁদের দ্বারাই মামুনের চরিত্রের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ট্যাডমোরের প্রান্তরে শামসিয়া নামক স্থানে মামুন কর্তৃক ইসলামের প্রথম মানমন্দির প্রতিষ্ঠা হয় । পরে ওয়াসিত, আপামিয়া প্রভৃতি স্থানে আরও অনেকগুলো নির্মিত হয়েছিল।

পারস্য-সাহিত্যের চর্চা

আরব বিজয়ের ফলে স্বভাবতই প্রাচীন পারস্যের ভাষা ও সাহিত্য অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। লোকেরা মাতৃভাষার অবহেলা করে আরবী ভাষাই শিক্ষা করত। অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় মামুন পুরাতন বিদ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং পারস্য ভাষা-চর্চার জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন, যাতে হাজার হাজার আরবী শব্দ দ্বারা তা সম্পদশালী হয়। বর্তমান পারসি কবিতার পথিকৃৎ কবি আব্বাস (মারভাষী)[১] তাঁর রাজত্বকালে আবির্ভূত হন।

দার্শনিক সম্মিলনী

সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার নির্ধারিত ছিল। পূর্বাহ্নে পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রাসাদে উপস্থিত হতেন, যেখানে তাঁরা প্রাসাদাধ্যক্ষ কর্তৃক রাজকীয় প্রাতরাশে আপ্যায়িত হতেন । আহারের পর তাঁদেরকে নিয়ে যাওয়া হত এসকল সম্মিলনীর জন্য নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে, যেখানে খলিফা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করতেন। মাগরিবের নামাজের পর সমবেত বিদগ্ধমণ্ডলী খলিফার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করতেন এবং পুনরায় নৈশভোজনে আপ্যায়িত হতেন। সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলো যথাযথভাবে রাজকার্যে উৎসর্গীকৃত হত; সামান্য খুঁটিনাটিও বাদ পড়ত না, কোন হিসাব পরীক্ষা ছাড়া অনুমোদিত হত না, কোন দরখাস্তই উপেক্ষিত হত না ।

মামুনের বিচক্ষণতা

অসাধারণ দয়া ও ধৈর্যশীলতাবশত শাসনকাজের প্রয়োজনে বাধ্য না হলে তিনি কখনো শাস্তি বিধান করতেন না। একদা এক ধর্মান্ধ (খারিজী) ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে রাজসমীপে উপনীত হলে মামুন যে কৌশলের সাথে তাকে নির্বাক করে দেন তাতে তিনি যেসব লোকের উপর শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন তাদেরকে শাসন করার ব্যাপারে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। খারিজী নির্ভয়ে খলিফার দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু থেমে যায় গালিচার প্রান্তে গিয়ে এবং যথারীতি অভিবাদন জানায়। তারপর সে খলিফাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি যে আসন অধিকার করে বসে আছেন সে সম্পর্কে আমাকে বলুন আপনি কি জনসাধারণের সর্বসম্মতিক্রমে না জোরজবরদস্তি করে সেখানে উপবিষ্ট রয়েছেন?' মামুন তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, 'এর কোনটিই নয়; বরং পূর্বে যিনি মুসলিম সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন তিনিই আমাকে এবং আমার ভাইকে উত্তরাধিকার সূত্রে এটি দিয়ে গেছেন এবং যখন আমার উপর কর্তৃত্বের ভার পড়ল তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সম্মতি আমার প্রয়োজন; কিন্তু আমি দেখলাম যে, যদি আমি শাসনক্ষমতা পরিত্যাগ করি তাহলে ইসলামের নিরাপত্তা ব্যাহত হবে, রাজপথগুলো অধ্যুষিত হবে দস্যু তস্করে, জনসাধারণের কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা

[১] মার্ভের বাসিন্দা।

দেবে এবং শুরু হবে কলহ ও গোলযোগ, যার ফলে মুসলমানরা হজ ও তাদের কর্তব্য পালন করতে বাধা পাবে। সে কারণেই যে পর্যন্ত তারা একমত হয়ে একজন উপযুক্ত লোককে মনোনীত না করবে এবং শাসনভার আমি তাঁর হাতে সমর্পণ না করব সে পর্যন্ত আমি জনসাধারণকে রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান থাকব। এই মুহূর্তে তারা যদি একমত হয়ে কাউকে মনোনীত করে, আমি তাঁর অনুকূলে পদত্যাগ করব। লোকটি জবাব দেয়, 'আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, দয়া ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এই কথা বলেই সে প্রস্থান করল। মামুন তাঁর একজন অনুচরকে পাঠান তাকে অনুসরণ করতে। সংবাদদাতার বিবরণী থেকে জানা যায় যে, লোকটি একদল ধর্মান্ধের (খারিজী) নেতা, যারা বিদ্রোহ করার উদ্দেশেই জমায়েত হয়েছিল, কিন্তু মামুনের বিচক্ষণতায় তারা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে যায়।

আবু ইসহাক মুহম্মদ, মুতাসিম বিল্লাহ [২১৮-২২৭ হিজরি; ৮৩৩-৮৪২ খ্রিস্টাব্দ]

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে মামুন তাঁর ভাই আল-মুতাসিম বিল্লাহ[১] (সংক্ষেপে মুতাসিম) উপাধি প্রাপ্ত আবু ইসহাক মুহম্মদকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে এক ফরমান জারি করেন। এত দীর্ঘকাল পর এটা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য যে মামুন কোন কারণে তাঁর পুত্র আব্বাসের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যিনি সৈন্যদের মধ্যে ছিলেন জনপ্রিয়, বিশেষ করে আরবদের মধ্যে। সম্ভবত তিনি মনে করেছিলেন যে আব্বাস সহজে প্রভাবান্বিত হবেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনি যে নীতি নির্ধারণ করেছিলেন তা তিনি (আব্বাস) অনুসরণ করে চলতে পারবেন না। মুতাসিমের অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ও পরিপক্ক চরিত্রকেই তিনি হয়তো তাঁর কর্মপন্থা চালিয়ে যাওয়ার জন্য অধিকতর যোগ্য বিবেচনা করেছিলেন।

১৯ রজব, ২১৮ হিজরি; ১০ আগস্ট, ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রথমে সৈন্যবাহিনী আব্বাসের মনোনয়নের জন্য সোচ্চার হয়, কিন্তু তিনি পিতার অন্তিম ইচ্ছা স্মরণ করে পিতৃব্যের নিকট আনুগত্যের শপথ নেন, যার ফলে সৈন্যদল তাদের দাবি প্রত্যাহার করে নেয় এবং তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। তদনুসারে তরসাসে মুতাসিমকে খলিফা বলে ঘোষণা করা হয়।[২] নিতান্ত দুর্বোধ্য অপরিণামদর্শিতাবশত তিনি তায়ানার নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন এবং সেই স্থানের উদ্দেশে আনীত দ্রব্যসামগ্রী, খাদ্য সম্ভার ও সৈন্যদল তরসাসে ফেরত আনেন । এতদ্ব্যতীত তিনি নিষ্ঠা সহকারেই ভাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রয়াসী হন।

তুর্কী সৈন্যবাহিনী গঠন

তার মারাত্মক ভুল হয় তুর্কী[৩] ও অন্যান্য বিদেশীদের নিয়ে একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন করা, যা শেষ পর্যন্ত খিলাফতের ধ্বংস বয়ে আনে। তুর্কী মমলুক[৪] (ক্রীতদাস) এবং মধ্য এশিয়া ও ইয়ামেন, মিশরের উচ্চভূমি থেকে আগত বেতনভোগী সৈন্যরা এই বাহিনীতে নিযুক্ত হয়। যারা ট্রানসক্সিয়ানা থেকে এসেছিল তাদেরকে বলা হত

---

[১] আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে অবিচল। এই সময় থেকে খলিফাগণ এ রকম উপাধি ধারণ করতে থাকেন।

[২] মাস'উদী ১৭ রজবকে তাঁর (মুতাসিম) সিংহাসনারোহণের তারিখ বলে উল্লেখ করেন।

[৩] আধুনিক যুগের ওসমানীদের (Ottoman) সাথে ঐ সময়ের তুর্কী বা তুর্কোমানদের এক করে ভাবা ভুল হবে। অষ্টম শতাব্দীর স্যাকসনদের সাথে বর্তমান কালের ইংরেজদের যে সাদৃশ্য, তাদের মধ্যেও অনুরূপ সাদৃশ্য ছিল।

[৪] মমলুক অর্থ ক্রীতদাস।

ফারাগিনা।[১] পক্ষান্তরে আফ্রিকাবাসী ও ইয়ামেনীদের পরিচয় ছিল মাগারিবা বা পাশ্চাত্যবাসী। তারা তাদের নিজস্ব সেনাপতিগণ কর্তৃক পরিচালিত হত, যাঁরা সরাসরি ছিলেন খলিফার অধীন। এভাবে তারা আরব ও পারস্য সৈন্যদল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল এবং এটি মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, অনতিবিলম্বে তারা রোমান সাম্রাজ্যের দেহরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের খেয়াল-খুশিমত খলিফাকে সিংহাসনে বসাত এবং পদচ্যুত করত। জমকালো পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে তারা বাগদাদের রাজপথে বেপরোয়াভাবে অশ্বচালনা করত এবং তাদের সম্মুখস্থ লোকজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত। রাজধানীতে ক্রোধের আর্তনাদ উঠল।

রাজধানী স্থানান্তর

হতবুদ্ধিসম্পন্ন খলিফা দাঙ্গার আশঙ্কায় তাঁর প্রিয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে বাগদাদের উত্তর-পশ্চিম দিকে কয়েকদিনের যাত্রাপথে অবস্থিত সামাররা নামক স্থানে স্থানান্তরিত হন। সামাররা বা সুররা মান রাআ[২] (বর্তমানে তা এই নামে অভিহিত) নামে পরিণত হয় মুতাসিমের অলডারশটে, যেখানে তিনি নিজের জন্য একটি প্রাসাদ, দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের জন্য সেনানিবাস এবং একলক্ষ ষাট হাজার অশ্বের জন্য আস্তাবল নির্মাণ করেন। নগরের অংশ-বিশেষ আবন্টিত হয় তুর্কী সেনাধ্যক্ষদের জন্য, যাঁদের প্রাসাদসমূহ আড়ম্বরের দিক দিয়ে খলিফার প্রাসাদের সাথে প্রতিযোগিতা করত।

ইরাকে জাঠ গোত্র

টাইগ্রিসের তীরে আরব ঐতিহাসিক কর্তৃক জাত্ত নামে অভিহিত ভারতীয় জাঠ গোত্রের আবির্ভাবের জন্য এই রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য। তারা কীভাবে সেখানে এসেছিল তা আমরা জানতে পারি না, তবে বলা হয় তাদের সংখ্যা ছিল সতের হাজার। লুঠতরাজের কারণে মুতাসিম তাদের বিরুদ্ধে এক ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করেন এবং খলিফাকে তাদের স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদ দেখানোর জন্য বন্দি অবস্থায় তাদেরকে নৌকাযোগে বাগদাদে নিয়ে আসা হয়। অতঃপর তারা সিলিসিয়ার প্রান্তদেশে বসতি স্থাপন করে। এখানে তারা সম্পূর্ণ বিনা কারণে গ্রিকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়; তাদের অধিকাংশই নিহত হয়, জীবিতদের বন্দিরূপে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ছেড়ে দেয়া হয় থ্রেসে।[৩] ৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ধর্মগুরু আমির মুহম্মদ আত-তকী তাঁর সহধর্মিণী মামুনের কন্যা উম্মুল-ফজল সমভিব্যাহারে মুতাসিমের সাথে সাক্ষাৎদান উপলক্ষে বাগদাদে অবস্থানকালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুত্র আলী তাঁর উত্তরাধিকারী হন ।

বাবেক ধৃত ও নিহত

বাবেকের ক্রমাগত লুঠতরাজ প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাকে দমন করা অতীব জরুরি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মুতাসিম আফসীন নামক তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তুর্কী সেনাপতিকে এই দস্যুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বিশেষ সতর্কতার সাথে কয়েকটি অভিযান চালানোর পর আফসীন দখল করে নেন বাবেকের ঘাঁটি। তার পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আত্মসমর্পণ করে এবং প্রেরিত হয় বাগদাদে, যেখানে তারা রাজক্ষমা লাভ করে এবং সদয় ব্যবহার পায়। বাবেক ও তার ভাই পালিয়ে যায় আর্মেনিয়ায়, যেখানে একজন আর্মেনীয় সর্দার তাদের ধরে ফেলে এবং সমর্পণ করে আফসীনের কাছে। তাদের বাগদাদে নিয়ে আসা হয়; মানবতার বিরুদ্ধে তাদের অপরাধ এত

---

[১] ফারগানা থেকে।

[২] যে এটি দেখেছে সে আনন্দিত হয়েছে।

[৩] বোহেমীয়, জিপ্সারী ও জিপসী যাযাবরগণ এই হতাবশিষ্ট অসহায় বন্দী জাঠদের বংশধর বলে মনে হয়।

সাংঘাতিক ও ন্যাক্কারজনক ছিল যে তা ছিল ক্ষমার অযোগ্য। প্রথমে তাদেরকে একটি হাতির পিঠে চড়িয়ে রাজপথে প্রদর্শন করা হয়, তারপর হত্যা করা হয়।[১] সাত হাজার খ্রিস্টান ও মুসলমান রমণীকে আফসীন তাদের নিজ নিজ গৃহে মুক্তি দেন। বিজয়ী সেনাপতির সংবর্ধনা ছিল রাজকীয়, তাঁকে বিবিধ সম্মান ও উপঢৌকনে ভূষিত করা হয়, কিন্তু তার অন্তিমকাল ছিল দুঃখজনক।

বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধ

আফসীন যখন মাজান্দ্রানে ব্যাপৃত ছিলেন তখন বাবেকের সাথে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ বাইজান্টাইন সম্রাট বাবেকের অনুকূলে মুসলিম বাহিনীর একাগ্রতা ভঙ্গের চেষ্টা করেন। তিনি কাপাডোসিয়া আক্রমণ করে মুসলিম অঞ্চলগুলো ধ্বংস করেন এবং লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ করেন তাদের নগরগুলো। পুরুষদেরকে হত্যা করেন এবং শিশু ও স্ত্রীলোকদের নিয়ে যান দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। মুতাসিমের জন্মস্থান জিবাত্রা (জাপেট্রন) ভস্মীভূত হয়; পুরুষদেরকে হত্যা কিংবা তপ্ত লৌহ দ্বারা অন্ধ করা হয়; অন্যদের অঙ্গহানী করা হয়। এসব বর্বরতার খবর পেয়ে মুতাসিম ক্ষিপ্ত হন এবং প্রতিজ্ঞা করেন উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের। দ্রুত সৈন্য সংগ্রহ করে তিনি বিশ্বাসঘাতক ও পাষণ্ড গ্রিকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। তাঁর অগ্রগামী সৈন্যদল অ্যানসিরার নিকটে থিউফিলাসের সম্মুখীন হয় এবং তাঁকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে । অতঃপর থিউফিলাসের জন্মভূমি অ্যামোরিয়মের দিকে খলিফা যাত্রা করেন। পশ্চাশ দিন অবরোধের পর অতর্কিত আক্রমণে সেটি অধিকৃত হলে তাকে ধূলিস্যাৎ করা হয়, ৩০,০০০ লোককে হত্যা করা হয়, অবশিষ্টদের বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয় গ্রিক সেনাপতি বাতিসের (অ্যাটিউস) সাথে। গ্রিক শক্তির বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার উদ্দেশে মুতাসিম এবার প্রপন্টিস ও বসফোরাসের দিকে তাঁর অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁর নিজের শিবিরে এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ায় অভিযান স্থগিত রাখতে হয়। কয়েকজন আরব সেনাপতি তুর্কীদের প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হয় এবং নিজেদের প্রতি খলিফার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে মুতাসিমকে হত্যার জন্য অল্পবয়স্ক ও বিপথেচালিত আব্বাসের সাথে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। দৈবাৎ ষড়যন্ত্রটি ফাঁস হয়ে যায় এবং তা এমন সুদূরপ্রসারী মনে হয় যে খলিফার পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে যায়। আব্বাস ও তাঁর সঙ্গীয় ষড়যন্ত্রকারীরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং মুতাসিম থিউফিলাসের সাথে সন্ধি স্থাপন করে সামাররায় ফিরে আসেন। অ্যামোরিয়াম দখল থিউফিলাসকে সম্পূর্নরূপে ভগ্নোৎসাহ করেছিল।

৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ

২২৪ হিজরিতে মাজিয়ার নামক তাবারিস্তানের ম্যাজিয়ান শাসনকর্তা বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন। আব্দুল্লাহ বিন তাহির ম্যাজিয়ারের বিদ্রোহ দমন করতে অসমর্থ হবেন এবং মুতাসিম আবদুল্লাহর স্থলে তাঁকেই পূর্বাঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করতে বাধ্য হবেন– এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আফসীন মাজিয়ান দলপতিকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার গোপন প্ররোচনা দেন। কিন্তু মাজিয়ার আবদুল্লাহর হাতে বন্দি হন এবং বাগদাদে প্রেরিত হন। খলিফার সামনে তিনি আফসীনের বিশ্বাসঘাতকতা ফাঁস করে দেন এবং দেখিয়ে দেন তাঁর নিকট হতে প্রাপ্ত চিঠিগুলো। মাজিয়ারের মৃত্যুদণ্ড হয় এবং আফসীনকে অনাহারে মেরে ফেলা হয় তাঁর নিজ গৃহে বন্দি করে। এই তুর্কী নেতা একজন সংস্কৃতি সম্পন্ন লোক ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ এই মর্মে গল্প প্রচলিত ছিল যে, তাঁর নিকট অদ্ভুত অক্ষরে লিখিত বইপত্র ছিল এবং তাঁর গৃহ পূর্ণ ছিল নানারূপ

[১] পরবর্তী যুগে বাইজান্টাইনদের শাস্তির অনুকরণে অঙ্গের বিচ্ছেদ সাধন, দৃষ্টিশক্তি রহিতকরণ প্রভৃতি শাস্তি প্রদান করা হত।

মূর্তিতে; মনে করা যায় যে, তিনি তাঁর সময়ের অনেক আগেই এসেছিলেন এবং তিনি পছন্দ করতেন দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে সংগৃহীত সাহিত্য ও কৌতূহলের বস্তু দ্বারা নিজেকে বেষ্টিত রাখতে।

মুতাসিমের মৃত্যু [১৯ রবিউল আউয়াল, ২২৭ হিজিরী; ৫ জানুয়ারি, ৮৪২ খ্রি.]
কিছুদিন পর মুতাসিম কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং ২২৭ হিজরির ১৯ রবিউল আউয়াল মাসে পরলোক গমন করেন ।
কথিত আছে যে, মুতাসিম কৃষিকাজের উন্নতি বিধান করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নিষ্ঠুর ও ক্রুদ্ধ প্রকৃতির লোক হলেও প্রধান বিচারক আবু দুয়াদের পুত্র আহমদের প্রভাব তাঁকে অনেক নিষ্ঠুর কাজ থেকে থেকে বিরত রেখেছিল। মুতাসিমের উজিরের কুপরামর্শকে অধিকাংশ সময়ে কাজীর উপদেশ নিষ্ক্রিয় করে দিত। মাসউদী বলেন, 'আল্লাহ যেসব আশীর্বাদপ্রাপ্ত লোককে সহজাত সর্বপ্রকার গুণ দ্বারা বিভূষিত করেন আহমদ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম, আল্লাহ যাঁদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও সদাচার দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন তাঁদের মধ্যেও তিনি অন্যতম[১]।
আবু দুয়াদের পুত্র আহমদ মুতাজিলাদের একজন নেতা ছিলেন।

আবু জাফর হারুন, আল-ওয়াসিক বিল্লাহ [২২৭-২৩২ হিজরি; ৮৪২-৮৪৯ খ্রি.]
মুতাসিমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবু জাফর হারুন আল-ওয়াসিক বিল্লাহ[২] সিংহাসনে তাঁর উত্তরাধিকারী হন। কয়েকজন গোঁড়া লেখক ওয়াসিকের চরিত্রকে অশ্লীলভাবে বিকৃত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন উত্তম রাষ্ট্রশাসক। তিনি মহানুভব, বিরক্তিকর পরিস্থিতিতেও ধীর ও ধৈর্যশীল ছিলেন। তাঁর প্রশাসন ছিল দৃঢ় ও উন্নত ভাবধারাসম্পন্ন। আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করলেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিন্দার উর্ধে ছিল। তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং উৎসাহ দেন শিল্প ও বাণিজ্যে। সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক থাকায় সঙ্গীতে তিনি অর্জন করেছিলেন বিশেষ পারদর্শিতা এবং কথিত আছে তিনি একশত রাগ ও সুর রচনা করেছিলেন। তার বদান্যতা ছিল অপরিসীম এবং তাঁর শাসনকালে সাম্রাজ্যে একজন ভিক্ষুকও ছিল না। তাঁর রাজত্বকালে গ্রিক ও আরবদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক বন্দি বিনিময় হয়েছিল।

আরব ও পারসিদের উপর তুর্কী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ওয়াসিক তাঁর পিতার আরব্ধ ভুলই চালু রাখেন। তিনি আশনাস নামক একজন তুর্কীকে সুলতান বা সাম্রাজ্যের সহকারী নিযুক্ত করেন এবং মণিমুক্তা খচিত একটি কোমরবন্দ ও তরবারি দিয়ে তাঁকে বিভূষিত করেছিলেন। ওয়াসিক লোকদের মধ্যে যুক্তিবাদ প্রচার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর এই উদ্যম প্রতিক্রিয়াশীল আইনজ্ঞদের দ্বারা ব্যাহত হয়, যাঁরা গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন।

ওয়াসিকের মৃত্যু [১১ আগস্ট, ৮৪৮ খ্রি.]
তাঁর অকাল মৃত্যু এক অপূরণীয় বিপর্যয়। কারণ, তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই আব্বাসীদের গৌরবের অবসান ঘটে। পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে তাঁদের ইতিহাস খলিফাগণের ক্ষমতাশূন্যভাবে সিংহাসনারোহণ এবং শোক-দুঃখ ব্যতীত তাদের মৃত্যুবরণের এক গোলযোগপূর্ণ চিত্রই তুলে ধরে। ২৩২ হিজরির ২৪ জুলহজ্জ সুররামান-আর-রাআতে ওয়াসিক মৃত্যুমুখে পতিত হন।

---

[১] সুয়ুতি তাঁর গোঁড়ামীর কারণে আহমদের স্মৃতিকে অভিসম্পাত দিয়েছেন।
[২] যিনি আল্লাহতে বিশ্বাসী।

অধ্যায়-১৯
আব্বাসীয় বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]
[২৩২-৪৫৪ হিজরি; ৮৪৭-১০৬৩ খ্রিস্টাব্দ]
মুতাওয়াক্কিল থেকে কায়িম

আরবদের নীরো মুতাওয়াক্কিল : সাম্রাজ্যের অবনতি : মুনতাসির : মুসতাঈন : মুতাজ : নিগ্রো বিদ্রোহ : সাফফাহর বংশ : মুহতাদি : মুতামিদ : নিগ্রো বিদ্রোহ অবদমিত : মুতাজিদ : ফাতিমীয়দের উত্থান : কারমাতী বংশ : তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ : মুকতাফী : খিলাফতে মিশরের পুনরায় অন্তর্ভুক্তি : সামানী বংশ : মুতকাদির : কাহির : রাজী : মুত্তাকী : বুওয়াইহী বংশ : প্রাসাদাধ্যক্ষ : মুসতাকফী : গজনবী বংশ : মুতী : তাইয়ী : কাদির : কায়িম : সেলজুক বংশ : তুঘরিল বেগ

আবুল ফজল জাফর, মুতাওয়াক্কিল আ'লা ইল্লাহ
[২৩২-২৪৭ হিজরি; ৮৪৭-৮৬১ খ্রিস্টাব্দ]

ওয়াসিকের মৃত্যুর পর কাজীউল কুজ্জাত, উজির এবং অন্যান্য সভাসদদের অনেকেই তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছা পোষণ করেন; কিন্তু তুর্কী নেতা ওয়াসিফ এই বলে আপত্তি করেন যে, 'মুকুট, রাজপোশাক এবং রাজদণ্ড বালকের জন্য খুবই বড় হবে।' তদনুসারে তাঁরা ওয়াসিকের ভাই জাফরকে নির্বাচিত করেন আল-মুতাওয়াক্কিল আ'লা ইল্লাহ[১] উপাধি দিয়ে। আরবদের এই নীরো পনেরো বছর রাজত্ব করেন এবং তাঁর শাসনামলেই শুরু হয় সাম্রাজ্যের অবনতি। তিনি অমিতাচারে নিমগ্ন এবং স্বভাবে মাতাল হওয়ায় সরকারকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে সাহায্য করেছিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গোঁড়া মতবাদ পুনঃপ্রবর্তন করতে আগ্রহশীল ছিলেন।

যুক্তিবাদীদের উপর তাঁর নির্যাতন

যুক্তিবাদ নিষিদ্ধ এবং পুরাতন মতবাদ পুর্ণোদ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বলে ঘোষণা করে তিনি একটি ফরমান জারি করেন। সরকারি চাকুরী থেকে যুক্তিবাদীদের বরখাস্ত করা হয় এবং বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা নিষিদ্ধ হয়। বিশিষ্ট মুতাজিলাবাদী কাজী আবু দুয়াদ ও তাঁর পুত্র কারারুদ্ধ হন এবং তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু মুতাওয়াক্কিলের নির্যাতন যুক্তিবাদীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। তাঁর ধর্মোন্মাদনায় অমুসলমানরাও অতিশয় প্রপীড়িত হয়। তারাও সরকারি চাকরি থেকে অপসারিত হয় এবং তাদের উপর আরোপিত হয় অন্যরকম বিদ্বেষমূলক অক্ষমতা।

খলিফা আলী (রা.) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি অহেতুক বিদ্বেষবশত তিনি শহীদ হুসাইন (রা.)-এর সমাধিসৌধ ধূলিসাৎ করেন এবং তার উপর দিয়ে জলস্রোত প্রবাহিত করেন । পবিত্র স্থানে তীর্থযাত্রা কঠোরভাবে দণ্ডনীয় ও নিষিদ্ধ করা হয় এবং ফাদাকের

---

[১] যিনি আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন।

সম্পত্তি পুনরায় বাজেয়াপ্ত হয়। সিংহাসনে আরোহণ করার পূর্বে স্বৈরাচারীকে (মুতাওয়াক্কিল) যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করায় ওয়াসিকের উজির ইবনে জাইয়াতকে[১] হত্যা করা হয়। সাধারণ গোলযোগের সুযোগ নিয়ে গ্রিকরা পুনরায় আক্রমণ শুরু করে। তারা মিশরের দামিয়েটা ভস্মীভূত ও সিলিসিয়া বিধ্বস্ত করে ২০,০০০ লোককে বন্দি করে নিয়ে যায়, যাদের মধ্যে ১২,০০০ লোককে সম্রাজ্ঞী থিয়োডরা নির্মমভাবে নির্যাতন করে হত্যা করেন । যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে কেবল তারাই নিস্কৃতি পায়। মুতাওয়াক্কিলের আচরণ শেষ পর্যন্ত এত ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, তুর্কী রক্ষীরা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

তাঁর মৃত্যু

কথিত আছে, তাঁর পুত্র মুনতাসির তাঁর নিষ্ঠুরতাকে ঘৃণা করতেন বলে ষড়যন্ত্রটি অনুমোদন করেন এবং তদনুসারে একদিন রাতে 'আরব নীরো' যখন মধ্যপানে বিভোর হয়ে অচৈতন্য অবস্থায় শায়িত ছিলেন তখন ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা করে।

আবু জাফর আহমদ, মুনতাসির বিল্লাহ [২৪৭-২৪৮ হিজরি; ৮৬১-৮৬২ খ্রিস্টাব্দ]

মুতাওয়াক্কিলের মৃত্যুর পর মুনতাসির বিল্লাহ[২] খলিফা বলে ঘোষিত হন। তিনি ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ, ধৈর্যশীল ও মহানুভব, প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এবং প্রজাদের মঙ্গল বিধানে যথার্থই আগ্রহশীল খলিফা বলে বর্ণিত হয়েছেন। তিনি হয়রত আলী (রা.) ও হুসাইন (রা.)-এর অপবিত্রীকৃত স্মৃতিসৌধ পুনর্নির্মাণ করে ফিরিয়ে দেন মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক বাজেয়াপ্ত তাঁদের বংশধরদের সম্পত্তি এবং মুসলমানদের উপর তাঁর পিতা যেসব অযোগ্যতা ও অক্ষমতা আরোপ করেছিলেন তার সবগুলোই প্রত্যাহার করে নেন।

রবিউস সানি, ২৪৮ হিজরি

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মাত্র ছ'মাস রাজত্বের পরই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন[৩]।

আবুল আব্বাস আহমদ, মুসতাঈন বিল্লাহ

যে তুর্কী সর্দারগণ এই সময় খিলাফতের প্রকৃত ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন তারা মুতাসিমের আরেক পৌত্রকে মুসতাঈন বিল্লাহ[৪] উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসান, কিন্তু তাঁকে কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব দেয়া হল না। মুনতাসিমের মৃত্যুর পর যে গোলযোগ উপস্থিত হয় তাতে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ধীরে ধীরে নিজেদেরকে জায়গীরদারে পরিণত করেন এবং খলিফাদের প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে নামমাত্র প্রাধান্যে পরিণত হয়।[৫]

---

[১] ইবনে জাইয়াত ছিলেন একজন নিষ্ঠুর মন্ত্রী। ওয়াসিকের রাজত্বকালে আবু দুয়াদের জন্য তাঁর নিষ্ঠুরতা সীমাবদ্ধ ছিল। অপরাধী ও শত্রুদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ইবনে জাইয়াত এক যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং মুতওয়াক্কিল তাঁকে ওই যন্ত্রে ঢুকিয়েই হত্যা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে Sir W. Skevington কর্তৃক আবিস্কৃত ও তাঁর নামে Scavenger's daughter নামে অভিহিত যন্ত্র ও ইবনে জাইয়াতের যন্ত্রের একই উদ্দেশ্যে ছিল। একটি পুড়িয়ে মারত, অন্যটি মারত পিষ্ট করে।

[২] আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী।

[৩] মুনতাসিরই প্রথম আব্বাসী খলিফা, যাঁর সমাধির উপর সৌধ নির্মিত হয়েছিল।

[৪] যিনি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন।

[৫] ওয়াসিকের মৃত্যু ও ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আরব সাম্রাজ্যে আবির্ভূত বংশসমূহের ইতিহাস নর্ম্যান্ডি, বার্গান্ডি ও গিনি নামক স্থানের জমিদারী দখলকারী ফ্রান্সের ক্ষমতাশালী পরিবারগুলোর সমতুল্য।

তাহির বংশ

আবদুল্লাহ বিন তাহির মুতাসিমের রাজত্বকালে প্রয়াত হন এবং তাঁর পুত্র তাহিরের হাতে প্রদেশের শাসনভার দিয়ে যান এবং তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে নিযুক্তিপত্র পান। পিতার মত তাঁর শাসনও ছিল উন্নত, ন্যায়পরায়ণ এবং উদার। তাহির বংশীয়রা খোরাসানের রাজধানী নিশাপুরে তাঁদের দরবার স্থাপন করেন। ৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তাহিরের মৃত্যু হয় এবং উত্তরাধিকার হন তাঁর পুত্র মুহম্মদ, যিনি ৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রদেশ শাসন করেন। তাহির বংশীয়দের ক্ষমতার ব্যবহার অন্যদেরও উৎসাহিত করে এবং খিলাফতের পূর্বাঞ্চল বনু আব্বাসের হাতছাড়া হয়।

মুসতাঈনের বাগদাদে পলায়ন

তুর্কী দেহরক্ষীদের নিপীড়ন সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে মুসতাঈন পালিয়ে যান বাগদাদে, যেখানে তিনি আরব ও পারসি সৈন্যদের সমর্থন আশা করেছিলেন।

আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ, আল-মুতাজ বিল্লাহ

তুর্কিরা তাঁকে (মুসতাঈন) ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হওয়ায় মুতাওয়াক্কিলের দ্বিতীয় পুত্রকে আল মুতাজ বিল্লাহ[১] উপাধি দিয়ে খলিফা বলে ঘোষণা করে এবং বাগদাদ অবরোধ করতে অগ্রসর হয় ।

মুসতাঈনকে হত্যা

মদীনায় শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে দেয়া হবে বলে আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে মুসতাঈনকে তাঁর পদাধিকার ত্যাগে সম্মত করা হয়, কিন্তু পদচ্যুত খলিফা হিজাজের পথে ওয়াসিতে মুতাজের এক গুপ্তচরের হাতে নিহত হন ।

তুর্কোমানরা এবার নিজেদের মধ্যে বিবাদ শুরু করে। বিগত ঘটনাসমূহের প্রধান নায়ক ওয়াসিফ ও বুগা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা নিহত হন এবং বাবিকিয়াল নামক জনৈক ব্যক্তি উজিরের পদ দখল করেন। অপদার্থ খলিফার নিকট থেকে তিনি লাভ করেন মিশরের রাজপ্রতিনিধিত্ব এবং প্রখ্যাত আহমদ বিন তুলুনকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পর ববিকিয়াল নিহত হলে প্রকৃতপক্ষে আহমদ বিন তুলুন হয়ে ওঠেন মিশরের স্বাধীন শাসক। তিনি নিজেকে যোগ্য, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা বলে প্রতিপন্ন করেন[২]।

জমাদিউস সানি [২৬৪ হিজরি; জুন ৮৬৮ খ্রি.]

ইমাম আলী (আন-নকী) ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র হাসান আল-আসকারী[৩]।

---

[১] আল্লাহ কর্তৃক শক্তি প্রদত্ত।

[২] তিনি কয়েকটি জমকালো স্থাপত্য সৌধ রেখে যান, যার ধ্বংসাবশেষ অধ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে।

[৩] তাঁর জন্ম ও মৃত্যু হয় সামাররার শিবিরে; সেজন্য তাঁকে এই উপাধি দেয়া হয়।

মুতাজের সিংহাসনচ্যুতি [২৫৫ হিজরি; জুন ৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ]

মুতাজ প্রায় তিন বছরকাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ২৫৫ হিজরিতে সৈন্যদল তাদের বেতনের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং মুতাজ তাদের দাবি পূরণে নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করলে তারা তাঁকে প্রাসাদ থেকে টেনে বের করে এনে তাঁকে নানাভাবে অপদস্থ করে এবং সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

তাঁর হত্যাকাণ্ড

অতঃপর তিনি কারারুদ্ধ হন, সেখানে তিনি গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারান। মনসুর ও রশীদের বংশধরদের এক্ষণে এই দশা হল।

আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ, আল-মুহতাদী বিল্লাহ [২৬ রজব, ২২৫ হিজরি]

মুতাজের সিংহাসনচ্যুতির পর তুর্কোমান সর্দারগণ ওয়াসিকের এক পুত্রকে মুহতাদী বিল্লাহ[১] উপাধি দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়-চরিত্র, ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ এবং কর্তব্য পালনে আগ্রহশীল। অপেক্ষাকৃত সুসময়ে তিনি নিজেকে যোগ্য শাসক হিসেবে প্রতিপন্ন করতে পারতেন। তিনি প্রাসাদ থেকে গায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ, নর্তকী ও অন্যান্য পরান্নভুকদের বহিষ্কার করেন এবং চেষ্টা করেন আইনানুসারে রাষ্ট্র শাসন করতে। এতে শীঘ্রই তাঁর সাথে তুর্কীদের সংঘর্ষ বাধে। মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে তিনি সাহসের সাথে তাদের মোকাবিলা করেন। সমর্থকদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে তিনি ধরা পড়েন বিদ্রোহীদের হাতে এবং যথেষ্ট লাঞ্ছনার পর সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অতঃপর তাঁকে বন্দি করা হয়, যেখানে তিনি কিছুদিন পরই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবুল আব্বাস আহমদ, মুতামিদ আলাল্লাহ [২৫৬ হিজরি; ৮৭০ খ্রিস্টাব্দ]

মুতাওয়াক্কিলের জীবিত পুত্রদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র সামাররায় বসবাস করতেন। তাঁকে মুতামিদ আলাল্লাহ[২] উপাধি দিয়ে খলিফা বলে ঘোষণা করা হয়। তিনি ছিলেন দুর্বল, অস্থিরচিত্র ও আমোদপ্রিয়। কিন্তু সুদক্ষ ও বিশেষ সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন তাঁর ভাই মুওয়াফফিক[৩] উপাধেয় আবু আহমদই প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্য শাসন করেন এবং মুতামিদের মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর (মুওয়াফফিক) মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিজেকে প্রতিপন্ন করেন খিলাফতের প্রধান অবলম্বন হিসেবে। অংশত মুওয়াফফিকের ব্যক্তিত্বের বলে এবং অংশত রাজদরবার এক্ষণে পুনরায় বাগদাদে চলে যাওয়ায় ও সেখানে রাজশক্তি স্বদেশপ্রেম দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এই রাজত্বকাল এবং পরবর্তী দুই রাজত্বকালে তুর্কী রক্ষীরা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং মামুনের বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যে পুনরায় প্রতিভাত হয় শৌর্য ও সমৃদ্ধির আলোকরশ্মি। ৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ তাবারিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। হাসান বিন

---

[১] যিনি আল্লাহ কর্তৃক সৎপথে পরিচালিত।

[২] যিনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন।

[৩] আল্লাহর সাহার্যে সমৃদ্ধ।

জায়দ নামক আলী (রা.)-এর জনৈক বংশধর সেখানকার অধিবাসীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং হয়ে ওঠেন সে দেশের রাষ্ট্রনায়ক।

সাফফাহ্‌র বংশীয়দের অভ্যুত্থান, লাইসের পুত্র ইয়াকুব

সাফফাহ্‌র বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাম্রকার[১] লাইসের পুত্র সুবিখ্যাত ইয়াকুব, যাঁর জীবন শুরু হয় সাধারণ একজন সৈনিক হিসেবে। তিনি ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তাহির বংশীয়দের নিকট থেকে সিজিস্তান জয় করে নেন এবং ক্রমান্বয়ে সমগ্র বর্তমান পারস্যের উপর তাঁর ক্ষমতা বিস্তার করেন। ৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাহিরের পৌত্র মুহম্মদকে খোরসান থেকে বিতাড়িত করেন এবং কিছুদিন পরই অধিকার করেন তাবারিস্তান। সাফল্য তাঁর অহঙ্কারকে এতই উসকে দিয়েছিল যে তিনি ইরাক আক্রমণ করেন, কিন্তু ওয়াসিতের নিকট মুওয়াফফিকের সম্মুখীন হন এবং বিপুল ক্ষয়ক্ষতিসহ পরাজিত হন। অতঃপর ইয়াকুব নিজের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ

পরের বছর ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে তিনি পুনরায় খলিফাকে ভীতি প্রদর্শন করেন, কিন্তু অকস্মাৎ জুনদিশাপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ভাই ও উত্তরাধিকারী আমর বিন লাইস মুতামিদের সাথে শান্তি স্থাপন করেন এবং খলিফার ফরমান দ্বারা তাঁর দখলীকৃত সমস্ত দেশের অবাধ অধিকারলাভ করেন।

সামানী বংশ

ট্রান্সক্সিয়ানা প্রদেশ সাফফাহ বংশের অঙ্গরাজ্য দ্বারা সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেখানকার শাসনকর্তা ইসমাঈল সামানীর অধীনে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়ে ওঠেন। সামান ছিলেন উষ্ট্রপালের মালিক এবং কাফেলা দলের নেতা। তাঁদের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে তাঁর পরিবার মামুনের কাছে ঋণী, যিনি ৮১৯ খ্রিস্টাব্দে সামানের পুত্র আহমদকে ফারগানার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। আহমদের পর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র নাসর। ৮৯২ খ্রিস্টাব্দে নাসরের মৃত্যু হলে তাঁর ভাই ইসমাঈল প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইসমাঈল ছিলেন অতিশয় দক্ষ ও দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। তুর্কোমান যাযাবররা ট্রান্সক্সিয়ানায় প্রবেশ করতে প্রয়াসী হলে তিনি তাদের জেক্সারটেস নদীর অপর তীরে বিতাড়িত করেন; বিজ্ঞ, উদার ও ন্যায়পরায়ণ শাসন দ্বারা তিনি প্রজাদের অনুরাগভাজন হন এবং এসব উপায়ে তাঁর বংশকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আমর বিন লাইসের মত নামমাত্র করদানের শর্তে খলিফা তাঁকে প্রদেশের শাসনভার প্রদান করেন, যা তাঁর বংশে পুরুষানুক্রমিকে পরিণত হয়[২]।

তুলুন বংশ

আহমদ বিন তুলুন মিশর ও সিরিয়া অধিকার করেছিলেন। আহমদ ৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র খুমার ওয়াইহ, যিনি দামিশকে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন।

---

[১] আরবী সাফফার শব্দের অর্থ তাম্রকার।

[২] সামানী বংশের শাসনকর্তাদের নামের জন্য সারণী দেখুন।

এসকল স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভবের ফলে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লেও এদের দ্বারা শাসিত দেশগুলোর লোকদের জন্য তা মঙ্গলবিহীন হয়নি, কারণ এরা শিল্পকলা ও সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি বিধান করেছিলেন ।

নিগ্রো বিদ্রোহ

মুতাজের রাজত্বকালে কালদীয়ায় যে নিগ্রো বিদ্রোহ শুরু হয় তা ছিল খুবই ভয়াবহ। একজন পারসি-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করে তার অনুগামীদের উৎকট অনাচারের অনুমতি দিয়েছিল এবং এইজন্য সে খবিশ (পাপাত্মা) নামে আখ্যায়িত হয়েছিল। দেশের সকল অংশের নিগ্রো ক্রীতদাসরা তার পতাকাতলে সামিল হয় এবং সে নিজে কালদীয়া ও আহওয়াজ প্রদেশের মালিক হয়ে কয়েক বছর পর্যন্ত তাকে মুওয়াফফিক কর্তৃক দমন করার সকল প্রয়াস উপেক্ষা করে চলে। ৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সে মুওয়াফফিক কর্তৃক আক্রান্ত ও নিধনপ্রাপ্ত হয়। তার ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়, অনুগামীরা হয় ছত্রভঙ্গ এবং সে স্বয়ং নিহত হয়। ৮৮২ খ্রিস্টাব্দে আরব, মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলনিয়া, কালদীয়া (ইরাক-আরব), ইরাক আজম, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া এবং ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী প্রদেশসমূহ পর্যন্ত খলিফার সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। তখনো লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এটি ছিল এক বিশাল সাম্রাজ্য।

খিলাফতের চারদিকে যে গোলযোগ দেখা দিয়েছিল তার সুযোগ নিয়ে বাইজান্টাইনরা কয়েকবার মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে। প্রথমে বিনা বাধায় তারা সম্মুখে অগ্রসর হয়, কিন্তু সিরিয়া যখন আহমদ বিন তুলুনের করতলগত হয় তখন তারা বাধা পায় তরসাসের তুলুন বংশীয় শাসনকর্তার কাছে এবং কয়েকটি যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়।

শিয়াদের শেষ ইমাম, ৮৭৪ খ্রি.

মুতামিদের রাজত্বকালে ২৬০ হিজরিতে ইমাম হাসান আল-আসকারী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহমদ আল-মাহদী (সৎপথপ্রাপ্ত) শিয়াদের শেষ ইমাম নিযুক্ত হলেন। মুহম্মদ (স.)-এর বংশধর এই ইমামের কাহিনী বড়ই করুণ। হাসানের পিতা স্বৈরাচারী মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক মদীনা থেকে সামাররায় নির্বাসিত হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানেই আবদ্ধ থাকেন। ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে মুতাওয়াক্কিলের উত্তরাধিকারীগণ একইভাবে হাসানকেও বন্দি করে রাখেন ।

২৬৫ হিজরি; ৮৭৮ খ্রি.

মাত্র পাঁচ বছর বয়স্ক তাঁর শিশুপুত্র পিতার জন্য শোকাভিভূত হয়ে তাঁর অনুসন্ধানে গৃহের অনতিদূরে একটি গুহায় প্রবেশ করে। এই গুহা থেকে শিশুটি আর ফিরে আসেনি। এই বিপর্যয়ের গভীর শোকানুভূতি হাসানের শিষ্যদের মনে এরূপ প্রত্যাশা সঞ্চার করে যে, দুঃখময় ও পাপপূর্ণ পৃথিবীকে পাপ ও অত্যাচারের গুরুভার থেকে মুক্ত করতে শিশুটি আবার ফিরে আসবে। পরবর্তীকালে চতুর্দশ শতাব্দীতে বিন খালদুন যখন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করছিলেন তখন শিয়ারা সন্ধ্যাকালে গুহার প্রবেশ পথে সমবেত হত এবং হারানো শিশুটিকে তাদের কাছে ফিরে আসার জন্য প্রার্থনা করত। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর হতাশ ও বিষাদময় চিত্তে তারা গৃহে ফিরত । ইবন খালদুন

বলেন, 'এটি ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। যখন তাদের বলা হত যে তার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব তখন তারা উত্তর করত যে পয়গম্বর খিজ্‌র বেঁচে থাকতে পারে তাহলে তাদের ইমামই-বা বেঁচে থাকবে না কেন?' এ প্রসঙ্গে ইবন খালদুন মন্তব্য করেন যে, 'খিজ্‌রের বেঁচে থাকা সম্পর্কিত বিশ্বাসটি একটি অযৌক্তিক কুসংস্কার। সে জন্য এই ইমাম অভিহিত হন মুনতাজার অথ্যাৎ প্রতিক্ষিত হুজ্জা বা (সত্যের) প্রমাণ এবং কায়িক অর্থাৎ জীবিত বলে।

আবুল আব্বাস আহমদ, আল-মুতাজিদ বিল্লাহ
[রজব ২৭৯ হিজরি; সেপ্টেম্বর ৮৯২ খ্রিস্টাব্দ]

মুওয়াফফিক ২৭৮ হিজরিতে পরলোকগমন করেন এবং কিছুদিন পর তাঁর ভাই খলিফারও মৃত্যু হয়। মুতামিদের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও মুওয়াফফিকের পুত্র আহমদ মুতাজিদ বিল্লাহ[১] উপাধি ধারণ করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর ও তাঁর পরবর্তী রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের আর কোন অঙ্গহানী ঘটেনি। অন্যদিকে কতকগুলো অনুকূল অবস্থার সমাবেশ খলিফাদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রদেশকে তাঁরা সাম্রাজ্যের সাথে পুনরায় যুক্ত করতে সক্ষম হন।

মুতাজিদের চরিত্র

মুতাজিদকে দ্বিতীয় সাফ্‌ফাহ্‌ বলা হয়। কারণ তিনি দুর্বল ও জীর্ণ আব্বাসী বংশের ক্ষমতাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন বলে মনে করা হয়। বলিষ্ঠ ও কর্মঠ মানুষ, তেজস্বী ও বিজ্ঞ প্রশাসক এবং উৎকৃষ্ট যোদ্ধারূপে তাঁকে বর্ণনা করা হয়ছে। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ প্রথম সাফ্‌ফাহ্‌র মতই নির্দয় ছিলেন এবং জনসাধারণের অরাজকতার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন বলেই মনে হয় এবং তিনি যে সম্ভ্রম ও ত্রাসের উদ্রেক করেছিলেন তা সকল বিবাদ-বিসংবাদকে প্রশমিত করে রেখেছিল।

মিশর পুনরাধিকার [২৮২ হিজরি]

তিনি বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধে কৃককার্যতা লাভ করেন এবং তাদের নিকট থেকে কয়েকটি নগর উদ্ধার কিংবা দখল করেন। তিনি মেসোপটেমিয়া থেকে কুর্দদের বিতাড়িত করেন এবং দৃঢ়তার সাথে দমন করেন মসুলের আমীর হামদানের বিদ্রোহ, যিনি নিজেকে স্বাধীন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি হল প্রকৃতপক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে মিশরকে খিলাফতের অধীনে ফিরিয়ে আনা। আহমদ বিন তুলুনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী খুমার ওয়াইহ স্বেচ্ছায় বাৎসরিক এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা করদানের বিনিময়ে মিশরের রাজপ্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত হতে চাইলেন। তাঁর কন্যা কাতর-উন-নাদার (শিশির বিন্দু) সাথে মুতাজিদের বিবাহ বন্ধন দ্বারা এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য আরও সুদৃঢ় হয়।

মুতাজিদের শাসন মোটামুটি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় ছিল এবং তাঁর কিছু কাজকর্ম ছিল নিঃসন্দেহে মঙ্গলজনক। তিনি নগর থেকে মন্দ চরিত্র ও ভবঘুরে লোকদের বিতাড়িত করেন; তারা দিনের বেলায় পথের পাশে গল্প বলা ও ভাগ্য গণনার ব্যবসা করত এবং রাতে ডাকাতি করত।

---

[১] যিনি আল্লাহর সাহায্যে দৃঢ়।

উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার সাধন

কিন্তু যে সংস্কার দ্বারা তিনি প্রজাদের সবচেয়ে বেশি শুভেচ্ছা অর্জন করেছিলেন তা হল উইলবিহীন উত্তরাধিকারী আইনের সংস্কার সাধন। প্রাচীন আরব প্রথায় মৃত ব্যক্তির সাথে কোন স্ত্রীলোকের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি, যেমন কন্যা বা ভগিনীর সন্তানগণ উত্তরাধিকারী থেকে বঞ্চিত হত এবং সেকেলে এই রীতি সর্বপ্রথম সুন্নী আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়। তদনুসারে পুরুষোদ্ভূত জ্ঞাতি না থাকলে ঐ সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হত। মুতাজিদ বাজেয়াপ্ত দপ্তর বিলোপ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, পুরুষোদ্ভূত জ্ঞাতিগণের পর স্ত্রীলোকোদ্ভূত জ্ঞাতিরা সম্পত্তি গ্রহণ করবে।

নববর্ষ উৎসব

তখন পর্যন্ত প্রাচীন পারসিদের মত উৎসবাদির দ্বারা সৌরবর্ষের প্রথম দিনটিকে পালন করা হত। নববর্ষের প্রথম দিনকে নায়রূজ[১] খাসসা (বিশেষ নওরোজ) বলা হত; ঐ দিনে খলিফা দরবার আহ্বান করে উপঢৌকন গ্রহণ করতেন এবং নিজেও দান-দক্ষিণা করতেন। লোকেরা পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎকার বিনিময় করত, পরস্পরকে উপহার দিত রঙিন ডিম,[২] সুস্বাদু কেক ও মিষ্টান্ন এবং আতসবাজী পুড়িয়ে ও পরস্পরের উপর রঙিন বা সুগন্ধি পানি ছিটিয়ে আমোদ-প্রমোদ করত[৩]। পানি ছিটাছিটিতে অনেক সময় কেলেঙ্কারিতে পর্যবশিত হত এবং বিশৃঙ্খল আতসবাজী বিপজ্জনক হওয়ায় মুতাজিদ উভয় প্রথাই নিষিদ্ধ করে দেন। যাই হোক, পুস্তক বিক্রেতাদের দর্শন বিষয়ক পুস্তকাদি বিক্রি নিষিদ্ধ করায় ভালোমন্দ দুই-ই হয়েছিল। তিন নববর্ষকে মার্চ মাস থেকে সিরীয় হুজায়রান (জুন) মাসে পরিবর্তিত করেন। তখন থেকে এটি মুতাজিদের নববর্ষ বলে অভিহিত হয়[৪]।

কারমাতী বংশ [২৭৮ হিজরি; ৮৯১-৮৯২ খ্রিস্টাব্দ]

আফ্রিকায় ফাতিমীদের[৫] অভ্যুত্থান এবং সাম্যবাদী কারমাতীদের (কারামিতা)[৬] আবির্ভাব এই রাজত্বকালে সংঘটিত হয়েছিল। কারমাতীগণ সমগ্র আরব, সিরিয়া ও ইরাক লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডে ভরে তুলেছিল এবং পরিশেষে মুসলিম জগতে বয়ে এনেছিল চরম ধ্বংস ও বিপর্যয়। কারমাতীগণ প্রথমে কুফার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আবির্ভূত হয়।

আবু সাঈদ আল-জান্নাবী [৯০০ খ্রি.]

তাদের মতবাদ পৌঁছে যায় ইসলামের স্বাধীনপন্থী ও বিপ্লববাদীদের আশ্রয়স্থল বাহরাইনে। এখানে কারমাতীগণ কুখ্যাত আবু সাঈদ আল-জান্নাবীর (জান্নাবা নামক স্থান থেকে) নেতৃত্বে এমন শক্তি সঞ্চয় করল যে তারা ২৮৭ হিজরিতে মুতাজিদের সৈন্যদলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সমর্থ হয়।

৯০৩-৯০৪ খ্রি.

দুই বছর পর তারা সিরিয়ায় প্রবেশ করে এবং লুণ্ঠনের মাধ্যমে বিধ্বস্ত করে প্রদেশটিকে। ৩০১ হিজরিতে আবু সাঈদ গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হলে তাঁর পুত্র আবু

---

[১] পারসিতে নওরোজ।

[২] রঙিন ডিম্ব সূর্যালোকিত মৃত্তিকার উর্বরাশক্তির প্রতীক ছিল। খ্রিস্টানদের ইস্টার ডিম্ব এবং ইস্টার উপহারের প্রথা এই একই ধারণা থেকে উদ্ভূত।

[৩] হিন্দুদের বসন্ত বা হোলি উৎসবের মত।

[৪] আন-নায়রুজ আল-মুতাজিদী। এই পরিবর্তনের কারণ পুনরালোচনায় দেখান হবে।

[৫] পূর্বে দ্রষ্টাব্য।

[৬] কারামতের শিষ্য; দ্রষ্টব্য 'দ্য স্পিরিট অব ইসলাম'।

তাহির তাদের নেতা নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে তারা বসরা অবরোধ করে এবং আগুন ও তারবারির সাহায্যে তাদের নাগালের মধ্যেকার দেশগুলোকে পরিণত করে ধ্বংস্তূপে। তারা এক সৈন্যবাহিনীর পর আর এক সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে তাদের ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যায়, অবশেষে ৩১৭ হিজরিতে (মুকতাদিরের রাজত্বকালে) হজ্জের শুভদিনে তারা অকস্মাৎ মক্কার উপর আপতিত হয়ে তীর্থযাত্রীদের হত্যা করে, কাবাকে করে অপবিত্র এবং কৃষ্ণ প্রস্তর (হাজরে আসোয়াদ) তুলে নিয়ে যায়। তাদের পাপের মাত্রা এবার পূর্ণ হয়। চতুর্দিকের মুসলমানরা সংঘবদ্ধ হয় মানবতার এই শত্রুদেরকে ধ্বংস করতে এবং প্রায় পনের বছর ধরে নৃশংস ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এই মারাত্মক সম্প্রদায় সমূলে উৎখাত হয়– যদিও তাদের বিদ্রোহের ধ্বংসাত্মক চিহ্ন কখনো মুছে যায়নি। আরব, সিরিয়া ও কালদীয়ার অধিকাংশ অঞ্চল বিরান হয়ে যায়। হৃত শক্তি পুনরুদ্ধারে খিলাফতের বাহু যখন প্রয়াসী হয় তখনই তা হয়ে পড়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং সাম্রাজ্যের জাতশত্রু বাইজান্টাইনরা এভাবে মুসলিম রাজ্যগুলোতে অবাধ লুণ্ঠন চালাতে সমর্থ হয়।

আবু মুহম্মদ আলী, আল-মুকতাফী বিল্লাহর সিংহাসনারোহণ
[২২ রবিউস সানী ২৯৯ হিজরি; ৫ এপ্রিল, ৯০২ খ্রিস্টাব্দ]

মুতাজিদ ২৯৯ হিজরিতে পরলোকগমন করেন এবং মুকতাফী বিল্লাহ[১] উপাধি গ্রহণ করে তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র আবু মুহম্মদ আলী। মুকতাফী একজন বিজ্ঞ, মহানুভব ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করেন। পিতার মৃত্যুর সময় তিনি ছিলেন রাক্কাতে এবং তাঁর পক্ষে আনুগত্যের শপথ নেন উবায়দুল্লাহর পুত্র উজির কাসিম। তিনি একজন সৎ ও যোগ্য উজির। টাইগ্রিস নদীর উপর দিয়ে নৌকাযোগে জনসাধারণের জয়ধ্বনির মধ্যে মুকতাফী বাগদাদে পৌঁছান। পৌঁছেই তিনি পিতার ভূগর্ভস্থ কারাগারগুলো ধ্বংস করেন এবং সেগুলোকে উপাসনা গৃহে রূপান্তরিত করেন। মুতাজিদ তাঁর প্রাসাদ নির্মাণ করতে যেসব জমি ও বাগান দখল করেছিলেন সেগুলো তিনি ফিরিয়ে দেন প্রকৃত মালিকদের কাছে। এভাবে তিনি জনসাধারণের শুভেচ্ছা লাভ করেন– যে জনসাধারণ তাঁর পিতার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়েছিল।

কারমাতী-বিভীষিকা খলিফার সৈন্যদলকে অবিরাম ইরাক, হিজাজ ও দক্ষিণ সিরিয়ায় ব্যাপৃত রাখা সত্ত্বেও মুকতাফী মিশরকে সরাসরি তাঁর অধীনে আনতে এবং অল্পবিস্তর শান্তি প্রদান করে বাইজান্টাইনদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হন। তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী আন্তালিয়া (আদালিয়া)[২] আকস্মিক আক্রমণ দ্বারা অধিকৃত হয় এবং থেসালোনিকা লুণ্ঠিত হয় ।

আবুল ফজল জাফর আল-মুকতাদির বিল্লাহ
[১২ জুলকদ, ৩০৪ হিজরি; ১৩ আগস্ট, ৯০৭ খ্রি.]

পাঁচ বছরের স্বল্পকালীন রাজত্বের পর দুর্ভাগ্যক্রমে মুকতাফী মৃত্যুবরণ করে এবং তাঁর ত্রয়োদশ বছর বয়স্ক ভাই জাফর মুকতাদির বিল্লাহ[৩] উপাধি ধারণ করে তাঁর উত্তরাধিকারী হন। তিনি প্রায় পাঁচিশ বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেসব উজিরের[৪] হাতে প্রকৃত ক্ষমতা নিহিত ছিল তাঁদের সদগুণ ও সুশাসনে এই রাজত্বের প্রারম্ভে সাম্রাজ্যের মর্যাদা বজায় ছিল, কিন্তু খলিফার হঠকারিতায় অবশেষে তা দ্রুত ক্ষুণ্ন হতে থাকে। ফাতিমী খলিফা উবায়দুল্লাহ আল মাহদী সমগ্র উত্তর আফ্রিকা জয় করে নেন এবং বিতাড়িত করেন ইফ্রিকিয়ার শেষ আঘলব আমীর জিয়াদত উল্লাহ বিন আঘলবকে, যিনি প্রথমে মিশরে ও পরে ইরাকে পালিয়ে যান।

---

[১] আল্লাহতে সন্তুষ্ট।
[২] আদালিয়া উপসাগরের তীরে অবস্থিত।
[৩] আল্লাহর দ্বারা শক্তিশালী।
[৪] ইবন ফুরাত এবং অন্যান্যরা।

৩০৫ হিজরি

যে দায়লামীগণ প্রাচীন মেডিয়ার সর্বোত্তম এলাকায় বাস করত তারা এ সময় হাসান নামক আলী (রা.)-এর একজন বংশধরের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। হাসান আল উতরুশ (অর্থাৎ বধির) নামেও অভিহিত হতেন। তিনি সামানীদের নিকট হতে তাবারিস্তান ও গীলান জয় করেছিলেন। ৩০৫ হিজরিতে বাইজান্টাইন সম্রাটের নিকট হতে একজন রাষ্ট্রদূতের বাগদাদ আগমনের কথা আমরা জানতে পারি, যাঁকে মহাসমারোহ ও উৎসব সহকারে অভ্যর্থনা করা হয়। পরের বছর বিখ্যাত মুকতাদিরিয়া হাসপাতালের উদ্বোধনের কথাও জানতে পারি, যার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক ৫ হাজার দীনার বরাদ্দ হয়।

মুকতাদিরের রাজত্বের শেষ ভাগে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ছিল তাঁর মায়ের হাতে, যিনি ছিলেন একজন চরিত্রবতী ও সুদক্ষ মহিলা। তিনি নিজের হাতে ফরমান ও আইন-কানুন জারি করতেন এবং শুক্রবার দিন কাজী ও সভাসদগণ পরিবেষ্টিত হয়ে দরবারে আরজি ও অভিযোগ গ্রহণ করতেন। প্রতিক্রিয়াশীল হাম্বলীরা মুকতাদিরের সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করে। তাদের দুর্দমনীয় ধর্মোন্মত্ততায় বাগদাদে প্রায়শই দাঙ্গা বেধে যেত[১]। সরকারের দুর্বলতা দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তারা জনসাধারণের ধর্মবিধানকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা বাড়ির অন্দরমহলে হানা দিত এবং এসব আবাসস্থলে তল্লাসি চালিয়ে তাদের গোঁড়া রুচির পরিপন্থী সমস্ত কিছু জোর করে কেড়ে নিত এবং ধ্বংস করে ফেলত। তাদের বিশেষ ঘৃণা ছিল দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলির বিরুদ্ধে; যেগুলি পুস্তক বিক্রেতাদের দোকান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তারা প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলত।

আবু মনসুর মুহম্মদ, আল কাহির বিল্লাহ
[৬ জমাদিউল উলা, ৩২২ হিজরি; ২৫ এপ্রিল, ৯৩৪ খ্রি.]

৩২০ হিজরিতে একজন সম্ভ্রান্ত বিদ্রোহীর সাথে যুদ্ধে মুকতাদির নিহত হন। অতঃপর আল কাহির বিল্লাহ[২] উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিতহন মুতাজিদের আরেক পুত্র আবু মনসুর মুহম্মদ। তিনি নিষ্ঠুর ও দুশ্চরিত্র প্রকৃতির ছিলেন এবং যারা তাঁকে খলিফা বলে ঘোষণা করেছিল তারাই তাঁকে পদচ্যুত ও অন্ধ করে দেয়। তাঁর রাজত্বকালে মিশর পুনরায় তাঁর বিখ্যাত শাসনকর্তা তুর্কী ইকশিদের হাতে স্বাধীন হয়ে ওঠে[৩]।

আবুল আব্বাস মুহম্মদ, আর-রাজী বিল্লাহ

অতঃপর তুর্কী আমীরগণ আবুল আব্বাস মুহম্মদ নামক মুকতাদিরের এক পুত্রকে সিংহাসনে বসান এবং তাঁকে অভিহিত করা হয় আর-রাজী বিল্লাহ[৪] উপাধী দিয়ে। তাঁর সাথেই খলিফাদের ক্ষমতা বা মর্যাদার শেষ চিহ্নটুকু বিলীন হয়। তাঁর সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই ওয়াসিত ও বসরার শাসনকর্তা মুহম্মদ বিন রাইক সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষীগত করেন এবং অসহায় রাজী কর্তৃক ভূষিত হন আমির উল উমরা[৫] উপাধিতে, যে পদমর্যাদা বিশেষভাবে তাঁর জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল। বাগদাদ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ব্যতীত আর কিছুই তখন নামমাত্র খলিফার হাতে ছিল না, প্রত্যেক

---

[১] তাদের ধর্মান্ধতা এতই ব্যাপক ছিল যে তারা ঐতিহাসিক তাবারীকে দাফন করতে দেয়নি, কারণ তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসে তিনি আমদ ইবন হাম্বলের প্রশংসা করেননি। তাবারীকে তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা পরে গোপনে সমাপিত করেন।

[২] আল্লাহর সাহায্যে ক্ষমতাশালী।

[৩] ইখশিদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

[৪] আল্লাহতে সন্তুষ্ট।

[৫] আমীরদের আমীর। প্রকৃতপক্ষে আমীর-উল উমারা ছিলেন প্রাসাদাধ্যক্ষ এবং তিনি খলিফার নামে সব সময় কর্তৃত্ব চালাতেন।

প্রদেশের শাসনকর্তারা অবতীর্ণ হন স্বাধীন ভূমিকায়। এ যাবৎ কাল স্পেনের উমাইয়া শাসকরা যথাযথভাবে খলিফা ও আমীরুল মুমেনীন (বিশ্বাসীদের নেতা) উপাধি গ্রহণে বিরত ছিলেন। কিন্তু এই যুগে আব্বাসীদের অবনতি এবং প্রকৃত শাসন কর্তৃত্ব লোপ পাওয়ায় তৃতীয় আবদুর রহমান খিলাফতের পদ ও প্রতীক গ্রহণ করেন।

মুহম্মদ বিন রাইককে পদচ্যুত করেন তাঁর তুর্কী সেনাপতি বাজকাম, যিনি অতঃপর আমীর-উল-উমরা পদ ও উপাধি লাভ করেন।

আবু ইসহাক ইব্রাহীম, আল-মুত্তাকী বিল্লাহ [৩২৯ হি.; ৯৪০ খ্রি.]

৩২৯ হিজরিতে রাজীর মৃত্যুর পর মুকতাদিরের আরেক পুত্র আবু ইসহাক ইব্রাহীমকে আল মুত্তাকী বিল্লাহ[১] উপাধি দিয়ে খলিফা বলে ঘোষণা করা হয়। তিনি ছিলেন বাজকামের কর্মসচিবের হাতের পুতুল মাত্র। কিছুদিন পর বাজকাম নিহত হন এবং আরেকজন তুর্কী হন তাঁর কর্তৃত্বের উত্তরাধিকারী, যাঁকে পরাজিত করে বিন রাইক পুনরায় আমীর-উল-উমরা হন। আরেকজন তুর্কোমান নেতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বিন রাইক অকর্মন্য খলিফাকে সঙ্গে নিয়ে মসুলে পালিয়ে যান। এখানে মসুল ও তিকরিতের অধিপতি আমির হামদানের পৌত্ররা গ্রিকদের ঠেকিয়ে রেখে তাঁদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতানুযায়ী বাইজান্টাইন আক্রমণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছিলেন। বিন রাইক গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন এবং এবং হাসান ও আলী নামে হামদান বংশের দু'জন আমীর যথাক্রমে নাসির উদ্-দৌলা ও সাইফুদ্দৌলা উপাধি গ্রহণ করে খলিফার তত্ত্বাবধায়ক হন। মুত্তাকীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সাড়ম্বরে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং তাঁকে পুনরায় অধিষ্ঠিত করেন তাঁর সিংহাসনে। তুজুন নামক তুর্কী সেনাপতির নেতৃত্বে আরেকটি বিদ্রোহের ফলে তাঁরা বাগদাদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। মুত্তাকী এবার তুজুনের হাতে পড়েন। একবার তিনি রাক্কায় পলিয়ে যান, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হয়ে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে অন্ধ ও পদচ্যুত করা হয়। এই রাজত্বকালে গ্রিকরা এডেসা (রুহা) পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে চতুষ্পার্শ্বস্ত মুসলমানদের হত্যা করে। কেবল এডেসা রক্ষা পায় যীশু-খ্রিস্টের বিখ্যাত রুমাল সমর্পণের মাধ্যমে, যেটি নগরীর প্রধান গির্জায় রক্ষিত ছিল।

আবুল কাসিম আবদুল্লাহ, আল-মুসতাকফী বিল্লাহ [সফর, ৩৩৩ হিজরি; অক্টোবর, ৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ]

অতঃপর তুজুন মুত্তাকীর ভ্রাতা আবুল কাসিম আবদুল্লাহকে আল মুসতাকফী বিল্লাহ[২] উপাধী প্রদান করে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করেন। মুসতাকফীর সিংহাসনারোহনের কিছুকাল পরে তুজুন মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং আমির-উল-উমরা পদে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর কর্মসচিব জাফর বিন শিরজাদ।

বুওয়াইহী বংশ

বুওয়াইহের পুত্র দায়লামী শাসকগণ এবার ইরাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করেন। তাঁদের অনুগ্রহ ও সমর্থন লাভের উদ্দেশে মুসতাকফী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আহমদকে মুঈজুদ্দৌলা এবং তাঁর ভাই আলী ও হাসানকে যথাক্রমে ইমাদুদ্দৌলা ও রুকনুদ্দৌলা উপাধি দান করেন। অচিরেই মুঈজুদ্দৌলা বাগদাদ ও খলিফার সর্বময় প্রভু হয়ে ওঠেন। তিনি সুলতান উপাধি পান এবং তাঁর নাম মুদ্রায় খচিত হয় এবং খুতবায় খলিফার নামের সাথে তাঁর নাম পঠিত হয়। তাঁর পদমর্যাদা ছিল ফ্রান্সের মেরোভিনজিয়ান রাজাদের আমলের চার্লস মার্টেলের পদমর্যাদার মত, কারণ তিনিই ছিলেন প্রকৃত ক্ষমতাশালী। পক্ষান্তরে খলিফা ছিলেন সরকারি তহবিল থেকে দৈনিক

---

[১] আল্লাহর সাহায্যে ধার্মিক।

[২] যিনি আল্লাহতে সন্তুষ্ট।

৫,০০০ দীনার বৃত্তি প্রাপ্ত তাঁর আশ্রিত মাত্র। মুঈজুদ্দৌলা শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হলেও তিনি নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। তিনি ছিলেন শিয়া এবং তিনিই কারবালার হত্যাকাণ্ডের স্মরণে ১০ মুহরমকে শোক দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন । বাইজান্টাইনরা সর্বত্র যুদ্ধ-বিগ্রহ চালায় এবং ইসলামের বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য তাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে অথবা তাদের লুণ্ঠন বন্ধ করতে অপারগ হয়।

আবুল কাসিম আল-ফজল আল-মুতী বিল্লাহ [৩৩৪ হিজরি, ৯৪৬ খ্রি.]

মুসতাকফী মুঈজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে রত– এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মুঈজ ৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ও অন্ধ করে দেন। অতঃপর মুকতাদিরের আরেক পুত্র আবুল কাসিম আল ফজলকে আল মুহী বিল্লাহ[১] উপাধি দিয়ে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। বুওয়াইহী বংশ প্রায় এক শতাব্দী কাল তাঁদের ক্ষমতা বজায় রাখেন; এই সময় পদমর্যাদায় তাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারে এমন কেউ ছিল না। তুর্কী সামরিক বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়, হামদানবংশীয়রা বিতাড়িত হয় মসুল থেকে এবং কেউ কেউ নিঃসন্দেহে নিষ্ঠুর ছিলেন, কিন্তু মোটামুটিভাবে তাঁদের আধিপত্য জনসাধারণের উন্নতি এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার সহায়ক ছিল।

আবু বকর আবদুল করিম, আত-তায়ী বিল্লাহ
[১৩ জুলকদ, ৩৬৩ জি.; ৫ আগস্ট, ৯৭৪ খ্রি.]

৩৫৬ হিজরিতে (৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে) মুঈজুদ্দৌলা প্রয়াত হন এবং তাঁর পুত্র বখতিয়ার ইজ্জুদ্দৌলা উপাধি প্রাপ্ত হয়ে আমীর-উল-উমরা পদে স্থলাভিষিক্ত হন। সাত বছর পর খলিফা মুতী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বুওয়াইহী আমীরের নির্দেশে তাঁর পুত্র আবুবকর আবদুল করিমের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন, যিনি আত-তায়ী বিল্লাহ[২] উপাধি নিয়ে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। এ সময় যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তা থেকে হামদানী ও বুওয়াইহী আমীরদের বদান্যতা এবং শিল্পকলা ও সাহিত্যে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক মাসউদী, দার্শনিক আবু নসর আল-ফারাবী, কবি মুতান্নাবী, কিতাব-উল-আগানী রচয়িতা আবুল ফারাজ, আবুল কাসিম আত-তানুখী, আলঙ্কারিক আদ-দীনাওয়ারী এবং অন্যান্য বহু দার্শনিক, বিজ্ঞানী, কবি, আইনজ্ঞ ছিলেন মুতী বিল্লাহর সমসাময়িক।

৩৬৩ হি., ৯৭৪ খ্রি.

তায়ী বিল্লাহর সিংহাসনারোহণকালে সিরিয়া ও হিজাজ জয় করেন বিখ্যাত ফাতিমী খলিফা আল-মুঈজ লি-দীনিল্লাহ, যাঁর নামে পবিত্র নগরদ্বয়ে (অর্থাৎ মক্কা ও মদীনা) খুৎবা পঠিত হত।

কিছুদিন পর ইজ্জুদ্দৌলা তাঁর পিতৃব্য আদুদ্দৌলা কর্তৃক পদচ্যুত হন এবং অকর্মণ্য খলিফা তাঁকে যে কেবল ঐ পদে বসাতে বাধ্য হন তা-ই নয়, তাঁকে তাজ উল-মিল্লাত (ধর্মের মুকুট) উপাধি দিয়ে রাজকীয় সম্মানও দিতে বাধ্য হন।[৩]

৩৭২ হি., ৯৮২ খ্রি.

আদুদ্দৌলা ৩৭২ হিজরিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র সামসামুদ্দৌলা[৪] যিনি শামস-উল-মিল্লাত (ধর্মের সূর্য) উপাধি পান। সামসামুদ্দৌলা তাঁর ভাই শরফুদ্দৌলা কর্তৃক পদচ্যুত হন, যিনি প্রায় চার বছর ঐ পদে বহাল থাকেন[৫]।

---

[১] আল্লাহর অনুগত।

[২] আল্লাহর অনুগত।

[৩] যেমন তাঁর প্রাসাদ দ্বারে প্রত্যুষে, সূর্যাস্ত ও রাত্রিতে বাদ্য বাজানো।

[৪] সাম্রাজ্যের তরবারী।

[৫] শরফুদ্দৌলা তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ শাহানশাহ (রাজাদের রাজা) উপাধি দিতে খলিফাকে রাজি করান।

৩৭৬ হি., ৯৮৫ খ্রি.
শরফুদ্দৌলা ৩৭৯ হিজরিতে পরলোকগমন করেন এবং তাঁর উত্তরধিকারী হন তাঁর পুত্র আবু নাসর, যিনি বাহাউদ্দৌলা (রাজ্যের গৌরব) ও জিয়াউল-মিল্লাত (ধর্মের জ্যোতি) উপাধি প্রাপ্ত হন।

৩৭৯ হি., ৯৮৯ খ্রি.
আদুদ্দৌলা ও শরফুদ্দৌলা (৯৪৯-৯৮৯ খ্রি.) উভয়েরই জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্পৃহা পুনরুদ্দীপিত করেন এবং পুনরুজ্জীবিত করেন বাগদাদের শিক্ষাকেন্দ্রকে, খিলাফতের বিপ্লবের সময় যেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যেসব বৈজ্ঞানিককে তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করেন তাঁদের মধ্যে ইবনুস সালাম, আবদুর রহমান সূফি এবং প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও জ্যামিতি শাস্ত্রজ্ঞ আবুল ওয়াফার নাম উল্লেখ করা যায়। কবি ও বিদ্বানদের উৎসাহিত করা ছাড়াও আদুদ্দৌলা অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। বন্দামীর[১] নদীগর্ভকে গভীর করে শিরাজ পর্যন্ত নৌকা চলাচলের উপযোগী করে তোলার দায়িত্ব দেয়া হয় শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে। এটি সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে নিকবর্তী জেলাগুলোতে এ যাবতকালীন ধ্বংসাত্মক সাময়িক প্লাবন বন্ধ হয়। তিনি বাগদাদে একটি জাঁকজমকপূর্ণ হাসপাতাল এবং কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

আবুল আব্বাস আহমদ, আল কাদির বিল্লাহ
[১৯ শাবান, ৩৮১ হি.; ১ নভেম্বর, ৯৯১ খ্রি.]
তায়ী বাহাউদ্দৌলা কর্তৃক পদচ্যুত হন এবং বাধ্য হন তাঁর ভ্রাতা আবুল আব্বাস আহমদের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করতে, যাঁকে আল-কাদির বিল্লাহ[২] উপাধি দিয়ে সিংহাসনে আসীন করা হয়। তায়ী তাঁর ভ্রাতার প্রাসাদেই অবস্থান করেন এবং বিশেষ সম্মান ও সদয় ব্যবহার লাভ করেছিলেন বলেই মনে হয়, যা সেকালে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তিনি ৩৯৩ হিজরিতে (১০০২ খ্রি.) মৃত্যুমুখে পতিত হন। কাদির বিল্লাহকে বর্ণনা করা হয় ধার্মিকতা ও সততার জন্য বিখ্যাত একজন গুণবান মানুষ হিসেবে। তিনি অধিকাংশ রাত উপাসনায় অতিবাহিত করতেন এবং আয়ের এক বৃহদংশ দান করে দিতেন। তাই বলে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সহানুভূতির দিক দিয়ে তিনি সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন এবং মতামতের ক্ষেত্রে ছিলেন গোঁড়া; অবস্থার চাপে পড়ে তাঁকে সকল উন্নয়নের প্রতিই কঠোর প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব গ্রহণ করতে হয়েছিল। ফাতিমীগণ চারদিকে তাঁদের ক্ষমতা বিস্তার করছিল। আল মুঈজের উত্তরাধিকারী আজিজ নিজেকে এমসা, হামা ও আলেপ্পোর মালিক করে তোলেন এবং মেসোপটেমিয়ায় তাঁর প্রভুত্ব স্বীকৃত হয়। মুতাজিলা মতবাদও বিশেষ প্রসার লাভ করছিল। কাদির নিজে ছিলেন একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, তিনি যাবতীয় জাগতিক কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে আব্বাসী খিলাফতের ধর্মীয় প্রতিপত্তি ও মর্যাদা সুদৃঢ় করার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। ধর্মীয় প্রধান হিসেবে তাঁর সভাপতিত্বে ধর্মজ্ঞ পণ্ডিতদের সভা অনুষ্ঠিত হয়; ফাতিমীদের বিরুদ্ধে অভিসম্পাত লিপিবদ্ধ ও প্রচার করা হয়; যুক্তিবাদ হয় নিন্দিত এবং গোঁড়া মতবাদের হুবহু অনুসরণ একান্ত প্রয়োজনীয় বলে

[১] শিরাজের নিকটবর্তী।
[২] আল্লাহর দ্বারা শক্তিশালী।

তার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। মুতাজিলা মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি পুস্তিকা রচনা করেন এবং যুক্তিবাদকে নাস্তিকতা বলে ঘোষণা করে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা প্রজ্বলিত হয় এবং ধর্মীয় মতবাদকে কঠোরতা দান করে পরবর্তীকালে সংস্কারকার্যকে দুঃসাধ্য করে তোলা হয় ।

গজনবী বংশ [৯৯৯ খ্রি.]

যে সামানী বংশধরগণ বিশেষ সাফল্যের সাথে ট্রান্সক্সিয়ানা ও খুরাসান শাসন করেছিলেন তাঁরা এ সময় অন্তর্হিত হন এবং তাঁদের স্থান গ্রহণ করেন আরেকটি রাজবংশ। তাঁদের রাজত্বকাল ৮৭৪ থেকে ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। একজন তুর্কী সৈনিক মমলুক (ক্রীতদাস) হিসেবে জীবন শুরু করে তাঁর বাদশাহর সেবার মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় উচ্চ পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন। পরবর্তী বাদশাহর বিরাগভাজন হয়ে আলপ্তগীন বোখারা থেকে পালিয়ে যান এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে। তাঁর রাজধানী ছিল গজনী এবং এখানে থেকে তিনি ষোল বছর যাবৎ পর্যন্ত তাঁকে দমন করার সকল প্রয়াস ব্যর্থ করে দেন। ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে কর্তৃত্ব বর্তায় তাঁর জামাতা সবুক্তগীনের উপর, যিনি দূরদর্শী ও ক্ষমতাশালী শাসন দ্বারা প্রজাদের ভালবাসা এবং তাঁর প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ক্ষমতা ও আধিপত্যকে খলিফা স্বীকৃতি দেন, যা তাঁর শাসনকে দেয় ঈপ্সিত বৈধতা। বাগদাদ থেকে তাঁকে পতাকা ও প্রচলিত সম্মানসূচক খিলাফতসহ নাসিরুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করা হয় এবং তিনি পরিগণিত হন গজনবী বংশের বৈধ প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। তিনি হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে পাঞ্জাবে আক্রমণ চালান এবং প্রতিষ্ঠা করেন বোস্ত ও কুসদার নগরী। সামানী আমীর নূহের বিশ্বস্ত মিত্র হিসেবে তিনি ট্রানসক্সিয়ানকে তুর্কোমান যাযাবরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন।

সুলতান মাহমুদ

তাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্র মাহমুদ ও ইসমাঈলের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। মাহমুদ তাঁর ভাইয়ের সাথে রাজ্য ভাগ করে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত জনের আকাঙ্ক্ষা ছিল একক শাসনের। যুদ্ধে মাহমুদ কৃতকার্য হন, কিন্তু ইসমাঈলের সাথে তিনি বিশেষ উদার ও সদয় ব্যবহার করেন। সামানী বংশের ক্ষমতা এক্ষণে চূর্ণ হয়ে যায় এবং ১০০০ খ্রিস্টাব্দে গজনবী বংশের সুলতান খুরাসানের আধিপত্য লাভ করেন। খলিফা তাঁকে ইয়ামিনুদ্দৌলা (সাম্রাজ্যের দক্ষিণ হস্ত) ও আমিন-উল-মিল্লাত (ধর্মের জিম্মাদার) উপাধিতে ভূষিত করে যথাবিহীত নিযুক্তিপত্র পাঠিয়ে দেন। সুলতান মাহমুদের রাজত্বকাল এশিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় রাজত্বকালগুলোর মধ্যে অন্যতম। তিনি গজনীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন এবং রোমের প্রথম সম্রাটের ন্যায় তিনি বলতে পারেন যে, তিনি তাঁর রাজধানীকে কুঁড়েঘরের শহররূপে দেখেছিলেন এবং একে তিনি রেখে গেছেন মর্মর পাথরের প্রাসাদরাজীর নগরীরূপে। তিনি ছিলেন জ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক এবং কখনো কখনো সাময়িক ব্যয়কুণ্ঠতা ও সঙ্কীর্ণতার দ্বারা তাঁর বদান্যতা ব্যাহত হলেও তাঁর দরবার বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থল ছিল। আল বিরুনী, ফিরদৌসী, দাকিকী এবং আরও বহু দার্শনিক ও কবির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তাঁর রাজত্বকালে।

সুলতান মাহমুদ বহুবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, কিন্তু পাঞ্জাবের সীমান্ত ছাড়িয়ে তিনি কোন স্থায়ী রাজ্য জয় করেননি। মাহমুদ যখন পূর্বাঞ্চলে ব্যাপৃত তখন তুর্কোমানদের এক বৃহৎ দল খিরগিজ মালভূমি থেকে সয়হুন নদী অতিক্রম করে এবং

বসতি স্থাপন করে ট্রান্সক্সিয়ানায়। গজনবী সুলতান তাদের নামমাত্র কর দান ও বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে এই প্রদেশের অধিকার ছেড়ে দিয়ে মারাত্মক ভুল করেন। তাদেরকে দুর্বল করার উদ্দেশে তিনি সেলজুক[১] নামে এক নেতার অধীনে তাদের এক গোষ্ঠীকে তিনি খুরাসানে প্রেরণ করেন। এখানে সেলজুকগণ শক্তি ও সংখ্যায় বেড়ে চলে; অবশেষে তারা তাদের পূর্ব প্রভুদের সাথে সফলভাবে অস্ত্র চালনা করতে সমর্থ হয়।

সুলতান মাহমুদ

সুলতান মাহমুদ ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। পুত্র ও উত্তরাধিকারী মাসুদের জন্য এক গৌরবময় সাম্রাজ্য রেখে যান। তিনি খুরাসান থেকে দুর্ধর্ষ প্রজাদের অপসারণ করতে চেষ্টা করেন, যারা একটি ভুল নীতির ফলে রাজ্যের একেবারে কেন্দ্রস্থলে শিকড় গেড়ে বসেছিলেন।

সেলজুকী বংশ

হিরাতের নিকটে এক স্মরণীয় যুদ্ধে মাসুদ পরাজিত হন এবং গজনবী বংশের ধ্বংসস্তূপের উপর সেলজুক শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। সুলতান মাসুদের রাজ্য এক্ষণে খাস আফগানিস্তান ও পূর্বদিকে পাঞ্জাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে; তাঁর মৃত্যুর পর কয়েকজন সুলতান দ্রুত একের পর এক সিংহাসন দখল করেন। সুলতান ইব্রাহীমের সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত গজনবী বংশের ঘটনাবলি থাকে বিশৃঙ্খল অবস্থায়, সুলতান ইব্রাহীম ছিলেন দার্শনিক কবি হাকিম সানায়ীর[২] বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক, তিনি খুরাসানের সেলজুকী আমীরের সাথে শান্তি স্থাপন করেন এবং ভারতবর্ষের দিকে ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে তাঁর সর্বশক্তি নিযুক্ত হয় ।

তুঘরিল বেগ

যে দলনেতার নামে সেলজুকদের নাম হয়েছিল তাঁর পুত্র তুঘরিল বেগকে তারা সুলতান মাসুদের পরাজয়ের পর গোষ্ঠীর নেতা নির্বাচন করেন। ইবনুল আসির তুঘরিল বেগকে জ্ঞানী, ধৈর্যশীল, উদার, ধার্মিক, জীবনযাত্রায় অনাড়ম্বর এবং বিদ্যোৎসাহী সম্রাট বলে বর্ণনা করেছেন। তুঘরিল বেগ দ্রুত জুরজান, পারস্য, ইরাক, খাওয়ারিজম এবং পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ তাঁর দখলে নিয়ে আসেন। শীঘ্রই তিনি উপনীত হন উত্তর পারস্যে বুওয়াইহী আমীরদের সন্নিধানে, যাঁরা নিজেদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন কিংবা বাধ্য হন সেলজুক দলপতির বশ্যতা স্বীকার করতে। তুঘরিল কোন নগর অধিকার করলে তাঁর বিজয়ের স্মৃতিতে সেখানে একটি মসজিদ ও শিক্ষায়তন স্থাপন করতেন এবং তাঁর ধর্মপরায়ণতার খ্যাতি প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্যকে করে তোলে দ্রুত ও প্রবলতর।

১১ জুলহজ্জ, ৪২২ হি., ২৯ নভেম্বর, ১০৩১ খ্রি.

তুঘরিলের ক্ষমতা যখন পারস্যে বুওয়াইহীদের আচ্ছন্ন করে ফেলছিল, তখন বৃদ্ধ ধর্মপরায়ণ খলিফা কাদির বিল্লাহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেছিলেন। তিনি একচল্লিশ

---

[১] যাঁর নামানুসারে গোষ্ঠীর নামকরণ হয়েছে।

[২] 'আতেশ কা'দাহ' দ্রষ্টব্য।

বছরেরও বেশি সময় খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে ৪২২ হিজরিতে ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। যেসব প্রখ্যাত মনীষী ইসলামের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন তাঁদের অনেকেরই উন্মেষ ঘটে তাঁর আমলে; যেমন মুতাজিলী পণ্ডিত কাজী আবদুল জব্বার ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আশআরী মতাবলম্বী আবু ইসহাক, শিয়া আইনজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরষ আল্লামা শায়খ মুফিদ, কবি আবু উমর বিন দররাজ, আইনজ্ঞ দার কুতনী ও ইবন শাহীন এবং অনেকে।

আবু জাফর আবদুল্লাহ, আল কায়িম বি-আমরিল্লাহ

কাদির বিল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবু জাফর আবদুল্লাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন আল কায়িম বি-আমরিল্লা[১] উপাধি ধারণ করে। গুণবান, সৎ, ধর্মপ্রাণ, বিদ্বান, আল্লাহতে বিশ্বাসী, দানশীল ও ধৈর্যশীল বলে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ষপঞ্জীর লেখক বলেন, তিনি ছিলেন জ্ঞান-চর্চায় অধ্যবসায়ী, লেখায় সিদ্ধহস্ত এবং বিচার ও বদান্যতায় তৎপর। বুওয়াইহী আমীরদের হেফাজতে তিনি প্রায় চব্বিশ বছর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতাহীন খলিফার ভূমিকা পালন করেছেন বলে মনে হয়। ৪৬৬ হিজরিতে তুর্কী সেনাপতি আর্সলান আল-বাসাসিরী যাবতীয় ক্ষমতা দখল করে প্রকৃতপ্রস্তাবে বুওয়াইহী বংশের মালিক রহিমকে আমীর উল উমরা বা প্রাসাদাধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারিত করেন। এই সংকটকালে কায়িম সেলজুক রাষ্ট্রনায়কের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তুঘরিল দ্রুত বাগদাদে চলে আসেন এবং তাঁর আগমনে বাসাসিরী মসুলে চলে যান। কিন্তু যে মুহূর্তে তুঘরিল পারস্যে এক বিদ্রোহ দমন করতে বাগদাদ ত্যাগ করেন তখনই বাসাসিরী রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে আব্বাসী খলিফাকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর স্থানে ফাতিমী খলিফা আল মুসতানসির বিল্লাহকে ঘোষণা করেন ইসলামের ধর্মনেতা বলে। খলিফার জামা, রাজদণ্ড ও ধর্মীয় মঞ্চ মিশরে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং ইরাকের প্রতিটি মসজিদে মুসতানসিরের নামে খুতবা পঠিত হয় । তুঘরিল দ্রুত বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করেন। বাসাসিরী পরাজিত ও নিহত হন এবং কায়িম পূর্বপুরুষদের সিংহাসনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হন ।

তুঘরিল বেগ সুলতান

কৃতজ্ঞ খলিফা এই সাম্রাজ্যের যাবতীয় জাগতিক ক্ষমতা তুর্কী রাষ্ট্রনায়কের হাতে সমর্পণ করেন; এতদিন পর্যন্ত যা আব্বাসীদের ধর্মীয় কর্তৃত্ব স্বীকার করত। বাগদাদে অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। খলিফা স্বয়ং আরব ও পারসিদের কর্তৃত্বের প্রতীকস্বরূপ তুঘরিলের মাথায় দু'টি মুকুট পরিয়ে দেন এবং ইসলামের সাতটি দেশের নিদর্শনস্বরূপ সাতটি পোশাকে বিভূষিত করেন । অতঃপর ঘোষকগণ তুঘরিলকে প্রাচ্য ও পাশ্চাতের সুলতান বলে ঘোষণা করে।

---

[১] যিনি আল্লাহর আদেশে দণ্ডায়মান।

অধ্যায়-২০
আব্বাসী বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]
কায়িম থেকে মুসতাজহির
[৪৫৫-৫০৩ হিজরি; ১০৬৩-১১১০ খ্রিস্টাব্দ]
ক্রুসেডের সূত্রপাত

খলিফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ : তুঘরিল বেগ: বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধ : তুঘরিলের মৃত্যু : আলপ আর্সলানের সিংহাসনারোহণ : রোমান আক্রমণ : শান্তি চুক্তি : ডায়োজিনস রোমানাস তাঁর প্রজাগণ কর্তৃক অন্ধ ও নিহত : আলপ আর্সলানের মৃত্যু : মালিক শাহর সিংহাসনারোহণ : কায়িমের মৃত্যু : মুকতাদি বি-আমরিল্লাহ খলিফা পদে অধিষ্ঠিত : মালিক শাহর গৌরবময় রাজত্বকাল : অ্যাসাসিনদের অভ্যুত্থান : হাসান সাবাহ : নিজামুল মুলকের হত্যা : মালিক শাহর মৃত্যু : তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিবাদ : খলিফা মুকতাদির মৃত্যু : মুসতাজহির বিল্লাহর সিংহাসনারোহণ : ক্রুসেডের সূত্রপাত : এন্টিয়ক অবরোধ : এটির দখল : ব্যাপক মুসলিম নিধন : মা'আররাতুন নুমানের ধ্বংস সাধন : জেরুজালেমে হত্যাকাণ্ড : ত্রিপলি লুণ্ঠন।

সেলজুক বংশ [৪৫৫-৫০৩ হি; ১০৬৩-১১১০ খ্রি.]

তুঘরিলের অধীনে সেলজুকগণ এশিয়ার সর্বপেক্ষা পরাক্রমশালী জাতিতে পরিণত হয়। এই গোষ্ঠী বিখ্যাত তুর্কী কিংবা শক জাতির একটি শাখা এবং যে যে গোত্রপতির অধীনে তারা ট্রানসক্সিয়ানা ও পরে খুরসানে প্রবেশ করেছিল তাঁর নামেই তারা আখ্যায়িত হয়। তুর্কী ও মোঙ্গলীয়রা একই জাতির লোক হলেও তাদের মধ্যে প্রধান প্রার্থক্য ছিল এই যে, শেষোক্তরা তখনো এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে অর্ধ বর্বর ও প্রায় অসভ্য অবস্থায় বাস করছিল। অপরপক্ষে পশ্চিমাঞ্চলের তুর্কি গোষ্ঠীগুলো আরব সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত সেলজুকরা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ইসলাম গ্রহণ করে এবং এর গোঁড়া সমর্থকে পরিণত হয়। আরবরা যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় ব্যাপৃত ছিল তখন তারা ইসলামের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ তাদেরই ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। এ সময় তারা একজন সর্বময় কর্তার আধিপত্য স্বীকার করেছিল; অধীনস্থ শাসকবর্গ নিজেদের মধ্যে ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং তারা দলপতির আনুগত্য মেনে চলত।

গ্রিকগণ খিলাফতের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এশিয়ায় তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছিল; পূর্ববর্তী সময়ে শক্তিশালী রাজাদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণসমূহ রাজ্যজয়ের প্রয়াসে পরিণত হয় এবং খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর শেষদিকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় দক্ষিণে সুদূর এন্টিয়ক এবং পূর্বে খাস আর্মেনিয়ার প্রান্তভূমি পর্যন্ত।

তুঘরিল বেগের মৃত্যু : আল্‌প আর্সলানের সিংহাসনারোহণ [৪৫৫ হি; ১০৬৩ খ্রি.]

১০৬০ খ্রিস্টাব্দে তুঘরিল বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাদের বিতাড়িত করেন কপাডোসিয়া ও ফ্রিজিয়া থেকে; কিন্তু ওই অঞ্চলগুলোতে স্থায়ী বিজয়লাভ সংরক্ষিত থেকে যায় তাঁর প্রতিভাশালী ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল্‌প আর্সলানের[১] (অমিতবিক্রম সিংহের) রাজত্বকালের জন্য; যিনি তাঁর অপুত্রক পিতৃব্যের মৃত্যুর পর সেলজুকদের সর্বাধিনায়কত্ব লাভ করেন এবং খলিফা কর্তৃক সুলতান উপাধি ও সুলতানের বিশেষ অধিকার[২] লাভ করেন। ইবনুল আসির আল্‌প আর্সলানকে উদার, মহানুভব, ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ শাসক; জীবনযাপনে পবিত্র, ধার্মিক ও খোদাভক্ত; দয়ালু, দানশীল ও দরিদ্র্যের বন্ধু; যে কোন নিন্দনীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত এবং সর্বোপরি সাহসী ও শৌর্যশালী হিসেবে বর্ণনা করেন। জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া চূড়ান্ত জয়লাভের পর তিনি আজারবাইজানের খোই নামক স্থানে অবস্থানকালে এই সংবাদ পান যে, ডায়োজিনিস রোমানস (আরবগণ কর্তৃক আর্মানুস নামে অভিহিত) সম্রাজ্ঞী ইউডোসিয়ার সাহায্যে বধ্যভূমি থেকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বাগদাদ ধ্বংস এবং সমগ্র পশ্চিম এশিয়া রোমকদের নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্দেশে দুই লক্ষেরও বেশি সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এশিয়া মাইনর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে বিজয় অথবা লুণ্ঠনের জন্য এর চেয়ে সুসজ্জিত ও অধিক সংখ্যক সৈন্য ইতিপূর্বে আর বের হয়নি।

মালাজ কার্দের যুদ্ধ

রোমকদের অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা তখন পশ্চাদপসরণ করে অবশেষে উপনীত হয় আধুনিক আরজেরুম ও ভ্যান নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত মালাজ কার্দ[৩] নামে এক বিখ্যাত দুর্গে। এখানে আরবরা সুলতানের সাথে যোগ দেয় এবং এখানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে প্রকৃতপক্ষে এশিয়ায় বাইজান্টাইন শক্তির বিনাশ ঘটে। সংখ্যাধিক্যে মুসলমানরা অভিভূত হয়ে পড়লেও এক বেপরোয়া ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে তারা রোমক বাহিনীকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করতে সমর্থ হয়। সম্রাট তাঁর সভাসদগণসহ বন্দি হন এবং তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সুলতানের শিবিরে, যেখানে তিনি তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী সদয় ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার প্রাপ্ত হন।

দীর্ঘসময়ব্যাপী আলোচনার পর সুলতান ও রোমানাসের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির শর্তানুসারে রোমানাস তাঁর কন্যাদের আল্‌প আর্সলানে পুত্রদের সাথে বিয়ে দিতে, বন্দিত্বমোচনের জন্য দশ লক্ষ ও বাৎসরিক রাজত্ব হিসেবে তিন লক্ষ ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে এবং সকল যুদ্ধবন্দি প্রত্যর্পণ করতে রাজি হন। অতঃপর সম্রাট ও তাঁর সভাসদগণ তাঁদের বন্দিকর্তার নিকট হতে বিদায় নেন এবং সুলতানের সুসজ্জিত প্রহরী বেষ্টিত হয়ে যাত্রা করেন কনস্ট্যান্টিনোপলের দিকে; কিন্তু পথিমধ্যে সম্রাট জানতে পারেন যে, অকৃতজ্ঞ প্রজাগণ কর্তৃক তিনি পদচ্যুত হয়েছেন। সুলতান তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু তিনি সাহায্যার্থে আসার আগেই গ্রিকগণ রোমানসকে বন্দি ও অন্ধ করে দেয় এবং পরে তাঁকে হত্যা করে।

---

[১] তাঁর পিতার নাম ছিল জিগরী বেগ দাউদ।

[২] তিনি আজাদুদ্দৌলা উপাধি পান।

[৩] ইবনুল আসিরের মতে : মীরখোন্দ একে বলেন মালাজ জার্দ।

৪৬৫ হি; ১০৭২ খ্রি.

মালাজকার্দের যুদ্ধের পর এশিয়া মাইনর সুলতানের পিতৃব্যপুত্র কুতলুমিশের পুত্র সুলায়মনকে জায়গীর হিসেবে প্রদান করা হয়। তিনি সুলতানের জায়গীরদার হিসেবে এ রাজ্য শাসন করতেন। সুলায়মান বিচক্ষণ শাসক ও সাহসী যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেন। তিনি উত্তরে হেলেসপন্ট ও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তার করেন এবং বাইজান্টাইন শাসকদের নিকট থেকে কর আদায় করেন। তিনি বিথিনিয়ার নাইস নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন, যেখানে ক্রুসেডের সময় পর্যন্ত তা বিদ্যমান ছিল। ক্রুসেডারগণ ঐ স্থান দখল করায় রাজধানী আইকোনিয়ামে স্থানান্তরিত হয়। তাতারগণ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত এশিয়া মাইনর তাঁর বংশধরদের অধীনে থাকে। সাধারণভাবে তাঁরা রূমের[১] বাদশাহ বলেই পরিচিত এবং তাঁরা তাঁদের শাসনক্ষমতা ও সভ্যতার অনেক স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছেন।

আল্‌প আর্সলানের মৃত্যু : মালিক শাহর সিংহাসনারোহণ [৪৬৬ হি; ১০৭৩ খ্রি.]

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এক বিদ্রোহীর আঘাতে আহত হয়ে আল্‌প আর্সলানের মৃত্যু হয়। তাঁর শাসন জনকল্যাণকর, জ্ঞানগর্ভ ও ন্যায়পরায়ণ ছিল। তাঁর সমগ্র রাজত্বকালব্যাপী নিজামুল মুলক উপাধিধারী বিখ্যাত খাজা হাসান তাঁর উজির ছিলেন, যাঁর উপর তিনি ন্যস্ত করেছিলেন অসামরিক প্রশাসনের সমুদয় ক্ষমতা। আল্‌প আর্সলানের উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র মালিক শাহ, যিনি জালাল-উদ-দৌলা (সাম্রাজ্যের গৌরব) উপাধিতে ভূষিত হয়ে সুলতানের পদে অধিষ্ঠিত হন।

খলিফা কায়িমের মৃত্যু [১৩ শাবান, ৪৬৭ হি., ২ এপ্রিল ১০৭৫ খ্রি.] আবুল কাসিম আবদুল্লাহ আল মুকতাদি বি-আমরিল্লাহর সিংহাসনারোহন

এর তিন বছর পর খলিফা কায়িম মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পৌত্র আবুল কাসিম আবদুল্লাহ মুকতাদি বি-আমরিল্লাহ[২] উপাধি ধারণ করে খিলাফতের পদে তাঁর উত্তরাধিকারী হন। সিংহাসনে আরোহণের সময় মুকতাদির বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর, কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর চরিত্রবলের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। ধার্মিক, পুণ্যবান, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উদার এবং আব্বাসী বংশের সবচেয়ে মহান খলিফাদের অন্যতম বলে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর অধিকৃত রাজ্যগুলো যত্নের সাথে শাসন করেন; দুশ্চরিত্রদের তিনি রাজধানী থেকে বিতাড়িত করেন এবং জনসাধারণের শালীনতাবোধ বৃদ্ধি ও নৈতিক ভ্রষ্টতা দমন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু ধর্মান্ধ হাম্বলীগণ অবিরত গোলযোগের কারণ ছিল এবং তাদের ও আশ'আরীদের (হানাফী) মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে প্রায়ই উভয়পক্ষে প্রচুর প্রাণহানী ঘটত।

কিন্তু এই যুগে মুসলিম জগতের দৃষ্টি খলিফা বা তাঁর দরবারের দিকে কেন্দ্রীভূত না হয়ে তা হয়েছিল এশিয়র শাসক সুবিখ্যাত সুলতানের দিকে।

---

[১] এই বংশের সম্রাটদের নামের জন্য বংশ তালিকা দেখুন। চতুর্দশ সম্রাট আলাউদ্দিন ছিলেন সুবিখ্যাত মরমী কবি জালালউদ্দিন রুমীর (রূমের অধিবাসী) বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও শিষ্য।

[২] আল্লাহর আদেশের অনুগামী।

মালিক শাহর রাজত্বকাল

মালিক শাহর রাজত্বের প্রথম দিকে কয়েকটি বিদ্রোহের ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যেগুলোর একটিতে নেতৃত্বে দেন তাঁর নিজের ভ্রাতা। তুসে সংঘটিত একটি ঘটনায় সুলতানের চরিত্রের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। ইমাম আলী আর-রিজার সমাধিতে প্রার্থনা করার পর মালিক শাহ তাঁর উজিরকে জানান, তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, মুসলমানদের শাসন করার জন্য তাঁর ভাই তাঁর চেয়ে বেশি উপযুক্ত হলে তাঁরই যেন জয় হয়। অতি অল্প রাজা-বাদশাহই বিজ্ঞ, মহান ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে মালিক শাহর মত খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিলেন।

মালিক শাহর উজির পদে নিজামুল মুলক

তিনি খাজা হাসান ওরফে নিজামুল মুলককে উজির পদে বহাল রাখেন এবং আতাবেগ[১] (আমীর শাসনকর্তা) উপাধি দিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করেন। ইয়াহিয়া বারমিকীর পর এশিয়ায় যাঁরা উজির ও প্রশাসকরূপে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে নিজামুল মুলকই সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ। রাজ্যশাসনপ্রণালি সম্পর্কে রচিত তাঁর গ্রন্থ[২] তাঁর প্রতিভা ও যোগ্যতার স্থায়ী নিদর্শন স্থাপন করেছে। চীনের সীমান্ত থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং উত্তরে জর্জিয়া থেকে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত সুলতানের বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল। বারো বার তিনি তাঁর সুবিস্তৃত রাজ্য পরিভ্রমণ করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে যাচাই করেন প্রতিটি প্রদেশের অবস্থা ও দাবি দাওয়া। সওদাগর ও মুসাফিরদের নিরাপত্তার জন্য রশীদ ও মামুনের মত তিনি বাণিজ্য ও তীর্থযাত্রার পথসমূহে বিশ্রামাগার ও প্রহরা গৃহ নির্মাণ করেন। সুলতানের শিকারের প্রতি আসক্তি ছিল, কিন্তু প্রমোদ যাত্রার সময়েও তিনি দরিদ্র বা কৃষকদের কথা ভুলে যেতেন না এবং শিকারের পর ঐ স্থানের দুঃস্থ অধিবাসীদের মধ্যে তিনি প্রচুর অর্থ বিতরণ করতেন।

মালিক শাহর সদয় শাসন

আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য এবং জনসাধারণের সমৃদ্ধিতে মালিক শাহর রাজত্বকাল ছিল রোমান বা আরব শাসনের শ্রেষ্ঠ যুগের সমকক্ষ। বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি হয়েছিল; শিল্পকলা ও সাহিত্যকে উৎসাহিত করা হয়েছিল উদার পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে; অভূতপূর্ব প্রেরণা দেয়া হয়েছিল পারসি ভাষা-চর্চায়; উচ্চ বিদ্যালয়, হাসপাতাল, মসজিদ ও প্রাসাদ দিয়ে এশিয়ার নগরগুলোকে সুসজ্জিত করা হয়েছিল এবং যাতায়াতের সুবিধা ও ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য রাস্তাঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা সাম্রাজ্যকে করা হয়েছিল পরিপূর্ণ।

বর্ষপঞ্জি সংস্কার

সুলতান অথবা তাঁর বিখ্যাত উজিরের নির্দেশে বর্ষপঞ্জি সংস্কার বহির্বিশ্বের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। রাজজ্যোতির্বিদ সুবিখ্যাত কবি ওমর খৈয়ামের সভাপতিত্বে বিজ্ঞানীদের একটি কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। এই জ্যোতির্বিদমণ্ডলী কাল গণনা দ্বারা যাবতীয় ভুল সংশোধন করেন। গিবন বলেন এই গণনা নির্ভুলতায় জুলীয় গণনাকে অতিক্রম করে গ্রীগরীয় গণনার কাছাকাছি পৌঁছেছিল। মেষ রাশির প্রথম বিন্দুতে সূর্য প্রবেশ করার সময়কে নববর্ষের দিন বলে ধার্য করা হয়, ইতিপূর্বে যা ধরা

---

[১] তুর্কী আতাবেগকে আরবগণ আতাবেক বলে।

[২] পারসি ভাষায় লিখিত বিখ্যাত সিয়াসতনামা।

হত (সূর্য) মীন রাশির মধ্যস্থলে উপনীতে হলে। সংস্কৃত অব্দ সুলতানের নামানুসারে 'জালালী' অব্দ রূপে অভিহিত হয়।

রুমের সামন্তরাজ সুলায়মান কারিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত সেলজুক রাজ্য বিস্তৃত করেন এবং অনেকগুলো দ্বীপ দখল করে নেন। কনস্ট্যান্টাইন ডুকাসের পুত্রের সিংহাসন ত্যাগের পর নাইসফোরাস বোটানিয়েটস বাইজানটিয়ামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারী আলেকজিয়াস কমোনিনাস মালিক শাহকে তাঁদের ঊর্ধ্বতন প্রভু বলে স্বীকার করে নেন এবং তাঁকে করদান করেন।

এন্টিয়ক বিজয়, ৪৬৭ হিজরি, ১০৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দ

৪৬৭ হিজরিতে সুলায়মান গ্রিকদেরকে এন্টিয়ক থেকে বিতাড়িত করেন এবং সুলতানের নামে নগরীটি পুনরায় জয় করে নেন। কিন্তু সাত বছর পর সিসিলি হাতছাড়া হওয়ায় বিপরীত দিক দিয়ে এই বিজয়ে সমতা ফিরে আসে। ১০৬১ খ্রিস্টাব্দে দ্বীপটি নর্মানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আরবদের মধ্যে গৃহবন্দি তাদের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়। তথাপি সংঘর্ষ দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী হয়েছিল। দীর্ঘ তিরিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের পর নর্মান কাউন্ট রোজার দ্বীপটিকে স্বীয় ক্ষমতাধীনে নিয়ে আসেন।

অ্যাসাসিনদের অভ্যুত্থান

মালিক শাহর রাজত্বের শেষদিকে মাজেন্দ্রানের দুর্গম গিরি সংকটে ইসলামের নাস্তিক্যবাদী অ্যাসাসিনদের[১] আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই মাজেন্দ্রান এক সময় বাবেক ও তাঁর সহযোগীদের আশ্রয়স্থল ছিল।

হাসান সাবাহ

পরবর্তীকালে ইউরোপ ও এশিয়া উভয় মহাদেশেই অভূতপূর্ব সাফল্য সহকারে অনুসৃত এই রক্তলোলুপ ভ্রাতৃসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজামুল মুলকের সতীর্থ হাসান সাবাহ, যিনি সেলজুক সাম্রাজ্যে বিশেষ স্থান অধিকারের উচ্চাভিলাষে ব্যর্থ হয়ে বিষ ও ছোরার সাহায্যে আইনসম্মত কর্তৃপক্ষের ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হন।

ইসমাঈলী সম্প্রদায়

মিশরের ফাতিমী খলিফাগণের সমর্থক হয়ে তিনি তাঁদের দ্বারা পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন এবং ইসমাঈলী মতবাদ প্রচার করার ক্ষমতা পান। এতকাল পর্যন্ত ইসমাঈলীদের মধ্যে কেবল গুরু ও শিষ্য– এই দুই প্রকারের লোক ছিল। যেমন, দায়ী বা প্রচারক, যাঁরা গুপ্ত মতবাদের সকল স্তর সম্পর্কে অবহিত হয়ে দীক্ষা দান করতেন এবং রফিক অর্থাৎ যাঁরা ক্রমান্বয়ে ধর্মনীতিতে আস্থাভাজন হয়ে গুপ্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত হতেন। হাসান অনতিবিলম্বে উপলব্ধি করেন যে, সতর্কতা ও উদ্দীপনা সহকারে তাঁর উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য কার্যনির্বাহক তৃতীয় শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন, যারা

---

[১] 'অ্যাসাসিন' শব্দটি হয় 'হাসানী' (হাসানের শিষ্য) শব্দের অপভ্রংশ কিংবা হাশিশীন বা হাশিম সেবনকারী।

উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের হাতে কেবল অন্ধ ও ধর্মোন্মত্ত যন্ত্রের মত কাজ করবে; ফলাফল বিবেচনা না করেই নির্বিবাদে মেনে চলবে প্রভুর আদেশ । এই কার্যনির্বাহী শ্রেণীর নাম হলো 'ফিদায়ী' (উৎসর্গীকৃত)।

গিরিবাস ধর্মগুরু

এই গুপ্তঘাতক দলের সর্বোচ্চ নেতাকে বলা হত সায়্যিদিনা অর্থাৎ আমাদের প্রভু কিংবা সিদনা (ক্রুসেডারদের সিডনী) এবং সচরাচর তাঁকে শায়খুল-জাবাল অর্থাৎ গিরিবাসী ধর্মগুরু বলা হত। ফিদায়ীরা ছিল তাঁর দেহরক্ষী ও তাঁর মারাত্মক হুকুমসমূহ তামিল করত[১]।

দলের বিভিন্ন স্তর

সর্বোচ্চ নেতার অব্যবহিত পরই ছিলেন দায়ীউল কবীর বা প্রধান মঠাধ্যক্ষ এবং জাবাল, কুহিস্তান ও সিরিয়া নামক যে তিনটি প্রদেশে দলের ক্ষমতা বিস্তার লাভ করেছিল সেগুলোর প্রত্যেকটি একজন দায়ীউল কবীর দ্বারা শাসিত হত। তাঁদের নিচে ছিলেন প্রারম্ভিক অধিকর্তা দায়ীগণ, যারা বার্তাবাহকের কাজ করতেন এবং দীক্ষা দিতেন ধর্মান্তরিতদের। শিষ্য ও সহচররা (রফিক) গুপ্ত মতবাদের বিভিন্ন স্তরে দীক্ষিত হয়ে নেতৃত্বের যোগ্য হতেন। ভক্ত ঘাতকরা (ফিদায়ী) ছিল সর্বনিম্নে, আর লসিকগণ (আকাঙ্ক্ষীরা) নব দীক্ষিত বা সাধারণ সহযোগী ছিল বলে মনে হয়। দলের অদীক্ষিত সদস্যরা ইসলামের ধর্মীয় কর্তব্য কাঠোরভাবে পালন করবে বলে আশা করা হত; ভক্ত অনুচরবর্গের কাছে কেবল অন্ধ আনুগত্যই দাবি করা হত। দীক্ষিতরা তাদের মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত হত এবং ফিদায়ীদের অস্ত্র চালনার নির্দেশ দিত শায়খের আদেশানুসারে, যিনি কলম দ্বারা ছুরিকা চালনা করতেন। এসব নাস্তিকরা মূলাহিদা বা অধার্মিক নামে পরিচিত ছিল। ৪৮৩ হিজরিতে হাসান সাবাহ কিছুটা বলপ্রয়োগে এবং কতকটা বিশ্বাসঘাতকতা করে মাজান্দারানের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত দুর্ভেদ্য আলামুত (ঈগলের বাসা) দুর্গ অধিকার করেন এবং সেখান থেকে প্রতিষ্ঠিত সমাজের উপর আক্রমণ শুরু করেন। মালিক শাহ অ্যাসাসিনদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান, কিন্তু এই ঘৃণ্য ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়ের মূলোৎপাটন করার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

নিজামুল মুলকের জীবননাশ

১০৯১ খ্রিস্টাব্দে হাসান সাবাহর এক গুপ্তচর কর্তৃক নিজামুল মুলক নিহত হন। ইবনুল আসির[২] বলেন, সদগুণাবলী ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য তিনি উঁচু-নিচু নির্বিশেষে সবার কাছে সমাদৃত ছিলেন। তিনি মুয়্যাইইদুল মুলক, ফখরুল মুলক ও ইজ্জুল মুলক নামে তিন পুত্র রেখে যান, যাঁরা পরে মালিক শাহর উত্তরাধিকারীদের উজির হন।

মালিক শাহর মৃত্যু [১৫ শাওয়াল, ৪৮৫ হি; ১৮ নভেম্বর, ১০৯২ খ্রি.]

সুলতানের মহান উজিরের মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদে আগমন করেন। মালিক শাহর সাথে আলেক্সিয়াস কমনিনাসের কন্যার[৩] বিবাহ স্থিরীকৃত হয়েছিল, কিন্তু মালিক শাহর

---

[১] ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই রক্তপিপাসু ঘাতক দলের সাথে পরবর্তীকাল ইউরোপে উদ্ভূত বিভিন্ন দলের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখতে পাবেন।

[২] তাঁর লেখা 'মসুলের আতাবেকগণের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে।

[৩] গিবন মনে করেন এই মহিলা ছিলেন আনা কমনিনা।

মৃত্যুতে এই পরিণয়কার্য সম্পন্ন হতে পারেনি। এই বিবাহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় অঞ্চলের জন্য বিশেষ ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা হয়েছিল। একুশ বছর রাজত্বের পর মালিক শাহ উনচল্লিশ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

বরকিয়ারুকের সিংহাসনারোহণ

মালিক শাহর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেলজুক সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও ঐক্য বিলুপ্ত হয়। তাঁর মহিষী তুরখান ওরফে খাতুন-উল-জালালিয়ার (মহিয়সী মহিলা) অনুরোধে খলিফা তাঁর শিশুপুত্র মাহমুদকে আড়ম্বরপূর্ণ নাসিরুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন[১] উপাধি দিয়ে সুলতানের পদমর্যাদা দান করেন। কিন্তু অল্পবয়স্ক বালকটিকে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বরকিয়ারুকের[২] জন্য পথ ছেড়ে দিতে হয়, যিনি সমস্ত ক্ষমতা দখল করেন এবং গ্রহণ করেন রুকুনুদ্দিন[৩] উপাধি। অল্পকাল পরে মালিক শাহর দ্বিতীয় পুত্র মুহম্মদ স্বয়ং আরেকজন প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়। বরকিয়ারুক ও মুহম্মদের মধ্যে ইরাক ও খুরাসান নিয়ে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তা হাসান সাবাহার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে সাহায্য করে। অন্তর্বিরোধের রক্তাক্ত ভূমিতে হত্যা ও বিদ্রোহের বিষবৃক্ষ পুষ্টিলাভ করে ।

অ্যাসাসিনগণ ক্রমান্বয়ে উত্তর পারস্য, ইরাক ও সিরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকটি সুদৃঢ় দুর্গে তাদের প্রভুত্ব কায়েম করে এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠ লোকদেরকে খুঁজে বেড়ায় তাদের ছুরিকা উঁচিয়ে।

আবুল আব্বাস আহমদ, আল মুসতাজহির বিল্লাহ [১৫ মহরম, ৪৮৭ হি; ফেব্রুয়ারি, ১০৯৪ খ্রি.]

খলিফা মুকতাদি ৪৮৭ হিজরিতে পরলোকগমন করেন এবং আল মুসতাজহির বিল্লাহ[৪] উপাধি ধারণ করে তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস আহমদ তাঁর উত্তরাধিকারী হন। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর। ইবনুল আসির তাঁকে বর্ণনা করেছেন দয়ালু, পুণ্যবান, উদার, মহানুভব, নম্র স্বভাব, সৎকর্মে উৎসাহদাতা এবং বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষক বলে। যদি তিনি অপেক্ষাকৃত অনুকূল সময়ে জীবিত থাকতেন তাহলে সম্ভবত ইতিহাসে কিছু নিদর্শন রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর আয়ত্তাধীন ক্ষমতা এতই অকিঞ্চিতকর ছিল যার ফলে তিনি কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে সমর্থ হননি।

ক্রুসেড যুদ্ধ [৪৯১ হি.; ১০৯৭-৯৮ খ্রি.]

এই সময় খ্রিস্টীয় ইতিহাসে ধর্ম যুদ্ধ বলে অভিহিত ধর্মোন্মত্ততার হিংস্র ঝটিকা প্রচণ্ডবেগে পশ্চিম এশিয়ার উপর আপতিত হয়। ইউরোপীয় ইতিহাসগুলোতে ক্রুসেড রোমানসের অলৌকিক মহিমায় পরিমণ্ডিত এবং এতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক নাইট বা যোদ্ধা বীরত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে সম্মানিত হন। সত্যের খাতিরে এই ছবির উপর থেকে পর্দা উন্মোচন করা এবং আমার আয়ত্তের স্বল্পপরিসরে এই যুদ্ধসমূহের নির্মম হিংস্রতা এবং সেগুলোতে অংশগ্রহণকারী লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও পশ্চিম এশিয়ায় তারা যে চরম দুর্দশা সৃষ্টি করেছিল তা উদ্ঘাটন করা আমার দায়িত্ব। একজন চতুর লেখক বলেন, ক্রুসেডগুলো ইতিহাসের এক চরম ক্ষিপ্রতাপূর্ণ অধ্যায়। ব্যর্থতার ফলে অবসাদ

---

[১] দীন ও দুনিয়ার সহায়ক।

[২] বেক ইয়ারুক প্রতিভাবান নেতা।

[৩] ধর্মের স্তম্ভ।

[৪] আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনাকারী।

না আসা পর্যন্ত খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীগণ প্রায় তিন শতাব্দী ধরে মুসলমানদের ধর্মের বিরুদ্ধে ঝড়ের বেগে অভিযানের পর অভিযান চালিয়ে ছিল এবং নিজের কৃতকর্মের দ্বারা কুসংস্কার নিজেই রচনা করেছিল তার কবর। ইউরোপ ধন ও জনশূন্য হয়ে পড়েছিল এবং সামাজিক ধ্বংস না হলেও ঘনিয়ে এসেছিল সামাজিক দেউলিয়াপনা। লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধে, অনাহারে বা রোগে প্রাণ হারিয়েছিল এবং কল্পনাতীত এইরূপ নৃশংসতা ক্রুশের যোদ্ধাগণকে কলঙ্কিত করেছিল ।

মুসলিম শাসনে খ্রিস্টানদের অবস্থা

মুসলিম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খ্রিস্টানরা পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করেছিল, তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধা উপভোগের অধিকার সংরক্ষিত হয়েছিল। তাদেরকে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধে চলাফেরা করতে, স্বধর্মাবলম্বী বিদেশী রাজাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে দেয়া হত এবং মুলমানদের মত একই শর্তানুযায়ী দেয়া হত জমি ও সম্পত্তির মালিক হতে। মুসলমানদের সাথে সমানভাবে তাদের জন্য সরকারি চাকরির (কয়েকজন স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তার সময় ব্যতীত) পথ উন্মুক্ত ছিল। সর্বত্র বিদ্যমান ছিল খ্রিস্টান মঠ ও গির্জা এবং বহু দূরবর্তী স্থান থেকে খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা বিনা বাধায় প্যালেস্টাইনে প্রবেশের অনুমতি পেত। বস্তুত আরব বিজয়ের দ্বারা পবিত্র ভূমিতে তীর্থযাত্রা বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে বরং উৎসাহিত হয়েছিল এবং আরবরা খ্রিস্টানদের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রেখেই সন্তুষ্ট থাকত, অন্যথায় তারা যে সমাধিমন্দিরে উপাসনা করার দাবি জানাত সেখানে তারা পরস্পরকে মারপিট করে হত্যা করত। উভয় সম্প্রদায়ের (মুসলিম ও খ্রিস্টান) ভক্তদের কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত জেরুজালেমে খ্রিস্টান ধর্মাচার্য ও তাঁর পুরোহিতদের জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, যেখানে মুসলমানদের হস্তক্ষেপ ছিল নিষিদ্ধ। ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া ফাতিমীদের হাত থেকে চলে গেলে ক্ষমতার পটপরিবর্তনে খ্রিস্টানদের সুবিধাই হয়, কারণ মিশরের রাষ্ট্রপ্রধানরা খ্রিস্টীয় বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতেন খ্রিস্টানদের। কিন্তু কোনো সহনশীলতাই ধর্মান্ধদের মনোরঞ্জন করতে পারেনি, যারা জেরুজালেমে মুসলমানদের উপস্থিতিকে ঘৃণার্হ বলে মনে করত। তীর্থযাত্রীরা আরবদের তত্ত্বাবধানে তাদের আতিথেয়তা উপভোগ করত এবং অন্তরে ঘোর বিদ্বেষ নিয়ে ফিরে যেত। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর শেষদিকে পৃথিবীতে স্বয়ং খ্রিস্টের সহস্রবর্ষ ব্যাপী রাজত্বকাল আসন্ন বলে বিশ্বাস করা হয়। ইউরোপ থেকে অগণিত জনতার ঢেউ পবিত্র ভূমিতে ধেয়ে আসতে শুরু করে এবং একাদশ শতাব্দীতে তাদের সংখ্যা ভয়াবহভাবে বেড়ে যায়। এই সময় প্যালেস্টাইন চলে আসে অর্তোক বংশীয় তুর্কোমানদের অধীনে। এঁরা সেলজুক সুলতান কিংবা সিরীয় সামন্ত প্রতিনিধির নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করতেন। অপরিচিতি লোকের বিপুল আগমন ও তাদের ধর্মোন্মাদনা রূঢ় তুর্কোমানদের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হত। তীর্থযাত্রীরা মাঝে মাঝে দুব্যবহার ও দস্যুবৃত্তির কবলে পড়ত, ঠিক আজকাল যেভাবে মুসলিম তীর্থযাত্রীরা তাদের মরুবাসী মুসলিম ভাইদের দ্বারা প্রায়ই লুণ্ঠিত ও অপদস্ত হয়। এরূপ দুর্ব্যবহারের কাহিনী সাধারণভাবে বহুমাত্রায় অতিরঞ্জিত হয়ে ফ্রাঙ্কদের দীর্ঘকালব্যাপী প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত করেছিল।

প্লাসেনটিয়া ও ক্লেরমন্টের সভা [মার্চ ও নভেম্বর, ১০৯৫ খ্রি.]

পোপ দ্বিতীয় আরব্যান প্লাসেনটিয়া নামক স্থানে ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে একটি সভা আহ্বান করেন; একই বছরের নভেম্বর মাসে ক্লেরমন্টে আরেকটি সভা ডাকেন। এখানে পোপ যীশুখ্রিস্টের সমাধিভূমিতে দখলদার অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের

হুকুম জারি করেন এবং এতে যোগদানকারীদের পাপমোচন ও যুদ্ধে নিহতদের স্বর্গ লাভের প্রতিশ্রুতি দেন। ধর্মীয় উন্মাদনাই ছিল এই ক্রুসেডের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু এর সাথে নতুন রাজ্য জয় বা ধন-সম্পদ অর্জনের স্পৃহা প্রভৃতি উদ্দেশ্যও নিহিত ছিল এবং প্রাচ্যদেশীয় মদিরার কাল্পনিক স্বাদ ও গ্রিক রমণীদের ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্য দ্বারা ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রলুব্ধ হয়েছিল। ধর্মবিশ্বাসের সাথে এভাবে লালসা, উচ্চাভিলাষ ও কামাসক্তি মিশে গিয়ে ধর্মীয় বিস্ফোরণকে উদ্দীপিত করেছিল।

হ্যালাম বলেন, সংক্রামক উন্মাদনা উদ্দীপিত করতে সবরকম পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছিল। ধর্মযোদ্ধা যে সময় ক্রুশ ধারণ করতেন সে সময় তিনি ঋণদায়জনিত মামলা ও করদান থেকে মুক্ত হতেন এবং তিনি নিজে থাকতেন গির্জার রক্ষণাধীনে। এসব বস্তুগত সুবিধার সাথে যুক্ত হয়েছিল প্রায়শ্চিত্ত বিলোপ, সকল পাপের ক্ষমা এবং অনন্ত সুখের অঙ্গীকার। এ বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না যে যুদ্ধে জীবনহানী ঘটলে অব্যর্থভাবে শাহাদাতের পুরস্কার পাওয়া যাবে।

কপর্দকহীন ওয়ালটারের (গথিয়ার) নেতৃত্বাধীন প্রথম দলটি বুলগেরীয় খ্রিস্টানদের দ্বারা নির্বিচারে নিহত হয়। সন্ন্যাসী পিটার সকল জাতি ও ভাষার চল্লিশ হাজার পুরুষ, নারী ও বালক-বালিকাদের নিয়ে গঠিত দ্বিতীয় আর একটি দল পরিচালনা করেন। তারা মেলভিলে উপনীত হয়ে শহর আক্রমণের দ্বারা সাত হাজার অধিবাসীকে হত্যা করে এবং নিজেদেরকে সর্বপ্রকার নীচতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় নিমজ্জিত করে তাদের পূর্ববর্তীদের হত্যার বদলা নেয়। পিটারের দলের সম্মুখে হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া মরুভূমিতে পরিণত হয়। আলেকসিয়াস তাদেরকে নগরে প্রবেশ করতে না দিয়ে বসফোরাস প্রণালীর মধ্য দিয়ে সমুদ্র পাঠিয়ে দেন। এশিয়ায় তারা পুনরায় অমিতাচার শুরু করে। মিখদ বলেন, তাদের দুস্কর্মে প্রকৃতিও কেঁপে উঠেছিল। তারা মাতৃক্রোড়ে শিশুদের হত্যা করে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শূন্যে ছড়িয়ে দেয় এবং নাইস শহরের দেয়াল পর্যন্ত লুণ্ঠনকর্ম চালিয়ে যায়। কিন্তু পনের হাজার সৈন্য নিয়ে সুলতান তাদের আক্রমণ করেন। তাদের নেতা রেজিনাল্ড কয়েকজন সঙ্গীসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট সকলে নিহত হয়।

তৃতীয় জনস্রোত 'মনুষ্য সমাজের অতীব মুর্খ ও বর্বর আবর্জনা'[১] দ্বারা গঠিত এবং গডশেল নামক একজন জার্মান সন্ন্যাসী কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল। তাদের ধর্মভক্তির সাথে অবাধ পৈশাচিক লুণ্ঠন, ব্যভিচার ও মদোন্মত্ততা মিশ্রিত হয়েছিল। মিখদের মতে, তারা অমিতাচারে গা ঢেলে দিয়েছিল; লাম্পট্যের বিশৃঙ্খল দৃশ্যে মগ্ন হয়ে তারা কনস্ট্যান্টিনোপল ও জেরুজালেমের পার্থক্য বিস্মৃত হয়েছিল এবং তাদের যাত্রাপথের সর্বত্র লুণ্ঠন, অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ছিল। হাঙ্গেরীবাসীরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, ক্রুসেডারদের অস্থিতে বেলগ্রেডের সমতল ভূমি আচ্ছাদিত হয় এবং গডশেলের উচ্ছৃঙ্খল বাহিনীর কয়েকজন লোক তাদের কাহিনী বর্ণনা করার জন্য পালিয়ে যায়। চতুর্থ জনস্রোতটি আসে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ফ্লান্ডার্স ও লরেইন থেকে। মিলস তাদেরকে আরেক দল বর্বর ও বেপরোয়া অসভ্য বলে অভিহিত করেন। তুর্কীদেরকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে তারা ইহুদীদেরকে হত্যা করতে শুরু করে। হাজার হাজার ইহুদীকে হত্যা করা হয়, লুঠতরাজ চালান হয় কলোন, রাইন ও মোজেল নদীর তীরবর্তী অন্যান্য শহরগুলোতে। কেবল ম্যায়েন্স (Mayence) শহরে সাতশত ইহুদী নিহত হয়।

এই নরপিশাচদল তাদের প্রকৃতিগত হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়ে দ্রুতবেগে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়;[২] কিন্তু একটি হাঙ্গেরীয় সৈন্যবাহিনীর দ্বারা মেমসবুর্গে তারা নিধন হয়।

---

[১] গিবিন।

[২] মিলস।

১০৯৭ খ্রি.

পরের বছর ইউরোপের সামন্তরাজদের দ্বারা অপেক্ষাকৃত সুসংবদ্ধ একটি আক্রমণ সংগঠিত হয়। প্রাচ্যদেশে তাদের গমনও ছিল অনুরূপ নৃশংসতাজনক। বুইলিনের গডফ্রের নেতৃত্বাধীনে ক্রুসেডাররা কন্ট্রান্টিনোপলে উপস্থিত হয়। যথাযোগ্য নৈপুণ্যে আলেকসিয়াস কনস্টান্টিনোপলের উপর তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন এবং অনাহুত আগন্তুকদের সমুদ্রে পাঠিয়ে দেন বসফোরাস প্রণালীর মধ্য দিয়ে। ১০৯৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ক্রুসেডাররা নাইসের প্রান্তরে সমবেত হয়। তারা সংখ্যায় সাত লক্ষ ছিল এবং সেলজুকগণ কর্তৃক আনীত যে কোন সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদে করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

এন্টিয়ক অবরোধ [অক্টোবর, ১০৯৭- জুন ১০৯৮ খ্রি.]

সুলতানের রাজধানী নাইস অবরুদ্ধ হয় এবং মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়। কিন্তু আলেকসিয়াস স্থানটি তাঁকে ছেড়ে দেয়ার জন্য সেলজুক সুলতানকে রাজি করান। দুর্গের উপর তাঁর উড্ডীয়মান পতাকার দৃশ্য দেখে ধর্মোন্মত্ত দল উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কিন্তু নগরটি রক্ষা পায়। নাইস থেকে ক্রুসেডাররা যাত্রা করে এন্টিয়কের দিকে। হত্যা, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের মাধ্যমে এশিয়ায় তাদের অগ্রগতি চিহ্নিত হয়ে থাকে। এন্টিয়কের অবরোধ নয় মাসকাল স্থায়ী হয়। খাদ্য সম্ভার ফুরিয়ে আসে এবং ক্রুশের সৈনিকরা প্রকৃতপক্ষে নরখাদকতার আশ্রয় গ্রহণ করে। মিসল বলেন, প্রকাশ্যে মৃতদেহ রন্ধন করা হত এবং নরমাংস ভক্ষণ করা হত গোপনে।[১]

তমশাচ্ছলে মৃতদেহের অঙ্গচ্ছেদ করা হত। এন্টিয়ক থেকে বহির্গমনকালে নিহত দুই সহস্র তুর্কীর মস্তক কেটে ফেলা হয়, সেগুলোর কয়েকটি প্রদর্শিত হয় জয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে, কয়েকটিকে শিবিরের চারদিকে বর্শাবিদ্ধ করে রাখা হয় এবং অন্যদের নিক্ষেপ করা হয় নগরের মধ্যে। একসময় তারা আরবদের শবদেহ কবর থেকে তুলে ফেলে এবং ক্রন্দনরত নগরবাসীর সামনে ১৫০০ মৃতদেহ প্রদর্শন করে। মিখদ বলেন, এন্টিয়কের সেলজুক সেনাপতির পুত্র ক্রুসেডারদের হাতে পতিত হয় এবং তার পরিবারকে প্ররোচিত করা হয় মুক্তিপণ হিসেবে নগরটি তাদের হাতে সমর্পণ করার জন্য। তাদের দাবি অগ্রাহ্য হলে অল্পবয়স্ক বন্দির প্রতি তারা চরম আচরণ করে। এক মাস ধরে প্রতিদিন তাকে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দেয়া হয়। অবশেষে তাকে দুর্গতোরণের পাদদেশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কতল করা হয় তার পিতামাতা ও নগরবাসীদের সম্মুখে[২]।

নৃশংসতা প্রায়শই বেপরোয়া পাপাসক্তির সাথে হাত মিলিয়ে চলছিল এবং আক্রমণকারীরা তাদের আদিম রিপুসমূহের লাগাম দিয়েছিল। জনৈক গ্রন্থকার মন্তব্য করেন যে, ধর্মবিগর্হিত যুদ্ধের ইতিহাসে এমন অমিতাচার ও ব্যভিচারের দৃশ্য কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয় এবং মিখদ বলেন, যদি সমসাময়িক বিবরণীগুলোতে আস্থা রাখা যায় তাহলে বলতে হয় যে, কুখ্যাত ব্যাবিলনের সকল পাপই জেরুজালেমের ত্রাণকর্তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

---

[১] ভন সিবেল, মিলস এবং আরও অনেক লেখকের মতে, ক্রুসেডারদের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রকাশ্যেই নরমাংসখাদকতা প্রচলিত ছিল, বিশেষ করে শিবির পরিচারকদের মধ্যে।

[২] প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৬২।

ক্রুসেডারগণ কর্তৃক এন্টিয়ক অধিকার [জুন, ১০৯৮ খ্রি.]

সেলজুক সেনাপতির (কারবোগা) অযোগ্যতা এবং তাঁর সাথে যোগদানকারী যুবরাজ ও আমীরদের প্রতি তাঁর দুর্ব্যবহারের জন্য সাহায্যদানের এক চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পতন হয় এন্টিয়কের। ফিরুজ বা আরবদের দ্বারা বেহরুজ নামে অভিহিত একজন আর্মেনীয় বিশ্বাসঘাতক রাতে রশি নামিয়ে দেয়, যার সাহায্যে ক্রুসেডাররা প্রাচীর অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। কয়েকটি বুরুজ আক্রান্ত হয় এবং প্রহরীরা নিহত হয়। অতঃপর একটি ফটক উন্মুক্ত হলে সমস্ত সৈন্যদল ঈশ্বর আমাদের সহায় রবে (আল্লাহ আমাদের সহায়) চিৎকার করতে করতে স্রোতের গতিতে নগরে প্রবেশ করে এবং শুরু করে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড। বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান, তারুণ্যের সহায়হীনতা এবং অবলা জাতির (নারী) সৌন্দর্য সবই লাতিন বর্বরদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছিল। বাড়িঘরের নিরাপত্তা ছিল না এবং মসজিদ চোখে পড়লেই তা নৃশংসতার নতুন ইন্ধন যোগাত[১]।

মর্মর প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদ থেকে দীনতম পর্ণ কুটির পর্যন্ত প্রতিটি আবাসস্থল কসাইখানায় পরিণত হয়; সরু গলি থেকে প্রশস্ত রাজপথ সবই সমানভাবে রক্তস্রোতে প্লাবিত হয়। নূন্যতমপক্ষে এন্টিয়কে দশ হাজার লোক নিহত হয় বলে অনুমান করা হয়।

মা'আরাতুন নোমানে হত্যাকাণ্ড

আরবদের হত্যার পর আক্রমণকারীরা নিকৃষ্টতম অমিতাচারে নিমগ্ন হয়। এন্টিয়ক থেকে তারা যাত্রা করে সিরিয়ার অন্যতম জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধশালী নগর মাররাতুন নোমানের দিকে, যেটি তারা দখল করে নেয়। এখানে তারা এক লক্ষ লোককে হত্যা করে। হিংস্রতায় ভাটা না পড়া পর্যন্ত রাস্তাঘাট রক্তে প্লাবিত হয়। অতঃপর বোহেমন্ড তাঁর বন্দিদেরকে পরিদর্শন করেন। মিলস বলেন, 'তাদের মধ্যে যারা বলিষ্ঠ ও সুন্দর তাদেরকে এন্টিয়কের দাস বাজারে বেচাকিনার জন্য রেখে দেয়া হয়, কিন্তু বৃদ্ধ ও দুর্বলদের বলি দেয়া হয় নিষ্ঠুরতার যূপকাষ্ঠে। মাররাতেও নরখাদকতা চলছিল এবং এমনও বলা হয় যে, খ্রিস্টানদের তাঁবুতে বিক্রয়ের জন্য প্রকাশ্যে নরমাংস রেখে দেয়া হয়েছিল।

জেরুজালেম দখল : ক্রুসেডারদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড
[২৩ শাবান, ৪৯২ হি.;১৫ জুলাই, ১০৯৯ খ্রি.]

মা'আররা থেকে ক্রুশের সৈনিকরা অভিযান চালায় জেরজালেমের[২] দিকে, যা তারা ঝটিকা আক্রমণে দখল করে নেয়। মিখদ হত্যাকাণ্ডের এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। রাস্তা ও বাড়িঘরে আরবদের হত্যা করা হয়। পরাজিতদের জন্য জেরুজালেমে কোন আশ্রয় ছিল না। কয়েকজন দুর্গ প্রাচীর থেকে লাফ দিয়ে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পায়, অন্যান্যরা আশ্রয়ের জন্য প্রাসাদ, বুরুজ এবং সর্বোপরি মসজিদে ভিড় জমায়, কিন্তু সেখানেও খ্রিস্টানদের অনুসরণ থেকে তারা আত্মগোপন করতে পারেনি। আরবরা যেখানে কিছুক্ষণ আত্মরক্ষা করেছিল সেই উমর (রা.)-এর মসজিদেও ক্রুসেডররা প্রভুত্ব কায়েম করে এবং টাইটাস বিজয় যে বীভৎস দৃশ্যে কলঙ্কিত হয়েছিল তারই

---

[১] মিলস, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯।

[২] নসির খসরুর সফরনামা'য় তৎকালীন জেরুজালেম সম্পর্কে অতীব চমকপ্রদ বর্ণনা রয়েছে। ফ্রাঙ্কদের অধিকারের অল্পকাল পূর্বে এটি ফাতিমীগণ কর্তৃক পুনরাধিকৃত হয়েছিল।

অশ্বারোহণে বাজারে আগমন করে জনসাধারণকে তাঁর পিতার ঋণের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং বহির্ভাগের অকৃতজ্ঞ লোকটির বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানান। আলেপ্পোবাসীগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে সমাগত হয়। তিনি বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠেন, 'আল্লাহ সাক্ষী, আমি যুদ্ধ করতে চাই না, কিন্তু যেহেতু তুমি তাই চাও তখন তারাই মীমাংসা করুক।' আলেপ্পোর সৈন্যরা পরাজিত হয় এবং বিশৃঙ্খলভাবে পালিয়ে যায় নগরীর ভেতরে। নিজেকে অসহায় দেখে গুমুস্তাগীন সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে অ্যাসাসিনদের তরবারি নিষ্কোষিত করেন। তাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং মালিক সালিহর অযোগ্য অভিভাবক ক্রুসেড যোদ্ধা ও মসুলের আতাবেক দ্বিতীয় সাঈফুদ্দিন গাজীর[১] কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি এমেসা অবরোধ করে, কিন্তু সালাহউদ্দীনের আগমনে তাদের পশ্চাদপসরণ করতে হয়, যিনি আরেকবার নূরুদ্দিনের পুত্রের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসার চেষ্টা করেন। এক সম্মানসূচক পত্রে তিনি প্রস্তাব দেন যে, মালিক সালিহর সহকারী হিসেবে দামিশক ও মিশর দখলে রাখার শর্তে হামা, এমেসা ও বালবেকে তিনি প্রত্যর্পণ করবেন। তাঁর প্রস্তাব ঔদ্ধত্যের সাথে প্রত্যাখ্যাত হয়। নগর প্রাচীরের পাদদেশে এক যুদ্ধে মালিক সালিহর সৈন্যদল আবার পরাজিত হয় এবং আলেপ্পো অবরুদ্ধ হয় গুরুতরভাবে। গুমুস্তাগীন ও সাঈফুদ্দিন গাজী সন্ধি প্রার্থনা করতে বাধ্য হন; সালাহউদ্দীনের করুণা উদ্রেক এবং তাঁর নিকট থেকে সুবিধাজনক শর্ত লাভ করার জন্য তাঁরা নূরুদ্দিনের শিশু কন্যাকে সালাহউদ্দীনের শিবিরে প্রেরণ করেন। সালাহউদ্দীন অতীব স্নেহের সাথে কন্যাটিকে গ্রহণ করে তাঁকে উপঢৌকনে আচ্ছাদিত করেন এবং তাঁর অনুরোধে আলেপ্পো প্রদেশে অধিকৃত সমস্ত নগরগুলো প্রত্যর্পণ করেন। সন্ধি অনুসারে দামিশক নিশ্চিতভাবেই তাঁকে প্রদান করা হয়।

সালাহউদ্দীনের সুলতান উপাধি লাভ

এ সময় থেকে সিরিয়া, হিজাজ ও মিশরে মালিক সালিহর নাম খুৎবা থেকে বাদ দেয়া হয় এবং সকল আইনসম্মত কর্তৃত্বের অধিকারী খলিফা নিয়মমাফিক নিয়োগপত্র ও সুলতান উপাধি দ্বারা সালাহউদ্দীনের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন।

মালিক সালিহর মৃত্যু [১১৮১-৮২ খ্রি.]

৫৭৯ হিজরিতে উনিশ বছর বয়সে মালিক সালিহ মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর রাজ্য দিয়ে যায় তাঁর পিতৃব্য পুত্র ইজজুদ্দিনকে, যিনি মসুলের আতাবেক পদে সাঈফুদ্দিনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। ইজজুদ্দিন তাঁর ভ্রাতা ইমামুদ্দিনের সাথে আলেপ্পো প্রদেশের বিনিময়ে সিঞ্জরের জায়গীর চেয়ে নেন। কিছুকাল পর ইমামুদ্দিন সালাহউদ্দীনকে তাঁর উর্ধ্বতন প্রভু বলে স্বীকার করে নেন এবং কয়েকটি মূল্যবান জায়গীরের বদলে আলেপ্পো প্রদেশটি ছেড়ে দেন মিশরের বিখ্যাত নৃপতিকে। মসুলও অনুরূপভাবে ছেড়ে দেয়া হয় এবং টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী নদীবিধৌত অঞ্চলে আতাবেগের অধিকারকে নিশ্চিত করা হয়।

সালাহউদ্দীনের ক্ষমতা

১১৮২ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগের মধ্যে আইকোনিয়ামের সুলতান ও বৃহত্তর আর্মেনিয়ার[২] আমীর সমেত পশ্চিত এশিয়ার সকল নৃপতি সালাহউদ্দীনের আধিপত্য স্বীকার করে নেন এবং তিনি যে কোন বিশেষ ব্যাপারে তাঁর সাথে যোগদান করার জন্য তাঁদের আহ্বান করার অধিকার লাভ করেন।

---

[১] মালিক সালিহর পিতৃব্য পুত্র।

[২] রাজধানী ছিল খিলাত। একজন মুসলমান রাষ্ট্রনায়ক এটি শাসন করতেন।

জেরুজালেম রাজ্য

কিন্তু জেরুজালেমের ফ্রাঙ্ক রাজ্য সমগ্র ইউরোপ থেকে লোক-লস্কর ও যুদ্ধোপকরণের সরবরাহ প্রাপ্ত হন; বীরগণ গৌরবান্বেষণে, দুঃসাহসিক অভিযাত্রীগণ অর্থের সন্ধানে, ধর্মান্ধরা বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধের উন্মাদনায়, অপরাধীরা দণ্ড থেকে পরিত্রাণ পেতে দলে দলে সিরীয় উপকূলে সমবেত হত। এ সময় আমরী তাঁর চতুর্থ পুত্র বল্ডউইনকে সিংহাসনে রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হন, কিন্তু এই হতভাগ্য যুবক আক্রান্ত হন এক জঘন্য ব্যাধিতে,[১] ফলে শীঘ্রই তিনি ঘৃণার পাত্রে পরিণত হন এবং রাজ্যের শাসনকার্যে যোগদানে বিরত থাকেন। তাঁর ভগ্নী সাইবিলার বিয়ে হয়েছিল মন্টফারেটের মার্কুইসের সাথে। তাঁদের ঔরসেও বল্ডউইন নামে একটি শিশুপুত্র ছিল।

সাইবিলা ও গাই দ্য লুসিগনান জেরুজালেমের রাজা ও রানী [১১৮৭ খ্রি.]

মন্টফারেটের মৃত্যুর পর তিনি গাই দ্য লুসিগনানকে বিয়ে করেন এবং বল্ডউইন তাঁকে অভিভাবক নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরই তিনি অভিভাকত্ব থেকে গাই দ্য লুসিগনানকে পদচ্যুত করেন এবং তা ন্যস্ত করেন ত্রিপলির কাউন্ট রেমন্ডের ওপর। একই সময়ে বল্ডউইন তাঁর ভাগ্নে পঞ্চম বল্ডউইনের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। এই শিশু রাজা স্বীয় অস্বাভাবিক মাতা কর্তৃক কিংবা তাঁরই ইঙ্গিতে নিহত হয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তা সত্য হোক আর নাই হোক, তাঁর মৃত্যুর পর সাইবিলা জেরুজালেমের রানী হিসেবে গৃহীত হন এবং তিনি স্বয়ং তাঁর স্বামীর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেন। এরূপে ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্যালেস্টাইনের সিংহাসন সাইবিলা ও গাই দ্য লুসিগনান কর্তৃক অধিকৃত হয়।

কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত বল্ডউইনের শাসনকালে সুলতান ও ফ্রাঙ্কদের মধ্যে একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। মিখদ বলেন, 'এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানরা তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করেছিল তা গৌরবের সাথে উল্লেখ করার মত, পক্ষান্তরে খ্রিস্টানরা বিশ্বাসঘাতকতা করে নতুন যুদ্ধের ইঙ্গিত করেছিল । চ্যাতিলনের রেনল্ড বা রেজিনাল্ড,[২] পয়েটিয়ার্সের রেমন্ডের বিধবা পত্নী কনস্টান্সকে বিয়ে করেছিলেন, তিনি দীর্ঘদিন নূরুদ্দিন মাহমুদের হাতে বন্দি ছিলেন। মালিক সালিহ তাঁকে মুক্তি দেন। অতঃপর তিনি বিয়ে করেন থোরানের হামফ্রের বিধবা পত্নীকে, যাঁর কাছে থেকে তিনি কারাক[৩] ও মন্ট্রিলের জায়গীর লাভ করেন।

ফ্রাঙ্কদের চুক্তিভঙ্গ [১১৮৬ খ্রি.]

১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে তিনি তাঁর দুর্গের পাশ দিয়ে গমনরত একদল ঐশ্বর্যশালী কাফেলা আক্রমণ করে বহু লোককে হত্যা করেন এবং তাদের দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করেন। ক্রুদ্ধ সুলতান জেরুজালেমের রাজার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন; জেরুজালেমের রাজা তা অস্বীকার করায় সালাহউদ্দীন তাঁকে শাস্তিদানের ভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। তিনি কারাক অবরোধ করে তদীয় সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র আল-মালিক-উল-আফজাল উপাধিধারী আলীর অধীনে একদল সৈন্য ফ্রাঙ্কদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য গ্যালিলি উপসাগরের দিকে প্রেরণ করেন। ফ্রাঙ্কগণ কারাক অবরোধ ও মালিক-উল-আফজালের অগ্রগতির সংবাদ শোনামাত্র তাদের সৈন্যদল সম্মিলিত করে তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে

---

[১] তিনি ছিলেন কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত।

[২] আরবগণ কর্তৃক আরনাত নামে অভিহিত।

[৩] কারাক মরু সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের পূর্বদিকে অবস্থিত।

সুলতানও দ্রুত হাজির হন পুত্রকে সাহায্য করতে। দুটি সৈন্যদলের সংখ্যা ছিল প্রায়ই সমান; ফ্রাঙ্কগণ সফুরিয়া বা সেফরিস[১] নামক প্রান্তরে সমবেত হয়েছিল, কিন্তু সালাহউদ্দীন দক্ষতার সাথে সৈন্য পরিচালনা করে তাদেরকে হিট্টিন[২] পর্বতের নিকটবর্তী টাইবেরিয়াসের পাশে অবস্থিত পর্বতবেষ্টিত একটি উপত্যকায় সরে যেতে বাধ্য করেন। ফ্রাঙ্কগণ টাইবেরিয়াস হ্রদের দিকে মুখ করে পর্বত থেকে এভাবে অবতরণ করল যেন তারা একটি চলমান পর্বত। সুলতানের সৈন্যদল হ্রদের সম্মুখে মোতায়েন ছিল এবং এভাবে ক্রুসেড যোদ্ধাদের হ্রদের জল থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

২৩ ও ২৪ রবিউস সানী, ৫৮৩ হি; ২ ও ৩ জুলাই, ১১৮৭ খ্রি.
টাইবেরিয়াস বা হিট্টিনের যুদ্ধ, ৪ জুলাই ১১৮৭ খ্রি.

দুই সৈন্যদল ২ জুলাই রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পরস্পরের সম্মুখীন হয়। সুলতান সারা রাত জেগে থেকে পরবর্তী দিনের ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। শুক্রবার এবং তার পরের দিন ৫৮৩ হিজরির ২৫ রবিউস সানীর যুদ্ধে গাই দ্য লুসিগনান চরমভাবে পরাজিত হন। তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক যুদ্ধ শোচনীয় পরাজয়ে পর্যবসিত হয়; দশ সহস্র ক্রুসেড যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হয় এবং তাদের প্রধান নেতৃবৃন্দ হয় নিহত, না হয় বন্দি হন। শেষোক্তদের মধ্যে ছিলেন গাই দ্য লুসিগনান, তাঁর ভ্রাতা জিওফ্রে, চ্যাতিলনের রেনড (যুদ্ধের মূল কারণ), থোরানের হামফ্রমের পুত্র, জুবাইলের কাউন্ট হিউ, টাইবেরিয়াডের রাজার পুত্র এবং দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ। কেবল ত্রিপলির রেডমন্ড, টাইবেরিয়াডের রাজা, সিডনের রেনড, এন্টিয়কের রাজার পুত্র এবং আইবেলিনের বালিয়ান পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এঁরা কৌশলে পশ্চাদানুসরণ এড়িয়ে সমুদ্রোপকূলে পৌছতে সক্ষম হন। গাই দ্য লুসিগনানের সাথে সদয় ব্যবহার করা হয়, কিন্তু চ্যাতিলনের রেনড এবং অন্যান্য যাঁরা তাঁর মত সন্ধিভঙ্গ করে যুদ্ধবিরতি কালে মুসলমানদের হত্যা করেছিলেন তাদের হত্যা করা হয়। সুলতান এই পরাজয়ের পর শত্রুকে শক্তি-সঞ্চয়ের করতে না দিয়ে দ্রুতবেগে হিট্টিন বিজয়ের পথ অনুসরণ করে চলেন। টাইবেরিয়াডের দুর্গ অধিকৃত হয় এবং ত্রিপলির রেমন্ডের স্ত্রী পতিত হন সুলতানের হাতে। সর্বপ্রকার সৌজন্য ও সম্মান সহকারে তাঁকে স্বামীর কাছে পৌঁছে দেয়া হয়; কোন স্ত্রীলোককে অসম্মান বা শিশুদেরকে নির্যাতন করা হয়নি। টলেমাইস[৩] শীঘ্রই তার দুর্গ প্রাচীরের পাদদেশে সালাহউদ্দীনকে দেখতে পায়। এই নগরী খ্রিস্ট রাজ্যের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ সৈন্যদলকে দুই বছর পর্যন্ত প্রতিরোধ করেছিল, সেটি এক্ষণে দুই দিনেই সালাহউদ্দীনের হস্তগত হয়। নাপলুস, জেরিকো, রামলা, সিজারিয়া, আরসুফ, জাফফা, বেইরুত এবং আরও অন্যান্য নগর বিনা বাধায় তাদের নগর-দ্বার খুলে দেয়। সমুদ্রোপকূলে কেবল টায়ার, ত্রিপলি ও আসকালন ক্রুসেড-যোদ্ধাদের হাতে থাকে। কিছুকাল অবরোধের পর আসকালন আত্মসমর্পণ করলে উদারতামূলক শর্তাবলী লাভ করে।

---

[১] প্রাচীন ডায়োসিজারিয়া, রোমান আমলে গ্যালিলির একটি প্রধান গ্রাম ছিল।

[২] পবর্তমালার মধ্যে সর্বোচ্চ হিট্টিন পর্বতের দক্ষিণ দিকের নিম্নাংশ টাইবেরিয়োসের যুদ্ধক্ষেত্র ছিল। এটি ছিল টাইবেরিয়াস হ্রদ থেকে এক ঘন্টার ভ্রমণপথে পশ্চিমে বাতুফ, উত্তরে হিট্টিন এবং দক্ষিণ- পূর্বে হামা নামক তিনটি উপত্যকার মধ্যবর্তী একটি বিশাল তৃণাচ্ছাদিত মালভূমি। যুদ্ধের যথাযথ স্থানটি উত্তরে হিট্টিন পর্বত, উত্তর পূর্বে 'বেদনারাশি' নামক পর্বত, পূর্বে হ্রদের খাড়া শৃঙ্গ এবং দক্ষিণে লুবিয়া গ্রাম দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে একটি কোণাকার ভূমিতে পরিণত হয়েছিল।– মিখদ

[৩] সেন্ট জীন দ্য একর বা সংক্ষেপে একর, আরবদের কর্তৃক আক্কা নামে অভিহিত।

জেরুজালেম

অতঃপর সুলতান জেরুজালেমের দিকে মনোনিবেশ করেন। এই নগরীর প্রাচীরাভ্যন্তরে বিপুল সংখ্যক বেসামরিক অধিবাসী ছাড়াও ষাট হাজারের বেশি সৈন্য ছিল। নগরে উপনীত হয়ে তিনি প্রধান অধিবাসীদের ডেকে তাদেরকে নিম্নলিখিত ভাষায় বলেন, 'আমি জানি, যেমন তোমরা জান যে জেরুজালেম একটি পবিত্র স্থান।[১] আমি এই স্থানকে রক্তপাতে অবিত্র করতে চাই না; তোমরা দুর্গ ছেড়ে দিলে আমার কোষাগারের একাংশ এবং যত জমি তোমরা আবাদ করতে পার সব তোমাদেরকে প্রদান করব। ধর্মান্ধতার বশবর্তী হয়ে ক্রুসেড যোদ্ধারা এই মহান ও উদার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যানের ফলে ক্রুদ্ধ সালাহউদ্দীন শপথ করেন গডফ্রে দ্য বোইলনের সহচর ও সৈন্যরা যে নিষ্ঠুরতা চালিয়েছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

জেরুজালেমের আত্মসমর্পণ; সালাহউদ্দীনের মানবতাবোধ

কিছুকাল অবরোধের পর ক্রুসেড যোদ্ধারা ভগ্নোৎসাহ হয়ে 'মানবজাতির সাধারণ পিতার নামে' দয়া ভিক্ষা চাইল। সুলতানের দয়া তাঁর শাস্তি প্রদানের ইচ্ছার উপর জয়ী হল। জেরুজালেমের গ্রিক ও সিরীয় খ্রিস্টানরা সুলতানের রাজ্য থেকে পূর্ণ নাগরিক অধিকার উপভোগের অনুমতি লাভ করল। যেসব ফ্রাঙ্ক ও ল্যাটিন অধিবাসী সুলতানের প্রজা হিসেবে প্যালেস্টাইনে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করল তাদেরকে সে অনুমতি দেয়া হল। সুলতানের সৈন্যদলের নিরাপত্তাধীনে সকল যোদ্ধাকে তাদের স্ত্রী ও শিশুসহ চল্লিশ দিনের মধ্যে নগর ছেড়ে টায়ার কিংবা ত্রিপলিতে চলে যেতে বলা হল ।

সালাহউদ্দীনের মানবতাবোধ

প্রতিটি পুরুষের জন্য দশ সিরীয় দীনার, স্ত্রীলোকের জন্য পাঁচ দীনার এবং শিশুর জন্য এক দীনার করে তাদের মুক্তিপণ ধার্য হয়। নির্ধারিত মুক্তিপণ দিতে অসমর্থ হলে তাদের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে হবে; কিন্তু এই শর্ত ছিল নামমাত্র। সুলতান নিজে দশ হাজার লোকের মুক্তিপণ দান করেন, অন্যদিকে তাঁর ভাই সাঈফুদ্দিন[২] (খ্রিস্টানদের স্যাফাদিন) মুক্তি দেন আরও সাত হাজার লোককে। সালাহউদ্দীনের ক্ষমাশীলতায় কয়েক হাজার লোককে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেয়া হয়। ধর্মযাজক ও সাধারণ লোকেরা বিনা প্রতিবন্ধকতায় তাদের সমস্ত ধনরত্ন এবং মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায়। বহু খ্রিস্টানকে দেখা যায় তাদের দুর্বল ও বৃদ্ধ পিতামাতা কিংবা বন্ধুবান্ধবকে কাঁধের উপরে বহন করতে। এই দৃশ্যে ব্যথিত হয়ে সুলতান তাদেরকে প্রচুর অর্থ দান করেন, এমনকি তাদের ভার বহনের জন্য খচ্চরও প্রদান করেন। জেরুজালেমের রানী সাইবিলা প্রধান তত্ত্বাবধায়িকা ও নাইটগণসহ তাঁর কাছে বিদায় নিতে এলে তিনি তাঁর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং তাঁর সাথে কথা বলেন অত্যন্ত কোমলভাবে। কোলে শিশু নিয়ে বহু ক্রন্দনরতা মহিলা তাকে (রানী) অনুসরণ করে। তাদের অনেকে সুলতানের কাছে উপনীত হয়ে নিম্নরূপে তাঁকে সম্বোধন করে :

'আপনি আমাদেরকে আপনার হাতে বন্দি যোদ্ধাদের স্ত্রী, মাতা ও কন্যাদেরকে পদব্রজে দেখতে পাচ্ছেন। আমরা চিরতরে এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তারা (বন্দি যোদ্ধা) আমাদের জীবন দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের হারালে আমাদের শেষ আশা নির্বাপিত হবে। আপনি যদি তাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেন তাহলে তাঁরা আমাদের অভাব মোচন করতে পারবেন এবং আমরা পৃথিবীতে সহায়হীন হব না।'

---

[১] মূলে রয়েছে আল্লাহর ঘর।

[২] সাঈফুদ্দিন আবু বকর, তাঁর উপাধি ছিল আল-মালিক-উল-আদিল।

তাদের প্রার্থনায় অভিভূত হয়ে সালাহউদ্দীন তৎক্ষণাৎ মায়ের কাছে তাদের পুত্রদেরকে, স্ত্রীদের কাছে তাদের স্বামীদেরকে ফিরিয়ে দেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর ক্ষমতাধীনে থাকা অবশিষ্ট বন্দিদের প্রতি সদয় ব্যবহারের। তিনি উদারভাবে অনাথ ও বিধবাদের আর্থিক সাহায্য দান করেন এবং হসপিটালার সম্প্রদায়ের নাইটগণকে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা সত্ত্বেও তিনি পীড়িত ও আহতদের পরিচর্যা এবং খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের তত্ত্বাবধানের কাজ চালিয়ে যেতে তাদের অনুমতি দেন।

সালাহউদ্দীনের মানবতা ছিল তাঁর নিকটতম খ্রিস্টান রাজার নৃশংসতার সম্পূর্ণ বিপরীত। মিলস বলেন, 'জেরুজালেম ছেড়ে অনেক খ্রিস্টান এন্টিয়কে গমন করে, কিন্তু বহেমন্ড তাদেরকে কেবল আতিথেয়তা প্রদর্শন করতে অস্বীকার করেন তাই নয়, বরং তাদের সর্বস্ব থেকে বঞ্চিত করেন। তারা আরব রাজ্যে প্রবেশ করে এবং সাদরে অভ্যর্থিত হয়। মিখদ জেরুজালেম থেকে নির্বাসিত ব্যক্তিদের প্রতি খ্রিস্টানদের অমানবিকতার কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন। তাদের পূর্বাঞ্চলের ভ্রাতৃগণ কতৃক বিতাড়িত হয়ে তারা শোচনীয়ভাবে সিরিয়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। এদের অনেকে দুঃখ ও ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করে। ত্রিপলি তাদের জন্য দ্বার রুদ্ধ করে দেয় এবং যেসব খ্রিস্টান তাদের বিপদে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিল তাদের প্রতি অভিসম্পাত দিতে দিতে একজন স্ত্রীলোক হতাশার তাড়নায় তার শিশু সন্তানকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। পরাজিত লোকদের মনোভাবের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করে সকল ক্রুসেড যোদ্ধা নগর ত্যাগ না করা পর্যন্ত সুলতান নগরে প্রবেশ থেকে বিরত থাকেন। বিজয়লাভের জন্য অভিনন্দন জানাতে তাঁর শিবিরে এসেছিলেন সাম্রাজ্যের আমীর ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে তিনি ৫৮৩ হিজরির ২৭ রজব[১] শুক্রবার দিন জেরুজালেমে প্রবেশ করেন। চারদিকে যুদ্ধের ধ্বংসসমূহের সংস্কার সাধন করা হয়, ফ্রাঙ্কগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত মসজিদ ও মহাবিদ্যালয়গুলোকে পুনর্নির্মাণ করা হয়। দেশ শাসনের জন্য ক্রুসেড যোদ্ধাদের কঠোর অত্যাচারী শাসন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের উদার ও দূরদর্শী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় ।

জেরুজালেম থেকে সালাহউদ্দীন টায়ারের দিকে অভিযান চালান। তিনি উদারতাবশে যেসব ক্রুসেড যোদ্ধাদের মুক্তি দিয়েছিলেন তাদেরকে কিছুটা অবিবেচনার সাথে আশ্রয় গ্রহণ করতে দেয়া হয়েছিল। টায়ারের রক্ষীবাহিনী এভাবে সবদিক দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করে প্রবল প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়। এর নেতৃত্ব দেন দক্ষ ও সুচতুর মন্টফেরাটের মার্কুইস কনরাড। তিনি সুলতানের নগর সমর্পণের আদেশকে অমান্য করে দাবি করেন যে, তিনি এমন এক রাজার আজ্ঞাবহ, যাঁর আধিপত্য সমুদ্রের ওপরেও বিস্তারিত। টায়ার অবরোধের জন্য কালক্ষেপণ না করে সালাহউদ্দীন কিছু সময়ের জন্য গতি পরিবর্তন করেন এবং সমুদ্রের উত্তর উপকূলে অভিযান চালিয়ে যথাক্রমে দখল করে নেন লাওডিসিয়া, জাবালা, জায়হুন, বেকাস, বোজায়র, দারবারসাক ও ফ্রাঙ্কদের দ্বারা অধিকৃত অন্যান্য সুরক্ষিত স্থান। মুক্তি পাওয়া মাত্র গাই দ্য লুসিগনান ইউরোপ গমন করবেন– এই মর্মে শপথ করলে তিনি তাঁকে মুক্তি দেন। কিন্তু মুক্তি পেয়েই এই খ্রিস্টান বীর তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং ক্রুসেড বাহিনীর ধ্বংসাবশিষ্ট ও ইউরোপ থেকে আগত নতুন সৈন্যদের দ্বারা সংগঠিত এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি টলেমিয়াস অবরোধ করেন। এখন থেকে এই স্থানকে কেন্দ্র করে পরবর্তী দুই বছরের জন্য তিনটি মহাদেশের স্বার্থ জড়িত হয়ে যায়।

---

[১] রসূলুল্লাহ (স.)-এর মি'রাজ বার্ষিকী।

তৃতীয় ক্রুসেড

জেরুজালেমের পতনে সমগ্র খ্রিস্টান জগতে ভয়াবহ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ধর্মযাজকগণ জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তুলতে ও ইউরোপের রাজা-রাজড়াদের আরেকটি ক্রুসেড শুরু করার জন্য প্ররোচিত করতে সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁদের উদ্যোগ সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। দলে দলে নতুন সৈন্য এসে সমবেত হয় টায়ার ও একরের সম্মুখবর্তী শিবিরে এবং খ্রিস্টান জগতের তিনজন প্রধান রাজা– জার্মানির সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস ও ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড কোর দ্য লায়ন তাতে সামিল হন। এই সংকটের সময়ে সালাহউদ্দীন যদি তাঁর সহজাত তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও দূরদর্শিতাবশত মিশর ও সিরিয়ার নৌবহরগুলোকে একত্রিত করে ফিনিশীয় উপকূলে প্রবল অবরোধ গড়ে তুলতেন তাহলে তিনি প্যালেস্টাইনেই ক্রুসেড যোদ্ধাদের পঙ্গু করে দিতে পারতেন এবং ইউরোপ থেকে শীঘ্রই সমাগত শক্তিশালী সৈন্যদলের অবরতরণও প্রতিরোধ করতে পারতেন। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে সামুদ্রিক আক্রমণ থেকে মুক্তির উপরই নির্ভর করছে ফিনিশিয়ার নিরাপত্তা এবং স্থলভাগের কোনো বিজয় দ্বারাই সমুদ্রের পরপার থেকে আগত জনস্রোত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। পিসা, জেনোয়া ও ভেনিসিয়ার অধিবাসীগণ প্রতিদিন খাদ্যদ্রব্য ও যুদ্ধসামগ্রীসহ ক্রুসেড যোদ্ধাদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি করছিল। একরের স্মরণীয় অবরোধের সময় সালাহউদ্দীন ও ইংল্যান্ডের রিচার্ড– এই দুই ব্যক্তি যে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলো ইবনুল আসির ও ইবন শাদ্দাদের বর্ণনা থেকে গৃহীত এবং মোটামুটি তাঁদের নিজের ভাষাতেই লিখিত হল। যখনই সালাহউদ্দিন কোন নগর বা দুর্গ দখল করতেন তখনই তিনি তথাকার অধিবাসীদের জীবন রক্ষা করতেন। ফ্রাঙ্কগণ দ্রুত টায়ারে চলে যেত তাদের যাবতীয় ধন-সম্পদ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিয়ে। এভাবে বহুসংখ্যক শত্রু এখানে সমবেত হয়েছিল এবং তারা সমুদ্রের পরপার থেকে অবিরত নতুন সৈন্য সাহায্য পেতে লাগল[১]। ঐতিহাসিক আরও বলেন যে, ইউরোপের লোকদেরকে ধর্মোন্মাদনায় উজ্জীবিত করার জন্য সবরকম পন্থা অবলম্বন করা হয়। জেরুজালেমের যে ধর্মাচার্যের প্রতি সালাহউদ্দীন সদয় ব্যবহার করেছিলেন তিনি একজন আরব কর্তৃক আহত মসীহর (যীশুখ্রিস্ট) এমন একটি ছবি নিয়ে ফ্রাঙ্কদের নগরে নগরে পরিভ্রমণ করেন এবং এভাবে খ্রিস্টানদের বিদ্বেষ উসকে দেন সর্বোচ্চ মাত্রায়। এই পন্থায় তিনি প্যালেস্টাইনের ফ্রাঙ্কদের সাহায্য করার জন্য বহু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করেন। এমনকি স্ত্রীলোকরাও যুদ্ধের জন্য নিজেদেরকে শ্রেণীভুক্ত করে। এক অল্পবয়স্ক খ্রিস্টান বন্দি ছিল বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান এবং বিধবাটি শুধু একটি ক্ষুদ্র গৃহের মালিক ছিল। তিনি কীভাবে বাড়িটি বিক্রি করে পুত্রকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন এবং তাকে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন, এই কাহিনী সে ঐতিহাসিকের নিকট ব্যক্ত করেছেন।

খ্রিস্টানগণ কর্তৃক একর অবরোধ শুরু [১৫ রজব, ৫৮৫ হি; ২৯ আগস্ট, ১১৮৯ খ্রি.]

ফ্রাঙ্কগণ তাদের সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে স্থল ও জলপথের চতুর্দিক থেকে আগমন করে এবং যখন তারা সকলে টায়ারে একত্রিত হল তখন তারা প্রথমে সিডন আক্রমণ করতে মনস্থ করল, কিন্তু পরিশেষে একর পুনরাধিকার করতে সংকল্প করে। তদনুসারে সমুদ্রোপকূলে জাহাজগুলোকে পাশাপাশি রেখে এই স্থানের উপর অভিযান চালায়। বস্তুত সমুদ্র ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন, কারণ এখান দিয়েই তাদের স্বদেশ থেকে যুদ্ধোপকরণ, খাদ্যসামগ্রী এবং অন্যান্য সাহায্য আসত। ৫৮৫ হিজরির ১৫ রজব তারা একরের সম্মুখে উপনীত হয় এবং তৎক্ষণাৎ নগরটি অবরোধ করে ।

---

[১] ইবনুল আসির।

একর অবরোধ

ফ্রাঙ্কদের গতিবিধির সংবাদ শোনামাত্র সালাহউদ্দিন একটি সামরিক মন্ত্রনাসভা ডাকেন। তাদেরকে পথিমধ্যে আক্রমণ করাই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত, কিন্তু তিনি তাঁর আমীরগণ কর্তৃক নিবৃত্ত হন, যাঁরা উপদেশ দেন একরের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত ময়দানে আক্রমণ চালাতে। সালাহউদ্দিন ঐ স্থানে পৌছে দেখতে পান ক্রুসেড-যোদ্ধারা একরের চারদিকে শিবির স্থাপন করে সমুদ্রের উপর তারদের আধিপত্য বিস্তার করেছে। এইরূপে তারা সম্পূর্ণরূপে নগরটিকে পরিবেষ্টন করে স্থলপথে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল। ঐতিহাসিক বলেন, সালাহউদ্দিন যদি তাঁর নিজের মতানুযায়ী কাজ করতেন এবং একরের দখল নেয়ার আগেই ফ্রাঙ্কদের আক্রমণ করতেন, তাহলে তিনি নগরটি রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ যখন কোন কিছু ইচ্ছা করেন তখন তিনি তার উপায় তৈরি করে দেন। সুলতান ক্রুসেড যোদ্ধাদের সামনে শিবির স্থাপন করেন এবং কাইসান (তেলকাইসান) পাহাড়ের উপর তাঁবু ফেলেন । তাঁর সৈন্যবাহিনীর ডাইন অংশ তাল-আয়াজিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বাম পার্শ্ব স্থাপিত হয় বেলুস[১] নদীর তীরে। মসুল, দিয়ার বকর, সিঞ্জর ও হারবান থেকে কিছু নতুন সৈন্য এসে এবার তাঁর সাথে যোগ দেয়। এভাবে একদিকে স্থলপথে যেমন মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি হয়, অন্যদিকে তেমনই সমুদ্রপথে ফ্রাঙ্কদের জন্য সাহায্য এসে জমা হয়।

১ শাবান, ৫৮৫ হি.; ১৪ সেপ্টেম্বর, ১১৮৯ খ্রি.

৫৮৫ হিজরির শাবান মাসের প্রারম্ভে সালাহউদ্দীন ক্রুসেড যোদ্ধাদের আক্রমণ করেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তকীউদ্দিন প্রচণ্ডরূপে আক্রমণ করে তাদের হটিয়ে দেন এবং পুনরায় একরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন । ইবনুল আসির বলেন, মুসলমানরা যদি রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেত তাহলে তারা সম্পূর্ণভাবে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য সফল করতে পারত, কিন্তু ফ্রাঙ্কদের অধিকৃত অর্ধেক স্থান দখল করেই পরদিন পুনরায় যুদ্ধ করবে মনে করে তারা বিশ্রাম নিতে চলে যায় ।

সালাহউদ্দীন এবার সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তন করেন এবং একরকে নতুন করে যুদ্ধসামগ্রী প্রদান করেন। যেসব আমীরকে তিনি নগরে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হুসামুদ্দিন (আবুল হায়জা, ডাকনাম আস সামীন বা বলিষ্ঠ)। ৬ শাবান ফ্রাঙ্কগণ তাদের পরিখার পিছন থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং ভীষণভাবে আক্রমণ করে আরবদের। তারা ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে পরাজিত হয় এবং পরিখার পিছনে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

এই সময় সালাহউদ্দীনের সৈন্যদল সারা দেশে ছড়িয়ে ছিল। একটি সৈন্যদল এন্টিয়করাজ বোহেমন্ডের গতিবিধি লক্ষ করত, সীমান্ত রক্ষার জন্য আরেকটি সৈন্যদল স্থাপিত হয়েছিল ত্রিপলির সম্মুখীবর্তী এমেসায়; তৃতীয় দলটি টায়ার পাহারা দিত এবং চতুর্থ দলটি সমুদ্র পথে ফ্রাঙ্ক আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ডামিয়েটা ও আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি দখলে রেখেছিল। সুতরাং নতুন সৈন্য আমদানি করা সত্ত্বেও সংখ্যাগতভাবে ক্রুসডে যোদ্ধাদের চেয়ে সুলতানের সৈন্য কমই ছিল এবং আরও নতুন

---

[১] ইবনুল আসির এটিকে 'নাহরুল জারী' (বহমান নদী), ইবনে শাদ্দাদ এটিকে 'নাহরুল হালব' (মিষ্টি পানির নদী) বলে অভিহিত করেছেন।

সৈন্য পাওয়ার আগেই তাঁকে ধ্বংস করার উদ্দেশে তারা আরেকবার আক্রমণ চালায় যা প্রথমে আংশিকভাবে সফল হলেও ভয়ঙ্কর পরাজয়ের মধ্যেই শেষ হয়। এই যুদ্ধে যেসব ক্রুসেড-যোদ্ধা নিহত হয় তাদের সংখ্যা ছিল ১০,০০০। স্থানটি পরিষ্কার রাখা এবং মৃতদেহগুলি সমুদ্রে ফেলে দেয়ার জন্য সালাহউদ্দীনের চেষ্টা সত্ত্বেও অসংখ্য অনাচ্ছাদিত মৃতদেহের দুর্গন্ধে আবহাওয়া বিষাক্ত হয় এবং দেখা দেয় ভয়াবহ মহামারী। সুলতান নিজেও তাতে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসক ও সেনাপতিদের পরামর্শে শিবির তুলে দেয়া হয়। সালাহউদ্দীন ও সৈন্যদল আল খারুবার[১] নিকট উঠে যান।

৪ রমজান, ৫৮৫ হি.; ১৬ অক্টোবর, ১১৮৯ খ্রি.

আরবরা চলে গেলে ফ্রাঙ্কগণ তাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পুনরায় একর অবরোধ করে। সালাহউদ্দীনের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা শিবিরের চারদিকে গভীর পরিখা খনন করে এবং তাতে উঁচু প্রাচীর তৈরি করে, যাতে পরাজিত হলে তারা তার পিছনে আশ্রয় নিতে পারে ।

সফর ৫৮৬ হি.; মার্চ, ১১৯০ খ্রি.

সালাহউদ্দীন খারুবায় শীতকাল অতিবাহিত করেন। ১১৯০ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালে তিনি পুনরায় একরের প্রান্তরে অবতরণ করেন এবং দখল করেন তাঁর আগের স্থানটিকে। নগর-প্রাচীর আক্রমণের জন্য ফ্রাঙ্কগণ বর্মপরিহিত সৈন্য কর্তৃক প্রকাণ্ড সব কাঠের টাওয়ার তৈরি করেছিল; অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণ দামেশকবাসী এক ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশে ন্যাপথা ও গ্রিক আগুন ভর্তি গোলা নিক্ষেপ করে চলমান বুরুজগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং সেগুলো ভস্মীভূত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এই সময় মেসোপটেমিয়ার দিক থেকে কিছু সৈন্য এসে সুলতানের সাথে যোগ দেয়। একরের সৈন্যদের জন্য খাদ্যসামগ্রী ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে মিশরের নৌবাহিনীও উপস্থিত হয়। নৌ যুদ্ধে ফ্রাঙ্কগণ পরাজিত হয় এবং মিশরীয় জাহাজগুলো পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করে ।

ফ্রেডারিক বারবারোসা

সেই সময় জার্মানির সম্রাট (মালিক-উল-আলমান) ফ্রেডারিক বারবারোসা অগণিত সৈন্যদলসহ প্যালেস্টাইন অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন– এ সংবাদে আরব শিবিরে ভীষণ অস্থিরতা দেখা দেয়। পথিমধ্যে তিনি ওউজ তুর্কোমানদের দ্বারা হয়রান হলেও ইসতেফানের (স্টিফেন) পুত্র লাফুন (লিঁও) শাসিত উচ্চ সাইলিসিয়া (বিলা-উল-আরমান) অতিক্রম করতে সমর্থ হন। সুলতান সাহায্যের জন্য দ্রুত বার্তাবহ পাঠান তাঁর মিত্রদের কাছে, এমনকি তিনি মরক্কোর সুলতান ইয়াকুব আল মনসুরের কাছেও দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই তাঁকে সাহায্যের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করেন।

তাঁর (বারবারোসা) মৃত্যু [১০ জুন, ১১৯০ খ্রি.]

একারণে ইউরোপের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সালাহউদ্দীনকে তাঁর নিজস্ব শক্তির উপরই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো সম্রাটের ভাগ্যে ছিল

---

[১] আল-খারুবা ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত একটি দুর্গ এবং এটি কার্মেল পর্বতের হায়টা নামক স্থান থেকে তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

না; তিনি সেলিউসিয়ার নিকটবর্তী সলফ (প্রাচীন ক্যালিকাদনাস) নদীতে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁর সৈন্যদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, অনেকে ফিরে যায় স্বদেশে। অন্যদিকে কিছুসংখ্যক লোক তাঁর পুত্রের (সোয়াবিয়ার ডিউক) নেতৃত্বে এন্টিয়কে চলে আসে, তারপর যায় প্যালেস্টাইনে। অবশেষে তারা জাহাজযোগে স্বদেশ যাত্রা করে, কিন্তু পথিমধ্যে জাহাজ ডুবে যাওয়ায় অনেকে প্রাণ ত্যাগ করে।

২০ জমাদিউস সানী, ৫৮৬ হি; ২ জুলাই, ১১৯০ খ্রি.

৫৮৬ হিজরির ২০ জমাদিউস সানী ফ্রাঙ্কগণ তাদের পরিখার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ আরম্ভ করে। তারা ভীষণ লোকক্ষয়ী পরাজয় বরণ করে এবং হতাহত লোকের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন হয়ে যায় । ক্রুসেড যোদ্ধারা এবার ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ে।

কাউন্ট হেনীর আগমন

এর দুই দিন পর তাদের সাহায্যের জন্য সমুদ্রের পরপার থেকে আলকোন্দ হেনরীর (ক্যাম্পাগণের কাউন্ট হেনরী) নেতৃত্বে এক দুর্ধর্ষ সৈন্যদল এসে হাজির হয়। এই তরুণ ইংল্যান্ডের রাজার বৈমাত্রেয় ভগ্নীর পুত্র এবং ফ্রান্সের রাজার সাথেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। একরের সন্নিকটে তিনি নির্বিঘ্নে তাঁর সৈন্যদলকে অবতরণ করান এবং যেসব ক্রুসেড যোদ্ধা সেখানে ইতিপূর্বেই শিবির স্থাপন করেছিল তাদের সাথে মিলিত হন। তিনি দৃঢ়ভাবে দুর্গ সুরক্ষিত করেন এবং সৈন্যদেরকে একত্রিত করে সুলতানকে আক্রমণ করার অভিপ্রায় ঘোষণা করেন। এর ফলে সালাহউদ্দীন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে আল খারুবায় ফিরিয়ে আনেন, যাতে তাঁর সৈন্য সমাবেশের জন্য আরও খালি জায়গা থাকে এবং একরের ভয়ঙ্কর পূতিগন্ধ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

২৭ জমাদিউস সানী, ৫৮৬ হি; ১ আগস্ট, ১১৯০ খ্রি.

সুলতানের সৈন্য অপসারণের ফলে ক্রুসেড যোদ্ধারা বিপুল উদ্যমে অবরোধ শুরু করে, কিন্তু নগরাভ্যন্তরস্থ বন্দি আরবরা বীরোচিত দৃঢ়তার সাথে এই হিংস্র আক্রমণের বিভীষিকা সহ্য করে । কারাকুশের আমীরগণ এবং হুসামুদ্দিন অবিরত সৈন্যদের সাহস উজ্জীবিত করেন। সজাগ ও সর্বত্র উপস্থিত থেকে এবং সর্বশক্তি ও সর্বকৌশল প্রয়োগ করে তারা ফ্রাঙ্কদের সহসা আক্রমণের কিংবা তাদের পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নষ্ট হতে দেন নি[১]। তারা অবরোধকারীদের যুদ্ধসরঞ্জাম পুড়িয়ে দেয় এবং কয়েকবার আকস্মিক নিষ্ক্রমণ দ্বারা শত্রুকে তাদের শিবিরে বিতাড়িত করে । অতঃপর কাউন্ট হেনরী নগর অবরোধকে পোতাশ্রয় অবরোধে পরিণত করেন। কিন্তু সুলতান সমুদ্রপথে বয়রুত থেকে খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়ে সৈন্যদের দুর্দশা লাঘব করেন।

একর অবরোধ

অতঃপর ফ্রাঙ্কগণ চিঠি লিখে বৃহৎ রোমের[২] অধিপতি পোপের (আরবীতে বাবা) কাছে, যিনি তাদের (ধর্মীয়) নেতা এবং যাঁর কথা আমাদের মধ্যে রসূলের নির্দেশ যেইরূপ গুরুত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে তাঁর কথাও তদ্রূপ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অনুরোধে চারদিক থেকে সাহায্য আসতে লাগল। এসব সৈন্য কাউন্ট হেনরীর সাথে যোগ দিলে তিনি পরিখা থেকে বেরিয়ে আসেন সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, যিনি এক সুশৃঙ্খল বাহিনী নিয়ে তাদের সম্মুখীন হন। তাঁর পুত্র আলী, খিজর ও গাজী সৈন্যবাহিনীর মধ্যভাগের নেতৃত্ব

---

[১] মিখদ।

[২] রুম-উল-কুবরা।

দেন; অন্যদিকে মিশরীয় সৈন্যদল নিয়ে তাঁর ভাই সাঈফুদ্দিন নেতৃত্ব দেন দক্ষিণাংশে; হামা ও সিঞ্জরের আমীর এবং অনান্য সামন্তরাজারা বামদিকে নেতৃত্ব দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সালাহউদ্দীন ঐদিন কোন এক অনিয়মজনিত পীড়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কেবল যুদ্ধের চিত্র দেখতে পান পাহাড়ের উপর স্থাপিত এক তাঁবু থেকে, যেখান থেকে যুদ্ধক্ষেত্রটি দেখা যায়। দীর্ঘক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলে, অবশেষে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফ্রাঙ্কগণ বিতাড়িত হয় তাদের ঘাঁটিতে। যদি সালাহউদ্দীন ঐদিন অসুস্থ না হতেন তাহলে যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেত। ফ্রাঙ্করাগণ এবার দুর্ভিক্ষে কষ্টভোগ করতে লাগল এবং শীতের আগমনে আশ্রয়ের জন্য তাদের জাহাজগুলোকে নিকটবর্তী গ্রিসের দ্বীপগুলোতে পাঠাতে বাধ্য হয় । আহমদ আল মাশতুবের পুত্র সাঈফুদ্দিন আলীকে নগরীর নেতৃত্ব দেয়া হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুর্বল সেনাবাহিনীকে পরিবর্তন করা হয়নি কিংবা সুলতানের আদেশ সত্ত্বেও স্থানটিতে নতুন রসদ নিয়ে আসার সুযোগ আমীররা গ্রহণ করেননি।

৯ এপ্রিল, ১১৯১ খ্রি.

বসন্তাগমনে ফ্রাঙ্কদের রণতরী বিপুল সংখ্যায় প্রত্যাবর্তন করে এবং পুনরায় একরের সৈন্যদলেল সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাধা প্রদান করে। কেবল একজন ডুবুরী চিঠিপত্র নিয়ে সুলতানের শিবিরে পৌঁছতে পারত। ৫৮৭ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল একরের সম্মুখের শিবিরস্থ ফ্রাঙ্কদের জন্য নতুন সাহায্য এসে পৌঁছে। বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী না হলেও তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত রাজাদের অন্যতম ফরাসীদের রাজা ফিলিপ (ফিলিপ অগাস্টাস) বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে অবতরণ করেন।

ইংল্যান্ডের রাজার আগমন [১৩ জমাদিউল আওয়াল, ৫৮৭ হি; ৮ জুন, ১১৯১ খ্রি.]

সালাহউদ্দিন শাফরা আম[১] নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছিলেন। তিনি তাঁর সামন্ত রাজাদের কাছে নতুন সৈন্য সাহায্য চেয়ে পাঠান, কিন্তু সেগুলো তাঁর কাছে পৌঁছানোর আগেই বিশটি জাহাজ বোঝাই সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মালিক আনকিলতারের[২] (ইংল্যান্ডের রাজা) উপস্থিতিতে ক্রুসেড যোদ্ধাদের শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ক্রুসেড যোদ্ধারা এবার বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করে, ফলে মুসলমানদের প্রতি তাদের অত্যাচার দ্বিগুণ বেড়ে যায়। কারণ মালিক আনকিলতার তাঁর সময়ে সাহস, প্রতারণা, কর্মতৎপরতা ও সহিষ্ণুতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সালাহউদ্দীন যখন তাঁর আগমন বার্তা পেলেন তখন তিনি রসদ ভর্তি একটি জাহাজ বয়রুত থেকে একরে প্রেরণ করতে আদেশ দেন[৩]। জাহাজটি পোতাশ্রয়ে পৌঁছানোর আগেই ক্রুসেড যোদ্ধাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। জাহাজের অধ্যক্ষ, জানদার বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি ইয়াকুব আল হালবী (আলেপ্পোর অধিবাসী) জাহাজটি শত্রুর হাতে পড়ার উপক্রম দেখে সেটির তলদেশে গিয়ে জাহাজটিকে ছিদ্র করে দেন। সমস্ত আরোহী ও দ্রব্যাদিসহ জাহাজটি সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়।

---

[১] একর থেকে তিন মাইল দূরে একটি গ্রাম; মুজামুল বুলদান।

[২] রয় দ্য অ্যাংলেটার।

[৩] তাদের আগমনের অল্পকাল পরেই ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের রাজাদ্বয় জ্বরে আক্রান্ত হন। তাঁদের অসুস্থতার কথা শুনে সালাহউদ্দীন অসুস্থতার সমগ্র সময় তাঁদেরকে লেবাননের বরফ, শীতল পানীয় এবং টাটকা ফল প্রেরণ করেছিলেন।

এবার প্রচণ্ড শক্তিতে একরের অবরোধ চলতে থাকে। নগররক্ষীরা কিছু সময়ের জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে যায় এবং সকল আক্রমণ প্রতিহত করে। সামন্ত রাজাদের প্রতিশ্রুত সাহায্য তখনো এসে পৌঁছেনি এবং উপর্যুপরি যুদ্ধ চালিয়েও সুলতান ক্রুসেড যোদ্ধাদের অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য করতে পারলেন না। যুদ্ধ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষে দুর্বল হওয়ায় প্রতিরোধকারীরা দু'বছরব্যাপী স্থায়ী যুদ্ধের জন্য দারুণ কষ্ট ভোগ করতে থাকে। দুর্গের প্রধান সেনাপতি মাশতুব নিরুপায় হয়ে ফিলিপ অগাস্টাসের শরণাপন্ন হন এবং তাঁকে বলেন, আমরা চার বছর এই নগরের মালিক ছিলাম। টলেমিয়াস দখল করার সময় আমরা পরিবার ও মালপত্রসহ সমস্ত অধিবাসীকে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যাওয়ার যথার্থ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম; আজকে আমরা আপনার কাছে নগরটি সমর্পণ করছি এবং খ্রিস্টানদেরকে আমরা যেসব শর্ত মঞ্জুর করেছিলাম, আমরাও তাই চাইছি। আরবগণ জেরুজালেম এবং টাইবেরিয়াসের যুদ্ধকালে ক্রুসেড যোদ্ধাদের নিকট থেকে গৃহীত সমস্ত নগর ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজা একরের একজন অধিবাসী বা সৈন্যেরও জীবনরক্ষা করতে অস্বীকার করেন। আরব আমীর শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে এবং নগরের ধ্বংসস্তূপের নীচে নিজেকে সমাধিস্থ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ফিরে আসেন। কিছুদিন আশাহীন যুদ্ধ চলে, কিন্তু দুর্ভিক্ষে নগররক্ষীদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল, অন্যদিকে নতুন সৈন্যের অভাবে সুলতানের বাহিনীও পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। অবশেষে নগরবাসী আরবগণ এই শর্তে আত্মসমর্পণ করে যে, ফ্রাঙ্কগণ কোন জীবনহানী ঘটাবে না, মুসলমনরাও তাদের পক্ষ থেকে প্রকৃত ক্রুশ কাষ্ঠসহ ১৬০০ বন্দিকে প্রত্যর্পণ করবে এবং ক্রুসেড যোদ্ধাদের নেতৃবর্গকে দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করবে।

আরবদেরকে হত্যা

মুক্তিপণ দিতে কিছুদিন বিলম্ব হওয়ায় এবং ইংল্যান্ডের সিংহহৃদয় রাজা নগর থেকে সৈন্যগণকে বের করে তাদের স্বজাতীয় ভাইদেরদের চোখের সামনে তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন ।

টলেমিয়াস অধিকার করতে ক্রুসেড যোদ্ধাদের ষাট হজার জীবন নষ্ট হয়েছিল।

মিখদ বলেন, 'অবশেষে বিজয়ী ক্রুসেড যোদ্ধাগণ টলেমিয়াসে এমন বিশ্রাম লাভ করে, সিরিয়ায় আগমনের পর থেকে তারা ঐরূপ বিশ্রাম করতে পারেনি। শান্তির আনন্দ, খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য, সাইপ্রাসের মদ এবং নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জ থেকে আগত রমণীরা সাময়িক সময়ের জন্য তাদের অভিযানের উদ্দেশ্য ভুলিয়ে দেয়।' যথারীতি বিশ্রামের পর তারা রিচার্ডের নেতৃত্বে অ্যাসকালন অভিমুখে যাত্রা করে। সালাহউদ্দীনও তাদের পাশাপাশি এগিয়ে যান এবং ১৫০ মাইল দূরত্বের মধ্যে হোমার বর্ণিত যুদ্ধের মত এগারটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আরসুফের যুদ্ধে সালাহউদ্দীন তাঁর আট হাজার সাহসী যোদ্ধাকে হারান। সৈন্যদল অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ায় তিনি যখন বুঝতে পারেন যে প্যালেস্টাইনের সবচেয়ে শক্তিশালী স্থানটিকে ক্রুসেড যোদ্ধাদের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না তখন তিনি দ্রুত অ্যাসকালনে ফিরে গিয়ে অধিবাসীদের সেখান থেকে সরিয়ে দেন এবং নগরটিকে ভূমিসাৎ করেন। রিচার্ড এসে বসবাসের অনুপোযোগী এক বিশাল দুর্গ ও নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান এবং তিনি আরও কিছু দেখতে পান। তিনি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও অমিতবিক্রমসম্পন্ন একজন লোককে তাঁর বিপক্ষে দেখতে পান ।

রিচার্ডের শান্তি স্থাপনের অভিপ্রায়

সালাহউদ্দীনের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে রিচার্ড শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠলেন। নিষ্ফল, বিরক্তিকর ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তিনি নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং ব্যস্ত হয়ে

উঠেছিলেন তাঁর বিশৃঙ্খল রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে। তদনুসারে তিনি সুলতানের ভাই সাঈফুদ্দিনের (আল-মালিক আল-আদিল) সাথে সাক্ষাৎকার দাবি করে দূত প্রেরণ করেন। দুই রাজপুরুষ মিলিত হন এবং হানফেরীর[১] পুত্র (থরানের হামফ্রী) দোভাষীর কাজ করেন । রিচার্ড শান্তি স্থাপনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে যে প্রস্তাবিত শর্ত উল্লেখ করেন তা অসম্ভব বিবেচিত হয় এবং সাক্ষাৎকারে কোন ফল লাভ হয়নি। মন্টফেরাটের মার্কুইস রিচার্ডের আচরণে বিরক্ত হয়ে সুলতানের কাছে একজন দূত প্রেরণ করে সিডন ও বেইরুট দখলে রাখার শর্তে নিজের থেকেই শান্তি স্থাপন করতে চান। সুলতান এই শর্ত মেনে নিলেন; কথা থাকল যে মার্কুইস নিজের অঙ্গীকারটি আগে কার্যকর করবেন। ইংল্যান্ডের রাজার নিকট থেকে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে নতুন দূতেরা আসেন, সেই সাথে তাঁর ভাই ও বন্ধু আল-মালিক আল-আদিল এবং সুলতানের কাছে চিঠিপত্রও আসতে থাকে। এই সময় প্রস্তাব করা হয় যে, ক্রুসেড যোদ্ধাদেরকে সমুদ্রতীরে তাদের অধিকৃত নগরগুলো হাতে রাখার অনুমতি দিতে হবে এবং জেরুজালেমসহ প্রকৃত ক্রুশকাষ্ঠ তাদেরকে প্রত্যর্পণ করতে হবে। সুলতান দৃঢ়তার সাথে জেরুজালেম প্রত্যর্পণের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শান্তি স্থাপিত হলে তিনি ক্রুশকাষ্ঠ ফিরিয়ে দিতে রাজী হন।

আলাপ-আলোচনা

ইংল্যান্ডের রাজা পুনরায় আল-মালিক আল-আদিলের নিকট নতুনভাবে শান্তি প্রস্তাব করেন এবং সুলতান ও তাঁর মন্ত্রণা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে উভয়ে একটি চুক্তিতে আসেন। প্রস্তাবিত চুক্তির শর্ত হল, রিচার্ডের বোন সিসিলের রাজার বিধবা পত্নী আল-মালিক আল-আদলের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবেন; রিচার্ড সমুদ্রোপকূলে তাঁর অধিকৃত নগরগুলো প্রদান করবেন বোনের যৌতুক হিসেবে, সুলতান তাঁর বিজিত নগরগুলো তাঁর ভাইকে প্রদান করবেন; উভয় ধর্মাবলম্বীদের জন্য উন্মুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ নগরী হিসেবে স্বামী ও স্ত্রী জেরুজালেমের মালিক হবেন; সাধারণ বন্দি বিনিময়, খ্রিস্টানদের নিকট ক্রুশ প্রত্যর্পণ এবং হসপিটালার ও টেমপ্লারদের পূর্বোক্ত সুযোগ-সুবিধা বহাল থাকবে। এসব প্রস্তাবে সুলতান এতকাল পর্যন্ত পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা দেখতে পান এবং তৎক্ষণাৎ তা অনুমোদন করেন। রিচার্ডের পুরোহিতরা চুক্তিটি সম্পাদন করতে দিলে সম্ভবত উপসাগরীয় অঞ্চলে তা খ্রিস্টান ও ইসলামী সাম্রাজ্যের বিরোধের ওপর সেতুবন্ধনের কাজ করত। সাঈফুদ্দিনের মত সাহসী ও মহানুভব বীরপুরুষের সাথে একজন খ্রিস্টান রাজকুমারীর বিয়ের প্রস্তাবে তাঁরা শোরগোল বাধান; রিচার্ডকে ভয় দেখান সমাজচ্যুত করার এবং সিসিলির প্রাক্তন রানীর মনে ধর্মীয় ভয় ও কুসংস্কার জাগিয়ে তোলেন। তাঁদের হুমকিতে ভীত হয়ে রিচার্ড তাঁর ভাই ও বন্ধুর কাছে দূত প্রেরণ করে তাঁকে ধর্মান্তরিত হতে অনুরোধ করে। অবশ্য এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়।

কনডারকে হত্যা [১ মে, ১৯৯২ খ্রি.]

ইতিমধ্যে মার্কুইসের নিকট থেকে নতুন দূতের আগমন ঘটে। ইংল্যান্ডের রাজা তখন তাঁর অযোগ্য মিত্রের হাত থেকে পরিত্রান পেতে ম্যাসিয়াটে অ্যাসাসিনদের গোত্র প্রধানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন; দু'জন ফিদায়ীকে কনরাডের ওপর লেলিয়ে দেয়া হয় এবং ৫৮৮ হিজরির ১৬ রবিউস সানী তারিখে তিনি নিহত হন।[২]

---

[১] বাহাউদ্দিন ইবনে শাদ্দাদ বলেন, শান্তি স্থাপনের দিন আমি তাঁকে দেখেছিলাম; তিনি প্রকৃতই সুদর্শন, তবে তাঁদের প্রথামত শ্মশ্রুমণ্ডিত ছিলেন।

[২] ভন হ্যামার তাঁর 'হিস্ট্রি অব দ্য অ্যাসাসিনস' গ্রন্থে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে, ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ডের প্ররোচনাতেই মন্টফেরাটের মার্কুইস কনরাড নিহত হয়েছিলেন।

রিচার্ডের নেতৃত্বে জেরুজালেমের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি অভিযানের অবসান ঘটে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে এবং এতে তাঁর প্যালেস্টাইন ত্যাগের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। তিনি সুলতানের কাছে দূত প্রেরণ করেন নতুন প্রস্তাব দিয়ে, যাতে পূর্ববর্তী দাবিসমূহ প্রত্যাহার করা হয়। সুলতানের নিকট ইংল্যান্ডের রাজার বার্তা ছিল, আমি আপনার স্নেহ ও বন্ধুত্ব কামনা করি, এ দেশে প্রভুত্ব করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি জানি আপনি অবশ্য আপনার আরো লোকক্ষয়ে যেমন অনিচ্ছুক, আমিও তেমনি আমার আরো লোক হারাতে অনিচ্ছুক। আমি আমার ভাগ্নে কাউন্ট হেনরীকে[১] আমার অধিকৃত দেশ প্রদান করেছি এবং তাকে এখন আমি আপনার নিকট সমর্পণ করছি, সে আপনার আজ্ঞা পালন করবে এবং আপনার পূর্বাঞ্চল অভিযানে আপনার সঙ্গে যাবে। আমি আপনার কাছে গির্জাটি (জেরুজালেম) চাইছি।

দেশে শান্তি আনয়ন এবং সৈন্যদেরকে বিশ্রামদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মন্ত্রণা পরিষদের পরামর্শে সুলতান অনুকূল উত্তর পাঠান। জেরুজালেমের সমস্ত দাবি নিশ্চিতভাবে প্রত্যাহার করে অক্ষতভাবে অ্যাসকালন, দারুম ও গাজা– এই তিনটি নগর এবং সর্বজনীন শান্তির আর্জি জানিয়ে কাউন্ট হামফ্রের পুত্র সমভিব্যাহারে একই দূত ইংল্যান্ডের রাজার নিকট হতে উপঢৌকনাদি নিয়ে পুনরায় সুলতানের শিবিরে হাজির হন। সুলতান উত্তর দেন যে, এন্টিয়কের রাজার সাথে তিনি আলাদাভাবে শান্তি স্থাপন করবেন এবং অ্যাসকালনের পরিবর্তে রিচার্ডকে তিনি লিডডা নগরটি দিতে ইচ্ছা পোষণ করেন, কিন্তু অন্য নগরগুলো নয়। ক্রুসেড যোদ্ধারা বেইরুট অভিযান করছে জানতে পেরে সুলতান তাঁর শিবির তুলে দেন এবং পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। আকস্মিক আক্রমণ দ্বারা জাফা অধিকৃত হয়, কিন্তু দুর্গটিকে রিচার্ড উদ্ধার করেন। ইংল্যান্ডের রাজা আবার আল মালিক আল আদলের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। তাঁরা তাঁর শিবিরে এলে তিনি সুলতানের উচ্চসিত প্রশংসা করেন। তারপর প্রধান আমীরকে বলেন, 'আল্লাহর নামে শান্তি স্থাপন করতে' তিনি যেন সুলতানকে অনুরোধ করেন। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে সুলতান রিচার্ডকে টায়ার থেকে সিজারিয়া পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল দেয়ার প্রস্তাব দেন। রিচার্ড জাফা ও অ্যাসকালন চান। সালাহউদ্দীন জাফা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু কোন শর্তেই অ্যাসকালন দিতে রাজী হলেন না।

শান্তিচুক্তি সম্পাদিত [২২ শাবান, ৫৮৮ হিঃ; ২ সেপ্টেম্বর, ১১৯২ খ্রি.]

অবশেষে ইংল্যান্ডের রাজা অ্যাসকালনের দাবি প্রত্যাহার করেন এবং উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। অতঃপর এই মর্মে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয় যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের রাজ্যসমূহ সমানভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করবে। উভয় জাতির লোক নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে পরস্পরের রাজ্যে যাতায়াত করতে পারবে। এ খবর শুনতে ঐদিন বহু লোক সমবেত হয় এবং উভয়পক্ষেই অনুভূত হয় চরম আনন্দ। সাহায্যদানের উদ্দেশে দূরবর্তী দেশগুলো থেকে যেসব নতুন সৈন্য আসছিল তাদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয় এবং তারা প্রস্থান করে। রিচার্ড অবিলম্বে স্বদেশে ফিরে যান। পরবর্তী ঘটনা ইংল্যান্ডের ইতিহাসের সব ছাত্রেরই জানা আছে।

তৃতীয় ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি

এভাবে তৃতীয় ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি ঘটে। এতে অগণিত মানুষ ধ্বংস হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের হাজার হাজার গৃহ জনশূন্য হয়ে যায়; জার্মানি লজ্জাকরভাবে হারায় তার একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাটকে। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড হারায় তাদের শীর্ষস্থানীয় বীরপুরুষদের। তাদের একমাত্র লাভ হয় একর অধিকার।

---

[১] সাম্পানের কাউন্ট হেনরি। গাই দ্য লুসিগানের মৃত্যুর পর সাইবিলা এই কাউন্টকে বিয়ে করেছিলেন এবং এভাবে তিনি জেরুজালেম রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

রিচার্ডের প্রস্থানের পর সালাহউদ্দীন কিছুদিন জেরুজালেমে বিশ্রাম নেন, তারপর উপকূলবর্তী দুর্গগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সেগুলো সংস্কারের জন্য অশ্বারোহী পরিবেষ্টিত হয়ে যাত্রা করেন সমুদ্রোপকূলে। জেরুজালেমে তিনি তাঁর কর্মসচিব ও জবিনীকারের পরিচালনায় একটি হাসপাতাল ও একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন।

সালাহউদ্দীনের মৃত্যু [৪ মার্চ, ১১৯৩ খ্রি.]

অতঃপর তিনি দামিস্কে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৫৮৯ হিজরির ২৭ সফর, বুধবার তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত পরিবারবর্গের সাথে তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। একজন মুসলিম লেখক বলেন, তাঁর মৃত্যু দিবস ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এমন একটি বিপর্যয়। প্রথম চার খলিফার মৃত্যুর পর তারা এরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হননি। প্রাসাদ, সাম্রাজ্য এবং সারা দুনিয়া শোকে অভিভূত হয়েছিল; সমগ্র নগরী শোকে নিমজ্জিত হয় এবং ক্রন্দন ও বিলাপ করতে করতে তাঁর লাশের অনুগমন করে।

তাঁর চরিত্র

এভাবে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও দুঃসাহসী নরপতির জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ধর্মনির্বিশেষে দরিদ্রদের মধ্যে বিপুল অর্থ বিতরণ করেছিলেন। যে দূত বাগদাদে সুরতানের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছিল, সে সঙ্গে এনেছিল তাঁর বর্ম, অশ্ব, একটি দীনার ও ছত্রিশ দিরহাম, যা ছিল তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি। সমসাময়িক লোকদের বিচারেই তাঁর চরিত্রের মূল্যায়ন হতে পারে, যাঁরা তাঁকে কোমল হৃদয়, দয়ালু, হিতৈষী, অমায়িক, ধৈর্যশীল ও সংযমী বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন বিদ্বান ও ধার্মিকদের বন্ধু, তাঁদেরকে তিনি দরবারে গ্রহণ করতেন এবং ব্যবহার করতেন মহানুভবতা সহকারে। কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি স্বীকৃতির চিহ্ন না নিয়ে কখনো তাঁর দরবার থেকে চলে যেতেন না। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল দ্বারা পরিপূর্ণ করেছিলেন। সুলতানের উজির আল কাজী আল ফাজিল[১] তিনজন আইয়ুব বংশীয় সুলতানের অধীনে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিও সালাহউদ্দীনের সহিত জ্ঞান ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিযোগিতা করতেন। সালাহউদ্দীনের মন্ত্রণা পরিষদ কেবল কারাকুশ, হুসামউদ্দিন, মাশতুবের ন্যায় বীরদের নিয়েই গঠিত ছিল না– কাজী, সুলতানের কর্মসচিব কাতিব ইমামুদ্দিন ওরফে আলহ (ঈগল), পেশাগত ঢিলা পোশাকের পরিবর্তে প্রায়শই সৈনিকের উর্দিধারী আইনজ্ঞ আলহাক্কারী এবং আরও অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর মন্ত্রণা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন[২]।

---

[১] . আবু আলী আবদুর রহিম ওরফে মজিরউদ্দিন বা ধর্মের আশ্রয়স্থল এবং আল-কাজী আল-ফাজিল বিজ্ঞ কাজী। তিনি লাখিম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত একজন বাঁটি আরব, অ্যাসকালনে তাঁর জন্ম হয় এবং তিনি ছিলেন এক কাজী পরিবারের লোক।

[২] প্রসিদ্ধ পর্যটক আবদুল লতিফ রিচার্ডের সাথে সন্ধির পর সালাহউদ্দীনকে দেখেছিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে এই বলে তাঁর উচ্চসিত প্রশংসা করেছেন যে, তার মুখাবয়ব প্রত্যেকের হৃদয়ে ভালবাসা ও সম্মানের উদ্যেক করত। তিনি আরও বলেন, যে প্রথম সন্ধ্যা আমি তাঁর সাহচার্যে অতিবাহিত করেছিলাম তখন তাঁকে আমি বিজ্ঞজন পরিবেষ্টিত দেখেছিলাম, যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা নিয়েই আলোচনা করেছিলেন। তিনি আনন্দের সহিত তাঁদের আলোচনা শুনেছিলেন এবং প্রায়ই নিজে আলোচনায় যোগ দিতেন। ঠিক তখনই তিনি জেরুজালেমের প্রাচীর ও তার চারদিকে পরিখা নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কাজের তত্ত্বাবধান করতেন এবং প্রায়শই নিজে কাঁধে করে পাথর বয়ে নিয়ে যেতেন। তিনি সূর্যোদয়ের আগেই সেখানে যেতেন এবং মধ্যাহ্নে ফিরে আসতেন আহারের জন্য, এরপর তিনি বিশ্রাম করতেন। আসরের নামাজের সময় তিনি অশ্বারোহণে আবার সেখানে যেতেন এবং ফিরে আসতেন মশাল জ্বেলে। রাতের অধিকাংশ সময় তিনি পরবর্তী দিনের কাজকর্ম নির্বাহ করতেন। উক্ত লেখক সৈন্যদের উন্নতি বিধানে সালাহউদ্দীনের আগ্রহের কথা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে একরের সম্মুখস্থ শিবিরে বহু দূরব্যাপী একটি বাজার ছিল, যাতে অশ্বচিকিৎসকদের জন্য তাঁবু ও চালা ব্যতীত সাত হাজারের বেশি দোকান এবং মাগরিবীগণ (মরক্কোর অধিবাসী) কর্তৃক পরিচালিত এক হাজার স্নানাগার ছিল।

অধ্যায়-২৩
আব্বাসীয় বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]
[৫৮৯-৬৬১ হিজরি; ১১৯৩-১২৬৮ খ্রিস্টাব্দ]
তাতারদের অভ্যুদয়

সালাহউদ্দীনের পুত্রগণ : আল-মালিক আল-আদলের উত্থান : চতুর্থ ক্রুসেড : আল-মালিক আল-আদিলের পুত্রগণ : প্রাচ্যদেশে ইসলামী সাম্রাজ্যের সাধারণ মূল্যায়ণ : খিলাফত : খলিফা আজ জাহির : খলিফা আল-মুসতানসির : খলিফা আল : মুসতাসিম : তাতারদের অভ্যুদয় : বাগদাদের পতন।

সালাহউদ্দীনের পুত্রগণ : সাম্রাজ্য ভাগাভাগি : আফজাল আজিজ জাহির

দুর্ভাগ্যক্রমে সালাহউদ্দীন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকার সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করে যাননি এবং এই অদূরদর্শিতা সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ হয়, যা এক্ষণে তাঁর তিন অগ্রজ পুত্রের অধীনে তিনটি স্বাধীন রাজ্যে ভাগ হয়ে যায়। আলী ওরফে আল মালিক আল-আফজাল (আবুল হাসান নূরুদ্দিন) লাভ করেন সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন এবং সাম্রাজ্যের রাজধানী দামেশক তাঁর অধিকারে থাকায় ভাইদের ওপর তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ওসমান ওরফে আল-মালিক আল-আজিজ (আবুল ফাতহ ইমামুদ্দিন) পিতার জীবদ্দশায় ছিলেন মিশরের সেনাপতি, তিনি ঐ দেশের রাষ্ট্রশাসক বলে ঘোষিত হন; অন্যদিকে গাজী ওরফে আল-মালিক আজ-জাহির (গিয়াসউদ্দিন) লাভ করেন আলেপ্পো প্রদেশ। কারাক ও শবেকের অধিপতি এবং সালাহউদ্দীনের ভাই আল-মালিক আল-আদিল, যিনি সৈন্যদের মধ্যে ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়, তিনি মেসোপটিমিয়ার কিয়দংশ এবং ইউফ্রেটিস নদীর নিকটর্বতী কয়েকটি নগর দখল করেন। শিরকুহর পুত্রগণ এমেসায় বহাল হন এবং পরিবাররের অন্যান্য অনুজ পুত্ররা গুরুত্বপূর্ণ জায়গীর লাভ করেন। সালাহউদ্দীনের আরেক ভাই শাসন করেন ইয়েমেন। মহান সুলতানের পুত্ররা ঐক্যবদ্ধ থাকলে সম্ভবত সাম্রাজ্যের বিভাজন সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের বংশধরদেরকে উত্তরধিকার সূত্রে ক্ষমতা দিয়ে যেতে পারতেন। তাঁদের বিবাদ ও অযোগ্যতাই আল আদিলকে তাঁর ভাইয়ের রাজ্য দখল করতে সাহায্য করেছিল। আফজাল ও আজিজের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হলে পূর্বোক্ত ব্যক্তি দামেশক থেকে বিতাড়িত হন, যেটি অতঃপর আদিলকে প্রদান করে আফজাল সারখাদ নগরটি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। একটি শিশুপুত্র[১] রেখে আজিজের মৃত্যু হলে আফজালকে আহ্বান করা হয় তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতে। অতঃপর আফজাল ও আদিলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে আদিল আফজাল ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মনসুর উভয়কেই মিশর থেকে বিতাড়িত করেন। তাঁরা কিছু জায়গীর পান মেসোপটেমিয়ায়, যেখানে তাঁরা এবং তাঁদের বংশধরগণ বসবাস করতে থাকেন।

---

[১] আল-মালিক-উল মনসুর মুহম্মদ।

আদিলের সিংহাসনারোহণ [২ ফেব্রুয়ারি, ১২০০ খ্রি.–১২০৭ খ্রি.]
৫৯৬ হিজরির ১৬ রবিউস সানী আদিল কায়রোতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অচিরেই তিনি সিরিয়া, পূর্ব মেসোপটেমিয়া, খিলাত ও বৃহত্তর আর্মেনিয়ার অধিকার লাভ করেন এবং ৬১২ হিজরিতে তিনি হন ইয়েমেনের অধিপতি, যে রাজ্যে তিনি পৌত্র ইউসূফকে তথাকার শাসনকর্তা হিসেবে[১] প্রেরণ করেন।

১২১৫-১৬ খ্রি.
সাঈফুদ্দিনকে (আল-মালিক আল-আদিল) অগাধ জ্ঞান, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, অশেষ বিচক্ষণতার গুণে গুণান্বিত, সর্বদা সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, আচার-আচরণে ধার্মিক এবং কর্তব্য পালনে সুদৃঢ় রাষ্ট্রপ্রধান রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাইয়ের মতই তিনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। আল আদিল এখন সিরিয়া, আপার মেসোপটমিয়া, মিশর ও আরব দেশ নিয়ে তাঁর সুবিখ্যাত ভাইয়ের সাম্রাজ্যের মতই এক বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠেন। সমস্ত ধর্মীয় মঞ্চ থেকে তাঁর নামে খুৎবা পাঠিত হয় এবং মুদ্রায় অঙ্কিত হয় তাঁর নাম।

চতুর্থ ক্রুসেড
সালাহউদ্দীনের মৃত্যুর দু'বছর পর পোপ তৃতীয় সেলেস্টাইন আরেকটি ধর্মযুদ্ধের উস্কানি দেন। কিন্তু সালাহউদ্দীন ও রিচার্ডের সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই দানবীর যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল। এ সময় থেকে ইসলাম ও খ্রিস্টান জগতের মধ্যে লড়াই ছিল তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বিরতিপূর্ণ। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ থাকা সত্ত্বেও ফ্রাঙ্কদের এই আক্রমণ পূর্ববর্তী আক্রমণগুলোর মতই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মিখদ বলেন, সিরিয়ায় একটি ক্ষুদ্র দুর্গ দখলের চেষ্টায় পাশ্চাত্যের সমস্ত শক্তির অপপ্রয়োগ করা হয়েছিল। সালাহউদ্দীনের সাথে সম্পাদিত যে সন্ধিপত্র সিরিয়ার তৎকালীন খ্রিস্টান রাজারা শপথপূর্বক গ্রহণ করেছিলেন তা নিদারুণভাবে ভঙ্গ করে ক্রুসেড যোদ্ধাদের এক বিশাল বাহিনী ফিনিশীয় উপকূলে অবতরণ করে বেইরুট অবরোধ করে।

তিবনিন অবরোধ [৫৯৪ হি; ১১৯৭-৯৮ খ্রি.,১২০০ খ্রি.]
তখন পর্যন্ত সালাহউদ্দীনের পুত্ররা নিজেদের রাজ্যে বহাল ছিলেন, কিন্তু ইসলামের সবচেয়ে অভিজ্ঞ বীর আল-মালিক আল-আদিল দ্রুত তাঁর রাজ্য থেকে ধাবিত হন ফ্রাঙ্কদের প্রতিরোধ করতে। ঝটিকা আক্রমণে তিনি জাফা দখল করে নেন, অন্যদিকে ক্রুসেড যোদ্ধারা তখন তিবনীন অবরোধ করছিল। অবরোধ শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তারা বাধ্য হয় শান্তি প্রার্থনা করতে। তদনুসারে তিন বছরের সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধর্মযুদ্ধ ক্রুসের সৈন্যদের নৃশংসতম অমিতাচার দ্বারা বিশিষ্টতা লাভ করেছিল।

পঞ্চম ক্রুসেড
তিন বছর পর তৃতীয় ইনোসেন্ট 'শুধুমাত্র অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে' একজন ইউরোপীয় লেখক বলেন, তাঁর বিলাসিতা ও লালসা চরিতার্থ করার জন্য আরেকটি ক্রুসেড ঘোষণা করেন এবং খ্রিস্টান জগতের রাজাদেরকে এতে যোগদান করতে আহ্বান জানান। ইংল্যান্ডের রিচার্ড পোপের কোন প্ররোচনাতেই কর্ণপাত করতে অস্বীকার করেন। রোমান ধর্মগুরুর দূতদের প্রতি তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, তোমরা আমার তিন কন্যা অহঙ্কার, লালসা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা পরিত্যাগ করতে উপদেশ দাও। আমি তাদেরকে সবচেয়ে উপযুক্ত লোকদের নিকট সম্প্রদান করেছি– আমার অহঙ্কার টেমপ্লারসের

[১] আল-মালিক আল-মাসউদ (সৌভাগ্যবান রাজকুমার) নামে অভিহিত সালাহউদ্দিন আবুল মুজাফফর।

নাইটদেরকে, আমার লালসা সিসটুকসের সন্ন্যাসীদেরকে এবং আমার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দিয়েছি ধর্মযাজকদেরকে।

কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য রাজারা তাঁর মত জ্ঞানী ছিলেন না, ফলে নতুনভাবে প্রাচ্যদেশ আক্রমণের জন্য সহসা এক বিশাল বাহিনী গড়ে ওঠে। ইসলামের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে, সিরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান না চালিয়ে তারা কনস্ট্যান্টিনোপাল আক্রমণ করে। ইবনুল আসির কর্তৃক এই ক্রুসেডের বর্ণনার সাথে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের বর্ণনার বিস্ময়কর মিল রয়েছে। কীভাবে জবর দখলকারী সম্রাট তাঁর ভাইকে[১] অন্ধ করে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন; প্যালেস্টাইন আক্রমণের জন্য সংগৃহীত বাহিনীর সাথে শেষোক্ত জনের অল্পবয়স্ক পুত্র[২] কীভাবে পালিয়ে যায়; কীভাবে তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে তারা (সৈন্যবাহিনী) অন্ধ ও পদচ্যুত বাইজান্টাইন সম্রাটের সাহায্যার্থে প্রত্যাবর্তন করে তা তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তিনি কয়েকটি চমৎকার বাক্যে কনস্ট্যান্টিনোপল নগরের আত্মসমর্পণ, এতে অগ্নি সংযোগ এবং অতঃপর ক্রুশের যোদ্ধাগণ কর্তৃক খ্রিস্টান নগরীর ওপর নিষ্ঠুরতা সম্পাদনের কথা বর্ণনা করেন। যে অগ্নিকাণ্ডে কনস্ট্যান্টিনোপলের এক চতুর্থাংশ ভস্মীভূত হয়,[৩] তা শুরু হয়েছিল কয়েকজন ফ্লেমিশ তীর্থযাত্রীর ধর্মান্ধতায়, যারা মসজিদ বা সিনাগগে অংশীদার কিংবা পুত্রহীন ঈশ্বরের উপাসনা দেখে বিরক্ত হয়েছিল। তাদের বিবাদের একমাত্র কার্যকরী পন্থা ছিল তরবারির সাহায্যে বিধর্মীদেরকে আক্রমণ করা এবং তাদের বাসস্থান জ্বালিয়ে দেয়া, কিন্তু বিধর্মী ও তাদের কিছু খ্রিস্টান প্রতিবেশী স্ব-স্ব জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় সাহসের সাথে এগিয়ে এসেছিল; আর ধর্মান্ধতার ফলে যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়েছিল তাতে ধ্বংস হয়েছিল সবচেয়ে রক্ষণশীল ও নির্দোষ গৃহগুলো। দিনরাত আটদিনব্যাপী পোতাশ্রয় থেকে প্রপনিটস পর্যন্ত নগরের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ ও জনবহুল এলাকায় তিন মাইল জুড়ে এই অগ্নিশিখা বিস্তার লাভ করেছিল।[৪]

বলপূর্বক নগরটি দখল করে ক্রুসেড যোদ্ধারা যে গ্রিককে সামনে পায় তাকেই হত্যা করে। বৃদ্ধ ভিলাহার ডুইন বলেন, স্ত্রীলোক ও অল্পবয়সী বালক-বালিকাদেরকে হতবুদ্ধি হয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে, ভয়ে কম্পিত ও অর্ধমৃত হতে, করুণভাবে বিলাপ করতে এবং দয়া-ভিক্ষা করতে দেখা– এক অতি ভয়াবহ দৃশ্য ছিল। মিলস ও গিবনের মতে, তীর্থযাত্রীদের দ্বারা সংঘটিত নিষ্ঠুরতার জন্য পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট বিশেষ আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন এবং ঐ নিষ্ঠুরতা ছিল বর্ণনাতীতভাবে ভয়াবহ। ক্রুসেড যোদ্ধারা ছিল সহানুভূতির প্রতি নিরাসক্ত। কয়েক দিন ধরে তারা কনস্ট্যান্টিনোপলের ভেতরে ও বাইরে অত্যাচার ও লুণ্ঠনের সবচেয়ে শোচনীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। মিখদ বলেন, গ্রাম, গির্জা ও ঘরবাড়ি সমস্তই লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল। দিশেহারা জনতার ভিড়ে রাস্তাঘাট ছেয়ে গিয়েছিল এবং বিপদের মধ্যে দিয়ে ভীতি ও ক্লান্তিতে ম্যুহমান হয়ে তারা হতাশায় ক্রন্দনধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাইজান্টাইন ঐতিহাসিক নাইসটাস, যাঁর কন্যা অতিকষ্টে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল। বর্বরতায় তুর্কীদেরও অতিক্রম করে গেছে বলে তিনি ক্রুসেড যোদ্ধাদেরকে ভৎর্সনা করেন। তিনি তাদেরকে সালাহউদ্দীনের সৈন্যদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, জেরুজালেমে আধিপত্যের সময় তারা বর্ষীয়সী মহিলা কিংবা কুমারীদের প্রতি অশিষ্ট আচরণ করেনি বা অগ্নি, তরবারি, ক্ষুধা ও বস্ত্রহীনতা দ্বারা খ্রিস্টানদেরকে কষ্ট দেয়নি।[৫]

---

[১] আইজাক অ্যাংগেলাস।

[২] আলেকজিয়াস।

[৩] ইবনুল আসির।

[৪] গিবন।

[৫] মিখদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯৫।

মণিমুক্তাখচিত পাত্রগুলোর মণিমুক্তা তুলে নিয়ে তারা সেগুলোকে পানপাত্রে রূপান্তরিত করেছিল; যে টেবিলের ওপর তারা খেলা ও ভোজন করত সেগুলো ছিল যীশুখ্রিস্ট ও সাধু পুরুষদের প্রতিকৃতিতে আচ্ছাদিত এবং খ্রিস্টীয় উপাসনার সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় বস্তুগুলোকে তারা পদদলিত করেছিল। সেন্ট সোফিয়ার গির্জায় সোনার ঝালরের জন্য পবিত্র স্থানের প্রশস্ত পর্দা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল এবং শিল্প ও ঐশ্বর্যের স্মৃতিস্তম্ভ বেদীটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে বিজেতাগণ তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। তাদের খচ্চর ও অশ্বগুলো ঢালাই রৌপ্য ও গিলটি করা ভাস্কর্য দিয়ে বোঝাই করা হয়েছিল, যেগুলো তারা তুলে নিয়েছিল দরজা ও বেদী থেকে। বোঝার ভারে পশুগুলো হোঁচট খেয়ে পড়ায় অধৈর্য চালকদের দ্বারা তারা ছুরিকাবিদ্ধ হয়েছিল এবং তাদের অপবিত্র শোণিত ধারায় গির্জার পবিত্র প্রাঙ্গণ প্লাবিত হয়েছিল। শয়তান কন্যা নামে অভিহিতা দৈত্যের অনুসারিণী ও ভৈরবী রূপিনী এক মহিলা প্রধান ধর্মাচার্যের আসনে বসে গির্জায় নেচে-গেয়ে প্রাচ্য দেশীয় স্তোত্র ও শোভাযাত্রাকে উপহাস করছিল।

ষষ্ঠ ক্রুসেড [১২১৬-১৭ খ্রি.]

১২১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় ইনোসেন্ট ষষ্ঠ ক্রুসেড ঘোষণা করেন– স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সকলেই পবিত্র বাহিনীতে তালিকাভুক্ত হয়। পরিকল্পিতভাবে প্রাচ্যদেশ আক্রমণ করার জন্য হাঙ্গেরীর রাজা, অস্ট্রিয়া ও ব্যাভেরিয়ার ডিউকদ্বয় এবং নিম্ন জার্মানির রাজন্যবর্গ তাঁদের সৈন্যবাহিনী একত্রিত করেন। দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক, যাদের অধিকাংশই ছিল জার্মান, প্রথমে তারা সিরিয়ায় অবতরণ করে এবং সমুদ্রোপকূলের অংশ বিশেষ ধ্বংস করার পর তারা মনোযোগ দেয় মিশরের দিকে।

আল মালিক আল আদিলের মৃত্যু
[৭ জমাদিউল রবি, ৬১৫ হি.; ২১ আগস্ট, ১২১৮ খ্রি.]

নীলনদের পূর্ব মোহনায় উপনীত হয়ে তার ডামিয়েটা অবরোধ করে। আল-মালিক আল-আদিল উত্তর সিরিয়া থেকে মিশরের দিকে দ্রুত প্রস্থানকালে দামিশকের সন্নিকটে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর রাজত্বের প্রায় বিশ বছর কোনক্রমেই অগৌরবের নয়। তিনি বারবার ফ্রাঙ্কদের পরাজিত করেন এবং স্থল ও সমুদ্রপথে তাদের আক্রমণগুলোকে ব্যর্থ করে দেন।

আদিলের পুত্রগণ

তাঁর পুত্রগণ তাঁর সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করে নেন। আল-মালিক আল-কামিল[১] (আবুল মা'আলী নাসিরউদ্দিন) উপাধিধারী মুহম্মদ লাভ করেন মিশর। আল-মালিক আল-মুয়াজ্জাম[২] (সরফউদ্দিন) উপাধিধারী দ্বিতীয় পুত্র ঈশা পান মিশর সীমান্তে এমেসা থেকে আল আরিশ পর্যন্ত বিস্তৃত সিরিয়া রাজ্য প্যালেস্টাইন, জেরুজালেম, আল কারাক প্রভৃতি যার অন্তর্ভুক্ত ছিল; অন্যদিকে আল-মালিক আল-আশরাফ[৩] (মুজাফফরউদ্দিন) উপাধিধারী মুসা আলেপ্পো রাজ্যের অধিকার লাভ করেন।

---

[১] নৈতিক দিক দিয়ে নিখুঁত নরপতি, ধর্মের সহায়ক।

[২] শক্তিশালী নরপতি, ধর্মের গৌরব।

[৩] সম্ভ্রান্ত নরপতি, ধর্মে বিজয়ী।

ডামিয়েটা অবরোধ [১০ রমজান, ৬১৬ হি; ১৯ নভেম্বর, ১২১৯ খ্রি.]

আঠার মাস অবরোধের পর ডামিয়েটা ক্রুসেড যোদ্ধাদের হস্তগত হয় এবং প্রাথমিক যুগের ক্রুসেড যোদ্ধারা প্রথম যখন জেরুজালেম প্রাকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই একই নির্মম মনোবৃত্তি নিয়ে তারা নগরে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রতিহিংসাবৃত্তি বৃথাই ঘুরে বেড়ায় শিকারের সন্ধানে। ডামিয়েটা তখন এক বিশাল গোরস্থান; অবরোধের প্রারম্ভে যেখানে সত্তর হাজারেরও বেশি লোক ছিল, সেখানে মাত্র তিন হাজার লোক অবশিষ্ট ছিল তাদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী শোনাতে। এমনকি এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যও ক্রুসেড যোদ্ধারা হত্যোদম করতে পারেনি বা পারেনি দয়ার উদ্রেক ঘটাতে এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জীবিত লোকগুলোকেও তারা নৃশংসভাবে হত্যা করে। অতঃপর তারা কায়রোর ওপর আপতিত হয়; ভাইদের নিকট থেকে নতুন সৈন্য সাহায্য পেলেও ক্রুসেড যোদ্ধাদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের সাথে সফলভাবে লড়াই করতে কামিল নিজেকে অসমতুল্য মনে করেন। তদনুসারে ডামিয়েটা ছেড়ে দেয়ার শর্তে তিনি তাদেরকে সালাহউদ্দীনের সমস্ত বিজিত স্থান ফিরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু মিশর বিজয় নিশ্চিত মনে করে তারা কামিলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

ফ্রাঙ্কদের পরাজয় [১৯ রজব, ৬১৯ হি; ৮ সেপ্টেম্বর, ১২১২ খ্রি.]

এই সময় নীলনদের পানি বৃদ্ধি পাচ্ছিল; আরবরা বাঁধগুলো খুলে দেয় এবং সহসা দেশ প্লাবিত হয়ে যায়। ক্রুসেড-যোদ্ধারা এবার তাদের মূল ঘাঁটি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রসদ বহনকারী একটি রক্ষীবহর অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয় এবং তাদের শিবিরে শুরু হয় দুর্ভিক্ষ। একই সময়ে মুসলিম সৈন্যদল লাগাতার আক্রমণ চালাতে থাকে। ফ্রাঙ্করা বাধ্য হয় শান্তি প্রার্থনা করতে। উভয়ের মধ্যে প্রতিনিধি বিনিময় হয় এবং পরিশেষে সম্পাদিত হয় একটি চুক্তি– যাতে নিরাপদে সমুদ্রোপকূলে প্রত্যাবর্তন, তীর্থযাত্রীদের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা এবং প্রকৃত ক্রুশের সংশয়জনক স্মৃতিচিহ্ন প্রত্যর্পণের শর্তে ক্রুসেড যোদ্ধারা ডামিয়েটা ত্যাগ করতে রাজি হয়।

খ্রিস্টানগণ চলে যেতে না যেতেই ভাইদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়; আল-মালিক আল-মুয়াজ্জাম কামিলকে বিতাড়িত করার উদ্দেশে আলাউদ্দিন খোয়ারিজম শাহের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুত্র জালালউদ্দিনের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন– অন্যদিকে কামিল আলাপ-আলোচনা শুরু করেন জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সাথে, যিনি ঠিক ঐ সময় পোপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের মতে একটি ক্রুসেডের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

আল-মালিক আল-মুয়াজ্জামের মৃত্যু [জুলকাদ, ৬২৪ হি; অক্টোবর-নভেম্বর, ১২১৭ খ্রি.]

১২১৭ খ্রিস্টাব্দে আল-মালিক আল-মুয়াজ্জামের মৃত্যু হয়। তিনি দামিশকের রাজ্য দিয়ে যান তাঁর পুত্র আল মালিক-উন-নাসির দাউদকে; অতঃপর কামিল ও আশরাফ দামিস্ক অধিকার করে তৎপরিবর্তে নাসিরকে হাররান, রূহা (এডেসা) ও রাক্কা প্রদান করার জন্য একমত হন। তদনুসারে তাঁর নিকট থেকে দামিস্ক নিয়ে নেয়া হয় এবং যে তিনটি নগর দিতে তাঁর পিতৃব্যরা সম্মত হন সেগুলো নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

৪ ফেব্রুয়ারি, ১২১৯ খ্রি.

১২১৯ খ্রিস্টাব্দে (৬২৯ হিজরি) ফ্রেডারিক (আরবদের দ্বারা আনবেরুর বা আনবের্তুর[১] বলে অভিহিত) সিরিয়ায় উপনীত হন। তাঁর ও কামিলের মধ্যে বিস্তর প্রত্রালাপ চলেছিল। অবশেষে উভয়ের মধ্যে দুই বছর ছয় মাস দশ দিন মেয়াদের একটি সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয়; তদনুসারে ফ্রেডারিক শান্তিপূর্ণভাবে জেরুজালেম, বেথেলহেম, নাজারেথ এবং জাফা থেকে একরের পথে অবস্থিত সমস্ত নগর ফিরে পান। পরহস্তে অর্পিত শহরে মুসলমানদের জন্য কেবল স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের সুবিধাটুকু সংরক্ষিত হয়। জেরুজালেমে উমর (রা.)-এর মসজিদটি তাদের অধিকারেই রাখতে দেয়া হয়। এই চুক্তি মুসলমান বা খ্রিস্টান কেউই অনুমোদন করল না; মুসলমানদের জন্য এটি ছিল ক্ষতিকর; কারণ সালাহউদ্দীন যেসব অঞ্চল জয় করেছিলেন এই চুক্তির কারণে সেগুলো তাদের হারাতে হয়; খ্রিস্টানদের জন্যও এটা ক্ষতিকর ছিল, কারণ মুসলমানরা স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অনুমতি লাভ করেছিল। ফ্রেডারিক পোপের আক্রমণের বিরুদ্ধে আপন রাজ্য রক্ষার জন্য অচিরেই ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করেন।

আল মালিক আল কামিলের মৃত্যু [২১ রজব, ৬৩৫ হি.]
জেরুজালেম পুনরাধিকার [জুলকাদ, ৬৩৭ হি.; ১২৪০ খ্রি.]

কামিল ১২৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর আমীরগণ তাঁর পুত্র আবু বকর আল মালিক আল আদলকে সিংহাসনে বসান, যিনি ছিলেন দুর্বল চরিত্রের যুবক এবং আমোদ-প্রমোদের প্রতি আসক্ত। তিনি তাঁর ভাই আইয়ুব আল মালিক আস সালিহ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন; যে দুর্দান্ত মামলুক সৈনিকরা এক্ষণে মিসরের অভিযাত শ্রেণীভুক্ত হয়ে উঠেছিল তাদের শাসনে রাখার জন্য তিনিই (আইয়ুব) ছিলেন অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি। হাররানের অধিপতি আবু নসর দাউদ ৬৩৭ হিরজিতে (১২৩৯-৪০ খ্রি.) খ্রিস্টানদের নিকট থেকে জেরুজালেম পুনরাধিকার করেন এবং এর প্রাচীরগুলো ধ্বংস করে দেন।

এশিয়ার অবস্থা

এ সময় পশ্চিম এশিয়ার অবস্থা ছিল গোলযোগপূর্ণ। খলিফার অধিকৃত অঞ্চলগুলোই কেবল শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করছিল বলে ধারণা করা হয়। তখন যে ঘটনাপরম্পরা দ্রুত সংঘটিত হচ্ছিল এবং যে দ্রুত আসন্ন বিপদ আরব সভ্যতাকে গ্রাস করছিল, তার কারণ অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে কিছুক্ষণের জন্য পূর্ব ঘটনার প্রেক্ষাপটে ফিরে যেতে হয়।

মুকতাফী, মুসতানজিদ ও মুসতাজীর শাসনকালে খলিফাগণ ইরাক, নিম্ন মেসোপটেমিয়া, ফার্স, আহওয়াজ ও ব-দ্বীপস্থ প্রদেশে তাঁদের পার্থিব ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ওয়াসিকের মৃত্যুর পর যে কোন সময় অপেক্ষা তাঁদের ধর্মীয় কর্তৃত্বও ছিল অধিকতর শক্তিশালী।

---

[১] আবুল ফিদা তাঁকে 'ফারদারিক' বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে, সুলতান বাইবার্স কর্তৃক ইউরোপে একটি মিশনের সাথে প্রেরিত কাজী জামালউদ্দিনের কাছে তিনি শুনেছিলেন, আনবেরুর সমস্ত ফ্রাঙ্ক-রাজাদের মধ্যে তার বিদ্যাবত্তা এবং দর্শন, তর্কশাস্ত্র ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন; তিনি মুসলমানদের সাহচর্য পছন্দ করনতেন, কারণ তিনি পড়াশুনা করেছিলেন সিসিলিতে এবং সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল মুসলমান।

মুসতাজীর মৃত্যু [১১৭৯-৮০ খ্রি.]; আহমদ আবুল আব্বাস আন-নাসির লি দীনিল্লাহ; আবু নসর মুহম্মদ আজ জাহির বি আমরিল্লাহ [৬৭২ হি; ১২২৫ খ্রি.]

মুসতাজী ৫৭৫ হিরজিতে পরলোকগমন করেন। তারপর তাঁর পুত্র আহমদ আব্বাস আন-নাসির লিদীনিল্লাহ[১] উপাধি ধারণ করে তাঁর উত্তরাধিকারী হন। দক্ষ ও সফলকাম শাসকরূপে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে। আজ জাহাবীর মতে, তাঁর সাতচল্লিশ বছরের দীর্ঘ রাজত্বকাল ছিল গৌরবময় ও আড়ম্বরপূর্ণ। তিনি একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন। পার্শ্ববর্তী সকল রাজা-বাদশাহ তাঁকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করতেন বলে ধারণা করা হয়। তাঁর রাজ্য পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করত এবং সর্বত্র বজায় ছিল শান্তি ও সমৃদ্ধি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নসর মুহম্মদ আজ জাহির বি আমরিল্লাহ[২] উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইবনুল আসির বলেন, ন্যায়পরায়ণ, অমায়িক ও মহানুভব রাষ্ট্রপ্রধান রূপে তাঁর শাসন উমর বিন আবদুল আজিজের দিনগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি মাত্র এক বছর রাজত্বের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবু জাফর মনসুর আল মুসতানসির বিল্লাহ
[১৩ রজব, ৬২৩ হি.; ১০ জুলাই, ১২২৬ খ্রি.]

তাঁর পুত্র আবু জাফর মনসুর আল মুসতানসির বিল্লাহ[৩] উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে খিলাফতের ক্ষমতা ও গৌরব অক্ষুণ্ন রাখেন। ঐতিহাসিকরা তাঁকে সাহসী ও নির্ভীক বীরপুরুষ এবং ন্যায়পরায়ণ, বিজ্ঞ ও ধার্মিক শাসক বলে উল্লেখ করেন। তিনি টাইগ্রিস নদীর পূর্ব তীরে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন যাতে তিনি প্রচুর বৃত্তি দান এবং ছাত্রদের শিক্ষা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতেন। তাতারদের বিরুদ্ধে রাজ্য রক্ষার জন্য তিনি একটি বিশাল সৈন্যবাহিনীও গঠন করেন।

তাতারদের অভ্যুদয়।

ফারগনার পূর্ব সীমান্ত থেকে সুদূর আমুর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত চীনা তাতার নামে অভিহিত মঙ্গোলিয়ার বিস্তীর্ণ অনুর্বর প্রান্তর এখনকার মত তখনো একই বংশ থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন নামধারী অসভ্য যাযাবর জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত হত। সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রে এসব বর্বরদের দ্বারা সংঘটিত হৃদয়বিদারক দৃশ্যের প্রায় প্রত্যক্ষদর্শী আবদুল লতিফ তাদেরকে এভাবে বর্ণনা করেন, তাদের স্ত্রীলোকগণও পুরুষদের মত যুদ্ধ করে; তাদের প্রধান অস্ত্র তীর এবং যে মাংসই তারা পায় তাই তাদের খাদ্য– তাদের হত্যাকাণ্ডের কোন ব্যতিক্রম বা বিরাম নেই, কারণ তারা স্ত্রীলোক ও শিশুদেরও হত্যা করে। তারা বায়ুপূর্ণ থলি দ্বারা কিংবা তাদের সন্তরণরত লোমশ অশ্বের কেশর ও লেজ ধরে গভীর নদী পার হতে অভ্যস্ত ছিল। তারা কোন ক্লান্তি জানত না, মৃত্যুকে ভয় করত না এবং অন্যের প্রতি নির্মম ছিল।

খোদার অভিসম্পাত; চেঙ্গিজের অভ্যুত্থান

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই অসভ্য ও অগণিত তাতার দল মহাসংহারক 'আল্লাহর অভিসম্পাত' চেঙ্গীজ বা জিঙ্গিসের পতাকাতলে সমবেত হয়, যেভাবে তারা হয়তো পুনরায় সমবেত হতে পারে। চেঙ্গীজের প্রকৃত নাম টেমুজিন, তিনি ১১৫৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৮৯ খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত হন যাযাবরদের খাকান বা সর্বময় প্রভু বলে, আর এই সময় থেকে তাঁর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের অভিযান শুরু

---

[১] আল্লাহর ধর্মের সহায়ক।

[২] আল্লাহর আদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ।

[৩] আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনাকারী।

হয়। ১২১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি চীনদেশ ও সমগ্র তাতার অঞ্চল জয় করেন। এ সময় মুসলিম দুনিয়া বিভিন্ন নতুন রাজবংশ দ্বারা শাসিত হচ্ছিল। পারস্যের সেলজুক সাম্রাজ্যের অবসান হয়েছিল। প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী গৌরবময় রাজত্বের পর মহান সুলতান সঞ্জর পরাজিত হন এবং তাঁর রানী তুরখান খাতুনসহ বন্দি হন ওগুজ নামে অভিহিত তুর্কোমানদের বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হাতে। এই লুণ্ঠনকারীরা তাদের রাষ্ট্রপ্রধানের উপর অপ্রত্যাশিত বিজয়লাভের পর মার্ভ ও নিশাপুর লুণ্ঠন করে, কিন্তু তাদের ধ্বংসযজ্ঞ তাতারগণ কর্তৃক সম্পর্ণ হয়।

সুলতান সঞ্জরের শোচনীয় পরিণাম

সঞ্জর চার বছর পর্যন্ত ওগুজদের হাতে বন্দি ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বন্দিনী অবস্থায় পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর বন্দিকর্তাদের নিকট থেকে পালিয়ে যান এবং তাঁর রাজধানীর বিনাশ ও সাম্রাজ্যের সর্বনাশ দেখতে উপস্থিত হন নিশাপুরে।

সেলজুক বংশের অবসান [৫৫২ হিজরি; ১১৫৭ খ্রি.]

এর কিছুদিন পরই তিনি ভগ্নহৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তুঘরিল নামধারী তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু তিনি ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান এবং তাঁর রাজ্য দখল করেন দরবারের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

আলাউদ্দিন হুসাইন (ঘোরী)/ ঘোরী বংশ [৫৪৫ হি; ১১৫০ খ্রি.]

১১৫০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব আফগানিস্তানে একটি নতুন বংশের অভ্যুদয় ঘটে। এই বংশ গজনী বংশের স্থলাভিষিক্ত হয়ে পরিশেষে তার ধ্বংস সাধন করে। ঘোরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হুসাইন ওরফে জাহানসুজ (বিশ্বদগ্ধকারী) ৫৫০ হিজরিতে গজনী লুণ্ঠন করেন এবং সবুক্তগীনের বংশধরদেরকে বাধ্য করেন লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করতে। সেখানে তাঁরা অচিরেই ঘরোয়া ভারতীয় রাষ্ট্রনায়ক হয়ে ওঠেন। সঞ্জর যখন পূর্ণ ক্ষমতায় সমাসীন তখন পশ্চিমদিকে আলাউদ্দিন হুসাইনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সঞ্জর কর্তৃক অবদমিত হয় এবং তিনি বাধ্য হন ভারতবর্ষের দিকে তাঁর উদ্যমের পথ খুঁজে নিতে। ১১৫৬ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিনের উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র সাঈফুদ্দিন। তিনি কিছুদিন পরই মারা যান। অতঃপর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তাঁর পিতৃব্যপুত্র গিয়াসউদ্দিন। ৫৬৯ হিরজিতে (১১৬৩ খ্রিস্টাব্দ) গজনী শেষবারের মত ঘোরী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১১৭৫/১১৮৭/১১৯৩ খ্রি.

গিয়াসউদ্দিনের ভাই শিহাবউদ্দিন,[১] পূর্বাঞ্চলে তাঁর প্রধান সেনাপতির কাজ করতেন। তিনি ৫৭১ হিজরিতে মূলতান জয় করেন এবং ৫২৮ হিজরিতে গজনী বংশের শেষ সুলতান খুসরু মালিককে কৌশলে বন্দি করা হয় এবং তিনি নিহত হন। ৫৮৯ হিজরিতে তিনি সরস্বতী নদীর তীরে নরাইনের স্মরণীয় যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। এই একক বিজয়ের ফলে মুসলমানরা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্তানের প্রভু হয়ে ওঠেন।

হিন্দুস্তান [১২০৬-১২১০]

৫৯৯ হিজরিতে শিহাবউদ্দিন তাঁর ভাই গিয়াসউদ্দিনের উত্তরাধিকারী হন। ৬০২ হিজরিতে তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হওয়ায় তাঁর মামলুক বা

[১] মুঈজুদ্দিন মুহম্মদ ইবন সাম নামে ইতিহাসে পরিচিত।

ক্রীতদাস কুতুবউদ্দিন (আইবেক[২]) হিন্দুস্তান লাভ করেন, অন্যদিকে তাঁর আরেক ক্রীতদাস বা কর্মচারী ইলদুজ পান গজনী রাজ্য। আইবেকের উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র আবুল মুজাফফর, কিন্তু মাত্র এক বছরের সংক্ষিপ্ত রাজত্বের পর তিনি ভগ্নীপতি আলতামাশ (শামসউদ্দিন) কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। তিনি পঁচিশ বছর হিন্দুস্তান শাসন করেন।

১২১০-৩৫ খ্রি.

তিনিই ভারতীয় মুসলমান রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাগদাদের খলিফার দরবার থেকে বহু ইপ্সিত নিযুক্তিপত্র লাভ করেন। ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর বংশধরগণ এই রাজ্যের অধিকারী ছিল। ভারতে মুসলিম রাজত্বের সুবিখ্যাত সম্রাজ্ঞী আলতামাশের কন্যা রাজিয়া তাঁর পিতার ইচ্ছানুসারে ৬৩৪ হিজরিতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রাচ্যদেশীয় জনসাধারণ এই প্রথম অবগুণ্ঠনহীনা ও রাজমুকুট পরিহিতা একজন সম্রাজ্ঞীকে দেখতে পায়।

১২৩৬-৩৯ খ্রি.

রাজিয়ার রাজত্বের প্রারম্ভে বহু বিপদ ও প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। এই বিপদ ও প্রতিবন্ধকতার মূল কারণ ছিল অবাধ্য শাসনকর্তাগণ। এরা তাঁর প্রতি বশ্যতা স্বীকার করতে ইতস্তত করছিলেন। পরিশেষে সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং রাজিয়ার আধিপত্য স্বীকৃত হয় দেবাল থেকে লখনৌতি[১] পর্যন্ত। তাঁর শেষ পরিণতি দুর্ভাগ্যজনক। একটি বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি বন্দি হন এবং পরে হিন্দু ঘাতকদের হাতে প্রাণ হারান।

খওয়ারিজম

খওয়ারিজম প্রদেশ (বর্তমানে খিবা) সুলতান মালিক শাহ কর্তৃক তাঁর পত্রবাহক[২] অথবা প্রাসাদাধ্যক্ষ নুসতাগীনকে জায়গীর হিসেবে দেয়া হয়েছিল। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র কুতুবুদ্দিন মুহম্মদ। তিনি সঞ্জরের নিকট হতে খওয়ারিজম শাহ উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী আতসিজ সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং সুলতান সঞ্জরের রাজত্বের শেষ দিকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়ে ওঠেন। আতসিজের দৌহিত্র ইরাক আজমকে তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং শেষ সেলজুক শাসক সঞ্জরের ভ্রাতুষ্পুত্র তুঘরিলের হত্যার পর খলিফা কর্তৃক তিনি নিযুক্ত হন পারস্য, খওয়ারিজম ও খেরাসানের অধিপতি। তাকিশের পর উত্তরাধকারী হন তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন মুহম্মদ। তিনি বলখ ও হেরাত জয় করে খোরাসান শাসনাধিকার সম্পূর্ণ করেন এবং তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় মাজেন্দ্রান, কিরমান, গজনী এবং সর্বশেষে ট্রান্সক্সিয়ান, যা কারাখিতাই গোষ্ঠীর খানের এক সহকারীর দখলে ছিল। ১২১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি খলিফার বিরুদ্ধে অভিযান চালান, কিন্তু হামাদানের[৩] নিকটবর্তী আমাদাবাদের পার্বত্য অঞ্চলে তাঁর সৈন্যদল তুষার ঝড়ে আক্রান্ত হলে তাঁকে থামতে হয়। অতঃপর তিনি রাজধানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। চার বছর পর প্রধানত তাঁরই নিষ্ঠুর ও বর্বর নির্বুদ্ধিতার জন্য তিনি অগণিত মোঙ্গলদের আক্রমণ দ্বারা বিপর্যস্ত হন।

---

[২] তুর্কী আইবেক অর্থ গৌরবান্বিত নেতা; আই খাতুন অর্থ গৌরবান্বিত মহিলা।

[১] মিনহাজ-উস-সিরাজ।

[২] তাশতদার।

[৩] হামাদান ও কিরমানশাহের পথ শীতকালে অদ্যাবধি পথিকদের কাছে ত্রাস হয়ে আছে।

মসুল

মঙ্গোলীয় অভ্যুত্থানের সময় মসুলে বিখ্যাত জঙ্গীর বংশধরদের শাসনের অবসান ঘটে। শেষ আতাবেক[১] মাসউদ নামে এক শিশুপুত্রকে রেখে যান তাঁর বিশ্বস্ত মামলুক বা ক্রীতদাস বদরউদ্দিন লুলুর তত্ত্বাবধানে। মাসউদ ১২১৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তার পুত্রও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর বদরউদ্দিন লুলু মসুলের আতাবেক হন। তিনি সাঁইত্রিশ বছর পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন, তারপর মোঙ্গলগণ এই দেশ আক্রমণ করে।

রূম [১২৪৩-৪৪ খ্রি.]

১২৩৫-৩৭ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলগণ যখন প্রথম এশিয়া মাইনর আক্রমণ করে তখন আইকোনিয়ামের সিংহাসন ছিল সুলতান সুলায়মানের সপ্তম অধঃস্তন পুরুষ (আলাউদ্দিন) কায়কোবাদের অধীনে। ৬৪১ হিজরিতে তারা কায়কোবাদের পুত্র ও উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দিন কায়খসরুকে পরাজিত করে এবং তাঁকে কর দিতে ও তাঁর দরবারে পরওয়ানা বলে অভিহিত একজন প্রতিনিধি রাখতে বাধ্য করে।

মিশর [১২৪০-৪১ খ্রি.]

মালিক আস সালিহ আইয়ুব ৬৩৮ হিজরিতে কীভাবে মিশরের অধিপতি হয়েছিলেন তা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি ক্রমস সিরিয়ায় নিজের ক্ষমতা বিস্তার করেন এবং সে দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আইয়ুব বংশীয় রাজাদেরকে বাধ্য করেন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে। তিনি যখন রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রয়াস চালাচ্ছিলেন তখন খওয়ারিজম শাহ মুহম্মদের সৈন্যরা মোঙ্গলদের সম্মুখ থেকে পলায়ন করে সিরিয়ায় প্রবেশ করে এবং সেখানে ঘোর বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসে। প্রথমে তারা এক শাসকের অধীনে এবং তারপর আরেকজনের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে। পরিশেষে তারা সিরিয়ার রাজাদের সাথে আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করে এবং হত্যা ও লুণ্ঠণে লিপ্ত হয়। ক্রমাগত কয়েকটি যুদ্ধের পর ৬৪৪ হিজরিতে (১২৪৬-৪৭ খ্রি.) তারা শেষবারের মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অষ্টম ক্রুসেড [৬৪৭ হি; ১২৪৫-৫০ খ্রি.]

আল মালিক আস-সালিহ যখন সিরিয়ায় ব্যাপৃত ছিলেন তখন ফ্রাঙ্কগণ অষ্টম ক্রুসেড শুরু করে। ফ্রান্সের নবম লুইস এর নেতৃত্ব দেন। আরব ঐতিহাসিকগণ তাঁকে রিদাফ্রান্স (রয় দ্য ফ্রান্স) বলে অভিহিত করেন। লুইস ডামিয়েটায় অবতরণ করেন, সেখান থেকে মুসলমানরা চলে যাওয়ায় তিনি মসজিদগুলোকে পরিণত করেন গির্জায় এবং গির্জাতেই তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। একবার ডামিয়েটা দখল করেই ক্রুসেড যোদ্ধারা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যায়। ব্যারনগণ ভোজনোৎসবের জাঁকজমকে একে অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন এবং সাধারণ লোকরা জঘন্যতম পাপে নিমগ্ন হয়। পাপাচার এতই প্রচলিত হয়ে যায় যে রাজা সেই অশালীন ও ক্ষতিকর প্রবাহ রোধ করতে পারেন না।

মিখদ বলেন, জুয়াখেলার নেশা নেতা ও সৈনিকদেরকে এমনই পেয়ে বসেছিল যে, তাঁরা ধন-সম্পদ হরানোর পর তাঁদের অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রগুলোকে পর্যন্ত দায়বদ্ধ করেছিলেন। যীশু-খ্রিস্টের পতাকার ছায়াতলে ক্রুসেড যোদ্ধারা সমস্ত রকম লাম্পট্যের

[১] নূরুদ্দিন আর্সলান শাহ।

অমিতাচারে নিমগ্ন হয়েছিল; সব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই ঘৃণ্যতম পাপ সংক্রমিত হয়েছিল। সীমাহীন বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদের স্পৃহা চরিতার্থ করতে সব রকম অন্যায় পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। শিবির ও নগরে যেসব বণিক রসদ সামগ্রী সরবরাহ করত, সেনানায়কগণ তাদের লুণ্ঠন করেছিলেন; তাঁদের ওপর আরোপ করা হয়েছিল অত্যধিক করের বোঝা, ফলে জিনিসপত্রের ব্যাপক অভাব দেখা দিয়েছিল। অতীব উৎসাহী লোকেরা দূরবর্তী স্থানে পরিভ্রমণ করে ছিল, মরুযাত্রীরা আক্রান্ত হয়েছিল অতর্কিতে, শহর ও সমতল ভূমি ধ্বংস করেছিল এবং বিজয়ের সময় তারা যেসব মুসলিম মহিলাকে ডামিয়েটায় নিয়ে আসে তাদেরকে তাড়িয়ে দিল। জয়েন ভিল বলেন, সাধারণ সৈনিকরা বিবাহিত ও কুমারী মেয়েদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করেছিল।

১৫ শাবান, ৬৪৭ হি; ২৩ নভেম্বর, ১২৪৯ খ্রি.

প্রায় দশ বছর রাজত্বের পর ফ্রাঙ্কগণ ডামিয়েটায় থাকতে থাকতেই আল মালিক আস সালিহ আইয়ুবের মৃত্যু হয়।[১] তিনি স্বল্পভাষী, ন্যায়পরায়ণ ও আচার-আচরণে সৎ, প্রতিশ্রুতি পালনে বিশ্বস্ত এবং বীরত্বপূর্ণ ও প্রভুত্বব্যঞ্জক চরিত্রের লোক বলে বর্ণিত হয়েছেন। তিনি তাঁর সেনাপতি ও উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা না করে কোন কাজ করতেন না। তিনি বাহরীয় মামলুকদের[২] একটি সামরিক বাহিনী গঠন করেছিলেন।

আইয়ুব তুরান শাহ (আল মালিক আল মুয়াজ্জাম শ্রেষ্ঠ রাজা) নামক এক পুত্র রেখে যান, যিনি সিরিয়া সীমান্তে অনুপস্থিত ছিলেন। আইয়ুবের সহধর্মিণী শজর-উদ-দার অতীব দক্ষ ও সাহসী ছিলেন। যে পর্যন্ত প্রধান কর্মচারীরা তুরান শাহের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ না করলেন সে পর্যন্ত সুলতানের মৃত্যুর কথা গোপন রাখেন। আইয়ুবের মৃত্যুতে মিশর জয়ের জন্য ফ্রাঙ্করা ডামিয়েটা থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু ব্যাপকভাবে প্রাণ হারিয়ে তারা পরাজিত হয়। লুইস ও তাঁর প্রধান সভাসদগণ মুসলমানদের হাতে বন্দি হন। তুরান শাহ বাহরীয় মমলুকদের প্রতিদ্বন্দ্বী বুরজী সামরিক বাহিনীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করায় বাহরীয়গণ তাঁকে হত্যা করে। তারপর তারা শজর-উদ-দারকে সিংহাসনে বসায়। তাঁর নামে খুতবা পঠিত হয় এবং তাঁর উপাধি আল-মুসতাসিমিয়া (বাগদাদের তখনকার শাসক খলিফা আল-মুসতাসিমের দাসী), আস-সালিহা (আস সালিহ আইয়ুবের সহধর্মিণী), আল মালিকাত উল মুসলিমিন (মুসলমানদের রানী), আল মালিক আল মনসুর খলিলের[৩] জননী মুদ্রায় অঙ্কিত হয়। চাশনিগীর[৪] মুঈজউদ্দিন আইবেক প্রধান সেনাপতি[৫] রূপে তাঁর সাথে সহযোগিতা করেন।

১২৫০ খ্রি.

অধিক কাল যেতে না যেতেই প্রধান সেনাপতি রানীকে পদচ্যুত করেন এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। কিন্তু আমীরগণ এতে সন্তুষ্ট হননি। তাঁরা রাজবংশের একজন লোককে সিংহাসনে বসাতে চান এবং তাঁরা আল-মালিক আল কামিলের দৌহিত্র পুত্র মুসা নামে এক অল্পবয়স্ক বালককে মনোনীত করেন। তিনি আল মালিক আল আশরাফ উপাধি ধারণ করে আইবেকের সাথে সহযোগিতা করেন।

---

[১] তাঁর উপাধি ছিল নাজমুদ্দিন– ধর্মের নক্ষত্র।

[২] নীলনদের অর্থাৎ বাহরুন-নীল-এর ওপর তাদের সেনানিবাস থাকায় তাদেরকে এরূপ বলা হত।

[৩] খলীল নামে তাঁর একটি পুত্র ছিল, তাকে তিনি শৈশবে হারান।

[৪] আস্বাদনকারী।

[৫] আতাবেক-উল-আসাকির।

শেষ আইয়ুবী সুলতান [৬৫১ হি; ১২৫৩-৫৪ খ্রি.]

এই সময় আন-নাসির ইউসসূফ ছিলেন দামেশক, আলেপ্পো এবং তথা সমগ্র সিরিয়ার অধিপতি।[১] খলিফার মধ্যস্থতায় আন-নাসির ইউসূফ ও আইবেকের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়, ফলে জর্ডান নদী পর্যন্ত ভূ-খণ্ড ছেড়ে দেয়া হয় মিশরীয়দের হাতে। পরের বছর আইবেক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন এবং আল মালিক আল আশরাফকে ফেরত পাঠান ইয়েমেনে তাঁর আত্মীয়দের কাছে। এই বালকই সর্বশেষ আইয়ুবী সুলতান, যাঁর নামে মিশরে খুতবা পঠিত হয়েছিল। বাহরীয় মামলুকরা আইবেকের অত্যাচারে সিরিয়ায় পালিয়ে যায় এবং আন-নাসির ও আইবেকের মধ্যে শুরু হয় নতুন যুদ্ধ। পুনরায় খলিফা হস্তক্ষেপ করেন এবং উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, যাতে আন নাসির মিশর সীমান্তে আল আরিশ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন। দুই বছর পর আইবেক গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন এবং আল মালিক আল মনসুর উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র নুরউদ্দিন আলী। আইবেকের মৃত্যুর পর খলিফা আল মালিক আন নাসির ইউসূফকে তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত নিযুক্তি পত্র ও সুলতানী খিলাফত পাঠান।

সিরিয়া

যদিও তিনি ইউফ্রেটিস নদীর তীর থেকে মিশর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র সিরিয়ার অধিপতি ছিলেন, তথাপি এই রাজ্যসীমার মধ্যেই ছিলেন আইয়ুবী বংশের অনেক ছোট ছোট রাজা, যাঁরা তাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধির পূর্ব পর্যন্ত নিঃসন্দেহে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। মোঙ্গল অভ্যুত্থানের সময় এমেসা ছিল শিরকুহের পৌত্র আল মালিক আল আশরাফ মুসার অধিকারে। ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি নাসির কর্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন এবং বিনিময়ে লাভ করেন তেলবশির জেলা। আশরাফ মোঙ্গলদের দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন এবং সিরিয়ায় প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। বিখ্যাত সালাহউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র তকীউদ্দিন উমরের বংশধরগণ হামা শাসন করতেন। সালাহউদ্দীনই তকীউদ্দিন উমরকে হামার অধিপতি নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর পুত্র মুহম্মদ ওরফে প্রথম আল মালিক আল মনসুর ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধ করে এবং বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর পৌত্র দ্বিতীয় মনসুর মোঙ্গলদের সিরিয়া আক্রমণের সময় হামার অধিপতি ছিলেন। সালাহউদ্দীনের ভাই আদিলের (সাঈফুদ্দিন আবু বকর) বংশধরদের অধীনে ছিল কারাক ও শবেক। তাঁর বিখ্যাত পৌত্র আল মালিক আল মুগীস তকীউদ্দিন উমর মোঙ্গল আক্রমণের সময় ঐ রাজ্য শাসন করতেন। আইয়ুবী বংশধরগণ সিরিয়ায় তাঁদের অধিকৃত অঞ্চল ছাড়া মেসোপটেমিয়াতেও সালাহউদ্দীনের রাজ্যের কিয়দংশ তখনো দখলে রেখেছিলেন। মায়াফারিকিন ছিল এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আল আদিলের আরেক পুত্রের বংশধরগণ কর্তৃক স্থাপিত এক বংশের রাজারা এটি শাসন করতেন। হালাকুর আক্রমণের সময় এই বংশের পঞ্চম শাসক মালিক কামিল এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। মোঙ্গলগণ কর্তৃক তিনি নিহত হন।

খওয়ারিজম শাহর বর্বর নির্বুদ্ধিতা

মোঙ্গল আক্রমণের সময় এই ছিল মুসলিম রাজা-বাদশাহদের অবস্থা। ১২১৮ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গীজের রাজ্য খওয়ারিজমের শাহ মুহম্মদের রাজ্যের সাথে একই সীমাবিশিষ্ট ছিল।

---

[১] হামার সুলতান (আল-মালিক আল-মুয়াইয়িদ ইমামুদ্দিন ইসমাঈল) ঐতিহাসিক আবুল ফিদা ছিলেন তকীউদ্দিন উমরের (আল-মালিক আল-মুজাফর) পঞ্চম অধস্তন বংশধর।

লক্ষ লক্ষ সশস্ত্র যাযাবরের অসভ্য অধিপতি ও ট্রান্সক্সিয়ানার দুর্ধর্ষ ও দুর্বিনীত তুর্কোমান রাজার মধ্যে সৌজন্য বিনিময়ের পর শেষোক্ত জনের এক নিষ্ঠুর কাজের ফলে ইসলামের ওপর যে বর্বরতার ঘূর্ণিবায়ু বয়ে যায় তা কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিম এশিয়াকে এক বিরাট শ্মশানে পরিণত করেছিল। সীমান্তবর্তী একটি শহরের খওয়ারিজম বংশীয় শাসনকর্তা মোঙ্গলিয়া থেকে আগত একদল বণিককে গুপ্তচরবৃত্তির অজুহাতে হত্যা করে তাদের মালপত্র আটক করেন। মোঙ্গলরাজ দোষী শাসনকর্তার সমর্পণ দাবি করলেন। খওয়ারিজম শাহ দূতকে হত্যা করে এই দাবির প্রত্যুত্তর দেন।

তাতার আক্রমণ ১২১৮ খ্রি.

মানবতা ও আন্তর্জাতিক সৌজন্যের এইরূপ অবমাননার সংবাদ পেয়েই মোঙ্গলরাজ দশ লক্ষ অসভ্য অনুচর নিয়ে তাতার প্রান্তর থেকে বেরিয়ে আসে এবং ফারগনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হিজরি ৬১৫ সালে এই ঝটিকা আরম্ভ হয়। মোঙ্গল আক্রমণের সময় ট্রান্সক্সিয়ানা, খোরাসান ও পারস্যের প্রান্তরসমূহ অবিরাম যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চ হওয়া সত্ত্বেও এ দেশগুলো অত্যন্ত উন্নত ছিল; জনসাধারণ ছিল সমৃদ্ধশালী; সবরকম সাহিত্য, কলা ও শিল্পের চর্চা হত এবং তাতে উৎসাহদান ও পৃষ্ঠপোষকতা করা হত; বহু শতাব্দীর সমৃদ্ধি ও সভ্যতার ফলস্বরূপ নগরগুলো ছিল জনাকীর্ণ এবং সরকারি ও বেসরকারি অট্টালিকায় সুশোভিত। হেরাত ও বলখের প্রত্যেকটিতে দশ লক্ষ করে জনসংখ্যা ছিল। বুখারা[১] ও সমরকন্দের জনসংখ্যা ছিল এর চেয়েও অনেক বেশি। খওয়ারিজম শাহর সৈন্যবাহিনী যেন ঝড়ের বেগে উড়ে গিয়েছিল। ছোটখাটো শহর ও নগরের কথা বাদ দিয়ে সভ্যতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলোতে কি ঘটেছিল তা বর্ণনা করলেই যথেষ্ট হবে।

বুখারা ভস্মীভূত

খোজান্দ ভূমিসাৎ হয় এবং এর অধিবাসীরা তারবারীর আঘাতে নিহত হয়। বুখারা ভস্মীভূত হয়। এই শিক্ষাকেন্দ্রের লুণ্ঠন সম্বন্ধে ইবনুল আসিরের বর্ণনায় অসহায় অধিবাসীদের ওপর বর্বরদের চরম নিষ্ঠুরতার কথা স্পষ্ট ভাষায় চিত্রিত হয়েছে, কিন্তু স্থানাভাবে তা উদ্ধৃত করা গেল না।

জুন, ১২১৯ খ্রি.

'আল্লাহর অভিশাপ' সুগদের মনোরম উপত্যকার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সমরকন্দে উপনীত হন। সমরকন্দ যে শুধু ট্রান্সক্সিয়ানার রাজধানীই ছিল তা নয়, বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রও ছিল। এর পরিধি ছিল তিন মাইল এবং বারোটি লৌহ ফটক সমন্বিত প্রাচীর ও মাঝে মাঝে দুর্গ দ্বারা এটি পরিবেষ্টিত ছিল। এর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১,১০,০০০ যার মধ্যে ৬০,০০০ তুর্কোমান ও কানকালিস এবং ৫০,০০০ তাজিক বা পারসি ছিল। যে তিনটি সেনাদল উত্তর ট্রান্সক্সিয়ানা আক্রমণ করেছিল তারা এবার হতভাগ্য নগরের দিকে দাবিত হয় এবং বহুসংখ্যক সৈন্যদল এটিকে অবরোধ করে। মোঙ্গলদের কাছে স্বজাতি হিসাবে ব্যবহার পাবে ভেবে তুর্কী বেতনভোগী সৈন্যদের একাংশ তাদের পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পত্তি নিয়ে পালাতে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তারা নিহত হয়। এর ফলে আমির ও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ বেরিয়ে আসেন এবং আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন।

---

[১] কয়েক মাইলব্যাপী প্রাসাদ, প্রমোদোদ্যান ও বাগান দ্বারা সজ্জিত বুখারার অবস্থান ছিল সুগদ নদীর উভয় পাশে। সুখদ নদী বুখারার উপকণ্ঠের উপর দিয়েও প্রবাহিত হয়েছিল।

সমরকন্দ ধ্বংস

তাঁদের আত্মসমর্পণ করা সত্ত্বেও নগরটি লুণ্ঠিত হয় এবং নিহত হয় অসংখ্য লোক। চেঙ্গীজ ৩০,০০০ শিল্পীকে দাস হিসেবে তাঁর পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করেন। সমান সংখ্যক লোককে রাখা হয় সামরিক কাজ ও তল্পী বহনের জন্য। দশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে কেবল ৫০,০০০০ লোক বিধ্বস্ত নগরের দুর্ভাগ্যের কথা বলার জন্য অবশিষ্ট থাকে। বুখারা ও সমরকন্দের অবস্থা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে বলখের অধিবাসীরা তাঁকে উপঢৌকন পাঠিয়ে বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু এ নগরটিকে পিছনে ফেলে যেতে তাঁর ভয় ছিল। তাই তিনি গণনার অজুহাতে অধিবাসীদেরকে ফুসলিয়ে নগরের বাইরে নিয়ে আসেন এবং তারপর তাদের হত্যা করেন; সেই সঙ্গে নগরটি ভস্মীভূত হয়। ১২২০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে এক ভয়াবহ যুদ্ধের পর অসভ্য যাযাবরেরা উরগঞ্জ (প্রাচীন থিবা) অধিকার করে নেয়, তারপর সংঘটিত হয় নির্বিচারে গণহত্যা। অতঃপর তারা অক্কাস নদীর বাঁধ খুলে দিয়ে নগরটি ধ্বংস করে। নিসা নামক স্থানে তারা ৭০,০০০ লোককে একযোগে বলি দেয়; পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদেরকে বলা হয় পাশাপাশি শয়ন করতে, তারপর তাদের দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় এবং তীরের সাহায্যে খুন করা হয়। ১২২১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাহিরীয় বংশ এবং পারস্যদেশীয় সেলজুকদের রাজধানী নিশাপুর ধ্বংস করা হয়। এটিকে ভূমিসাৎ করে ঐ স্থানে বার্লি বপন করা হয়। মাত্র ৪০০ শিল্পী রক্ষা পায় এবং তাদের উত্তরাঞ্চলে নির্বাসিত করা হয়। মীরখন্দের মতে, নিশাপুর ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হত্যাকাণ্ডে ১৭,৪৭,০০০ লোক প্রাণ হারিয়েছিল।

হেরাতের হত্যাকাণ্ড; রাই ও হামাদান লুণ্ঠিত

হেরাত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তারা এক সপ্তাহ ধরে হত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং কথিত আছে যে তাতে ১৬,০০,০০০ লোক নিহত হয়েছিল। স্থানটি সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য[১] হয়ে যায় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয় । রাই, দীনাওয়ার ও হামাদান লুণ্ঠিত হয় এবং জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ তরবারির আগাতে নিহত হয় । অতঃপর মোঙ্গলগণ খলিফার শাসনাধীন ইরাকের উপর অভিযান চালায়; কিন্তু মুসতানসিরের সৈন্যগণ তাদের বিতাড়িত করে।

খওয়ারিজম শাহের মৃত্যু [২২ জুলহজ্জ, ৬১৭ হি; ১২২০ খ্রি.]

এসব বিপর্যয়ের মূল হোতা মুহম্মদের সাম্রাজ্য যখন এভাবে বিধ্বস্ত হচ্ছিল এবং জনসাধারণ ধ্বংস হচ্ছিল তখন তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। যে অগণিত লোক তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের বিরুদ্ধে তাঁর কোন বীরত্বই কার্যকরী হয়নি। তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করা হয়, তাঁর পরিবারবর্গ ধরা পড়ে মোঙ্গলদের হাতে এবং সমস্ত পুরুষ নিহত হয়; কেবল তিন পুত্র রক্ষা পেলেন, যাঁদের মধ্যে একজন একাকী বর্বর আক্রমণকারীদেরকে সামান্য বাধাদান করতে সমর্থ হন। মুহম্মদ আশ্রয় নেন কাস্পিয়ান সাগরের একটি দ্বীপে, যেখানে তিনি একাকী ও পরিত্যক্ত অবস্থায় ফুসফুস প্রদাহে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন । ইসলামের উপর তিনি যে সর্বনাশ নিয়ে এসেছিলেন এভাবে তার কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়। তাতারগণ তাঁর বীর পুত্র জালালউদ্দিনকে নির্মম রক্তপিপাসু কুকুরের জেদ নিয়ে অনুসরণ করে। তিনি

---

[১] কথিত আছে, মোঙ্গলদের প্রত্যাবর্তনের পর যে চল্লিশ জন লোক জুমা মসজিদের ভস্মীভূত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সমবেত হয়েছিল, তারাই ছিল একদা হেরাতের জনপ্রাচুর্যের অবশিষ্টাংশ।

খওয়ারিজম, হেরাত ও গজনীর পথে প্রত্যাবর্তন করে নতুন সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং দু'টি সফল যুদ্ধে মোঙ্গলদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করতে সমর্থ হন। চেঙ্গীজ নিজে প্রচণ্ডবেগে বামিয়ান ও কাবুলের মধ্য দিয়ে গজনী অতিক্রম করে এবং জালালউদ্দিনকে অনুসরণ করেন। প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হয়ে তিনি সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে পলাতক রাজকুমারের নাগাল পান এবং তাঁকে আক্রমণ করেন ভীষণরূপে। জালালউদ্দিন তাঁর সহজাত বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেন। তিনি বারবার মোঙ্গলদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন; কিন্তু অবশেষে এক কোণে বিতাড়িত হন। তাঁর দু'টি অশ্ব ইতিমধ্যে নিহত হয়; তিনি তৃতীয়টির উপর লাফিয়ে ওঠেন, যার পিঠে চড়ে মোটামুটি ত্রিশ ফুট উঁচু তীর থেকে তিনি ঝাঁপ দেন সিন্ধুনদের জলস্রোতে এবং নিরাপদে অপর তীরে পৌঁছে যেতে সক্ষম হন। ভারতবর্ষের তৎকালীন শাসক সুলতান বলবনের সৈন্যদলের উপস্থিতি চেঙ্গীজকে সিন্ধুনদ অতিক্রমে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং তিনি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে পশ্চিমদিকে চলে যান।

ট্রান্সক্সিয়ানা ও খোরাসানে বহু শতাব্দীর সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় এবং জনসাধারণ এক গভীর বর্বরতায় নিমজ্জিত হয়। এতে তাদের অতীতের মহিমা ও সমগ্র ভবিষ্যতের স্মৃতি সমানভাবে আচ্ছাদিত হয়। মধ্য এশিয়ার যেসব রাজপথ দিয়ে চীন ও ভারবর্ষের পণ্যসামগ্রী পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে বহন করা হত সেগুলো পরিত্যক্ত হয়; উর্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ ভূ-খণ্ডগুলো অনুর্বর ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে অথবা পরিশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যেসব ললিত কলা ও শিল্পজাত দ্রব্য ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তা চিরতরে বিলুপ্ত হয়। শহরগুলো ধ্বংস হয়; কৃষকরা হয় নিহত, না হয় মোঙ্গলীয় সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে তালিকাভুক্ত হতে বাধ্য হয়। হাজার হাজার শিল্পীকে পাঠান হয় সুদূর পূর্বাঞ্চলে। তারা বর্বর বিজেতাদের ঘরবাড়ি সুসজ্জিত ও পরিশোভিত করত। ।

মোঙ্গল অভ্যুত্থান মধ্য এশিয়ার মননশীল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়, কারণ পারস্য ও পশ্চিমাঞ্চল ক্রমশ তাদের দুভ্যাগ্য কাটিয়ে উঠলেও বুখারা ও সমরকন্দ কখনো তাদের পূর্ববর্তী মানসিক কর্মতৎরপতা ফিরে পায়নি এবং তখন থেকেই তাদের মননশীল কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে কূট-ধর্মতত্ত্ব ও মরমীবাদে নিয়োজিত হয়। মধ্য এশিয়া ও পারস্যকে মরুভূমিতে পরিণত করে চেঙ্গীজ (তাতার) প্রান্তরে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে তিনি সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জালালউদ্দিনের মৃত্যু

এভাবে জালালউদ্দিন তাঁর পৈত্রিক রাজ্যের কিয়দাংশ পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। কিন্তু সৈন্যবাহিনী সংগঠনের আগেই মোঙ্গলগণ আবার তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে। তিনি কুর্দিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন, কিন্তু সেখানে তিনি একজন বিশ্বাসঘাতক অধিবাসীর হাতে নিহত হন।

খলিফা মুসতানসিরের মৃত্যু [১০ জামাদিউস সানী, ৬৪০ হি; ৫ ডিসেম্বর, ১২৪২ খ্রি.]; আবু আহমদ আবদুল্লাহ আল মুসতাসিম বিল্লাহর সিংহাসনারোহণ

খলিফা মুসতানসির ১২৪২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বংশ ও আরব সভ্যতার ভাগ্যের সবচেয়ে সংকটজনক সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র আবু আহমদ আবুল্লাহ। তিনি আল মুসতাসিম বিল্লাহ[১] উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন দুর্বল,

[১] আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণকারী।

চঞ্চল ও আমোদপ্রিয়। তাঁর রাজত্বকাল দেশে গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা এবং বিদেশে বিপর্যয়ের অবিরাম কাহিনীতে পূর্ণ। তাঁর নিজের ও তাঁর পরিবারের ধ্বংসে এসবের পরিণতি ঘটে। যে হাম্বলীরা ছিল বাগদাদে অবিরাম গোলযোগের উৎসস্বরূপ, তাদের সাথে হানাফীদের, কার্খের পশ্চিম শরহতলীতে বসবাসকারী শিয়াদের সাথে সুন্নীদের এবং ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের সাথে নিচশ্রেণীর লোক ও বদমাশদের কলহ মুসতাসিমের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। পিতার সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে তিনি তাদেরকে ব্যবসা ও কৃষিকাজ করার নির্দেশ দান করে এসব বিশৃঙ্খলা আরও বাড়িয়ে তোলেন। শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে এক দাঙ্গার ফলে তিনি তাঁর পুত্র আবুবকর এবং তাঁর সচিবকে কার্খ শহরতলী ধ্বংস করে শিয়াদের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করার আদেশ দেন। কথিত আছে, শীয়া উজির মুআইয়িদউদ্দিন মুহম্মদ বিন আল-কামী ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী, তিনি এতে দুঃখিত হয়ে তাতারদের বাগদাদে আসতে আহ্বান জানান। আরব ঐতিহাসিক ইবন খালদুন, আবুল ফিদা, মাকরিজী ও সুয়ূতী সবাই উজিরকে বর্ণনা করেন বিশ্বাসঘাতক হিসাবে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা মীরখন্দ ও ওয়াসসাফ কর্তৃক সমর্পিত হয়েছেন, যাঁরা একজন মোঙ্গলের অধীনে ইতিহাস রচনা করেছিলেন। কেবল রশীদউদ্দিন[১] তাঁকে বিশ্বস্ত কর্মচারী বলে বর্ণনা করেন। তিনি আব্বাসীয় বংশকে আসন্ন ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু নির্বোধ ও অস্থিরচিত্ত দুর্বল খলিফার অধীনে তিনি ছিলেন অসহায়। সে যাই হোক, হালাকু তাঁর ভাই মঙ্গু খানের প্রধান সেনাপতি রূপে পারস্যে কাজ করছিলেন। তিনি অ্যাসাসিনদেরকে নির্মূল করে এবং তাদের দুর্গগুলো ধ্বংস করে তাব্রিজের দিকে অভিযান করেন, যেখান থেকে তিনি মুসতাসিমের নিকট নিম্নলিখিত বার্তাসহ কয়েকজন দূত প্রেরণ করেন : যখন আমরা রুদবারের বিরুদ্ধে অভিযান করি তখন আমরা সাহায্য চেয়ে তোমার কাছে দূত পাঠিয়েছিলাম; তুমি তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, কিন্তু একজন লোকও পাঠাওনি। এক্ষণে আমরা তোমার আচরণ পরিবর্তন এবং অবাধ্যতা পরিহার করতে অনুরোধ করছি। কারণ অবাধ্যতা তোমার সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্যের ক্ষতিই করবে।

হালাকুর বাগদাদ অভিযান [রবিউল আওয়াল, ৫৫৫ হি.]

বিভ্রান্ত খলিফা সৈন্যসামন্তহীন অবস্থায় নিস্পৃহ সভাসদ ও অন্তর্বিপ্লবে লিপ্ত নগর নিয়ে এই ঝটিকার কাছে নত না করে ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রত্যুত্তর দেন এবং বিশৃঙ্খল জনতা প্রস্থানোদ্যত মোঙ্গলদেরকে অপমান করেন। এতে ধর্মহীন বর্বর ক্রোধান্বিত হন। সমগ্র নগরীকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ফেলতে পারে এমন একটি সৈন্যবাহিনী নিয়ে হালাকু আব্বাসী রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন। বাগদাদের সন্নিকটে উপনীত হওয়ার আগে খলিফার সৈন্যদল আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কিছুটা রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু মতানৈক্যের ফলে একবার তারা শোচনীয়ভাবে বিতাড়িত হয় এবং আরেকবার ঘটে নিষ্ফল জীবনহানী। মোঙ্গলরা এবার বাগদাদ অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। নগরের বহির্ভাগের সমস্ত উঁচু জায়গায় এবং যেসব দুর্গ ও প্রাসাদ নগরের উচ্চে অবস্থিত ছিল তাদের উপর নিক্ষেপণ অস্ত্রও স্থাপন করা হল এবং এর সাহায্যে বৃহৎ পাথরের টুকরো ও জ্বলন্ত অগ্নি নিক্ষেপ করে প্রাচীরগুলো ভেঙে ফেলা হয় এবং অট্টালিকাগুলোতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

---

১. জামআউত-তাওয়ারিখ।

মুতাসিমের আত্মসমর্পণ [৪ সফর, ৬৫৬ হি.]

চল্লিশ দিন অবরোধ চলার পর দোদুল্যচিত্ত খলিফা বর্বরের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু তাঁর আত্মসমর্পণের বার্তা নিষ্ফল হয়। অতঃপর হালাকু মুসতাসিমের প্রধান কর্মচারীদেরকে প্রলুব্ধ করে তাঁর শিবিরে নিয়ে আসেন এবং সামান্য অজুহাতে তাঁদেরকে ভৃত্য ও অনুচরসহ হত্যা করা হয়। মুসতাসিমের অবস্থা এবার নৈরাজ্যজনক হয়ে ওঠে। অবশেষে তাঁর নিজের ও জনসাধারণের জীবন রক্ষার জন্য তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে রাজী করানো হয়। তিনি তাঁর ভাই ও দুই পুত্রকে নিয়ে মোঙ্গল শিবিরে যান। সঙ্গে যান কাজী, শায়খ, আমির ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ প্রায় তিন হাজার লোক। কেবল খলিফা, তাঁর ভাই ও দুই পুত্র এই তিন যুবরাজ এবং তাঁদের অনুচরবর্গের তিনজনকে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হয়। বর্বর নেতা মিষ্টি-মধুর বাণী ও অতীব বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনার আড়ালে নিজের দুরভিসন্ধি গোপন করেন। তিনি খলিফাকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন নগরীর সশস্ত্র অধিবাসীদেরকে তাদের অস্ত্র ত্যাগ করে একটি সাধারণ আদম শুমারীর জন্য তোরণদ্বারসমূহে সমবেত হন। খলিফার আদেশে রক্ষীরা নিরস্ত্র অবস্থায় দলে দলে নগর থেকে বেরিয়ে আসে। তাদেরকে তৎক্ষণাৎ বন্দি করা হয়। পরদিন সূর্যোদয়ের সময় হালাকু হতভাগ্য নগরী লুণ্ঠন ও তার অধিবাসীদেরকে হত্যার আদেশ দেন।

বাগদাদ লুণ্ঠন; সর্বজনীন হত্যাকাণ্ড

বাগদাদের ধ্বংসকাহিনী বর্ণনা করতে গিবনের মত বিদগ্ধ ঐতিহাসিকের লেখনীর দরকার। স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণ পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাদের পদদলিত করে হত্যা করা হয়। খানদানী পরিবেশে লালিত যে ভদ্রমহিলারা কখনো জনতার দৃশ্য দেখতে সাহসী হয়নি তাদের প্রকাশ্য জনপদে টেনে এনে জঘন্যতম অত্যাচার করা হয়। খলিফা পরম্পরায় অতি যত্নে ও পরিশ্রমে সংগৃহীত শিল্প ও সাহিত্যের সম্পদসমূহ এবং পুরাতন পারস্য সভ্যতার নিদর্শনগুলো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ধ্বংস হয়। তিনদিন ধরে রাস্তাগুলোতে রক্তস্রোত বয়ে যায় এবং বহু মাইল পর্যন্ত তার গতিপথে ট্রাইগ্রিস নদীর পানি লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। ছয় সপ্তাহ ধরে চলে ভয়াবহ লুণ্ঠন, হত্যা ও মানবতার অবমাননা। প্রাসাদ, মসজিদ ও সমাধিসৌধগুলোকে অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করা হয় কিংবা স্বর্ণ গম্বুজের জন্য সেগুলোকে করা হয় ভূমিসাৎ। হাসপাতালে রোগীদেরকে, মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকদেরকে তরবারীর আঘাতে হত্যা করা হয়। সমাধি সৌধে শায়খ ও ধর্মপ্রাণ আমিরদের নশ্বর দেহাবশেষ এবং শিক্ষায়তনে মহান বিদ্বানমণ্ডলীর অবিনশ্বর গ্রন্থাবলিকে করা হয় ভস্মীভূত। বইগুলোকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, কিংবা যেখানে টাইগ্রিস নদী নিকটে ছিল সেখানে তার পানিতে নিমজ্জিত করা হয়। এভাবে মানবজাতির পাঁচ শতাব্দীর সঞ্চিত সম্পদ বিলুপ্ত হয় এবং জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হন।

মুসতাসিমের মৃত্যু

চারদিনব্যাপী ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পর মুসতাসিমকে তাঁর পুত্রগণ ও পরিবারের প্রধান ব্যক্তিবর্গসহ পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। কেবল আব্বাসী বংশের সামান্য কয়েক জন অখ্যাত যুবরাজ ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পান। জ্ঞানের আবাসস্থল, সংস্কৃতির অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, আরব দুনিয়ার চক্ষু ও কেন্দ্রভূমি বাগদাদ চিরতরে ধ্বংস হয়। আক্রমণের পূর্বে যার জনসংখ্যা ছিল বিশ লক্ষের অধিক। ইবন খালদুনের মতে, ছয়

সপ্তাহের হত্যাকাণ্ডে ষোল লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। বাগদাদ ধ্বংসের সাথে সাথে পশ্চিম এশিয়ার উপর রাতের কালো ছায়া নেমে আসে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইসলামী দুনিয়ার উপর দিয়ে যে অগণিত বর্বর ও ধর্মহীনদের ঝটিকা প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল তাদের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কথা আরব ও পারসি লেখকরা হৃদয়বিদারক সূত্রে বর্ণনা করেন। শুধু ধর্মান্ধ লোক ব্যতীত আর কেউই মোঙ্গলগণ কর্তৃক সংঘটিত এই ভয়াবহ মানব জীবননাশ এবং বুদ্ধি-বৃত্তিমূলক সম্পদের ধ্বংসসাধন কিংবা গণহত্যা ও নৃশংসতা প্রদর্শনে অশ্রু সম্বরণ করতে পারবে না। ইবনুল আসির বলেন, তাতারদের আক্রমণ সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের উপর এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের উপর আপতিত বৃহত্তম বিপর্যয় ও সবচেয়ে ভয়াবহ দৈব দুর্বিপাকগুলোর অন্যতম। পরবর্তী যুগে এরূপ দুর্ঘটনা আর সংঘটিত হয়নি; যদি কেউ বলে, আল্লাহর সৃষ্টিকাল থেকে এ যাবৎ পৃথিবী কখনো এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়নি, তবে তার উক্তি সত্য হবে; কারণ ইতিহাসে এর নজির নেই। আবদুল লতিফ মোঙ্গল অভ্যুত্থানকে একটি দুর্ভাগ্য বলে অভিহিত করেছেন। এটি অন্য সকল দুর্ভাগ্যকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করেছে। 'জাহান কুশার' লেখক জুওয়াইনী এই সময়ে চেঙ্গীজের অধীনে চাকরি করতেন। তিনি বলেন, যে বিপ্লব পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করেছে তা জ্ঞান ও বিদ্বানদের বিনাশ ঘটিয়েছে– বিশেষকরে যে খোরাসান ছিল জ্ঞানের আলোকতীর্থ ও বিদ্বানদের সমাগমস্থল সেখানেই বিদ্বান ব্যক্তিরা দুর্ঘটনার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। জ্ঞান ও গুণ গরিমার জন্য এই সময়টি ছিল দুর্ভিক্ষ স্বরূপ।

৯ সফর, ৬৫৮ হি; ২৫ জানুয়ারি, ১২৬০ খ্রি.

বাগদাদ ধ্বংসের পর বর্বর বাহিনী ইউফ্রেটিস নদী পার হয়ে মেসোপটেমিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং তারা যেখানে যায় সেখানেই চালাতে থাকে ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড। এডেসা, হাররান ও নাসিবীনের অধিবাসীদেরকে কতল করা হয়। আলেপ্পোতে পঞ্চাশ হাজার লোককে হত্যা করা হয় এবং দশ হাজার নারী ও শিশুকে বিক্রি করা হয় দাস হিসেবে। নগরটি রক্ষা পাবে– এই প্রতিশ্রুতিতে হাররান আত্মসমর্পণ করে; কিন্তু বর্বরেরা অধিবাসীদেরকে হত্যা করে– এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকেও।

এভাবে মোঙ্গলগণ সর্বত্র ধ্বংসসাধন করতে করতে পশ্চিমদিকে এগিয়ে চলল। মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান অন্তর্দ্বন্দ্বই তাদের অগ্রগমনে সাহায্য করে। অবশেষে প্যালেস্টাইনস্থিত নাজারেথের নিম্নবর্তী শহর আইন জালুত নামক স্থানে তারা বিখ্যাত সুলতান বাইবার্সের সম্মুখীন হয় এবং এই যুদ্ধে তারা পরাজিত হন এবং তাদের বহু লোক নিহত হয়। বাইবার্স পরে মিশরের অধিপতি হন। বাইবার্স মোঙ্গলদেরকে আলেপ্পোর বহির্দেশ পর্যন্ত তাড়া করেন এবং সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়াকে তাদের ঘৃণিত কবল থেকে মুক্ত করেন ।

২৫ রমজান, ৬৫৮ হি.; ৩ সেপ্টেম্বর, ১২৬০ খ্রি.; অক্টোবর, ১২৬০ খ্রি.

এ সময় আইবেকের পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করেন সাঈফুদ্দিন কুতুজ নামক তাঁর এক সেনাপতি এবং তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। আইন জালুতের যুদ্ধের অল্প পরই কুতুজ গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হলে বাইবার্স আল মালিক আজ জাহির উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

খিলাফতের পুনরুজ্জীবন

দুই বছরের পর্যন্ত সুন্নী জগৎ গভীরভাবে ও দুঃখের সাথে একজন ধর্মনেতার অভাব অনুভব করছিল। এই অভাবের কথা সূয়ূতী করুণভাবে প্রকাশ করেছেন।[১] বাইবার্স খিলাফতকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তিনি কায়রোতে আহ্বান করেন আব্বাসীয় বংশের যুবরাজ আহমদকে (আবুল কাসিম)। আহমদ তাঁর বংশের লোকদের হত্যাকাণ্ড হতে রক্ষা পেয়েছিলেন।

এই তরুণ শাহজাদা কায়রোর উপকণ্ঠে উপনীত হলে সুলতান তাঁর কাজী ও রাজ্যের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য বেরিয়ে আসেন। প্রধান কাজীর সামনে প্রথাগতভাবে তাঁর বংশ পুত্র প্রমাণের পর তাকে আল মুসতানসির বিল্লাহ উপাধি দিয়ে খলিফা পদে বরণ করা হয়।

১৩ রজব, ৬৫৯ হি; মে, ১২৬১ খ্রি.

প্রথমেই আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন নিজে; তারপর পদমর্যাদা অনুসারে ক্রমাগত আসেন প্রধান কাজী তাজউদ্দিন, প্রধান শায়খবৃন্দ এবং সর্বশেষে অভিজাত সম্প্রদায়। এটি সংঘটিত হয় ১৩ রজব (১২ মে, ১২৬১ খ্রিস্টাব্দ) এবং নতুন খলিফার নাম মুদ্রায় অঙ্কিত ও খুতবায় উচ্চারিত হয়। পরের শুক্রবার (১৭ রজব) কালো পোশাকে শোভাযাত্রা করে তিনি অশ্বারোহণে মসজিদে আসেন এবং ধর্মীয় অভিভাষণ দেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বাসীদের খলিফা পদে অভিষিক্ত হয়ে তিনি সুলতানকে খিলাফত ও নিযুক্তি পত্র প্রদান করেন– যা আইনসম্মত ক্ষমতার স্বীকৃতি হিসেবে এসব গোঁড়া লোকদের চোখে অত্যাবশ্যক ছিল।

এরূপে যোদ্ধা-সুলতানের তত্ত্বাবধানে কায়রোতে আব্বাসীয় খিলাফতের পুনর্জন্ম ঘটে। তখন থেকে এটি কেবল ধর্মীয় পদে পরিণত হয়। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত ওসমানী বিজেতা সুলতান সেলিম শেষ খলিফার নিকট হতে তাঁর নিজের অনুকূলে এক পদত্যাগ পত্র প্রাপ্ত হন। তখন থেকে ওসমানীয় রাষ্ট্রপ্রধানরা খলিফা উপাধি ধারণ করে সুন্নী জগতের অধিকাংশ স্থানে আইনসম্মত ধর্মীয় নেতা রূপে স্বীকৃত হন।

---

[১] এভাবে ৬৫৭ হিজরি সাল আরম্ভ হল এবং পৃথিবীতে কোন খলিফা রইলেন না। ৬৫৮ হিজরী সালও আরম্ভ হল এবং তখনো কোন খলিফা রইলেন না।

অধ্যায়-২৪
পুনরালোচনা

খিলাফত : নাম মাত্র নির্বাচন : আনুগত্যের শপথ : খিলাফতের পবিত্রতা : সরকার : রাজনৈতিক শাসনযন্ত্র : নীতি : প্রশাসন : শাসনকর্তার পদ : প্রাদেশিক বিভাগ : উজির : রাষ্ট্রের কর্মবিভাগ : বিচারালয় : কৃষি : শিল্প : সাম্রাজ্যের রাজস্ব : সৈন্যবাহিনী : সামরিক কৌশল : নৌ বিভাগ।

দ্বিতীয় উমরের রাজত্বকালের সামান্য বিরতিটুকু বাদ দিলে হাজ্জাজের আমল থেকে সিরীয় আরবগণ কীভাবে রাষ্ট্রের উচ্চপদগুলো একচেটিয়া করে নিয়েছিল এবং কী রকম নিষ্ঠার সাথে বাইরের লোকদের জন্য লাভ ও সম্মানজনক পদপ্রাপ্তির যাবতীয় পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল, তা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। যতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন জাতির প্রজাগণ তাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়নি ততদিন পর্যন্ত বৈষায়িক শক্তির উপর স্থাপিত এই স্বার্থপর নীতি কৃতকার্য হয়েছিল। যে বিপ্লব উমাইয়াদের নিকট হতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে হস্তান্তর করেছিল তাতে তাদের একচেটিয়া অধিকার খর্ব হয়। তখন থেকেই আরব নয় এমন প্রজারা বিশাল ও সুভভ্য সাম্রাজ্যের সাধারণ প্রজা ও ইসলাম জগতের নাগরিক হিসেবে উপযুক্ত স্থান দখল করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে প্রবেশাধিকার লাভ করে এবং আরবদের সাথে সমান অধিকার ভোগ করে। প্রাচীন অথবা বর্তমানকালে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। এতে মানুষের সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের গণতান্ত্রিক নীতির বাস্তব রূপদান ঘটে।

আব্বাসীয় খিলাফত

এটিই প্রধানত আব্বাসীয় খিলাফতকে অসাধারণ প্রাণশক্তি দান করেছিল এবং এই কারণেই পার্থিব কর্তৃত্ব হারানোর পরও তা তার ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম রেখেছিল। সকল প্রজার মধ্যে জাতীয় ঐক্যের এই মূলনীতি গৃহীত হওয়ায় প্রাথমিক যুগের আব্বাসীয় খলিফাগণ এমন একটি সাম্রাজ্য সৌধ নির্মাণ করতে সমর্থ হন, যা প্রতিদ্বন্দ্বীহীন অবস্থায় পাঁচ শতাব্দীরও অধিক কাল স্থায়ী হয়েছিল এবং কেবল বহিরাগত বর্বরদের আক্রমণেই তার পতন ঘটেছিল।

খলিফা কেবল পার্থিব রাষ্ট্রনায়কই ছিলেন না, তিনি একটি ধর্ম ও প্রজাতন্ত্রের ধর্মীয় নেতা ও ঐশী সরকারের প্রকৃত প্রতিনিধি ছিলেন। এমনকি কয়েকজন খলিফা যখন তাঁদের আমীরদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছিলেন, তখনো তাঁদের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হত এবং তাঁদের ব্যক্তিত্ব ঘিরে যে জ্যোতি বিরাজ করত তাতে পদ্ধতি উদ্ভাবনে মনসুরের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, যার ফলে খলিফা ঐশী নিযুক্ত আমির বা নেতা হিসেবে বিশাল সুন্নী জামাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

উত্তরাধিকারী মনোনয়নের রীতি

উমাইয়া যুগের ন্যায় শাসনরত খলিফা প্রায় অবধারিতভাবেই তাঁর জীবদ্দশাতেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন। মনোনয়ন হয়ে গেলে কাজী, সেনাপতি, সামরিক ও অসামরিক বিভাগের অধস্তন কর্মচারীসহ সাম্রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তাদেরকে ডাকা হত

ভাবী উত্তরাধিকারীর প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে। একে বলা হত বাইয়াত। শপথ গ্রহণকারী ব্যক্তি যুবরাজের হাতে হাত রেখে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণ করতেন। সাম্রাজ্যের উর্ধতন কর্মকর্তা ও অভিজাতবর্গ ব্যক্তিগতভাবে মনোনীত উত্তরাধিকারীর কাছে শপথ গ্রহণ করতেন; সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে সচরাচর কোন ব্যক্তি তাঁর (উত্তরাধিকারী) প্রতিনিধিত্ব করতেন। রাজকীয় অধিকার আরও সুদৃঢ় করতে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যুর পর নতুনভাবে বাইয়াত গ্রহণ করা হত। স্পেন দেশীয় ঐতিহাসিক[১] কর্ডোভায় অনুষ্ঠিত এই উৎসবের এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। এই উৎসব অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে বাগদাদের খলিফার দরবারের রীতিনীতির অনুকরণ করেছিল। খলিফা তাজ বলে অভিহিত গিলটি করা মণ্ডপের নিচে সিংহাসনে উপবেশন করতেন। যেসব সরকারি কর্মকর্তা ও সভাসদের এ ধরনের উৎসবে উপস্থিত থাকার অধিকার ছিল তাঁদের দ্বারা পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠগুলো পূর্ণ হত। সিংহাসনের নিকটবর্তী হয়ে রাজপরিবারের শাহজাদা উৎসব শুরু করতেন এবং অভিষেকের বিধি-বিধান পাঠ করতেন। তারপর যাবতীয় বিধি-নিষেধসহ তাঁরা আনুগত্যের শপথ নিতেন। তাঁদের অনুসরণ করতেন উজির ও তাঁদের পুত্রগণ, দেহরক্ষী বাহিনী এবং প্রাসাদের ভৃত্যবর্গ। এরপর খলিফার ভাই, উজির ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ বৃত্তাকারে সিংহাসনের উভয় পাশে সারিবদ্ধ হতেন এবং হলঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে প্রাসাদাধ্যক্ষ ভবনে প্রবেশের সাথে সাথে জনসাধারণকে শপথ গ্রহণ করাতেন।

খিলাফত

নির্বাচিত খলিফার প্রতি আনুগত্যের শপথ ধর্মীয় মর্যাদা পেত এবং তাঁর ব্যক্তিত্বকে পবিত্রতা দান করত। এই যুগে ভিন্ন অবস্থায় বাস করে সে সম্পর্কে আমরা সামান্যই ধারণা করতে পারি। মক্কা ও মদীনার মসজিদে নির্বাচিত খলিফার জন্য প্রার্থনা দ্বারা এই পবিত্রতার ভাব আরও বর্ধিত ও সুদৃঢ় হত। 'মানুষের মতই আল্লাহর মত' এই প্রবাদেরই এটি নতুন প্রকাশ। বাইয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় মর্যাদা নিম্নলিখিত ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেসব আইন-কানুন সমগ্র মুসলিম সমাজের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে তা আল্লাহরই বাণীর অভিব্যক্তি। এটিই হল ইজমাউল উম্মত বা জনসাধারণের ঐকমত্যের মূল কথা। যখন তারা সর্বসম্মতভাবে একজন ধর্মীয় নেতা ও মুসলিম সমাজের নায়ক নির্বাচন করে তখন তাঁর ধর্মীয় কর্তৃত্বের সাথে ঐশী অনুমোদন যুক্ত হয়। তিনিই আইনসম্মত সরকারের উৎস ও প্রেরণা এবং তিনিই কেবল শাসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নামাজে ইমামতি করার জন্য প্রতিনধি নিয়োগের অধিকার লাভ করেন। খলিফা নির্বাচনে এই ধর্মীয় ভাবধারা জড়িত থাকায় বহুকাল পরে যখন তাঁর পার্থিব ক্ষমতাসমূহের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছিল তখনো গজনীর মাহমুদের মত বিজয়ী ও গোত্রপতিরা তাঁদের ক্ষমতার ধর্মীয় স্বীকৃতির জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। খলিফার অনুমোদন তাঁদের কর্তৃত্বকে বিধিবদ্ধ করেছিল, তাঁদের রাজ্যের আইনসম্মত শাসন তাঁদের হাতেই ন্যস্ত ছিল এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যে কোন রকমের গণবিদ্রোহকে বেআইনি ও ধর্মবিগর্হিত বলে নির্দেশ করা হত। একটি আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র প্রদানের মাধ্যমে এই অনুমোদন কার্যকর হত এবং এর সাথে অবধারিতভাবেই সম্মানসূচক পোশাক (তশরীফ) দেয়া হত, তন্মধ্যে মধ্যে প্রায়শই মণিমুক্তা খচিত পাগড়ী, তরবারী ও পতাকা থাকত।

---

[১] মাকারী।

রাজনৈতিক শাসনযন্ত্র

আব্বাসীয় খিলাফতের আমলে যে রাজনৈতিক শাসনযন্ত্র বিদ্যমান ছিল এবং পরবর্তীকালে আরব সাম্রাজ্যের পতনের পর উদ্ভূত রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে কিংবা কিছুটা পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হয়েছিল তা মনসুর প্রবর্তন করেছিলেন এবং তাঁর প্রতিভার দ্বারাই তা বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। উমাইয়া শাসনকালে খলিফাদের সরকার পূর্ণ স্বৈরাচার ছিল। এই স্বেচ্ছাচারিতা মরুভূমির আরব ও ধার্মিক কিংবা বিদ্বান লোকদের বাকস্বীনতার দ্বারা প্রশমিত হত। এরা প্রায়শই কুরআনের শ্লোক বা কবিদের কাব্যাংশ উদ্ধৃত করে রাষ্ট্রপ্রধানের মনোভাব পরিবর্তন করতে সমর্থ হতেন। আব্বাসীয় বংশের প্রথম পাঁচজন খলিফার আমলেও বিভাগীয় মন্ত্রীবর্গ এবং পরিবারের প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে একটি বেসরকারি মন্ত্রণা পরিষদ গঠিত হলেও সরকার ছিল মোটামুটি স্বৈরতান্ত্রিক। খলিফাই ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস এবং রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় আদেশ তাঁর নিকট থেকেই উদ্ভূত হত। উজির ছিলেন প্রকৃতপক্ষে খলিফার প্রতিনিধি এবং তাঁর নামে তিনিই সাম্রাজ্যের পূর্ণ কর্তৃত্ব চালাতেন। তিনি কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারতেন। তিনি কর ধার্য ও রাজস্ব আদায় এবং ব্যয় নির্বাহের আজ্ঞাবাহকরূপে কাজ করতেন। রাষ্ট্রের পত্র-বিনিময় বিভাগ তাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল। তিনি খলিফার ভারপ্রাপ্ত হয়ে কাজ করতেন এবং খলিফাকে সাহায্য ও পরামর্শ দানের সাধারণ কর্তব্য ছাড়াও সমুদয় বেসামরিক ও সামরিক শাসন তাঁর মধ্যে যুক্ত হয়েছিল। প্রাথমিক আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনস্থ উজিরগণ এরকমই ছিলেন। তাঁরা খলিফার নিকট থেকে কর্তৃত্ব লাভ করতেন এবং তাঁরই আদেশে পালন করছেন বলে মনে করতেন। কালক্রমে দেখা গেল এসব কর্তব্য একজন লোকের পক্ষে নির্বাহ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার এবং বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম চালানোর জন্য উজিরের অধীনে কিছু ছোটখাটো কর্মচারী নিয়োগ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

মামুনের অধীনে নিয়মতন্ত্র

বিখ্যাত মামুনের আমলে স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসনের পরিবর্তে নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর রাজত্বকালে খলিফার অনুগত সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে সর্বপ্রথম একটি নিয়মিত মন্ত্রণা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের প্রতিনিধিরা তাঁদের মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন এবং আলাপ-আলাচনার ক্ষেত্রে তাঁরা কখনো বাধাপ্রাপ্ত হতেন বলে মনে হয় না। পরবর্তীকলে খলিফাগণ যখন পার্থিব কর্তৃত্ব হারিয়ে পেলেন এবং তাঁদের প্রভাব ধর্মীয় মর্যাদার ওপরই বহাল থাকে, তখন তাঁদের মন্ত্রণাপরিষদ ধার্মিক ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সভায় পরিণত হয়। কিন্তু বুওয়াইহী, সামানী, সেলজুক ও আইয়ুবী সকলেরই মন্ত্রণা পরিষদ ছিল এবং তাতে কম-বেশি জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব থাকত। সালাহউদ্দীনের মন্ত্রণা পরিষদ তাঁর কিংবা তাঁর উজিরের (আল কাজী আল ফাজিল) সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহের জন্য নিয়মিত মিলিত হত এবং সুলতানের যুদ্ধবিগ্রহের সময়ও তাঁর সঙ্গে যেত বলে ধারণা করা হয়।

হতভাগ্য আমিন ব্যতীত আব্বাসীয় বংশের প্রথম আট জন খলিফা ছিলেন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইংল্যান্ডের টিউডোর রাজাদের মত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উপর দৃঢ়ভাবে আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। একজন শাসনকর্তাকে দীর্ঘদিন কোন প্রদেশে না রাখাই ছিল নির্ধারিত শাসননীতি। প্রদেশের প্রাত্যহিক

ঘটনাবলি সম্পর্কে বাগদাদের দরবারকে অবহিত করার জন্য প্রতিটি প্রাদেশিক রাজধানীতে থাকত বিশ্বস্ত বার্তাবাহকের দল। কখনো কখনো ডাক-বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা[১] (সাহিবউল বারিদ) খলিফার সরকারি সংবাদদাতার কাজ করতেন। এসব সুপরিচিত প্রতিনিধি ও কর্মচারী ছাড়াও সাম্রাজ্যের সকল অংশে বিরাজ করত বিপুল সংখ্যক গুপ্ত পুলিশ বা গোয়েন্দা, যারা জনসাধারণের সকল অবস্থার উপর কড়া নজর রাখত। এমনকি তাদের কার্যকলাপ বিদেশেও প্রসারিত হয়েছিল। কারণ মাহদী, রশীদ, মামুন ও মুতাসিমের আমলে বাইজান্টাইন সম্রাটদের প্রতিটি গতিবিধি সম্পর্কে খলিফাকে অবহিত করার জন্য বাইজান্টিয়াম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গুপ্তচর রাখা হত। এই গোয়েন্দারা ছিল নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর এবং উল্লেখযোগ্য বিশ্বস্ততা ও সাফল্যের সাথেই তারা দায়িত্ব পালন করত বলে ধারণা করা হয়। সম্ভবত তুর্কী রক্ষীদের আধিপত্যের সময় এবং বুওয়াইহীদের শাসনকালে খলিফা যখন হয় বন্দি, না হয় ক্ষমতাহীন অবস্থায় ছিলেন তখন এই প্রথা স্থগিত কিংবা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু তাদের পার্থিব ক্ষমতার আংশিক পুনরুদ্ধার হলে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁরা পুরাতন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। কথিত আছে যে, আন নাসির লি দীনিল্লাহ[২] তাঁর নিজের সাম্রাজ্য বা প্রতিবেশী দেশসমূহে সংঘটিত প্রত্যেক বিষয়ে এত চমৎকার অবহিত থাকতেন যে, সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল তিনি জিনদের (আশরীরী) সেবা পেতেন।[৩] এসব উদ্দেশে আধুনিক কালের মতই বেসরকারি সংস্থার সাহায্য নেয়া হত এবং সকল শ্রেণীর লোকের মধ্য থেকে গুপ্তচর নিযুক্ত করা হত। বিশেষ করে সওদাগর, ফেরিওয়ালা ও অনুরূপ লোকদেরকে– যারা তুচ্ছ হলেও প্রতিটি ঘটনা খলিফাকে অবহিত করত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যখন সাম্রাজ্যের জায়গীরদারে পরিনত হন এবং খলিফার সার্বভৌমত্ব হ্রাস পেয়ে মোটামুটি রাজনৈতিক প্রভুত্বে পরিণত হয়, তখন এই বিশ্বস্ত বার্তাবহাকরা খলিফার দূত বলে পরিগণিত হয়েছিল এবং তারা নিশাপুর, মার্ভ, মসুল ও দামিস্ক প্রভৃতি দরবারে তাঁর স্থায়ী প্রতিনিধিরূপে কাজ করেছিল। মধ্যযুগের শেষদিকে ইউরোপে পোপের দূতদের মত যে রাষ্ট্রনায়কের কাছে তারা প্রেরিত হত, তাঁদের সামরিক অভিযানে তারা সঙ্গী হত। আমরা তাদের কেবল আল্প আর্সলান ও মালিক শাহর শিবিরেই দেখতে পাই তা নয়, বরং নূরুদ্দিন মুহম্মদ ও সালাহউদ্দীনের শিবিরেও সদা তৎপর থাকত এবং কখনো কখনো অনধিকার হস্তক্ষেপ করতে, আবার কখনো সাময়িকভাবে যেমন– পরবর্তী আইয়ুবীদের আমলে কলহরত রাজাদের মধ্যে মিলন ঘটাতে এবং গৃহ বিবাদের মীমাংসা করতে তাদের দেখতে পাই।[৪]

প্রত্যেক রাজা তাঁর পক্ষ থেকে খলিফার দরবারে 'শাহানা' নামক একজন প্রতিনিধি রাখতেন। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের পক্ষে কূটনৈতিক চাল লক্ষ করার দায়িত্ব এদের ওপর অর্পিত হত। কারণ পোপের আমলের রোমের মত বাগদাদেও সকল আইনসম্মত ক্ষমতার উৎসের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলত। শাহানাগণ[৫] রাজধানী ছাড়াও সচরাচর ওয়াসিত, বসরা, তিকরিত প্রভৃতি স্থানে মোতায়েন থাকত।

---

[১] তাঁকে সাহিব-উল খবরও বলা হত।

[২] পূর্বে দ্রষ্টব্য।

[৩] আজ-জাহাবী।

[৪] আবুল ফিদা বলেন, খলিফার দূত আল-মালিক আল-মুয়াজ্জামের পুত্রদের বিরোধ মীমাংসা করেছিল।

[৫] এই শব্দটি এখন প্রহরী অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাষ্ট্রনীতি

সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করা প্রাথমিক আব্বাসীয়দের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আক্রমণাত্মক অভিযান ও বিদেশে রাজ্য জয় পরিহার করা হয়েছিল। আপার মিশর, দায়লাম ও কাবুলের মত দেশগুলোতে অগ্রগতির কারণ এসব অঞ্চলে বসবাসকারী অসভ্য ও বর্বর উপজাতিরদের উৎপাত; পক্ষান্তরে বাইজান্টাইনদের সাথে বারবার যুদ্ধ সর্বদা তাদেরই আক্রমণ এবং সন্ধির শর্ত ভঙ্গের ফলে সংঘটিত হয়েছিল।

প্রশাসন

আব্বাসীয় শাসন আধুনিক কালের সুসভ্য শাসন পদ্ধতির মতই সুনির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হত; বরং কোন কোন দিক দিয়ে তা আমাদের যুগের চেয়ে উন্নতই ছিল বলা যেতে পারে। বর্তমানে কালের উসমানী সাম্রাজ্যের মত রাষ্ট্রের সকল পদ সমানভাবে মুসলমান, ইহুদি খ্রিস্টান ও হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। রাজ্যশাসনের জন্য আব্বাসীয় খলিফাগণ কর্তৃক প্রবর্তিত জটিল শাসনযন্ত্রের মত আর কিছুই উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনের পার্থক্য এত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে না। এই শাসনযন্ত্র পরে সকল উত্তরাধিকারী মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত হয়েছিল।

শাসনকর্তাগণ

বিগত বংশের মত প্রাদেশিক প্রশাসন খলিফা নিযুক্ত শাসনকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হত; কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। মনসুর কখনো কোন শাসনকর্তাকে বেশিদিন একই প্রদেশে রাখতেন না। পদ থেকে অব্যাহতির পর তাঁকে তাঁর শাসনের পূর্ণ হিসেব দিতে হত এবং বিশ্বাসভঙ্গের সামান্যতম সন্দেহ হলেও তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হত। মনসুরের আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ কোনক্রমেই কর্মশূন্য ছিল না। তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধীনে তাঁদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক ছিল, যদিও তাঁদের কর্মোদ্যোগের ক্ষমতা ছিল সমানভাবে সীমাবদ্ধ। তাঁরা কেবল তাঁদের ওপর ন্যস্ত প্রদেশগুলোর প্রশাসনিক ও সামরিক বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং বাধ্য ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধানের ইচ্ছানুসারে পদচ্যুত হতে। বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল প্রাদেশিক কাজীর ওপর। তিনি বিভিন্ন শহরে অবস্থানরত কয়েকজন প্রতিনিধি কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হতেন; কিন্তু কোন কোন প্রদেশের শাসনকর্তাগণ তাঁদের অধীনস্থ প্রদেশ থেকে রাজসরকারে উদারভাবে অর্থ সাহায্য দ্বারা রাজ্যের সেবা করে কিংবা বিশেষ আনুগত্য প্রদর্শন করে বিশেষ সুবিধা লাভ করতেন।

বিভিন্ন শাসন বিভাগ

সিসিলি সমেত লিবিয়া মরুভূমির নিকটবর্তী পশ্চিম আফ্রিকা নিয়ে একটি প্রদেশ গঠিত হয়েছিল এবং সাফফাহর আমলে সেটি ছিল আবদুর রহমান বিন হাবিবের শাসনাধীনে; অন্যদিকে বিশ্বস্ত আবু আইয়ুনের উপর মিশরের শানসভার ন্যস্ত হয়েছিল। জজিরা (মেসোপটেমিয়া), আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া; মদীনা, মক্কা ও ইয়েমামা (পশ্চিম ও মধ্য আরব); ইয়েমেন বা দক্ষিণ আরব; কুফা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল (সাওয়াদ বিখ্যাত ইউফ্রেট উপত্যকা); ব-দ্বীপ সমেত বসরা, বাহরাইন ও ওমান; পারস্য ইরাক, খোরাসান ও ট্রান্সক্সিয়ানা; সিন্ধু ও পাঞ্জাব; আহওয়াজ (সুসিয়ানা) দক্ষিণ পারস্য; মসুল রাজ্য এবং পরিশেষে সিরিয়াসহ ফিনিশীয় উপকূল নিয়ে বাকি প্রদেশগুলো গঠিত

হয়েছিল। সাফফাহ পরে প্যালেস্টাইনকে সিরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে একজন পৃথক শাসনকর্তার অধীনে রাখেন। রশীদ পূর্ববর্তী বিভাগের কিছুটা রদবদল করেন; তিনি মেসোপটেমিয়া ও কিন্নিসরীনের শাসন কর্তৃত্ব থেকে সিরিয়া ও সিলিসিয়ার সীমান্ত অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং সেগুলো নিয়ে আওয়াসিম[১] নামে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করেন। এই প্রদেশের শাসনকর্তার পদ রাজপরিবারের একজন শাহজাদাকে দেয়া হলেও একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী সর্বদাই তাঁর সাথে যুক্ত থাকতেন তাঁর উপদেষ্টা ও সহকারী হিসেবে। আওয়াসিমের শাসনকর্তা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সীমান্ত রক্ষী[২] এবং সীমান্ত ও গিরিপথগুলোর তত্ত্বাবধান করাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। রশীদ কর্তৃক স্থাপিত ও সুরক্ষিত সিলিসিয়ার তাসাস ছিল এই গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের রাজধানী। রশীদ তাঁর পিতামহের মতই একজন বিখ্যাত নগর-নির্মাতা ছিলেন; মনসুর মাসিসিয়া (প্রাচীন মপসুয়েসতা) পুনর্নির্মাণ করে; রশীদ নির্মাণ করেন তারসাস, আদানা, মারআশ (জার্মানিসিয়া) এবং আরও কয়েকটি স্থান। এই সকল স্থানকে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করে খিলাফতের নিয়মিত সৈন্যদলের সাহায্যে পরিবৃত রাখা হত।

উজির

যদিও উজিরের[৩] পদ পারসিদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং আরবদের নিকট পরিচিত হলেও আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত ঐ নামের কোন কর্মচারী প্রকৃতপক্ষে পদ গ্রহণ করেননি। খলিফার প্রকৃত ক্ষমতা বিনষ্ট হলে উজিরের কর্তৃত্বও লোপ পায় এবং আমির-উল-উমরা[৪] বা পধান সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর স্থান দখল করেন। পরে বুওয়াইহীরা খলিফার জন্য কেবল রইস-উর-রুআসা[৫] নামে একজন কর্মসচিব রেখে উপাধিটি তাদের মন্ত্রীদেরকে প্রদান করে। সেলজুক সুলতানদের অধীনে যখন খলিফারা তাঁদের পার্থিব ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করলেন তখন তাঁরা পুনরায় উজির মনোনীত করেন এবং পরিষদীয় কর্মসচিব ও উজিরের পদ একই ব্যক্তির[৬] মধ্যে সংযুক্ত হয়।

উসতাদ-উদ-দার

উসতাদ-উদ-দার বা প্রাসাদের তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। দুর্বল রাষ্ট্রপ্রধানদের আমলে আমির-উল-উমরা উসতাদ-উদ-দারও ছিলেন এবং বুওয়াইহী আমীরগণ এই উপাধি দ্বারা নিজেদের পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। যখন তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা হারান তখন উসতাদ-উদ-দার পদটি প্রকৃতপক্ষে এর অর্থনুসারী প্রাসাদাধ্যক্ষ নামেই পরিণত হয়। খলিফা আল মুসতানজিদের[৭] শাসনকালে

---

[১] সীমান্ত অঞ্চল।

[২] পারসি ভাষায় 'মারজবান' শব্দে এই অর্থ বোঝায়।

[৩] উজির শব্দের অর্থ ভার বহনকারী। আবু-সালমাহ প্রথম এই উপাধি গ্রহণ করেন।

[৪] পূর্বে দেখুন।

[৫] নেতাদের নেতা।

[৬] আল-কায়িমের রাজত্বকালে উজির আলি ইবন আহমদ ইবন মাসলামাহ রইস-উর-রুআসা উপাধি লাভ করেছিলেন।

[৭] পূর্বে দেখুন।

আবদুল্লাহ (আজাদউদ্দিন) ইবনুল মুজাফফর এবং তারপর তাঁর পুত্র তথা রইস-উর রুআসার পৌত্র আবদুল ফারিগ মুহম্মদ (ইমামুদ্দিন) প্রাসাদাধ্যক্ষের কাজ করেছিলেন।

সুলতান

খলিফা ওয়াসিক তুর্কী দেহরক্ষীদের প্রধান সেনাপতি আশনাসকে সর্বপ্রথম সুলতান[১] উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁকে একটি মণিমুক্তাখচিত মুকুট ও দুইটি কটিবন্ধ দান করেন। এটি বোধ হয় প্রকৃতপক্ষে বুয়াইহীদের ক্ষমতা লাভের সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তারপর এই উপাধি আমীরদেরকে প্রদান করা হয়। বিপুল জাঁকজমক ও উৎসব সহকারে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হত। উপাধি প্রাপককে প্রথমে রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত করা হত, মাথায় পরানো হত মণিমুক্তা খচিত মুকুট, গলায় গলাবন্ধনী, বাহুতে বাজুবন্দ এবং কটিদেশে তরবারি বেঁধে দেয়া হত। পরিশেষে সামরিক ও অসামরিক ক্ষমতা সমন্বয়ের নিদর্শন স্বরূপ খলিফা স্বয়ং তাঁর হাতে তুলে দিতেন দুইটি পতাকা। তন্মধ্যে একটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রচলিত পতাকার মত রৌপ্যখচিত এবং অন্যটি খলিফার উত্তরাধীকারীদেরকে প্রদত্ত প্রতাকার মত স্বর্ণমণ্ডিত ছিল। অতঃপর সমবেত জনতার সম্মুখে নিযুক্তিপত্র পাঠ করা হত। তারপর সুলতান খলিফার হাত চুম্বন করতেন।

কিন্তু সুলতান উপাধি বুওয়াইহী আমীরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গজনীর মাহমুদ, তুঘরিল, আলপ আর্সলান, মালিক শাহ, সালাহউদ্দীন প্রমুখের মত পরাক্রমশালী বিজয়ীদেরকেও তা প্রদান করা হয়েছিল। একবার কেউ গ্রহণ করলে বা কাউকে প্রদান করা হলে বস্তুতপক্ষে সেটি পরিবারে বংশানুক্রমিকভাবে নিয়োগের জন্য আবেদন করা হত এবং প্রায় সাধারণ প্রথামতই নিয়মিত খিলাত সহযোগে তা মঞ্জুর করা হত ।

মালিক

পরবর্তীকালে মালিক[২] অথবা রাজা নামক আরেকটি উপাধি সৃষ্টি হয়। তা কখনো সুলতান উপাধির সাথে যুক্তভাবে এবং কখনা পৃথকভাবে, কিন্তু সর্বদাই কোন গুণবাচক উক্তি সহযোগে শাসনরত আমীরদেরকে প্রদান করা হত। জঙ্গীর পুত্র বিখ্যাত নূরুদ্দিন মাহমুদ সর্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করেন। তিনি খলিফার নিকট থেকে আল মালিক আল আদিল বা ন্যায়পরায়ণ রাজা উপাধি পেয়েছিলেন।

উজিরের পদ

আব্বাসীয় আমলে উজিরের পদকে মুসলিম আইনজ্ঞ ও রাজনৈতিক অর্থনীতির লেখকরা দু'টি শ্রেণীতে চিহ্নিত করেন, যেমন : (১) অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন (উজিরাতুত তাফবীজ) এবং (২) সীমিত ক্ষমাতসম্পন্ন (উজরাতুত তানফীজ)। প্রথম শেণীর উজিরদেরকে রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করতেন; রাষ্ট্রের সকল ব্যাপারে তাঁদেরকে পূর্ণ ও অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হত। তাঁরা যে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে তা প্রভুকে জানাতে পারতেন। সাফফাহ, মনসুর বা মাহদীর আমলে এ ধরনের উজির ছিলেন না। রশীদের আমলে জাফর বারমেকী এবং মামুনের আমলে ফজল বিন সহলই শুধু ভারপ্রাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

---

[১] একটি আরবী শব্দ, এর অর্থ শাসক।

[২] একটি আরবী শব্দ, ল্যাটিন রেক্স (Rex) শব্দের অনুরূপ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর উজিরদের ঐরূপ বিস্তৃত ক্ষমতা ছিল না। তাঁরা নিজের উদ্যোগে কোন কাজ করতে পারতেন না, কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশ পালনের জন্য ক্ষমতা লাভ করতেন। উজিরগণকে প্রশাসন, কর নির্ধারণ, প্রদেশগুলোর স্থানীয় অবস্থা এবং তাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হত। অমুসলমানরাও এই পদের যোগ্য ছিলেন; তবে তাঁদের নিয়োগ বোধ হয় গোঁড়া লোকদের অনুমোদন লাভ করত না।[১]

উজির নিয়োগের ধরনও কম চিত্তাকর্ষক নয়। খলিফা যাঁকে মনোনীত করতেন তাঁকে একটি মুতালিয়া (বিজ্ঞপ্তি বা সরকারি পত্র) মারফত প্রাসাদে ডাকা হত। সাম্রাজ্যের দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি (আমীর) মারফত তাঁকে এই পত্র প্রদান করা হত। হুজরার (খলিফার মন্ত্রণাকক্ষ) দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলে প্রাসাদাধ্যক্ষ খলিফার সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতেন। অভিবাদন জ্ঞাপনের পর খলিফা কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতেন; অতঃপর প্রথাগত সম্মানসূচক পরিধান (তশরীফ) পরানোর জন্য তাঁকে আরেকটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হত। খলিফার সন্নিধানে ফিরে এসে তিনি খলিফার হস্ত চুম্বন করে প্রস্থান করতেন। প্রাসাদদ্বারে উপনীত হলে বহুমূল্য সাজে সজ্জিত একটি অশ্ব তাঁর কাছে আনা হত। অতঃপর তিনি অশ্বারোহণে উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সাম্রাজ্যের অফিসার, দরবারের আমীর, খলিফার খিদমতগার এবং দীওয়ানের অধ্যক্ষগণকে সম্মুখে নিয়ে তাঁর দীওয়ানস্থ দফতরে গমন করতেন। দফতরে তাঁকে মহাসমারোহে অশ্ব থেকে অবতরণ করানো হত এবং সেখানে তিনি নিজ আসন গ্রহণ করলে তাঁর নিযুক্তির ঘোষণাপত্র পঠিত হত।[২]

দীওয়ানউল আজিজ

বর্তমান তুর্কী সরকারকে যেমন আল-বাব-উল আলী বা মহান দরজা বলা হয়, তদ্রুপ খলিফার সরকারকে বলা হত আদ-দীওয়ান আল-আজিজ বা মহান সভা। প্রধান উজির সভায় সভাপতিত্ব করতেন এবং লাভ করতেন আল উজির উদ দীওয়ানউল আজিজ[৩] উপাধি।

রাষ্ট্রের কর্মবিভাগ

আব্বাসীয়দের শাসনযন্ত্র সুদক্ষ কার্যবিভাগ ও খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ শাসন পদ্ধতির সমকক্ষ। রাষ্ট্রের প্রধান কর্মবিভাগগুলো ছিল নিম্নরূপ :

দীওয়ানউল খারাজ (কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগ) বা অর্থ দফতর, দীওয়ানউদ দীয়া (রাজ-সম্পত্তির দফতর), দীওয়ানউজ জিমাম (নিরীক্ষা বা হিসাব দফতর), দীওয়ানউল

---

[১] এই মনোভাব আরবদের কাছে অদ্ভুত ছিল না। বুওয়াইহী আদুদ্দৌল্লার খ্রিস্টান উজির (নাসর ইবন হারুন) বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। মিশরের ফাতিমীরা প্রায়শই ইহুদী ও খ্রিস্টান উজির নিয়োগ করতেন।

[২] বিশিষ্ট উজিরদের মধ্যে মনসুরের উজির আবু আইয়ুব আল মুরিয়ানী ও রবী ইবন ইউনুস, রশীদের উজির জাফর, মামুনের ফজল ও হাসান, মুকতাদী ও কায়িমের ফখরুদ্দৌল্লা ইবন তাহির, আল মুহতাদির রুদাওয়ারী, মুসতানজিদের ইবন হুবায়রা, তুঘরিল বেগের আল আমিদ আল-কুন্দুরী আলপ আর্সলান ও মালিক শাহর নিজামুল মূলক এবং সালাহউদ্দীনের আল-কাজী আল-ফাজিলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

[৩] বিভিন্ন বিভাগের অধিকর্তারা মাঝে মাঝে উজির বা মন্ত্রী নামে পরিচিত হতেন, কিন্তু তাঁরা সর্বদাই থাকতেন প্রধান উজিরের অধীনে, যিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনের সর্বময় কর্তা। প্রধানমন্ত্রী আল উজির-আল-আজম বা আস-সদর আল আজম বা প্রধান উজির উপাধি প্রাপ্ত হতেন।

জানদ (সমর দফতর), দীওয়ানউল মাওয়ালী ওয়াল গিলমান (আশ্রিত ও ক্রীতদাসদের নিরাপত্তা বিভাগ)– এই বিভাগে খলিফার বন্দিমুক্ত ব্যক্তি ও ক্রীতদাসদের একটি তালিকাবহি রাখা হত, যা থেকে তাদের জন্য বরাদ্দ সাহায্য দেয়া হত; দীওয়ানউল বারিদ (ডাক বিভাগ), দীওয়ান-উজ জিমাম আন নাফাকাত (রাজপরিবারের ব্যর্থ নির্বাহ দফতর), দীওয়ানউর রাসাইল (পত্রবিনিময় বা বিচার দফতর), দীওয়ানউত তাওকিয়া (আবেদন দফতর), দীওয়ানান নজর ফিল মাজালিম (অভিযোগ অনুসন্ধান দফতর), দীওয়ানউল আহদাস ওয়াশ শুরতা (দেশরক্ষী ও পুলিশ দফতর) এবং দীওয়ানউল আতা (দান দফতর)– নিয়মিত সৈনিকদের বেতন দেয়ার জন্য প্রধান পে-মাস্টার জেনারেল দফতরের সমতুল্য।[১] অমুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল একটি বিশেষ দফতরের উপর, যার অধিকর্তাকে বলা হত কাতিবউল জিহবাজাহ।[২]

এসব প্রধান দফতরগুলো ছাড়াও প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও বিচার সংক্রান্ত কয়েকটি ছোটখাটো দফতর ছিল। এগুলোর মধ্যে সরকারি মঞ্জুরি দফতর বা দীওয়ান-উল মুকাতিয়াত এবং খাল, পয়ঃপ্রণালী ও সেচকাজ তত্ত্বাবধানকারী (দীওয়ানউল আকরিহা) দফতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি বলতে পারি যে, এসব অফিস থাকা সত্ত্বেও খলিফাদের অধীনস্থ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের চেয়ে সেগুলোতে অনেক কম আমলাতন্ত্র ও কর্তাগিরী বিদ্যমান ছিল এবং সরকার নিজের স্বার্থহানী করেও ভিন্ন সম্প্রদায়গুলোর ব্যাপারে চরম সীমা পর্যন্ত নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলত। প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি শহর তাদের নিজেদের ব্যাপার নিজেররাই পরিচালনা করত এবং গোলযোগ আরম্ভ হলে বা কর প্রদান না করলেই কেবল সরকার হস্তক্ষেপ করত। কিন্তু কৃষি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত। যেসব খাল ও সেচকার্জের উপর ফসল ও রাষ্ট্রের রাজস্ব নির্ভর করত সরকার সেগুলোর নির্মাণ ও মেরামতের তত্ত্বাবধান করত। রশীদের আমলে সাম্রাজ্যের প্রধান কাজী আবু ইউসুফ খলিফাকে লেখা একটি চিঠিতে কৃষির উন্নতির জন্য সরকারের নিজস্ব খরচে নতুন খাল খনন এবং পুরাতনগুলোর পঙ্কোদ্ধার ও সংস্কারের দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ জোর দেন। পানির সরবরাহ অব্যাহত রাখা এবং তা বিলি বণ্টনের জন্য যে ব্যয় হবে তা রাষ্ট্র ও কৃষকেরা সমানভাবে বহন করবে। তিনি সুদক্ষ জল পুলিশের ব্যবস্থা এবং বড় বড় নদীতে, বিশেষকরে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসে নৌচলাচলের বাধাবিঘ্ন দূর করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করেন।

দীওয়ানউজ জিমাম

উন্নত শাসনের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল খলিফা মাহদী কর্তৃক বড় বড় কেন্দ্রগুলোতে নিরীক্ষা বা হিসাব দফতরের (দীওয়ানউজ জিমাম) প্রবর্তন। উমাইয়া আমলের মত কেন্দ্রীয় রাজস্ব দফতর (দীওয়ানউল খারাজ) ছিল রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী প্রদেশ ইরাকের সমগ্র রাজস্ব আদায় এবং অন্যান্য প্রদেশের রাজস্বের হিসাব রাখাই ছিল এর দায়িত্ব। অর্থের বদলে ফসলের দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহও (মাউইন) এই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দীওয়ানউর রাসাইল বা পত্র বিনিময় দফতর ছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই বিভাগের সভাপতিকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্মাধ্যক্ষ বলা যেতে পারে, যাঁর দায়িত্ব ছিল রাজকীয় ফরমান, নিযুক্তিপত্র, বিশেষাধিকার পত্র ও সাধারণ রাজনৈতিক

---

[১] মনসুরের রাজত্বকালে জনৈক হাবিব ইবন আবদুল্লাহ ইবন রাগাবান এই বিভাগের সভাপতি ছিলেন।

[২] স্পেনে এই অধিকর্তাকে বলা হত কাতিব-উজ জিমাম।

পত্রাদি রচনা করা এবং রাষ্ট্রপ্রধান বা উজিরের অনুমোদন লাভের পর সেগুলোতে লাল গালায় খলিফার চিহ্নযুক্ত সীলমোহর দেয়া। তিনি সরকারি চিঠিপত্রগুলো পরিমার্জন ও সংশোধন করতেন এবং নিজে সেগুলোতে সীলমোহর দিতেন। যে সাধারণ সভায় খলিফা জনসাধারণের অভিযোগ ও দরখাস্ত শ্রবণ করতেন তিনি সেসব সভায় যোগদান করতেন এবং অভিযোগকারীর দরখাস্তের উপর খলিফার রায় লিখে দিতেন। এসব মামলায় প্রায়শই রায়ের একটি অনুলিপি বাদীকে দেয়া হত; আর আসলটি রাখা হত সরকারি সেরেস্তায়। এই অফিসে সম্পাদিত কাজের ধরন এবং তাতে সর্বদা ব্যবহৃত বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল লিখন পদ্ধতির জন্য কর্মাধ্যক্ষ ও কেরানীদেরকে অবশ্যই উচ্চবংশের প্রতিভাবান ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে থেকে মনোনীত করতে হত। গুরুত্বের দিক দিয়ে এর পরের দফতরটি ছিল দীওয়ানউত তাওকিয়া বা আবেদন দফতর। উমাইয়াদের আমলে রাষ্ট্রের সীলমোহর দফতর নামে অভিহিত এই অফিসে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত স্মারকলিপির উত্তর রচনা করা হত; রাষ্ট্রপ্রদানের স্বাক্ষর ও সীলমোহর যুক্ত করে সেগুলোকে রেজিস্ট্রি করা হত এবং পাঠানোর আগে সেগুলোতে সাধারণত খলিফার স্মারক চিহ্ন কিংবা কুরআনের একটি শ্লোক লিখে দেয়া হত।

ডাক বিভাগ

প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে ডাক বিভাগের কার্য তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন একজন পোস্টমাস্টার (আস সাহিবউল বারিদ)। তিনি কেবল রাজকীয় ডাকের নিয়মিত চলাচলেরই তত্ত্বাবধান করতেন না, বরং সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্পর্কে খলিফাকে অবহিত করতেন। বস্তুত তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ গুপ্ত প্রতিনিধি ছিলেন এবং তিনি মাঝে মাঝে প্রদেশের অবস্থা, প্রশাসনের কাজকর্ম, কৃষক ও কৃষির অবস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মনোভাব, টাকশালের অবস্থা এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট দাখিল করতেন। সৈন্যদের পরিদর্শন ও বেতন দেয়ার সময়ও তাঁকে উপস্থিত থাকতে হত। সরকারি ডাকের সাথে বেসরকারি চিঠিপত্রও নেয়া হত এবং নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেয়া হত প্রাপকদের কাছে; কিন্তু এই অনুগ্রহের জন্য বেসরকারি লোকদের কত দিতে হত তা বলা কঠিন। ডাক বহনের জন্য পারস্যে ঘোড়া ও খচ্চর এবং আরব ও সিরিয়ায় উটের দল ব্যবহার করা হত। গোটা সাম্রাজ্যে ৯৩০ টি বিশ্রামস্থল ছিল এবং প্রতিটি বিশ্রামস্থলে নিশ্চয়ই পশুর সংখ্যা ছিল অসংখ্য, কারণ উপযুক্ত ভাড়া দিলে সাধারণের ব্যবহারের জন্য সেগুলো পাওয়া যেত। কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে তাঁর সমস্ত অনুচরণবর্গ নিয়ে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট প্রদেশে যেতে হলে তিনি বিশ্রামস্থলগুলোতে থেমে থেমে পরিভ্রমণ করতেন, এমনকি সৈন্যদলকে ঐভাবে নিয়ে যাওয়া হত। রাজকীয় ডাকবাহী ঘোড়াগুলোর সুস্পষ্ট চিহ্ন থাকত এবং বেসরকারি ঘোড়ার সাথে সেগুলো গুলিয়ে যেত না। পশুগুলোকে খাওয়ানো, নতুন পশু ক্রয়, ডাক পিয়ন ও ডাক বিভাগের কর্মচারীদের বেতন বাবদ শুধু ইরাকের জন্যই খরচ হত ১,৫৪, ০০০ দীনার (প্রায় ১,০০,০০০ পাউন্ড)। উমাইয়া খলিফা হিশামের আমলে ইরাক প্রদেশের ডাক বিভাগের ব্যয় ছিল চল্লিশ লক্ষ দিরহাম। ডাক বিভাগের অধিকর্তা সাহিবউল বারদকে পোস্টমাস্টার ও অন্যান্য কর্মচারীদের সম্পর্কে খলিফার রিপোর্ট পেশ করতে হত এবং মাঝে মাঝে সেগুলোর সারমর্ম তৈরি করে দিতে হত। এছাড়া, সকল প্রাদেশিক শহরে ডাক বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ, তাদের তত্ত্বাবধান ও বেতন প্রদানের দায়িত্ব ছিল তাঁর হাতে। প্রতিটি বিশ্রামস্থলের নাম এবং একটি থেকে

অপরটির দূরত্ব সম্বলিত নির্ভুল ডাক বিভাগীয় নির্দেশিকাসমূহ সরকারি সেরেস্তায় রক্ষিত থাকত। বলা হয় যে, সংবাদ বহনের জন্য পায়রা নিয়োগের কথা গ্রিক ও রোমানদের জানা ছিল,[১] কিন্তু এ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম প্রামাণ্য দলিল মুতাসিমের রাজত্বকালে পাওয়া যায়। তাঁর রাজত্বকালে বাবেকের বন্দি হওয়ার সংবাদ একটি পায়রা হরকরার সাহায্যে বাগদাদে প্রেরিত হয়েছিল।[২] এরপর নিয়মিত ডাকের কাজে পায়রা নিযুক্ত হয়। খলিফা নাসির লি দীনিল্লাহর রাজত্বকালে তাদের পায়রার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয় এবং নূরুদ্দিন মাহমুদ সামরিক কাজের উদ্দেশে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়মিত পায়রা বাহনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সেনা পরিদর্শন বিভাগ

সমর দফতরের সাথে সম্পর্কিত অথবা তার অধীনস্থ দীওয়ানউল আরজ বা সেনা পরিদর্শন দফতর নামক আরেকটি বিভাগ ছিল। অস্ত্রাগারগুলো ছিল একজন বিশেষ আধিকারিকের অধীন। তাঁকে মুশরিফউস সানাআত বিল মাখজান[৩] বলা হত। প্রতিটি সরকারি অফিস একজন পরিচালকের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। তিনি রইস বা সদর বলে আখ্যায়িত হতেন এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের কাজ সম্পাদন করতেন মুশরিফ বা নাজীর নামে অভিহিত পরিদর্শক। কৃষি ও সেচকাজের পরিদর্শক মুশরিফউল আকরিহা, দ্রব্যের সাহায্যে খাজনা আদায়ের পরিদর্শক ও মুশরিফউল ইকোমাতিল মাখজানিয়া, সরকারি গুদামের পরিদর্শক মুশরিফ বিল মাখজান, সরকারি মঞ্জুরি বিভাগের পরিদর্শক নাজীরউদ দীওয়ানুল মুকাতিয়াত উপাধিতে ভূষিত হতেন। নিরীক্ষা ও হিসাব পরীক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালকে বলা হত নায়িবআন দীওয়ানিজ জিমাম।[৪]

এই সকল এবং অন্যান্য কর্মচারী ছাড়াও একজন সাধারণ নিয়ামক ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে সরকারি অফিসগুলো পরিদর্শন করে খলিফার নিকট বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করতেন। তাঁকে বলা হত মুশরিফউল মামলিকাত। পদমর্যাদার দিক দিয়ে বিভিন্ন রাজকর্মচারীদের মানের ক্রম এরূপ ছিল– প্রথমে উজির, তারপর হাজিব বা মহামান্য প্রাসাদাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের সভাপতি, প্রধান কাজী, রক্ষীবাহিনীর প্রধান, বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষ ইত্যাদি। হাজিব[৫] বৈদেশিক দূত, আমীর-ওমরাহ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে খলিফার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

---

[১] কথিত আছে যে, টরোসথিনিস এজিনা নামক স্থানে তাঁর পিতার কাছে বেগুনী বর্ণে রঞ্জিত একটি কবুতর পাঠিয়ে অলিম্পিক খেলায় তাঁর বিজয়ের সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন এবং মডেনা অবরোধকালে হিরটিয়াস ও ব্রুটাস পায়রার সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান করেছিলেন।

[২] মাস'উদী।

[৩] সামরিক ভাণ্ডারের কারখানা পরিদর্শক।

[৪] তাজ-উর-রুআসা (নেতাদের মুকুট) উপাধিধারী আবু-গালিব আল-আসবাগী খলিফা আল মুকতাদীর রাজত্বকালে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইরাকের কাতিবরা তাঁর প্রবর্তিত প্রথানুসারে সরকারি হিসাব রক্ষা করতেন।

[৫] স্পেনে হাজিবই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে উজির।

পুলিশ

প্রত্যেক নগরের 'শুরতা' নামক বিশেষ পুলিশ ছিল। এর প্রধানকে সাহিবুস শুরতা বলা হত। উমাইয়া আমলের মত শুরতা বা নগররক্ষীরা সাধারণ পুলিশ থেকে পৃথক ছিল এবং নগরের এলাকা অনুসারে তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হত। নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত ছিল এবং রাতে বিভাগীয় প্রধানের অধীনে তারা নগরে টহলদারি করে বেড়াত। শুরতা ছিল সামরিক শ্রেণীভুক্ত এবং সব সময় ভাল বেতন পাওয়ায় তারা সৎ ও কর্মে উৎসাহী ছিল। বাগদাদে পুলিশ অধিকর্তার অফিস ছিল প্রায় প্রাদেশিক শাসনকর্তার অফিসের মত মর্যাদাসম্পন্ন। মামুনের আমলে খোরাসানের শাসনকর্তার পদের জন্য আবেদন এবং তা লাভ করা পর্যন্ত সেনাপতি তাহির কিছুকাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তীকালে সাহিবউস শুরতা মাঝে মাঝে উজিরের পদ পরিগ্রহ করতেন।

মুহতাসিব

সাধারণ পুলিশ মুহতাসিব নামক একজন বিশেষ কর্মকর্তার অধীনে ছিল। এই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পদটি খলিফা মাহদী সৃষ্টি করেন এবং তখন থেকেই তা ইসলামী দেশগুলোতে বিদ্যমান থাকে। মুহতাসিব ছিলেন হাট-বাজার ও জনসাধারণের ন্যায়-অন্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক। তিনি একদল অধীনস্থ কর্মচারী সঙ্গে নিয়ে প্রত্যহ নগরের উপর দিয়ে যাতায়াত করতেন এবং পুলিশী আদেশ যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে স্বয়ং নিশ্চিত হতেন। তিনি খাদ্যভাণ্ডার পরিদর্শন করতেন, পরীক্ষা করতেন ব্যবসায়ীদের দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা এবং আপত্তিকর কার্যকলাপ দমন করতেন। যে কোন রকম প্রতারণার চেষ্টা করলে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেয়া হত। ইসলামী সাধারণ আইনের হুগো গ্রোটিয়াস আবুল হাসান আল মাওয়ারদী বিচার ও শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাজের প্রসার ও সীমা বর্ণনা[১] করার পর বলেন যে, বিচার বিভাগের রায় এবং শাসন ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্যস্থলে পুলিশের (হিসবা) অবস্থান। তিনি বলেন, আইনের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই পুলিশের কর্তব্য নিহিত– যা বিধিবদ্ধ তা করতে বাধ্য করা এবং নিষিদ্ধ বিষয় প্রাধান্য লাভ করলে তা প্রতিরোধ করা।

বণিক সভা

বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ও প্রতারণা দমন করার বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য বণিকদের নিয়ে একটি দায়িত্বশীল বণিক সভা গঠন করা হত। এই সভা গঠিত হত বণিক কিংবা তাঁদের প্রতনিধিদের নিয়ে। সর্বদাই তাঁদের মধ্য থেকে একজন প্রভাবশালী ও সন্মানিত ব্যক্তি সভাপতিত্ব করতেন, যাঁকে বলা হত আর রইসউত তুজ্জার[২]। সভার সদস্যদের আমিন বলা হত। কেবল যে প্রতিটি বাণিজ্য কেন্দ্রেই বণিকসভা ছিল তা নয়, বরং অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ শহরেই স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং মাঝে মাঝে শাসনকর্তা বা রাষ্ট্রপ্রধানের মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত নগর পরিষদ (দীওয়ানউশ শূরা) ছিল; আর তাতে সভাপতিত্ব করতেন একজন নির্বাচিত সদস্য। স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করা হত এবং পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোকে হেফাজত ও উৎসাহ প্রদান করা

---

[১] তাঁর আহকাম-উস সুলতানিয়া' গ্রন্থে।

[২] বণিক প্রধান।

হত। খলিফাদের আমলে সভ্যতা রচয়িতা ঐতিহাসিক যথার্থই মন্তব্য করেন যে, সৌভাগ্যক্রমে মুসলিম জগতে পূর্ণ আমলাতন্ত্র ছিল না। শাসন যথাসম্ভব সহজ ছিল এবং তা ন্যস্ত ছিল সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের উপর; সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ কেবল সঠিক কর আদায় দাবি করত। এর সাথে আমি সেচকাজ রক্ষণাবেক্ষণের কথা যোগ করতে পারি। এই নিরপেক্ষ নীতির উদাহরণ হিসেবে আমি পারস্যে প্রচলিত প্রথার উল্লেখ করব। প্রতিটি শহর তার অধীনস্থ অঞ্চলসহ আপন আপন শাসনকাজ পরিচালনা করত, কর ধার্য করত এবং রাষ্ট্রের নির্ধারিত রাজস্ব প্রদান করত। নতুন কর ধার্যের প্রশ্ন বা পার্শ্ববর্তী শহরের সাথে বিরোধ দেখা দিলে শাসনকর্তার পরামর্শ নেয়া হত। এভাবে এসব শহরগুলো অনেক অর্ধস্বাধীন রাজ্য গঠন করেছিল। তাদের অবস্থা প্রায়ই ইউরোপের স্বাধীন নগরগুলোর অবস্থার অনুরূপ ছিল। বলখ তার অধীনস্থ অঞ্চলসহ দশ লীগ (প্রায় ত্রিশ মাইল) বিস্তৃত ছিল এবং চতুর্দিকে মাটির প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। সুগদ, সমরকন্দ, হিরাত, বুখারা, খওয়ারিজম,[১] রাই, হামাদান এবং অন্যান্য শহরও অনুরূপ বিস্তৃত ছিল। এভাবে এই পৌরসভাগুলো জাতির সংস্কৃতির উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণত স্থানীয় অভিজাত পরিবার, বিচারক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে কেবল সহকারী শাসনকর্তা নির্বাচন করত। এসব স্বাধীন শহরের সহকারী শাসনকর্তার পদ এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে সময় সময় তা রাজপরিবারের শাহজাদাদেরকে প্রদান করা হত।

আমীরউল হজ্জ

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি খলিফারা কীভাবে বাগদাদ থেকে মক্কা এবং বাগদাদ থেকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের সমগ্র পথে সরাইখানা ও বিশ্রামাগার নির্মাণ করেছিলেন এবং জলাধার তৈরি করে দিয়েছিলেন, যাতে তীর্থযাত্রী সওদাগররা খারাপ আবহাওয়ায় আশ্রয় খুঁজে পায় এবং নিষ্কৃতি পায় তৃষ্ণার দুর্ভোগ থেকে। তীর্থযাত্রীদেরকে লুণ্ঠন ও বেদুঈনদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য তাঁরা হাজীদের তত্ত্বাবধায়ক (আমীলউল হজ্জ) নামে গুরুত্বপূর্ণ পদও সৃষ্টি করেছিলেন, যাদের দায়িত্ব ছিল একদল সৈন্যসহ তীর্থযাত্রীদের সাথে গমন করা। যাযাবর গোষ্ঠীগুলোকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব একজন প্রধান সর্দারের উপর ন্যস্ত ছিল, যাঁকে বলা হত আমীরউল আরব।[২] তিনি তাদের সদাচারণের জন্য দায়বদ্ধ থাকতেন।

বিচারকাজ

বিচারকাজ নির্বাহ ছিল একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অমুসলমানদের নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত সকল বিষয় তাদের ধর্মীয় নেতা বা শাসকদের মীমাংসার ওপর ছেড়ে দেয়া হত; আর মুসলমানদের ব্যাপার ন্যস্ত ছিল কাজীদের ওপর। প্রত্যেক নগরের নিজস্ব কাজী ছিল এবং বড় বড় শহরে ছিল কতিপয় নায়িব (সহকারী) কাজী। বাগদাদের প্রধান কাজীকে বলা হত কাজীউল কুজ্জাত[৩] এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বিচারের কাজে কাজীদেরকে সাহায্য করার জন্য আধুনিক কালের নোটারি পাবলিকের ন্যায় আরেক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত হত– এদেরকে বলা হত আদল।

---

[১] মদীনাতুল ফিল (হাতীর নগর)।

[২] তিনি রোমক ও বাইজান্টাইন আমলের দলপতি ছিলেন।

[৩] রশীদ কর্তৃক নিযুক্ত আবু ইউসূফ প্রথম এই পদে অধিষ্ঠিত হন।

ফৌজদারি বিচারের ভার ন্যস্ত ছিল সাহিবউল মাজালিম নামক বিচারকের হাতে। কিন্তু আদ দীওয়ান আন নজর ফিল মাজালিম বা অভিযোগ তদন্ত বিভাগ সর্বোচ্চ আদালত ছিল। খলিফা নিজেই এবং তাঁর অনুপস্থিতে একজন পধান কর্মকর্তা সভাপতিত্ব করতেন। এই বিভাগের অন্যান্য সদস্য ছিলেন প্রধান কাজী, হাজিব, রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তাগণ এবং তাতে বিশেষভাবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হতেন কযেকজন মুফতী বা আইনজ্ঞ ব্যক্তি। বিবাদী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক হলে বা সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত হলে কাজীর আদেশ কার্যকর করা কঠিন হয়ে পড়ত বলে এই আদালত স্থাপনের প্রয়োজন হয়। কেউই এই আদালতকে অবমাননা করতে সাহসী হত না এবং কেউই এর কঠোরতা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার মত ক্ষমতাশালী ছিল না।

কিন্তু নূরুদ্দিন মাহমুদের সময়ের পূর্বে কোন নিয়মিত উচ্চ আদালত স্থাপিত হয়নি।[১] খিলাফতের পতনের ফলে বিচার-বিভাগের শোচনীয় অবনতি ঘটায় তিনিই সর্বপ্রথম বিভিন্ন বিচারালয়কে একই স্থানে স্থাপিত করে দারউল আদল প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিচার বিভাগের সংগঠন ও উন্নতিবিধান করেন।

সচ্চরিত্রের লোক ব্যতীত কেউই আদালতে প্রমাণপত্র দাখিল করতে বা দলিলের সাক্ষী হতে পারত না। মানবীয় প্রতিভার দ্বারা উদ্ভাবিত অন্যান্য ব্যবস্থার ন্যায় এই ব্যবস্থারও প্রায়ই অপপ্রয়োগ ঘটত।

কৃষি

ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশটি ছিল সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ সরকারের সরাসরি শাসনাধীন ছিল বলে এর কৃষি বিষয়ক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ মনোযোগ দেয়া হত। অসংখ্য খাল মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হত এবং জটিল পানি নিষ্কাশনী ব্যবস্থা দ্বারা জলাভূমিগুলোর পানি নিঃসরিত হত। মাহদী ওয়াসিত জেলায় একটি খাল খনন করেছিলেন, ফলে এক বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ড কৃষির উপযোগী হয়েছিল। মনসুরের এক পিতৃব্য কর্তৃক খোদিত 'ঈসা খাল' ইউফ্রেটিস নদীর তীরে আনবার থেকে বাগদাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে শহরের পশ্চিমাংশে টাইগ্রিস নদীতে পতিত হয়েছিল; এর চারদিকে বড় বড় জাহাজ চলাচল করতে পারত। দুজায়ল[২] খাল তিক্রিতের নিকট মূল নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং এর অনেকগুলো শাখানদী ছিল। এই খাল বাগদাদের উত্তরে অবস্থিত জেলাগুলোর সেচকাজের জন্য ব্যবহৃত হত। টাইগ্রিস নদীর পূর্বদিকের জেলাগুলোও অনুরূপ কৃষি বিষয়ক সুবিধা ভোগ করত। এসব সুবিধা কোন প্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না। সাম্রাজ্যের সর্বত্রই কৃষি ও উদ্যানের উন্নতি বিধানকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করা হত। বর্ষপঞ্জির লেখকগণ বলেন, ঐ সময় ইরাক ও দক্ষিণ পারস্য যথার্থই উদ্যানের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হত। সমগ্র দেশ, বিশেষত বাগদাদ ও কুফার মধ্যবর্তী অঞ্চল সমৃদ্ধ শহর, উন্নয়নশীল গ্রাম ও সুদৃশ্য বাসভবনে সমাকীর্ণ ছিল। সাম্রাজ্যের খনিজ সম্পদগুলোকেও যত্ন সহকারে কাজে লাগান হত। খোরাসানের লৌহ খনি এবং কিরমানের সীসা ও রৌপ্যখনিগুলোতে উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কাজ চলত। তাব্রিজ থেকে চীনা মাটির বাসন ও মার্বেল পাথর, উত্তর পারস্য থেকে সৈন্ধব লবণ ও গন্ধক এবং জর্জিয়া থেকে শৈলজ তৈল ও ন্যাপথা পাওয়া যেত।

---

[১] দজলা বা টাইগ্রিসের ক্ষুদ্রত্ববাচক অর্থ দুজায়ল।

[২] দজলা বা টাইগ্রিসের ক্ষুদ্রত্ববাচক অর্থ দুজায়ল।

শিল্পজাত দ্রব্য

সব রকম শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতিতে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ দান করা হত। বসরার কাঁচ ও সাবান শিল্প সমগ্র সভ্য জগতেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল; মুতাসিমের আমলে এসব শিল্পকলা নতুনভাবে উৎসাহ লাভ করে; কারণ, তিনি বাগদাদ, সামাররা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নগরে নতুন কারখানা খুলেছিলেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় কাগজের কারখানাও স্থাপন করেছিলেন; এর জন্য মিশর থেকে শ্রমিক ও শ্রমিক সর্দার আনা হত; কারণ মিশরে প্রাচীনকাল থেকে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী বিকাশ লাভ করেছিল। পারস্যের সমস্ত প্রধান শহরে জরীর কাজের জন্য রাজকীয় কারখানা বিদ্যমান ছিল এবং সেগুলোতে বিশেষ চিহ্নযুক্ত উচ্চমানের রেশম, সাটিন, বুটিদার, গালিচা প্রভৃতি তৈরি হত। বস্তুত পারস্য, ইরাক ও সিরিয়ার অসংখ্য তাঁত থেকে উৎপন্ন চমৎকার বস্ত্র দ্বারা আরবদের শিল্পোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। রেশম ও আধা রেশমে নির্মিত মস্তকাবরণী রুমালের জন্য কুফা ছিল বিখ্যাত– যা এখনো পশ্চিম এশিয়ায় ব্যবহৃত হয় এবং তা কুফিয়া নামে পরিচিত। খুজিস্তানও (প্রাচীন সুসিয়ানা) তার বয়ন শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পৃথিবীর সর্বত্র তুস্তারের সুদৃশ্য কিংখার, করকুবের মূল্যবান গালিচা এবং সুসের রেশম ও সাটিনের চাহিদা ছিল। অন্যান্য প্রদেশও তাদের চমকপ্রদ শিল্পদ্রব্যের জন্য ছিল সমান প্রসিদ্ধ। সুসানগার্দে ছিল দামাশক রেশমের জরী, উষ্ট্র লোমের বস্ত্র ও গালিচার রাজকীয় কারখানা। এতে সুলতানের জন্য স্পান সিল্কে (কাজ্জু) প্রস্তুত ফুলতোলা পর্দা এবং কাঁচা রেশম, উট ও ছাগলের লোমের দ্রব্যাদিও তৈরি হত। এখানে স্পান শিল্পে চমকপ্রদ অঙ্গাবরণী তৈরি হত। এইগুলোকে শিরাজের ডুরিদার পশমি অঙ্গরাখা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে ধারণা করা হত। খোরাসানের সমৃদ্ধ নগরগুলো কিংখার, গালিচা, কম্বল, ঝালর, গদির আবরণ ও সর্বপ্রকার পশমী বস্ত্রের উৎপাদনে কর্মতৎপর ছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে সাম্রাজ্যের প্রতিটি নগরেরই ধাতু, কাঁচ, পশম, রেশম বা ক্ষৌমবস্ত্রে[১] প্রস্তুত নিজস্ব বিশেষ শিল্পজাত দ্রব্য ছিল। সিরিয়া তার কাঁচ শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই সেখানে বিভিন্ন রঙের ও মীনা করা কাঁচ প্রস্তুত হত। এতে সুবর্ণ ও অন্যান্য রঙের কারুশিল্প পূর্ণতা লাভ করেছিল এবং প্রাচীন লেখকরা কারুকার্যমণ্ডিত বহু প্রসিদ্ধ স্ফটিক খণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। ফাতিমী ধনাগার থেকে একটি বিশেষ পানপাত্র ৩৬০ দীনার মূল্যে বিক্রয় হয়েছিল।[২] সাদা ও নীল রঙের মীনা করা লিপিসহ কাঁচের দীপাধারগুলো মসজিদ ও প্রাসাদে ঝোলানো থাকত এবং ব্যবহার বা বিলাসের সামগ্রী হিসেবে নানা আকার ও প্রকারের পাত্রসমূহের বিশেষ চাহিদা ছিল।

কৃষিজাত দ্রব্যেও দেশ সমানভাবে সমৃদ্ধ ছিল। সাম্রাজ্যের সর্বত্র বার্লি, গম, ধান, খেজুর এবং সব রকমের ফলসহ তুলাও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত।[৩] বৈজ্ঞানিক পন্থায় অনুসৃত ফলের চাষ উল্লেখযোগ্যভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল। আহওয়াজ ও ফার্স ছিল ইক্ষু চাষ ও চিনি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এসব প্রদেশে বিদ্যমান অসংখ্য শোধনাগার ও কারখানা কেবল এশিয়ার ব্যাপক অংশেই নয়, বরং ইউরোপেও দ্রব্য সরবরাহ করত। সেখানে জুনদিশাপুর ছিল পদার্থবিজ্ঞানের বিশ্ববিশ্রুত মহাবিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থল এবং

---

[১] কাজেরুন তার ক্ষৌমবস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

[২] মাকরিসী।

[৩] যেসব কৃষি সমৃদ্ধ দেশের উপর দিয়ে নাসির খসরু পরিভ্রমণ করেছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত মনোজ্ঞ বিবরণী থেকে খিলাফতের গৌরবময় যুগের কৃষির অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মায়াফারিকীণ, খিলাত, আলেপ্পো, টায়ার, সিডন, বেইরুট প্রভৃতি নগরের পাশে তিনি বহু মাইলব্যাপী দোলায়মান শস্য, বিশাল ইক্ষু ক্ষেত, লেবু, জলপাই, খেজুর, কমলালেবু প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষের অগণিত বাগান দেখতে পেয়েছিলেন।

তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদদের আবাসভূমি। সম্ভবত এই মহাবিদ্যালয় শিল্প ও বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করেছিল। চিনি শোধনের জ্ঞান অবশ্যই ঐ নগরেই উৎপত্তি লাভ করে এবং খুজিস্তানেই সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হয়ে তা ব্যবসায়ের ভিত্তিতে আরম্ভ হয়; সেখান থেকে অন্যান্য বহু শিল্পের ন্যায় তা চলে যায় স্পেনে। সাধারণ রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ছিল বার্লি, গম, ধান, ফল, মাজেন্দ্রদানের বিখ্যাত ফুল, চিনি, কাঁচ, লৌহজাত দ্রব্য, রেশম, পশম, ক্ষৌমবস্ত্র, তেল, সব রকমের সুগন্ধী দ্রব্য– যেমন : গোলাপ জল, জাফরান, পদ্ম নির্যাস, খেজুর কুঁড়ি থেকে প্রস্তুত সুগন্ধী, সুবাসিত কেশরাগ, আঙুরের সিরাপ, সুগন্ধী ফুলের তেল ইত্যাদি। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে ছিল ভারতবর্ষ ও এর দক্ষিণ-পূর্বের দ্বীপপুঞ্জ থেকে আনীত মশলা ও ওষুধপত্র, চন্দন কাঠ, মূল্যবান পাথর ও মণিমুক্তা, বাঁশ, আবলুশ কাঠ ও গজদন্ত।

ফারসিস্তান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল; এখানে লবণ, রৌপ্য, লৌহ, সীসা, গন্ধক ও ন্যাপথার খনি ছিল। ইয়েজদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও রৌপ্য পাওয়া যেত।

রাজস্ব

সাম্রাজ্যের রাজস্ব (১) ভূমি রাজস্ব; (২) উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ খাজনা বা আয়কর (উশর, জাকাত-সাদাকাত); (৩) খনি ও চারণভূমির আয়ের এক পঞ্চমাংশ; (৪) অমুসলমানদের নিকট থেকে গৃহীত কর (সামরিক সেবার পরিবর্তে); (৫) বাণিজ্য শুল্ক; (৬) লবণ ও মৎস্য কর; (৭) দোকানদারগণ কর্তৃক সাধারণের স্থান ব্যবহারের জন্য অর্থাৎ রাস্তা ও রাস্তার প্রাঙ্গণে দোকান নির্মাণ ও বিপণি স্থাপনের জন্য প্রদেয় কর; (৮) কল কারখানার উপর আরোপিত কর; (৯) যানবাহন ও বিলাস দ্রব্যের ওপর আরোপিত কর এবং (১০) আমদানি শুল্ক থেকে কর সংগৃহীত হত। কিন্তু খলিফা ওয়াসিক সামুদ্রিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে আমদানি শুল্ক রহিত করেন।

ভন ক্রেমার বলেন, তখনকার দিনের মূলধন বিনিয়োগকারীরা নির্বোধ ছিলেন বলে কারো মনে যে ধারণা হতে পারে তা ভুল। কৃষক সম্প্রদায় ছিল আব্বাসীয় খলিফাদের নিকট এক বিশেষ উদ্বেগের বিষয় এবং সর্বতোভাবে তাদের করভার লাঘব করার চেষ্টা করা হত। মনসুর নগদ টাকার বিনিময়ে গম ও জইয়ের করদান রহিত করে দেন এবং মুকাসিমাহ অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল কর হিসেবে দেয়ার প্রথা প্রবর্তন করেন। অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় কৃষি এবং খেজুর ও ফল গাছের উপর আর্থিক কর ধার্যের পুরাতন পদ্ধতি বহাল থাকে। এর ফলে রাজস্ব আদায়কারীদের পক্ষ থেকে জোর-জবরদস্তি চলতে থাকলে মাহদী তাঁর পিতার প্রবর্তিত নীতি সম্প্রসারিত করেন এবং নির্দেশ দেন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উৎপন্ন দ্রব্যের অনুপাতেই কর ধার্য করা হবে। ভূমি বিশেষভাবে উর্বর হলে এবং তাতে কোন শ্রম না লাগলে চাষী সরকারকে অর্ধেক ফসল দিত; ভূমিতে জল সরবরাহ কষ্টকর ও ব্যয় সাপেক্ষ হলে দিতে হত এক তৃতীয়াংশ; যেখানে তা আরও কষ্টকর ছিল সেখানে কেবলমাত্র এক চতুর্থাংশ দিতে হত এবং এমনকি কখনো এক পঞ্চমাংশ দিতে হত। দ্রাক্ষাকুঞ্জ, খেজুর ক্ষেত, ফলের বাগান এবং অনুরূপ বস্তুর কর নির্ধারণে নগদ টাকায় শস্যের মূল্য নিরূপণ করা হত এবং তার অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ অর্থ খাজনা ধার্য করা হত। উৎপন্ন শস্যের আনুপাতিক হারের প্রথা (মুকাসিমা)[১] বলে অভিহিত এই কর নির্ধারণ প্রথা ছিল প্রাচীন প্রথার বিপরীত।৬ঐ প্রথা জমির পরিমাণের ওপর স্থাপিত ছিল (মুহাসিবাহ)।

---

[১] শব্দটি এখনো ভারবর্ষে প্রচলিত।

২০৪ হিজরি সালে (৮১৯-২০ খ্রিস্টাব্দ) মামুন ভূমি রাজস্ব আরও হ্রাস করেন। এর ফলে সবচেয়ে উর্বর জমির ক্ষেত্রেও রাজস্বের হার অর্ধেকের পরিবর্তে দুই পঞ্চমাংশ ধার্য হয়। কিন্তু ব্যাবিলোনিয়া, কালদীয়া, ইরাক, মেসোপটেমিয়া ও পারস্যে অসংখ্য ভূস্বামী ও নিষ্কর কৃষক ছিল, বিজয়ের প্রাক্কালে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে যাদের রাজস্ব চিরস্থায়ীরূপে নির্ধারিত হয়েছিল। তাদের ওপর আরোপিত করের কোন রকম হেরফের করা যেত না এবং এভাবে তারা সকল হয়রানি থেকে রক্ষা পেয়েছিল। উত্তর পারস্য ও খোরাসানের গ্রাম্য সম্প্রদায়গুলোও একই অনুগ্রহ ভোগ করত। এভাবে জমির কর নির্ধারণের তিনটি পদ্ধতি ছিল। প্রথমত, জমির পরিমাণের (মুহাসিবাহ) ভিত্তিতে নগদ টাকায় অথবা ফসলের বিনিময়ে কিংবা উভয় প্রকারে; দ্বিতীয়ত, উৎপন্ন শস্যের অনুপাতে শস্যের দ্বারা করদান প্রথা (মুকাসিমাহ); তৃতীয়ত, সরকার ও ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে স্বাক্ষরিত পাট্টা বা চুক্তির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করদান প্রথা (মুকাতিয়াহ)। খলিফার অধিকাংশ খাস ভূমি শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনকি কঠোরতম শাসনকালেও প্রায়ই খাজনা মওকুফ করে দেয়া হত। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুতাজিদ আর্থিক বছরকে[১] মার্চের মাঝামাঝি থেকে ১৭ জুন (১১ রবিউল আওয়াল) পর্যন্ত সরিয়ে এনে বছরের সিকি ভাগ খাজনা মওকুফ করে দিয়েছিলেন। পরে তা ২১ জুলাই পর্যন্ত সরিয়ে দিয়ে পুনরায় আরও খাজনা মওকুফ করা হয়েছিল বলে মনে হয়। সাম্রাজ্যের বর্ধিষ্ণু অবস্থা, কৃষক শ্রেণীর উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণবন্ত অবস্থার কথা মনে রাখলে এই হিসেবে আমরা আশ্চর্যবোধ করব না যে, রশীদের বার্ষিক রাজস্ব ছিল, ২৭,২০,০০,০০০ দিরহাম ও ৪৫,০০,০০০ দীনার কিংবা মামুনের দৈনিক খরচ ছিল ৬০০ দীনার।

সামরিক সংগঠন

সিরিয়া বিজয়ের সাথে সাথেই আরবদের অধিকৃত অঞ্চলের উত্তর সীমান্তকে বাইজান্টাইনদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এই কাজ খলিফা উমর (রা.)-এর সময়ে শুরু হয় এবং উমাইয়া শাসনকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে; তবে কেবল মনসুরের সিংহাসনারোহণের পরই তা নিয়মমাফিক আরম্ভ হয়। তরসাস, আদানা, মাসিসিয়া (Mopsuesta), মারআশ (Germanica), মালাতিয়ার (Melitene) মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমর কেন্দ্রগুলো রাজপথের সংযোগস্থল কিংবা গিরিসংকটের প্রান্তদেশে অবস্থিত ছিল, যার মধ্য দিয়েই বিশাল সৈন্যবাহিনী ঢুকে যেতে পারায় সেগুলোকে দখল করে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়। বাইজান্টাইনগণ ১৩৩ হিজরিতে মালাতিয়াকে ধূলিস্যাৎ করে দেয়। ১৩৯ হিজরিতে মনসুর জায়গাটির পুনর্নির্মাণ করে ৪,০০০ সৈন্য দ্বারা সেটিকে সুরক্ষিত করেন, যারা আরামদায়ক সেনানিবাসে বসবাস করত এবং লাভ করত বিশেষ মাহিনা। প্রত্যেক সৈন্য তার খোরাকী ছাড়াও ১০০ দীনারের নিয়মিত বাৎসরিক ভাতার ওপর ১০ দীনার বেশি পেতেন। মনসুর সিলসিয়ার হাদাত, জিবাত্রা (বাইজান্টাইনদের জাপ্ট্রেন), লাওডিসিয়া এবং ফ্রিজিয়া ও কাপাডোসিয়ার অন্যান্য স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন। রশীদ মারআশকে

---

[১] চন্দ্রবর্ষের স্থায়িত্ব না থাকায় ঋতুচক্রের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না, আরবদের আর্থিক বছর গণনা হত (পারসিক) সৌরবর্ষের হিসেবে। মালিক শাহর পঞ্জিকা সংস্কারের পূর্বে মধ্যদিন রেখায় সূর্যের মীন রাশিতে প্রবেশের সময় থেকে আরম্ভ হত। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, তাঁর রাজত্বকালে সৌরবর্ষকে সূর্যের মেষ রাশিতে প্রবেশের সময় থেকে গণনা করা হত। মার্চ মাসের ২১ তারিখে যে মিলন ঘটত ।

সুরক্ষিত করেন এবং সিডনাসের তীরবর্তী প্রাচীন তরসাস নগরীকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে সেখানে মোতায়েন করেন শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী। মারআশের নিকটে তিনি হারুনিয়া দুর্গ নির্মাণ করেন। অন্যদিকে সম্রাজ্ঞী জুবেদা পুনর্নির্মাণ করেন ইসকানদারুন (আলেকজান্দ্রেত্তা) শহরটিকে। সীমান্ত রক্ষার জন্য রশীদ যেসব পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তার একটি পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।[১] পূর্বে যে সীমান্ত অঞ্চলগুলো কিন্নিসরিন নামক সামরিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তিনি সেগুলোকে এক একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করেন, যার অন্তর্ভুক্ত হয় এন্টিয়ক, মেমবিজ (ব্যামবেস বা হায়রাপোলিস), দুলুক (ডোলেচ), কুরিস, (সাইরোজ) প্রভৃতি স্থান এবং সেটি সামরিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হয়; সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৈন্য মোতায়েন করা হয় এবং নির্মিত হয় অসংখ্য নতুন দুর্গ ও কাষ্ঠ প্রাকার। এসব অঞ্চলে অবস্থানরত সৈন্যরা তাদের নির্দিষ্ট বেতন ছাড়াও খেরাকী ও পারিতোষিক লাভ করত। তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র, সমর সজ্জা ও অশ্বসমূহ রাখতে হত উত্তম অবস্থায়। প্রায়শই চাষের জন্য তাদেরকে এবং তাদের পরিবারবর্গকে জমি বণ্টন করা হত। এই প্রথা মামুন ও মুতাসিম বহাল রাখেন। গ্রিকদের অবিরাম আক্রমণের ফলে যেসব অঞ্চল বিধ্বস্ত ও জনশূন্য হয়ে পড়েছিল সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দূরবর্তী প্রদেশসমূহ থেকে অনেক জনগোষ্ঠীর সমুদয় লোককে এই সীমান্ত অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

সীমান্তবর্তী নগরগুলোর ইতিহাস বহু শতাব্দী ব্যাপী পরস্পর মারাত্মক সংঘাতে লিপ্ত এই দুই শক্তির পরিবর্তনশীল পর্যায়সমূহ স্পষ্টভাবে সূচিত করে। সম্ভবত পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই যার প্রতিটি বিন্দু সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের মধ্যবর্তী এই সীমান্ত অঞ্চলের মত এমন রক্তস্নাত হয়েছিল, যার প্রতি পদে সংঘটিত হয়েছিল এত তিক্ত কলহ এমনকি রাইন নদীর সীমান্ত বা লম্বার্ডির প্রান্তরও এ রকম ছিল না। অপেক্ষাকৃত তেজস্বী ও সুদক্ষ উমাইয়া খলিফাদের আমলে আরবরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করে সিলিসিয়া ও কাপাডোসিয়ার অভ্যন্তরে অধিকার কায়েম করেছিল। দ্বিতীয় ইয়েজিদ ও তাঁর দুর্বল উত্তরধিকারীদের সময় এই বাইজান্টাইনগণ তাদের হৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করে। আব্বাসীয়দের সিংহাসনারোহণের পর সাম্রাজ্য নতুন শক্তি সঞ্চয় করে এবং অচিরেই তারা সীমান্ত শহরগুলো পুনরায় জয় করে নেয়। বাইজান্টাইন আক্রমণ ও সন্ধিভঙ্গের ফলে খলিফাগণ প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে বিশাল সেনা অভিযান চালাতে বাধ্য হতেন। সময় সময় এসব বাৎসরিক অভিযান (আস সাইফাহ) যুদ্ধে পরিণত হত। আবার কখনো এইগুলো কেবল বাৎসরিক যুদ্ধ কৌশল রূপেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু সুরক্ষিত চৌকি প্রথা (রিবাত) সিলিসিয়া সিরীয় সীমান্তে সীমাবদ্ধ ছিল না। ট্রান্সক্সিয়ানা, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ায় একই নীতি অনুসরণ করা হত এবং প্রতিটি রক্ষণোপযোগী স্থানে কাষ্ঠ নির্মিত দুর্গ প্রাকার রাখা হত।

সেনাবাহিনী

যুদ্ধে নিযুক্ত সেনাবাহিনী দুই শ্রেণীর সৈন্য নিয়ে গঠিত হত, যথা : নিয়মিত বাহিনী,[২] যারা ছিল সরকারের বেতনভোগী এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী,[৩] যারা কর্তব্যবোধে যোগদান করত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে থাকাকালীন যারা কেবল রসদ পেত। গৃহে অনুপস্থিত

---

[১] পূর্বে দেখুন।

[২] আরবীতে মুরতাজিকাহ (বেতনভোগী)।

[৩] মুতাতাওয়িআহ(স্বেচ্ছাসেবক)।

থাকাকালে তাদের স্ত্রীলোক ও শিশুরা জিনিসপত্র বা নগদ টাকার দ্বারা সাহায্য পেত। নিয়মিত বাহিনী বিভিন্ন শ্রেণীর অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। পদাতিক সৈন্যরা (হারবিয়াহ) বর্শা, বল্লম, তরবারি ও ঢাল দ্বারা সজ্জিত হত। তীরন্দাজরা (রামিয়াহ) তরবারি ও ঢালের সাথে তীর ধনুকও রাখত। পদাতিক সৈন্যগণ শিরস্ত্রাণ ও বক্ষ আবরণী পরিধান করত এবং তাদের বাহু ও পদযুগল রক্ষিত থাকত লোহার খাপে। প্রত্যেক সৈন্যবাহিনীতে সংশ্লিষ্ট থাকত একদল ন্যাপথা নিক্ষেপণকারী (নফফাতিন), যারা শত্রুর দিকে ন্যাপথা বা গ্রিক অগ্নি কিংবা বিশেষভাবে প্রস্তুত অগ্নিগোলক নিক্ষেপ করত। আর ছিল একদল সুড়ঙ্গ খননকারী, যারা তাদের ঢাল ও তরবারির সাথে কোদাল সঙ্গে নিয়ে যেত। কথিত আছে, অগ্নি নিক্ষেপণকারীরা অগ্নি প্রতিরোধক পোশাক দ্বারা সুরক্ষিত থাকত, যা পরে তারা শত্রুর ধ্বংসোন্মুক প্রজ্বলিত ঘাঁটিগুলোতে নির্বিঘ্নে ঢুকে যেতে পারত। সাধারণত ১০,০০০ লোক নিয়ে একটি বাহিনী গঠিত হত এবং একজন আমীর বা সৈন্যাধ্যক্ষ তার নেতৃত্ব দিতেন। ১০,০০০ লোকের স্থলবাহিনীর নেতা ছিলেন কায়িদ; অন্যদিকে ১০০ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ককে বলা হত নকীব (সেঞ্চুরিয়ন)। দশজনের উপর ছিল একজন আরিফ (ডেকুরিয়ন)। সৈন্যরা তাদের বিভাগ ও অস্ত্রশস্ত্র অনুসারে সমরসজ্জা পরিধান করত। মুতাওয়াকিলের সময় সকল নিয়মিত সৈন্যকে হালকা বাদামী রঙের জামা দেয়া হত। তাদেরকে পারসি কায়দায় কটিবন্ধের সাথে তরবারি ধারণ করতে হত।[১]

বিদেশী সৈন্য দ্বারা গঠিত একটি বিশেষ বাহিনী রাজকীয় দেহরক্ষীর কাজ করত।[২] তারা উচ্চতর বেতন পেত এবং চমকপ্রদ ইউনিফর্ম পরিধান করত। মুতাসিম তাঁর দেহরক্ষীদেরকে দামিশকের (রেশমের পোশাক) সাথে সোনার কটিবন্ধ দ্বারা সজ্জিত করতেন।

রাজকীয় দেহরক্ষীদল ব্যতীত আরো একদল সৈন্যবাহিনী ছিল তারা বাহ্যত কিছুটা নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। তাদেরকে বলা হত গার্হস্থ্য বাহিনী।[৩] পরবর্তীকালে তারা জানদার (corps d'elite) নাম লাভ করে।

আব্বাসীয় যুগে খলিফার ব্যক্তিগত রক্ষীদেরকে আল গিলমানউল হুজারিয়া (খাস কামরার বালভৃত্য)[৪] বলা হত। তারা খলিফার বালক-ভৃত্যের কাজ করত, কিন্তু বয়োপ্রাপ্ত হলেও দেহরক্ষীর কাজ করত। এসব অল্পবয়স্করা দরবারে শিক্ষালাভ করত এবং যত্নের সাথে সামরিক কুচকাওয়াজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হত। তাদের আলাদা সেনানিবাস ছিল, যেখানে তারা আংশিক সন্ন্যাসী ও আংশিক সামরিক বাহিনীর মত সুশৃঙ্খলাধীনে বাস করত।

---

[১] আরবগণ কাঁধ থেকে ঝুলিয়ে তরবারি ধারণ করত।

[২] তারা আর-রাজালুল মুসাফিরাত নামে পরিচিত ছিল। মুনতাসিরের মৃত্যুর পর তারা প্রকৃতপক্ষে প্রিটোরিয়ান রক্ষীদলের ভূমিকা পালন করত।

[৩] আল মাদুমাত। মুতাসিমের আমলে ইতাখ নামে একজন তুর্কোমান এই বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। মুতাওয়াকিল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ইতাখ উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হন এবং এক সময় পশ্চিমী ও তুর্কী রক্ষীদের সৈন্যাধ্যক্ষ, সর্বোচ্চ কোষাধ্যক্ষ, ডাক বিভাগের অধিকর্তা এবং প্রাসাদাধ্যক্ষের পদ দখল করেন। এতে দেখা যায় যে, এক ব্যক্তির পক্ষে বহু পদ লাভের কথা আরবদের অজানা ছিল না।

[৪] ফাতিমীদের আমলে তাদের বলা হত সিবয়ানুল হুজার অর্থাৎ খাস কামরার বালক।

যন্ত্রবিজ্ঞানী (ইঞ্জিনিয়ার)

সৈন্যবাহিনীর অভিযানকালে একদল বাছাই করা যন্ত্রবিজ্ঞানী[১] সহযাত্রী হতেন। এই কর্মচারীদের অনেকে প্রতিটি দুর্গ ও নগরে অবস্থান করতেন। যন্ত্রবিজ্ঞানীদের প্রধানকে আমীরউল মাজানিকীন বলা হত। তাঁরা সচরাচর নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে (জুনদ) কর্মজীবন শুরু করতেন এবং পরে বিশেষ সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত হতেন অথবা বিশেষ স্থানে নিযুক্ত হয়ে সেখানেই অবস্থান করতেন। এসব যন্ত্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন ইয়াকুব বিন সাবির আল মাজানিকী (ইঞ্জিনিয়ার)। অন্যদের ন্যায় তিনিও নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং বাগদাদে অবস্থানকারী যন্ত্রবিজ্ঞানীদের প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর বিদ্যাবত্তা ও সমরকুশলতার জন্য সমানভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং কলম ও তরবারি উভয়ের সাহায্যেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি উমদাতুল মাসালিক[২] নামে যন্ত্রবিজ্ঞান সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে ইবন খাল্লিকান বলেন, 'যুদ্ধ সম্পর্কীয় প্রতিটি বিষয়, যথা : যুদ্ধের শ্রেণীবিন্যাস, দুর্গ নির্মাণ, দুর্গ দখল, অশ্বারোহণ কৌশল, কারিগরি বিদ্যা, দুর্গ অবরোধ, অশ্বারোহণ সংক্রান্ত কুচকাওয়াজ, যুদ্ধাশ্ব, সকল প্রকার অস্ত্রের ব্যবহার, সামরিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত, সম্মুখ সমর, বিভিন্ন রকমের অশ্বারোহণ এবং অশ্বসমূহের গুণাবলির কথা এতে আলোচিত হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতাল ও পরিবহন ব্যবস্থা

যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় সৈন্যবাহিনীর সাথে একদল চিকিৎসক ও পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধপত্রবাহী একটি হাসপাতাল থাকত। এই হাসপাতালে উষ্ট্রবাহিত শিবিকার আকারে আহতদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স সংশ্লিষ্ট থাকত। রশীদ ও মামুনের যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালের তাঁবু, সরঞ্জাম ও ওষুধপত্র বহনের জন্য প্রচুর পরিমাণ উট ও খচ্চরের প্রয়োজন হত। এমনকি পরবর্তীকালে সেলজুক বংশীয় সুলতান মাহমুদের মত অপেক্ষাকৃত অখ্যাতনামা বাদশাহদের আমলেও সমর হাসপাতালের জন্য চল্লিশটি উট বোঝাই মালপত্রের প্রয়োজন হত।

প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার এবং অস্ত্র (আর্সেনাল)[৩] নির্মাণের জন্য কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। অভিজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা[৪] এগুলো প্রায়শই পরিদর্শন করতেন। অশ্বারোহীরা উমাইয়া আমলের ন্যায় তরবারি, সমর কুঠার ও বর্শা ব্যবহার করত এবং প্রায় সবসময় বর্মসহ লোহার শিরস্ত্রাণ পরিধান করত। প্রত্যেক সৈন্যবাহিনীতে সংশ্লিষ্ট থাকত একদল খোরাসানী কিংবা উত্তর পারসিক অশ্বারোহী তীরন্দাজ, যারা প্রাচীনকালে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে তীর নিক্ষেপের জন্য বিখ্যাত ছিল।[৫] বিখ্যাত সেনাপতি মুহাল্লিব কর্তৃক আবদুল মালিকের সময় লোহনির্মিত পা-দান প্রবর্তিত হয়েছিল।[৬]

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, প্রত্যেক সুস্থ-সমর্থ আরবকে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সৈনিকরা কেবল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত

---

[১] মানজানিকীন বলা হত।

[২] এর পুরো নাম– উমদাতুল মাসালিক ফি সিয়াসাতুল মামালিক।

[৩] দারউস সানদ। আর্সেনাল বস্তুতপক্ষে আরবী থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

[৪] নাজির বলা হত।

[৫] গার্থিয়ানরা এই কাজের জন্য বিখ্যাত ছিল।

[৬] পূর্বে দেখুন।

হয়েই নয়, বরং তৎপরতার সাথে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করত, কিন্তু তা বিফল হলে সৈন্য সংগ্রহে জোর জবরদস্তি করা হত এবং হাজ্জাজ একবার বসরায় এই প্রথা সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন।

আরবদের সামরিক শক্তির অধঃপতন

প্রকৃতপক্ষে মুকতাদিরের শাসনকালেই আরবদের সামরিক শক্তির অধঃপতন শুরু হয়। এর প্রধান কারণ ছিল সৈন্যদের বেতন প্রদানের পদ্ধতির পরিবর্তন। এই সময় থেকে সৈন্যরা সরাসরি রাজকীয় কোষাগার থেকে বেতন না পেয়ে তা পেত শাসনকর্তা বা বিভাগীয় সেনাপতির নিকট থেকে। এই উদ্দেশে এই কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন অঞ্চল প্রদান করা হত। বস্তুত রাজকোষ প্রায় নিঃশেষিত হয়ে পড়ায় এই পরিবর্তন সাধিত হয়। কয়েকটি প্রদেশে রাজস্ব আদায় হত না, অন্যান্য প্রদেশ থেকে তাদের পূর্ববর্তী প্রদেয় রাজস্বের একাংশ মাত্র আদায় হত। একান্ত নিয়মমাফিক আমদানি থেকে অমিতব্যয়ী ও বিলাসী দরবারসহ রাষ্ট্রের সমগ্র ব্যয় নির্বাহ অসম্ভব ছিল। তদনুসারে মুকতাদির তাঁর সভাসদগণকে এই শর্তে প্রদেশগুলো প্রদান করেন যে, তাঁরা নিজ দায়িত্বে যাবতীয় রাজস্ব আদায় করে তা থেকে শাসন সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ ও সৈন্যদের বেতন প্রদান করবেন এবং বার্ষিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করবেন বাগদাদের দরবারে। এসব মঞ্জুরীকে বলা হত ইকতিয়াত। এই নির্বোধ নীতির স্বাভাবিক ফলস্বরূপ সাম্রাজ্যে দ্রুত ভাঙন ধরে। বুওয়াইহীরা বেতনের পরিবর্তে সৈন্যদেরকে জমি দান করত। এই সামরিক মঞ্জুরী ছিল সম্পূর্ণ করমুক্ত এবং জায়গীর প্রাপ্ত কর্মচারী ও সৈনিকরাই তার আয় ভোগ করত। এর ফলে সভ্যতা পিছিয়ে পড়ে এবং সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও শস্যশালী প্রদেশগুলো অচিরেই নিঃস্ব ও জনশূন্য হয়ে যায়। আরব জাতি ক্রমশ বিদেশীদের দ্বারা জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। ক্রুসেড শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল বহুলাংশে ইউরোপের অনুরূপ। এটি বহু ক্ষুদ্র রাজ্য ও জায়গীরে বিভক্ত ছিল, যারা খলিফাকে তাদের ধর্মীয় নেতা বলে স্বীকার করত, পাশ্চাত্যে পোপ যেভাবে স্বীকৃত হতেন। কোন স্বার্থগত সংহতি ছাড়াই তারা পরস্পরের বিরোধিতা করত। তাদের স্বার্থপর প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও উচ্চাভিলাষ দ্বারা সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে ফেলেছিল।

সামরিক যায়গীর প্রথা

সেলজুকদের সময় সামরিক জায়গীর প্রথা আরও বৃদ্ধি পায়। শাসক পরিবারের প্রতিটি লোক ও প্রত্যেক আমীরকে কোন শহর বা জেলা দেয়া হত, সেখানে তাঁরা সর্বময় কর্তৃত্ব সহকারে শাসন করতেন এবং সামন্ত প্রভুর (সাহিব-উল মাকাল) সমূহ ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। সামন্তরাজ সুলতানকে বার্ষিক কর দিতেন এবং যুদ্ধের সময় নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সুলতানের পতাকাতলে সমরক্ষেত্রে যাত্রা করতেন, যে সৈন্যদের সমরসজ্জা ও ভরণপোষণের ব্যয় তাঁকেই নির্বাহ করতে হত। কেবল ইরাকেই এ ধরনের চল্লিশ জন সামন্তরাজ ছিলেন। অল্প কয়েকজন ছিলেন আরব পরিবারভুক্ত।[১] তুর্কী ও তাতারগণ যেখানেই গেছে সেখাইে এই সামরিক জায়গীর প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে। তারাই এক্ষণে সমগ্র পশ্চিম এশিয়ার বিজয়ী ও শাসক জাতি বলে পরিগণিত। মিশর ও পশ্চিম আফ্রিকায়, পারস্য ও ভারতে এবং পরিশেষে এমনকি বসফোরাস প্রণালী অতিক্রম করে পূর্ব ইউরোপে তাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন রয়েছে। তুরস্কে সুলতান মাহমুদের শাসন-সংস্কার ও নিয়মিত সৈন্যদল প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথা লোপ পায়।

---

[১] দুবাইসের পরিবার হিল্লাহ এবং মুনকীজ বংশীয়গণ শায়জার শাসন করেছিলেন। এছাড়াও আরও কয়েকটি আরব পরিবার ছিল।

সৈন্যদের বেতন

উমাইয়ারদের আমলে পদাতিক সৈন্যের গড়পড়তা বেতন ছিল বছরে ১০০০ দিরহাম (৪০ পাউন্ড স্টার্লিং)। সাফফাহ এটিকে কমিয়ে মাসিক আশি দিরহাম করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। অশ্বারোহী সৈন্যগণ তাদের যোদ্ধা ভাইয়ের ন্যায় সাময়িক পারিতোষিকাদিসহ এর দ্বিগুণ বেতন পেত। তবে যে প্রদেশে তারা অবস্থান করত সেই প্রদেশ অনুসারে সৈন্যদের বেতনের তারতম্য হত বলে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মামুন ইরাকে[১] তাঁর পদাতিক সৈন্যদেরকে রসদ ছাড়া মাসে বিশ দিরহাম বেতন দিতেন; অশ্বারোহী সৈন্যদেরকে দিতেন চল্লিশ দিরহাম এবং নিয়মিত ভাতা; পক্ষান্তরে দামিশকের সামরিক বাহিনী পেত যথাক্রমে চল্লিশ ও একশ দিরহাম। পরবর্তীকালে সৈন্যদের বেতন হ্রাস করার দুটি কারণ ছিল; প্রথমত, সোনার মূল্যবৃদ্ধি[২] এবং দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতির ফলে সৈন্য সংগ্রহের জন্য বিশাল অঞ্চল খলিফার অধিকারে থাকা। যে কোন বিদেশী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে খাঁটি আরবদের ন্যায় সমভাবে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারবে– এই মহান গণতান্ত্রিক নীতি ধর্ম বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল।

আশ্রিত প্রথা

বিজিত জাতির লোকজনকে শাসকজাতির সাথে সংযুক্ত করার আরেকটি ব্যবস্থা সমানভাবে কার্যকরী ছিল। এটি ছিল ওয়ালা বা আশ্রিত প্রথা। একজন পারসি, গ্রিক, বার্বার বা স্লাভ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সাথে সাথেই কোন বৃহৎ আরব গোত্রের মৈত্রী বন্ধন লাভ করত কিংবা আশ্রিতে পরিণত হত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির, এমনকি শাসক পরিবারেও ওয়ালা প্রথার নীতি অনুসারে আশ্রয়দাতার সাথে তার সরসারি সম্পর্ক স্থাপিত হত। এই কারণে পরবর্তী খলিফাগণ যুদ্ধ বাহিনীর জন্য শুধু আরব উপদ্বীপের সামরিক গোত্রসমূহের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। ভ্যারাঙ্গিয়ান, ফ্রাঙ্ক, পারসি, গ্রিক, আফ্রিকান, বার্বাররা বেতনের আশায় প্রলুব্ধ হয়ে তাদের পতাকাতলে সমবেত হত। এর ফলে একদিকে যেমন সৈন্য সংগ্রহের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি পুরাতন সৈন্যদের উৎসাহ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

সৈন্যবাহিনীর গঠন

এই বেতনভোগী সৈন্যরা নির্ভরযোগ্য ছিল না এবং দুর্বল শাসকদের আমলে সৈন্যবাহিনীতে তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। মনসুরের আমলে সৈন্যবাহিনী তিনটি বিরাট দলে বিভক্ত ছিল, যেমন : (১) মুদার বংশীয় (২) হিময়ার বংশীয় এবং (৩) পারস্যদেশীয়। এদের সাথে মুতাসিম তুর্কোমান ও আফ্রিকানদের নিয়ে গঠিত চতুর্থ বাহিনীটি সংযোজিত করেন। প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে ও অভিযান পথে সৈন্যদল পাঁচটি অংশে বিভক্ত ছিল; যেমন : (১) কেন্দ্র (কালব)– এই অংশে সচরাচর সৈন্যাধ্যক্ষ অবস্থান করতেন, (২) দক্ষিণ পার্শ্ব (মাইসারাহ), (৩) বাম পার্শ্ব (মাইমানাহ), (৪) অগ্রগামী দল (তালিয়াহ) এবং (৫) পশ্চাৎ রক্ষী দল (সাকাহ)। অভিযান কালে দীপ্তিমান বর্ম ও ইস্পাতের উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ পরিধান করে দীর্ঘ বর্ষা ফলকে উটপাখির কালো পালক ছড়িয়ে লঘুগতি অশ্বারোহী অগ্রগামী দল সর্বদাই মূল

---

[১] মামুনের সময় (২০১ হিজরি বা ৮১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দ) ইরাকে দখলদার সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১,২৫,০০০।

[২] খলিফা উমরের সময় দীনারের মূল্য ছিল ১০ দিরহাম। মামুনের সময় এর মূল্য ছিল ১৫ দিরহাম। এক দীনারের মূল্য ছিল ১৩ শিলিং ৭ পেন্স।

বাহিনী থেকে কয়েক মাইল আগে থাকত। স্কাউট নিয়োগ প্রথা প্রচলিত ছিল। কোতয়াবা[১] তার স্কাউটদেরকে শুধু সমর পর্যবেক্ষণের কাজেই নিযুক্ত করতেন না, বরং সম্মুখবর্তী দেশসমূহের মানচিত্র তৈরির কাজেও তাদের লাগাতেন এবং তাঁর সময় থেকে এটি প্রথাসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। প্রত্যেক সেনাপতি হয় নিজের স্কাউটদের সাহায্যে মানচিত্র প্রস্তুত করতেন কিংবা সামরিক সদর দফতর থেকে তা লাভ করতেন।

শত্রু ভূমির মধ্য দিয়ে সীমাহীন শ্রেণীতে বিন্যস্ত আরব বাহিনীর আঁকা-বাঁকা পথে গমনের দৃশ্য ছিল অবশ্যই অভিভূত করার মত। উভয় পাশে বিপুল সংখ্যক তীরন্দাজ বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে বিশ্বাল অশ্বারোহী দল সবার আগে গমন করত। তীরন্দাজগণ প্রায় অশ্বারোহীদের ঘোড়ার মতই দৌড়াতে পারত। তাদের পিছনে ঘনীভূত সংখ্যায় ও অদ্ভুত নিয়মানুবর্তিতার সাথে আসত পদাতিক বাহিনী। তাদের মধ্যস্থলে খাদ্যসামগ্রী, তাঁবু ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লম্বা উটের সারি পথ অতিক্রম করত। অন্যদিকে পীড়িত ও আহতদের জন্য রোগী পরিবহনের গাড়ি বা খাটিয়া এবং যুদ্ধের যন্ত্রপাতি, যেমন : ক্ষেপণাস্ত্র, প্রস্তর নিক্ষেপক যন্ত্র প্রভৃতিতে বোঝাই করা উট, খচ্চর ও অশ্বদল তাদের পশ্চাৎভাগে গমন করত। যদি খলিফা বা কোন শাহজাদা ঘটনাক্রমে সৈন্যদলের সঙ্গে থাকতেন তাহলে দৃশ্যটি হত আরও জমকালো। দেহরক্ষীদের উজ্জ্বল উর্দি, রাজকীয় চিহ্ন সমন্বিত স্বর্ণখচিত পতাকা এবং জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে সজ্জিত সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ এক চমকপ্রদ দৃশ্যের অবতারণা করত। শিবির স্থাপনোপযোগী নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোমাত্র অগ্রগামী সেনাদল পরিখা খনন করত। কারণ আরব বাহিনী অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন না করে কোন স্থানে শিবির স্থাপন করত না। মূল বাহিনী তাঁবুতে পৌঁছলে সেগুলোকে সাধারণ শহরের মত রাস্তাঘাট, বাজার ও প্রাঙ্গণ দ্বারা সুবিন্যস্ত করা হত। কোথাও কোন গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ছিল না; শীঘ্রই রসদাদি বিতরণ করা হত; প্রজ্বলিত হত শিবিরাগ্নি, কেতলি গরম করতে দেয়া হত এবং অনাড়ম্বর নৈশ ভোজের পর খলিফা কিংবা তাঁর অনুপস্থিতিতে কাজীউল আসকারের[২] নেতৃত্বে এশার নামাজ পড়া হলে সৈন্যরা চক্রকারে বসে যুদ্ধ ও দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী অথবা বীনা ও বাঁশির সাহায্যে গীত, প্রাচীন কবিতার আবৃত্তি শ্রবণ করতেন। যে পর্যন্ত নক্ষত্ররাজী অস্তগমনোন্মুখ না হত সে পর্যন্ত নিস্তব্ধতা ও বিশ্রাম শিবির ও তার অধিবাসীদের আচ্ছন্ন করত না।

সৈন্যদের বিন্যাস

আরব সৈন্যদের প্রাথমিক গঠন বিন্যাস হত পংক্তি অনুসারে; আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয় উদ্দেশেই সৈন্যদের ঘন সন্নিবিষ্ট এক বা দুই পংক্তিতে সাজানো হত। দ্বিতীয় মারওয়ানের আমলে যুদ্ধ পদ্ধতিতে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয় এবং আক্রমণ ও আত্মরক্ষা দৃঢ় ও মজবুত দলের সাহায্যে সাধিত হত। জাবের যুদ্ধে উভয় পক্ষই এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল।

যুদ্ধ কৌশল

ইবনুল আসির কর্তৃক বর্ণিত পরবর্তী বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাসিবীন প্রান্তরে। এই যুদ্ধে আবু মুসলিম আবদুল্লাহ বিন আলীকে পরাজিত করেন। এ উপলক্ষে খোরাসানী সেনাপতির যুদ্ধ কৌশল ও সৈন্য পরিচালন পদ্ধতিতে আরব জাতির সামরিক উন্নতির

---

[১] পূর্বে দ্রষ্টব্য।

[২] সামরিক বিভাগের বিচারপতি।

পরিচয় পাওয়া যায়। একটি উঁচু জায়গায় অবস্থান করে তিনি যুদ্ধ পরিদর্শন, আদেশ প্রদান, ভুল-ত্রুটি সংশোধন এবং দূত বা শিবির সহকারীদের সাহায্যে সামরিক ব্যবস্থাপনা চালিয়েছিলেন। এই শিবির সহকারীরা অবিরাম তাঁর ও তাঁর বিভাগীয় অধিকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করত।[১] আক্রমণ মুকাবিলা করার সময় পদাতিক সৈন্যগণ বর্গক্ষেত্রে গঠন করত; তারা শত্রুর দিকে ঝুঁকিয়ে সামনের দিকে তাদের দীর্ঘ বর্শা ফলক পুঁতে দিত এবং সামনে ঢাল রেখে মাটিতে একটি হাঁটু গেড়ে বসে কৌশলে উদ্ভাবিত লৌহ ফলকযুক্ত কাষ্ঠদণ্ডের অন্তরাল থেকে বিদ্ধকারী বর্ষা সহযোগে তারা শত্রুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকত। ভারী অস্ত্রবাহী পদাতিকদের ঠিক পিছনেই ছিল তীরন্দাজদের অবস্থান, পক্ষান্তরে পশ্চাতে ও পার্শ্বদ্বয়ে অশ্বারোহী সৈন্যরা অবস্থান করত। শত্রুর আগমন ঘটলেই তীরন্দাজরা প্রচণ্ডবেগে অজস্র তীর নিক্ষেপ করত, অন্যদিকে পদাতিকরা তাদের স্থানে অটল থেকে প্রয়োগ করত তাদের বর্ষা। একই সময়ে অশ্বারোহী সৈন্যরা মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান দিয়ে সবেগে বেরিয়ে আসত এবং আক্রমণ করত আগুয়ান শত্রুদলকে। এভাবে যুদ্ধ করেই আরবরা প্রায়শই বিজয়লাভ করত। যে মুহূর্তে শত্রু পশ্চাদগামী হচ্ছে বলে মনে হত তখনই প্রধান সৈন্যদল অথবা সংরক্ষিত বাহিনী এগিয়ে এসে চরম আঘাত হানত। অশ্বারোহী সৈন্য কিংবা অশ্বারোহী তীরন্দাজরাই সব সময় অনুসরণের কাজ সম্পাদন করত। আক্রমণের সময়ও অনুরূপ শ্রেণীবিন্যাস ও কলা কৌশল প্রয়োগ করা হত।

প্রতিবেশী জাতিসমূহের উপর আরবদের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তাদের সামরিক সংগঠনের মধ্যেই নয়, বরং তাদের গতির ক্ষিপ্রতার মধ্যেও নিহিত ছিল। গ্রিকরা যেখানে তাদের মালপত্র ও খাদ্যসামগ্রী খচ্চর, গাধা ও ঘোড়া চালিত মালগাড়িতে টেনে নিয়ে যেত, আরবরা সেখানে প্রায়ই উট নিয়োগ করত। এই কারণে দ্রুত গমন সম্ভব হত এবং বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে সৈন্যসামন্ত, রসদসামগ্রী, মালপত্র, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি স্থানান্তরিত করা যেত। একজন আধুনিক ঐতিহাসিকের মন্তব্য, আরবরা উটের সাহায্যেই সিরিয়া জয় করেছিল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হলে পদাতিক সৈন্যদেরকে ঘোড়া বা উটও দেয়া হত। অনতিদূর দ্রুত অভিযানে প্রায়ই প্রত্যেক অশ্বারোহী তার পিছনে নিত একজন পদাতিক সৈন্যকে। আমরা এক শত্রুর নিকট থেকে আরবদের সামরিক কৌশল সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাই। আরব সাম্রাজ্য যখন তার শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সেই সময় মুতামিদ, মুতাজিদ, মুকতাফী ও মুকতাদিরের সমসাময়িক বিজ্ঞ আখ্যাপ্রাপ্ত ষষ্ঠ লিও[২] বর্বরদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশে বদ্ধপরিকর হয়েও তাদের সম্পর্কে কিছুটা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, অবধারিতভাবেই তাদের যুদ্ধ-বিন্যাস ছিল দীর্ঘ বর্গক্ষেত্রাকার, ফলে আক্রমণ করা দুঃসাধ্য ছিল এবং আত্মরক্ষার পক্ষেও তা ছিল বিশেষ সুবিধাজনক। অভিযানকাল ও যুদ্ধক্ষেত্র– উভয় অবস্থাতেই এই শৃঙ্খলা কঠোরভাবে রক্ষিত হত। আরবরা দৃঢ় ও অটলভাবে তাদের স্থান রক্ষা করত, ফলে তারা তাড়াহুড়া করে আক্রমণ করতে বা একবার যুদ্ধ আরম্ভ হলে শীঘ্রই তা শেষ করতে প্ররোচিত হত না। সাধারণভাবে তারা আক্রমণের জন্য প্রতীক্ষা করাই পছন্দ করত, কিন্তু প্রথম আক্রমণ ব্যাহত হয়েছে দেখলেই তারা সর্বশক্তি নিয়ে অগ্রসর হত। স্থল ও পানিপথের যুদ্ধ– উভয় ক্ষেত্রেই তারা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করত। প্রথমে তারা শত্রুর দিকে বর্ষা ও তীর নিক্ষেপ করত, তারপর ঢালগুলো পরস্পরের অতি সন্নিকটবর্তী করে সুসজ্জিত শ্রেণীতে আক্রমণ শুরু করত। যুদ্ধবিগ্রহে সতর্কতা ও চমৎকার ব্যবস্থাপনার জন্য আরবরা সকল জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যতা অর্জন করেছিল। তারা জোরপূর্বক সৈন্যদলভুক্ত না হয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে যুদ্ধে যেত। ধনীরা স্বদেশের জন্য যুদ্ধে যোগ দিয়ে মৃত্যুবরণ করত এবং দরিদ্ররা যেত লুটের মালের জন্য। দেশীবাসীগণ তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র দিত এবং দরিদ্র ও অসহায় লোকদের

---

[১] কাদেসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সাদ ইবন ওয়াককাস লিখিত আদেশ দ্বারা সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন।

[২] ৯১২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হয়।

অস্ত্রশস্ত্রের জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাগ্রহে অর্থ সাহায্য করত। কালচার আনডার দ্য খালিফস[১] নামক গ্রন্থ প্রণয়নকারী ঐতিহাসিক এই বিষয়ে মন্তব্য করেন যে, সম্রাট (অর্থাৎ লিও) যে আরবদেরকে বর্বর ও অবিশ্বাসী বলে অভিহিত করেছেন তারা সেই সময়ের প্রগতি ও সভ্যতার ধারক বলে বিবেচিত হলেও তিনি তাদেরকে সংস্কৃতির দিক দিয়ে পতনোন্মুখ বাইজান্টাইনদের চেয়ে বেশি উন্নত বলে মনে করেননি এবং তিনি আরও বলেন, বাইজান্টাইনরা যে বর্বর নামে অন্যদের আখ্যায়িত করে তার অনেক কিছুতেই প্রমাণিত হয় যে, তারা নিজেরাই ঐ নামের অনেক বেশি উপযুক্ত। আমরা লিওর নিকট থেকে জানতে পারি যে, তারা আরবদের দিকে, বিশেষভাবে তাদের অশ্বারোহী সৈন্যদের দিকে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করতেন। যেহেতু আরব অশ্বারোহীরা নিজের জীবনের চেয়ে অশ্বকে বেশি ভালবাসত, সেহেতু তারা প্রায়শই বিষাক্ত শরাঘাতে অশ্বকে মরতে দেয়ার চেয়ে পশ্চাদপসরণই শ্রেয় মনে করত। শত্রুর গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করা ছিল বাইজান্টাইনদের একটি রীতি, অন্যদিকে আরবরা এ ব্যাপারে বিশেষ বিধি-নিষেধ আরোপ করত। লুটের মাল সম্পর্কে বাইজান্টাইনদের কোন নিয়ম ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের ধর্মীয় আইন কঠোর নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছিল। পুরাতন নিয়ম-কানুন শিথিল না হওয়া পর্যন্ত ঐ নীতিসমূহ কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয়েছিল। আরবদের স্বেচ্ছায় সামরিক চাকরিতে যোগদান সম্পর্কিত পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ থেকে গ্রিকদের চেয়ে তাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।'

সেনাপতির অধীনে যখন ক্ষিপ্রগতি অশ্বারোহী সৈন্য থাকত তখন জারেবাসের (প্রতিবন্ধক) ব্যবহারও বিরল ছিল না। সৈন্যরা লটবহরের সাহায্যে একটি জারেবা (প্রতিবন্ধক) গঠন করত এবং প্রথম আক্রমণে ব্যর্থ হলে ক্ষতির সংস্কার সাধন করে নতুনভাবে শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য সাধারণত এই রক্ষাব্যবস্থার পিছনে পশ্চাদসরণ করত।

পার্বত্য যুদ্ধে আরবরা ছিল সুনিপুণ। বাবেকের বিরুদ্ধে আফশিনের অভিযানগুলো যত্ন-সহকারে পরিকল্পিত ও সুনিপুণভাবে পরিচালিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। বিদ্রোহীরা উঁচু মাটির বাঁধ ও পাথরের পরিখা (সঙ্গর) ব্যবহার করতে জানত এবং তারা পর্বত চূড়া থেকে তাদের আক্রমণকারীদের উপর প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড ছুঁড়ে দিত। তীরন্দাজদের সাহায্যে এবং নিক্ষেপণকারী যন্ত্র থেকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে আফশিন পর্বতচূড়া শত্রুমুক্ত করেছিলেন; পরে সেগুলো দখল করে নিয়েছিলেন তাঁর সৈন্যদের সাহায্যে, আর এভাবেই ক্রমশ শত্রু দেশের অভ্যন্তরে অগ্রসর হয়েছিলেন। আরবদের অবরোধের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল শরনিক্ষেপক যন্ত্র, প্রস্তর নিক্ষেপক যন্ত্র (মানজানিক) ও প্রাচীর ভাঙার যন্ত্র (লাতিন টেস্টুডু, আরবী দাব্বাবাহ); শেষোক্ত যন্ত্রের সাহায্যে তারা এমন মজবুতভাবে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করত যে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডগুলো উড়ে গিয়ে সরলরেখার মত প্রাচীরের গায়ে লাগত এবং সেগুলোকে বিদীর্ণ করে দিত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে আরবরা বারুদের ব্যবহার প্রচলন করে এবং যে সুলতান বাইবার্স আইন জালুতের যুদ্ধে তাতারদের পরাজিত করেছিলেন তাঁর সৈন্যবাহিনীতে একদল বন্দুকধারী ছিল।

নৌ-বাহিনী

সিরিয়া ও মিশর বিজয়ের সাথে সাথে এক বিস্তীর্ণ উপকূল ভাগ আরবদের অধিকারে চলে আসে। সামুদ্রিক বন্দর রক্ষা ও শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য নৌ-বাহিনীর সৃষ্টি ও

[১] ভন ক্রেমারের নিকট আমি এই বিষয়ের জন্য বিশেষভাবে ঋণী।

রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নৌ বহরকে (আসাতিল) লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়। প্রথমে নাবিক নিযুক্ত করা হয় ফিনিশীয় উপকূলবর্তী শহর থেকে; ঐসকল শহরের অধিবাসীগণ দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রার জন্য বিখ্যাত ছিল। পরবর্তীতে সিরিয়া, মিশর ও এশিয়া মাইনরের উপকূল থেকে নাবিক নিযুক্ত করা হয় । ২৮ হিজরিতে নৌ বহরের সাহায্যে অবতরণকারী সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাইপ্রাস অধিকৃত হয়। ৩৪ হিজরিতে মিশরের শাসনকর্তা যখন লিসিয়ার উপকূলে অবস্থান করছিলেন তখন বাইজান্টাইনগণ ৬০০ যুদ্ধজাহাজের এক নৌ বহরের সাহায্যে তাঁকে আক্রমণ করে। তিনি মাত্র ২০০ যুদ্ধ জাহাজের এক নৌ-বহরের সাহায্যে তাদেরকে পরাজিত করেন। আরবরা নির্ভীকভাবে যুদ্ধকে বরণ করে, কিন্তু জাহাজে জাহাজে যুদ্ধ হলে পরাজিত হবে দেখে তারা শত্রুসেনাদের সাথে দ্রুত হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করে দেয়। তারা লৌহ-আঁকসি দিয়ে শত্রু জাহাজগুলোকে নিকটে টেনে আনে এবং বর্ষা ও তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রিকদের উপর। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আরবদের গৌরবজনক বিজয় লাভ ঘটে। বাইজান্টাইন নৌ বহর ধ্বংস হয় এবং সৈন্যাধ্যক্ষ যুবরাজ অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন। এই সময় থেকে নৌ যুদ্ধে আরবদের যুদ্ধ পদ্ধতি হয়ে ওঠে সব রকম কৌশল প্রয়োগ ত্যাগ করে যথাসম্ভব শত্রুর নিকটবর্তী হয়ে যুদ্ধ করা। সিরিয়া ও মিশরের প্রায় সকল সামুদ্রিক বন্দরে এবং পারস্যোপসাগরের উপকূলবর্তী উবুল্লা ও বুশায়ার বন্দরে জাহাজ নির্মিত হত। আরবদের জাহাজগুলো বাইজান্টাইনদের জাহাজের চেয়ে বৃহত্তর ছিল, কিন্তু সম্ভবত তত দ্রুতগামী ছিল না।

বাণিজ্য জাহাজও অনুরূপ সুদক্ষ ছিল এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যে সহায়তা ও উৎসাহ দান করা হত। প্রায় প্রত্যেক সমুদ্র বন্দরে একটি আলোক গৃহ ছিল– তাকে বলা হত খাশাব। নৌবহরে কেবল যুদ্ধের উদ্দেশে প্রস্তুত সরকারি জাহাজই থাকত সেরূপ মনে হয় না, বরং সরকারি আদেশ জারি হলে প্রত্যেক প্রদেশ ও বন্দর নির্দিষ্ট সংখ্যক জাহাজ নির্মাণ করতে বাধ্য ছিল। এই নিয়ম বিশেষভাবে ফাতেমীয়দের আমলে মিশরে প্রচলিত ছিল। সালাহউদ্দীনও একই নিয়ম অনুসরণ করেছিলেন। স্পেনের খলিফাদের নৌবহর সংগৃহীত হত সাম্রাজ্যের সকল বন্দর থেকে। প্রতি যুদ্ধ-জাহাজ একজন কাপ্তানের (কাইদ বা মুকাদ্দাম) অধীনে ছিল। তিনি জাহাজের নাবিকদের সেনাপতি ছিলেন এবং তাদের শরীর-চর্চা ও পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি লক্ষ রাখতেন। অন্যদিকে রইস নামে অভিহিত আরেকজন কর্মকর্তা কেবল নৌ চালনায় আত্মনিয়োগ করতেন। নৌবহরের প্রধানকে বলা হত আমীর-উল-মা বা আমীর-উল বাহর। আমীর-উল বাহর থেকে অ্যাডমিরাল শব্দটির উদ্ভব হয়েছে।

অধ্যায়-২৫
পুনরালোচনা [পূর্বানুবৃত্তি]

বাগদাদ : এর গঠন : স্থাপত্য : খলিফার দরবার : সামাজিক জীবন : পোশাক-পরিচ্ছদ : নারী-সমাজ : তাদের স্থান : সঙ্গীত : সাহিত্য দর্শন : বিজ্ঞান ও শিল্পকলা : যুক্তিবাদ : ইখওয়ান উস সাফা (পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ)।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে বর্ণিত সামরিক ও বেসামরিক সংগঠনের কেন্দ্রস্থল ছিল বাগদাদ। এটি ছিল ইসলামের রাজধানী ও ইরাকের নয়ন এবং সৌন্দর্য সংস্কৃতি ও শিল্পকলার পীঠস্থান।[১]

মনসুরের নগরী

ইয়াকুত তাঁর ভৌগোলিক বিশ্বকোষে[২] বলেন যে, মনসুর বৃত্তাকার ও প্রকাণ্ড লৌহ-দ্বার সমন্বিত চারটি ফটক দ্বারা বিদীর্ণ সুদৃঢ় প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত নগরটির পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। প্রতিটি তোরণের উপরিভাগ সোনালী গম্বুজ দ্বারা পরিমণ্ডিত ছিল এবং তাতে একজন অশ্বারোহীর বর্শা উঁচিয়ে যাতায়াত করার মত উচ্চতা ছিল। নগরীর অভ্যন্তরে, কেন্দ্র থেকে সামান্য দূর পর্যন্ত প্রসারিত ভেতরের প্রাচীরের অভ্যন্তরেই রাজকীয় প্রাসাদ খুলদ তার স্বর্ণ তোরণ (বাব-উজ জাহাব) নিয়ে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। খলিফার বাসবভনের অনতিদূরে আবেষ্টনীর মধ্যে ছিল জুমা মসজিদ, শাহজাদা ও অভিজাতবর্গের প্রাসাদসমূহ, অস্ত্রাগার, কোষাগার এবং অন্যান্য সরকারি দফতর। এই আবেষ্টিত স্থানটুকুই স্বয়ং একটি নগরীর রূপ ধারণ করেছিল, যাকে বলা হত মদীনাতুল মনসুর। বস্তুতপক্ষে মাহদীয়াহ নগরের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর টাইগ্রিস নদীর উভয় তীরে বার মাইল ব্যাসের দুটি বিশাল অর্ধবৃত্তের আকারে নগরীটি গঠিত হয়। প্রমোদোদ্যান, বাগিচা, বাগানবাড়ি ও রমণীয় বিহার ভূমি দ্বারা পরিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ বাজার ও সুরম্য মসজিদ ও হাম্মাম সমন্বিত অসংখ্য শহরতলী নদীর উভয় পার্শ্বে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমৃদ্ধির সময় বাগদাদ ও তার উপকণ্ঠের জনসংখ্যা ছিল বিশ লক্ষের অধিক। সম্ভবত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত নগরটির চেয়ে মাহদীয়াহ ছিল অধিকতর জাঁকজমকপূর্ণ। কয়েক ঘণ্টার পথব্যাপী বিস্তৃত এক বিশাল প্রমোদোদ্যানের মধ্যস্থলে ছিল খলিফার প্রাসাদ (কাসরুল খিলাফত)। এই উদ্যানটিতে পশুশালা ও পক্ষীশালা ছাড়াও শিকারের জন্য সংরক্ষিত বন্য পশুর একটি খোঁয়াড়ও ছিল। প্রাসাদ প্রাঙ্গণগুলো সাজানো ছিল বাগান দিয়ে এবং তা পাথরে খোদিত মূর্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সুরুচিসম্মত গুল্ম, ফল, বৃক্ষরাজী, জলাধার ও ফোয়ারা দ্বারা বিভূষিত ছিল। নগরীর এই অংশেই তাহিরবংশীয় এবং অন্যান্য প্রধান অভিজাত শ্রেণীর প্রাসাদসমূহ ছিল। নদীর উভয় তীরে কমপক্ষে চল্লিশ হাত প্রশস্ত সুদীর্ঘ রাজপথসমূহ নগরীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে এবং নগরীকে অনেকগুলো বিভাগ

---

[১] ইয়াকুত (শিহাবউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ)।

[২] মুজাম-উল বুলদান।

বা মহল্লায় বিভক্ত করেছিল। এর প্রত্যেক মহল্লা একজন তত্ত্বাবধায়ক বা পরিদর্শকের অধীনে ছিল; তিনি ঐ এলাকার অধিবাসীদের পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করতেন। প্রতিটি রাস্তায় শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রহরী (আসহাব-উল আরবু) মোতায়েন থাকত। একটি প্রধান সড়ক বা মহল্লাকে বলা হত মামুনীয়া। এটি খুবই প্রশস্ত ছিল এবং খাল (আল মুয়াল্লা) থেকে আল আজাজ[১] তোরণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নগরের তোরণদ্বারসমূহ

যে অসংখ্য তোরণের মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিকের নগরে প্রবেশ করা যেত তন্মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল : (১) বাব-উশ-শামাসিয়া, (২) বাব-উল -কাজ (রেশমের তোরণ), (৩) বসরা তোরণ, (৪) বাব-উদ-দায়র (মাঠের তোরণ), (৫) বাব-উশ-শাম (সিরিয়া তোরণ), (৬) বাব-উল-বুস্তান (উদ্যান তোরণ), (৭) বাব-উত-তাক (তাঁবু তোরণ), (৮) শিরাজ তোরণ, (৯) খায়জুরান তোরণ, (১০) বাব-উশ-সিবইয়ান (বালকদের তোরণ), (১১) বাব-উত-তীন (ডুমুর তোরণ), (১২) বাব-উল-আজাজ। এছাড়াও নগরীর মাহ্‌দীয়া অংশে পাঁচটি প্রধান তোরণ ছিল, যেগুলোর নামও সংরক্ষিত হয়েছিল : (১) বাব-উল-গারাবাহ (বৃক্ষ তোরণ), (২) বাব-উস-সুকুত-তামার (খেজুর বাজারের তোরণ), (৩) বাব-উন-নূবী (নূবয়দের তোরণ; এই তোরণের চৌকাঠে দূতদেরকে চুম্বনদান করতে হত), (৪) বাব-উল-আম্মাহ (জনসাধারণের তোরণ) ও (৫) বাব-উল-মারাতিব (সোপান তোরণ)।

নদীর উভয় তীরস্থ মিনারে অবস্থানরত সৈনিকরা নগর তোরণগুলোর মতই উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকের জলপথের বহির্গমন কেন্দ্রগুলোতে দিনরাত পালাক্রমে পাহারা দিত। যে অসংখ্য পয়ঃপ্রণালী শহরকে বিভক্ত করেছিল সেগুলোর সাহায্যে প্রতিটি গৃহে সকল ঋতুতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি সরবরাহ করা হত। রাস্তা, বাগান ও প্রমোদোদ্যানগুলো নিয়মিত ঝাড়ু দেয়া হত এবং ঐগুলোতে পানি ছিটানো হত। প্রাচীর অভ্যন্তরে কোন আবর্জনা থাকতে দেয়া হত না। কাসরুল খুলদের হলঘরটি (আইওয়ান) আশি হাত উঁচু একটি সবুজ গম্বুজে মণ্ডিত ছিল; এটি ছিল বাগদাদের মুকুট, নগরীর প্রতীক এবং আব্বাসী বংশের স্মারক চিহ্ন। গম্বুজের উপর একজন বর্শাধারী অশ্বারোহীর প্রতিমূর্তি ছিল।[২]

বর্গাকার প্রাঙ্গণ

রাজপ্রাসাদের সম্মুখে 'মুরাব্বা' নামে অভিহিত[৩] একটি বিরাট বর্গাকার প্রাঙ্গণ পুনর্মিলন, সামরিক পরিদর্শন, প্রতিযোগিতা ও ঘোড়দৌড়ের জন্য ব্যবহৃত হত। রাতে রাস্তা ও প্রাঙ্গণ বাতি দ্বারা আলোকিত হত । মনসুর মঞ্চে দণ্ডায়মান হয়ে কিংবা সিংহাসনে উপবেশন করে তাঁর সৈন্যদলকে পূর্ণ সামরিক সজ্জায় পরিদর্শন করতেন, পক্ষান্তরে

---

[১] মাবাসিদউল ইতিলাদ।

[২] এই মর্মে জনশ্রুতি ছিল যে, কোন দিকে বিদ্রোহ শুরু হলে প্রতিমূর্তিটি সেইদিকে বর্শা উঁচিয়ে খলিফাকে সতর্ক করে দিত। ইয়াকুত একে বদ্ধ কুসংস্কার ও সুস্পষ্ট মিথ্যাচার বলে বর্ণনা করেন। ১৯০ বছর ধরে দণ্ডায়মান থাকার পর একদিন রাতে বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় মুস্তাকীর রাজত্বকালে (৩২৯ হি; ৯৪০ খ্রি.) গম্বুজের চূড়াটি প্রতিমূর্তিসহ ভেঙে পড়ে। (মুজামউল বুলদান; ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮৪)।

[৩] একমাত্র ঘোড়ার উপর বাজী ধরার জুয়াখেলাই মুসলিম ধর্মীয় আইনে অনুমোদিত (মুসতাহাল) হয়েছে।

রশীদ, মামুন ও মুতাসিম প্রায়ই অশ্বারোহণ করতেন এবং সামরিক মহড়ায় অংশগ্রহণ করতেন । আরবরা বরাবরই ঘোড়দৌড়ের প্রতি অনুরক্ত ছিল। এই অনুরাগ যেমন ছিল দামিশকে, তেমনি ছিল বাগদাদে। মুরাব্বাতে রশীদ কর্তৃক প্রবর্তিত পারস্যের পোলো (চৌকান[১]) খেলা অনুষ্ঠিত হত।

নগরীর মাহদীয়াহ অংশে একটি বিরাট ময়দান ছিল, যেখানে নদীর দক্ষিণ তীরস্থ সেনানিবাসের সৈনিকরা প্রত্যহ কুচকাওয়াজ করত।[২] নগরীর বিভিন্ন তোরণে অবস্থিত দীর্ঘ ও প্রশস্ত বারান্দাগুলেকে নাগরিকদের গল্প গুজব ও অবসর বিনোদন কিংবা পথিক ও গ্রাম্য লোকদের রাজধানীতে আগমনের জন্য ব্যবহার করা হত। রাজধানীতে বিভিন্ন জাতির লোকদের স্বার্থ সরকারের নিকট উপস্থাপন করার জন্য প্রত্যেকের একজন করে প্রধান কর্মচারী থাকতেন এবং তাঁর কাছে আগন্তুকরা পরামর্শ বা সাহায্যের জন্য আবেদন করতে পারত। এই কর্মচারীরা তাঁদের স্বজাতীয়দের সদাচারের জন্যও দায়বদ্ধ থাকতেন।

বাগদাদের প্রাসাদসমূহ

বাগদাদ প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি প্রাসাদ নগরী, যেগুলো চুন ও সুরকি দিয়ে তৈরি ছিল না, ছিল মার্বেলে তৈরি। প্রাসাদগুলো গঠন বা পদ্ধতির দিক দিয়ে দামিশকের প্রাসাদগুলোর থেকে ভিন্ন ধরনের না হলেও সচরাচর অনেক তলাবিশিষ্ট ছিল এবং সেগুলোর কারুকার্যে সুস্পষ্টভাবে পারস্য রুচির প্রভাব প্রতিভাত হত। প্রাসাদ ও অট্টালিকাগুলো প্রভূত পরিমাণে সোনা দিয়ে স্বর্ণমণ্ডিত ও সুসজ্জিত করা হয়েছিল এবং সেগুলোতে ঝোলানো থাকত সুন্দর সুন্দর ঝালর বুটিদার বা রেশমের পর্দা। কক্ষগুলো বিলাসবহুল দীবান (গদিযুক্ত আসন), মূল্যবান টেবিল, চমৎকার চীনা পাত্র এবং সোনা ও রূপার অলঙ্কার দ্বারা উজ্বল ও রুচিসম্মতভাবে সাজান থাকত। রাজকীয় কাসরগুলো (প্রাসাদ) মণিমুক্তা খচিত হয়ে উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করত এবং সাজসজ্জা অনুসারে অসংখ্য হলঘরগুলো আখ্যায়িত হত পৃথক পৃথক নামে। সেগুলোর মধ্যে একটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সেটিতে সম্পূর্ণ স্বর্ণ নির্মিত একটি বৃক্ষের শাখায় শাখায় সোনার তৈরি ও মণিমুক্তা খচিত পাখি বসানো থাকত। স্বর্গতুল্য আরেকটি হলঘরকে (আইওয়ানউল ফিরদৌস) তার জমকালো ঝাড়-ফানুস, দেওয়াল ও ভেতর ছাদের মণিমুক্তা খচিত কারুকাজ, বর্ণবিন্যাস ও অলঙ্করণের জন্য যথার্থই পরীর দেশ বলে মনে হত। নদীর উভয় তীরে বহু মাইলব্যাপী পরিদৃশ্যমান ছিল আমীর ওমরাহ ও অভিজাতবর্গের প্রাসাদ, প্রমোদাঙ্গন, বাগান ও উদ্যান।[৩] মার্বেল পাথরের সিঁড়ি জলের কিনারা পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পতাকা শোভিত হয়ে জাওনাক নামে অভিহিত সহস্র সহস্র প্রমোদ-তরী পানির উপর সূর্য রশ্মির মত নৃত্য করে নদীর দৃশ্যকে

---

[১] পারসী ভাষায় 'চৌগান'। খলিফা ও অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের পোলো খেলার সাজ-সরঞ্জামের সুকসাভিয়ভ (Tsuxaviov) থেকে বোঝা যায় বাইজান্টাইনরা কোথা থেকে এই খেলা পেয়েছিল। ফরাসীরা এটি পেয়েছিল কর্ডোভা থেকে এবং এটিকে শিকেইন বা ছলচাতুরির খেলা বলে অভিহিত করেছিল। আধুনিক ইংরেজি শব্দ শিকেইন (Chicane) ও শিকেইনারি (Chicanery) চৌকান থেকে উদ্ভূত। এতে খেলাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রতারণা করার কথাই বোঝা যায়।

[২] প্রত্যেক নগরীতে ধনুর্বিদ্যা, ঘোড়দৌড়, পোলো খেলা, জারিদ (কৃত্রিম যুদ্ধ) প্রভৃতি চর্চার জন্য একটি ময়দান (মল্লভূমি) থাকত এবং সেখানে নাগরিকরা সপরিবারে সান্ধ্য বিবাহ সম্পন্ন করত।

[৩] নাসিরী খুসরু বলেন, উবুল্লাহ পর্যন্ত নদীর তীর অট্টালিকা, প্রমোদাঙ্গন, বাগান ও উদ্যানে পরিপূর্ণ ছিল এবং তা ছিল একাদশ শতাব্দীতে।

প্রাণবন্ত করে তুলত এবং আমোদপ্রিয় বাগদাদীগণকে নিয়ে যেত নগরের এক অংশ থেকে আরেক অংশে। নদীর তীরে বহু মাইলব্যাপী বিস্তৃত ফেরিঘাটে নৌবহরগুলো নোঙর করে থাকত, চীনদেশীয় জলযান থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন আসিরীয় ভেলা পর্যন্ত সকল আকার ও প্রকারের সামুদ্রিক ও নদীবাহী পোতসমূহ ফাঁপা চামড়ার রজ্জু দিয়ে বাঁধা থাকত। এগুলোর মধ্যেই বিক্ষিপ্তভাবে বিরজিত পুলিশী নৌকাগুলোর (শাজাওয়াত) সাথে খলিফার রণতরীগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকত।

মসজিদসমূহ

নগরীর জুমা মসজিদগুলো ছিল বৃহদায়তন এবং পরিকল্পনার পারিপাট্যে, কল্পনার বিশালতায় ও কারুকার্যের শ্রেষ্ঠত্বে ওলিদ কর্তৃক নির্মিত দামিশকের বিশাল মসজিদকে হার না মানালেও তার সমকক্ষ ছিল। জামে মসজিদ ছাড়াও নগরের প্রতিটি মহল্লায় ছিল বিশেষ উপাসনালয় এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্রই প্রতিটি শহরের নিজস্ব সুরম্য জুমা মসজিদ ছিল।[১]

মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল

রাজধানী ও প্রাদেশিক শহরগুলোতে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য অসংখ্য সমৃদ্ধশালী মহাবিদ্যালয়, হাসপাতাল ও আতুরাশ্রম[২] ছিল। এগুলোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নিষ্কর জমিজমার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিটি মহাবিদ্যালয়ে একজন পৃথক অধ্যক্ষ ছিলেন এবং সরকারি হাসপাতালগুলো পরিচালক বা দবীর নামে অভিহিত একজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে। মুকতাফীর রাজত্বকালে বিখ্যাত আবুবকর আর-রাজী[৩] (ইউরোপীয় বিজ্ঞানে Rhazes নামে পরিচিত) এই উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিটি আতুরাশ্রমের সাথে একজন কাজী সংশ্লিষ্ট থাকতেন বলে ধারণা করা হয়,[৪] কিন্তু তাঁর দায়িত্ব কি ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

১০৬৭ খ্রিস্টাব্দে নিজাম-উল-মূলক কর্তৃক স্থাপিত 'নিজামিয়া মহাবিদ্যালয়' এবং ৬২৩ হিজরিতে (১২২৬ খ্রিস্টাব্দ) মুসতানসির বিল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মুসতানসিরিয়াহ' ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানগুলোও ছিল সমানভাবে প্রসিদ্ধ এবং নতুন মহাবিদ্যালয়গুলোর সাথে সাথে সেগুলোতেও বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে ছাত্ররা দলে দলে সমবেত হত। সাম্রাজ্যের অন্যান্য নগরও রাজা-বাদশাহ কিংবা বেসরকারি ব্যক্তি বিশেষের বদান্যতায় স্থাপিত মহাবিদ্যালয়ের জাঁকজমক দ্বারা রাজধানীর সাথে প্রতিযোগিতা করত।[৫]

---

[১] নাসিরী খুসরু।

[২] হাসপাতালকে দারউশ শাফা বা মারিস্তান বলা হত। প্রতিটি নগরে হাসপাতাল ছিল, দামিশকে নূরুদ্দিন মাহমুদ কর্তৃক নির্মিত হাসাতালটিকে তাঁর নামানুসারে বলা হত মারিস্তান-উন-নূরী। সেটি ছিল এক বিশাল প্রতিষ্ঠান। পাগলদের জন্যও সর্বত্র হাসপাতাল ছিল।

[৩] ৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়।

[৪] এই কর্মচারীকে বলা হত কাজীউল মারিস্তান।

[৫] হেরাত ও নিশাপুর প্রত্যেকটিতে আরবের মেইকিনাস (একজন বিদ্যোৎসাহী রোমান নাইট) নামে অভিহিত মহান নিজাম-উল-মূলক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি করে নিজামিয়া কলেজ ছিল। সালাহউদ্দীন জেরুজালেমে একটি মহাবিদ্যালয় খুলছিলেন, তাঁর নামানুসারে যাকে বলা হত নাসিরিয়া। দামিশকেও বহু শিক্ষায়তন ছিল, সেগুলোর মধ্যে রাওয়াহিয়াহ ও সালাউদ্দীনের ভগ্নী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাতুস সিতইশ শাম (সিরিয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়) দুইটি সবচেয়ে বিখ্যাত। মসুলে ছিল নূরীয়াহ, ইজজিয়াহ, জয়নিয়াহ, ওয়াফিসা ও আলিয়াহ মহাবিদ্যালয়।

আব্বাসীয় খলিফাগণ যে জাঁকজমক ও আড়ম্বরে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন তা দামিশকে উমাইগণ কর্তৃক প্রদর্শিত আড়ম্বরের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। খলিফা যখনই প্রাসাদ তোরণ থেকে বের হতেন তখনই সেখানে হাজির থাকত জমকালো উর্দি পরিহিত দেহরক্ষী দল। হাদী রক্ষীদেরকে নিষ্কোষিত তরবারি, বক্র, ধনু এবং কাঁধে বর্শা নিয়ে হাঁটার প্রথা প্রববর্তন করেন; অন্যদিকে রশীদ ও মামুন প্রায়শই অশ্বারোহণে বা পদব্রজে একজন বা দুজন অনুচর নিয়ে নগর পরিক্রমা করতেন। বিশেষকরে শুক্রবারের জুমা[১] এবং কোন উৎসব উপলক্ষে খলিফা যখন জুমা মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামাজে ইমামতি করতেন তখন তাঁর অনুচরবর্গের দৃশ্য অসাধারণ চিত্তাকর্ষক হত। সৈন্যরা পতাকা উড়িয়ে ঢোলক ও ভেরী বাজাতে বাজাতে[২] সামনের দিকে অগ্রসর হত, তাদের পিছনে চমকপ্রদ সাজে সজ্জিত ঘোড়ায় চড়ে শাহজাদারা গমন করতেন এবং তাঁদের পিছনে প্রধান আমীর উমারা সমভিব্যাহারে খলিফা শ্বেত অশ্বে আরোহণ করে গমন করতেন। অবশিষ্ট দেহরক্ষীদল থাকত সকলের পিছনে। এতদুপলক্ষে খলিফা জানুর নিচ পর্যন্ত লম্বা কালো বা বেগুনী রঙের কাবা পরিহিত হয়ে শালের তৈরি কটিবন্ধ বা মণিমুক্তা খচিত ঘুনসি কোমরে বেঁধে কাঁধের উপর মূল্যবান কালো রঙের চাদর জড়িয়ে কালানসুয়াহ নামক একটি মাথাবিশিষ্ট টুপি পারধান করতেন। কালানসুয়াহ সচরাচর একটি বহু মূল্যবান হীরক খণ্ডে শোভিত থাকত। নবীর সিলমোহর ও যষ্ঠি অবিচ্ছেদ্যভাবে খলিফার সঙ্গে থাকত। সচরাচর তাঁর গলায় ঝুলত রত্নখচিত স্বর্ণমালা এবং পাদুকাতে থাকত মণিমুক্তা খচিত বকলস। দেহের সাথে আঁটসাঁটভাবে পরিহিত কাবা জানুর নিম্নদেশ পর্যন্ত নেমে আসত এবং যাতে ভেতরে পরিহিত বুটিদার খাফতান দেখা যায় সে জন্য তা গলার দিকে কিঞ্চিৎ খুলে রাখা হত। আস্তিনগুলো থাকত বোতাম আঁটা, পরে মুসতাঈন ঢিলা আস্তিনের ব্যবহার প্রচলন করেন। কথিত আছে, তাঁর কাবার আস্তনের পরিধি ছিল তিন হাত।

অভ্যর্থনা

খলিফাদের অভ্যর্থনা আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হত। এই অভ্যর্থনাপ্রণালি অমাত্যবর্গের জন্য আদর্শস্বরূপ ছিল এবং পরবর্তীকালে প্রতি যুগের ও দেশের মুসলিম শাসকগণ এই প্রণালি অনুকরণ করেছিলেন। উমাইয়া আমলের ন্যায় দুই ধরনের অভ্যর্থনাপ্রণালি ছিল– একটি সাধারণ (আম) এবং অন্যটি বিশেষ (খাস)। একটির ভেতর দিয়ে অন্যটিতে যাওয়া যায় এ রকম তিনটি বিরাট হলঘর সভাসদ ও সকল স্তরের প্রভাবশালী লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত। দরজাগুলোতে ঝুলত মোটা বুটিদার পর্দা, যা কোন সভাসদের প্রবেশকালে দ্বারে দণ্ডায়মান হাজিবের (প্রাসাদাধ্যক্ষ) বালক-ভৃত্য কর্তৃক উত্তোলিত হত। খলিফা সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকতেন; একশ দেহরক্ষী উন্মুক্ত তরবারি হাতে তাঁর চারদিকে দণ্ডায়মান থাকত, পক্ষান্তরে সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও শাহজাদাগণ রাজকীয় আসনের ডানে ও বামে সারিবদ্ধ থাকতেন । পর্দা উত্তোলিত

---

[১] নিঃসন্দেহে আব্বাসীয়রা উমাইয়ার বংশধরদের চেয়ে সভ্য ছিলেন; তাঁরা শুক্রবারের জুমার নামাজে উপস্থিত হয়ে ইমামতি করতেন এবং নিজেরাই সচরাচর খুৎবা পাঠ করতেন; কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম ঘটত।

[২] রাজকীয় ব্যান্ড বাজনাকে বলা হত তবলখানা, অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে এতে থাকত ভেরী (নাফীর), ঢোলক (দফ), খঞ্জনী (তবল), শানাই (জমুর) ও বাঁশি (শাবাবা) এবং এতে সভাপতিত্ব করতেন একজন ওস্তাদ বা গুরু, যাঁকে বলা হত মিহতার বা রইস।

হলে প্রাসাদাধ্যক্ষ উপস্থিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতেন। অতঃপর অভিবাদন[১] করে তিনি প্রকোষ্ঠস্থিত অন্যান্য ব্যক্তির সাথে দণ্ডায়মান হতেন। বংশের শাহজাদা, সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং বিদ্বান, প্রতিভাবান ও খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত ব্যক্তিগত বা বিশেষ অভ্যর্থনা ছিল মোটামুটিভাবে প্রথাবহির্ভূত এবং রক্ষী বা সশস্ত্র সৈন্যদল ছাড়াই তা অনুষ্ঠিত হত। এতদুপলক্ষে ভাবী উত্তরাধিকারী খলিফার পাশে একটি আসনে সমাসীন থাকতেন; পক্ষান্তরে সভাসদরা সিংহাসনের উভয় দিকে তাদের বংশগত কৌলীন্য ও পদমর্যাদা অনুসারে দুটি সারিতে উপবেশন করতেন।[২] এসব সমাবেশে খলিফা বিনা আড়ম্বরে উপস্থিত ব্যক্তিদের সাথে কথাবার্তা বলতেন; চিকিৎসক ও জ্যোতির্বিদরা বিজ্ঞানের নতুনতম আবিষ্কার সম্পর্কে আলোচনা করতেন, কবিরা আবৃত্তি করতেন তাঁদের কবিতা এবং পর্যটকরা তাঁদের ভ্রমণের আশ্চর্য কাহিনী বলতেন। রমজান মাসে কখনো খলিফার নিজ প্রাসাদে এবং অধিকাংশ সময় উজিরের সরকারি বাসভবনে সাম্রাজ্যের প্রধান কর্মচারীদেরকে ভোজসভায় (সিমাত) নিমন্ত্রিত করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই ভোজনোৎসবকে বলা হত তবক। এই উৎসবে অতিথিদেরকে তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী আসন দেয়া হত।[৩]

রমজান শেষে ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে খলিফা নগরীর গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে ভোজে আপ্যায়িত করতেন। অভ্যর্থনাগৃহের উর্ধপ্রান্তে থাকত রাজকীয় আসন, তাতে প্রায়ই রাজপ্রতিনিধিগণ উপবেশন করতেন। কিন্তু খলিফা স্বয়ং উপস্থিত থাকলে উজির এবং পরিবারের কয়েকজন শাহজাদা তাঁর সঙ্গে থাকতেন।

পোশাক-পরিচ্ছদ

অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত লোকদের পোশাক খলিফার অনুকরণে তৈরি হত; কিন্তু ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ও আইনবিদরা পাগড়ী পরিধান করে তার উপর নবীর অনুকরণে 'তায়লাসান' নামক একটি রুমাল ফেলে দিতেন। কোন কোন সময় তায়লাসান পরিধান করা হত কাঁধের উপর।[৪] সাধারণ লোকেরা কেবল কালানসুয়াহ পরিধান করত। মোটা কালো টুপির নিচে সাদা রেশমের তৈরি এক প্রকার টুপি পরিধান করা হত এবং গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানকালে কালো টুপি খুলে ফেললেও সাধারণ মেলামেশার সময় ঐ টুপি মাথায় থাকত। অন্দরমহলে এই টুপিও খুলে ফেলা হত এবং মাথার খুলির উপর পরা হত

---

[১] আরবদের অভিবাদনের সাধারণ ধারণা ছিল বুকে ডান হাত রেখে ঈষৎ শরীর বেঁকিয়ে মাথা নত করা এবং পরে কপালে হাত উত্তোলন করা। আভূমি নত হয়ে বা যাষ্টাঙ্গ প্রণাম করার পারসিক প্রথার ফলে জমি চুম্বনের যে প্রথার উৎপত্তি হয়েছে তা কখনো আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না এবং তা তাদের স্বাধীনতা ও পৌরুষের পরিপন্থী ছিল। বিশেষ অভ্যর্থনার সময় খলিফা তাঁর ডান হাত চুম্বনের জন্য বাড়িয়ে দিতেন। মহিলাকে অভিবাদনের সময় তাঁর বস্ত্রাঞ্চল চুম্বন করা হত। এভাবে মুকতাদিরের মা তাঁর পোশাকের প্রান্তভাগ প্রদান করতেন।

[২] আ'লা কদর আনসাবিহিম ওয়া মারাতিবিহিম– ইবনে খাল্লিকান।

[৩] কেবল বেতনভোগী কর্মচারী হওয়া ব্যতীত যাঁদের অন্য কোন যোগ্যতা নেই এমন কয়েকজন লোককে তাঁর আগে আসন দেয়ায় কবি হাউস বাইস (মৃত্যু ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ) একবার এতই ক্ষুব্ধ হন যে, তিনি ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় ভোজনোৎসবে যোগদান থেকে অব্যাহতি চেয়ে উজিরের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন।

[৪] লেন (Lane) খুব সঠিকভাবেই ধারণা করেন যে, এসব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের রুমাল থেকে আধুনিক (ইউরোপীয়) শিক্ষা বিষয়ক রুমাল ও মস্তকাবরণের উদ্ভব হয়েছে।

বেগুনী রঙের টুপি। পরবর্তীকালে কালানসুয়াহর পরিবর্তে আধুনিক তুরবুশ বা ফেজের প্রচলন হয়। আব্বাসীয়দের আমলে সর্বোপরি পরিধেয় আবা বা জুব্বা এবং মাথায় পরিহিত কালানসুয়াহর সাথে ঢিলা পায়জামা, পেন্টালুন, শার্ট (কামিজ[১]), ফতুয়া জাতীয় অন্তর্বাস, জ্যাকেট, খাফতান ও কাবা ছিল ভদ্রলোকের সাধারণ পোশাক। ধূলাবালি আটকানোর জন্য মাঝে মাঝে আবার পরিবর্তে কাবার উপর এক ধরনের আঙরাখা পরিধান করা হত। মোজা ব্যবহারের রীতিও অজানা ছিল না এবং ধনী লোকরাই তা পরিধান করতেন বলে মনে হয়। সেগুলো তৈরি হত রেশম, পশম কিংবা চামড়া দিয়ে এবং তা মৌজাজ[২] নামে অভিহিত হত। বিভিন্ন পেশার লোকদের পোশাকে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। উমাইয়াদের আমলের ন্যায় ভ্রমণ, আশ্বারোহণ বা সামরিক কুচকাওয়াজের সময় লোকেরা গৃহাভ্যন্তরে পরিহিত পোশাক থেকে ভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করত। রাতের পোশাককে বলা হত কুমাশউন নাওন। ইজার (পেন্টালুন), শার্ট, ফতুয়া ও একটি লম্বা জ্যাকেট ফিতা বা কোমরবন্ধ (মিজার) দ্বারা কোমরের সাথে বাঁধা থাকত, সেইসঙ্গে কাঁধের উপর থাকত 'রিদা' নামক (একখণ্ড বস্ত্র)– যা জনসাধারণের সচরাচর ব্যবহারের পোশাক ছিল। পুরুষেরা বুট ও জুতো উভয়ই ব্যবহার করত, তবে বিশেষভাবে সৈন্যদের মধ্যে বুট জুতার প্রচলন ছিল বেশি। কখনো কখনো একই সঙ্গে এক জোড়ার উপর আরেক জোড়া জুতো পরা হত। মসজিদ বা প্রাসাদে প্রবেশের সময় জারমুক নামে অভিহিত বাইরের জোড়াটি খুলে ফেলা হত এবং ভেতরের জোড়াটিই পরা থাকত।

নারীদের পোশাক

উমাইয়াদের সময় থেকেই নারীদের পোশাকে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।[৩] উচ্চ শ্রেণীর বা ধনাঢ্য মহিলারা মস্তকাবরণী হিসেবে মণিমুক্তা খচিত গম্বুজাকার টুপি পরিধান করতেন। এই টুপির নিম্নভাগে মণি বসানো স্বর্ণের একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত থাকত। রশীদের বৈমাত্রেয় ভগিনী উলাইয়া এই মস্তকাবরণীর প্রবর্তন করেন। প্রাচীন অক্ষর খোদিত এক ধরনের মাদুলী টুপির বহির্বেষ্টনী থেকে ঝোলানো অবস্থায় প্রায়ই পরিধান করা হত।[৪] মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণ সাধারণত মুক্তা ও পান্না খচিত ফিতার ন্যায় এক ধরনের চ্যাপ্টা স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা মস্তক সজ্জিত করত। এগুলো ছিল অত্যন্ত রুচিসম্মত নকশায় তৈরি এবং অদ্যাবধি তা পরিহিত হয়। পায়ে নুপুর (খলাখল) এবং হাতের বালাও সচরাচর ব্যবহৃত হত। কৃত্রিম সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপায় অজানা ছিল না। গণ্ডদেশ ও ওষ্ঠ রঞ্জিত করার কৌশল[৫] প্রত্যক্ষভাবে পারসিকদের নিকট হতে গৃহীত হয়েছিল;

---

[১] সেমিজ (chemise) শব্দটি আরবী কামিজ থেকে উদ্ভূত। এই দৃষ্টান্ত থেকে আব্বাসীয়দের সময় থেকে পুরুষের পোশাক পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

[২] পারসীতে মুজা। আরবদের নিকট থেকে এটি বাইজান্টাইনদের কাছে চলে যায়। ডোজি বলেন, গ্রিক মোভিসাক্লোভ (movisaklov) আরবি মৌজাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

[৩] স্বামীর মতই সম্রাজ্ঞী জুবাইদা তাঁর যুগের ফ্যাশনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি আচ্ছাদন বিশিষ্ট চেয়ার আবিষ্কার করেন এবং মেয়েদের মধ্যে প্রচলন করেন মণিমুক্তা খচিত কটিবন্ধ ও পাদুকা।

[৪] পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে পুরুষদের পোশাকে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হলেও মেয়েদের পোশাক পদ্ধতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি।

[৫] গণ্ডদেশ উজ্জ্বল করা।

কারণ তাদের মধ্যে এই প্রথা অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়, তবে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম ফোঁটা দেয়ার পদ্ধতি আরবদের মধ্যে বরাবরই প্রচলিত ছিল। সুন্দরী হিসাবে বিবেচিত হতে হলে আরব কুমারীকে দীর্ঘাকৃতি, ক্ষীণকায়া, সুঠাম, সুশ্রী এবং বৃহৎ, টানা, কালো চক্ষুবিশিষ্ট হতে হত।[১]

নারীর স্থান

আব্বাসীয় শাসনের প্রথম দিকে নারীদের অবস্থা উমাইয়া আমলের থেকে মোটেই ভিন্ন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে নারী ও পুরুষদের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ প্রথা কাদির বিল্লাহর সময়ের পূর্ব পর্যন্ত বহুলভাবে প্রসারিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। এই খলিফা মুসলিম জগতের প্রগতির পথ রুদ্ধ করতে অন্য সকলের চেয়ে বেশি দায়ী ছিলেন। মনসুরের সময়ে আমরা দুইজন রাজকন্যা (তাঁর পিতৃব্য কন্যা) সম্পর্কে জানতে পারি যে, মারওয়ানের সাথে যুদ্ধকালীন কোন অঙ্গীকার পালনের জন্য তাঁরা বর্ম পরিহিত হয়ে বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। রশীদের আমলেও আমরা দেখেছি আরব কুমারীরা কীভাবে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে যেত এবং সৈন্যদের নেতৃত্ব দিত। মুকতাদিরের মা স্বয়ং সর্বোচ্চ আপীল আদালতের সভাপতিত্ব করতেন, দরখাস্তকারীদের আবেদন শুনতেন এবং সভাসদ ও বিদেশী রাষ্ট্রদূতদেরকে সাক্ষাৎ দান করতেন। সুসভ্য ও পদমর্যাদাসম্পন্ন মহিলাদের গৃহে মিলনোৎসব ও আলোচনা সভার অধিবেশন মুতাওয়াক্কিলের আমল পর্যন্ত বন্ধ হয়নি। রশীদ ও মামুনের আমলে আমরা জানতে পারি যে, মহিলারা পুরুষদের সাথে সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিযোগিতায় নিজস্ব মর্যাদা রক্ষা করে চলতেন। তাঁরা কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং তাঁদের সৌন্দর্য ও গুণাবলী দ্বারা সভা সমিতিতে প্রাণসঞ্চার করতেন। সম্রাজ্ঞী জুবাইদা প্রতিভাবান রমণী ও গুণসম্পন্না কবি ছিলেন। তিনি প্রায়ই রশীদকে কবিতার ছন্দে চিঠি লিখতেন এবং তাঁর পুত্র আমীনের মৃত্যুর পর তিনি মামুনকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে উচ্চস্তরের প্রতিভা ও অনুভূতি প্রতিভাত হয়। বুরান সম্পর্কে আমি পূর্বেই বলেছি। তবলা বিশারদ উবাইদা (আত তমবুরিয়া) মামুন ও মুতাসিমের রাজত্বকালে জীবিতা ছিলেন। কিতাব-উল-আগানী গ্রন্থের লেখক তাঁকে সৌন্দর্যময়ী, গুণবতী ও প্রতিভাময়ী রমণী বলে[২] বর্ণনা করেছেন। তিনি অপূর্ব দক্ষতার সহিত তবলা বাজাতেন এবং তা থেকে তিনি উপাধি লাভ করেন। তিনি সঙ্গীতও রচনা করতে পারতেন।

কবি ফজল মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি মুতাওয়াক্কিলের প্রাসাদে কিছুদিন বাস করেছিলেন বলে মনে হয়। মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি বিয়ে করেন এবং বাগদাদে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর কবিতা তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতার সমতুল্য বলে বিবেচিত হত।

ষষ্ঠ হিজরিতে শায়খা শুহদা নামে এক মহিলা খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বাগদাদে ইতিহাস ও সুকুমার সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা করতেন এবং চমৎকার হস্তাক্ষরের জন্যও তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ মহিলা আইনজ্ঞদের অন্যতম জয়নাব উম্মুল

---

[১] কিন্তু ইয়েমামার জারকা বা নীল নয়না কুমারীর সুখ্যাতি থেকে গাঢ় নীলবর্ণ চোখের প্রতি আরবদের আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

[২] তিনি ছিলেন পূর্ববর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্না রমণী এবং ইসহাক (বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ) তাঁর যোগ্যতা ও গুণাবলীর বিষয়ে সুখ্যাতি করেছেন, আবু খাশিশা তাঁকে সম্মান করতেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিভা স্বীকার করতেন। তিনি ছিলেন সুন্দরী ও অতীব মিষ্টি সুরের অধিকারিণী। কিতাব-উল আগানী, নবম খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

মুয়াইয়িদ খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এবং হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জীবিত ছিলেন।[১] তিনি সে যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের নিকট থেকে যোগ্যতার সনদ লাভ করে আইন শিক্ষা দেয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন।

সালাহউদ্দীনের সময়ে খ্যাতির অধিকারিণী আবুল ফারাজের কন্যা তাকিয়াহ হাদীস বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। তিনি একজন বিশিষ্ট কবিও ছিলেন।

আমীর উসামার গ্রন্থে আবরদের মধ্যে মহিলাদের উচ্চাসন লাভের এক অতি প্রাণবন্ত আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে। একাদশ শতাব্দীর অতীব গোলযোগপূর্ণ সময়ে যখন পশ্চিম এশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল তখনও মহিলারা, বিশেষকরে শায়জারের মহিলারা বীরোচিত শ্রদ্ধা এবং ভদ্রোচিত সমাদর ও যত্নের পাত্রী ছিল। পরিণয় একটি পবিত্র কাজ, পারিবারিক গৃহ একটি পবিত্র ধাম এবং সন্তানের জন্ম, বিশেষকরে পুত্র সন্তানের জন্ম স্বর্গীয় আশীর্বাদ বলে গণ্য হত। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার ছিল মায়ের উপর; পুত্রগণকে শিক্ষকের হাতে অর্পণ করার পূর্বে মা তাদের তত্ত্বাবধান করতেন; কন্যাদেরকে সতী-সাধ্বী রমণী রূপে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মা হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়া হত।[২]

সঙ্গীত

মুসলিম আইনজ্ঞগণ কর্তৃক তখনো সঙ্গীত নিষিদ্ধি হয়নি এবং উচ্চস্তরের নারী ও পুরুষ উভয়েই সঙ্গীত চর্চা করতেন। ধর্মপ্রাণ শাহজাদী উলাইয়াহ ছিলেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের অন্যতম। সঙ্গীতে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কিতাব-উল-আগানী বা সঙ্গীত গ্রন্থের লেখক[৩] অত্যন্ত প্রশংসার সাথে তাঁর রচনার উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাই ইব্রাহীমও ছিলেন সমান প্রতিভাধর এবং খলিফা ওয়াসিক স্বয়ং গীতিকার ও গায়ক হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। শাহজাদী ও উচ্চস্তরের মহিলাগণ প্রায়ই সায়াহ্নে আসর (নওবাত-উল-খাতুন) বসাতেন। শতাধিক সঙ্গীতকারের সম্মিলিত কণ্ঠে এই সঙ্গীত গীত হত এবং একজন পরিচালক ষষ্ঠির সাহায্যে তাল বাজাতেন।

গৃহের আসবাবপত্র

উমাইয়াদের আমলেই চেয়ার (কুরসি) ও উচ্চ আসন ব্যবহারের রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছিল; কিন্তু প্রকোষ্ঠের তিনদিকে স্থাপিত দীবান বা সোফার ব্যবহার পরবর্তী রাজবংশের আমলে প্রায় প্রত্যেক গৃহেই পরিদৃষ্ট হত।

খানাপিনার রীতি

লেকেরা দীবানের পাশে রাখা টেবিলে আহার করত। কাঠের তৈরি টেবিলগুলো ঝিনুক, আবলুস বা কচ্ছপের খোল দিয়ে সাজানো থাকত। ওয়াসিকের আস্ত সোনার তৈরি একটি টেবিল ছিল। রূপা, তামার উপর রাংতা প্রলেপিত কিংবা পিতলের তৈরি একটি বৃহৎ গোলাকার বারকোশে রূপা বা চীনামাটির (সাধারণ লোকের মধ্যে রাংতা প্রলেপিত তামার) থালাগুলো সাদা কাপড়ে ঢেকে প্রতিটি টেবিলে রাখা হত। প্রতিটি রেকাবিতে

---

[১] তিনি ৫২৪ হিজরিতে (১১৩০ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬১৫ হিজরিতে (১২১৮-১৯ খ্রি.) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

[২] উম্মাহাত-উর-রিজাল, কিতাব-উল ইতিবার, পৃ. ১০০।

[৩] আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, নবম খণ্ড, পৃ. ৮৩। সঙ্গীত সংকলন তাঁর একটি বিরাট সাহিত্য কর্ম। তিনি মহিলা সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনীও (কিতাব-উল-কিয়ান) রচনা করেন।

রাখা হত চীনামাটি কিংবা আবলুস কাঠের তৈরি চামচ এবং প্রতিটি বারকোশের উপর রুটির চ্যাপ্টা পিঠা রাখা হত। অভিজাত শ্রেণির গৃহে জানজাল (পারসিক চানগাল) নামক দুই দাঁড়বিশিষ্ট কাঁটা চামচের ব্যবহার সচরাচর প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি করে তোয়ালে থাকত এবং ভোজনের পর একজন পরিচালক একটি গামলা থেকে জগের সাহায্যে তার হাতের উপর পানি ঢেলে দিত।

অবস্থাপন্ন লোকদের গৃহে আচ্ছাদিত কাঁচের পাত্রে সাধারণ পানীয় হিসেবে চিনি মিশ্রিত মিষ্টি পানিতে violet, roses, mulberry, cherry ফুলের সিরাপ দ্বারা সুগন্ধ করে শবরত পরিবেশিত হত।

খেজুর বা কিসমিস দ্বারা প্রস্তুত নেবিজ এবং বাল বা মধু ও পানি মিশ্রিত পানীয়র খুব প্রচলন ছিল, কিন্তু মদের ব্যবহারও অজানা ছিল না। অনুসন্ধান করে আমরা জানতে পরি যে উজিরদের গৃহে মদ্যপানের আসর বসত, যেখানে কাজী ও আনজ্ঞরা মদ্যপানে লিপ্ত হতেন।[১] রশীদের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম নাদীম বা অন্তরঙ্গ সহচর নিয়োগের কথা শোনা যায়। এই শব্দটির সাথে কোন নিন্দাসূচক ভাব জড়িত ছিল না। তার দায়িত্ব ছিল হাস্য-কৌতূক দ্বারা প্রভুর মনোরঞ্জন করা। তিনি প্রতিভাবান ব্যক্তি বলে তার কাজ ছিল কবিতা আবৃত্তি করে শোনানো এবং সাধারণত পানোৎসবে ভাঁড় হিসেবে কাজ করা।

খেলাধুলা

অভ্যন্তরীণ খেলার মধ্যে দাবা ছিল সর্বসাধারণের প্রিয়। রশীদ কর্তৃক পশ্চিম এশিয়ায় প্রবর্তিত হয়ে এটি দ্রুত আরবদের মধ্যে প্রসার লাভ করে এবং তাস ও পাশার প্রচলন কার্যত বন্ধ করে দেয়। ধনুর্বিদ্যা এবং পরবর্তীকালে হাত বন্দুকের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ, পোলো (চৌকান), হকি (সুলাজান)[২] বর্শা নিক্ষেপ (জারিদ), ঘোড়দৌড়, কুস্তি এবং পদব্রজে ও অশ্বারোহণে অসি সঞ্চালন ছিল বাহিরের খেলাধুলার মধ্যে প্রধান। রাজধানীতে ও অন্যান্য বড় শহরে সাময়িকভাবে পদাতিক ও অশ্বারোহী বীরব্রতীর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সংঘটিত হত। এই যুদ্ধে পরস্পরকে দ্বন্দ্বে আহ্বান (রিহান) জানানো হত। ক্রিকেট খেলাও অজানা ছিল না; নারী-পুরুষ উভয়েই র‍্যাকিট (এক ধরনের সহজ টেসি খেলা) ও টেনিস (লাব-উল কুরা) খেলত এবং মেয়েরাও চর্চা করত ধনুর্বিদ্যার। প্রথম দিকে নৃত্য শুধু নিচ শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না এবং তরুণীরা আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করতে প্রায়শই এতে রত হত। কিন্তু পেশাদার নর্তকীর সংখ্যাধিক্য দ্রুত জাতীয় অধঃপতন টেনে এনেছিল।

শিকার ছিল রাষ্ট্রনায়ক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাধারণ আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার। খুব সামান্য ব্যতিক্রম থাকলেও আব্বাসীয়রা এই আনন্দদায়ক শরীর চর্চার

---

[১] ইবন খাল্লিকান দেখুন : উজির আল মুহাল্লাবী। হিজরি ৬৫৬ সালে মোকা নগরের নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী শায়খ উমর নামক একজন দরবেশ কফি আবিষ্কার করেন বলে কথিত আছ, কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীর আগে এর ব্যবহার ব্যাপক হয়ে ওঠেনি। De Sacy, Chrest. Arab : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৮১

[২] চৌকন ও সুলাজান সচরাচর সমার্থক শব্দ বলেই বিবেচিত হয়। রশীদ ও মামুন ব্যতীত আরব রাষ্ট্রনায়ক ও নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে যাঁরা পেলো খেলার প্রতি গভীরভাবে আসক্ত ছিলেন তাঁদের আমি মালিক শাহ, নূরুদ্দিন মাহমুদ, নাজমুদ্দিন আইয়ুব ও সালাহউদ্দীনের নাম করতে পারি। রাওয়াজাতাইন গ্রন্থের লেখকের মতে, নূরুদ্দিন মাহমুদ বলকে কদাচিৎ ভূপতিত হতে দিতেন।

প্রতি গভীরভাবে আসক্ত ছিলেন এবং শেষের দিকে মুসতানজিদের সময়েও আমরা নিয়মিত শিকার যাত্রার কথা জানতে পারি। সালাহউদ্দীন সাধারণত তাঁর পুত্রগণসহ মৃগায় যেতেন। এর প্রতি তাঁর তীব্র আসক্তির ফলে একবার তাঁর ক্রুসেড যোদ্ধাদের হাতে বন্দি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। শীতের আগমনে পশ্চিম এশিয়ায় যে পাখির ঝাঁকের আগমন ঘটত সেগুলো ছাড়া সিংহ, প্যানথার, চিতাবাঘ এবং সকল প্রকার হরিণ ছিল শিকারের সাধারণ বস্তু। বাজপাখির সাহায্যে শিকার করাও এক প্রকার আমোদের ব্যাপার ছিল।

সামাজিক পুনর্মিলন

উচ্চপদস্থ লোকেদের গৃহে প্রায়ই সামাজিক পুনর্মিলন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত। এই সভায় বিভিন্ন প্রতিভা ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা পরস্পর মিলিত হয়ে আলোচনায় যোগদান করতেন। কিন্তু মামুনের সময় থেকে সাহিত্য সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। এই সকল সমিতিতে পণ্ডিত ব্যক্তিরা সমবেত হয়ে দার্শনিক বিষয়সমূহ আলোচনা করতেন– যদিও সেগুলোকে দমনের জন্য বিশেষভাবে মুতাওয়াক্কিল ও মুতাজিদের সময়ে নানা রকম প্রয়াস চলেছিল; তবু বাগদাদের ধ্বংসকাল পর্যন্ত সেগুলো সগৌরবে বহাল ছিল। তৎকালীন সমাজে পুস্তক বিক্রেতারা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন এবং সাধারণভাবে তাঁদের দোকানগুলো ছাত্র ও বিদ্বান ব্যক্তিদের নিয়মিত গমনাগমনস্থলে পনিণত হত। এই স্থানকে নিরপেক্ষ ক্ষেত্র বিবেচনা করে মুতাজিলা ও আশআরীরা অদৃষ্টবাদ, পরকালে আল্লাহর দর্শন লাভ, দৈহিক পুনরুত্থান প্রভৃতি বিষয়ে পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করতেন। পুস্তক বিক্রেতা কেবল জ্ঞানের পরিবেশকই ছিলেন না বরং প্রায়ই বইপত্র প্রকাশ করতেন। লিখন শৈলী এত পূর্ণতা লাভ করেছিল যে শ্রেষ্ঠ বইগুলো এক দীনার অর্থাৎ ১৩ শিলিং ৬ পেন্স মূল্যে জনসাধারণের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

আরবদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ

মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে একটি জাতির পাঁচ শতাব্দী ব্যাপী বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেয়া অসম্ভব। তবু আরবরা পৃথিবীর উন্নতি বিধানে যে কাজ করে গেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ব্যতীত এই পর্যালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পূর্বেই আমি রশীদ ও মামুনের আমলে শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছি। এখানে আমি আরব ইতিহাসের বুদ্ধিবৃত্তির প্রধান দিকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেই ক্ষান্ত হব।

নাবিকদের দিকনির্ণয় যন্ত্র

আরবরা নাবিকদের দিকনির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কার করে এবং জ্ঞানান্বেষণ বা বাণিজ্য উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী সমুদ্র পথে পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। তারা আফ্রিকা, দূরবর্তী দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারতের সমুদ্রোপকূল ও মালয় উপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে। এমনকি চীনও মুসলিম ঔপনিবেশিক ও সওদাগরদের জন্য তারা রুদ্ধ দ্বার খুলে দিয়েছিল, আর বসরা ছিল ভারত ও ক্যাথের সাথে বাণিজ্যিক বিনিময়ের জন্য একটি কর্মবহুল বন্দর।

আরবদের বাণিজ্যিক তৎপরতা

আরবদের বাণিজ্যিক তৎপতর সমুদ্র পথেই সীমাবদ্ধ ছিল না। একটি বিশাল মরুপথ দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলোর উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল, আরেকটি গিয়েছিল দক্ষিণ দিকে মরুভূমির উপর দিয়ে অন্ধকাররাচ্ছন্ন মহাদেশের (আফ্রিকা) কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত। ভূমধ্যাসাগরের অসংখ্য বন্দর থেকে এই উত্তরাঞ্চলের বাণিজ্য-পসরা স্পেন, সিলি, ইতালি ও ফ্রান্সে পৌঁছে দেয়া হত। ত্রিবিজন্দ ছিল বাইজান্টিয়ামের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি রমরমা জংশন। অন্যান্য বাণিজ্য পথগুলো পারস্যোপসাগরের উপর দিয়ে মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারতে চলে গিয়েছিল, পক্ষান্তরে তৃতীয় আরেকটি পথ বাগদাদ থেকে কাস্পিয়ান সাগরের উপকূল পর্যন্ত গিয়ে জাহাজের সাহায্যে যুক্ত হয়েছিল দূরবর্তী উত্তরাঞ্চলের দেশসমূহের সাথে। এ থেকে অদ্যাবধি রাশিয়া ও সুইডেনে আব্বাসীয় মুদ্রা প্রাপ্তির কারণ নির্ণয় করা যায় এবং সেইযুগে আরবদের সাথে তাদের সক্রিয় বাণিজ্যিক লেনদেনের কথাও এতে প্রমাণিত হয়।

আরবদের আবিষ্কার

আরবরা অ্যাজোর্স (Azores) আবিষ্কার করে এবং অনুমান করা হয় যে তারা আমেরিকা পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিল। প্রাচীন মহাদেশসমূহে তারা মানুষের শিল্পোন্নতির জন্য নানাভাবে অভূতপূর্ব ও অতুলনীয় উৎসাহ প্রদান করেছিল। আরবের নবী পরিশ্রমকে কর্তব্য বলে শিক্ষা দিয়েছেন; শিল্পকর্মকে নির্দেশ করেছেন ধর্মকর্ম বলে। আল্লাহর দৃষ্টিতে উত্তম বলে কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ে সুপারিশ করেছেন। এসব উপদেশের স্বাভাবিক ফললাভ ঘটেছিল; সওদাগর, ব্যবসায়ী ও সাধারণ শ্রমশিল্পী শ্রেণীকে সম্মান প্রদর্শন করা হত এবং শাসনকর্তা, সেনাপতি ও বিদগ্ধ ব্যক্তিরা নিজেদের পেশাগত উপাধি দ্বারা অভিহিত হতে ঘৃণা বোধ করতেন না।

এই দীর্ঘ সময়ে যে বিপুল সংখ্যক সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তাঁরা মানবিক জ্ঞানের প্রতিটি শাখার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর ব্যাকরণ, সুকুমার সাহিত্য, অলঙ্কার শাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, হাদীস ও ভ্রমণ সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন; প্রণয়ন করেন অভিধান ও জীবনী গ্রন্থ এবং সুচিন্তিত ইতিহাস ও সুন্দর কাব্য রচনা করে বিশ্বকে করেন সমৃদ্ধ; বিজ্ঞানের আবিষ্কার দ্বারা তাঁরা মানবীয় জ্ঞানের পরিধিকে করে তোলেন প্রশস্ত এবং তাঁদের দার্শনিক আলোচনা দ্বারা চিন্তার আন্দোলনে প্রেরণা সঞ্চার করেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে আরবরা যে ব্যাপক পরিধি জুড়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেছিল সে বিষয়ে বিবেচনা করলে আমি যে চিন্তাশীল ঐতিহাসিকের[১] কথা প্রায়ই উল্লেখ করেছি তাঁর মূল্যায়নকে মোটেই অতিশয়োক্তি বলা চলে না। এই যুগের বিশাল সাহিত্যকর্ম, বহুবিধ প্রতিভার স্ফুরণ ও মূল্যবান আবিষ্কারসমূহ সবকিছুই বিস্ময়কর বুদ্ধিবৃত্তির প্রমাণ দেয় এবং আরবরা যে প্রতি বিষয়েই আমাদের গুরু ছিল তা যথার্থভাবে প্রতিপন্ন করে। তারা একদিকে যেমন মধ্যযুগের ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ, ভ্রমণ কাহিনী ও চরিত্রাভিধান প্রণয়নের সুন্দর পদ্ধতি প্রদান করেছেন, অন্যদিকে তেমনি অতুলনীয় শ্রমশিল্প এবং কল্পনা ও রূপায়নে সমানভাবে চমকপ্রদ স্থাপত্য ও শিল্পকলার গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছিল।

আলোচ্য সময়ে অভিনিবেশ সহকারে পদার্থ বিজ্ঞানের চর্চা হত এবং রসায়নশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, প্রাকৃতিক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, তাদের কর্মস্পৃহা এতে নিয়োজিত ছিল। কুফার আবু মুসা জাফর (খ্রিস্টান লেখকদের কাছে Geber বলে পরিচিত) হলেন আধুনিক রসায়নবিদ্যার জনক। তাঁকে যাঁরা অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের মৌলিকতা ও অধ্যবসায়, জ্ঞানের গভীরতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি

---

[১] সিডিলট।

আধুনিক যুগের শিক্ষার্থীদের বিস্ময় উদ্রেক করে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও শল্যকলার চরম উন্নতি হয়েছিল। আরবরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ওষুধ প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কার করে এবং তারাই বর্তমানে ডিসপেনসারি বা ঔষধালয় নামক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবর্তক। তারা প্রতিটি নগরে জনসাধারণের জন্য হাসপাতাল স্থাপন করেন। এইগুলোকে বলা হত দারউস শাফা অর্থাৎ আরোগ্য নিকেতন বা মারিস্তান (বিমারিস্তানের সংক্ষিপ্ত রূপ) অর্থাৎ চিকিৎসাধীন রোগীদের নিবাস এবং সেগুলো সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত হত।

উদ্ভিদবিদ্যা ও লতাপাতার ভেষজগুণ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করতে বিদ্যার্থীদের শিক্ষার জন্য বাগদাদ ও অন্যান্য স্থানে স্বাভাবিক উদ্যানসমূহ বিদ্যমান ছিল। এই সকল স্থানে বক্তৃতা করতেন বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা। একইভাবে নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বুদ্ধিবাদী আন্দোলনের ফলে বিজ্ঞান ও শিল্পকলার যে দ্রুত উন্নতি সাধিত হয় তাতে ভূগোল ও ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ রচনার সূচনা ঘটে। মুসলিম ইবন হুমাইর[১], জাফর ইবন আহমদ আল মারবাজী (মার্বের অধিবাসী), ইবন ফুজলান, ইবন খুরদাবিহ[২] জায়হানী, মাসউদী, আল-ইসতাখরী[৩], ইবন হাওকাল[৪], আল-বিরুনী[৫], ইয়াকুত, আল-বাকরী, আল-মুকাদ্দাসী ও ইদ্রিসী ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত আরব ভৌগোলিক।[৬]

আল-বিরুনী[৭] ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে বসবাস করে তিনি তাদের ভাষা, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য, তাদের রীতিনীতি ও আদব কায়দা, আইনকানুন, ধর্ম, অদ্ভুত কুসংস্কার এবং দেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর মন্তব্যসমূহ হোমার, প্লেটো ও অন্যান্য গ্রিক লেখক ও দার্শনিকদের উদ্ধৃতি সহযোগে বৈচিত্র্যময় হয়ে একটি গ্রন্থে প্রণীত হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ছাড়াও তিনি জ্যোতিষ, অংক, গাণিতিক ভূগোল, কাল নিরূপণ বিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান সম্পর্কেও গ্রন্থ রচনা করেন। বিরুনীর অল্পকাল পরে আবির্ভূত হন প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও পর্যটক নাসির-ই-খসরু। জেজসারটেস দরিয়ার তীরে অবস্থিত কুবাদীয়ান নামক গ্রামে তাঁর জন্ম হয় এবং তিনি মার্ব নগরে বসবাস করতেন। ১০৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই শহর ত্যাগ করে নিশাপুর, কুম, তাব্রিজ, আখলাত বা খিলাত ও মায়াফারিকীন ও আলেপ্পো পরিভ্রমণ করে সিরিয়ায় আসেন এবং টায়ার, সিডন, বেইরুট ও জেরুজালেম পরিদর্শনের পর শিমরে যান। মিশর থেকে পবিত্র নগরদ্বয়ে (মক্কা ও মদীনা), তারপর আল আহসার পথে বসরা এবং সেখান থেকে বলখে ফিরে যান। তাঁর সফরনামা যে কোন ভাষায় লেখা সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী ভ্রমণ কাহিনীগুলোর অন্যতম।

---

[১] ৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে।

[২] মুতাজিদের আমলে জীবিত ছিলেন, মৃত্যু হয় আনুমানিক ৯১২ খ্রিস্টাব্দে।

[৩] আনুমানিক ৯৫১ খ্রিস্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

[৪] আনুমানকি ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হয়।

[৫] ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে গজনীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৬] মুজাম-উল বুলদানের লেখক, ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে জন্ম, মৃত্যু ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে। আল বাকরী (আবু উবাইদ আবদুল্লাহ) ছিলেন স্পেনের অধিবাসী, ১০৯৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ইদ্রিসী এত সুপরিচিত ছিলেন যে তাঁর বিস্তৃত পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ১১৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

[৭] আবু রায়হান মুহম্মদ ইবন আহমদ ছিলেন খওয়ারিজমের অধিবাসী এবং তিনি গজনীর মাহমুদ ও মাসউদের সময় খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

ইতিহাস

পুরাতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জ্ঞানের এই মনোমুগ্ধকর শাখার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করতেন। বালাজুরী বাগদাদে জন্মগ্রহণ করে সেখানে বসবাস ও গ্রন্থ রচনা করেন এবং ২৭৯ হিজরিতে (৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর বিজয়ের ইতিহাস (ফুতুহ-উল বুলদান) চমকপ্রদভঙ্গিতে লিখিত এবং তা ঐতিহাসিক মনোবৃত্তির সুস্পষ্ট উন্নতি সূচিত করেছিল।

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর শেষ এবং চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে খ্যাতিমান হামদানী দক্ষিণ আরবের বিস্তারিত ইতিহাস, এর গোত্রসমূহ ও অসংখ্য চিত্তাকর্ষক ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা, শিলালিপিসমূহের ব্যাখ্যা সেইসাথে ইয়েমেনের জাতিতত্ত্ব ও ভূগোল পৃথিবীকে দান করেন। তবে মাসউদী, তাবারী ও ইবনুল আসিরের বিশাল গ্রন্থাবলিতেই আমরা এই যুগের আরব মনের পূর্ণ কার্যকলাপ দেখতে পাই। তাদের উত্তরধিকারীদের[১] মতই এই ব্যক্তিরা ছিলেন বিশ্বকোষ প্রণেতা, দার্শনিক, গণিত শাস্ত্রবিদ, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক।

মাসউদী

বাগদাদের অধিবাসী হলেও মাসউদী ছিলেন উত্তর আরবের বংশোদ্ভূত। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে মুসলিম দুনিয়ার অধিকাংশ স্থান পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি প্রথমে ভারতবর্ষের গিয়ে মুলতান ও মনসুরা পরিদর্শন করেন, অতঃপর পারস্য ও কিরামানের উপর দিয়ে পরিভ্রমণ করে পুনরায় ভারতবর্ষে যান এবং কিছুদিন কাম্বে (কাম্বাজা) ও দাক্ষিণাত্যে কাটিয়ে চলে যান সিংহলে, সেখান থেকে জলপথে কাম্বালু (মাদাগাসকার) এবং সেখান থেকে ওমানে গমন করেন। সম্ভবত তিনি ইন্দোচীন উপদ্বীপ এবং চীনেও গমন করেন। তিনি মধ্য এশিয়ার বহুদূর পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে কাস্পিয়ান সাগরে উপনীত হন। ভ্রমণান্তে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন টাইবেরিয়াস ও এন্টিয়কে এবং পরে বসরায়। সেখানে তিনি মুরুজ-উজ-জাহাব নামে বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করেন। পরিশেষে তিনি অবস্থান করেন ফুসতাতে (পুরাতন কায়রো), সেখানে তিনি প্রকাশ করেন 'কিতাব-উত-তানবিহ এবং পরে মিরাত-উজ জামান বা সময়ের দর্পণ নামে এক বিশাল গ্রন্থ, যার কিছু অংশ বিশেষ সংরক্ষিত আছে। বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে পাঠককে আমোদ ও উপদেশ প্রদান করতে আগ্রহান্বিত হয়ে তিনি মুরুজ-উজ-জাহাব (সোনালী প্রান্তর) গ্রন্থে চিত্তাকর্ষক ও আনন্দবর্ধক উপায়ে তাঁর জীবনের বহুমূল্য অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। সাক্ষ্যপ্রমাণ স্বরূপ নামের তালিকা দ্বারা লেখনীকে ভারাক্রান্ত না করে, বিস্ময়কর, দুষ্প্রাপ্য ও চিত্তাকর্ষক রূপে তাঁর মনে যা উদিত হত তাকেই গুরুত্ব দিয়ে সংক্ষেপে ও আখ্যানমূলক লিপি কুশলতায় জনসাধারণ ও তাদের আচার-ব্যবহার চিত্রিত করে তিনি আনন্দবোধ করতেন।

তাবারী

তাবারী (আবু জাফর মুহম্মদ ইবন জরীর) আরবদের লিভী নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি ৯২২ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে পরলোকগমন করে। তিনি ৩০২ হিজরি (৯১৪ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত তাঁর বর্ষপঞ্জি রচনার কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন। আল মাকীন দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ঘটনা এতে সন্নিবেশিত করেন।

---

[১] মাকরিজী, ইবন খালদুন, আবুল ফিদা প্রমুখ।

ইবনুল আসির

ইজ্জুদ্দিন বা ধর্মের গৌরব বলে অভিহিত ইবনুল আসির ইরাকের জাজিরা বনু উমরের অধিবাসী হলেও তিনি প্রধানত বাস করতেন মসুলের নিকটবর্তী স্থানে। সেখানে তাঁর সুরম্য ভবন[১] তৎকালীন বিখ্যাত বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থল ছিল। আল কামিল নামে পরিচিত তাঁর বিশ্বজনীন ইতিহাস ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে পরিসমাপ্তি লাভ করে। এটিকে আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তিনি মসুলের আতাবেগদের সম্বন্ধেও একটি ইতিহাস রচনা করেন।

আরবদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-চর্চা

আরবরগ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে বিরাট কাজ সম্পাদন করেছিলেন তার কেবল সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন। আরবদের সবচেয়ে প্রাচীন জ্যোতির্বিদ মাশাআল্লাহ ও আহমদ ইবন মুহম্মদ আল নিহাবন্দি মনসুরের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। মামুনের রাজত্বকালে সিন্দ ইবন আলী, ইয়াহিয়া ইবন আবি মনসুর ও খলিদ ইবন আবদুল মালিকের মত বিখ্যাত জ্যোতির্বিদগণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সূর্যের বিষুবরেখা অতিক্রমের সময়, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ, ধূমকেতুর ছায়া এবং নভোমণ্ডলের অন্যান্য দৃশ্য সম্পর্কে তাঁদের গবেষণামূলক মন্তব্য বহুলভাবে মানবীয় জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করেছিল।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

মুহম্মদ ইবন মুসা আল খওয়ারিজমী মামুনের আদেশক্রমে সিদ্ধান্ত বা ভারতীয় সারণী টীকা ও টিপ্পনীসহ অনুবাদ করেন। আল-কিন্দী গণিত, জ্যামিতি, দর্শন, আবহবিদ্যা, দৃষ্টিবিজ্ঞান, ভেষজ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে দুইশত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আবু মাশার (মধ্যযুগের ইউরোপ কর্তৃক আলবুমাজার রূপে বিবৃত) সৌর মণ্ডলকেই তাঁর বিশেষ অধ্যয়নের বিষয় রূপে গ্রহণ করেন এবং আবু মাশারের সারণীই সর্বকালের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে রয়েছে। মুসা ইবন শাকির ছিলেন রশীদের সময়ের একজন প্রধান নির্মান বিজ্ঞানী। কিন্তু তাঁর পুত্ররা মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিকের আমলে প্রসিদ্ধি লাভ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানকেই তাঁদের অধ্যয়নের বিশেষ বিষয়রূপে গ্রহণ করেন এবং সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের গতিবিধি সম্পর্কে বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশ করেন। তাঁরা পৃথিবীর আকার, সূর্যের গ্রহণরেখার বক্রতা, চন্দ্রের অক্ষররেখার তারতম্য, বিষুবরেখার গতিবিধি প্রভৃতি নির্ণয় করেন। আবুল হাসান দূরবীন আবিষ্কার করেন। এর সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি একটি নল বিশেষ এবং এর উভয় প্রান্তে আলোর প্রতিফলক সংযুক্ত রয়েছে। মুসা ইবন শাকিরের পুত্রদের আরব্ধ মহান কাজ চালিয়ে যান আন নাইজারী ও মুহম্মদ ইবন ঈসা আবু আবদুল্লাহ। আলবাতানী[২] (মধ্যযুগীয় ইউরোপের Albategnius) ছিলেন আরেকজন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁর জ্যোতিষ্ক সারণী লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়ে বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তিস্বরূপ কাজ করেছিল।

দশম শতাব্দীর শেষ দিকে বাগদাদে বসবাসকারী ও কর্মরত অসংখ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে সচরাচর বানু আমাজুর নামে পরিচিত। আলী ইবন আমাজুর ও আবুল হাসান আলী ইবন আমজুর নামে দুই ব্যক্তির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রের গতিবিধি নির্ণয়ের জন্য তাঁরা বিখ্যাত।

বুওয়াইহীদের আমলে বহু সংখ্যক জ্যোতির্বিদ, পদার্থবিদ ও গণিত শাস্ত্রবিদ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে কেবল আলকোহী ও আবুল ওয়াফা এই দুইজনের

---

[১] পূর্বে দেখুন।

[২] ৯২৯ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

নাম এখানে উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন। আলকোহী গ্রন্থের গতি সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেন। কর্কটক্রান্তি ও জলবিষুব সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবুল ওয়াফা খোরাসানের বুজজান নামক স্থানে ৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইরাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখানে তিনি প্রধানত গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় আত্মনিয়োগ কনে। তিনি ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পর্যবেক্ষণে ছেদক ও স্পর্শরেখার ব্যবহার প্রবর্তন করেন।

ইবন ইউনুস নামক আর একজন অন্যতম বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও গণিত শাস্ত্রজ্ঞ ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁর আবষ্কারসমূহ ইবনুন নবদী এবং ইউরোপে আল-হাজেন নামে সচরাচর হাসান ইবন হায়সাম কর্তৃক আরো উন্নতিপ্রাপ্ত হয়। ইবন হায়সাম বায়ুমণ্ডলের দিক পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ের বিখ্যাত আবিষ্কারক। তিনি একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও আলোক বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করলেও প্রধানত মিশরেই বসবাস করতেন। আলোক বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থাবলির জন্য তিনি ইউরোপে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তন্মধ্যে একটি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। ইবন তুলুনের রাজত্বকালে জীবিত ইবন শাথির এবং কবি হিসেবেই সমাধিক পরিচিত ওমর খৈয়ামও ছিলেন খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ।

দর্শন

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় সমান উৎসাহে অধিবিদ্যা ও দর্শনের চর্চা হত। আল-কিন্দী, আল-ফারাবী ও আবু আলী ইবন সীনা (Abicenna) হলেন সবচেয়ে বিখ্যাত আরব দার্শনিক।[১]

সচরাচর আরবদের দার্শনিক বলে অভিহিত এবং ইউরোপে আল-কিন্দিয়াস নামে পরিচিত ইয়াকুব ইবন ইসহাক আল-কিন্দী[২] ছিলেন সর্বজনীন মুক্তিবাদী। আরবগণ কর্তৃক দ্বিতীয় অ্যারিস্টটল নামে অভিহিত আবু নসর ফারাবী[৩] (Alfarbious) ছিলেন ইবন সীনার (আভিসেনা) শিক্ষক ও অগ্রদূত।

আভিসেনা

ইবন সীনা[৪] (আভিসেনা) নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ছিলেন।

কাব্য

এই যুগের অসংখ্য কবি আরবী ও পারসি উভয় ভাষাতেই কবিতা রচনা করায় তাঁদের বাছাই করা এক দুরূহ ব্যাপার। যাঁরা আরবী ভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন তাঁদের নাম ইস্পাহানী ও ইবন খাল্লিকানের গৌরবোজ্জ্বল গ্রন্থের পৃষ্ঠায় দেখতে পাওয়া যাবে। এখানে যাঁদের নাম দেয়া হল তাঁদেরকে কেবল আরব মনের উর্বরতার পরিচয় দেয়ার জন্য বিক্ষিপ্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। আবু নওয়াস[৫] আমিনের সময় প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁকে গণ্য করা হত প্রাক ইসলামী যুগের প্রখ্যাত কবি আমিরুল কায়েসের সমকক্ষ রূপে। তাঁর কিছুদিন পরই আবির্ভূত হন উতবী[৬] ও

---

[১] স্পেনীয় নামের জন্য *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম* দেখুন।

[২] ৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হয়।

[৩] ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হয়।

[৪] ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হয়।

[৫] ৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

[৬] উতবী ৮৪২ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

আবু তাম্মাম হাবিব।[১] শেষোক্ত জন সম্পর্কে ইবন খাল্লিকান বলেন : রচনাশৈলীর মৌলিকতা, কবিতার গুণ ও বিষয়বস্তুর বর্ণনা নৈপুণ্যে তিনি তাঁর সকল সমসাময়িক কবিদের অতিক্রম করে গিয়েছেন। আল- বুহতারী নবম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আবু তাম্মামের ন্যায় তিনি হামাসা নামক কাব্যের রচয়িতা। কিন্তু মুতান্নবীর[২] খ্যাতি তাঁর অধিকাংশ পূর্বসূরিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি মসুলের হামদানী বংশীয় আমীর সাঈফুদ্দৌল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। আন-নামী ছিলেন আরেকজন প্রতিভাবান কবি। তিনি ১০০৮ খ্রিস্টাব্দে আলেপ্পোতে মৃত্যুবরণ করেন।

পারসি কবিদের মধ্যে সুলতান মাহমুদের সময় দাকীকী ও ফিরদৌসী, সুলতান মাসউদের আমলে উনসূরি, সুলতান সঞ্জরের আমলে আনওয়ারী, আইকোনিয়ামের সুলতান আলাউদ্দিনের আমলে তাতারদের হাতে নিহত ঔষধ ব্যবসায়ী ফরিদউদ্দিন, জালালউদ্দিন এবং গজনবী সুলতান ইব্রাহীমের আমলে সানাঈ ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত। আন-নাদীম নামে অভিহিত বাগদাদের অধিবাসী আবু ফারাজ মুহম্মদ ইবন ইসহাক[৩] সর্বপ্রথম গ্রন্থ বিবরণী মূলক অভিধান প্রণয়নের ধারণা পোষণ করেন। তাঁর কিতাব-উল-ফিহরিস্ত গ্রন্থে সকল প্রকার জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে এমন অনেক লেখক ও তাঁদের গ্রন্থাবলির নাম দেয়া হয়েছে যে-সকল গ্রন্থ আর পাওয়া যায় না, কিন্তু সেগুলোতে আবরদের সৃজনশীল সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যেত। ইবন খাল্লিকানের[৪] বিশাল গ্রন্থ জীবন চরিতমূলক বিশ্বকোষ বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ।

সাঈফুদ্দৌল্লাহ বিখ্যাত 'কিতাব-উল-আগানী'র লেখক আবুল ফারাজ আলী ইবন হুসাইন আল ইস্পাহানীর[৫] মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই গ্রন্থটি তার নামানুসারে শুধু সঙ্গীত গ্রন্থই নয়। যাঁদের গান এতে সন্নিবেশিত হয়েছে তাঁদের জীবনী এতে স্থান পেয়েছে, আলোচিত হয়েছে সঙ্গীতগুলোর ব্যাকরণগত গঠন প্রণালী এবং মাঝে মাঝে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে।

লিপি কৌশল

কথিত আছে ইসলাম প্রচারের কিছুদিন আগে কোরাইশদের মধ্যে আরবী লিখনশৈলী প্রবর্তিত হয়েছিল। হীরার[৬] নিকটবর্তী আনবারের অধিবাসী জনৈক মুরামির ইবন মারাসা এটি প্রথম আবিষ্কার করেন। আনবার থেকে এটি চলে যায় হীরাতে; আবু সুফিয়ানের[৭] পিতা হার্ব মুনজিরসের[৮] রাজধানী পরিদর্শনকালে এটি আয়ত্ত করেন এবং মক্কায় তাঁর স্বীয় নগরবাসীদের মধ্যে তা প্রবর্তন করেন। এরপর তা দ্রুত কুরাইশদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

ইয়েমেনের হিমরায়দের মধ্যে সম্ভবত ধ্বনি প্রধান একটি ভিন্ন ধরনের লিখন পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল বলে মনে হয়। ইবনে খাল্লিকান বলেন, হিময়ারদের আল মুসনদ নামে এক রকম লিখন পদ্ধতি ছিল। এতে অক্ষরগুলো পৃথকভাবে থাকত, পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকত না; তারা এটি সাধারণ লোকদের শিখতে দিত না এবং তাদের

---

[১] ৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে আবু তাম্মামের মৃত্যু হয়।

[২] তিনি ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে দস্যুদের সাথে যুদ্ধে নিহত হন।

[৩] ৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে।

[৪] জন্ম ১২১১ খ্রি., মৃত্যু ১২১৮ খ্রি.।

[৫] মৃত্যু ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে।

[৬] পূর্বে দেখুন।

[৭] মুআবিয়ার পিতা।

[৮] কথিত আছে, জনৈক আসলাম ইবন সিদরা তাঁর শিক্ষক ছিলেন।

অনুমতি ব্যতীত কেউ এটি ব্যবহার করতে সাহস পেত না। তারপর যখন ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় ঘটে তখন দেখা যায় সমগ্র ইয়েমেনে লেখাপড়া জানা একজন লোকও নেই।

উমাইয়াদের রাজত্বের শেষদিকে প্রাচীন কুফীল লিখন পদ্ধতি বিভিন্ন আকারে রূপান্তরিত হয়, তন্মধ্যে নাসখ বা নাসখী পদ্ধতিই ছিল সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (হিজরি চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী) নাসখ লিখন পদ্ধতি সচরাচর ইবন বাওয়াব নামে পরিচিত আবু হাসান ও আবু তালিব আল-মুবারক নামক দুই শ্রেষ্ঠ আরবি লিপিকারের হাতে আরও উন্নতি লাভ করে।

সালাহউদ্দীনের রাজত্বকালে আমরা সুলস[১] নামে এক প্রকার বৃহৎ গোলাকার লিখনের কথা জানতে পারি। এটি পারস্যের নাসতালিক পদ্ধতির কাছাকাছি নাসখী পদ্ধতিরই উন্নত রূপ বলে মনে হয়।

ধর্মীয় সম্প্রদায়

এই যুগে প্রত্যাশিতভাবেই ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে; কিন্তু সে সময় সচরাচর আশআরী[২] বলে অভিহিত হানাফী মতবাদই ছিল রাষ্ট্রীয় ধর্ম। তবু হানাফী ধর্মসভাগুলোতে হাম্বলী সম্প্রদায়ের লোকদেরই প্রাধান্য ছিল। তারা ছিল অত্যন্ত কলহপ্রিয় ও দুর্ধর্ষ সম্প্রদায় এবং বাগদাদের জনসাধারণের উপর তাদের প্রভূত কর্তৃত্ব ছিল। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে শাফিঈ মতবাদও প্রসার লাভ করেছিল। সিরিয়ার নগরগুলোতে এবং ফিনিশিয়ার সমুদ্র উপকূলবর্তী শহরসমূহে বহু লোক ছিল শিয়া মতাবলম্বী, যারা নিঃসন্দেহে হাম্বলীদের গোঁড়ামির কঠোরতাকে কিছুটা শিথিল করেছিল। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর (মোতাবেক খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী) ধর্মী-দর্শনের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল যুক্তিবাদী আন্দোলনের অভূতপূর্ব পুনরুত্থান। খুব সম্ভবত মাসউদী ও জখমশরীর ন্যায় চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং আল-কিন্দী ও আল-ফারাবীর ন্যায় দার্শকিদের লেখনীর ফলেই এরূপ ঘটেছিল।

মুতাজিলী মতবাদ

মুতাজিলীগণ বিশ্বাসের সাথে যুক্তি এবং ধর্মের সাথে দর্শনের সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই যেসব মানস সাধারণ খাতে চালিত হয়ে তৃপ্তি পেত না, তারা এই মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হত। এভাবে বহু হানাফী সাধারণ মতবাদের দিক থেকে নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে আস্থাবান হয়েও দার্শনিক বিষয়ে মুতাজিলী মতবাদ পোষণ করতেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও জনসাধারণের মনোভাব ছিল প্রগতি বিরোধী এবং শতাব্দীর শেষভাগে যাবতীয় প্রগতির আশা সন্দেহাতীতভাবেই প্রতিক্রিয়াশীলতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

---

[১] আবদুল লতিফ।

[২] এর প্রতিষ্ঠাতা আবুল হাসান আল-আশআরীর নামানুসারে আশআরী মতবাদ নামে খ্যাত। যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে যাঁর নিন্দার ফলে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। আল-বিরুনীর আল-আসার নামক গ্রন্থের সুপণ্ডিত সম্পাদক বলেন, আল-আশআরী ও আল-গাযালি না থাকলে আরবগণ গ্যালিলিও, কেপলার ও নিউটন প্রমুখ মনীষী সমন্বিত জাতিতে পরিণত হত। আল-আশআরী বাগদগাদে ৩৩১ কিংবা ৩৪০ হিজরিতে (৯৪১ কিংবা ৯৫২ খ্রি.) পরলোকগমন করেন। আশআরী মতবাদ সম্পর্কে '*দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*' দেখুন।

অকপট ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়

এই গভীর সংকটকালে জ্ঞান প্রসারের উদ্দেশে সর্বপ্রথম একটি সমিতি গঠিত হয়। ধর্মনেতাদের অনুদার আচারপ্রিয়তা, ধনিকের আত্মসংযমহীন ভোগাসক্তি ও দরিদ্রের অজ্ঞতাপ্রসূত ধর্মান্ধতা ইসলামের সংস্কার সাধনে উৎসাহী চিন্তাবিদদের একটি ক্ষুদ্র দলকে জনসাধারণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনোভাব নিয়ে আসতে এবং অজ্ঞতা ও গোঁড়ামির দিকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অধোগতি রোধ করতে একটি ভ্রাতৃসংঘ স্থাপনে অনুপ্রাণিত করে। তাঁরা নিজেদেরকে ইখওয়ানুস সাফা বা অকপট ভ্রাতৃ সম্প্রদায় নামে অভিহিত করতেন। অকপট ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়ের সংগঠন বসরায় স্থাপিত হয়। কেবল নিষ্কলুষ চরিত্র এবং বিশুদ্ধ নীতিজ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরাই এই সংঘে সংযুক্ত হতেন। সদস্যগণ শান্ত ও বিনীতভাবে সমিতির নেতা জায়দ ইবন রিফআর গৃহে মিলিত হতেন এবং এমন উদার মনোভাব ও প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দার্শনিক ও নৈতিক বিষয়সমূহ আলোচনা করতেন যা আধুনিককালেও প্রশংসার দাবিদার। খিলাফতের প্রতিটি শহরে, বস্তুত যেখানেই তাঁদের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজ করার যোগ্যতা ও ইচ্ছাসম্পন্ন একদল চিন্তাশীল লোক পেতেন সেখানেই তাঁরা সমিতির শাখা গড়ে তুলতেন। বস্তুতপক্ষে তাঁদের রীতিনীতি সর্বতোভাবেই উদারপন্থী ছিল এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁদের অভিমত ছিল অতি বাস্তব ও পরম মহানুভব। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে তাঁরা পৃথিবীকে বিভিন্ন গবেষণামূলক নিবন্ধের মাধ্যমে সাময়িক জ্ঞানের এক সাধারণ সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করেছেন। এগুলো একত্রে 'রাসায়িল ইখওয়ানুস সাফা' বা অকপট ভ্রাতৃসংঘের গ্রন্থাবলি নামে পরিচিত। এসব গ্রন্থ বা রিসালাসের আলোচনা গণিতসহ জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল, সঙ্গীত ও কারিগরিবিদ্যা; পদার্থবিদ্যাসহ রসায়ন, আবহবিদ্যা ও ভূ-তত্ত্ববিদ্যা; জীববিদ্যা, শারীরবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, অধিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, পরলোক তত্ত্ব প্রভৃতি মানবীয় জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় প্রসারিত হয়েছিল। বস্তুত এগুলো সেকালে প্রচলিত যাবতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের এক জনপ্রিয় বিদ্যাকল্পদ্রুম ছিল।

শেষ পরিণতি

এভাবে যখন নক্ষত্ররূপ আভিসেনা (Avicenna) জ্ঞানের নভোমণ্ডলে উদিত হল তখন সমাজবিজ্ঞান ও অনুরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে তাঁর উন্নত চিন্তাধারাকে অভ্যর্থনা জানানোর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে ছিল এবং খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিশ্চিতভাবেই আরব জগতে রেনেসাঁর এক আশু সম্ভাবনা সূচিত হয়। কিন্তু মুসলমানরা অচিরেই পাশ্চাত্যের ক্রুসেড বাহিনীর সাথে মৃত্যু সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ায় তাদের সমূহ শক্তি কেবল আত্মরক্ষার প্রতিই নিয়োজিত হয়। জঙ্গী নূরুদ্দিন ও সালাহউদ্দীনের সাফল্য তাদেরকে ফ্রাঙ্ক আক্রমণের বিপদ থেকে মুক্তি দিতে না দিতেই তাতার মতবাদের স্রোতধারা এসে প্রাচ্যের সমুদয় সভ্যতা ও কৃষ্টি বিনষ্ট করে দেয়।

অধ্যায়-২৬

স্পেনের আবরগণ–উমাইয়া বংশ

[১৩৮-৩০০ হিজরি; ৭৫৬-৯১২ খ্রিস্টাব্দ]

প্রথম আবদুর রহমান (আদ-দাখিল) : হিশাম : দ্বিতীয় আবদুর রহমান (আল-আওসাত) মুহম্মদ মুনজির আবদুল্লাহ।

আবদুর রহমানের স্পেনে অবতরণ : মাসারার যুদ্ধ : অভিজাত সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ : ফ্রাঙ্কদের ষড়যন্ত্র : শার্লিমানের আক্রমণ : রনসেসভেলের যুদ্ধ : আবদুর রহমানের মৃত্যু ও তাঁর চরিত্র : প্রথম হিশামের সিংহাসনারোহণ ও তাঁর চরিত্র : তাঁর ন্যায়পরায়ণ ও সদয় শাসন : ফ্রাঙ্ক ও খ্রিস্টান গোষ্ঠীগুলোর সাথে যুদ্ধ : মালিকী মতবাদের প্রবর্তন : হিমাশের মৃত্যু : প্রথম হাকামের সিংহাসনারোহণ ও তাঁর চরিত্র : তাঁর প্রতি ফকিহের (আইনজ্ঞ) বিরাগ : কর্ডোবায় বিদ্রোহ : বিদ্রোহ দমন : দাঙ্গাকারীদের নির্বাসন : টলোডা : হাকামের মৃত্যু : দ্বিতীয় আবদুর রহমানের সিংহাসননারোহণ : তাঁর সমৃদ্ধ শাসনকাল : খ্রিস্টান গোষ্ঠীগুলোর বিদ্রোহ : তাদের বশ্যতা স্বীকার : নর্মানদের অভ্যুদয় : কর্ডোভায় খ্রিস্টানদের বিক্ষোভ : আবদুর রহমানের মৃত্যু : মুহম্মদের সিংহাসনারোহণ : তাঁর চরিত্র : খ্রিস্টান বিদ্রোহ দমন : নর্মানদের নতুন আক্রমণ : তাদের পরাজয় : বিদ্রোহসমূহ : মুহম্মদের মৃত্যু : মুনজিরের সিংহাসনারোহণ : তাঁর মৃত্যু : আবদুল্লাহর উত্তরাধিকার প্রাপ্তি : তাঁর গোলযোগপূর্ণ রাজত্বকাল : তাঁর মৃত্যু : আরবদের স্যাভয়, পিডমন্ট, লিসুরিয়া ও সুইজারল্যান্ড প্রবেশ।

প্রথম আবদুর রহমান [আল-দাখিল বা প্রবেশকারী উপাধিপ্রাপ্ত]

জাবের[১] যুদ্ধের পর ছয় বছর অতিবাহিত হতে না হতেই পশ্চিমাঞ্চলে একটি নতুন উমাইয়া রাজ্য গড়ে ওঠে। নির্বাসিত পরিবারের লোকদের মধ্যে যাঁরা সাফফাহর প্রতিহিংসা এড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুর রহমান[২] (সদাশয়ের ভৃত্য) নামক হিসামের এক পৌত্র। সিরিয়া থেকে মরিটানিয়া নামক স্থানে তাঁর পলায়ন, অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা, অতিথিপরায়ণ বার্বারদের নিকট তাঁর সাময়িক অবস্থান এক লোমহর্ষক কাহিনীর সৃষ্টি করেছিল। বার্বারদের সাথে অবস্থানকালে জিব্রাল্টার প্রণালীর পরপারে অবস্থিত যে মনোরম দেশটি একদা তাঁর পূর্বপুরুষদের অধিকারে ছিল তার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেখানে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে স্বগোত্রীয় ও দলীয় লোকদের সমর্থন লাভের উদ্দেশে তিনি তাদের নিকট এক বিশ্বস্ত গুপ্তচর প্রেরণ করেন। তাঁর বার্তা সাদরে গৃহীত হয় এবং তাঁকে স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

---

[১] পূর্বে দেখুন।

[২] তিনি ছিলেন হিশামের পুত্র মুআবিয়ার পুত্র। সেজন্য তাঁকে ইবন মুআবিয়া বলা হত, যাকে প্রাচীন খ্রিস্টান কালপঞ্জি রচয়িতাগণ বেনেমগিয়াস (Benemaugius) রূপে বিকৃত করেছেন।

স্পেনে অবতরণ [রবিউস সানী, ১৩৮ হি; সেপ্টেম্বর, ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ]

৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হতভাগ্য বংশের এই তরুণ রাজকুমার স্পেন উপকূলের আল-মুনিকার (আল-মুনাক্কার) নামক স্থানে অবতরণ করেন। প্রতাপশালী মুদার বংশীয়দের সাম্প্রতিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ ইয়েমেনী বংশীয়রা তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয় এবং অচিরেই তিনি মুক্ত প্রান্তরে শাসনকর্তা ইউসুফের মুখোমুখী হতে সমর্থ হন– যিনি এতকাল যাবৎ নামমাত্র আব্বাসীয় খলিফার অধীনতা স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাষ্ট্রপ্রধান রূপে স্পেন উপদ্বীপ শাসন করছিলেন।

মাসারার যুদ্ধ [১৩ মে, ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ]

যে যুদ্ধে[১] আবদুর রহমানের সিংহসান লাভ ঘটে তা মাসারায় সংঘটিত হয় এবং তা পর্যবসিত হয় দ্বিতীয় মারজ রাহাতে।[২] ইউসুফ বিপুল ক্ষয়-ক্ষতিসহ পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। ১৪১ হিজরিতে একটি ব্যর্থ বিদ্রোহের চেষ্টা করে তিনি প্রাণ হারান।

বিতাড়িত, পলায়নপর ও গৃহহীন ভবঘুরে এবার তাঁর উচ্চাভিলাষের শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হন। তিনি একটি রাজ্যের অধীশ্বর হলেও নিজের দক্ষতা ও পরাক্রমে যা অর্জন করেছিলেন তা শান্তিপূর্ণভাবে ভোগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আরব অভিজাত সম্প্রদায় তাঁদের সহজাত সংযমহীনতার বশবর্তী হয়ে ব্যক্তিগত শাসনকে ঘৃণা করতে থাকে। বার্বারগণও তাঁদের বিরূপতার শরীক হন। এই উভয় গোত্রের লোকেরা প্রজাতান্ত্রিক মনোবৃত্তি নিয়ে আরব শাসিত স্পেনকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দল শাসিত রাজ্যপুঞ্জে বিভক্ত করতে চেয়েছিল; উক্ত দলগুলি যথেচ্ছভাবে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়ে পরস্পরের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করবে এবং আসন্ন বিপদের সময় উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হবে। এই মনোভাবের ফলে শৃঙ্খলা, সংহতি ও ঐক্য স্থাপনে আবদুর রহমানের প্রয়াসে অভিজাতবর্গ বাধা সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা অবিরত তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করলেও ক্যাটালনিয়া ও ন্যাভারের খ্রিস্টানদের ন্যায় আরব বিদ্রোহীগণও পিপিনের নিকট থেকে এবং এরপর তাঁর পুত্র শার্লেমানের নিকট হতে সাহায্য প্রাপ্ত হত। কর্ডোবার রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আরব শাসনকর্তাদের প্রয়াসকে সর্বতোভাবে সহায়তা করাই ছিল এই উভয় শাসকের নীতি।

ফ্রাঙ্কদের চক্রান্ত

ফ্রাঙ্ক রাজারা প্রায়শই তাঁদের বিদ্রোহে সরাসরিভাবে প্ররোচনা দিতেন, কিন্তু আবদুর রহমান অতুলনীয় উদ্যমের সহিত এসব বিদ্রোহের মোকাবিলা করেন। রাজ্য রক্ষার্থে এবং শান্তি-শৃঙ্খলার খাতিরে অবিরাম যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়ে তিনি যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা আমাদের কাছে প্রশংসনীয় না হলেও তিনি যে অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন তাতে এই নীতি উপযুক্তই ছিল। এটি ছিল সামন্ততন্ত্রের সাথে রাজতন্ত্রের লড়াই। আবদুর রহমানের সৌভাগ্য যে আরব সর্দারদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না, কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে আমীরকে পরাভূত করতে হলে সমগ্র অভিজাতবর্গের সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন; কিন্তু একতাবদ্ধ হয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় তা তাঁদের জানা ছিল না। কয়েক বছরের মধ্যে উমাইয়া বংশধর তাঁর পথ থেকে

---

[১] কোরবানী উৎসবের (ইওয়ামূল আজহা) দিনে। ইবনুল আসির ৫ম খণ্ড, ৭৩৮ পৃ.।

[২] পূর্বে দেখুন।

সকল শত্রুকে নিপাত করেন। বিদ্রোহ দমিত হয় এবং আরব অভিজাতবর্গ বিধ্বস্ত হয়। দেশে আমীরের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ছিল বেতনভোগী সৈন্যদের উপর নির্ভরশীল; তিনি আর জনপ্রিয় নরপতি ছিলেন না, ছিলেন না প্রথম আগমনের মত তরুণ নায়ক; তিনি আর রক্ষী ব্যতীত কর্ডোভার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারতেন না। যাঁদেরকে তিনি পরাজিত করেছিলেন তাঁদের প্রতিহিংসা থেকে পরিত্রাণের জন্য তাঁকে সর্বদা অসংখ্য অনুচর পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে হত। আবুদর রহমান যখন খ্রিস্টান বিদ্রোহী অভিজাতবর্গের মোকবিলায় ব্যাপৃত তখন স্পেনের মুসলমানরা তাদের খ্রিস্টান প্রতিবেশীদের দ্বারা শোচনীয়ভাবে নিগৃহীত হচ্ছিল। তাদের নগরগুলো পুড়িয়ে দেয়া হয়, বাড়ি ও শস্যক্ষেত্র বিধ্বস্ত হয়। তারা নিজেরাও হয় নিহত না হয় বন্দি ও দাসত্বে আবদ্ধ হয়। শোচনীয়ভাবে এই অপরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সময় উত্তরাঞ্চলের এক ব্যাপক অংশ আরবদের হাতছাড়া হয়ে যায়। আলফনজোর (আদফুনশ) পুত্র ফ্রুয়েলা[২] লুগো, ওপোরটো, সালামাঙ্কা, ক্যাস্টিল[৩] (কাসতিয়ালা), জামোরা ও সিগোভিয়া অধিকার করেন।[৪] ৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী অসংখ্য বিদ্রোহীদের একজন[৫] পিরেনীজ পর্বত পার হয়ে শার্লেমানের[৬] নিকট সাহায্য প্রার্থনা উদ্দেশে পালিয়ে যায় ।

শার্লেমানের স্পেন আক্রমণ

ফ্রাঙ্কদের সম্রাট তাঁর ক্ষমতা বিস্তার ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি এই ঘটনাকে স্পেনে প্রভুত্ব কায়েমের অনুকূল সুযোগ বলে মনে করেন। একটি বিশাল সৈন্যদল সংগ্রহ করে পর্বতমালা পেরিয়ে সম্মুখবর্তী সমস্ত কিছু ধ্বংস করতে করতে তিনি সারাগোসার নগর প্রাকারে উপনীত হন। হুসাইন ইবন ইয়াহিয়া আল-আনসারী[৭] এই নগরটি রক্ষা করছিলেন। এখান থেকে শার্লিমান সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হন। বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহে তিনি বিদ্রোহী সর্দারকে বন্দি করেন এবং স্বদেশে অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন।

---

[১] ইবনুল আসির বলেন, সেভিলে বিদ্রোহ বেং আরবদের ঈর্ষাপরায়ণতার (গিশতুল আরব) ফলে আবদুর রহমান বেনতভোগী সৈন্য (উবায়দ'র আক্ষরিক অর্থ দাস) নিয়োগ করতে শুরু করেন।

[২] ইবনুল আসির কর্তৃক তাদভিলিয়া নামে অভিহিত।

[৩] আরব লেখকরা প্রাচীন ক্যাস্টিল ও আলভাকে 'আলাবা ও কেল্লার দেশ' 'আলাবা ওয়াল কাল্লাআ', প্রাচীন লাতিন ভাষায় Alava et Castella Vetula নামে অভিহিত করেছেন। নাভেরকে তাঁরা বলেছেন বাস্কনদের দেশ। কখনো কখনো আল জাবাল-উল-বুরত বা দ্বার বা গিরিপথ বিশিষ্ট পর্বত নামক পিরোনীজ প্রান্তস্থিত গ্যাসকনির একাংশকেও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হত। স্পেন থেকে ফ্রান্সে প্রবেশের জন্য পাঁচটি গিরিপথ ছিল, যেগুলোর কোন না কোন পথ বারংবার ফ্রাঙ্ক আক্রমণের সময় আরবরা ব্যবহার করত; সেগুলো হল : (১) বার্সিলোনা থেকে পাবপিগনান হয়ে নারবোন পর্যন্ত পথ, (২) পাইকারডা থেকে কার্দা পর্যন্ত পথ, (৩) পাম্পিলুনা থেকে রনসিভেলের গিরিসংকট পার হয়ে সিজ দেশের মধ্যে দিয়ে সেন্ট জিন পিড পোর্ট পর্যন্ত পথ, ইদ্রিসী যাকে বাব-উশ-শাজরী বলে অভিহিত করেছেন, (৪) টলোসা থেকে ব্যায়োন পর্যন্ত পথ এবং (৫) বার্ন থেকে জাকা পর্যন্ত পথ।

[৪] ইবনুল আসির, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮২; মাক্কারী, ১ম খণ্ড. পৃ. ২১৩।

[৫] সুলায়মান ইবন ইয়ুকজান আল কালবী।

[৬] ইবনুল আসির কর্তৃক কারলা বলে অভিহিত।

[৭] সাদ ইবন উবাদার বংশধর।

রনসিভেল

তিনি যখন পিরোনীজ পর্বত অতিক্রম করছিলেন তখন রনসিভেলের গিরিসংকটে সুলায়মান পুত্র মাতরুহ ও আইশুন কর্তৃক আক্রান্ত হন। এই যুদ্ধে তাঁর পশ্চাৎরক্ষীদেরকে ছিন্নভিন্ন করা হয় এবং তাঁর কিছুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা নিহত হয়।[১] এরপর শার্লেমান ও আবদুর রহমানের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ

উমাইয়া বংশীয় এই নরপতির ক্ষমতা এক্ষণে সুদৃঢ়ভাবে আশ্রয়দাত্রী দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদিও তাঁর রাজত্বকাল বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র দ্বারা গোলযোগপূর্ণ ছিল, এমনকি তাতে লিপ্ত ছিল তাঁর নিজের পরিবারের লোকজনরাও, তথাপি তাঁর রাজত্বকাল ছিল সাফল্যমণ্ডিত। তেত্রিশ বছর রাজত্বের পর ১৭৩ হিরজিতে[২] তিনি পরলোক গমন করেন। যদিও তার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনে তিনি প্রায়শই কঠোর ও নির্মম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, তথাপি তিনি ছিলেন কোমল প্রকৃতির[৩] এবং শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী। ইবনুল আসির তাঁকে দীর্ঘকায়, কৃশ ও সুঠাম দেহবিশিষ্ট অক্লান্ত প্রাণশক্তির অধিকারী, প্রখর বুদ্ধি ও দুরদর্শিতাসম্পন্ন, কর্তব্যপরায়ণ, মহৎ ও উদার চরিত্রের মানুষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বিদ্বান, রুচিশীল ও কবি ছিলেন। অধ্যবসায় ও শাসন দক্ষতায় তাঁকে মনসুরের সাথে তুলনা করা হয়।[৪] তিনি চমৎকার অট্টালিকা ও উদ্যান দিয়ে কর্ডোভাকে সুশোভিত করেছিলেন এবং একটি জুমা মসজিদ নির্মাণ শুরু করেছিলেন– যা তাঁর জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ হয়নি। যদিও তিনি ১৫৬ হিজরিতে আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের নামে খুৎবা পাঠ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তবু তিনি খিলাফতের কেন্দ্রস্থলের সম্মান প্রদর্শনার্থে কখনো বিশ্বাসীদের সর্বাধিনায়ক (আমীরুল মুমেনীন) উপাধি গ্রহণ করেননি; কারণ খিলাফতের কেন্দ্রস্থল বাগদাদ তখনো ইসলামের আবাসভূমি ও আরব গোষ্ঠীসমূহের মিলনকেন্দ্র[৫] ছিল। তিনি শুধু আমীর (শাসক) উপাধি নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন।[৬]

হিশামের সিংহাসনারোহণ ; তাঁর চরিত্র

আবদুর রহমানের পর তাঁর পুত্র হিশাম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন । তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ন, কোমল স্বভাব ও মহানুভব শাসক এবং যথার্থই ধার্মিক ও সদগুণের আদর্শস্বরূপ[৭] ছিলেন। বস্তুত চরিত্রের দিক দিয়ে তাঁকে উমর ইবন আবদুল আজিজের সাথে তুলনা করা হয়।[৮] তিনি সাধারণ পোশাক পরে কর্ডোভার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন, জনসাধারণের সাথে মেলামেশা করতেন এবং স্বয়ং তাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হতেন। তিনি প্রায়শই পীড়িত ও দুঃস্থদের শয্যাপাশে উপস্থিত হয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন, দরিদ্র লোকদের গৃহ পরিদর্শন করে গভীর আগ্রহে তাদের দুঃখ ও কষ্টের কাহিনী শুনতেন। প্রায় রাতেই তিনি বৃষ্টি ও তুষারের মধ্যে করুণাবশত দরিদ্র আতুরদের জন্য নিজের হাতে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। তাঁর দান ছিল

---

[১] ইবনুল আসির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮।

[২] ইবনুল আসির এটিকে ১৭১ হিজরির ঘটনা বলে বর্ণনা করেন।

[৩] রীনড. পৃ. ৯৮।

[৪] ইবনুল আসির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৬।

[৫] মাক্কারী। মাসউদী বলেন, যতদিন পবিত্র নগরদ্বয় আব্বাসীয়দের অধিকারে ছিল ততদিন পর্যন্ত স্পেনের উমাইয়ারা আমীরুল মুমেনীন উপাধি গ্রহণ করেননি।

[৬] ইবনুল আসির তাঁকে সর্বদাই সাহিব-উল আন্দালুস বা আন্দালুসের অধিপতি বলে অভিহিত করেন।

[৭] ডোজী।

[৮] ইবনুল আসির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০২।

অবাধ এবং যেসব অভাবগ্রস্ত ধার্মিক ব্যক্তি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া অগ্রাহ্য করে মসজিদে আসতেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অর্থ বিতরণ করতেন। নির্যাতিত ও দরিদ্র-পীড়িত ব্যক্তিরা কখনই তাঁর আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হত না। একইভাবে তাঁর শাসন ছিল দৃঢ় ও শক্তিশালী, কঠিন হস্তে বিশৃঙ্খলা দমন করা হত এবং কোন দুষ্কর্মই শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারত না। এই ধার্মিক নরপতির শাসনে জনসাধারণ উন্নতি লাভ করেছিল। তিনি বিখ্যাত আস-সামহ সেতুর সংস্কার সাধন করেন, পিতার আরব্ধ জুমা মসজিদের কাজ সম্পূর্ণ করেন এবং তার রাজ্যের নগরগুলোকে সুন্দর সুন্দর সরকারি প্রাসাদ দিয়ে সুশোভিত করেন।

তাঁর শাসনের দৃঢ়তা বা চরিত্রের কোমলতা কোনটিই আমীরদেরকে বিদ্রোহ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। সিংহাসনারোহণের কিছুদিন পরই তাঁকে তাঁর ভাইদের এক বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়। তাঁদেরকে দমন করার পর সুলায়মানের পুত্র মাতরূহের বিদ্রোহ প্রশমিত করার জন্য তিনি এব্রোর দিকে অগ্রসর হন; মাতরূহ শার্লিমানকে স্পেন আহ্বান করেছিলেন। বিদ্রোহী নিহত হয় এবং সারাগোসা ও বার্সিলোনা পুনরায় উমাইয়া শাসকদের বশ্যতা স্বীকার করে।

নিজ রাজ্যে শান্তি ফিরে আসায় হিশাম উত্তরাঞ্চলের দিকে মনোনিবেশ করতে সমর্থ হন। সীমান্তবর্তী খ্রিস্টান গোত্রগুলোকে দমন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল; কারণ তাদের আক্রমণ ছিল অবিরাম ও ভয়াবহ। তারা অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড চালাত এবং যেখানেই যেত সে স্থানকে করত বিধ্বস্ত। এখনকার মত তখনো সভ্যতা ও বর্বরতার মধ্যে লড়াই বিদ্যমান ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সভ্যতা বারবার অন্তর্বিরোধের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং আর বর্বরতা অবিরত বাইরে থেকে সাহায্য পেতে থাকে।

ফ্রাঙ্কদের সাথে যুদ্ধ [৭৯২ খ্রিস্টাব্দ]

যে ফ্রাঙ্ক শাসকগণ এতদিন স্পেনের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক নীতি অনুসরণ করেছিলেন এবং কিছুকাল যাবৎ উপদ্বীপে সমস্ত বিশৃঙ্খলায় উস্কানি দিয়েছিলেন হিশাম তাঁদের সমুচিত শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। এই উদ্দেশে তিনি দুইটি সেনাবাহিনীর দল প্রেরণ করেন; একটি বাহিনী ক্যাটালনিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে কার্ডেন পদদলিত করে নারবোন (আরবুনা) ও অন্যান্য স্থান পুনরায় দখল করে নেয় এবং অরবিয়েনা নদীর তীরে ভিলেডেন নামক স্থানে সেপটিম্যানিয়ায় শার্লেমানের পুত্রের পক্ষে প্রহরারত টুলোর কাউন্টকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। অন্য বাহিনীটিও সমানভাবে সাফল্য লাভ করে। গ্যালিসীয় গোত্রগুলো তাদের নেতা বারমুডার (বারমুন্ডা) নেতৃত্বে ব্যাপক প্রাণহানীসহ পরাজিত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়।

স্পেনে মালিকী মতবাদের প্রবর্তন

হিশাম মদীনার মনীষী এবং চারটি প্রধান সুন্নী মতবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আমির মালিকের[১] প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং উপদ্বীপে মালিকী প্রথা প্রবর্তন করতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এই সময় থেকে প্রকৃতপক্ষে এটি হয়ে ওঠে আন্দালুসিয়ার রাষ্ট্রধর্ম। ফকীহগণ একযোগে ধর্মতত্ত্ববিদ ও আইনজ্ঞদের কাজ সম্পাদন করতেন এবং ধর্মপরায়ণ রাজা তাঁদেরকে বিশেষ মর্যাদা দেয়ায় এই রাজত্বকালে তাঁরা জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের উপর বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন।

---

[১] পূর্বে দেখুন। বিজ্ঞ ইমাম স্পেন দেশীয় শাসকের ধর্মপরায়ণতা ও গুণাবলির উচ্ছসিত প্রশংসা করে তাঁকে মুসলিম আমীরদের আদর্শস্থানীয় হিসেবে খিলাফতের আসন গ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে করতেন।

হিশামের মৃত্যু [৭৯৬ খ্রি.]; হাকামের [আল-মুনতাসির] হিংহাসনারোহণ; তাঁর চরিত্র; তাঁর প্রতি ফকীহদের বিরাগ

হিশাম ১৮০ হিজরিতে পরলোকগমন করেন এবং তাঁর পুত্র আল মুনতাসির (বিজয়ী) উপাধিধারী হাকাম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইবনুল আসির তাঁকে জ্ঞানী, সাহসী ও গুণান্বিত বলে বর্ণনা করেন এবং আন্দালুসয়ী শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম নিজেকে জাঁকজমক ও আড়ম্বর বেষ্টিত রাখতেন। তবে তাঁর রাজত্বকাল সর্বদাই অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে গোলযোগপূর্ণ ছিল। ধর্মজ্ঞরা তাঁকে যেভাবে দরবেশ রূপে দেখতে চেয়েছিলেন, তিনি স্বভাবতই ছিলেন সেই জীবনের অনুপযুক্ত। তিনি ছিলেন চপলমতি ও ফুর্তিবাজ এবং জীবন উপভোগের উপকরণ দ্বারা সুসজ্জিত। তিনি শিকার ভালবাসতেন এবং আইনজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞদের সাহচর্য পছন্দ করতেন না; তিনি নিজেকে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও পণ্ডিত লোক কর্তৃক পরিবেষ্টিত রাখতে ভালবাসতেন। এসব প্রবণতা তাঁকে ফকীহদের বিরাগভাজন করে তোলে। কিন্তু তাঁদের অসন্তুষ্টির জন্য আরও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। হিশামের উদার অথচ ভ্রান্ত নীতির ফলে ফকীহরা দেশে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে হাকাম তাঁদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন না করলেও অথবা আইনসম্মত বিচারলয়ের রায় কার্যকর করলেও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁদের সবরকম হস্তক্ষেপ বর্জন করেছিলেন। এভাবে ক্ষমতা লাভের আশায় ব্যর্থ হয়েও ধর্মনেতার অহঙ্কারে মত্ত[১] হয়ে তাঁরা জননেতা সেজে বসেন। তাঁরা ধর্মীয় বেদী থেকে তাঁকে অসাধু ও অধার্মিক বলে নিন্দা জ্ঞাপন করেন[২] এবং তাঁর আত্মার শুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। এভাবে তাঁরা স্পেনীয় মুসলমানদের গোঁড়ামী উজ্জীবিত করতে প্রয়াসী হন– যাদের মধ্যে তাঁদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অধিকাংশ লোক ছিল ইসলাম দর্মে দীক্ষিত। কর্ডোভা, সেভিল, টলোডো ও মাদ্রিদের মত প্রধান প্রধান নগরের দীক্ষিত মুসলমানরা উচ্চ বংশোদ্ভূত ছিলেন। আরব ও বার্বার এবং স্পেন দেশীয় মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সাধারণভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রচলিত ছিল, বিশেষকরে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে এইরূপ হত। এই ধরনের মিলনজাত সন্তানকে বলা হত মুওয়াল্লাদ[৩] (আরব বংশে জন্মপ্রাপ্ত)।

বংশগত বিরোধ

খাঁটি আরব বংশজাতরা বিলাদিউন ও মুওয়াল্লাদের ঘৃণা করে তাদের সাথে ঔদ্ধত্যমূলক আচরণ করত। পারস্যের মত উমাইয়া আমলেও তাদেরকে রাষ্ট্রের উচ্চপদ থেকে বাদ দেয়ার চেষ্টা করা হত। পরিণামে খাঁটি আরবরাও এই উভয় দল কর্তৃক ঘৃণিত হত। স্পেনীয় মুসলমানরা বারবার আরব প্রাধানেয্র বিরুদ্ধে ঘোরতর বিদ্রোহ করেছিল। ফকীহরা এই তীব্র বংশগত বিভেদ প্রশমিত করার পরিবর্তে নিজেরাই স্পেনবাসীদের পক্ষ অবলম্বন করে রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণকে উৎসাহিত করেছিলেন।

---

[১] ডোজি।

[২] এই নিন্দাবাদের কথা ইবনুল আসিরের ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠায় ধ্বনিত হয়েছে।

[৩] স্পেনীয় মুলাট্টো এবং ফরাসী মুলাটার আরবী মুওয়াল্লাদ শব্দের অপভ্রংশ। পারস্যে আরব পিতা ও পারসি মাতার সন্তানদেরকে 'আবনা' বা 'সন্তান' বলা হত।

ফ্রাঙ্কদের আক্রমণ

এসব অনাচারের ফলে আন্দালুসিয়ার অভ্যন্তরে যখন অমঙ্গল দানা বেঁধে ওঠে তখন সুলায়মান ও আবদুল্লাহ নামক হাকামের দুই পিতৃব্য পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন; এরা পূর্বে একবার বিদ্রোহ করে হিশাম কর্তৃক ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ষড়যন্ত্র প্রিয় রাজা শার্লেমানের সাহায্য প্রার্থনা করতে আইলা শ্যাপেলে গমন করেন। ফ্রাঙ্কদের সাহায্যে আবদুল্লাহ টলেডো অবরোধ করেন এবং সুলায়মান ভ্যালেনসিয়ার অধিকার লাভ করেন। একই সময়ে শার্লেমানের পুত্র লুইস ও চার্লস সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে ধ্বংস করে দেন এবং গ্যালিসীয় নেতা আলফনজো আরাগনে প্রবেশ লাভ করেন।

তাদের পরাজয়

এই সংকটময় পরিস্থিতিতে হাকাম অতীব তেজস্বিতার পরিচয় দেন। সৈন্যবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশকে টলেডো পাহারার জন্য রেখে তিনি গ্যালিসীয়দের দিকে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত করে তাদের দেশ লুণ্ঠন করেন, অতঃপর ফ্রাঙ্কদের উপর আপতিত হয়ে তিনি তাদেরকে সোসাসুজি এব্রো নদী পার করে[১] পিরোনীজের অপর প্রান্তে বিতাড়িত করেন। এসব যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি টলেডোতে ফিরে আসেন। সুলায়মান যুদ্ধে নিহত হন; আবদুল্লাহ বশ্যতা স্বীকার করে ক্ষমতালাভ করেন।

বার্সিলোনা হাতছাড়া [১৮৫ হি; ৮০১ খ্রি.]

হাকাম যখন এসব বিজয়লাভ করছিলেন, ফ্রাঙ্কগণ তখন বার্সিলোনা দখল করে। মূলত এখানকার শাসনকর্তার বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই এই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ শহরটি হাতছাড়া হয়। তিনি শার্লেমান কর্তৃক এখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার অনুমতি লাভের আশায় ফ্রাঙ্কদেরকে তাঁর সাহায্যার্থে আহ্বান করেছিলেন। এভাবে শার্লেমান স্পেনে তার শক্ত ঘাঁটি তৈরি করেন। স্পেনে তাঁর অধিকৃত অঞ্চল দুটি সীমান্ত প্রদেশে বিভক্ত হয়– (১) সেপটিম্যানিয়া প্রদেশ, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ক্যাটালনিয়া এবং বার্সিলোনা ছিল এর রাজধানী; (২) গ্যাসকনি প্রদেশ– নেভার ও আরাগান নামক ফ্রাঙ্ক নগরদ্বয় এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ৮০৯ খ্রিস্টব্দে গ্যাসকনি প্রদেশ পুনরায় হাকামের অধিকারভুক্ত হয়।

কর্ডোভায় বিদ্রোহ

৮০৫ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভায় হাঙ্গামা শুরু হয়। হাঙ্গামার মোকাবিলা করা হয় সদয়ভাবে। পরের বছর হাকাম যখন মেরিডার জনসাধারণের বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত ছিলেন তখন কর্ডোভার অধিবাসীরা পুনরায় বিদ্রোহ করে। হাকাম দ্রুত রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং এই সময় কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমন করায় তিনি বিরাগভাজন হন। ৮০৭ খ্রিস্টাব্দে শার্লেমানের পুত্র লুডউইগ টরটোসা অবরোধ করলে হাকামের পুত্র আবদুর রহমান তা মুক্ত করেন। ৮১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেই ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করেন।

---

[১] এসব বিজয়ের জন্য তিনি সৈন্যগণ কর্তৃক আল-মুজাফফর (বিজয়ী) উপাধি লাভ করেছিলেন। খ্রিস্টান পঞ্জিকাকারীরা তাকে আবুলাফার রূপে বিকৃত করেছেন।

টলেডো

টলেডোর অধিবাসীরা কখনো একথা ভুলতে পারেনি যে, তাদের নগরী এককালে ছিল স্পেনের রাজধানী। তাদের অতীত গৌরবের স্মৃতি তাদের অন্তরকে পীড়িত করত এবং আরবদের বিরুদ্ধে বাড়িয়ে তুলতো তাদের বিদ্বেষ। তারা তাদের ধন-সম্পদ, জনসংখ্যা ও ঐশ্বর্যে গৌরবান্বিত হয়ে খলিফার আদেশে মান্য করতে কিংবা তাদের জন্য অনুমোদিত কোন শাসনকর্তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করত। ৮১১ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত প্রথম বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হয়। টালভেরার অধিনায়ক আমরুস ইবন ইউসূফ নামক হাকামের জনৈক সেনাপতি (কাইদ) স্বয়ং একজন মুওয়াল্লাদ ছিলেন; তাঁকে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য নিয়োগ করা হয়। তিনি কয়েকজন প্রধান অধিবাসীকে[১] হাত করে তাঁদের সাহায্যে জনসাধারণকে রাজার কর্তৃত্ব স্বীকার করতে প্রবৃত্ত করেন। দশ বছর পর তারা পুনরায় বিদ্রোহী হয়। তাদের অবাধ্যতায় অসমর্থ হয়ে অত্যন্ত বিরক্ত এবং সদয় ব্যবহার দ্বারা তাদের ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে তিনি আমরুসকে পুনরায় উক্ত অঞ্চলে নিযুক্ত করেন। আমরুস এক্ষণে নগরীর শাসনকর্তা রূপে উত্তর সীমান্তের সেনাধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রাজার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনে করে টলেডোবাসীগণ তাঁর নিয়োগ মেনে নেয়; এমনকি তারা তাঁকে নগরের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত বাসভবনও নির্মাণ করতে দেয়।

হফরার ঘটনা (১৯১ হি; ৮১৩ খ্রি.)

এভাবে কৃতকার্যতা লাভ করে তিনি একদিন প্রধান প্রধান নগরবাসীকে প্রলুব্ধ করে দুর্গের মধ্যে নিয়ে আসেন এবং তাদের হত্যা করেন।[২] এভাবে অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে প্রধান প্রধান অধিবাসীকে হারিয়ে বিক্ষুব্ধ এই নগরী পরবর্তী সাত বছর পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করে চলে।

কর্ডোভায় বিদ্রোহ [৮১৪ খ্রি.]

১৯৮ হিজরিতে কর্ডোভার অধিবাসীদের বিক্ষোভ চরম সীমায় পৌঁছায়। একদিন মসজিদে একজন সাধারণ লোক খলিফাকে তাঁর মুখের উপর অপমান ও ভীতি প্রদর্শন করতে সাহসী হয়। তাকে সমুচিত শাস্তি দেয়ার ফলে শেকুন্দাহ নামক কর্ডোভার উপকণ্ঠে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। উন্মত্ত জনতা রাজাকে একরূপ প্রাসাদে অবরোধ করে ফেলে। বিপদ চরমে উঠলেও হাকাম বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাথে জনরোষের মোকাবিলা করেন। হাঙ্গামাকারীরা প্রতিহত হয় এবং তাদের প্রধান প্রধান নেতারা নিহত কিংবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়; অবশিষ্টগণ বিতাড়িত হয়। কিছু লোক জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে ফেজের নিকট বসতি স্থাপন করে। অধিকাংশ লোক আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে যায় এবং সেখান থেকে যায় ক্রিটে,[৩] তারা ক্রিট দ্বীপ দখল করে নেয় এবং গ্রিকরা পুনরাধিকার করা পর্যন্ত সেটি তাদের দখলে রাখে। ৮১৬ খ্রিস্টাব্দে শার্লেমানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী এবং হাকামের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়, যদিও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

---

[১] বনু মাখশী।

[২] ইবনুল আসির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

[৩] পূর্বে দেখুন, পৃ. ২৬৩। তারা যে নগর পত্তন করেছিল তার নাম নগর রক্ষায় নির্মিত পরিখা (ক্যানডিয়া, ক্যানডেক্স, খন্দক) থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

হাকামের মৃত্যু [জুল হজ্জ, ২০৬ হি; মে, ৮২২ খ্রি.]; দ্বিতীয় আবদুর রহমানের [আল-আওসাত] সিংহাসনারোহণ; তাঁর চরিত্র; তাঁর সঙ্গীতানুরাগ

ছাব্বিশ বছর রাজত্বের পর ২০৬ হিজরিতে হাকামের মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র আল আওসাত[১] নামে অভিহিত আবদুর রহমান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আরব ঐতিহাসিক বলেন, তাঁর রাজত্বকাল শান্ত ও আড়ম্বরপূর্ণ ছিল, জনসাধারণ ছিল সমৃদ্ধশালী এবং প্রচুর রাজস্ব আমদানি হত। তিনি ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী এবং তিনি প্রতিভাবান ও বিদ্বান লোকদের সাহচর্য ভালবাসতেন। তাঁর অনুরোধে প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ জিরইয়াব বাগদাদ থেকে কর্ডোভায় আসেন এবং যুগপৎ রাজপ্রাসাদ ও নগরীতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। যে সঙ্গীতানুরাগ পরবর্তীকালে স্পেন দেশীয় আরবদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হয় এখন তা সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দরবারের আড়ম্বর ও জাঁকজমকে আবদুর রহমান তাঁর সকল পূর্ববসূরিকে অতিক্রম করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় নাইট সম্প্রদায় যে উন্নত সভ্যতা, পরিমার্জিত বীরত্ব এবং আরব শিষ্টাচারের কমনীয়তা, সৌন্দর্য, পারিপাট্য ও রুচিবোধ অনুকরণ করতে প্রয়াসী হন তা এই যুগ থেকে আরম্ভ হয়েছিল।[২]

খ্রিস্টান গোত্রগুলোর আক্রমণ

আবদুর রহমানের সিংহাসনারোহণের অল্পকাল পরেই লিঁওর অধিপতি (দ্বিতীয় আলফনজো[৩]) আরাগনের[৪] মদীনা-সলিম জেলা আক্রমণ করেন এবং তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও আরব রাজ্যে আক্রমণ চালায়। তাদের শাস্তিদানের জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করা হয়। বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং তাদের কেল্লা ও দুর্গগুলোকে ভূমিস্যাৎ করা হয় এবং লিঁও নগরীর ধ্বংস সাধন করা হয়।

তাদের আত্মসমর্পণ

আত্মসমর্পণের পর তাদেরকে নির্ধারিত কর ছাড়াও মোটা অংকের জরিমানা দিতে হয় এবং মুসলমান বন্দিদেরকে মুক্তি দিতে ও ভবিষ্যতে সদ্ব্যবহারের জন্য জামিন স্বরূপ প্রতিভু প্রদান করতে বাধ্য করা হয়। ফ্রাঙ্কগণও এ উপলক্ষে সুবিধা লাভের চেষ্টা করে; তারা ক্যাটালনিয়ার আরব অধিকৃত অঞ্চলে প্রবেশ করে ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড চালায়। পরবর্তীতে তারাও শোচনীয় পরাজয় বরণ করে সীমান্তের পরপারে বিতাড়িত হয়।

নর্মানদের প্রথম আবির্ভাব

আবদুর রহমানের রাজত্বকালেই স্পেন উপকূলে আবির্ভূত হয় নর্থম্যান বা নর্মানগণ (আরবগণ মাজুস বলত)। তারা সমুদ্র থেকে নাগালের মধ্যে অবস্থিত বহু স্থান লুণ্ঠন করে, কিন্তু কর্ডোভার রাজা কর্তৃক প্রেরিত নৌবহর ও সেনাদলের আগমন ঘটলে তারা পালিয়ে যায়। ফ্রান্সের লুইস লি ডেবোনেয়ারের (Louis le Debonnaire) প্ররোচনায় মেরিডার খ্রিস্টানরা বহুবার বিদ্রোহ করলেও সহজেই সেগুলো দমন করা হয়। টলেডোর এক নতুন বিদ্রোহে ইহুদী ও খ্রিস্টানরা একযোগে অংশগ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত ৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে তা দমিত হয়।

---

[১] মধ্যবর্তী।

[২] সিডিলট।

[৩] আরবদের দ্বারা লুদারিক নামে অভিহিত।

[৪] আরবদের সাগর।

কর্ডোভায় খ্রিস্টানদের বিক্ষোভ; আরবদের সহনশীলতা :
আবদুর রহমানের রাজত্বের শেষ দিকে কর্ডোভার একদল ধর্মান্ধ খ্রিস্টান বিপজ্জনক ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে তা বিদ্রোহে পরিণত হয়। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের পক্ষে আরব শাসনে অভিযোগের কোনো কারণ ছিল না। এই খ্রিস্টানগণই ছিল রাজধানী ও সমগ্র দেশের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত সমাজ। অন্যদিকে তাদের নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকার যথেষ্ট কারণ ছিল; ধর্মের জন্য তারা নির্যাতিত বা উৎপীড়িত হত না, তাদেরকে স্বাধীন ও অবাধভাবে ধর্মাচার পালন করতে হয় এবং পূর্ণভাবে ধর্মীয় আইনের ফল ভোগ করতে দেয়া হত। তাদের অনেকেই সৈন্যবাহিনীতে কাজ করত; শাসক শ্রেণীর মত তাদের জন্যও সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে লাভজনক সামরিক ও অসামরিক পদগুলো সমানভাবে উন্মুক্ত ছিল। তাদের বহুসংখ্যক লোক বিদেশী রাষ্ট্রে দূত হিসেবে নিযুক্ত হত। আবার ধনী আরব নেতাগণ তাঁদের জমিদারী পরিচালনা করার জন্য খ্রিস্টান তত্ত্বাবধায়কদের প্রতিভা কাজে লাগাতেন।

আরব কৃষ্টি গ্রহণকারী খ্রিস্টানগণ গোঁড়া খ্রিস্টানগণ কর্তৃক নিন্দিত
আরবী সাহিত্যের উৎকর্ষতায় মুগ্ধ হয়ে[১] বিদগ্ধ সমাজ বিশেষ করে রুচিশীল ব্যক্তিগণ বিজেতাদের ভাষায় কথাবার্তা বলতেন এবং লেখালেখি করতেন। আরবদের ভাষা গ্রহণের সাথে সাথে তাঁরা আবরদের চাল-চলন ও রীতিনীতি গ্রহণ করতেন। আরব কৃষ্টি গ্রহণকারী এসব খ্রিস্টানদেরকে তাঁদের ধর্মান্ধ ভ্রাতাগণ ঘৃণা করত এবং তাঁদের অধার্মিক বলে নিন্দা করত; আর ধর্মযাজকেরা অসন্তোষের আগুনে ইন্ধন জুগিয়ে ধর্মান্ধ লোকের তিক্ততা বাড়িয়ে তুলতেন। এই প্রসঙ্গে জনৈক খ্রিস্টান লেখক[২] বলেন, মুসলমানদের প্রতি তাদের সহজাত বিদ্বেষ ছিল এবং তারা মুহম্মদ (স.) ও তাঁর প্রচারিত ধর্মমত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করত। আরবদের মধ্যে বসবাস করে তাদের পক্ষে ইষলাম ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার মত সহজ কাজ আর কিছুই ছিল না; কিন্তু তারা গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে তাদের দ্বারপ্রান্তে বিদ্যমান জ্ঞানের সন্নিধানে যেতে অস্বীকার করত এবং মক্কার পয়গম্বর সম্বন্ধে তারা যেসব হাস্যকর কাহিনী সংগ্রহ করেছিল সেগুলোর পুনরুক্তি করে ও তাতে আস্থা স্থাপন করে সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু তারা যে কেবল আরবদের ধর্মকেই ঘৃণা করত তা নয়, শাসক শ্রেণীর নির্দোষ আনন্দ ও শিষ্টাচারের প্রতিও ছিল তাদের তীব্র বিদ্বেষ। এসব কারণে যে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল তা কর্ডোভার পরিত্যক্ত বালক ও ইতর লোকদের ছোটখাটো অসদাচরণের ফলে আরও গভীর হয়ে ওঠে। আধুনিক কালের নগরগুলোর এই প্রকৃতির লোকেরাও আগন্তুক বা বিদেশীদের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করে থাকে।

আন্দোলনকারীদের হাঙ্গামামূলক আচরণ; আবদুর রহমানের মৃত্যু
আবদুর রহমানের রাজত্বকালে তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি বিক্ষোভে পরিণত হয়। তারা শৈলশৃঙ্গে ও পর্বতশৃঙ্গে ওঠে দস্যু বা তাদের সহচরে পরিণত হল । তারা কেবল রাজধানীতে ধর্মের জন্য শহীদ হতে পারত। তারা প্রকাশ্যে আরব পয়গম্বর ও তাঁর ধর্মের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করত; নামাজের সময় মসজিদে ঢুকে তারা অভিশাপের পুনরাবৃত্তি করত; তারা তরুণ-তরুণীদের ধর্মাচারে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করত এবং প্রায়শই বাড়ি থেকে তাদের অপহরণ করে নিয়ে যেত। আরব পয়গম্বরের নিন্দাবাদে দাঙ্গা ও রক্তপাত সৃষ্টি হওয়ার কারণে ইসলামী রাষ্ট্রীয় আইনে এর শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

---

[১] ডোজি।

[২] ডোজি।

অপরাধীদেরকে কাজীর কাছে নিয়ে গেলে তাঁর আদালতেই তারা অভিসম্পাতের পুনরাবৃত্তি করত। তাদেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। দণ্ডাজ্ঞা অনুমোদনের জন্য তাদেরকে রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণা পরিষদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে পরিষদ কাণ্ডজ্ঞান ও মানবতার খাতিরে তাদেরকে কথা প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করতেন। এই অনুরোধ পালনের পরিবর্তে এখানে তারা পুনরায় অপরাধ করত। তখন আইনের বিধান অনুযায়ী কাজ করা হত। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আবদুর রহমান তাঁর রাজ্যের খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের এক সভা আহ্বান করেন এবং তাঁর পক্ষে স্বয়ং উপস্থিত থাকা সম্ভব না হওয়ায় তিনি রাজ্যের মন্ত্রণা পরিষদের সদস্য জনৈক খ্যাতনামা খ্রিস্টানকে[১] তাঁর প্রতিনিধি রূপে সভায় প্রেরণ করেন। ধর্মযাজকগণ একটি আদেশ জারি করে মুহম্মদ (স.) এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমস্ত রকম অভিসম্পাত বর্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং হাঙ্গামাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেন। কিন্তু কিছুতেই এই ধর্মান্ধদের উন্মাদনা প্রশমিত হয়নি। দুর্দান্ত ও কলহপ্রিয় ব্যক্তিগণ অবজ্ঞাভরে তাদের ধর্মযাজকদের আদেশ অমান্য করেছিল। কারো কারো স্পর্ধা এতই বেড়ে গেল যে তারা প্রধান জুমা মসজিদে ঢুকে পড়ত এবং চিৎকার করে বলত বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গীয় রাজ্যের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তোমরা, অবিশ্বাসীরা নরকাগ্নির আস্বাদ গ্রহণ করবে। মুসলমানগণ এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠত এবং অপরাধীদের হত্যা করতে উদ্যত হত, কিন্তু কাজী তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে জনতার প্রতিহিংসা থেকে তাদের রক্ষা করতেন। নগরের ধর্মাধ্যক্ষ দৃঢ়তার সাথে কাজ করতেন এবং সরকারও ছিল তৎপর। বহু ধর্মান্ধ ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু ৮৫২ খ্রিস্টাব্দে আবদুর রহমানের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলতে থাকে।

মুহম্মদের সিংহাসনারোহণ; তাঁর চরিত্র

আবদুর রহমানের পুত্র মুহম্মদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইবনুল আসির বলেন, ন্যায়পরায়ণতার দিক দিয়ে তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতেন। তিনিই প্রথম আন্দালুসিয়ার সকরার (নিয়মিত ভিত্তির উপর) সুগঠিত করেন এবং রাজ্যশাসনের জন্য আইন-কানুন বিধিবদ্ধ করেন। নিজের উদারতার গুণে তিন জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি ঘটান। রাজ্য সংগঠনে তাঁকে আবদুল মালিকের (প্রথম ওয়ালিদ) পুত্র ওয়ালিদের সাথে তুলনা করা হয়। আবদুর রহমানের মৃত্যু অব্যবহিত পরই টলেডোবাসীগণ লিঁওর সর্দার কর্তৃক প্রেরিত এক সৈন্যদলের সাহায্যে পুনরায় বিদ্রোহী হয়।

৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ

মুহম্মদ স্বয়ং টলেডোবাসী ও লিঁওবাসীদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে দ্রুত অভিযান চালিয়ে গুয়াদা সিলিটের (ওয়াদি সালিতাহ) নিকট তাদের সম্মুখীন হন। সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভরশীল বিদ্রোহীরা তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে, কিন্তু এক অতর্কিত আক্রমণে তারা সর্বতোভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এরপর অধিকাংশ বিষয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তির শর্তে টলেডোবাসীগণ বশ্যতা স্বীকার করে। কর্ডোভার বিশ্বাসঘাতক ও হাঙ্গামাকারীগণ এবার ক্রুদ্ধ আমিরের পূর্ণ দাপট টের পেতে শুরু করে। রাজধানীতে বিদ্রোহের মূলোৎপাটনের জন্য দমন নীতি অবলম্বন করা হয় এবং যেসব অত্যুৎসাহী ধর্মান্ধ ব্যক্তি জনসাধারণকে বিদ্রোহ করতে প্ররোচনা দিত অথবা সীমান্ত বহির্ভূত অঞ্চলের শত্রুদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতামূলক পত্র বিনিময় করত, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

---

[১] তাঁর নাম ছিল গোমেজ, তাঁর পিতা ছিলেন অ্যান্টনি এবং অ্যান্টনির পিতা ছিলেন জুলিয়ান। বিশপদের সভার অংশগ্রহণের জন্য ধর্মান্ধ খ্রিস্টানরা তাঁর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেছিল।

কর্ডোভায় খ্রিস্টান বিদ্রোহের মূলোৎপাটন

খ্রিস্টান ঐতিহাসিকের ভাষায় : এই অভূতপূর্ব উন্মাদনা বহু বছর কর্ডোভায় স্থায়ী হওয়ার পর প্রধান উৎসাহদাতাদেরকে হারিয়ে বিদ্রোহীগণ ক্রমশ প্রচলিত আইনের বশীভূত হয়ে পড়ে এবং কিছুদিন পর এর স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।[১]

নর্মানগণ [৮৫৯ খ্রি.]

ফ্রাঙ্কগণ তাদের প্রচলিত প্রথা অনুসারে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের সুযোগ নিয়ে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলো আক্রমণ করে। এজন্য মুহম্মদকে সর্বদাই ঐ অঞ্চলে একদল সৈন্য মোতায়েন রাখতে হত। ২৪৫ হিজরিতে নর্মানগণ প্রভেনস প্রদেশ বিধ্বস্ত করে পুনরায় স্পেন উপকূলে উপনীত হয়ে ভীষণ লুঠতরাজ আরম্ভ করে। স্পেনীয় নৌবহর তাদের তাড়া করে এবং তুমূল যুদ্ধের পর বহু সংখ্যক রণতরী হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত নর্মানগণ স্পেনীয় উপকূল থেকে বিতাড়িত হয়।

নেভার ও গ্যালিসিয়া আক্রমণ; বিদ্রোহ [২১৫ হি; ৮৬১ খ্রি.]

গ্যলিসিয়ি, লিঁও নেভারের খ্রিস্টান রাজাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত শাস্তিমূলক অভিযান চালানো হয়। ৮৬১ খ্রিস্টাব্দে বাসকনদের দেশ (নেভার) আক্রমণ করে তার রাজধানী (প্যামপেলুনা) অধিকার করা হয়। চার বছর পর লিঁওর রাজা শান্তি প্রার্থনা করলে বিনা শর্তে বশ্যতা স্বীকারের ভিত্তিতে তা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু মুহম্মদের রাজত্বের শেষ ভাগে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আরও ভয়ঙ্কর গোলযোগ দেখা দেয়। আরাগনে স্পেনের ভিসিগথ বংশোদ্ভূত জনৈক স্পেনীয় মুসলমান[২] সারাগোসা, টুডেলা ও হুয়েসকায় নিজের আধিপত্য কায়েম করে রাজা উপাধি ধারণ করেন।

ইবন মারওয়ান; উমর ইবন হাফসুন [৮৮৪ খ্রি.]

পশ্চিমাঞ্চলে ইবন মারওয়ান[৩] নামক মেরিডার জনৈক অধিবাসী লিঁওর রাজার (তৃতীয় আলফনজো) সহায়তায় বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন। বোবাসট্রোতে শীঘ্রই আরও ভয়াবহ বিদ্রোহ দেখা দেয়। রোনডা ও মালাগার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চল গেরিলা যুদ্ধের জন্য উপযোগী হওয়ায় তা দস্যু ও তস্করদের সর্বক্ষণের আস্তানায় পরিণত হয়। পরবর্তীকালে নেপোলিয়নের সেনাপতিরা এখানেই সবচেয়ে বেশি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং এখানেই উমর ইবন হাফসুন নামক সুলতানের সৈন্যদল থেকে পলাতক এক ব্যক্তি বহু সংখ্যক দস্যু জোগাড় করে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এসব বিদ্রোহীদের দৃষ্টান্ত সংক্রামক হয়ে পড়ে এবং কিছুটা সীমান্তবর্তী খিস্টান অধিপতি ও কিছুটা ফ্রাঙ্কদের রাজার উস্কানিতে দেশের সর্বত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এসব গোলযোগের চাপে পড়ে আরব রাজ্য যে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়েনি এটিই আশ্চর্যের কথা। যে সফলতার সাথে এই যুগে আরব রাজ্য কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল তাতে ক্ষমতাসীন জাতির বিলক্ষণ প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং শাসকদের পক্ষেও তা কম যোগ্যতার পরিচায়ক নয়। মুহম্মদ অতি বাধ্যক্য হেতু স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে

---

[১] ডোজি।

[২] বনু কাসি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত মুসা।

[৩] ইবনুল আসির কর্তৃক জালিকী বা গ্যালিসীয় নামে অভিহিত।

অবতীর্ণ হতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী মুনজিরকে এসব বিপজ্জনক বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। মুনজির প্রথমে উত্তরাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। পর্যায়ক্রমে সারাগোসা, রূতা, কার্থাজেনা ও লেরিডা প্রভৃতি স্থলভাগ তাঁর অধিকারে আসে। সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ[১] আবদুল ওয়াহিদ রূতী বন্দি হন এবং আরাগনের অংশ বিশেষের অধিপতি মুসার পুত্র ইসমাঈল বশ্যতা স্বীকার করেন। ২৭১ হিজরিতে মুনজির ইবন মারওয়ানের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাঁকে পরাজিত করেন এবং তাঁর দুর্গকে ভূমিসাৎ করে দেন। সারাগোসা পুনরায় আরাগন বিদ্রোহীদের হাতে ফিরে আসে। বিদ্রোহীগণ বোবাসট্রোর দস্যু সর্দারের[২] সাথে মিত্রতা স্থাপনকারী মুসার পৌত্র মুহম্মদের[৩] নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। নিয়মিত অবরোধের পরই স্থানটি পুনরাধিকৃত হয়। মুহম্মদ ও তাঁর মিত্র উমর ইবন হাফসুন পর্বতে পালিয়ে যান। রাজকীয় বাহিনী প্রত্যাগমন করতে না করতেই তাঁরা পুনরায় বেরিয়ে পড়েন। ৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে মুনজির পুনরায় উমর ইবন হাফসুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। আলহামা নামক স্থানে বিদ্রোহীগণ আশ্রয় গ্রহণ করলে ঐ স্থান অবরোধ করা হয় এবং বিদ্রোহীগণ চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়।

মুহম্মদের মৃত্যু; মুনজিরের সিংহাসনারোহণ [৪ আগস্ট, ৮৮৬ খ্রি.; সফর, ২৭৩ হি.]

এই সময় যুবরাজের শিবিরে বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মুনজির দ্রুত অবরোধ তুলে দেন এবং সিংহাসনে তাঁর উত্তরধিকার সুনিশ্চিত করতে দ্রুত কর্ডোভায় চলে যান। এই সুযোগে উমর লাভবান হন এবং বিশ্বাসঘাতকতা বা বলপ্রয়োগের দ্বারা তিনি বহু দুর্গের মালিক হয়ে বসেন। মুহম্মদ ছিলেন জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক এবং বিজ্ঞানের অনুরাগী; তিনি বিচক্ষণ, জ্ঞানী ও শাসন প্রণালীতে সুদক্ষ ছিলেন।[৪]

তাঁর চরিত্র

তাঁর উত্তরাধিকারী মুনজির উদ্যম, প্রজ্ঞা ও সাহসিকতহার গুণে বিভূষিত ছিলেন। দীর্ঘ জীবন লাভ করলে তিনি যে রাজ্যে পূর্ণ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর সামনে বিদ্যমান কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে তিনি পূর্ণ উদ্যমে আত্মনিয়োগ করেন এবং স্বয়ং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এর ফলে আর্কিডোনা অধিকৃত হয় এবং উমরের সুরক্ষিত দুর্গ বোবাস্ট্রো হয় অবরুদ্ধ। বিদ্রোহীগণ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু যে সন্ধি অনুসারে তিনি রাজক্ষমা লাভ করছিলেন অচিরেই তা ভঙ্গ করেন।

---

[১] ইবনুল আসির, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।

[২] ইবনুল আসির কর্তৃক বাবাস্তার এবং মাক্কারী কর্তৃক ইয়াবাস্তার বলে অভিহিত।

[৩] লুপের (লোপেজ) পুত্র এবং লুপ ছিলেন মুসার পুত্র।

[৪] ইবনুল আসির, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৯৭।

মুনজিরের মৃত্যু; আবদুল্লাহর সিংহাসনারোহণ [সফর, ২৭৫ হি.; জুলাই, ৮৮৮ খ্রি.]
মুনজির পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বোবাস্ট্রোর নিকট এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন।[১] তাঁর রাজত্বকাল মাত্র দু'বছর স্থায়ী হলেও দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে এবং জনসাধারণের মধ্যে ধন সম্পদ ও সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পায়।

মুনজিরের পর তাঁর ভাই আবদুল্লাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইবনুল আসির বলেন, তার সময়ে আন্দালুসিয়া গোলযোগে পূর্ণ হয়ে ওঠে, চারদিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হয় এবং তাঁর সমগ্র রাজত্বকালব্যাপী এরূপ চলেছিল।[২] আবদুল্লাহ চরম সংকটময় অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। বহু সময় ধরে বংশগত বিভেদের ফলে অন্তঃসারশূন্য হয়ে রাষ্ট্র দ্রুত ধ্বংস ও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

তাঁর প্রসিদ্ধ রাজত্বকাল
কর্ডোভার আমীর কেবল স্পেনের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদেরই বিরোধিতার সম্মুখীন হননি, বরং আরব অভিজাতবর্গও সাধারণ অরাজকতার মধ্যে স্বাধীনতা লাভের সুযোগ দেখতে পেয়েছিলেন। সর্বত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লব দেখা দেয়। সেভিল ও এলভিরা জেলায় আরব ও বিলাদিউনদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বেঁধে যায়। কতকগুলো শক্তিশালী দুর্গে অনেক বার্বার দলপতি নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাজার আধিপত্য অস্বীকার করেন।

সেভিল
মেনটেসা, মদীনা বনি সলিম (সিডোন জেলায় অবস্থিত), লর্কা ও সারাগোসা আরব সর্দারদের দখলে চলে যায়; ইব্রাহীম ইবন হাজ্জাজ সেভিলের অধিকার লাভ করেন। তিনি গথ রাজকুমারী সারার[৩] বংশধর ছিলেন এবং বনু হাজ্জাজ নামে পরিচিত তাঁর পরিবার এই কুমারীর মাধ্যমে সেভিল জেলায় বহু সম্পদ লাভ করেছিলেন। এখানে তিনি জাঁকজমকের সাথে রাজত্ব করতে থাকেন। তাঁর শাসন সম্রাটের শাসনের চেয়ে দৃঢ় ও শক্তিশালী ছিল। সকল রকম দস্যুবৃত্তি ও অরাজকতা অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করা হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে উৎসাহ প্রদান করা এবং দাঙ্গার ফলে যেসব ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার সংস্কার সাধনে সব রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। আলগার্ব, বেজা, সান ইস্টেভেন, জেন, মুরসিয়া এবং আরও অন্যান্য স্থান স্পেন দেশীয় মুসলিম সর্দারদের দখলে ছিল। বাদাজোজ ছিল ইবন মারওয়ানের দখলে এবং আরাগনে লপেজের পুত্র মুহম্মদ স্বাধীন নৃপতিরূপে রাজত্ব করতে থাকেন।

উমর ইবন হাফসুনের কর্ডোভা অভিযান
উমর ইবন হাফসুন এসব গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করে চতুর্দিকে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন । এমনকি তিনি কর্ডোভা দখলেরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে লাগলেন। যে সুলতান এতদিন যাবৎ অনুকূল সময়ের অপেক্ষায় সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলছিলেন, অবশেষে তিনি মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন পূর্বপুরুষদের সিংহাসন অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যুদ্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

---

[১] ডোজি বলেন, তাঁর চিকিৎসক বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করেন। তিনি তাঁর মৃত্যুর তারিখ ২৯ জুন, ৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেন। ইবনুল আসিরের মতে, ২৭৪ হিজরির সফর মাসে, মাক্কারীর মতে, ২৭৫ হিজরিতে এটি সংঘটিত হয়।

[২] সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩০৩।

[৩] পূর্বে দেখুন।

তাঁর (হাফসুন) পরাজয় [১৫ এপ্রিল, ৮১৯ খ্রি.]

তাঁর সেনাপতি উবায়দুল্লাহ পোলির নিকট ইবন হাফসুনকে পরাজিত করতে সমর্থ হন। এটিই ছিল সুলতানের ভাগ্যের পরম সন্ধিক্ষণ এবং উবায়দুল্লাহর বিজয় তাঁর রাজত্বকে রক্ষা করেছিল। পোলি, এসিজা, আর্কিডোনা, এলভিরা ও জেন তৎক্ষণাৎ তাঁর অধীনতা স্বীকার করে। পরে বিশ্বস্ত উজির বদরের অনুরোধে মানবতামূলক একটি কাজের ফলে ইবন হজ্জাজ স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁর প্রিয় পুত্রকে জামিন স্বরূপ কর্ডোভায় পাঠানো হয়। আবদুল্লাহ এই যুবকবকে বহু সম্মানে বিভূষিত করে পিতার নিকট প্রত্যার্পণ করেন এবং লাভ করেন ইবন হাজ্জাজের সহৃদয়তা ও আনুগত্য। এই শক্তিশালী সর্দারের সাথে সুলতানের মিলন হওয়ায় এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ক্রমশ বিশৃঙ্খল অঞ্চলগুলোতে রাজার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। আলজিসিরাজস থেকে নিবলা পর্যন্ত সমুদয় অঞ্চল বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করে এবং আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থান তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। এমনকি আরাগনের বনু কাসি গোত্রও পুনরায় বশীভূত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

রবিউল আওয়াল, ৩০০ হিজরি; ১৫ অক্টোবর, ৯১২ খ্রিস্টাব্দ

এই সময় বৃদ্ধ সম্রাট প্রায় ছাব্বিশ[১] বছরের গোলযোগপূর্ণ ও গৌরবহীন রাজত্বের পর আটষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

আবরদের সেভয়ে প্রবেশ

অনুসন্ধিৎসু পর্যটক লিগুরীয় উপকূলে, আল্পস পর্বতের উপর, পীডমন্ট ও ডফিনীতে আরব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকদের প্রত্যাগমন লক্ষ্য না করে পারেন না এবং তিনি সম্ভবত নিজেকে প্রশ্ন করবেন, এটি কী দৈবক্রমে ঘটছে, না এর পিছনে অন্য কোন কারণ আছে? আমি যে সময়ের (৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ) কথা বর্ণনা করছি তখন আরবগণ পুনরায় দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রবেশলাভ করেছিল। এই সময় তারা সেন্ট ট্রপেস উপসাগর দিয়ে প্রভেন্স ও ডফিনীতে ছড়িয়ে পড়ে। এটি ছিল স্পেন ও আফ্রিকার সামুদ্রিক বন্দরগুলো থেকে সংগঠিত বহু দুঃসাহসী ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত একটি স্বাধীন আন্দোলন।

পিডমন্ট; সুইজারল্যান্ড

তাদের প্রধান দুর্গের নাম ছিল ফ্রাক্সিনেটাম। ৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তারা ডফিনীর গিরিসংকট পেরিয়ে মন্ট সেনিস অতিক্রম করে পীডমন্ট, লিগুরিয়া ও সুইজারল্যান্ডের কিয়দংশ দখল করে। তারা এই দেশের (সুইজারল্যান্ড) কনস্ট্যান্স হ্রদ অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে এখানে একটি উপনিবেশ গড়ে তোলে। ফ্রান্সে তারা ফ্রেজুস, মার্সাই ও গ্রেনোবল দখল করেন এবং নীস বহুদিন পর্যন্ত তাদের অধিকারে থাকে। তাদের আদিপত্যের নিদর্শনস্বরূপ এই শহরের একাংশকে অদ্যাবধি ক্যান্টন দি সারাজিনস (Canton de Sarrazins) বলা হয়।

[১] পঁচিশ বছর এগার মাস– ইবনুল আসির। ডোজি বলেন, তিনি চব্বিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

অধ্যায়-২৭
স্পেনের আবরগণ
উমাইয়া বংশ [পূর্বানুবৃত্তি]
[৩০০-৩৬৬ হিজরি; ৯১২-৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ]
তৃতীয় আবদুর রহমান [আন-নাসির] : দ্বিতীয় হাকাম [আল-মুসতানসির]

তৃতীয় আবদুর রহমানের সিংহাসনারোহণ : বিদ্রোহ দমন : উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টান গোত্রগুলোর সাথে তাঁর যুদ্ধ : তাদের শাস্তি : আমীরুল মুমিনীন উপাধি গ্রহণ : গ্যালিসীয়গণ কর্তৃক নতুন আক্রমণ : সরকারি কাজে শ্লাভদের নিয়োগ : আল খন্দকের যুদ্ধ : গোত্রসমূহের শান্তি প্রার্থনা : এব্রো নদী পর্যন্ত সীমানা প্রত্যাহার : আফ্রিকায় যুদ্ধ : গ্যালিসীয়দের সাথে নতুন যুদ্ধ : প্রজাগণ কর্তৃক সাঞ্চো বিতাড়িত : টোটা : সাঞ্চো কর্তৃক আবদুর রহমানের সাহায্য প্রার্থনা : লিঁও, ক্যাস্টিল ও নেভার খিলাফতের উপনিবেশে পরিণত : আবদুর রহমানের মৃত্যু ও তাঁর চরিত্র : দ্বিতীয় হাকামের সিংহাসনারোহণ ও তাঁর সদাশয় রাজত্বকাল : গ্যালিসীয় নেভারবাসীদের বিরুদ্ধে সাফল্য : আফ্রিকা অভিযান : হাকামের বিদ্যানুরাগ : কর্ডোভা : এর জাঁকজমক : এর বিস্তার : আজ জহরা : বীরত্ব।

তৃতীয় আবদুর রহমান [আন-নাসির লি দীনইল্লাহ]

আবদুল্লাহর পর তাঁর পুত্র আবদুর রহমান[১] সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর প্রতি যখন আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা হয় তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র বার বছর, কিন্তু তাঁর চেয়ে বয়স্ক ও অভিজ্ঞ পিতৃব্য ও পরিজনবর্গ তাঁর সিংহাসনারোহণকে রাজ্যের জন্য মঙ্গলজনক বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। ঐতিহাসিক বলেন, 'তাঁরা সকলেই তাঁর মধ্যে মহত্ত্বের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে তাঁকে বিচ্ছিন্ন উমাইয়া সাম্রাজ্যের ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করেন।'

তাঁর অকপট নীতি

পিতামহের কুটিল ও সময়োপযোগী নীতি পরিহার করে তিনি বিদ্রোহীদের প্রতি বলিষ্ঠ ও অকপট নীতি অবলম্বন করেন। ঘৃণাভরে সকল মধ্যপন্থা পরিহার করে তিনি স্পেনীয়, বার্বার ও আরব বিদ্রোহীদের প্রতি ঘোষণা করেন যে, তিনি তাদের নিকট থেকে কর প্রত্যাশা করেন না, বরং তাদের দুর্গ ও নগরগুলো লাভ করতে চান; যদি তারা বশ্যতা স্বীকার করে তাহলে তিনি তাদের সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন, অন্যথায় তাদের দৃষ্টান্তমূলক ক্ষমা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন, অন্যথায় তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভোগ করতে হবে। অধিকাংশ প্রধান প্রধান নগর স্বতস্ফূর্তভাবে বশ্যতা স্বীকার করে। ৯১৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আবদুর রহমান স্বয়ং

---

[১] ইবনুল আসির বলেন, তাঁর পিতা মুহম্মদ কিছু গুরুতর অপরাধের জন্য আবদুল্লাহর আদেশে প্রাণদণ্ড ভোগ করেন। আবদুর রহমানের বয়স তখন মাত্র তিন সপ্তাহ, তবে পিতার প্রতি কঠোরতর ক্ষতিপূরণ করার জন্য বৃদ্ধ সমাট তাঁকে অতি যত্নের সহিত লালন-পালন করেছিলেন।

তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে উপস্থিত হন। সুদর্শন তরুণ রাজার অকপট ও বীরোচিত ব্যবহার, সৈন্যদের সহিত অবাদ মেলামেশা, বিপদের সময়েও তাদের অংশীদার হওয়ার স্পষ্ট ইচ্ছা প্রকাশে তাদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে এবং তাদের নৈতিক চরিত্রের উপর বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করে। তিন মাসের অনধিক কাল ধরে অভিযান চালিয়ে তিনি এলভিরা ও জেন প্রদেশ নিজের অধিকারে নিয়ে আসেন। সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গগুলো অধিকৃত হয় এবং সমগ্র অঞ্চল দস্যু ও অস্থিরতামুক্ত হয়। সমতল ক্ষেত্রের মতই তিনি সিয়ারা নেভাদার দুর্গম শৈলশিখরেও সফলকাম হন। যেসব দস্যু সর্দার দেশে অথ্যাচার করে বেড়াত তাদের মধ্যে অনেকে হয় বশ্যতা স্বীকার করে, না হয় নিহত হয়। ইব্রাহীম ইবন হজ্জাজের পুত্র মুহম্মদ সেভিল রাজ্যে তাঁর পিতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তিনি আবদুর রহমানের নিকট এসে তাঁর পক্ষে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

বিদ্রোহীদের বশ্যতা স্বীকার

সেভিলের অধবাসীরা প্রথমে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু কিছুদিন অবরোধের পর তারা নগরের দ্বার খুলে দেয়। সুলতান তখন রেজিও নামক প্রদেশের সিরনিয়ার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং একে একে তাদের দলপতিগণ বশ্যতা স্বীকার করেন। এমনকি সম্রাটের গোরতর শত্রু স্পেন দেশীয় খ্রিস্টানরাও তাঁর মহানুভবতা ও দৃঢ়তার সম্যক পরিচয় পেয়ে অস্ত্র পরিহার করতে শুরু করে। খ্রিস্টান ঐতিহাসিক এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, 'সরকারের সম্মানার্থে বলতে হয়, যেসকল খ্রিস্টান আত্মসমর্পণ করেছিল তাদের প্রতি সরকার অত্যন্ত ন্যায়বিচারমূলক আচরণ করেছিল।'[১]

বোবাস্ট্রো অধিকার [২ জানুয়ারি, ৯২৮ খ্রি.]

৯১৭ খ্রিস্টাব্দে উমর ইবন হাফসুন পরলোকগমন করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে সিরানিয়া অঞ্চলের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত সম্রাটকে ঐ পার্বত্য অঞ্চলে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখতে হয়েছিল। ৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বোবাস্ট্রো অধিকৃত হয়, অন্যান্য দুর্গগুলো দখল করে ভূমিস্যাৎ করা হয় এবং শেষবারের মত সিরানিয়া অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হয়। একইভাবে পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্রোহীদেরকে করায়ত্ত করানো হয়।

বাদাজোজ দখল [৯৩০ খ্রি.]

দক্ষিণাঞ্চলে আর কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকায় সম্রাট এবার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অবরোধের পর বাদাজোজের পতন ঘটে।

টলেডোর আত্মসমর্পণ [৯৩২ খ্রি.]

লিঁওর খ্রিস্টান দলপতি কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে টলেডো পুনরায় বিদ্রোহী হয়। সম্রাট এই বিদ্রোহী নগরীতে বিদ্বান লোকদের এক প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে তাদের আনুগত্য আহ্বান করেন। লিঁওবাসীদের সাহায্যের উপর নির্ভর করে বিদ্রোহীরা ঔদ্ধাত্যপূর্ণ উত্তর প্রদান করে। বলপ্রয়োগ ছাড়া আর কোন উপায়ে টলেডোবাসীদের চৈতন্য ফিরিয়ে আনা যাবে না দেখে তিনি ক্ষিপ্রতা ও স্বভাবগত তেজস্বিতার সাথে তাঁর কর্মপন্থা অবলম্বন করেন। দুই বছর অবরোধের পর টলেডোবাসীরা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে। অবশেষে বিবাদের জ্বলন্ত অঙ্গার নির্বাপিত হয়। বিদ্রোহের প্রতিটি চিহ্ন নির্মূল হয় এবং সম্রাট

---

[১] ডোজি।

তাঁর পূর্বপুরুষদের নিকট হতে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারের অবিসংবাদিত অধিপতি হিসাবে স্বীকৃত হলেন।

কিন্তু আবদুর রহমান যখন নিজের রাজ্যে শান্তি স্থাপনে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তাঁকে দুটি প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। নয়নাভিরাম আন্দালুসিয়ার উপর যাদের লক্ষ্য ছিল অভ্রান্ত এদের একটি হল খ্রিস্টান অধিবাসী বা উত্তরাঞ্চলের গোত্রসমূহ, অন্যটি আফ্রিকার ফাতিমীগণ। স্পেন বিজয়ের পর যেসব আরব এই উপদ্বীপে বসতি স্থাপন করেছিল অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঁচ বছরব্যাপী স্পেনে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে তাদের বহুসংখ্যক লোক আফ্রিকায় প্রস্থান করে।

উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টান গোত্রসমূহ

এই দলবদ্ধভাবে প্রস্থানের সুযোগে গ্যালিসীয়রা বিদ্রোহী হয় এবং অবশিষ্ট আবরদের বহুসংখ্যক লোককে হত্যা করে তারা আলফনজোকে তাদের সর্দার বা রাজা নির্বাচিত করে। কয়েক বছর পর ঐ অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী বার্বারগণ তাদের সংখ্যাল্পতাবশত অ্যাসটরগা, লিঁও, জামোরা, সালামানকা, সিমানকাস, সেগোভিয়া, মিরান্ডা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রধান নগর ত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু আলফনজো এই পরিত্যাক্ত অঞ্চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত না করে তিনি কেবল সেখানকার অবশিষ্ট মুসলমানদের হত্যা করেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং তারপর ফিরে যান তাঁর পার্বত্য অঞ্চলে। যে গৃহযুদ্ধের ফলে আরব রাজ্যে ব্যাপক লোকক্ষয় হয়েছিল তার সুযোগে তাঁর (আলফনজো) উত্তরাধিকারীগণ লিঁওকে তাদের রাজধানী করে নেয়। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন আন্দালুসিয়া সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দ্বারা আন্দোলিত হচ্ছিল তখন তারা ডোরো নদী পর্যন্ত তাদের রাজ্যসীমা বিস্তার করে সেখানে চারটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেন।

অবিরাম আক্রমণ

এস্থান থেকে তারা মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে এবং অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে অসহায় মুসলমানদের নাস্তানাবুদ করে তোলে। তারা এতই বর্বর ও দরিদ্র ছিল যে তারা কেবল দ্রব্য বিনিময়ের সাহায্যেই বেচাকেনা করত। তারা আন্দালুসিয়ার শতধা বিভক্ত রাজ্যটিকে সহজ শিকার মনে করে আন্দালুসিয়ার ঐশ্বর্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকে। তারা এমন ধর্মান্ধ, নিষ্ঠুর ও নির্দয় ছিল যে কদাচিৎ কাউকে আশ্রয় প্রদান করত না। যখন তারা কোন নগর দখল করত তখন নারী-পুরুষ ও বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাত।[২] আরবরা খ্রিস্টানদের প্রতি যে সহনশীলতা প্রদর্শন করেছিল তা তাদের আদৌ জানা ছিল না। এই ধরনের লোকেরা তাদের জয়ের স্পৃহা চরিতার্থ করতে পারলে মুসলমানদের কী দশা ঘটবে তা সহজেই অনুমেয়। আরবদের মধ্যে দিনের পর দিন যে উজ্জ্বল সভ্যতা গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টানগণ তাকে ঘৃণার চোখে দেখত। সুতরাং কেবল রাজ্য রক্ষা করাই আবদুর রহমানের দায়িত্ব ছিল না, সভ্যতা রক্ষারও দায়িত্ব ছিল। তরুণ খলিফা তাঁর কর্তব্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং যে উদ্দীপনার সাথে তিনি বিদ্রোহী প্রজাদেরকে দমন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, সেরূপ তেজস্বিতার সহিত তিনি সভ্যতা রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

৯১৪ খ্রিস্টাব্দ

উত্তরাঞ্চলের বর্বর লোকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার কোন ইচ্ছাই আবদুর রহমানের ছিল না। তিনি তাদের সাথে শান্তি রক্ষা করে চলতে পারলেই খুশি হতেন; কিন্তু তারা তাঁকে যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করে। ৯১৪ খ্রিস্টাব্দে লিঁওবাসীরা তাদের দলপতি দ্বিতীয়

---

[১] জামোরা, সিমানকাস, সান ইস্টেভান ও উসমা।

[২] ডোজি।

অর্ডনোর[১] নেতৃত্বে মেরিডা প্রদেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড দ্বারা দেশটিকে বিধ্বস্ত করে দেয়। তারা অ্যালঞ্জ[২] দখল করে সেখানকার পুরুষ অধিবাসীদেরকে হত্যা করে এবং মহিলা ও শিশুদেরকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে নিয়ে যায়। লুণ্ঠিত দ্রব্য ও অগণিত বন্দি নিয়ে তারা ডোরো নদী অতিক্রম করে। এই সময় আবদুর রহমান আফ্রিকায় ফাতিমীদের সাথে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর উজির আবু আবদার পুত্র আহমদের নেতৃত্বাধীনে একটি শাস্তিমূলক অভিযান প্রেরণ করেই সন্তুষ্ট থাকেন। আহমদ শত্রুকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন, কিন্তু সান এস্টেভানের সম্মুখে তার গতি রুদ্ধ হয় এবং এখানে বিপুল ক্ষয়ক্ষতিসহ আরবরা পরাজিত হয়। এর ফলে উৎসাহিত অর্ডনো ও তাঁর মিত্র নেভারের দলপতি সাঞ্চো[৩] টুডেলা ও ভলেটিয়েরার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লুণ্ঠন করেন।

৩০৫ হিজরি; জুলাই, ৯১৮ খ্রিস্টাব্দ

এবার আবদুর রহমান সকল বিপদাপদ উপেক্ষা করে খ্রিস্টান গোত্রগুলোকে এমন শিক্ষা দিতে চান– যা তারা যেন অচিরে ভুলে যেতে না পারে। ৯১৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে হাজিবে বদরের নেতৃত্বে এক দল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয়। তিনি বিদ্রোহীগণকে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থান করতে দেখেন; বিদ্রোহীগণ উক্ত অঞ্চলে আক্রান্ত ও পরাজিত হয়।

অর্ডনোর পরাজয় [৩০৮ হি; ৯২০ খ্রি.]

লিঁওবাসীরা তখনো সম্যকভাবে শায়েস্তা হয়নি মনে করে ৯২০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে আবদুর রহমান স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অর্ডনো পরাজিত হন এবং উসমা, সান এস্টেভান, ক্লুনিয়া ও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকৃত হয়।

সাঞ্চোর পরাজয়

লিঁওবাসীদের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল রেখে সম্রাট নেভারের দিকে মনোযোগ দেন। টুডেলার শাসনকর্তা এবং অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক মুহম্মদ ইবন লোপের হাতে নেভারের দলপতি সাঞ্চো শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। একাকী রাজকীয় বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয়ে সাঞ্চো তাঁর সহযোগী ভ্রাতা লিঁওর দলপতির সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং পিরেনীজের সঙ্কীর্ণ গিরিপথের মধ্যে দিয়ে গমনরত আরব সৈন্যদলকে হতচকিত করে দেয়ার জন্য পর্বতের উপর তাঁদের সম্মিলিত বাহিনী মোতায়েন করেন। তারা আরবদের উপর পাথর ও ক্ষেপণাস্ত্র এবং বড় বড় প্রস্তর-খণ্ড নিক্ষেপ করে। বিপদ উপলব্ধি করে সম্রাট তাঁর সৈন্যদলকে জানকুয়েরা নামক স্থানে পৌঁছানো মাত্র তাদের থামিয়ে শিবির তৈরির আদেশ দেন। গিরিপথ প্রসারিত হয়ে স্থানটি সুন্দর ও প্রশস্ত উপত্যকায় পরিণত হয়েছিল। ডোজি বলেন, 'এবার খ্রিস্টানগণ মারাত্মক ভুল করল। তারা পর্বতের উপরে না থেকে সমতল ভূমিতে নেমে আসে এবং দৃষ্টতার সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ভয়াবহ পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তারা তাদের হঠকারিতার মূল্য দেয়। রাতের অন্ধকারে দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানরা তাঁদেরকে অনুসরণ করে এবং তাদের বহু দলপতি বিজয়ীদের হাতে ধরা পড়েন। তাদের মধ্যে ছিলেন দু'জন ধর্মযাজক, যাঁরা বর্মাবৃত হয়ে যুদ্ধ করছিলেন।

---

[১] মাক্কারী তাঁকে আদিফুনশের পুত্র উরদিন বলে অভিহিত করেন, পক্ষান্তরে ইবন খালদুন তাঁর পিতার নাম দেন রাজমীর বা রাদমীর।

[২] আরবীতে আল-হানস (আল-হানখ)।

[৩] আরবীতে আল-হানস (আর-হানখ)।

এই গৌরবময় বিজয়ের পর নেভারবাসীদের নিকট থেকে বিন্দুমাত্র বাধা না পেয়ে সম্রাট নেভারের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে অতিক্রম করেন। তিনি তাদের দুর্গ ও সুরক্ষিত স্থানগুলো ভূমিসাৎ করে ২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

নতুন গোত্র-বিদ্রোহ

৯১২ খ্রিস্টাব্দে অর্ডনো ও সাঞ্চো পুনরায় যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ অবলম্বন করেন; তাঁরা অকস্মাৎ নাজেরা ও ভিগারায় অবতীর্ণ হন এবং সেখানে বসবাসরত আরব পরিবারগুলোকে হত্যা করেন, তন্মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা আরবও ছিলেন। সম্রাট যুদ্ধ করতে না চাইলেও জনমত তাঁকে এই যথেচ্ছ অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণে বাধ্য করত। কিন্তু তাঁর নিজের রাজ্যে উত্তরাঞ্চলের বর্বরগণ কর্তৃক সংগঠিত অবিশ্রান্ত লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের ফলে তিনি নিজেও উত্যক্ত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি [৩১২ হিজরি; এপ্রিল, ৯২৪ খ্রি.]

বসন্ত কালের জন্য অপেক্ষা না করে তিনি অবিলম্বে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ১০ জুলাই তিনি নেভারে প্রাবেশ করেন, কিন্তু তাঁর নাম শত্রুর মনে এমন ভীষণ ত্রাস সঞ্চারিত করেছিল যে, শত্রু তাঁর আগমনমাত্র দুর্গ ত্যাগ করে চলে যায়। সাঞ্চো বহুবার সম্রাটকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হন। রাজকীয় বাহিনী আক্রেশে ও কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই সাঞ্চোর রাজধানী পাম্পেলুনায়[১] পৌঁছে যায়। শাস্তিস্বরূপ সাঞ্চোর দুর্গ, প্রাসাদ ও অন্যান্য অট্টালিকা ভূমিসাৎ করা হয়। বাস্কদের দলপতি এবার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং কিছুদিনের জন্য পরবর্তী ক্ষতিসাধনে অসমর্থ হন। লিঁও অঞ্চলেও সম্রাট সমানভাবে সাফল্যলাভ করেন এবং ৯২৫ খ্রিস্টাব্দে অর্ডনোর পুত্রদের[২] মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তাঁর কাজে তা যথেষ্ট সহায়ক হয়।

আমীরুল মুমিনীন উপাধি গ্রহণ [৩১৭ হি; ১৬ জানুয়ারি, ৯২৭ খ্রি.]

লিঁওবাসীদেরকে যথেচ্ছভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দিয়ে এক্ষণে তিনি নিজের রাজ্যের বিদ্রোহ নির্মূল করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন এবং আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, তিনি ৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ যাবৎকাল উমাইয়া শাসকগণ আমীর বা সুলতান উপাধি নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন; তাঁরা মনে করতেন যে পবিত্র নগরীদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারীই খলিফা ও আমীরুল মুমিনীন উপাধি পাওয়ার যোগ্য;[৩] তদনুসারে আব্বাসীয় বংশধররা যতদিন মক্কা ও মদীনার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন এবং তথায় তাঁদের নামে খুৎবা পঠিত হত ততদিন তাঁরা এই সম্মানসূচক উপাধি গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন।

এই সময় আব্বাসীয় খিলাফত জীর্ণতা ও দুর্বলতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। খলিফা রাজী পরবর্তী খলিফাদের মত বুওয়াইহী রাজন্যবর্গের হাতে বন্দি না হলেও নেহাতই বৃত্তিভোগী ছিলেন এবং পবিত্র নগরীদ্বয় ছিল ফাতিমী বংশধর আল মুঈজের দখলে। কর্ডোভার খলিফা স্বাভাবিকভাবেই মনে করেন যে, স্পেনের উমাইয়াগণ এতদিন পর্যন্ত বাগদাদের খলিফাদের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করে আসছিলেন এখন তা নিরর্থক হয়ে পড়েছে এবং সে কারণে তিনি খলিফা ও আমীরুল মুমিনীন[৪], উপাধি গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেন।

---

[১] আল-বানবালুনা।

[২] সাঞ্চো ও আলফনজো।

[৩] মাস'উদী।

[৪] খ্রিস্টানদের দ্বারা মিরমোলিন রূপে বিকৃত।

তদনুসারে সকল শ্রেণীর প্রজার এক বিশাল সভায় তাঁকে আন-নাসির-লি দীনিল্লাহ[১] উপাধিতে ভূষিত করে খিলাফতে অভিষিক্ত করা হয়।

৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় রেমায়ার তাঁর ভাই চতুর্থ আলফনজো ও আরও অনেক আত্মীয়-স্বজনের চক্ষু উৎপাটন করে লিঁওর ক্ষমতা দখল করেন। তিনি আরবদের বিরুদ্ধে হিংস্র ও অনমনীয় বিদ্বেষ পোষণ করতেন এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই তিনি মুসলিম রাজ্যে লুণ্ঠন শুরু করেন।

রেমায়ারের আক্রমণ

আবদুর রহমান অবিলম্বে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং তাঁকে যুদ্ধে নামানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু রেমায়ার উপসামা (ওয়াশমা) দুর্গের প্রাচীরের অভ্যন্তরে থাকাই সমীচীন মনে করেন। এই স্থানের সামনে একদল সৈন্য রেখে খলিফা উত্তর অভিমুখে তাঁর অভিযান চালিয়ে যান। এই সময় গ্যালিসীয় ও লিঁওবাসীদের সাথে নেভারবাসীগণ যোগ দেয়। সাঞ্চোর মৃত্যু ঘটে এবং তাঁর পুত্র গার্সিয়া তাঁর মা টোটার (থিউডা) অভিভাবকত্বে নেভারের অধিপতি হন। টোটাও রেমায়ারের মতই হিংস্রভাবে আরবদের ঘৃণা করতেন। খলিফা ক্যাস্টিল ও আলভার উপর দিয়ে দ্রুতবেগে ধাবিত হয়ে গ্যালিসীয়দের দুর্গগুলো ভূমিসাৎ করে দেন। এমনকি রেমায়ার ক্যাস্টিলের রাজধানী বার্গোসের ধ্বংসসাধনকেও রোধ করতে পারলেন না।

৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ

এই সংকটকালীন সময়ে খ্রিস্টান গোত্রগুলো সারাগোসার বিদ্রোহী শাসনকর্তাকে (মুহম্মদ ইবন হিশাম[২]) তাদের অমূল্য মিত্র হিসাবে পান। তিনি কিছু কাল্পনিক অভিযোগে তাঁর হেতু খলিফার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। এভাবে সমগ্র উত্তরাঞ্চল আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে রণসাজে সজ্জিত হয়; বিপদ ছিল অত্যন্ত গুরুতর, কিন্তু স্বাভাবিক তেজস্বিতার সাথে তিনি এর মোকাবিলা করেন। সারাগোসা এমন প্রবল উৎসাহ ও ক্ষিপ্রতার সহিত অবরুদ্ধ হয় যে বিদ্রোহী শাসনকর্তা আত্মসমর্থণ করতে[৩] বাধ্য হন। পরবর্তীতে তিনি ক্ষমালাভ করে নিজ পদে পুনর্বহাল হন। কিন্তু গোত্রের লোকগণ (খ্রিস্টান) অনুরূপ উদার ব্যবহার পাননি। বাস্কদের দেশ পুনরায় আক্রান্ত হয় এবং গ্রাম ও নগরগুলোর উপর কর ধার্য করা হয়। টোটা পরাজয়বরণ করে শান্তি প্রার্থণা করেন এবং খলিফাকে স্পষ্টভাবে নেভারের অধিরাজ বলে স্বীকার করে নেন।

রেমায়ারের শাস্তি

বহু যুদ্ধে পরাজিত রেমায়ার আর খলিফার সাথে সম্মুখ-যুদ্ধে সাক্ষাৎ করতে সাহসী হলেন না এবং স্বীয় পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। লিঁও প্রদেশ এবং ক্যাটালনিয়ার কিয়দংশ ব্যতীত সমগ্র স্পেন এবার মাহিমান্বিত কর্ডোভারাজের পদানত হয়। ক্যাটালনিয়ার অংশবিশেষ ফ্রান্সের শাসনাধীনে চলে যায়।

স্লাভদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ

আরব অভিজাত শ্রেণী এবং তাঁদের কলহপ্রিয় ও দুর্দান্ত প্রকৃতির প্রতি বিতৃষ্ণার ফলে আবদুর রহমান বিদেশীদের হাতে বহু ক্ষমতা অর্পণ করতে থাকেন। তারা ছিল প্রধানত বিভিন্ন জাতির মামলুক, যথা : জার্মান, ফ্রাঙ্ক, ইতালীয়, স্ক্যাভিনেভিয়ান, ভারাঙ্গিয়ান,

---

[১] আল্লাহর ধর্মের সাহায্যকারী।

[২] ইবন খালদুন তাঁর নাম হিশাম বলে উল্লেখ করেন; পক্ষান্তরে ডোজি তাঁকে হাশিম বলেন।

[৩] ইবন খালদুন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪।

রুশ ইত্যাদি। যারা নেহাত অল্প বয়সে ভেনিসীয়, জেনোয়াবাসী ও পিসাবাসী ব্যবসায়ীদের দ্বারা স্বদেশ থেকে নীত হয়ে আরবদের নিকট বিক্রীত হত।[১] ইসলাম কবুলের সঙ্গে সঙ্গে তারা গ্রহণ করত আরবদের ভাষা, সংস্কৃতি ও আদব-কায়দা। আরব গৃহে তারা পরিবারের সদস্য বলে বিবেচিত হত এবং প্রায়শই তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেয়া হত। আন-নাসির এরূপ বহু সংখ্যক বিদেশী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। এদের সমষ্টিগত উপাধি ছিল ইসকালাবী বা স্লাভ। তিনি তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও অসমারিক কাজে নিযুক্ত করতেন এবং উচ্চ বংশোদ্ভূত যেসব লোক তাঁদের পূর্ব পুরুষদেরকে মরুভূমির বীরপুরুষদের শামিল মনে করতেন, সেসব ভুঁইফোড় ব্যক্তিদেরকে এদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য করা হত। স্লাভ বাহিনী তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সৈন্যদল ছিল। এই পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার আরব অভিজাত শ্রেণীকে আরও বিরূপ করে তোলে।

আল-খন্দকের যুদ্ধ

৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিসীয় ও বাস্করা আবার বিদ্রোহী হওয়ায় নতুন শাস্তিমূলক অভিযান চালানোর প্রয়োজন হয়। এ সময় খলিফা একটি মারাত্মক ভুল করেন। তিনি নজদ নামক একজন স্লাভ সেনাপতিকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দেন। এতে আরব কর্মকর্তারা ক্ষিপ্ত হন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা শপথ নেন যে, অত্যন্ত সংকটজনক মুহূর্তে তাঁরা স্লাভদেরকে বিপদে ফেলে চলে আসবেন। খলিফার পক্ষপাতিত্ব অথবা আরবদের ঈর্ষার ফলে আরব বাহিনীর যে সর্বনাশ ঘটেছিল তা বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। মাসউদী ও মাক্কারী বলেন যে, আরবরা জামোরা পর্যন্ত বিনা বাধায় অগ্রসর হয়ে তা অবরোধ করেছিল। এই নরগী পর পর কয়েকটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল, যেগুলোর মধ্যে প্রতি দুই প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল জলপূর্ণ পরিখা। আরব সৈন্যরা বহির্ভাগের প্রাচীরের একটি ছিদ্র দিয়ে পথ করে নিতে সফল হলে তারা আকস্মিকভাবে পরিখার সামনে এসে পড়ে। এখানে তাদের উপর তীর ও বর্ষা বর্ষিত হয়। এই সংকটজনক অবস্থায় আরব সৈন্যদল নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে পরিত্যক্ত ও প্রাচীরের অভ্যন্তরে ঘেরাও হয়ে খলিফার সৈন্যবাহিনীর বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। কন্ড (Conde)-এর বিবরণ আরও বিস্তারিত। আরবগণ পরিখা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত এবং তাদের কিছু সহযোগীর প্রত্যাবর্তন সত্ত্বেও আক্রমণ অব্যাহত রাখে। তারা স্রোতের মত দেয়ালের ছিদ্র দিয়ে ভেতরে ঢুকে যায় এবং সহযোগীদের মৃতদেহের উপর দিয়ে পরিখা পার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে খ্রিস্টানদের উপর। খ্রিস্টানগণ এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে আরবদের তাড়া খেয়ে নগরের মধ্যে পালিয়ে যায় এবং সমগ্র স্থান এক বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। কেবল রক্ষা পায় শিশু ও স্ত্রীলোকেরা।[২] জামোরার প্রাচীরের অভ্যন্তরে সংঘটিত এই যুদ্ধকে আল-খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ বলা হয়। স্পেন দেশীয় খ্রিস্টান বর্ষপঞ্জিকা প্রণেতাদের নিকট হতে গৃহীত বিবরণ থেকে ডোজির প্রদত্ত বিবরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তিনি বলেন যে, আরব সৈন্যদল সালামাঙ্কার অনতিদূরে আল-খন্দক (আলহানদাগা) গ্রামের নিকট শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তখন আরবগণ দল বেঁধে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। এভাবে পার্শ্বদেশ খোলা পেয়ে লিঁও ও নেভারের অধিবাসীরা খলিফার সৈন্যদলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; স্লাভগণ অতীব দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করেও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

---

[১] বিক্রয়ের পূর্বে তাদের কারো কারো অঙ্গচ্ছেদ করা হত। দক্ষিণ ফ্রান্সের ভার্দুন ও অনান্য স্থানে মানুষের অঙ্গচ্ছেদের জন্য ফরাসীরা বিরাট বিরাট কারখানা স্থাপন করেছিল (রিনড প্রণীত ইনভেনশনস দ্য সারাজিনস)। এসব স্থান থেকে বাইজান্টিয়াম, ভ্যাটিকান, স্পেন ও অন্যান্য দেশের প্রয়োজন মেটানো হত।

[২] ডমিনেশন দ্য অ্যারাবস এন অ্যাসপ্যাগনে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩০।

জামোরার প্রাচীরের অভ্যন্তরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও খলিফার সাহস ও উদ্দীপনা দমিত হয়নি। তিনি অনতিবিলম্বে আকেরাট সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা গ্যালিসীয় ও বাস্কদের উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ৯৪০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে খলিফার বাদাজোজের শাসনকর্তা[১] রেমায়ারকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং তাঁর দেশকে অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। যে পর্যন্ত গোত্রগুলোর (খ্রিস্টান) মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে না পড়েছিল সে পর্যন্ত এই যুদ্ধাভিযান অব্যাহত থাকে ।

তৃতীয় অর্ডনোর শান্তি প্রার্থনা

৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ধর্মান্ধ রেমায়ারের[২] পুত্র ও উত্তরাধিকারী তৃতীয় অর্ডনো শান্তি প্রার্থনা করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে সম্মানজনক শর্তে সন্ধি স্থাপিত হয়। গ্যালিসীয় অধিপতি খলিফার আধিপত্য স্বীকার করতে, আন্দালুসিয়ার খ্রিস্টান বা কোন বৈদেশিক শক্তির সাথে সমস্ত রকম ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকতে, কর্ডোভা রাজ্যের সীমান্তবর্তী তাঁর প্রধান দুর্গগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভেঙে ফেলতে এবং মুসলিম রাজ্যগুলোর উপর আক্রমণ না চালানোর প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন। অপরপক্ষে খলিফা নেভার ও লিঁওর স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এবং প্রথানুযায়ী শ্রদ্ধা ও নির্দিষ্ট কর লাভ করে সন্তুষ্ট থাকতে সম্মত হন।

এব্রো নদী পর্যন্ত রাজ্যসীমা অপসারিত

এ সন্ধি অনুসারে মুসলিম রাজ্যের সীমা এব্রো নদী পর্যন্ত অপসারিত হয়। এই সময় রাজ্যসীমা ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ টরটোসা থেকে এব্রো ধরে শক্তিশালী আফরাগা (ফ্রাগা) দুর্গ পেরিয়ে আটলান্টিক উপকূলের লেরিডা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এব্রো নদী রাজ্যের প্রধান রক্ষামূলক সীমানায় পরিণত হয়।

আফ্রিকায় যুদ্ধ

সীমান্তবর্তী গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে এসব যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাকালীন আবদুর রহমান আফ্রিকাতেও একইভাবে যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়েন। ফাতিমী ভীতি থেকে রক্ষা এবং মরিটানিয়ায় মাহদীর ক্ষমতা বিস্তার প্রতিরোধ করার জন্য তিনি ৯১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে পশ্চিম আফ্রিকার ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে সহায়তা করছিলেন। মাহদী পূর্বেই বিদ্রোহী উমর ইবন হাফসুনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। এজন্য স্পেনের বিরুদ্ধে মাহদীর আক্রমণাত্মক মনোভাব সম্পর্কে তঁর কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁরা কিছু করার আগেই খলিফা পশ্চিম আফ্রিকা দখলের চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমে সফল হয়েছিলেন, কিন্তু বিখ্যাত আল মুঈজের ফাতিমী সিংহাসনে আরোহণের সময় স্পেনীয় খলিফা খ্রিস্টান গোত্রগুলোর সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তাঁর সৈন্যদল আফ্রিকা থেকে বিতাড়িত হয়। কেবল মরিটানিয়ার চাবিকাঠি সিউটা তাঁর হাতে ছিল। তৃতীয় অর্ডনোর সাথে শান্তি স্থাপনের পর অক্লান্ত খলিফা আফ্রিকার প্রতি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মনোনিবেশ প্রদান করতে সমর্থ হন। কিন্তু অর্ডনোর মৃত্যুর ফলে তিনি ফাতিমী রাজ্যে পরিকল্পিত আক্রমণ পরিহার করতে বাধ্য হন।

---

[১] আহমদ ইবন ঈলা।

[২] দ্বিতীয় রেমায়ার ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গ্যালিসীয়দের সাথে নতুন যুদ্ধ

গ্যালিসিয়া ও লিওর পরবর্তী অধিপতি সাঞ্চো তাঁর ভাইয়ের সাথে সম্পাদিত [redacted] মানতে অস্বীকার করেন। খলিফা আব্দুর রহমান [redacted] যুদ্ধের জন্য যে সৈন্যদল প্রস্তুত করেছিলেন তা অবাধ্য গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে নিযুক্ত করতে বাধ্য হন।

জুলাই [৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ]

তাঁর সাহসী সেনাপতি ও টলেডোর শাসনকর্তা আহমদ ইবন ঈলা যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব পান এবং জুলাই মাসে তিনি গ্যালিসীয় ও লিঁওবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এক বিরাট বিজয় লাভ করেন।

প্রজাদের দ্বারা সাঞ্চো বিতাড়িত

অনতিবিলম্বে সাঞ্চোর প্রজাবর্গ ক্যাস্টিলের কাউন্ট ফার্দিনান্দ গনজালেজর সহিত মিলিত হয়ে তাঁকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। সাঞ্চো পাম্পেলুনায় তাঁর মাতামহী টোটার কাছে পালিয়ে যান এবং লিঁওবাসীগণ তাঁর পিতৃব্যপুত্র অর্ডনোকে তাদের দলপতি বা রাজা নির্বাচন করে।

খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা [এপ্রিল, ৯৫৯ খ্রি.]

টোটা তাঁর পৌত্রকে সাহায্য করতে অসমর্থ হয়ে খলিফার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁরা কর্ডোভায় গমন করলে রাজকীয় সংবর্ধনা পান। তাঁদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয় এবং একটি আরব সৈন্যদল সাঞ্চোর সাথে তাঁর রাজ্যে যায়। বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যায় এবং ৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সাঞ্চোর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। লিঁও, ক্যাস্টিল, গ্যালিসিয়া ও নেভার প্রকৃতপক্ষে কর্ডোভা খিলাফতের উপনিবেশে পরিণত হয়।

আবদুর রহমান আন-নাসিরের মৃত্যু [রমজান, ৩৫০ হি; ১৬ অক্টোবর, ৯৬১ খ্রি.]

মহান খলিফা মাত্র দুবছর এই বিজয়ের ফল ভোগ করেছিলেন, কারণ তিনি পূর্ণ অর্ধশতাব্দীকাল রাজত্ব করে ৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর তিয়াত্তর বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

যে সকল উমাইয়া নরপতি স্পেনের রাজত্ব করেছেন তাঁদের মধ্যে আবদুর রহমান আন-নাসির নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সুদক্ষ ও গুণবান ছিলেন। তিনি রাজ্যকে গোলযোগপূর্ণ, কলহে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন বংশের সামন্ত সর্দারদের মধ্যে বিভক্ত, অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধের শিকার এবং উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টান গোত্রগুলোর বিরামহীন আক্রমণে বিপন্ন অবস্থায় দেখতে পান। অসংখ্য বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি আন্দালুসিয়াকে রক্ষা করেন এবং সেটিকে আগের চেয়ে বৃহদায়তন ও শক্তিশালী করে তোলেন। সমগ্র রাজ্যে শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি বিরাজ করত। পুলিশ বাহিনী এত নিখুঁত ছিল যে, পথিক ও সওদাগর সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চলেও উৎপীড়ন বা বিপদের সামান্যতম আশঙ্কা ছাড়াই ভ্রমণ করতে পারত। সস্তা বাজার দর, কৃষকদের পরিহিত পোশাকের পারিপাট্য এবং অশ্বারোহণের সর্বজনীন অভ্যাস, এমনকি দরিদ্রতম ব্যক্তিরও অশ্বারোহণ জনগণের সাধারণ সমৃদ্ধির প্রমাণ দেয়। তাঁর উদার ও সদাশয় শাসন ব্যবস্থায় কৃষি বিষয়ে যে অভূতপূর্ব উৎসাহ প্রদান করা হয়েছিল তাতে হাস্যময়ী শস্যক্ষেত্র, সুসমৃদ্ধ উদ্যানরাজী ও অপরিমেয় ফল সম্ভার তার সাক্ষ্য দেয়। আইলযোগে উত্তম জল সরবরাহ ব্যবস্থা

এবং অতীব অনুর্বর ভূমিকেও শস্যশালী করতে পারে এমন বৈজ্ঞানিক জলসেচন প্রণালী পর্যটকদের বিস্ময়ের উদ্রেক করত। কিন্তু আন-নাসির কেবল কৃষিরই উন্নতি সাধন করেননি বাণিজ্য ও শিল্পে এবং কলা ও বিজ্ঞানে উৎসাহ প্রদান করে সেগুলোর সমৃদ্ধি সাধন করছেন। কর্ডোভা, আলমেরিয়া, সেভিল ও অন্যান্য নগরীতে অসংখ্য বিশেষ বিশেষ শিল্প-কারখানা ছিল, যেগুলো জনসাধারণের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল এবং স্পেনকে করেছিল সম্পদশালী। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এত প্রসার লাভ করেছিল যে একমাত্র বাণিজ্যের শুল্ক থেকেই রাজস্বের একটা বড় অংশ রাজ-সরকারে জমা হত। আন-নাসিরের সময় মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,২০,০০,০০০ দীনারের বেশি।[১] আন-নাসিরের সামরিক শক্তি ছিল কালোপযোগী। তাঁর সুসজ্জিত নৌবহর থাকায় তিনি ফাতিমীদের সাথে ভূমধ্যসাগরে কর্তৃত্ব স্থাপন করে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ডোজির মতে, সম্ভবত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অগণিত ও সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী থাকায় তিনি উত্তরাঞ্চলে খ্রিস্টানদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ তাঁর সাথে মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের সম্রাট, জার্মানি, ফ্রান্স, ও ইত্যালির রাজারা সকলেই তাঁর কাছে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন।[২] কিন্তু রাজকর্মের চেয়ে তার কর্মীর জন্যই এই গৌরবময় রাজত্বকাল পাঠকের মনে বেশি প্রশংসা ও বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। তাঁর বুদ্ধিমত্তা এত প্রখর ছিল যে, কোন কিছুতেই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না এবং সূক্ষ্মতম খুঁটিনাটি ও মহত্তম পরিকল্পনায় বিস্ময়করভাবে তার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হত। ঐতিহাসিক আরও বলেন, এই বিচক্ষণ পুরুষ কেন্দ্রায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, জাতীয় ঐক্য ও রাজকীয় ক্ষমতার মধ্যে সংহতি স্থাপন করেছিলেন, মিত্রতার মাধ্যমে এক ধরনের রাজনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং উদার সহনশীলতা বশে তাঁর মন্ত্রণা সভায় প্রত্যেক ধর্মের লোককে আহ্বান করেছিলেন। অতএব তিনি মধ্যযুগের শাসক না হয়ে বরং বিশেষ করে আধুনিক কালেরই একজন সম্রাট। এই কৌতুহলোদ্দীপক চরিত্র চিত্রনের পর আবদুর রহমান সম্পর্কে আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনা দুর্বল ও বৈচিত্র্যহীন বলে প্রতীয়মান হয়।[৩]

---

[১] এই বিশাল আয়ের এক তৃতীয়াংশ সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হত, এক তৃতীয়াংশ ব্যয় হত জনহিতকর কাজে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং সাহিত্য ও কলার উৎসাহ প্রদানে, পক্ষান্তরে অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ সঞ্চিত হত।

[২] ৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ (৩৩৬ হিজরি) কর্ডোভায় বিপুল সংখ্যক দূত সমাগমের জন্য উল্লেখযোগ্য ছিল। কনস্ট্যান্টিনোপলের দূতেরা আবদুর রহমানের মিত্রতা কামনা করেছিলেন, তাঁরা ছাড়াও স্লাভদের রাজা বা ডিউক (আরবদের দ্বারা জুকা বা দুকা বলে অভিহিত), জার্মানির সম্রাট (ওথো), কালদাহ বা কার্লা বলে অভিহিত ফ্রান্সের রাজা (চার্লস দ্য সিম্পল) এবং জাবাল-উল-বুর্তের (পিরেনীজ পবর্তমালা) অপর পান্তের উকোহ (হুগো) নামে আরেকজন ফ্রাঙ্ক রাজার দূত ছিলেন।

[৩] এই সেই নরপতি, যিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি মাত্র চৌদ্দ দিনের অবিমিশ্র সুখানুভূতির কথা স্মরণ করতে পারেন। এক পুত্র বিদ্রোহের চেষ্টা করেন। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হয়। তাঁর (অপরাধীর) ভাই ও ভাবী উত্তরধিকারী স্বয়ং সাশ্রু নয়নে পিতার পদপ্রান্তে পতিত হয়ে মন্ত্রণা পরিষদ প্রদত্ত শাস্তি মওকুফের জন্য প্রার্থনা জানান। বৃদ্ধ খলিফা বলেন, পিতা হিসেবে আমি সারা জীবন রক্তাশ্রুপাত করতে থাকব; কিন্তু আমি রাজাও বটে, পিতাও বটে। আমি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। যে দিন থেকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়, সেদিন থেকে আবদুর রহমানকে কখনো হাসতে দেখা যায়নি।

দ্বিতীয় হাকামের [আল-মুসতানসির বিল্লাহ] সিংহাসনারোহণ

আবদুর রহমানের পর তাঁর পুত্র হাকাম আল-মুসতানসির বিল্লাহ[১] উপাধি ধারণ করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। পিতার মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বেই হাকাম রাজ্যের প্রশাসনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ইতিমধ্যেই তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতার খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।[২]

লিঁও অধিপতির বিশ্বাসঘাতকতা

লিঁও ও নেভারের অধিপতিদেরকে মহান খলিফা এতভাবে সাহায্য করা সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুকে তাঁরা ক্ষতিকর মনে না করে এটিকে সন্ধির শর্ত ভঙ্গের এবং আরবদের অধীনতাপাশ ছিন্ন করার সুযোগ বলে মনে করেন। হাকাম শান্তিপ্রিয় ও পণ্ডিত সুলভ মানুষ বলে পরিচিত হওয়ায় তিনি সন্ধির শর্ত পালনের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না কিংবা যুদ্ধ বাঁধলে তাঁর পিতার মত সফলকাম হতে পারবে না– এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সাঞ্চো ও গার্সিয়া উভয়ে এমন এক ছলনাময় মনোভাব পোষণ করেন, যাতে বিশ্বাসঘাতকতার আভাস বিদ্যমান ছিল এবং সীমান্তবর্তী দুর্গগুলোর ধ্বংস সাধনে নানা কৌশলে বিলম্ব করা হচ্ছিল।

ফেব্রুয়ারি, ৯৬২ খ্রিস্টাব্দ

এই সময় সুযোগ বুঝে ক্যাস্টিলের কাউন্ট ফার্দিনান্দ গঞ্জালেজ পুনরায় আক্রমণ শুরু করেন। অকৃতজ্ঞ দলপতিরা অচিরেই নতুন খলিফার প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন; কারণ কিছুদিন যুদ্ধের পরই দেখা গেল পণ্ডিত খলিফা জ্ঞানান্বেষণের মতই সৈনিকরূপে অসি চালনাতেও সিদ্ধহস্ত। গঞ্জালেজের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানে হাকাম স্বয়ং নেতৃত্ব দেন। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে সীমান্তের পরাপারে পালিয়ে যান। ক্যাস্টিলের কাউন্টের বিরুদ্ধে অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর অর্ডনো (দ্য উইকেড) হাকামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইতোপূর্বে সাঞ্চো পূর্ববর্তী খলিফার সাহায্য নিয়ে তাঁকে বিতাড়িত করেছিলেন। তাঁকে সসম্মানে সংবর্ধনা করা হয়[৩] এবং তাঁর সহিত এই মর্মে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় যে, তিনি সর্বদা মুসলমানদের সাথে শান্তি রক্ষা করে চলতে বাধ্য থাকবেন, তাঁর পুত্র গার্জিয়াকে জামিন স্বরূপ প্রদান করবেন এবং বিদ্রোহী গঞ্জালেজের সাথে কখনো যোগদান করতে পারবেন না। অতঃপর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সাঞ্চোকে লিঁও ও গ্যালিসিয়া থেকে বিতাড়িত করে অর্ডনোকে সেখানকার অধিপতি রূপে অধিষ্ঠিত করার আদেশ দিয়ে সেনাপতি গালিবের নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করা হয়। তখনো সংকটজনক অবস্থায় বিদ্যমান সাঞ্চো সমরায়োজনে ভীত হয়ে পড়েন এবং খলিফার কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করতে দ্রুত রাজ্যের ধর্মাজক ও সম্ভ্রান্ত লোকদের নিয়ে গঠিত একদল রাষ্ট্রদূতকে কর্ডোভায় প্রেরণ করেন এবং অবিলম্বে সন্ধির শর্তগুলো পূরণ করার জন্য শপথ পূর্বক প্রতিশ্রুতি দেন। কয়েক মাস পর অর্ডনোর মৃত্যু[৪] হলে তিনি আবার বিদ্রোহী হন; নেভারের অধিপতি এবং ক্যাস্টিল ও ক্যাটালনিয়ার কাউন্টদের সাহায্যের উপর নির্ভর

---

[১] আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনাকারী।

[২] আবদুর রহমানের জীবদ্দশায় মুরুজ-উজ-জাহাব গ্রন্থ প্রণেতা মাস'উদী হাকামকে ন্যায়পরায়ণতা ও সদগুণাবলির জন্য তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে অভিহিত করেন।

[৩] ইবন খালদুন।

[৪] ৯৬২ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে।

করে তিনি সরকারি সন্ধি শর্ত পালন করতে অস্বীকার করেন। এইরূপে হাকাম খ্রিস্টান গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন। তিনি সর্বপ্রথম ক্যাস্টিলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং অতর্কিত আক্রমণে সান এস্টেভন দ্য গোরমাজ (শান্ট ইস্টিবান) অধিকার করেন এবং গঞ্জালেজকে সন্ধি প্রার্থনা করতে বাধ্য করান। কিন্তু সন্ধি সম্পাদিত হতে না হতেই তা ভেঙে যায়। গালিবকে পাঠানো হয় লিঁওর বিরুদ্ধে। মেডিনাসেলির (মদীনা-সালিম) মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনি সাঞ্চোর রাজ্যের আটিয়েনজা (আসতা) নামক স্থানে উপনীত হলে তথায় বিপুল সংখ্যক গ্যালিসীয় তাঁর সম্মুখীন হয়। তারা যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় ভোগ করে এবং গ্যালিসিয়া অধিকৃত হয়।

নেভারের আত্মসমর্পণ

সারাগোসার শাসনকর্তা ইয়াহিয়া ইবন মুহম্মদ তাজিবীর সহিত মিলিত হয়ে বাস্কদের দেশ আক্রমণ করেন। বাস্কদের অধিপতিও সন্ধি ভঙ্গ করেছিলেন।[১] নেভারের অধিপতিও পরাজিত হন এবং অতর্কিত আক্রমণে তাঁর প্রধান প্রধান নগরগুলো দখল করে নেয়া হয়। এসব বিজয়ের মধ্যে বাস্কদের দেশে গালিব কর্তৃক কালাহোরা (কালহাররা) অধিকার ছিল সবচেয় গুরুত্বপূর্ণ। হাকাম এর দুর্গগুলো পুনরায় নির্মাণ করে সেখানে তাঁর সৈন্য সমাবেশ করেন। নেভার, গ্যালিসিয়া, আলাবা ও ক্যাস্টিলের অনেক স্থান অনুরূপভাবে সৈন্যবাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়। এক কথায় হাকাম যদিও যুদ্ধ পছন্দ করতেন না এবং তাঁকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল, তথাপি অচিরেই তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান শত্রুকে শান্তি প্রার্থনা করতে বাধ্য করেন।

সাঞ্চোর আত্মসমর্পণ; তাঁদের সাথে সন্ধি

লিঁওর অধিপতি সাঞ্চো ৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে আত্মসমর্পণ করেন। ক্যাটালনিয়া, বোরেল ও মিরনের[২] কাউন্টরাও কয়েকটি যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন এবং মুসলিম সীমান্তের পার্শ্ববর্তী যেসব দুর্গ ও কেল্লা থেকে সচরাচর লুণ্ঠণকারী দল বেরিয়ে আসত সেগুলো ধ্বংস করতে, স্বধর্মীয়গণকে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্যদানে বিরত থাকতে এবং পরিশেষে অন্যান্য খ্রিস্টান গোত্র ও জাতিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে বাধা দান করতে প্রতিশ্রুত হয়ে তাঁরা নুতন শান্তি চুক্তি প্রার্থনা করেন। বাস্কদের অধিপতি গার্সিয়া শান্তি প্রার্থনা করে একদল সভাসদ ও ধর্মযাজক সমভিব্যহারে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন। গালিব সম্পূর্ণরূপে নেভারবাসীদের পরাজিত না করা পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়, তারপর পূর্ববর্তী শর্তে হাকাম তাঁদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। এই সময় বালাকাশের (রোডরিগো ভেলাসকুয়েজ) পুত্র লুজলিক নামক গ্যালিসিয়র প্রান্তবর্তী জনৈক শক্তিশালী কাউন্টের মাতা তাঁর পুত্রের পক্ষে শান্তি প্রার্থনা করতে হাকামের দরবারে আসেন। খলিফা তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করেন এবং তাঁর অনুরোধ মঞ্জুর করেন। ৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ক্যাস্টিলের বিদ্রোহী কাউন্টের মৃত্যুতে ঐ প্রদেশে শেষবারের মত শান্তি স্থাপিত হয়।

আফ্রিকায় অভিযান [৩৬২ হি; অক্টোবর, ৯৭২ খ্রি.]

দুই বছর পর হাকাম ফাতিমীয় খলিফাদের বিজয়স্রোত প্রতিরোধ করতে মরিটানিয়ায় (মাগরিব-উল-আকসা ও আওসাত) এক অভিযান প্রেরণ করেন। তাঁর সেনাপতি

---

[১] ইবন খালদুন।

[২] ইবন খালদুন কর্তৃক বারিল ও মুনীরা বলে অভিহিত।

গালিব পশ্চিম আফ্রিকায় উমাইয়া প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। জেনাতা, মাগরাওয়া ও মিকনাসার বার্বার গোত্রগুলো কায়রোর খলিফার প্রতি তাদের আনুগত্য অস্বীকার করে এবং তাদের ধর্মীয় মঞ্চ থেকে হাকামের নামে খুতবা পঠিত হয়। হয়রত আলী (রা.)-এর বংশীয় বহু রাজকুমার বহুদিন ফেজ নগরে বসবাস করার পর স্পেনে চলে আসেন এবং সেখানে তাঁদের সদয়ভাবে গ্রহণ করা হয়। ইদ্রিসী বংশধরদেরকে রিফদের দেশে[১] এবং তারপর কর্ডোভায় নিয়ে আসা হয়। কিন্তু পরে তাঁদের কয়েকজনকে আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্বাসিত করা হয়।

হাকামের বিদ্যানুরাগ

ইবন খালদুন বলেন, হাকাম সাহিত্য ও বিজ্ঞান ভালবাসতেন এবং বিদ্বান লোকদেরকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি ছিলেন পুস্তক সংগ্রহকারী; যদিও তাঁর সকল পূর্বসূরিই সাংস্কৃতিক রুচিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন এবং তাঁদের গ্রন্থাগারগুলোকেও দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুস্তক দ্বারা সমৃদ্ধ করতে ভালবাসতেন, তবু হাকামের মত উদ্দীপনা নিয়ে কেউ এ কাজে লিপ্ত হননি। রাজ গ্রন্থাগারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল একজন বিশিষ্ট কর্মচারীর উপর এবং এর গ্রন্থ তালিকাই ছিল চুয়াল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত।[২] হাকাম স্পেনকে এক বিরাট বাজারে পরিণত করেন, যেখানে প্রত্যেক দেশের বইপত্র অনতিবিলম্বে বিক্রির জন্য হাজির করা হত। তিনি আকর্ষণীয় ও মূল্যবান বইয়ের খোঁজে পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন এবং সেগুলো কেনার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন। প্রচুর পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দিয়ে মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহ দেয়া হত এবং তার প্রথম কপিগুলো সংগ্রহের জন্য সমস্ত রকম উদ্যোগ নেয়া হত। আবুল ফারাজ (ইস্পাহানী) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইরাকে প্রকাশিত হওয়ার আগেই গ্রন্থের[৩] একটি কপি তাঁর কাছে পাঠান এবং কর্ডোভার কৃতজ্ঞ খলিফার নিকট থেকে এক হাজার দীনার পুরস্কার লাভ করেন। পুস্তকের প্রতিলিপিকরণ, অঙ্গ-সজ্জা ও বাঁধাইয়ের জন্য প্রাসাদের অনেক প্রকোষ্ঠ আলাদা করে রাখা হত এবং সেকালের সবচেয়ে দক্ষ লোকেরা এসব কাজে নিযুক্ত হত। হাকাম কেবল গ্রন্থ শিকারীরই ছিলেন না, অধিকন্তু গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে সাদা পাতার উপর প্রচুর টীকা-টিপ্পনী লিখে রাখতেন। স্পেনীয়দের মতই বিদেশী পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের প্রতি তাঁর বদান্যতা ছিল অপরিসীম। তিনি দার্শনিকদের উৎসাহিত করতেন এবং আশ্রয় দিতেন, তাঁরা যাতে ধর্মান্ধদের উৎপীড়নের ভয় না করে জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করতে পারেন। এই সুশিক্ষিত নরপতির আমলে জ্ঞান- বিজ্ঞানের সকল শাখার উন্নতি ঘটেছিল। তাঁর পূর্বসূরিদের দ্বারা স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল অসংখ্য এবং সেগুলোকে প্রভূত পরিমাণ বৃত্তি দেয়া হত। স্পেনে প্রায় সকল ব্যক্তিই লিখতে ও পড়তে জানত, পক্ষান্তরে খ্রিস্টান অধিকৃত ইউরোপে ধর্মযাজকগণ ব্যতীত সকলেই, এমনিক উচ্চ শ্রেণীর লোকরাও সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল।[৪] হাকাম বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞান কখনো অতি বিস্তারক্ষম নয় এবং দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি তাঁর উদার মনোভাবের দরুণ রাজধানীতে তিনি সাতাশটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যেখানে সঙ্গতিবিহীন পিতা-মাতার সন্তানগণ বিনামূল্যে শিক্ষালাভ করত, এমনকি সরকার থেকে বইপত্রও দেয়া হত। অন্যদিকে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম এবং কায়ারোর আজহারিয়া ও বাগদাদের নিজামিয়ার সমকক্ষ।

---

[১] ইবন খালদুন।

[২] গ্রন্থাগারটিতে ৪,০০,০০০ বই ছিল।

[৩] পূর্বে দেখুন।

[৪] ডোজি।

হাকাম আল-মুসতানসিরের মৃত্যু [২ সফর ৩৬৬ হি; ১ অক্টোবর, ৯৭৬ খ্রি.]
এই মহান ও গুণবান খলিফা ১ অক্টোবর, ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই স্পেনের উমাইয়া বংশের গৌরবের অবসান ঘটে।

কর্ডোভা
আরব কর্তৃক কুরতুবা[১] নামে অভিহিত কর্ডোভা নগরী সিয়ারা মোরেনা নামক পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে প্রশস্ত ও উর্বর সমতল ভূমির উপর অবস্থিত ছিল। এটি গুয়াদাল কুইভারের[২] দক্ষিণ তীরে এক ধরনের অর্ধবৃত্তাকার রঙ্গমঞ্চ সদৃশ ছিল। আরব শাসকরা এই নগরীকে অসংখ্য সুরম্য অট্টালিকা দিয়ে সুসজ্জিত করেন; কিন্তু জাঁকজমক সহকারে এর সুসংবদ্ধ সৌন্দর্য বিধানের ধারণা সেকালে অল্পই ছিল। এইরূপ সৌন্দর্য বিধান শুরু হয় আবদুর রহমান আদ দাখিলের আমলে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তাঁর প্রথম কাজ ছিল নিকটবর্তী পাহাড় থেকে রাজধানীতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করা। কর্ডোবার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উৎকর্ষের দিক দিয়ে অন্যান্য যে কোন নগরকে অতিক্রম না করা পর্যন্ত তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ক্রমাগত এর সংখ্যা বাড়াতে থাকেন। সীসার নলের সাহায্যে পানি নিয়ে আসা হত, তারপর তা বিতরণ করা হত শহর ও শহরতলীতে। জলাধার ও চৌবাচ্চাগুলো ছিল গ্রিস দেশীয় মার্বেল পাথরে চমৎকারভাবে খোদিত কিংবা পিতলের পাত দ্বারা নির্মিত। এমনকি কোন কোন প্রাসাদে সেগুলো ছিল সোনা ও রূপার তৈরি। আরবরা সব আকারের জলাধারা পছন্দ করত; কোন অট্টলিকা বা সংশ্লিষ্ট উদ্যান প্রবাহমান জলধারা ও ঝর্ণা ব্যতীত ছিল না। ৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় আবদুর রহমান একটি বিশাল পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করেন, যা তাঁর পূর্বসূরিদের কাজকে ম্রিয়মাণ করে দেয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খিলানের উপর এটি নির্মিত হয়েছিল এবং পার্শ্ববর্তী পর্বত থেকে নগরীর পয়ঃপ্রণালীতে পানি নিয়ে আসা হত। এখান থেকে পানি গিয়ে জমা হত এক বিশাল পাত্রে, এই পাত্রটির মধ্যস্থলে সোনার পাতে মোড়া একটি সিংহ মূর্তি ছিল; মূর্তিটির মুখ থেকে পানি নিঃসরিত হত। নগরে পানি সরবরাহের পর উদ্বৃত্ত পানি চলে যেত নদীতে। যে সুবিখ্যাত রুসাফা উদ্যান ইউরোপের সভ্য দেশগুলোর কাছে আদর্শ স্বরূপ হয়ে উঠেছিল তা প্রথম আবদুর রহমান তৈরি করেন। পৃথিবীর সমস্ত স্থান থেকে সংগৃহীত বাছাই করা ও দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়ায় এটি পরিপূর্ণ ছিল। একটি চমৎকার প্রাসাদ উদ্যানটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছিল; কিন্তু তিনি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস-বাসনের জন্য অট্টালিকা বানিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না, বরং তিনি তাঁর রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে মসজিদ, হাম্মাম, সেতু ও দুর্গ নির্মাণ করেছিলেলন। যে বিশাল জুমা মসজিদ স্পেনের অন্যতম অলঙ্কার বলে পরিগণিত হত, তার নির্মাণ কাজ তিনিই আরম্ভ করেছিলেন, যদিও তাঁর পুত্র সেটি সম্পূর্ণ করেন। একজন প্রাচীন লেখকের বর্ণনা থেকে কর্ডোভার গৌরবময় যুগের জাঁকজমক সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, বাতির আলোয় অট্টালিকার নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারের মধ্য দিয়ে যে কেউ দশ মাইল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে পারত। আরেকজন লেখক বলেন নগরটি একদিকে চব্বিশ মাইল, অন্যদিকে ছ'মাইল বিস্তৃত ছিল এবং গুয়াদালকুইভারের তীরবর্তী সমস্ত স্থানটি জুড়ে ছিল ঘরবাড়ি, প্রাসাদ, মসজিদ ও উদ্যান। নগর প্রাচীরের অভ্যন্তরে সমৃদ্ধশালী জনসংখ্যা অধ্যুষিত শহরতলী সাতাশটি মহল্লায় বিভক্ত ছিল। প্রতিটি মহল্লায় ছিল অধিবাসীদের প্রয়োজন অনুযায়ী

---

[১] রোমানগণ এটিকে কর্ডোভা বলত; আবার কলোনিয়া প্যাট্রিসিয়াও বলত।
[২] আরবী ওয়াদিউল কবীর (বৃহৎ নদী) থেকে বিকৃত।

যথেষ্ট সংখ্যক মসজিদ, বাজার ও হাম্মাম, যাতে এক মহল্লার লোককে অন্য মহল্লায় যেতে হত না। রাজধানী সংলগ্ন তিন হাজার শহর ও গ্রাম থেকে এর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হত। কর্ডোভার সন্নিকটবর্তী স্থানের প্রশাসকগণ প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের পর খলিফার কাছে তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করতেন। আদ-দাখিল কর্তৃক আরব্ধ ও প্রথম হিশাম কর্তৃক সুসম্পূর্ণ জমকালো মসজিদটিকে আন-নাসির আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। এটি ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত এবং পরম রুচিসম্মতভাবে সজ্জিত এক চমকপ্রদ অট্টালিকা। কর্ডোভায় অসংখ্য গ্রন্থাগার ছিল এবং ধনী লোকেরা নিরক্ষর হলেও পুস্তক সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম বা অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তাঁদের পুস্তকালয় আছে কিংবা তাদের নিকট দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে, শুধু এই সুখ্যাতির জন্যই তাঁরা এরূপ করতেন।

আজ-জাহরা প্রাসাদ

আন-নাসির কর্তৃক রাজধানী থেকে চার মাইল দূরে নির্মিত সুরম্য আজ-জাহরা[১] প্রাসাদ পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়ের বস্তু ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত সাদা, মণি বর্ণ, গোলাপী ও সবুজ রঙের খাঁটি মার্বেল পাথর দিয়ে এটি তৈরি হয়েছিল। ফোয়ারা দ্বারা সুসজ্জিত পূর্বদিকের হলঘরটিতে রাখা হয়েছিল স্বর্ণ নির্মিত ও মূল্যবান প্রস্তরখচিত জীবজন্তুর মূর্তি, যাদের মুখ দিয়ে অবিরাম জলধারা প্রবাহিত হত। দরবার কক্ষটি ছিল মার্বেল পাথর ও সোনার উপর মণিমুক্তাখচিত কারিগরি শিল্পের এক চমৎকার নিদর্শন। প্রাচীন লেখকদের মতে, এটির নকশার নিখুঁত বৈচিত্র্য সৌন্দর্যের সুষমতা, কারুকাজ ও সাজসজ্জার রুচিবোধ, উৎকৃষ্ট কুঞ্জবনের ছবির মত প্রতীয়মান। মার্বেলখচিত বা গলিত সোনায় তৈরি স্তম্ভগুলোর কাঠামো, বিশাল কৃত্রিম হ্রদ ও চমৎকার মূর্তি বিশিষ্ট ফোয়ারারাগুলোর কথা যথাযথভাবে ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

উদ্যানের সাথে সংলগ্ন ছিল বন্য পশুদের জন্য বৃহৎ খোয়াড় এবং সেইসাথে সকল দেশের সব রকম পাখির জন্য পক্ষীশালা সংলগ্ন ছিল। যে মহিষীর নামানুসারে প্রাসাদ ও নগরীর নামকরণ হয়েছিল তাঁর প্রতিমূর্তি কেন্দ্রীয় তোরণের উপর স্থাপিত হয়েছিল। মূল প্রাসাদ ও তার উদ্যান ব্যতীত খলিফার অনুচর ও সভাসদের ব্যবহারের উপযোগী বহু অট্টালিকা ছিল। সেগুলোর সাথেই সংলগ্ন ছিল আজ-জাহরা শহর।[২]

বিখ্যাত উমাইয়া শাসকদের আমলে কর্ডোভা তার তিন হাজার আটশ' মসজিদ, ষাট হাজার প্রসাদ ও অট্টালিকা, সাধারণ লোকের বসবাসের জন্য দু'লক্ষ ঘরবাড়ি, সাতশ' স্নানাগার, আশি হাজার দোকানপাট ছাড়াও ছাত্রাবাস ও সরাইখানা নিয়ে আড়ম্বর ও আয়তনে বাগদাদের সাথে প্রতিযোগিতা করত। এর খ্যাতি জার্মানির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং স্যাক্সন সন্ন্যাসিনী রোসউইথা (Hroswitha) এটিকে বিশ্বের অলঙ্কার বলে অভিহিত করেছিলেন।[৩] গৌরবময় যুগে কর্ডোভার জনসংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। বর্তমান শাসনকালে এর জনসংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশি হবে না।[৪]

---

[১] সৌন্দর্যময়ী।

[২] প্রাসাদের সন্নিকটে এসে বসবাস করার জন্য প্রত্যেক লোককে চারশ দিরহাম করে দান করায় দেশের সকল স্থান থেকে বিপুল সংখ্যক অধিবাসী এখানে এসেছিল। দশ হাজার লোক বিশ বছর ধরে প্রাসাদটির নির্মাণ কাজে নিযুক্ত ছিল।

[৩] ডোজি বলেন, এই লেখিকা দশম শতাব্দীর শেষার্ধে তাঁর কবিতা ও ল্যাটিন নাটকের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল।

[৪] মারফি। কর্ডোভার সমৃদ্ধি ছিল সেভিল, আলমারিয়া, জীন, মালাগা, এসিজা, মাদ্রিদ ও সারোগোসা প্রভৃতি নগরের প্রতীক স্বরূপ।

বীরত্ব

কর্ডোভা শুধু সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলই ছিল না, এখানেই বীরযোদ্ধারা প্রথম লালিত-পালিত হয়েছিল। বীরত্ব আরব চরিত্রের সহজাত গুণ, কিন্তু এই আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি, আচরণবিধি, বীরের মার্জিত ভাব ও শিষ্টাচার প্রভৃতি পরবর্তীকালে গ্রানাডা রাজ্যে যেগুলো অধ্যবসায় সহকারে চর্চা হত, তা আন-নাসির ও তাঁর পুত্রের আমলে প্রাধান্য লাভ করে। এই সময় বীরধর্মের ভাধারা, উচ্চ সম্মানবোধ ও অবলা নারী সমাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সাথে মিলিত হয়ে তাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটাতে শুরু করে।[১] আরেকজন অভিজ্ঞ লেখক বলেন যে, পরবর্তীকালে পাশ্চাতের খ্রিস্টান জাতিগুলোর মধ্যে আনুষঙ্গিক বিধি-বিধানসহ বীরত্বের যে উন্মেষ ঘটেছিল, তা আন-নাসির, হাকাম ও আল-মনসুরের আমলে আরবদের মধ্যে উন্নতি লাভ করে।[২] এখানে বিদেশী বীরপুরুষরা শান্তি ও নিরাপত্তার স্বীকৃতি লাভ করে আরব অশ্বারোহী সৈন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে আসতেন। সোচ্চারভাবে ভগ্নী ও প্রণয়িনীর নাম করতে করতে সৈনিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার পুরাতন প্রথা অচল হয়ে পড়েছিল। এই সময় বীরযোদ্ধারা তাঁদের প্রেয়সীর স্মৃতিচিহ্ন স্কন্ধে বা শিরস্ত্রাণে ধারণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। প্রায়শই সংঘটিত অশ্বারোহীর দ্বৈত যুদ্ধ এবং অন্যান্য যেসব প্রতিযোগিতা রাজধানীকে প্রাণবন্ত করে রাখত, তাতে আরব মহিলারা ছিলেন প্রকাশ্য দর্শক এবং সাধারণ উৎসবে তাঁদের উপস্থিতি দৃশ্যের শোভা ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করত। স্ত্রী-পুরুষের সম্মানজনক মেলামেশার ফলে যে কমনীয় ভাব ও শিষ্টাচারের উন্মেষ ঘটেছিল সে সম্পর্কে বর্তমান কালের ভারতবাসী মুসলমানগণ সামান্যই ধারণা করতে পারবে। যে মার্জিত শিষ্টাচার ও উচ্চ সম্মানবোধ আরব অশ্বারোহীদেরকে স্পেন দেশে তাদের সাম্রাজ্যের শেষকাল পর্যন্ত বিশিষ্টতা দান করেছিল তা একজন বেয়ার্ড বা সিডনীকেও সুষমামিণ্ডিত করতে পারত।[৩] প্রকৃত বীরের পক্ষে যে দশটি গুণ আবশ্যকীয় সেগুলো হল– ধর্মপরায়ণতা, সাহস, শিষ্টাচার, শৌর্য, কবিতা রচনা ও বাকপটুতা, অশ্ব, তরবারী, বর্ষা ও তীর চালনায় নৈপুণ্য।

---

[১] রিনড।

[২] Viardot, Scenes de moeurs en Espagne au dixieme siecle.

[৩] ১১৩৯ খ্রিস্টাব্দে সপ্তম আলফনজোর রাজমহিষী যখন আজেকা দুর্গে অবরুদ্ধ হন তখন তিনি একজন রমণী দ্বারা রক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করে সৌজন্য ও সাহসের অভাব প্রদর্শনের জন্য মুসলমান অশ্বারোহীদের নিন্দা করেন। তাঁরা নিন্দাবাদ ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করে কেবল অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন অনুগ্রহ করে তাঁর প্রাসাদ থেকে একবার তাঁদেরকে দর্শন দেন, সেই অনুযায়ী তিনি উপস্থিত হলে মুসলিম বীরগণ অতি সম্মানের সাথে তাঁকে অভিবাদন করে তৎক্ষণাৎ অবরোধ তুলে দেন এবং প্রস্থান করেন।

অধ্যায়-২৮
স্পেনের আরবগণ, উমাইয়া বংশ [পূর্বনুবৃত্তি]
[৩৬৬-৪২৮ হিজরি; ৯৭৬-১০৩৭ খ্রিস্টাব্দ]

দ্বিতীয় হিশাম : মাহদী : সুলায়মান : চতুর্থ আবদুর রহমান : দ্বিতীয় মুহম্মদ : তৃতীয় হিশাম : দ্বিতীয় হিশামের সিংসাহসনারোহণ : হাজিব-আল-মনসুর : তাঁর চক্রান্ত : রাজ্যের সমুদয় ক্ষমতা দখল : খ্রিস্টান গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর জয়লাভ : তাঁর মৃত্যু : তাঁর পুত্র আল-মুজাফফরের সিংহাসনারোহণ : তাঁর সফলকাম : সরকার : আল- মুজাফফরের মৃত্যু : হাজিব : আবদুর রহমান : মাহদীর সিংহাসন দখল : দ্বিতীয় হিশামের সিংহাসন ত্যাগ : সুলায়মান কর্তৃক মাহদী নিহত : কর্ডোভায় বিক্ষোভ।

দ্বিতীয় হিশামের [আল মুওয়াঈদ বিল্লাহ] সিংহাসনারোহণ; [৩৬৬-৪২৮ হি.; ৯৭৬-১০৩৭ খ্রি.]

হাকাম মৃত্যুকালে একাদশ বছর বয়স্ক একমাত্র পুত্র হিমাশকে রেখে যান। শান্তিপূর্ণভাবে এই অল্পবয়স্ক বালকের সিংহাসনারোহণ সুনিশ্চিত করতে তিনি জীবদ্দশায় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তিনি উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করেন এবং সকলেই হিশামের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। সেইসাথে একটি দলিলে স্বাক্ষর করেন, যাতে হাকাম তাঁর বৃদ্ধ বয়সের পরম স্নেহভাজন পুত্রকে খিলাফত দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। মৃত্যু শয্যায় তিনি বালকটিকে হাজিব মাশাফি ও রাজ্যের কর্মসচিব মুহম্মদ ইবন আমিরের তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর পুত্র তার মা সুদক্ষ মহিলা সম্রাজ্ঞী[১] সুবহের অভিভাকত্বে এবং এসব অনুগ্রহভাজন কর্মচারীর সহায়তার শান্তিপূর্ণভাবে ও কৃতকার্যতার সাথে রাজ্য শাসন করতে সক্ষম হবেন। তদনুসারে হিশামকে আল-মুওয়াঈদ বিল্লাহ[২] উপাধি প্রদান করে খলিফা বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু প্রয়াত খলিফা মুহম্মদন ইবন আমিরের বিশ্বস্ততা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলেন। হাজিব মাশাফী ও অন্য যে-সকল সভাসদ তাঁর কর্তৃত্বের বিরোধিতা করছিলেন, তিনি তাঁদের অনতিবিলম্বে অপসারিত করেন। তিনি বহু নেতৃস্থানীয় শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে হত্যা করেন এবং রাজ্যে যখন নেতৃস্থানীয় লোকের অভাব দেখা দেয়[৩] তখন সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দখল করে নেন এবং বালক খলিফাকে তাঁর প্রসাদে প্রায় বন্দি করে রাখেন। রাজ্যের কর্মচারীদেরকে কোন উৎসব ব্যতীত তাঁর কাছে যেতে দেয়া হত না, ঐ সময় তাঁরা তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেই প্রস্থান করতেন। উজিরের পদ দখল করে ইবন আবি আমির হাজিব আল মনসুর[৪] উপাধি গ্রহণ করেন এবং নিজের জন্য নির্মাণ করেন জাহিরা নামে একটি জমকালো

---

[১] এর অর্থ উষাকাল। ডোজি একে সানন্দে Aurora বা উষা দেবী বলে বর্ণনা করেছেন।

[২] আল্লাহর ধর্মের সাহায্যকারী।

[৩] ইবন খালদুন।

[৪] বিজয়ী প্রাসাদাধ্যক্ষ।

প্রাসাদ। মুদ্রায় তাঁর নাম অঙ্কিত হয়, সমস্ত আদেশ ও অনুশাসন জারি হয় তাঁর শীলমোহর অঙ্কিত হয়ে এবং ধর্মীয় মঞ্চ থেকে খলিফার সাথে তাঁর নামেও খুতবা পঠিত হয়। যেসব প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর মনে ভয় বা ঈর্ষার উদ্রেক করত তাদের পর্যুদস্ত করে তিনি সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। তিনি আরব সৈন্যদের অপসারিত করে তাদের স্থলে যাদের আনুগত্যের উপর তাঁর আস্থা ছিল সেই বার্বারদের বিপুল সংখ্যায় নিযুক্ত করেন। বস্তুত আরবদেরকে তিনি দ্বিতীয় শেণীর অতি নগণ্য পদে বহাল রাখেন।[১]

ইবন খালদুনের মতে, তিনি বায়ান্নটি[২] যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে তার প্রত্যেকটিতে সাফল্যলাভ করেন। কখনো তাঁর সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়নি বা তাঁর পতাকা অবনমিত হয়নি। হাকামের মৃত্যুর সাথে সাথে গ্যালিসীয় ও বাস্করা আরবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং পুনরায় আক্রমণ শুরু করে দেয়। ক্রমাগত কয়েকটি গৌরবময় যুদ্ধে মনসুর, (এখন আমি তাঁকে এই নামেই অভিহিত করব), লিঁও ও নেভারকে করদ রাজ্যে পরিনত করেন এবং ঐসব রাজ্যের রাজধানীকে তাঁর সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করেন। অতঃপর তিনি ক্যাটালনিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং বার্সিলোনা লুণ্ঠন করে তিনি ফরাসী কাউন্টদের বিতাড়িত করেন। এইরূপে সাম্রাজ্যের সীমানা পিরেনীজের অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মরিটানিয়াতেও তাঁর সৈন্যদল অনুরূপভাবে সাফল্যলাভ করে এবং তাঁর সেনাপতিরা পশ্চিম আফ্রিকার এক বৃহৎ অংশ অধিকার করে নেন। ৯৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি হাজিব পদকে তাঁর পরিবারের বংশানুক্রমিক করে তোলার অভিপ্রায় পোষণ করেন। যদি তিনি পারতেন তাহলে তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষকের পুত্রকে সিংহাসন থেকে অপসারিত করে দিতেন এবং কার্যত নিজেই হয়ে উঠতেন আইনসঙ্গত খলিফা, কিন্তু তিনি জাতিকে ভয় পান, কারণ তাদের মধ্যে আইনগত বৈধতার ধারণা বদ্ধমূল ছিল। অভিজাতবর্গ সম্ভবত রাজবংশ পরিবর্তনকে প্রয়োজনীয় বলেই মনে করতেন; কিন্তু জনসাধারণ, বিশেষ করে স্পেন দেশীয়রা অন্যরকম চিন্তা করত। ধর্মীয় ভাবাবেগের মত রাজবংশের প্রতি অনুরাগও তাদের সত্তার অংশস্বরূপ ছিল এবং যদিও মনসুর দেশকে অভূতপূর্ব গৌরব ও সমৃদ্ধি দান করেছিলেন, তবু তাদের খলিফাকে ক্ষমতাহীন করে রাখায় তারা তাঁকে ঘৃনা করত। এই মনোভাব উপলব্ধি করে অথচ যথাসময়ে এর পরিবর্তন হতে পারে– এই আশায় তিনি তাঁর পুত্র আবদুল মালিককে খলিফার নামমাত্র আদেশে উজির পদে তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেই সন্তুষ্ট থাকেন। ৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'সৈয়দ' (প্রভু) এবং 'মালিক করীম' (সদাশয় সম্রাট) উপাধি গ্রহণ করেন।

হাজিব আল-মনসুরের মৃত্যু [১০০২ খ্রি.]

এই খ্যাতনামা পুরুষ ১০০২ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন এবং মদীনা সালিমে (Medinaceli) তাঁকে সমাহিত করা হয়। উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টানগণ হাজিব আল-মনসুরের মত আন্দালুসিয়ার আর কোন শাসককে এত ভয় করত না। তাঁর সামরিক দক্ষতা ও বিস্ময়কর সাংগঠনিক প্রতিভা তাঁকে সৈনিকদের কাছে পরমপ্রিয় করে তুলেছিল। সৈন্যদের সুখ-সুবিধা ও শৃঙ্খলা বিধানে তিনি অবিরাম ও অবিশ্রান্তভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে সুশিক্ষিতভাবে গড়ে তুলে স্পেনকে তিনি এমন এক ক্ষমতা দান করেছিলেন যা ডোজির মতে, তৃতীয় আবদুর রহমানের সময়ও উপভোগ করা যায়নি। কিন্তু জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা লাভের জন্য এইটুকুই তাঁর একমাত্র দাবি ছিল না। যদিও রাজনৈতিক কারণে তিনি মুক্তবাদী ও দার্শনিক লোকদের

---

[১] ইবন খালদুন।

[২] অন্য লেখকের মতে ছাপান্নটি।

প্রতি অসহনশীলতা প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তবু পারিষদবর্গের মনে কোন আঘাত না দিয়ে যথাসাধ্য তাঁদের নিরাপত্তা বিধানে কুণ্ঠিত হতেন না।[১] তাঁর সমগ্র শাসনকালব্যাপী সামরিক গৌরবের সাথে যুক্ত হয়েছিল সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি আগ্রহ এবং শিল্প ও কৃষির প্রতি অনুরাগ। রিনড বলেন, তাঁর শাসনককাল ব্যতীত আর কোন সময় মুসলিম-শাসিত স্পেন অধিকতর সমৃদ্ধশালী ছিল না। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে উৎসাহ প্রদান করতেন এবং উদার বদান্যতায় জ্ঞানী লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ক্ষমতা লাভের জন্য তিনি যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা প্রবলভাবে নিন্দনীয় হলেও ক্ষমতা লাভের পর তিনি যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সদাশয়, ন্যায়পরায়ণ ও প্রতিশ্রুতি পালনে নিষ্ঠাবান। বস্তুত তাঁর বিচক্ষণতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল।

হাজিব আবদুল মালিক আল-মুজাফফর

মনসুরের পুত্র আবদুল মালিক আল-মুজাফফর (বিজয়ী) উপাধি ধারণ করে হাজিব পদে মনসুরের স্থলাভিষিক্ত হন। রাজ্য পরিচালনায় তিনি তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন। খ্রিস্টান গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি বহুবার বিজয় লাভ করেন এবং তাঁর সফল শাসনে দেশ আরও সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। একজন প্রবীণ লেখক বলেন, ঐদিনগুলো ছিল উৎসবের দিন।

বনু আমিরের প্রতি বিরাগ

তথাপি বনু আমির জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেন নি। যদি তাঁরা খলিফার নামে শাসনকার্য চালিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন তাহলে বোধহয় তাঁদের কর্তৃত্ব কিছুদিন স্থায়ী হত, কিন্তু তাদের ব্যগ্র উচ্চাভিলাষ সকল সীমা অতিক্রম করেছিল। সিংহাসনের ছায়াতলে বসে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং সিংহাসন লাভ করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। এভাবে তাঁরা রাজবংশের সমস্ত লোক তথা সমগ্র উমাইয়া গোত্রকে তাঁদের ঘোরতর শত্রুতে পরিণত করেছিলেন। তাঁরা ফকীহ সম্প্রদায় ও জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে বিরূপ করে তুলেছিলেন। সেইসঙ্গে নাসিরের সিংহাসনারোহণের সময় থেকে স্পেন উপদ্বীপে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার ফলেও একটি বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রাচীন আরব সমাজ তার দোষ গুণসহ লুপ্ত হয়েছিল। আন-নাসির ও প্রতাপশালী হাজিবের জাতিগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের যে লক্ষ্য ছিল তা অর্জিত হয় প্রাচীন অভিজাততন্ত্রের মূল্য স্বরূপ, যা ধ্বংস ও নিঃস্ব হয়ে দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক নামগুলো ক্রমশ মুছে যাচ্ছিল মানুষের স্মৃতি থেকে। দরবারের সভাসদগণ উমাইয়া বংশের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় নিঃসন্দেহে এই আঘাত প্রতিরোধ করতে পেরেছিলেন এবং এ যাবৎ তাঁদের সমগ্র সম্পদ ও প্রতিপত্তি বজায় রেখে আসছিলেন, তবু এই যুগের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন বার্বার ও স্লাভ সেনাপতিগণ। তাঁরা হাজিব আল-মনসুরের আমলে তাঁদের ভাগ্য সৃষ্টি করেছিলেন। বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি সামাজিক উপাদান প্রাধান্য লাভ করে, যেমন : ঐশ্বর্যশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সওদাগর, ব্যবসায়ী ও শিল্পী সম্প্রদায় সাধারণভাবে দেশের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। কিন্তু এর ফলে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়, কারণ ধন-সম্পদ বৃদ্ধি ও নতুন সমাজব্যবস্থার উন্মেষে শুরু হয় শ্রেণী সংঘাত। বর্তমান কালের রাজনীতিবিদ যে সকল সমস্যায় বিজড়িত হন তৎকালীন ইতিহাসেও সেগুলো প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, যেমন– সামরিক ও অসামরিক লোকদের প্রতি বিদ্বেষ, মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের

[১] ডোজি।

ঘৃণা, সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকের প্রতি সাধারণ লোকের ঈর্ষা। রাজধানীর সামাজিক অবস্থা এরূপ ছিল যে, সামান্যতম গোলযোগ থেকে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে মারাত্মকত সংঘাত অবাধারিত ছিল। কর্ডোভা হাজার হাজার শ্রমিকে পরিপূর্ণ এক বিশাল কারখানায় পরিণত হয়েছিল। এই শ্রমিকদল সামান্যতম ইঙ্গিতে লুণ্ঠিত দ্রব্যলাভের সম্ভাবনায় যে কোন দাঙ্গা বা বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু বিত্তবান শ্রেণীর লোকেরা বনু আমিরের প্রতি ঘৃণাবশত এই বিপদের কথা বিস্মৃত হয়েছিল।[১]

হাজিব-আল-মুজাফফরের মৃত্যু [অক্টোবর, ১০০৮ খ্রি.]

কেউ কেউ যে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেছিল এবং সবাই যার জন্য আশান্বিত ছিল, জীবনের বিকাশ লগ্নে মুজাফফরের মৃত্যুতে তা-ই ঘটেছিল। বনু আমিরের পতন ঘটেছিল বটে, কিন্তু অন্ধ স্যামসনের মত তাঁরা নিজেদের পতনের সাথে সাথে সমগ্র সাম্রাজ্যের পরিকাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

হাজিব আবদুর রহমান সাঞ্চোল

সাঞ্চোল[২] নামে অভিহিত তাঁর ভাই আবদুর রহমান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ঘোর ব্যভিচারের জন্য জনসাধারণ তাঁকে ঘৃণা করত, তবুও তিনি নিজেকে খলিফা করার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। তাঁকে খিলাফতের ভাবী উত্তরাধিকারী ঘোষণা করার জন্য তিনি দ্বিতীয় হিশামকে বাধ্য কবেন। তাঁর ঔদ্ধত্যে কর্ডোভাবাসীদের অসন্তোষ চরমে ওঠে। সাঞ্চোল উত্তরাঞ্চলে অভিযান চালানোর জন্য রাজধানী ছেড়ে যেতে না যেতেই মুহম্মদ নামক রাজপরিবারের একজন লোকের নেতৃত্বে কর্ডোবায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। বনু আমিরের প্রাসাদ (আজ-জাহিরা) লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়।

মুহম্মদ আল-মাহদী

হিশাম মুহম্মদের অনুকূলে তাঁর নিজের পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং মুহম্মদ মাহদী উপাধি গ্রহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি সাঞ্চোলের স্বত্বাধিকারের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। রাজধানীর অনুপ্রেরণা প্রদেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী মাহদীর পতাকাতলে সমবেত হয়। ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা 'জনসাধারণের প্রতিনিধি' ডাক্তার, কসাই, মুচি, জিন-নির্মাতা প্রভৃতি লোককে নেতৃত্বে বরণ করে।

সাঞ্চোলের মৃত্যু

কিন্তু মাহদী জনপ্রিয় এই গণ আন্দোলনের মাধ্যমে যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকে জাগিয়ে তুলেছিলেন তাকে তিনি বশে রাখতে পারেননি এবং তা প্রকৃতপক্ষে স্পেনে উমাইয়া বংশের পতনের প্রকৃত কারণ হয়েছিল। সাঞ্চোল তাঁর অনুচরগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে বন্দি ও নিহত হন। কিন্তু নতুন খলিফা বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেননি, অচিরেই তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য সকল দলের বিরাগভাজন হন। দুর্ধর্ষ বার্বারগণ তাঁকে ত্যাগ করে এবং আরেকজন প্রার্থীকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনিও ছিলেন উমাইয়া বংশীয় এবং তিনি সুলায়মান নাম গ্রহণ করেছিলেন। কর্ডোভা এবার ভয়ঙ্কর দাঙ্গার রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয় এবং উভয়পক্ষে সৃষ্টি হয় জঘন্যতম দলাদলি। উন্মত্ত সৈন্যদলের প্রলোভনে মাহদী দ্বিতীয় হিশামকে বের করে আনেন এবং পুনরায় তাঁকে

---

[১] ডোজী।

[২] আবরদের সানজুল। ডোজী বলেন, সাঞ্চোল ছিল তাঁর অবজ্ঞাসূচক নাম, তাঁর মা নেভারের রাজা সাঞ্চোর কন্যা ছিলেন বলে তাঁকে ছোট সাঞ্চো বলা হত।

খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। সুলায়মান এরপর ক্যাস্টিল ও লিঁওর খ্রিস্টানদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অন্যদিকে মাহদী ক্যাটালনিয়ানদের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। এভাবে মুজাফফরের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে আরবগণ গ্যালিসীয় ও অনান্য গোত্রগুলোর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে তাদের সাহায্যপ্রার্থী হয়, যা কেবল আন-নাসির ও মহান হাজিব কর্তৃক বিজিত সমস্ত স্থান প্রত্যর্পণ করার পরই এই সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছিল। এইভাবে দুইশত দুর্গ ও নগর খ্রিস্টানদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। কর্ডোভা পর্যায়ক্রমে সুলায়মান ও মাহদীর মিত্রদের দ্বারা অধিকৃত ও পুনরাধিকৃত হয়ে অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত নগরী বলে বিবেচিত হয়।

সুলায়মান [জুলাই, ১০১০ খ্রিস্টাব্দ]

তৃতীয় আবদুর রহমানের সুরম্য আজ-জাহরা নগরী লুণ্ঠিত এবং আংশিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে মাহদী নিহত হন; অতঃপর সুলমায়মান অসহায় হিশামকে বন্দি করেন। বন্দি হিশামকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হয় অথবা মক্কায় চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয় ।

আলী ইবন মাহমুদ [১০১৭ হিজরি]

জবরদখলকারী 'মুসতাঈন বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি অসদুপায়ে অর্জিত বিজয়ের ফল বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি। অন্য একটি বিদ্রোহের ফলে তাঁর পতন ও মৃত্যু হয়। তারপর ইদ্রিসী বংশের এক ব্যক্তি[১] সিংহাসনে বসেন। কিছুদিন পর তিনি আততায়ী কর্তৃক নিহত হলে তাঁর ভাই কাসিম সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কাসিমের শাসন ছিল শান্ত ও ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু অচিরেই বার্বারগণ তাঁকে ত্যাগ করে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে এক যুদ্ধের ফলে তিনি কর্ডোভা থেকে বিতাড়িত হন। অতঃপর কর্ডোবাবাসীগণ উমাইয়া বংশীয় জনৈক ব্যক্তিকে[২] সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন, কিন্তু তিনি বেশিদিন সিংহাসনে থাকতে পারেননি। উমাইয়া বংশীয় আরও দুই ব্যক্তি[৩] দ্রুত তাঁর অনুগমন করে। এই নামমাত্র হতভাগ্য নরপতিদ্বয়ের দ্বিতীয় জনের[৪] সঙ্গে সঙ্গে স্পেনে উমাইয়া বংশের অবসান ঘটে। কর্ডোভাবাসীগণ কিছুদিনের জন্য আলী ইবন হামুদের[৫] পুত্র ইয়াহিয়ার বশ্যতা স্বীকার করে। ১০৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আততায়ী কর্তৃক নিহত হলে তারা নগরে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। চল্লিশ বছর পর সেভিলের রাজা কর্তৃক অধিকৃত না হওয়া পর্যন্ত এই সাধারণতন্ত্র বিদ্যমান থাকে।

---

[১] আলী ইবন হামুদ।

[২] আবদুর রহমান, যাঁর উপাধি ছিল আল মুসতাজহির বিল্লাহ (আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনাকারী)।

[৩] মুহম্মদ, আল মুসতাকফী বিল্লাহ (আল্লাহতে সন্তুষ্ট)। এই আল মুসতাকফী ছিলেন বিখ্যাত মহিলা কবি ওয়াল্লাদার পিতা। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী মহিলা এবং জ্ঞানে ও রুচিতে তিনি তাঁর পিতার দরবারে শ্রেষ্ঠ কবিদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। সমকালীন ইতিহাস এই রাজকুমারী সম্পর্কীয় কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাঁর সৌন্দর্যের মতই চরিত্রের মহত্ব ও পবিত্রতার জন্যও তিনি সমান প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন জীবিত থেকে ৪৮০ হিজরিতে (৮ মে, ১০৮৭ খ্রিস্টাব্দ) অবিবাহিত অবস্থায় পরলোকগমন করেন।

[৪] তৃতীয় হিশাম, আল মুতাজ বিল্লাহ (আল্লাহর জন্য প্রস্তুত)। মাক্কারী বলেন, হিশাম ছিলেন শান্ত ও সুশিক্ষিত শাসক এবং বহু উজ্জ্বল গুণের অধিকারী। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি রাজধানীতে প্রবেশের কিছুদিন পরই কর্ডোভার অস্থিরমতি ও অধঃপতি নাগরিকরা তাঁর শাসনে অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে এবং ৪২২ হিজরিতে (১০৩১ খ্রিস্টাব্দ) সেনাবাহিনী তাঁকে পদচ্যুত করে।

[৫] তাঁর উপাধি ছিল আল-মুতাআলী।

অধ্যায়-২৯
স্পেনের আরবগণ [পূর্বানুবৃত্তি]
[৪২৮-৮৭১ হিজরি; ১০৩৭-১৪৬৬ খ্রিস্টাব্দ]

মূলুকুত-তাওয়াইফ বা আঞ্চলিক রাজন্যবর্গ : তাঁদের পারস্পরিক বিরোধ : খ্রিস্টান শক্তির ক্রমবিস্তার : আল মুরাবিতগণ : ইউসসুফ ইবন তাশফিন : জাল্লাকার যুদ্ধ : ইউসুফ ইবন তাশফিনের মৃত্যু : তাঁর পুত্র আলী তাঁর স্থলাভিষিক্ত : তাঁর মৃত্যু : আল মুরাবিত : সাম্রাজ্যের পতন : আল মুওয়াহিদগণ : আবদুল মোমিন : আবু ইয়াকুব ইউসুফ : আবু ইউসুফ ইয়াকুব (আল-মনসুর) : এলারকসের যুদ্ধ : ইয়াকুবের মৃত্যু : মুহম্মদ আন-নাসিরের সিংহাসনারোহণ : আল আ'কাবের বিপর্যয় : আল মুওয়াহিদ সাম্রাজ্যের পতন : বনু আহমারের অভ্যুদয় : গ্রানাডা রাজ্য।

মূলুকুত-তাওয়াইফ বা আঞ্চলিক রাজন্যবর্গ, বনু হামদু; বনু আব্বাদ [৪২৮-৮৭১ হি; ১০৩৭-১৪৬৬ খ্রি.]

রাজধানীর রাজনৈতিক গোলযোগ প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরকে স্বাধীনতা ঘোষণার সুযোগ প্রদান করে। মালাগা, আলজিসিয়ার্স ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো দখল করে নেয় বনু হামদুদরা।[১] তাঁরা পরবর্তীকালে আমীরুল মোমিনীন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রানাডার রাজা কর্তৃক পদচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ঐ অঞ্চল শাসন করেন। গ্রানাডা বার্বার দলপতি জাবীরের হস্তগত হয়। তাঁর বংশের লোকেরা ১০৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই রাজ্য শাসন করেন। সেভিলসহ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো (আল-গার্বসহ) বনু আব্বাদ কর্তৃক অধিকৃত হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সেভিলের প্রধান কাজী আবুল কাসিম মুহম্মদ ওরফে ইবন আব্বাদ। বনু আব্বাদ[২] বংশের শেষ নরপতি ছিলেন মুতামিদ। তিনি ইউসুফ ইবন তাশফিন[৩] কর্তৃক আফ্রিকায় নির্বাসিত হয়েছিলেন।

বনু জুন্নুন [৭৮ হিজরি; ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দ]

টলেডো বনু জুন্নুন কর্তৃক অধিকৃত হয়। তারা আড়ম্বরপূর্ণ অমিতাচারের জন্য বিখ্যাত ছিল। শেষ জুন্নুন বংশীয় রাজা কাদির ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে ষষ্ঠ আলফনজোর কাছে নগরটি সমর্পণ করেন।

---

[১] মরিটানিয়ার ইদ্রিসী বংশোদ্ভূত; তাঁরা মায়মুনের পুত্র হামুদের বংশধর; মায়মুন ছিলেন আহমদের পুত্র; তিনি (আহমদ) আলীর পুত্র, তিনি (আলী) উবায়দুল্লাহর পুত্র, তিনি (উবায়দুল্লাহ) উমরের পুত্র, তিনি (উমর) ইদ্রিসের পুত্র। হামুদ আফ্রিকা থেকে পালিয়ে যান এবং হাজিব আল-মনসুরের শাসনকালে কর্ডোভায় আশ্রয় গ্রহণ করলে তাঁকে সহৃদয়ভাবে গ্রহণ করা হয় এবং খলিফা হিশামের সৈন্যদলে তাঁকে সেনাপতির পদ দেয়া হয়।

[২] আব্বাদ তাঁর জনৈক পূর্ব পুরুষ। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র আবু আমর আব্বাদ ওরফে মুতাজিদ বিল্লাহ।

[৩] পূর্বে দেখুন।

বনু হুদ

বনু হুদ তৃতীয় আবদুর রহমানের জনৈক সেনাপতির[১] বংশধর। তাঁরা ১১১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সারাগোসার অধিপতি ছিলেন। বাদাজোজ, ভ্যালেনসিয়া, মুরসিয়া ও আলমারিয়া অনুরূপভাবে স্বাধীন দলপতিদের দ্বারা শাসিত হত।

মুজাহিদ আল-আমিরী

ডেনিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ছিল আবুল জুয়ুশ (সৈনিকদের জনক) উপাধিধারী মুজাহিদ ইবন আবদুল্লাহ আল-আমিরীর[২] দখলে। তিনি ছিলেন নির্ভীক যোদ্ধা ও অভিজ্ঞ নাবিক। তিনি সর্বদাই সমুদ্রে নৌবহর প্রস্তুত রাখতেন। এর সাহায্যে তিনি ফ্রান্স ও ইতালির সমুদ্রোপকূলে অবতরণ করতেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন খ্রিস্টানদের কোন জাহাজ বাহর-উশ শামের[৩] (শামের সমুদ্র) নদীতে পাড়ি দিতে সাহস করেনি। মূলুকুত তাওয়াইফ[৪] নামে অভিহিত এসব আঞ্চলিক রাজারা প্রত্যেকেই ছিলেন জ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক। বস্তুত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা একে অন্যকে অতিক্রমের চেষ্টা করতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবি।[৫] আরব ঐতিহাসিক যথার্থই মন্তব্য করেন যে, গলার হার ভেঙে গিয়ে তার মুক্তাগুলো ছড়িয়ে পড়লে আঞ্চলিক রাজন্যবর্গ বনু উমেয়ার সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এর ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষতি না হয়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

তাঁদের বিরোধ

যদি তাঁরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারতেন কিংবা স্বার্থের সমন্বয় সাধন করতে পারতেন, তাহলে তাঁরা স্পেন দেশীয় খ্রিস্টানদের আক্রমণ দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করতে সমর্থ হতেন। স্বাভাবিকভাবেই এই সময় খ্রিস্টানদের আক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু পরস্পরের বিবাদ ও ঈর্ষাপরায়ণতা তাঁদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেছিল। এমনকি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন।

প্রথম ফার্দিনান্দ; সেভিলের রাজা মুতামিদ

১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে ক্যাস্টিল ও লিঁওর রাজা প্রথম ফার্দিনান্দ তাঁর সমগ্র সৈন্যদল নিয়ে বিচ্ছিন্ন আরবদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করেন।[৬] সেভিলের রাজা মুতাজিদ লিঁওবাসীদেরকে করদানে স্বীকৃত হয়ে আত্মরক্ষা করেন। পুত্র মুতামিদের জন্য রাজ্যভার রেখে ১০৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১০৭৫ খিস্টাব্দে মুতামিদ কর্ডোভা অধিকার করেন এবং কিছুদিন

---

[১] মুহম্মদ ইবন হাশিম আত তাজিবী, সারাগোসার শাসনকর্তা।

[২] তিনি ছিলেন হাজিব আল-মনুসুরের একজন মাওলা (মুক্তিপ্রাপ্ত দাস)।

[৩] ভূমধ্যাসাগর। ডোজি মুজাহিদকে তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড় জলদস্যু বলে অভিহিত করেন।

[৪] তাওয়াইফ হল তাইফাহ শব্দের বহুবচন যার অর্থ গোত্র বা দলভুক্ত লোকজন।

[৫] সেভিলের শেষ রাজা মুতামিদ তাঁর কবিতার চমৎকার রচনাশৈলী ও শব্দ বিন্যাসের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বাদাজোজের রাজা মুজাফফর ইবন আফতাস পঞ্চাশ খণ্ডে সম্পূর্ণ কিতাবুল মুজাফফরী নামক এক চমৎকার ইতিহাস গ্রন্থ লিখে যান।

[৬] কোন শহর বা নগর দখল করলে স্পেন দেশীয় খ্রিস্টানরা সহজাতভাবেই পৈশাচিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত হত। বোবাস্ট্রোতে যে অত্যাচার সংঘটিত হয়েছিল তা অবর্ণনীয়।

পরই গুয়াদালকুইভার থেকে গুয়াদিয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র টলেডো রাজ্য তাঁর অধিকারে আসে।

ষষ্ঠ আলফনজো

১০৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ফার্দিনান্দের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ষষ্ঠ আলফনজো ক্যাস্টিলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিবেক বর্জিত হওয়ায় তিনি তাঁর ভাইদেরকে তাঁদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে তিনি স্বয়ং লিঁও, ক্যাস্টিল, গ্যালিসিয়া ও নেভরের একচ্ছত্র অধিপতি হন এবং সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। অন্যদিকে সামন্ত আরব রাজাদের প্রদেয় করব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি সমগ্র উপদ্বীপকে সরাসরি তাঁর নিজের শাসনাধীনে নিয়ে আসতে বদ্ধপরিকর হন। ইউরোপের সকল স্থান থেকে গৃহীত দুঃসাহসী যোদ্ধাদের দ্বারা গঠিত এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর অধিকারী হয়ে তিনি জীন, দানব বা স্বর্গীয় দূতদের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেন।

টলেডোর আত্মসমর্পণ [১০৮৫ খ্রিস্টাব্দ]

১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে জন্নুন বংশের শেষ রাজা কাদির তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ টলেডো নগরী সমর্পণ করেন। এক্ষণে তাঁর গর্ব সীমা ছড়িয়ে গেল। গ্রানাডা, বাদাজোজ, সেভিলসহ আরও যে কয়েকটি নগর তখনো মুসলমানদের হাতে ছিল তারা স্পষ্টভাবে তাদের ভাগ্যের কথা বুঝতে পারে এবং আসন্ন বিপদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কিন্তু উপদ্বীপের অভ্যন্তরীণ বিবাদের ফলে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়ার কোন আশাই ছিল না। সুতরাং তারা বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বাধ্য হন।

আল-মুরাবিতদের অভ্যুদয়

স্পেনে মুসলিম সাম্রাজ্য যখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ছিল পশ্চিম আফ্রিকায় তখন একটি নতুন শক্তির উদয় ঘটে। মূলাসসামিন[১] নামে অভিহিত সাহাবার বার্বারগণ সম্প্রতি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। মারবুত[২] বা সাধু উপাধিধারী ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে তারা অনেক রাজ্য জয় করে এবং যে সময়ের কথা আমরা বলছি তখন তাদের সাম্রাজ্য সেনিগাম্বিয়া থেকে আলজিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তাদের রাজাদেরকে বলা হত আল-মারাবিতা,[৩] যা আল মুরাবিত রূপে বিকৃত হয়েছে।

ইউসুফ ইবন তাশফিন আমীরুল মুসলিমীন

কিছুদিন পূর্বে বাগদাদের খলিফা কর্তৃক গৌরবজনক আমীরুল মুসলিমীন বা মুসলমানদের অধিনায়ক উপাধিতে ভূষিত বিখ্যাত ইউসুফ ইবন তাশফিন ছিলেন তাদের শাসনকর্তা। ধর্মনেতাদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে স্পেনের আরব রাজাগণ তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

---

[১] অবগুণ্ঠিত লোক লিসাম (লিথাম) থেকে অবগুণ্ঠন। তাদের লোকজনেরা মরুভূমির উত্তপ্ত বালুরাশি থেকে পরিত্রাণের জন্য সর্বদা একটি অবগুণ্ঠন পরিধান করত বলে তাদেরকে এই নাম দেয়া হয়েছিল। মুসলমানদের স্ত্রীলোকরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত বলে মনে হয় এবং তারা অবাধ ও অবগুণ্ঠনহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াত। তারা যুদ্ধে নিয়োজিত হত না বলে উত্তীয়মান বালুকা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘোমটা ব্যবহারের প্রয়োজন হত না বলে মনে হয়।

[২] মারাবিত, মারবুত, রাবিত, রাবীত সবই এক ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ ধার্মিক বা সাধু লোক।

[৩] মারবুতের বহুবচন। মারবুত শব্দটি সচরাচর আধুনিক আলজিরিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

স্পেনে গমন [অক্টোবর, ১০৮৬খ্রি.]
তাঁদের আবদনে সাড়া দিয়ে ইউসুফ ইবন তাশফিন ১০৮৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্পেনে গমন করেন। সেভিলের নিকট মুতামিদ ও অন্যান্য আন্দালুসীয় রাজারা তাঁর সাথে যোগদান করেন এবং তাঁদের সম্মিলিত বাহিনী বাদাজোজের (ব্যাজিয়স বা ব্যাটলিয়স) দিকে অভিযান চালায়। বাদাজোজের বার মাইল দক্ষিণে জাল্লাকা[১] নামক স্থানে আলফনজো তাদের সম্মুখীন হন। আরবরা সংখ্যায় ছিল মোট বিশ হাজার, অন্যদিকে আলফনজোর অধীনে ষাট হাজারেরও বেশি অভিজ্ঞ সৈন্য ছিল।

জাল্লাকার বিজয় [১২ রজব, ৪৭৯ হি; ২৩ অক্টোবর, ১০৮৬ খ্রি.]
১০৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর, শুক্রবার এক ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইবনুল আসির[২] বলেন, আলফনজো মাত্র তিনশত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান, অন্যদিকে অবশিষ্টরা মৃত বা মুমূর্ষু অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকে। জাল্লাকার বিজয় লিওর খ্রিস্টান রাজ্যকে সাময়িকভাবে পঙ্গু করে দেয়। এই অবস্থায় ইউসুফ ইবন তাশফিন বেশিদিন স্পেনে অপেক্ষা করেননি; পরবর্তী বছরে প্রত্যাবর্তন করে তিনি স্পেন দেশীয় রাজাদেরকে তাঁদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে তাদের রাজ্যগুলোকে তিনি আল-মুরাবিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।[৩] বস্তুত টেগাস নদী পর্যন্ত সমগ্র আন্দালুসিয়া এক্ষণে মরক্কোর সম্রাটের অন্তর্ভুক্ত হয়। যে ফকীহ সম্প্রদায় আল-মুরাবিতগণকে নিয়ে আসার জন্য এত সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁরা এসব খলিফাদের আমলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। ডোজি বলেন, আল-মুরাবিতদের শাসনকালে মুসলিম ধর্মযাজকরা যেরূপ ক্ষমতা লাভ করেছিলেন তার অন্য দৃষ্টান্ত খুঁজতে হলে ভিসিগথদের সময়ে ফিরে যেতে হবে। তাঁদের সঙ্কীর্ণ মনোভাব এতদূর পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছিল যে, তাঁরা ইমাম আল-গাযালির বিখ্যাত গ্রন্থ 'জ্ঞান ও ধর্মের পুনরুজ্জীবন'কে[৪] নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

ইউসুফ ইবন তাশফিনের মৃত্যু [মুহররম, ৫০০ হি; সেপ্টেম্বর, ১১০৬ খ্রি.]
আবুল হাসান আলীর সিংহাসনারোহণ
ইউসুফের জীবদ্দশায় খ্রিস্টানগণ সর্বদায় তাঁর বাহুবলে শঙ্কিত ছিল। তিনি ১১০৬ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন এবং তাঁর পুত্র আলী আবুল হাসান[৫] উপাধি ধারণ করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তাঁর সুযোগ্য পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, যদিও, ঐতিহাসিকদের মতে, অনেক বিষয়ে তিনি তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি খ্রিস্টান গোত্রগুলোকে বহুবার পরাজিত করেন এবং তাদের নিকট হতে তালাভেরা, মাদ্রিদ (মাজরীত),[৬] গুয়াদালাক্সারা (ওয়াদিউল হিজারা)[৭] ও আরও অনেক দুর্গ ও নগর অধিকার করেন, অন্যদিকে তাঁর সেনাপতি সির ইবন আবী বকর সান্টারেম, বাদজোজ, অপর্টো (বোরটোকাল), ইভোরা (টেবোরা) ও লিসবন (আলিশবুনা) নগরসমূহ পুনরাধিকার করেন।

---

[১] খ্রিস্টানদের সেক্রালিয়াস।

[২] দশম খণ্ড, পৃ. ১০০।

[৩] সেভিলের রাজা মুতামিদ মরক্কোতে নির্বাসিত হয়ে ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁর পতনের কাহিনী বড়ই করুণ।

[৪] ইহহিয়া উল উলুম ওয়াদ্দীন আদ্যপান্ত গোঁড়া মতবাদমূলক গ্রন্থ।

[৫] ইবন খাল্লিকান তাঁকে একজন শক্তিশালী, শান্ত, ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ ও অতি মহানুভব নরপতি বলে বর্ণনা করেছেন।

[৬] প্রাচীন মজোরিটাম।

[৭] পাথরের নদী। এই নদী থেকেই নগরের নামকরণ হয়েছে।

১১১৯ খ্রিস্টাব্দ

কিন্তু আরাগনী, ক্যাটালনী ও পীরেনীজ পর্বতের অপর প্রান্তে ফ্রাঙ্কদের সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক সারাগোসা (সারাকুসতাহ), কালাতায়ুদ (কালাত আইয়ুব) ও টেগাস নদীর অপর প্রান্তস্থ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকৃত হওয়ায় লাভ-ক্ষতি সমান হয়ে পড়ে। এভাবে আল-মুরাবিতরা যখন আন্দালুসিয়ায় যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তখন আফ্রিকায় তাদের শাসনের পক্ষে অতি মারাত্মক পরিণতিসূচক নতুন ঘটনাবলি রূপ পরিগ্রহ করে।

আল-মোহেড [আল মুয়াহহিদুন]; মুহম্মদ ইবন তুমার্ত, আল-মাহদী [১১২০ খ্রি.]

৫১৪ হিজরিতে পশ্চিম আফ্রিকার সুসের অধিবাসী ইবন তুমার্ত উপাধিধারী মুহম্মদ নামক এক ব্যক্তি মরিটানিয়াকে বিভক্তকারী বিশাল পবর্তশ্রেণীতে বসবাসকারী বার্বারদের মধ্যে আবির্ভূত হন। তিনি আরব বংশোদ্ভূত হলেও বার্বার গোত্রে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তিনি যৌবনে পূর্বাঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং আল-গাযালি, আবু বকর আত-তারতুশী (তরতোশার অধিবাসী) ও অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট দর্শন ও আইন অধ্যয়ন করেন। জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে নৈতিক শৈথিল্য এবং সাধু ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ লোকের অত্যধিক সম্মান প্রদানে বিরক্ত হয়ে অ্যাটলাস পর্বতের অসভ্য লোকদের মধ্যে ধর্ম সংস্কার সম্পর্কে প্রচার শুরু করেন এবং হযরত পয়গম্বর যে মাহদীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তিনি নিজেকে সেই মাহদী হিসেবে প্রচার করেন ।

আবদুল মোমিন

অচিরেই তাঁর চতুর্দিকে বহু সংখ্যক শিষ্য সমবেত হয়। ইবন তুমার্ত[১] জনৈক ধনী সওদাগরের পুত্র আবদুল মোমিন নামক এক যুবককে তাঁর সহকারী মনোনীত করেন। তাঁর অনুগামী ও শিষ্যরা নিজেদেরকে আল-মুয়াহিদীন বা একেশ্বরবাদী বলে পরিচয় দিত। ক্রমশ একেশ্বরবাদীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অচিরেই তারা এক বিশাল রাজ্য গঠন করে এবং তা মূলত মুরাবিত সাম্রাজ্যের ক্ষতিসাধন করে। যতদিন আলী ইবন তাশফীন জীবিত ছিলেন তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

১১৪৩ খ্রি., আলী ইবন তাশফিনের মৃত্যু; তাঁর পুত্র তাশফিনের উত্তরাধিকার লাভ; ১১৪৫ খ্রি.; তাঁর মৃত্যু

১১৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং উত্তরাধিকার লাভ করেন তাঁর পুত্র তাশফিন। তিনি একেশ্বরবাদীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিহত হন এবং মরক্কোর সাম্রাজ্য আবদুল মোমিনের হাতে চলে যায়।[২] আল-মুরাবিত ও আল-মুওয়াহিদুনের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ স্পেনের খ্রিস্টানদেরকে মুসলিম রাজ্যগুলো লুণ্ঠন করে আরবদের উপর অতি নিষ্ঠুর অত্যাচার চালানোর সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়।

---

[১] তুমার্তের পুত্র আবদুল্লাহ, তাঁর পুত্র আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ প্রথম হাসানের অর্থাৎ ইমাম হাসান (রা.) অধস্তন পুরুষ হিসেবে তিনি হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর।

[২] মুহম্মদ ইবন তুমার্ত তাঁর শিষ্যদের নেতৃত্ব আবদুল মোমিনের হাতে সমর্পণ করে ৫২৪ হিজরিতে (১১৩০ খ্রি.) পরলোকগমন করেন।

সপ্তম আলফনজো

রাজা সপ্তম আলফনজো তাঁর পিতামহ ষষ্ঠ আলফনজোর ন্যায় সম্রাট উপাধি ধারণ করে কর্ডোভা, সেভিল ও কারমোনার প্রাচীর পর্যন্ত অঞ্চলসমূহ ধ্বংস সাধন করেন, জারেস লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করেন এবং গডিক্স (ওয়াদি আশ) পর্যন্ত প্রবেশ করেন। পাঁচ বছর পর তিনি জেন, বেজা, উবেদা ও আনদুজারের উর্বর অঞ্চলগুলোর ক্ষতিসাধন করেন। আন্দালুসীয় মুসলমানরা পুনরায় প্রণালীর অপর পার্শ্বস্থ তাদের সহধর্মী ভাইদের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করে।

১১৪৭ খ্রিস্টাব্দ

৫৪১ হিজরিতে আবদুল মোমিন তাদের সাহায্যার্থে একদল সৈন্য ও একটি নৌবহর পাঠান।[১] তাঁর সেনাপতিগণ খ্রিস্টানদের পরাজিত করে বিতাড়িত করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন ক্ষমতা স্থাপনকারী মুরাবিত শাসনকর্তাদের আধিপত্য খর্ব করেন এবং প্রকৃতপক্ষে আন্দালুসিয়াকে নিয়ে আসেন নিজের শাসনাধীনে। চার বছর পর তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেন এবং প্রদেশগুলোতে তাঁর পুত্রদেরকে শাসনকর্তা হিসেবে[২] নিযুক্ত করেন ।

১১৬০ খ্রিস্টাব্দ; আল-মোহেড সাম্রাজ্য

৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফ্রাঙ্কদের নিকট হতে মাহদীয়া[৩] অধিকার করে আমীরুল মোমেনীন উপাধি গ্রহণ করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ নগর বিজয়ের সাথে সাথে তিনি বার্কার মরুভূমি থেকে পশ্চিম আটলান্টিক পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকার অধিপতি হন।

আবদুল মোমিনের মৃত্যু [১১৬৩ খ্রি.]

তেত্রিশ বছরেরও অধিকাল কৃতিত্বের সহিত রাজত্বের পর ১১৬৩ খ্রিস্টাব্দে আবদুল মোমিন পরলোকগমন করেন। তিনি নীলচক্ষুবিশিষ্ট সুদর্শন, কঠোর, সাহসী, জ্ঞানী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি বিদ্বানের সমাদর করতেন। তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্রই জ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বিশেষ করে স্পেনে। তিনি মরক্কোতে অসংখ্য সরকারি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

আবু ইয়াকুব ইউসূফের সিংহাসনারোহণ

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহম্মদই প্রথমে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন; কিন্তু তাঁর অযোগ্যতা ও অলসতার জন্য সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা তাঁকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থানে মনোনীত করেন তাঁর ভাই আবু ইয়াকুব ইউসূফকে। তিনি ছিলেন উদার ও সদাশয় রাজা এবং তাঁর সিংহাসনারোহণ জনসাধারণের জন্য এক সুখী ও সমৃদ্ধশালী রাজত্ব কালের সূচনা করেছিল। তিনি বহুবার স্পেনে আসেন এবং টারাগোনা ও সান্টারেমসহ বহু নগর পুনরাধিকার করেন।

---

[১] ইবনুল আসির, একাদশ খণ্ড; পৃ. ৭৫।

[২] উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর উত্তরাধিকারী আবু মুহম্মদ আবদুল্লাহর অধীনস্থ হয় বুগিয়া ও তার অধীনস্থ অঞ্চল; আবু হাসান আলীর অধীনে ফেজ এবং আবু সাঈদের সিউটা (সিবতা), আলজিসিরাস (আল জাজিরাত-উল খাজরা সবুজ দ্বীপ), মালাগা ইত্যাদি।

[৩] পূর্বে দ্রষ্টব্য।

তাঁর মৃত্যু [রবিউল আওয়াল, ৫৮০ হি; জুলাই, ১১৮৪ খ্রি.]
আবু ইউসুফ ইয়াকুব, আল-মনসুর বিল্লাহ
ইউসুফ ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর খ্যাতনামা পুত্র ইয়াকুব। তাঁর আমলে আলমোহেড সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। তাঁকে জ্ঞানী ও সর্বগুণে গুণান্বিত শাসকরূপে রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ক্যাস্টিনের নবম আলফনজোর সাথে পাঁচ বছরের জন্য এক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এক সাফল্যজনক যুদ্ধের অবসান ঘটে। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হতে না হতেই ক্যাস্টিলীয় সৈন্যরা পিরেনীজের অপর প্রান্ত থেকে বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা দলবৃদ্ধি করে তাদের সম্মুখস্থ সবকিছু লুণ্ঠন ও হত্যা করে এবং ভয়াবহ অত্যাচার ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে আন্দালুসিয়া আক্রমণ করে।

আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-মনসুর বিল্লা [রজব, ৫৯১ হি; ১১৯৫ খ্রি.]
এই সংবাদ পেয়ে ইয়াকুব আফ্রিকা থেকে ফিরে আসেন। ফ্রাঙ্করা খ্রিস্টান জগতের দূরতম প্রান্ত থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে।

আলারকসের যুদ্ধ [৯ শাবান, ৫৯১ হি; ১৯ জুলাই, ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দ]
বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তারা বাদাজোজের নিকটবর্তী আলারকস (আল আর্ক) নামক স্থানে আল-মুওয়াহিদ রাজাকে আক্রমণ করে।[১] যুদ্ধে তারা এক ভয়াবহ পরাজয় বরণ করে। কথিত আছে, এই যুদ্ধে তাদের এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার সৈন্য নিহত এবং আরও তিরিশ হাজার সৈন্য বন্দি হয়। অবশিষ্ট খ্রিস্টান সৈন্য কালাট্রাভায় পালিয়ে যায় এবং সেখানে তারা দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু ঐ দুর্গও অতর্কিত আক্রমণে অধিকৃত হয়। আলফনজো টলেডোতে পালিয়ে যান এবং সেখানে তিনি আল-মুওয়াহিদ রাজাকে বাধা দেয়ার জন্য আরেকটি বিশাল সৈন্যদল সংগ্রহ করেন; কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি এই যুদ্ধেও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। কালাট্রাভা, গুয়াদালাক্সারা, মাদ্রিদ, এস্কিলোনা, সালামাঙ্কা এবং স্পেন ও পর্তুগালের যেসব নগর ও দুর্গ তাঁর হাতে পড়েছিল সেগুলো পুনরায় বিজিত হয়।

৫৯৩ হি; নভেম্বর, ১১৯৬ খ্রি.
১১৯৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইয়াকুব টলেডো অবরোধ করেন এবং এর অবস্থা চরমে ওঠে। তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে আলফনজোর মা নগর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে নগর রক্ষার জন্য বিজেতার নিকট প্রার্থনা করেন। ইয়াকুব দয়ার্দ্র হয়ে কেবল প্রার্থনাই মঞ্জুর করেননি, বরং যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে মণিমুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদির জমকালো উপঢৌকনসহ তাঁদের বিদায়দান করেন। আরাগনীগণ মাদ্রিদ অবরোধ করছিল কিন্তু তাঁর আগমনে তারা অবিলম্বে পালিয়ে যায়। তিনি মাদ্রিদ উদ্ধার করে সেভিলে ফিরে আসেন। এখানে তিনি এক বছর অবস্থান করে সন্ধিপ্রার্থী খ্রিস্টান রাজাগণ কর্তৃক প্রেরিত দূতদের সাথে শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করে তাদের সন্ধি মঞ্জুর করেন।[২] তিনি আন্দালুসিয়ার শাসনকার্য সম্পর্কেও বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।

---

[১] কেউ কেউ বলেন, এই যুদ্ধ কর্ডোভার উত্তরে কালাত রাবাহ নামক স্থানের নিকটবর্তী মারজউল হাদীদের (লৌহ প্রান্তর) সমভূমিতে সংঘটিত হয়েছিল।

[২] ইবন খালদুন।

স্পেনে প্রত্যাবর্তন [৫৯৪ হি; নভেম্বর, ১১৯৭ খ্রি.]
তাঁর মৃত্যু [২২ রবিউসসানি, ৫৯৫ হি; ফেব্রুয়ারি, ১১৯৯ খ্রি.]

১১৯৭ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে তিনি তাঁর আফ্রিকা রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। ইয়াকুব ছিলেন সালাহউদ্দীনের সমসাময়িক এবং এশিয়ার এই বিখ্যাত নরপতি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁর নিকটেই ভ্রাতুষ্পুত্র আমীর উসামাকে দূতস্বরূপ প্রেরণ করেন। ইয়াকুব ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক। একজন প্রবীন লেখক বলেন, তিনি বিদ্বান ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, কারণ তিনি নিজেই ছিলেন একজন পণ্ডিত। তিনি ধর্ম ও শিষ্টাচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন গুণী ও ধার্মিক। তাঁর সৈন্যবাহিনী ছিল সুশৃখলবদ্ধ এবং কঠোর শাসনাধীন। তাঁর শাসন ছিল দৃঢ় ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি তাঁর রাজ্যের প্রত্যেক নগরে হাসপাতাল ও আতুরাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। সেখানে পীড়িত ও অসুস্থ লোকেরা চিকিৎসালাভ করত এবং দরিদ্র ও আতুরদের ভরণপোষণ ও তত্ত্বাবধান করা হত। বিখ্যাত চিকিৎসক আভেনজোর (ইবন জুহর) ও আভেনপেস (ইবন রাজা) তাঁর রাজত্বকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তদ্রূপ কর্ডোভার কাজীর পদাধিকারী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আভিরাস[১] (ইবন রুশদ) ঐ সময়েই আবির্ভূত হন। আব্বাসীয় বংশের রশীদ ও মামুন এবং স্পেনের উমাইয়া রাষ্ট্রনায়কদের মত তিনি দেশের জলসেচ এবং সওদাগর ও পথিকদের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন এবং তাঁর সাম্রাজ্যের নগরগুলোকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দিয়ে সুশোভিত করেন। সেভিলের যে বিখ্যাত মানমন্দিরটি এক্ষণে গিরাল্ডা নামে অভিহিত তা তিনি আলারকসের যুদ্ধের পর নির্মাণ করেন।[২]

মুহম্মদ আন-নাসির লি দীনিল্লাহ

ইয়াকুব আল মনসুরের পর তাঁর পুত্র মুহম্মদ তৃতীয় আবদুর রহমানের মত আন-নাসির লি দীনিল্লাহ[৩] উপাধি ধারণ করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আন-নাসির চরিত্রে ও যোগ্যতায় তাঁর পিতার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন। আমোদপ্রিয় ও অযোগ্য বলে তিনি আল-মুওয়াহিদ সাম্রাজ্য এবং সেই সাথে স্পেনে আরব স্বার্থ ধ্বংসের মূল কারণ হয়ে ওঠেন।

ইয়াকুব আল-মনসুরের মৃত্যু খ্রিস্টানদের জন্য পুনরায় আন্দালুসিয়া আক্রমণ করার সঙ্কেত স্বরূপ হয়। ক্যাস্টিলের নবম আলফনজো (ইবন আদফুনশ) পুনরায় তাঁর সৈন্যদল দ্বারা সেভিল ও কর্ডোভার চতুর্দিক ছেয়ে ফেলেন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা ঐ অঞ্চলকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন। প্রজাদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে আন-নাসির এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সিউটা (সিবতা) থেকে চলে আসেন। সেভিলে পৌঁছানোর কিছুদিন পরই তিনি কালাতরাভার (কালাত রাবাহ) শাসনকর্তা ইউসুফ ইবন কাদিসকে নগর আলফনজো ছেড়ে দেয়ার জন্য হত্যা করেন। এই কর্মচারীকে আন্দালুসীয় মুসলমানরা অতিশয় শ্রদ্ধা করায় তাঁর হত্যা তাদের মধ্যে কেবল তীব্র অসন্তোষই সৃষ্টি করেনি, বরং তারা দলত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যায়। আন-

---

[১] মনে হয়, ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে গোঁড়া লোকেরা অভিরোসের নাস্তিকতাপূর্ণ ধারণা সম্পর্কে আল-মুওয়াহিদ সুলতানের কাছে অভিযোগ করে, যার ফলে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়, কিন্তু শীঘ্রই তিনি মুক্ত হয়ে পূর্ব অনুগ্রহ লাভ করেন।

[২] স্পেনীয় খ্রিস্টানরা এটিকে ঘণ্টা ঘরে পরিণত করে।

[৩] আল্লাহর ধর্মের সাহায্যকারী।

নাসিরের সমরায়োজনের সংবাদে খ্রিস্টান জাতিগুলোর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। যেসব দুঃসাহসী দল ক্রুসেডার নাম গ্রহণ করে প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া লুণ্ঠন করেছিল তারা বিজয়ী সালাহউদ্দীন কর্তৃক এশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে স্পেনে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট একটি ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং টলেডোর আর্চবিশপ রোডারিকুয়েজ পোপের সাহায্য প্রার্থনা করতে রোমে গিয়েছেলেন। তিনি সর্বত্র আরবদের বিরুদ্ধে একটি পবিত্র যুদ্ধের কথা প্রচার করেন। ক্যাস্টিল, আরাগন, পর্তুগাল, লিঁও ও নেভারের রাজাগণ ফ্রান্স, ইতালি ও জার্মানি থেকে আগত একদল ক্রুসেডারের সাথে মিলিত হয়ে আল-মুওয়াহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

আল আকারের যুদ্ধ [২৯ সফর, ৬০৯ হি.; জুলাই, ১২১২ খ্রি.]
আরবদের দ্বারা আল উকাব এবং স্পেনীয়দের দ্বারা লাস নাভাস দ্য টলোসা নামে অভিহিত একটি স্থানে দুই বাহিনী মিলিত হয়। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায় আন্দালুসীয় বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে এবং অবশিষ্টরা শত্রুদলে যোগ দেয়। আফ্রিকানরা বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু সংখ্যাধিক্যে অভিভূত হয়ে নিঃশেষে প্রত্যেক সৈন্য ধ্বংস হয়। আন-নাসিরকে বহু কষ্টে বিপদাস্থল ত্যাগ করতে প্রবৃত্ত করানো হয়।

আন-নাসিরের মৃত্যু [৬১১ হি; মে, ১২১৪ খ্রি.]
সেভিল থেকে তিনি মরক্কোতে গমন করেন। কথিত আছে, সেখানে তিনি শোক ও লজ্জায় ১২১৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইউসুফ আল-মুসতানসির বিল্লাহ ; তাঁর মৃত্যু [৬২০ হি.; ১২২৩ খ্রি.]
আবদুল ওয়াহিদের সিংহাসনারোহন; তাঁর হত্যা [৬২১ হি.; ১২২৪ খ্রি.] আবুল মুহম্মদ আল-আদিলের সিংহাসনারোহণ [৬২৪ হি.; ১২২৭ খ্রি.]
মুওয়াহিদীন খিলাফতের সিংহাসনে নাসিরের স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র ইউসুফ। তিনি আল-মুসতানসির বিল্লাহ[১] উপাধি গ্রহণ করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর এবং স্বভাবতই সকল ক্ষমতা মুওয়াহিদীন শায়খদের হাতে চলে যায়। ১২২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করলে সিদ[২] আবু মুহম্মদ আবদুল ওয়াহিদকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। তাঁর শাসনকালে স্পেনের আমীর ও শাসনকর্তারা কার্যত স্বাধীন হয়ে ওঠেন। পরের বছর আবদুল ওয়াহিদ ঘাতকের হাতে নিহত হলে আল-মুওয়াহিদরা আল-মনসুরের জনৈক পুত্র আবু মুহম্মদেক আল-আদিল উপাধি দিয়ে তাদের রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন করে। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে আল-আদিলের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা নিহত হন। অতঃপর তাঁর ভাই সেভিলের শাসনকর্তা ইদ্রিস আল-মামুন উপাধি গ্রহণ করে নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু মুরসিয়া ও পূর্ব আন্দালুসিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল ইবন হুদের[৩] নেতৃত্বে তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। ক্যস্টিলের রাজা কর্তৃক প্রেরিত কিছু সংখ্যক খ্রিস্টান সাহায্যকারী

---

[১] যিনি আল্লাহর নিকট সাহায্যপ্রার্থী।

[২] সকল আলমোহেড সর্দার সিদ (সাঈয়েদ) উপাধি ধারণ করতেন, এ থেকেই স্পেনীয় (Cid) শব্দের উদ্ভব, যে সিডের (Cid) নামে প্রচুর রোমাঞ্চকর আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে । তিনি একজন দলত্যাগী ও সাধারণ দস্যু।

[৩] মুহম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন হুদ।

নিয়ে মামুন ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকা গমন করেন।[১] তাঁর স্পেন ত্যাগ সেভিলে বিদ্রোহের সঙ্কেত প্রদান করে। সেভিল আল-মুওয়াহিদের অধীনতা পাশ ছিন্ন হয়ে ইবন হুদের বশ্যতা স্বীকার করে। ইবন হুদ এভাবে আন্দালুসিয়ার অধিকাংশ অংশের প্রভু হয়ে ওঠেন। বিক্ষুব্ধ জনতার দ্বারা আলমোহেডরা বিতাড়িত কিংবা নিহত হয়। কিন্তু ইবন হুদই[২] মুওয়াহিদীন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকারী একমাত্র স্পেনীয় আরব ছিলেন না।

মুহম্মদ ইবনুল আহমারের অভ্যুত্থান

জাইয়ান (আবু জামিল)[৩] ভ্যালেনসিয়ার রাজা উপাধি গ্রহণ করেন; অন্যদিকে সচরাচর ইবনুল আহমার নামে পরিচিত মুহম্মদ ইবন ইউসূফ আর্জোনার[৪] নগর ও দুর্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজকীয় মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষাকারীদের মধ্যে ইবনুল আহমারই সবচেয়ে সফলকাম বলে প্রতিপন্ন হয়। কারণ তিনি এমন এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী আড়াই শতাব্দী যাবৎ আরব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ইবন খালদুন গ্রানাডায় ইবনুল আহমারের এক উত্তরাধীকারীর দরবারে অবস্থান করেছিলেন। তিনি এই বিখ্যাত দুঃসাহসিক বীরের দ্রুত উত্থানের কথা বর্ণনা করেছেন।[৫] তাঁর পূর্বপুরুষগণ বনু নসর নামে স্পেনে বহুদিন ধরে বসবাস করছিলেন এবং উমাইয়া খলিফাদের অধীনে তাঁরা জুন্দ বা সৈন্যবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করেছিলেন। এই সময় সচরাচর 'শায়খ' নামে আখ্যাত মুহম্মদ ছিলেন বনু নসরের দলপতি এবং যোগ্যতাবলে স্বগোত্রীয়দের মধ্যে তিনি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। যে সময় মুওয়াহিদীনদের সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হচ্ছিল, তাঁদের শাসনকার্য হয়ে পড়েছিল দুর্বল এবং দলপতিরা তাঁদের দুর্গগুলো শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছিলেন, তখন ইবনুল আহমার সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন।[৬]

৬২৯ হিজরি; ১২৩১ খ্রিস্টাব্দ

ইবন খালদুন আরও বলেন, সমগ্র আন্দালুসিয়া এবার গৃহযুদ্ধের যোগ্য ক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং ক্যাস্টিলীয়গণ আরব নেতাদের বিভেদ ও ন্যায়ভ্রষ্টতার সুযোগ গ্রহণে ত্রুটি করে না। তারা একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এবং একে একে প্রত্যেকেই ধ্বংস করে। ইবনুল আহমার তাঁর রাজত্বের প্রথম ভাগে ইবন হুদের বিরুদ্ধে

---

[১] মরক্কো বিজয়ের পর (৬২৬ হিজরি, ১২২৮ খ্রিস্টাব্দ) আল-মামুন মুওয়াহিদীনদের সব বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো রহিত করে দেন। ১২৪২ খ্রিস্টাব্দে (৬৪০ হিজরি) তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর ভাই আস-সাঈদ, যিনি দু'বছর পর নিহত হলে আবদুল মোমিনের আরেক বংশধর উমরকে মুর্তজা বিল্লাহ (আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত) উপাধি দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। মুর্তজা ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে ওয়াসিক (আবু দাবুস) কর্তৃক নিহত হন। ১২৬৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়াসিক স্বয়ং বানু মারীন নামক বার্বার গোত্রের সাথে যুদ্ধে নিহত হলে সমগ্র মরিটানিয়া তাদের শাসনাধীন হয়।

[২] তিনি আল মুতাওয়াক্কিল উপাধি ধারণ করেন।

[৩] মারদানিশের (মার্টিনাস) বংশধর, যিনি ইউসূফ ইবন তাশফিন কর্তৃক বাদাজোজের অধিপতির পদ থেকে অপসারিত হয়েছিলেন।

[৪] কর্ডোভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত।

[৫] তিনি ছিলেন রসুলুল্লাহর (স.) সময়ের খাসারাজ গোত্রের নেতা (সাইয়িদ) সা'দ ইবন উবাদার বংশধর। তদনুসারে বনু নসর আল-আনসারী ও আল খাসরাজী উপাধি ধারণ করেছিলেন (আনসার ও খাসরাজ গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত)।

[৬] ইবন খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭০। সামন্তপ্রভুদের বলা হত আসহাবউল মা'কাল দুর্গাধিপতি।

সাহায্য প্রাপ্তির উদ্দেশে ক্যাস্টিলের রাজার[১] সাথে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। অন্যদিকে ইবন হুদ ইবনুল আহমারের বিরুদ্ধে অনুরূপ সাহায্যের জন্য খ্রিস্টান রাজাকে ত্রিশটি দুর্গ ছেড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এভাবে সংঘর্ষ চলতে থাকে।

ক্যাস্টিলীয়গণ কর্তৃক কর্ডোভা ও ভ্যালেনসিয়া দখল

১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যাস্টিলীয়গণ কর্ডোভা দখল করে, দুই বছর পর ভ্যালেনসিয়াও[২] তাদের করতলগত হয়। ১২৩৯ খ্রিস্টাব্দে আসিরা এবং ১২৪৬ খ্রিস্টাব্দে মুবসিয়া দখল করে অবশেষে তারা জাইয়ানকে তিউনিসে বিতাড়িত করে। ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে পনের মাসের দীর্ঘ প্রবল অবরোধের পর সেভিলও[৩] তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

ক্যাস্টিলীয়গণ যখন এভাবে ইবনুল আহমারের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধ্বংসসাধন করছিল তখন তিনি জারেস, জেন, গ্রানাডা, মালাগা ও আলমেরিয়া দখলের উপায় উদ্ভাবন করতে থাকেন এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের কৌশল ও দক্ষতার সমন্বয়ে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র ও সঙ্কুচিত রাজ্যে ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন। পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে এই রাজ্যকে খ্রিস্টান স্পেন, পর্তুগাল ও তাদের সহকারী পিরেনীজের অপর পাশ থেকে দল পরম্পরাগত ক্রুসেডারদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে বার বার রুখে দাঁড়াতে হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই এটি ছিল অসম শক্তির দ্বন্দ্ব এবং ইবনুল আহমারের রাজ্যের চূড়ান্ত ধ্বংস শুধু সময়ের প্রশ্ন নিয়েই বিদ্যমান ছিল, তবুও শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধ বীরত্বের সাথেই চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আল-গালিব বিল্লাহ্ উপাধি ধারণ : আলহামব্র প্রাসাদ

গ্রানাডা বিজয়ের পর ইবনুল আহমার এখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করে আল-গালিব বিল্লাহ[৪] উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি নিজের জন্য এখানে বিখ্যাত দুর্গ ও প্রাসাদ আলহামব্র (আল-হামরা)[৫] নির্মাণ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ এটিকে সম্প্রসারিত এবং আরও সুষমামণ্ডিত করেন।

মরিটানিয়ার মারিনীয় নরপতিদের সাথে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব বজায় রাখাই ছিল ইবনুল আহমারের মূলনীতি এবং এ জন্যই রাজ্যের মসজিদগুলোতে খুৎবায় তাঁর নামের সাথে তাঁদের নামও যুক্ত করা হত। ৬৬০ হিজরিতে (১২৬১ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর ও তাঁর মিত্র ক্যাস্টিলের খ্রিস্টান রাজার মধ্যে যুদ্ধ বাধে; ক্যাস্টিল রাজ গ্রানাডা আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত ও বিতাড়িত হন।

---

[১] তৃতীয় ফার্দিনান্দ।

[২] আরাগণের রাজা জায়মের (জ্যাকমেক) নিকট নগরটি আত্মসমর্পণ করেছিল।

[৩] বিগত দু'বছর ধরে সেভিল ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি সাধারণতন্ত্র, আবু ফারিস ইবন আবু হাফসের সভাপতিত্বে যার শাসনকার্য ন্যস্ত ছিল পাঁচ সদস্যের মন্ত্রণা সভার হাতে। ইবনুল আহমার সেভিল অবরোধে ফার্দিনান্দের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন, সেইসঙ্গে কারমোনা ও অন্যান্য স্থান অধিকারেও।

[৪] আল্লাহর (কৃপায়) বিজয়ী।

[৫] লাল প্রাসাদ। পরে দ্রষ্টব্য।

ইবনুল আহমারের মৃত্যু [২৯ জমাদিউস সানি, ৬৭১ হি.; ২৪ সেপ্টেম্বর, ১২৭২ খ্রি.;] আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ (দ্বিতীয়) আল-ফকীহের সিংহাসনারোহন [১২৯৫ খ্রি.]; তাঁর মৃত্যু [৭০১ হি.; এপ্রিল, ১৩০২ খ্রি.]

ইবনুল আহমার ১২৭২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ। তিনি নিজে বিদ্বান ও আইনজ্ঞ[১] হওয়ায় জ্ঞান-সাধনার বিরাট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দে ক্যাস্টিলীয়গণ পুনরায় আরবদের দ্বারা ডন নুনো (নুনো গঞ্জালেজ দ্য লরা) নামে অভিহিত সেনাপতির নেতৃত্বে গ্রানাডা আক্রমণ করে, কিন্তু মারিনীয় নরপতির[২] সাহায্যে মুহম্মদ তাদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ঐ যুদ্ধে ক্যাস্টিল রাজ প্রাণ হারান। এগার বছর পর ক্রাস্টিলবাসী ও আবরদের মধ্যে নতুন করে যুদ্ধ বাধে, যা শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং তাতে মুহম্মদ একইভাবে সফল হন। তিরিশ বছরেরও অধিককালব্যাপী গৌরবময় রাজত্বের পর তিনি ১৩০২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

তৃতীয় আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদের সিংহাসনারোহণ; তাঁর সিংহাসন ত্যাগ; নাসরের সিংহসনারোহণ; তাঁর সিংহাসন ত্যাগ [৭১৩ হি; ১৩১৪ খ্রি.]; আবুল ওয়ালিদ ইসমাঈলের সিংহাসনারোহণ [৭১৩ হি.]; এলভিরার যুদ্ধ [৭১৬ হি. ১২ মে, ১৩১৯ খ্রি.] ক্যাস্টিলীয় সৈন্যবাহিনীর ধ্বংস সাধন

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র একই নামে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার সাথে রাজত্ব করেন, তারপর তাঁর ভাই নাসরের এক বিদ্রোহের ফলে তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। নাসর দুর্ভাগা রাজা বলে প্রতিপন্ন হন। সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ক্যাস্টিল ও আরাগনের শাসকগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং কেবল বাৎসরিক কর দানে সম্মত হয়ে তিনি তাঁদেরকে বিদায় করতে সমর্থ হন। ১৩১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইবনুল আহমারের ভাই ইসমাঈলের পুত্র ইসমাঈলের[৩] অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যাস্টিলবাসীরা তাঁর নিকট হতে কয়েকটি নগর অধিকার করে নেয়। যদিও তিন বছর পর তিনি এলভিরায়[৪] তাদেরকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরাজিত করতে সমর্থ হন। ১৩১৯ খ্রিস্টাব্দে ক্যাস্টিলরাজ তাঁর পুত্র পেড্রোর (ডন বেট্রোহ) নেতৃত্বে শেষবারের মত গ্রানাডা দখলের জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। যুবরাজের সাথে পঁচিশ জন রাজপুত্র ছিলেন, তার মধ্যে একজন ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজপুত্র, যিনি একদল ইংরেজ সৈন্য নিয়ে ক্যাস্টিলবাসীদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। ডন পেড্রোসহ তাঁদের সকলেই যুদ্ধে নিহত হন।

ইসমাঈলের হত্যা [২৭ রজব, ৭২৫ হি; ১৮ জুলাই, ১৩২৫ খ্রি.]; চতুর্থ আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ; আবুল হাজ্জাজ ইউসূফ [৭৩৩ হি; আগস্ট, ১৩৩৩ খ্রি.]

১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে ইসমাঈল ঘাতকের হাতে নিহত হলে তাঁর পুত্র আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তেজস্বী ও সফল শাসক রূপে নিজেকে প্রমাণিত করেন। যে জিব্রাল্টার ইতিপূর্বে খ্রিস্টানদের দখলে চলে গেছিল, ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে তা তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। দুর্গ পরিদর্শন করে প্রত্যাবর্তনকালে সুলতান মুহম্মদ পর্বতের পিছনে লুক্কায়িত একদল গুপ্তঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর ভাই আবুল হাজ্জাজ ইউসূফ। তিনি ছিলেন বনু নাসর রাজবংশের

---

[১] তিনি আল ফকিহ বা আইনজ্ঞ উপাধি লাভ করেছিলেন।

[২] ইয়াকুব ইবন আবদুল হক ও তাঁর পুত্র ইউসূফ– এই দু'জন ছিলেন এই রাজবংশের সবচেয়ে শক্তিশালী নরপতি।

[৩] তাঁর পূর্ণ নাম আবুল ওয়ালিদ ইসমাঈল ইবন ফারাজ ইবন ইসমাঈল।

[৪] আরবদের আল বিরা, রোমকদের ইলিবিরিস।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও উদার শাসনে রাজ্যের সমৃদ্ধি সাধিত হয় এবং জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। পূর্বপুরুষদের মত তিনিও ছিলেন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আগ্রহী পৃষ্ঠপোষক।

তাঁর হত্যা [৭৫৫ হি; ১৩৫৪ খ্রি.]; মুহম্মদ আল গণি বিল্লাহর সিংহাসনারোহণ
আন্দালুসিয়ার মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে তাঁর রাজত্বকাল বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ রাজপ্রাসাদের মসজিদে প্রার্থনারত অবস্থায় তিনি এক উন্মাদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তাঁর পুত্র আল গণি বিল্লাহ[১] উপাধি গ্রহণ করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আল গণি ছিলেন সাংস্কৃতিক রুচিসম্পন্ন ও সুপণ্ডিত রাষ্ট্রনায়ক এবং তিনি তাঁর রাজ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় উৎসাহদান ও উন্নতি বিধান করেছিলেন। লিসানুদ্দিন বা ধর্মের রসনা উপাধিপ্রাপ্ত বনু নাসর বংশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক[২] ইবনুল খাতিব ছিলেন তাঁর উজির।

ইসমাঈল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত [১৩৫৯ খ্রি.]
রাজধানীতে সাময়িকভাবে অনুপস্থিতির সময় আল গণি তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই ইসমাঈল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। আলী গণি তখন আফ্রিকায় চলে যান এবং ফেজ নামক স্থানে অবস্থান করেন।

আবু সাঈদের বিদ্রোহ [১৩৬০ খ্রি.]
ইসমাঈল তাঁর অসদোপার্জিত ক্ষমতা বেশিদিন ধরে রাখতে পারেননি। কারণ আবু সাঈদের নেতৃত্বে এক বিদ্রোহে তিনি নিহত হন; আবু সাঈদকে আবদুল্লাহ মুহম্মদও বলা হত।

আবু সাঈদের হত্যা [১৩৬২ খ্রি.]
দু'বছর পর আবু সাঈদ ক্যাস্টিলের রাজার কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তিনি তাঁকে ধন-সম্পদের লোভে হত্যা করেন।

আল-গণির পুনর্বহাল [৭৬৫ হি; ১৩৬৪ খ্রি.]
আবু সাঈদের মৃত্যুর পর আল গণি গ্রানাডায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে চঞ্চলচিত্ত জনসাধারণ কর্তৃক সংবর্ধিত হন। তাঁর অবশিষ্ট রাজত্বকাল নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হয় এবং যে কৌশল ও দক্ষতা সহকারে তিনি ক্যাস্টলবাসীদের সাথে শান্তি রক্ষা করে চলছিলেন তাতে রাজ্যে সম্পদ ও সমৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি পায়। গ্রানাডায় শিল্প ও কলাবিদ্যার পূর্বাবস্থা ফিরে আসে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে লেভান্ট (ভূমধ্য সাগরের পূর্ব উপকূল) ও দূর প্রাচ্যের ঐশ্বর্যসম্ভার এর দ্বারপ্রান্তে আনীত হয়। অসংখ্য নতুন সেচ ব্যবস্থার দ্বারা ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

আল গণির মৃত্যু [৭৯৩ হি; ১৩৯১ খ্রি.]; দ্বিতীয় ইউসুফ
১৩৯১ খ্রিস্টাব্দে সর্বজনীন শোক প্রকাশের মধ্যে আল-গণির মৃত্যু ঘটলে তাঁর পুত্র আবু আবদুল্লাহ ইউসুফ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর রাজত্বকাল সৌভাগ্যজনক হয়নি। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ইচ্ছুক হয়ে তিনি ক্যাস্টিলবাসীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আধুনিককালেও যেমন প্রায়শই ঘটে থাকে, সেই সময়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। গণবিক্ষোভের ফলে তিনি একটি যুদ্ধে যোগদান

---

[১] আল্লাহর কৃপায় ধনবান।

[২] তাঁর ইতিহাসের নাম 'তারিখ দাওলাতুন নাসরিয়াহ'। তিনি ছিলেন আবরদের মন্টেস্কী ইবন খালদুনের সমসাময়িক ও বন্ধু। উপসংহার দেখুন।

করলেও শেষ পর্যন্ত তাতে সফল হননি। কিন্তু গ্রানাডাবাসীদের উত্তেজনা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ফলে ইউসুফ ক্যাস্টিলের বালক রাজা তৃতীয় হেনরীর সাথে অনুকূল শর্তে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে সমর্থ হন।

দ্বিতীয় ইউসুফের মৃত্যু [৭৯৯ হি; ১৩৯৬ খ্রি.]; ষষ্ঠ মুহম্মদ

দ্বিতীয় ইউসুফের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামও ছিল ইউসুফ। তিনি প্রতিভা ও বহু গুণের অধিকারী ছিলেন বলে ইউসুফ তাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন; কিন্তু ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে সিংহাসন দখল করেন অনুজ মুহম্মদ। তিনি তাঁর অগ্রজকে স্যালোব্রেনা দুর্গে বন্দি করে রাখেন। ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে ক্যাস্টিলীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী গ্রানাডা রাজ্য আক্রমণ করে। তাদের রাজার কাছে এর প্রতিকার না চেয়ে মুহম্মদ নিজের হাতেই তাদের শাস্তি বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর ফলে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে দুই পক্ষেরই প্রায় সমান সমান ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

ষষ্ঠ মুহম্মদের মৃত্যু [৮১১ হি; ১৪০৮ খ্রি.]; তৃতীয় আবু আবদুল্লাহ ইউসুফের সিংহাসনারোহণ

১৪০৮ খ্রিস্টাব্দে ষষ্ঠ মুহম্মদের মৃত্যু হলে সীদ ইউসুফকে কারাগার থেকে বের করে এনে তাঁকে রাজা ঘোষণা করা হয়। ইউসুফ প্রথম মনোযোগ দেন ক্যাস্টিলবাসীদের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ দীর্ঘ করতে। দুই বছর পর দুই জাতির মধ্যে নতুন করে যুদ্ধ বাধে, যা শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত থেকে যায় এবং স্বল্পকাল যুদ্ধ বিরতির পর একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি ইউসুফের সমগ্র জীবনকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই সময় তৃতীয় হেনরীর শিশু পুত্র তাঁর মায়ের অভিভাবকত্বে ক্যাস্টিলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ক্যাস্টিলীয় রাণী আরব রাষ্ট্রনায়ককে অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন এবং দু'জনের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। প্রতি বছর তাঁরা একে অপরকে মূল্যবান উপহার সামগ্রী পাঠাতেন এবং তাঁদের মধ্যে চলতো হৃদ্যতাপূর্ণ ও প্রাণবন্ত পত্রালাপ। ক্যাস্টিলীয় ও আরাগনী অশ্বারোহীরা নিজেদের সরকারের আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রায়শই ইউসুফের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করত। আত্মসম্মানের প্রশ্ন মীমাংসার জন্য অনেকেই গ্রানাডায় এসে অবধারিতভাবেই বিষয়টি তাঁর সালিশীতে পেশ করতেন; আর এ নিয়ে লড়াই বাধার উপক্রম হলে তিনি প্রায়শই যুদ্ধ থামাতে এবং বিবাদমান দলগুলোর মধ্যে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনতে হস্তক্ষেপ করতেন। তাঁর হৃদয়ের দয়া, ন্যায়পরায়ণতা, বদান্যতা ও সদগুণ তাঁকে দেশী ও বিদেশী লোকদের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তাঁর রাজত্বকালে ক্যাস্টিলবাসী ও আরবদের মধ্যে যে ঐক্য বিরাজিত ছিল তার ফলে আরবরা আংশিকভাবে তাদের ক্ষতিপূরণ করতে এবং সুখ-শান্তি উপভোগ করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি।

তৃতীয় ইউসুফের মৃত্যু [৮২৭ হি; ১৪২৩ খ্রি.]
সপ্তম মুহম্মদের (আল কায়সার) সিংহাসনারোহণ

পনের বছর রাজত্বের পর সমগ্র প্রজামণ্ডলীর অকৃত্রিম শোকানুভূতি জাগিয়ে এই মহান রাজা পরলোকগমন করেন। তাঁর সাথে সাথে গ্রানাডার সুখের দিন শেষ হয়। তাঁর পুত্র মুহম্মদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তার ডাকনাম ছিল আল কায়সার বা ন্যাটা। তিনি গর্বিত ও বিষণ্ন প্রকৃতির বলেই অচিরেই গ্রানাডাবাসীদের কাছে নিজেকে অত্যন্ত অপ্রিয় করে তোলেন। তিনি গ্রানাডাবাসীদের অতি প্রিয় ক্রীড়ানুষ্ঠান ও সাধারণ আমোদ-প্রমোদ বন্ধ করে দেন এবং আমোদপ্রিয় লোকদের নিতান্ত অপ্রিয় বিভিন্ন বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এর প্রজারা অকস্মাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং তাঁকে রাজধানী থেকে বিতাড়িত করে।

ইউসূফ আল-আহামারি [৮৩৬ হি; ১৪৩২ খ্রি.]
পুনরায় আহূত হয়ে তিনি আবার বিতাড়িত হন এবং ইউসূফ নামক রাজপরিবারভুক্ত জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ক্যাস্টিলের রাজা দ্বিতীয় জনের[১] সহায়তায় সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু কয়েক মাস পরই ইউসূফের মৃত্যু হলে সপ্তম মুহম্মদ পুনরায় তাঁর রাজ্য উদ্ধার করেন। ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে ক্যাস্টিলবাসীগণ গ্রানাডা আক্রমণ করে। তারা আর্কিডোনা প্রাচীরের পাদদেশে এক যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করলেও গডিক্স (ওয়াদি আশ) অঞ্চলের অধিকাংশ ও মূল গ্রানাডা ধ্বংস করে দেয়।

৮৪৮ হিজরি; ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দ
১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ শেষবারের মত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইবনুল আহনাফ (মুহম্মদ নামেও অভিহিত) কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। জনসাধারণ তাঁর পারিতোষিকে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রাজা বলে স্বীকার করে। কিন্তু বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ক্যাস্টিলে আশ্রয় নিয়ে দ্বিতীয় জনের নিকট পূর্বে আশ্রয় গ্রহণকারী ইবনুল আহনাফের জনৈক পিতৃব্য পুত্র ইবন ইসমাঈল[২] নামে অভিহিত সাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। বহু সংখ্যক ক্যাস্টিলবাসী ও অসন্তুষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে ইবন ইসমাঈল গ্রানাডা আক্রমণ করেন এবং পাঁচ বছর ধরে আরবগণ নিষ্ঠুর ও রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত থাকে।

ইবন ইসমাঈলের সিংহাসনারোহণ [৮৫৯ হি; ১৪৫৪ খ্রি.]
১৪৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইবনুল আহনাফ শেষবারের মত পরাজিত হন এবং ইবন ইসমাঈল নিজেকে বনু আহমারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রথম ইচ্ছা ক্যাস্টিলের রাজা চতুর্থ হেনরীর নিকট দূত ও উপঢৌকন পাঠিয়ে শান্তি চুক্তির নবায়ন লাভ করা। কিন্তু ক্যাস্টিল রাজ তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে গ্রানাডা আক্রমণ করেন। এই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ কয়েক বছর স্থায়ী হয় এবং আরবগণ স্পেনবাসী খ্রিস্টানদের লুণ্ঠনে শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয়, নির্মমভাবে বিনিষ্ট হয় ক্ষেত-খামার, সুদৃশ্য প্রাসাদ ও অট্টালিকা এবং জমির উর্বরাশক্তিবর্ধক সেচ ব্যবস্থা অপূরণীয়ভাবে ধ্বংস হয়। এই প্রকার যুদ্ধে সার্বিকভাবে খ্রিস্টানদেরই সুবিধা হয়েছিল। কারণ আরবদের যুদ্ধজয়ও তাদের জন্য ফলপ্রসূ হত না; ক্যাস্টিলীয়দের লোকবসতির কেন্দ্রগুলো ছিল বহু দূরে। অপরপক্ষে গ্রানাডা রাজ্য এক্ষণে সমুদ্র, এলভিরা পর্বতমালা ও আল-পুজ্জারাস (আল বুশরাত)[৩] পর্বত শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ক্রাস্টিলবাসীরা অতর্কিত আক্রমণ করে আর্কিডোনা ও জিব্রাল্টার অধিকার দখল করে নেয়। এই সকল বিপদের কারণে ইবন ইসমাঈলের মনোবল ভেঙে যায়। তিনি বুঝতে পারলেন যে, যুদ্ধ আরও চলতে থাকলে রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। তদনুসারে তিনি শান্তি স্থাপনের জন্য সকল স্বার্থ ত্যাগ করেন।

৮৬৮ হিজরি; ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দ
তিনি চতুর্থ হেনরীকে তাঁর উর্ধ্বতন প্রভু বলে স্বীকার করেন এবং তাঁকে বাৎসরিক বারো হাজার স্বর্ণমুদ্রা কর দিতে সম্মত হন। গ্রানাডার পার্শ্ববর্তী স্থানে উভয় রাজার পারস্পরিক সাক্ষাতে এই সন্ধি অনুমোদিত হয় ।

ইবন ইসমাঈলের মৃত্যু [৮৭১ হি; ১৪৬৬ খ্রি.]
১৪৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইবন ইসমাঈলের মৃত্যু পর্যন্ত এই শান্তি চুক্তি স্থায়ী হয়েছিল ।

---

[১] জবর দখলকারী প্রকাশ্যে নিজেকে ক্যাস্টিল রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত রাজা বলে স্বীকার করেছিলেন।

[২] সুলতান দ্বিতীয় ইউসূফের পুত্র। তাঁর পুত্র আমীর আলীর ঔরসজাত।

[৩] আল বুশারাত উপত্যকা ছিল অত্যন্ত উর্বর এবং এই অঞ্চলের পরিশ্রমী ও যুদ্ধপ্রিয় অধিবাসীদের মেষ ও গবাদি, দ্রাক্ষা, কমলালেবু, ডালিম, জামীর ও তুঁত গাছ রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল।

অধ্যায়-৩০
স্পেনের আরবগণ [পূর্বানুবৃত্তি]
[৮৭১-১০১৬ হিজরি; ১৪৬৬-১৬১০ খ্রিস্টাব্দ]

শেষ যুদ্ধ : গ্রানাডা অবরোধ : আত্মসমর্পণ : ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার বিশ্বাসঘাতকতা : স্পেনীয় মুসলমানদের উপর নির্যাতন : শেষ বিতাড়ন : স্পেনের ক্ষতি

আবুল হাসান আলীর সিংহাসনারোহণ

ইবন ইসমাঈলের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল হাসান[১] উপাধিধারী আলী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন সাহসী, বীর ও প্রতিভাবান ব্যক্তি; জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন পেলে তনি সম্ভবত পূর্বসূরিদের গৌরবের সমকক্ষতা লাভ করতে পারতেন এবং তাঁর রাজ্যকেও রাখতেন অক্ষত; কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন জাতি নিয়ে সম্মুখস্থ কাজ সমাধা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিজের উগ্র হঠকারিতা ও পুত্রের বিদ্রোহের ফলে রাজ্যের ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়।

ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা [১৪৬৯ খ্রি.]

১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার পরিণয় ক্যাস্টিল, আরাগণ ও লিঁওর সৈন্যদলকে একই সাধারণ পতাকাতলে সমবেত করে। উভয়েই ছিলেন একইরূপ ধর্মান্ধ, উভয়েই মনে করতেন বিশ্বাসী ও বিধর্মীদের অগ্নিদগ্ধ বা হত্যা করা তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্য, উভয়েই স্পেনে সভ্যতার শেষ চিহ্নের বিলুপ্তি ঘটাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এইজন্য তাঁদের উভয়ের অনুরোধক্রমে এবং রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য আবুল হাসানের সাথে যে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তার মেয়াদ উত্তীর্ণের জন্য তাঁরা অধিক আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু গ্রানাডার রাজা তাঁর পিতা কর্তৃক অঙ্গিকারকৃত কর দিতে ঔদ্ধত্যের সাথে অস্বীকার করায় ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার মধ্যে তিক্ততা দেখা দেয়।[২]

জাহারা অধিকার [৮৭১-১০১৬ হি.]

আবুল হাসান নিজেই তাঁদেরকে বহু প্রতীক্ষিত সুযোগটি প্রদান করেন। যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ শেষ হতে না হতেই তিনি বেপরোয়াভাবে যুদ্ধ শুরু করেন এবং ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আক্রমণ চালিয়ে জাহারা শহর অধিকার করেন। এই শহর অধিকারের ফলে তাঁর ও তাঁর রাজ্যের উপর বর্বরতা ও ধর্মান্ধতার পাহাড় ভেঙে পড়ে, উত্তর স্পেনের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ যাকে এত দিন যাবৎ ঠেকিয়ে রেখেছিল। আরবদের মধ্যে চিন্তাশীল লোকেরা রাজার এই অবিমৃষ্যকারিতাকে তাঁদের রাজ্যের জন্য অমঙ্গলজনক বলে মনে

---

[১] স্পেনীয়দের কর্তৃক আলবোয়াসেন রূপে বিকৃত।

[২] কর দাবি করার প্রত্যুত্তরে তাঁর বাণী ছিল গর্বসূচক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ। তোমার প্রভুকে বল, যে রাজারা কর দিতেন তাঁরা মারা গেছেন; আমাদের টাকশালে এখন আর স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হয় না, কেবল বর্শাফলক তৈরি হয়।

করেছিলেন। রাজার অভ্যর্থনা কক্ষে এক প্রবীণ ফকীহ এই অমঙ্গলাশঙ্কার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হায় আফসোস! জাহারার ধ্বংসাবশেষ আমাদেরই মাথার উপর পড়বে। স্পেনে মুসলিম সাম্রাজ্যের দিন এখন ঘনিয়ে এসেছে।

আল-হামার পতন [৮৮৭ হি; ফেব্রুয়ারি, ১৪৮২ খ্রি.]

আবুল হাসান জাহারা দুর্গে শক্তিশালী সৈন্যদল মোতায়েন করায় জাহারা পুনরধিকার করা কষ্টকর মনে করে ক্যাস্টিলবাসীরা সুরক্ষিত আল- হামাহ (আলহামা) শহরে অতর্কিত নৈশ আক্রমণ চালায়। এটি রাজধানী থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে পর্বতের পাদশেশে স্থাপিত হয়ে গ্রানাডা অঞ্চলের প্রবেশ পথকে পাহারা দিচ্ছিল। বীরত্বের সাথে প্রতিরক্ষা করা সত্ত্বেও স্থানটি অতর্কিত আক্রমণে অধিকৃত হয়ে মানুষের কসাইখানায় পরিণত হয়। এমনকি যেসব স্ত্রীলোক ও শিশু জুমা মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিল তারাও ক্যাস্টিলবাসীদের দ্বারা নির্দয়ভাবে নিহত হয়। এভাবে আল-হামার পতন ঘটে– একদিন এটি ছিল সমৃদ্ধশালী নগরী; এক্ষণে এটি বিশাল সমাধিভূমিতে পরিণত হয়। একদিন এর সুদৃশ্য রাস্তাগুলো ছিল সুখী মানুষের বিহারভূমি, পরে তা নিহতের লাশে স্তূপাকার হয়ে যায়। আল-হামার পতন গ্রানাডা ধ্বংসের পূর্বাভাষ সূচিত করে এবং এর অধিবাসী ও সৈন্যদলের মর্মান্তিক অবস্থা দেখে মুসলিম জনসাধারণ সর্বজনীন বিলাপধ্বনি করতে থাকে। যার নির্বুদ্ধিতায় এই বিপর্যয় ঘটেছিল তাঁকে তাঁরা অভিসম্পাত দেয়। আবুল হাসান নগরটি পুনরাধিকারের জন্য দুইবার চেষ্টা করেন; প্রথমবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, দ্বিতীয়বারের চেষ্টা সফল হওয়ার উপক্রম হলে তাঁর পুত্র আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদের[১] নেতৃত্বে রাজধানীতে এক বিদ্রোহের সংবাদ তাঁর শক্তিকে স্থবির করে দেয়। স্পেনীয় মুসলমানদের অদৃষ্টের এই দারুণ সংকটকালে বহু বিবাহের কুফল প্রকট হয়ে ওঠে। আবুল হাসানের দুই স্ত্রী ছিলেন– একজন তাঁর পিতৃব্য কন্যা আয়েশা, অন্যজন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্পেনীয় মহিলা[২] (খ্রিস্টান)। শেষোক্ত স্ত্রী ও তাঁর সন্তানদের সাথেই তাঁর সম্পর্ক গভীর ছিল। আয়েশা তাঁর স্পেনীয় সপত্নীর প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর পুত্র কুখ্যাত বোয়াবদীলকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচনা দেন।

২৭ জামাদিউল আওয়াল, ৮৮৭ হি.; জুলাই, ১৪৮২ খ্রি.

মায়ের নিকট হতে উৎকোচ পেয়ে সৈন্যদল ও জনসাধারণের একাংশ যুবকটিকে তাদের রাজা বলে গ্রহণ করে। আবুল হাসান দ্রুত গ্রানাডায় ফিরে আসেন। গ্রানাডা উভয় পক্ষের বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। পিতা ও পুত্রের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী এক যুদ্ধবিরতির ফলে বৃদ্ধ রাজা ক্যাস্টিলবাসীদের দ্বারা অবরুদ্ধ লোজা বা লোক্সা (লোশা) উদ্ধার করতে এবং ক্যানেট অধিকার করতে সমর্থ হন। কিন্তু এসব সাফল্যে কোন লাভ হয়নি, কারণ তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর বিদ্রোহী পুত্র আল-হামরা দুর্গ অবরোধে কৃতকার্যতা লাভ করে নিজেকে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র গ্রানাডার অধীশ্বর করে ফেলেছেন।

---

[১] স্পেনীয়গণ কর্তৃক বোয়াবদিল রূপে বিকৃত। গ্রানাডাবাসীরা তাঁকে বলত ছোট রাজা (আস-সুলতান আস-সাগীর) এবং তদনুসারে স্পেন দেশের বর্ষপঞ্জীতে তাঁকে El-Rey Chico বলা হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমি তাঁকে বোয়াবদিল বলেই অভিহিত করব।

[২] তিনি ছিলেন বেডমারের আলকেড নামে পরিচিত ক্যাস্টিলবাসীর কন্যা। তাঁর নাম ইসাবেল দ্য সোলিস, কিন্তু আরবরা তাঁকে জুহরা (প্রেম দেবী) বলত।

অতঃপর আবুল হাসান পশ্চাদপসরণ করে মালাগায় চলে যান। আজ জাগাল[১] উপাধিধারী তাঁর ভাই আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ মালাগার শাসনকর্তা ছিলেন। গুয়াডিক্স ও বায়েজা নগর দুটি কেবল তাঁর অধিকারে ছিল।

সফর, ৮৮৮ হি; মার্চ, ১৪৮৩ খ্রি.

ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা লোক্সায় তাঁদের সৈন্যদলের পরাজয়ের প্রতিশোধস্পৃহায় দগ্ধ হয়ে মালাগা প্রদেশে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। যদি সফলতার দ্বারা আমরা শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে দেয়া, জলপাই ও দ্রাক্ষা গাছ কেটে ফেলা, সমৃদ্ধশালী গ্রাম ধ্বংস করা, গবাধি পশু তুলে নিয়ে যাওয়া ও অসহায় মানুষকে হত্যা করা বুঝি[২] তাহলে এই সৈন্যবাহিনী প্রথমে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল বলতে হবে। ক্যাস্টিলবাসীরা যখন সানন্দে এই কাজে ব্যাপৃত তখন আজ-জাগাল ও তাঁর সহকারী রিজওয়ান আক্যারকুইয়া (আশ-শারকিয়া) নামক পার্বত্য অঞ্চলে তাদেরকে আক্রমণ করে এবং শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পর তারা পরাজিত হয়।[৩] আরবদের কার্যকলাপ একেবারে নৈরাশ্যজনক ছিল না, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বোয়াবদীল কর্তৃক সংশোধিত একটি নতুন ঘটনায় অবস্থার মোড় সম্পূর্ণ ঘুড়ে যায়। তার পিতৃব্য আজ-জাগালের নাম এক্ষণে চঞ্চল গ্রানাডাবাসীদের মুখে মুখে উচ্চারিত হওয়ায় হতভাগ্য বোয়াবদীল তাঁর কর্মপন্থা অনুসরণ করতে ইচ্ছুক হয়ে ক্যাস্টিলীয় শহর লুসেনা আক্রমণ করেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোচনীভাবে পরাজিত ও বন্দি হন। এই সংকটকালীন সময়ে আবুল হাসান সাহসী আজ-জাগালের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে তাঁর পরিবার ও মালপত্র নিয়ে প্রথমে ইলেরায়[৪] এবং পরে আল মুনেকারে চলে যান। কিছুদিন পরেই মুনেকারে তাঁর মৃত্যু হয়। বোয়াবদীলের বন্দিদশাকে ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে স্বর্গীয় সাহায্য বলে মনে করেন। কারণ তাঁরা তাঁর মধ্যে গ্রানাডায় অন্তর্বিরোধ জিইয়ে রাখার, এর সামরিক শক্তি বিভক্ত করার এবং পরিশেষে দুর্ভাগা রাজ্যের ধ্বংস সাধনের সবচেয়ে উপযুক্ত ক্রীড়নক খুঁজে পান। দুর্বল, চঞ্চল ও ভীরু হওয়ায় তিনি ধূর্ত ও সুকৌশলী ফার্দিনান্দের হাতে নেহাত মোমের পুতুলের মত ছিলেন। অচিরেই তাঁকে তাঁদের বিশ্বস্ত সামন্তরাজে পরিণত হতে রাজী করানো হয়। যে মুহূর্তে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের ক্রীড়নক সম্পূর্ণ বশে এসেছে, তখনই তাঁরা তাঁকে প্রচুর সৈন্যসামন্ত, অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সমাগ্রীসহ গ্রানাডায় পাঠিয়ে দেন। দেহরক্ষী ক্যাস্টিলবাসী ও আয়েশা কর্তৃক অর্থ দ্বারা বশীভূত কিছু সংখ্যক গ্রানাডাবাসীর সহায়তায় তিনি আলবেজিন[৫] শহরতলী দখল করেন এবং গ্রানাডা পুনরায় ধ্বংসাত্মক গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত হয়। আজ- জাগাল বোয়াদীলের কাছে প্রস্তাব দেন যে, তাঁরা সম্মিলিতভাবে রাজ্য শাসন করবেন এবং একত্রে সাধারণ শত্রুর বিরোধিতা করবেন; কিন্তু অযোগ্য যুবক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[৬] ক্যাস্টিলবাসীরা আজ-জাগাল ও

---

[১] সাহসী বা সুদর্শন (যুবক)।

[২] কনড।

[৩] ওয়াশিংটন আরভিং ক্যাস্টিলবাসীদের এই বিপর্যয় বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

[৪] প্রাচীন ইলিরিস।

[৫] এখানে বেজার লোকেরা বাস করত বলে এই নাম হয়েছে। একজন প্রাচীন লেখক বলেন, এই লোকেরা সব সময় তাদের বিদ্রোহ প্রবণতার জন্য খ্যাত ছিল।

[৬] এই সময় জেগ্রিসরা (বিশ্বাসঘাতক বোয়াবদীলের পক্ষাবলম্বী) দেশপ্রেমিক বনু সিরাজ (দ্য আবেনসেরাজেস) পরিবারকে প্রলুব্ধ করে প্রত্যেকটি লোককে হত্যা করে।

বোয়াবদীলের এই আত্মঘাতী লড়াইয়ের সুযোগ নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোরা, কাসর বোয়েলিয়া, রোন্ডা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নগর দখল করে নেয়। যে লোক্সায় তারা অনেকবার পরাজিত হয়েছিল ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে তা অধিকৃত হয় এবং এক বছর পর মালাগাও তাদের অধিকারে চলে যায়। আজ-জাগাল এই নগর রক্ষার জন্য একবার বেরিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বোয়াবদীলই তাঁকে প্রতিরোধ করেন। কারণ বোয়াবদীল এত নীচ প্রকৃতির ছিলেন যে এই মুসলিম নগরী জয় করার জন্য তিনি ফার্দিনান্দকেও অভিনন্দন জানান। যদিও সকল অধিবাসীর নিরাপত্তা ও প্রাণরক্ষার পবিত্র অঙ্গীকারের পর এসব স্থান আত্মসমর্পণ বা বশ্যতা স্বীকার করেছিল, তবুও একবার দখল পেয়েই ধার্মিক ফার্দিনান্দ তাঁর প্রতিশ্রুত প্রতিজ্ঞা ভাঙতে ইতস্তত করেননি। লোকজনকে হয় দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়, আর না হয় তাদের বাড়িঘর ও দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। কেবল বেজা, আলমারিয়া, ভেরা, হুয়েজার ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান আজ-জাগালের হাতে রইল।

বেজার পতন [১০ মহররম, ৮৯৫ হি; ৪ ডিসেম্বর, ১৪৮৯ খ্রি.]

বিশ্বাসঘাতক ফার্দিনান্দ বোয়াবদীলের সাথে এই মর্মে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, তিনি আজ-জাগালের নিকট হতে যেসব স্থান জয় করবেন তার সবগুলোই বোয়াবদীলকে দিয়ে দেবেন। হতভাগ্য বিশ্বাসঘাতক বোয়াবদীল তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেন; কারণ তাঁর ভয় ছিল যে, তিনি ক্যাস্টিলবাসীদের সাহায্য না করলে আজ- জাগাল ফার্দিনান্দকে যেমন বহু যুদ্ধে পরাজিত করেছেন, তেমনিভাবে তাঁকেও গ্রানাডা থেকে বিতাড়িত করবেন। ফার্দিনান্দ এভাবে তাঁর সমূহ বাহিনী নিয়ে বেজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে সমর্থ হন। আজ-জাগাল শোচনীয় অবস্থায় পড়ে যখন আফ্রিকার মুসলমান রাজাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাঁরা তখন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর আবেদন বিফল হলেও আরবরা দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং আজ-জাগাল ক্যাস্টিলবাসীদেরকে তাঁর রাজধানীর প্রাচীল প্রান্ত থেকে বারবার বিতাড়িত করেন; কিন্তু ফার্দিনান্দ কৌশলে খাদ্যাভাব ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত নগরটিকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করান। যথারীতি যেসব শর্তে নগরের আত্মসমর্পণ ঘটানো হয় অনতিবিলম্বেই তা ভঙ্গ করা হয়; নগরবাসীদেরকে নির্মমভাবে ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং তথাকথিত ধার্মিক রাজা ও রাণী তাদের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করেন। ঘুষ দিয়ে আল-পুক্সারাস (আল-বুশারাত) অঞ্চলের দুর্গ ও শহরের শাসনকর্তাদেরকে বশে আনা হয়। যে আজ-জাগাল অধ্যাবধি তাঁর প্রজাদের স্বাধীনতার জন্য বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিলেন তাঁকে শেষ পর্যন্ত ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রবৃত্ত করানো হয়। তাঁকে রাজা উপাধি দিয়ে আনদারাক্স জেলা প্রদান করা হয়, কিন্তু ক্ষুদ্র রাজ্যটি তাকে বেশিদিন ভোগ করতে দেওয়া হয়নি। কারণ এক বছর পর তাঁকে আফ্রিকায় নির্বাসিত করা হয়। এক্ষণে গ্রানাডা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ব্যতিরেকে আরবদের হাতে আর কিছুই রইল না। আজ-জাগালের পতনে বোয়াবদীল স্বস্তি লাভ করল বটে, কিন্তু তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে খ্রিস্টান পৃষ্ঠপোষকদের অভিসন্ধির দ্বারা শীঘ্রই প্রতারিত হন। আজ- জাগালকে অপসারিত করতে না করতেই তাঁরা বোয়াবদীলকে গ্রানাডা ছেড়ে দিতে বলেন। এ ব্যাপারে তাঁর অসম্মতির ছুঁতো ধরে ফার্দিনান্দ গ্রানাডার উর্বর অঞ্চলগুলোকে যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা উচ্ছন্ন করে দেন। ভেগাকে বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে তিনি কর্ডোভোয় চলে যান ।

এভাবে জীবন মরণের যুদ্ধ শুরু হয়; আরবদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর মুসা ইবন আবিল গাজানের কথায় ভীরু বোয়ারবদীলের হৃদয়েও কিঞ্চিৎ প্রাণ সঞ্চার হয়। এই বীরের নেতৃত্বে আরবরা আবার শত্রুর দেশে প্রবেশ করে যুদ্ধ করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কয়েকটি সীমান্ত ঘাঁটি দখল করতে সমর্থ হয়।

গ্রানাডা অবরুদ্ধ [জমাদিউস সানি, ৮৯৬ হি; মার্চ, ১৪৯১ খ্রি.]

বসন্ত সমাগমে ফার্দিনান্দ পুনরায় ৪০,০০০ পদাতিক ও ১০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গ্রানাডার সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে নতুনভাবে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেন। শস্য ও ফলবান বৃক্ষ বিনষ্ট, বাসভাবন ভস্মীভূত এবং অসহায় অধিবাসীরা হয় নিষ্ঠুরভাবে নিহত, আর না হয় উৎপীড়িত বা তাদের অঙ্গ কর্তিত হয়। স্পেনের মুসলিম সভ্যতার শেষ আশ্রয়স্থল গ্রানাডার চতুর্দিকে সৈন্য বেষ্টনী দৃঢ় থেকে দৃঢ়তার করা হয় এবং উৎপীড়িত ভেগা শহরের লোকেরা রাজধানীর প্রাচীরাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। দশ বছর ধরে তারা প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য আক্রমণকারীদের সাথে লড়াই করেছিল, যেখানেই তারা পদ স্থাপন করতে পেরেছিল সেখানেই তারা শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হয়েছিল। কিন্তু এক্ষণে রাজধানীর বাইরে তাদের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না এবং গভীর হতাশায় এর প্রাচীরাভ্যন্তরেই তারা নিজেদেরকে আবদ্ধ করল। চমৎকারভাবে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবিত হল এবং কিছুকাল পর্যন্ত তা দক্ষতার সহিত কার্যকর করা হল । তখন পর্যন্ত রাজধানী ও আলপুক্সারাসের (আল- বুশারাত) মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি এবং সিয়েরা নেভাদা (জাবালুশ- শুল) অঞ্চল থেকে অবরুদ্ধ লোকদের জন্য রক্ষীবাহিনী খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করছিল, অন্যদিকে মুসার নেতৃত্বে অবরুদ্ধ ব্যক্তিরা সাহসের সাথে বগির্গমন করে শত্রুকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। ক্যাস্টিলীয়দের শিবিরের সামনে প্রতিদিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটিত হত, এতে আরব অশ্বারোহীগণ প্রতিনিয়ত তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করত। এসব দ্বন্দ্বযুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষগণ নিহত হলে ফার্দিনান্দ অবরোধকে কঠোরতর করতে এবং আরবদের খাদ্যাভাব ঘটিয়ে তাদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হন।

নগরে দুর্ভিক্ষ [মহররম, ৮৯৭ হি; নভেম্বর, ১৪৯১]

নগর প্রাচীরের বহির্ভাগে তিল পরিমাণ ভূমি শত্রুগণ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় এবং বাইরে থেকে সকল প্রকার প্রবেশ বন্ধ হওয়ায় অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের পক্ষে শস্যাদি সংগ্রহ করা বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে সরবরাহ পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রতিদিনই খাদ্যসামগ্রী হ্রাস পেতে থাকে এবং সফর মাসের মধ্যে জনসাধারণের দুর্দশা প্রায় সহ্যের সীমা অতিক্রম করে।[১]

আত্মসমর্পণের শর্তাবলী [সফর, ৮৯৭ হি; ডিসেম্বর, ১৪৯১ খ্রি.]

গ্রানাডার দুর্ভিক্ষপীড়িত পদাতিক বাহিনীর দুর্বলতার জন্য অবরোধ ভেঙে ফেলার একটি প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সাহসে যা করতে পারেনি, দুর্ভিক্ষে তা করতে সম্ভব হয়। আত্মসমর্পণের শর্ত নির্ধারণের জন্য ক্যাস্টিলবাসীদের শিবিরে প্রতিনিধি পাঠানো হয় এবং দীর্ঘ আলোচনার পর নিম্নলিখিত শর্তাবলী নির্ধারিত হয়– দুই মাসের মধ্যে আরবরা স্থলপথে বা সমুদ্রপথে মুক্ত হতে না পারলে গ্রানাডা নগরী খ্রিস্টানদের

[১] মাক্কারী।

কাছে সমর্পণ করতে হবে; রাজা তাঁর সকল সেনাপতি, উজির, শায়খ ও প্রজাবর্গসহ ক্যাস্টিলীয় শাসকদেও নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবেন; বোয়াবদীল আলপুক্সারাস অঞ্চলে কিছু সম্পত্তি পাবেন; ছোট ও বড় সকল মুসলমানের জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাসহ তারা পূর্ণ ও অভাধভাবে তাদের সম্পত্তি, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বাদির ভোগদখল করতে পারবে; তাদেরকে মুক্ত ও নিরুপদ্রবভাবে ধর্মকর্ম করতে দেয়া হবে; তাদের মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অক্ষত থাকবে; মুয়াজ্জিনকে আজান দিতে বাধা দেয়া হবে না; তারা তাদের আদব-কায়দা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ভাষা ও পোশাক পরিচ্ছদ অব্যাহত রাখতে পারবে; তাদের নিজেদের আইন-কানুন অনুযায়ী তাদের প্রশাসকগণ তাদেরকে শাসন করবেন। তাদের ও খ্রিস্টানদের মধ্যেকার বিবাদের বিচার মিশ্র আদালতে সম্পাদিত হবে; তাদের নিজেদের রাজাকে প্রদেয় কর ব্যতীত অন্য কোন কর তাদের উপর বসানো হবে না; কোন খ্রিস্টান জোরপূর্বক কোন মুসলমানের গৃহে প্রবেশ বা তাকে কোনভাবে অপমানিত করতে পারবে না; সমস্ত মুসলমান বন্দিকে মুক্তি দেয়া হবে, যেসব আরব আফ্রিকায় চলে যেতে চায় তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলে যেতে দেয়া হবে এবং কেবল ভাড়া ব্যতীত অন্য কোন টাকা-পয়সা না নিয়ে তাদেরকে ক্যাস্টিলীয় জাহাজে করে পৌঁছে দেয়া হবে; নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়র পর যদি কোন মুসলমান পথ ভাড়া ছাড়াও যে সম্পত্তি সে সঙ্গে নিয়ে যাবে তার এক-দশমাংশ প্রদান করে তাহলে তাকেও চলে যেতে বাধা দেয়া হবে না; কাউকে অন্যের কৃতকর্মের জন্য অভিযুক্ত বা শাস্তি প্রদান করা হবে না। কোন খ্রিস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে ঐ ধর্ম ত্যাগ করে পূর্ব ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে না; কোন মুসলমান খ্রিস্টান হতে চাইলে প্রস্তাবটি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য কিছুদিন সময় দিয়ে মুসলমান ও খ্রিস্টান উভয়পক্ষের একজন করে বিচারক এই অভিলষিত পরিবর্তন সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করবেন এবং এভাবে যাচাইয়ের পর সে যদি ইসলাম ধর্মে ফিরে যেতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে দেয়া হবে; কোন মুসলমানের গৃহে খ্রিস্টান সৈন্য রাখা হবে না কিংবা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হবে না; কোন মুসলমান খ্রিস্টানদের সাথে ভ্রমণ করতে বা তাদের সাথে বসবাস করতে চাইলে তার জীবন ও সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে এবং ইহুদীদের ন্যায় তাদেরকে কোন বিশেষ চিহ্ন ধারণ করতে হবে না।

কেবল মুসাই আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে আপত্তি করেছিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে ক্যাস্টিলবাসীদের প্রবঞ্চনামূলক ও বিশ্বাসঘাতক প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা না রাখতে সতর্ক করে দেন এবং অবরোধ ভাঙার জন্য শেষ বারের মত প্রাণপণ চেষ্টা করতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, দাসত্বের গ্লানি ও লজ্জার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, ক্যাস্টিলবাসীরা বিশ্বস্তভাবে তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করবে? তোমরা প্রতারিত হয়েছ। শত্রু আমদের রক্তের জন্য পিপাসার্ত, কিন্তু শত্রুপক্ষ আমাদের জন্য যা সঞ্চিত করে রেখেছে– সেই অন্যায়, অনাচার, অমর্যাদা, অপমান; ঘরবাড়ি লুণ্ঠন, স্ত্রী-কন্যাদের অসম্মান, মসজিদ অপবিত্রকরণ– এক কথায় অত্যাচার, অবিচার ও

অনুদারতা– তার তুলননায় মৃত্যু কিছুই নয়। আমাদেরকে অঙ্গারে পরিণত করার জন্য ইতিঃপূর্বেই জ্বালানি কাঠ প্রজ্বলিত করা হয়েছে।[১] তাঁর কথায় কোন ফল হয়নি।

মুসার মৃত্যু

সাহসী যোদ্ধা তাঁর সহচরদের এক সম্মিলিত সভায় তাঁদের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ মিশ্রিত কটাক্ষপাত করে নিজের অশ্বারোহণে এলভিরা ফটক দিয়ে নগরী ত্যাগ করলেন এবং আর কখনো নগরীতে ফিরে আসেননি। কথিত আছে, অশ্বারোহণে গমনকালে তিনি একদল খ্রিস্টান বীরযোদ্ধার সম্মুখীন হন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন দশজন। তাঁদের যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি অশ্ববিহীন হওয়ার আগে তাঁদের অনেককে হত্যা করেন। অতঃপর তাঁদের দয়ার প্রস্তাব ঘৃনাভরে প্রত্যাখ্যান করে পায়ের উপর ভর দিয়ে নিতান্ত দুর্বল হয়ে না পড়া পর্যন্ত তিনি দুর্দান্তভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যান; অবশেষে একবার শেষ চেষ্টা করে তিনি নিজেকে শেনিল নদীত নিক্ষেপ করেন এবং বর্মের ভারে নদীর তলদেশে নিমজ্জিত হন।

গ্রানাডার আত্মসমর্পণ [২ রবিউল আওয়াল, ৮৯৭ হি; জানুয়ারি, ১৪৯২ খ্রি.]

মিশর ও রোমের সুলতানদের সাহায্য প্রার্থনা করে দূত প্রেরণ করা হয়, কিন্তু অনুগ্রহ প্রদর্শনের নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ শেষ হলেও সাহায্যের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি ক্যাস্টিলবাসীরা গ্রানাডা দখল করে। যে সময় গ্রানাডার দুর্গে খ্রিস্টান ক্রশ মুসলিম অর্ধচন্দ্রকে স্থানচ্যুত করে তা বাস্তবিকই অশুভ ছিল; কারণ স্পেনীয় খ্রিস্টানগণ কর্তৃক ঐ নগর অধিকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পেন উপদ্বীপের বুদ্ধিবৃত্তিমূলক জীবনযাত্রা ও শিল্প সংক্রান্ত কাজকর্ম চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

বোয়াবদীল ও তাঁর পরিবারবর্গ আল-পুক্সারাসের পথ ধরেন। এই রাস্তাই এখন তাঁদের একমাত্র সহায়ক। পাদুলের পার্বত্য অঞ্চলে পৌঁছে তিনি গ্রানাডার দিকে তাঁর শেষ দীর্ঘ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কেঁদে ফেলেন। যে মা এতকাল যাবৎ তাঁর কুমন্ত্রণাদাত্রী ছিলেন, তিনি এবার তাঁকে এই বলে সম্বোধন করেন, হ্যাঁ, পুরুষের মত তুমি যা রক্ষা করতে পারনি, তা হারিয়ে নারীর মত কাঁদাই তোমার ভাল।[১] বোয়াবদীল কিছুদিন আন্দারাক্সে বসবাস করেন; কিন্তু স্পেনে তাঁর অবস্থানকে ফার্দিনান্দ ক্যাস্টিলীয় সার্বভৌমের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করেন এবং তিনি অচিরেই আফ্রিকায় নির্বাসিত হন।

বোয়াবদিলের মৃত্যু [৯৪০ হি; ১৫৩৮ খ্রি.]

অতঃপর তিনি ফেজে চলে যান এবং ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সেখানে বসবাস করেছিলেন।[২]

নির্যাতন শুরু

ধার্মিকপ্রবন ফার্দিনান্দ বা সাধ্বী ইসাবেলা কেউই আত্মসমর্পণের শর্তাদি পালন করতে না চাওয়ায় মুসলমানরা ইহুদীদের দূরবস্থা দেখে অচিরেই তাদের শেষ বীরের অশুভ

---

[১] সেভিলে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে ধর্মগত অপরাধ তদন্তের জন্য রোমান ক্যাথলিক যাজকেদের বিচারসভা স্থাপিত হয় এবং একটি বিচারসভায় সাতজন ইহুদীকে দগ্ধ করে এর খুনীসুলভ কার্যকলাপ শুরু হয়।

[১] যে স্থানে বোয়াবদীল গ্রানাডার প্রতি তাঁর বিষণ্ন বিদায়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন এখনো El ultimo sospiro Moro বা মুরের শেষ দীর্ঘশ্বাস নাম বহন করছে।

[২] তিনি ইউসূফ ও আহমদ নামক দুই পুত্র রেখে যান, সপ্তদশ শতাব্দীর একজন আরব লেখক তাঁদের বংশধরদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন; তাঁরা এত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, জীবনধারণের জন্য তাঁদেরকে মসজিদ থেকে লব্ধ বদান্যতার উপর নির্ভর করতে হত।

সতর্ক বাণীর কথা স্মরণ করে। আরবদের উদার শাসনে যে ইহুদীরা উন্নতি লাভ করেছিল তাদের ধন- সম্পদের প্রতি ক্যাস্টিলীয় শাসকদের লোলুপ দৃষ্টি জাগ্রত হয় হয়। ফার্দিনান্দ সব সময় ধর্মের খোলসে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ নীতি ঢেকে রাখতেন এবং প্রতারণার ইচ্ছা থাকলেই ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিতেন। ফার্দিনান্দ ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে এই মর্মে এক ফরমান জারি করেন যে, ইহুদীদেরকে হয় ধর্ম ত্যাগ করতে হবে, আর না হয় দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাদেরকে দগ্ধীভূত, নির্যাতিত কিংবা নির্বাসিত করা হয়। ইহুদীদের বিরুদ্ধে ফরমান জারির সাথে সাথে মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত সন্ধির শর্তগুলোও লঙ্ঘন করা শুরু হয়; তাদের প্রতি সর্বপ্রকার অপমান ও অত্যাচারমূলক শর্ত আরোপ করা হয়। তাদের ধর্ম ও আইন নিষিদ্ধ হয় এবং তাদের অনেককেই বলপূর্বক খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। ক্যাস্টিলীয়দের বিশ্বাসঘাতকতা মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে এবং আলবেজির অধিবাসীগণ বিদ্রোহ করে। এর ফলে দুর্ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পায়।

জিমেনিসের নির্যাতন : ক্যাস্টিলবাসীদের নিষ্ঠুরতা [৯০৪ হি; ১৪৯৮ খ্রি.]

প্রতিহিংসাপরায়ণ জিমেনিস ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে এক সর্বজনীন নির্যাতন শুরু করেন। তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌত্তলিকদের ধর্ম গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় মৃত্যুবরণ করতে হবে। কেউ কেউ এতে সম্মত হয়, কিন্তু অধিকাংশই তাদের ধর্ম বিশ্বাসে অটল থাকে এবং আল-পুক্সারাসের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানেও তারা নির্যাতনকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুরুষদেরকে হত্যা করেই ক্যাস্টিলীয়গণ সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা বারুদের আগুনে একটি মসজিদও উড়িয়ে দেয়, যেখানে বিস্তীর্ণ এলাকার শিশু ও স্ত্রীলোকেরা আশ্রয় নিয়েছিল। প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মুসলমানরা সাহসের সাথে আত্মরক্ষা করছিল এবং ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে তারা জাবাল বালানসার যুদ্ধে জয়লাভ করে। এর ফলে হতাবশিষ্ট লোকজন ও তাদের পরিবারবর্গ মরক্কো, তুর্কী ও মিশরে চলে যেতে সমর্থ হয়। কিন্তু খ্রিস্টান প্রভুরা তাদের ধন-সম্পত্তি দখল করে নেন। আর যারা রয়ে যায় তাদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর, তাদেরকে তরবারির ভয় দেখিয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য করা হয়, কিন্তু নামমাত্র খ্রিস্টান হলেও অন্তরে তারা ঐরূপ ছিল না। কারণ তারা গোপনে আল্লাহর উপাসনা করত এবং যথাসময়ে ওজু ও নামাজ সামাধা করত।[১] যে পবিত্র পানি দ্বারা তাদের পুত্র কন্যাদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হত, পুরোহিতদের দৃষ্টির আড়াল হলেই তারা তা ধুয়ে ফেলতে কার্পন্য করত না। খ্রিস্টান রীতিতে বিবাহের পর বাড়িতে ফিরে তারা আবার মুসলিম রীতিতে বিবাহ সম্পাদন করত। কোন বিচক্ষণ ও সত্যপ্রিয় সরকার হলে গ্রানাডার আত্মসমর্পণের সময় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলো পালন করে এই গোপন অসন্তোষের বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারত; কিন্তু স্পেনের শাসকবর্গ মরিস্কোদের সাথে ব্যবহারে বিচক্ষণ ছিলেন না, সত্যপ্রিয়ও ছিলেন না এবং যতই দিন যেতে থাকে ততই তাঁর আরও নিষ্ঠুর ও মিথ্যাশ্রয়ী হয়ে ওঠেন।[২] এসব নামমাত্র খ্রিস্টানদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পাহারা দেয়া হত এবং ধর্মভ্রষ্টতার সামান্যতম লক্ষণেও হতভাগ্য অপরাধীর উপর ধর্মীয় বিচার-সভার দণ্ড আরোপিত হত। গ্রানাডা, সেভিল ও কর্ডোভায় বিচার-সভার অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত থাকত এবং দিনের পর দিন এই অগ্নিশিখা বহু সংখ্যক পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালক- বালিকাকে গ্রাস করত। বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সব রকমের অস্ত্রশস্ত্র, এমনকি ক্ষুদ্র ছুরিকা ব্যবহারও

---

[১] মাক্কারী।

[২] লেনপুল।

নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল এবং এভাবে স্পেন বিজয়ী জাতির হতভাগ্য বংশধরগণ তাদের উপর আরোপিত আঘাত ও অত্যাচার ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে লাগল। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে তাদের অবস্থা অসহ্য হয়ে ওঠে। বিজিতদের সম্পত্তি ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে এবং যে দেশে তারা এতদিন রাজত্ব করেছিল, সেখানে তাদেরকে ভয়াবহ দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেও তারা সন্তুষ্ট হয়নি। খ্রিস্টানগণ তাদের মূলচ্ছেদ করতে তাদের গৌরবময় অস্তিত্বের স্মৃতিচিহ্নটুকুও ধ্বংস করতে চেয়েছিল। ধর্মান্ধ দ্বিতীয় ফিলিপ এই সময় স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রানাডার আর্চ-বিশপও সমভাবে প্রতিহিংসাপরায়ন ও ধর্মান্ধ ছিলেন। তিনি রাজার নিকট থেকে এই মর্মে এক অনুশাসন লাভ করলেন যে, আরবদেরকে তাদের ভাষা, আদব-কায়দা, আচার-ব্যবহার ও সমস্ত রকম অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে খ্রিস্টানদের টুপি ও পায়জামা ব্যবহার করতে; স্নান বন্ধ করে তাদেরকে বিজেতাদের মত ময়লা অবস্থায় থাকতে; তাদের ভাষা, রীতি-নীতি, উৎসব এমনকি তাদের নাম পর্যন্ত ত্যাগ করতে, স্পেনীয় ভাষায় কথা বলতে; স্পেনীয়দের মত আচার-ব্যবহার অবলম্বন করতে এবং স্পেনীয় ভাষায় তাদের নতুন নামকরণ করতে আদেশ দেয়া হয়। একটি জাতির পুরোপুরি বিজাতীয়করণ আল-মনজোর (আল-মনসুর) ও আবেনসারেজদের (বনু সিরাজ) বংশধরদের পক্ষে তো দূরের কথা, সাধারণ লোকের পক্ষেও বরদাস্ত করা অসম্ভব ছিল।[১]

নভেম্বর, ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দ

নিরুপায় হয়ে তারা অস্ত্রধারণ করে। এটি ছিল আশাহীন সংগ্রাম। তিন বছর বিরামহীন যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার কুখ্যাত ডন জুয়ান[২] কর্তৃক নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ দ্বারা এই বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। তাঁর সম্মুখেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং আল-পুক্সারাসের গ্রাম ও উপত্যকাগুলো মানুষের কসাইখানায় পরিণত হয়। যেসব দরিদ্র মানুষ পর্বত গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে আগুনের ধোঁয়া দিয়ে মেরে ফেলা হয়। মরিস্কো নামে অভিহিত বহু লোক তখনো ভ্যালেনসিয়া ও মুর্সিয়াতে অবশিষ্ট ছিল।

স্পেনীয় আরবদের শেষ বিতাড়ন

১৬১০ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় ফিলিপ তাঁর পিতার আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করেন; পাঁচ লক্ষেরও বেশি নিরপরাধ লোককে বলপূর্বক আফ্রিকায় নির্বাসিত করা হয় এবং সহায় ও কপর্দকহীন অবস্থায় তাদের সমুদ্রতীরে ছেড়ে দেয়া হয়। যারা স্পেনের অভ্যন্তরে বাস করছিল এবং তাদের সংখ্যা দুই লক্ষের কম ছিল না; একদা শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী জাতির হতভাগ্য ধ্বংসাবশেষ এই লোকগুলোকে নির্দয়ভাবে সীমান্ত পার করে ফ্রান্সে বিতাড়িত করা হয়; স্পেনীয়দের নিষ্ঠুরতা বা পথের কষ্ট সহ্য করে যারা বেঁচেছিল তারা সেখান থেকে জাহাজে করে মুসলিম দেশগুলোতে চলে যায়। গ্রানাডার পতন থেকে আরম্ভ করে তৃতীয় ফিলিপের রাজত্বকাল পর্যন্ত তিরিশ লক্ষ লোককে স্পেন উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত করা হয়।

গথদের অলস গরিমায় যে উপদ্বীপ মৃত ও অনুর্বর হয়ে পড়েছিল তাকে সক্রিয় পরিশ্রমবলে যে সাহসী, উদ্ভাববনশীল ও জ্ঞানলোকিত জাতি নতুন জীবন দান করেছিল,

---

[১] লেনপুল।

[২] পঞ্চম চার্লসের উপপত্নী ব্রোমবার্গের গর্ভজাত জারজ পুত্র।

আন্দালুসিয়াকে যারা উদ্যানে পরিণত করেছিল, চারদিক যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন যারা জ্ঞানবর্তিকা উর্ধে তুলে ধরছিল, যারা সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়েছিল, সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করেছিল এবং বীরত্বের আদর্শ স্থাপন করেছিল মোদ্দা কথা, যারা আধুনিক ইউরোপের জন্মদান করেছিল, এভাবে তারা স্পেনের মাটি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর স্পেন মুরদের বিতাড়িত করে কি লাভ করল? বহু শতাব্দীর সংস্কৃতি, জ্ঞান ও শিল্পকলার আবাসভূমি মনোরম আন্দালুসিয়া পুনরায় উৎপাদনহীন হয়ে বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক অধঃপতনের নামান্তরে পরিণত হয়। কন্ডের[১] সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে হয়, মুসলমানদের উপস্থিতি যেসব দেশকে জ্ঞানালোকিত ও সুসমৃদ্ধ করেছিল সেগুলো চিরন্তন অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়েছে। প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয়নি, সে চিরকালই হাস্যময়ী; কিন্তু মানুষ ও তাদের ধর্মের পরিবর্তন হয়েছে। কয়েকটি ভাঙাচোরা স্মৃতিস্তম্ভ ও নির্বাক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে সত্যের বিলাপ-ধ্বনি উত্থিত হয়, বিজিত আরবদের জন্য সম্মান ও গৌরব, বিজেতা স্পেনীয়দের জন্য ধ্বংস ও দৈন্য। ধর্মান্ধতায় স্পেনের কিরূপ ক্ষতি সাধিত হয়েছিল তার আরও মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন আরেকজন ইউরোপীয় লেখক। বিপথগামী স্পেনীয়রা জানত না যে তারা কী করতেছে। মুরদের নির্বাসন তাদেরকে আনন্দ দিয়েছিল। কিছুদিন যাবত এর চেয়ে চমৎকার ও আবেগময় আর কিছু ঘটেনি। তৃতীয় ফিলিপ যে ন্যায় দণ্ডাজ্ঞা দ্বারা মুরদের শেষ চিহ্নটুকুও আফ্রিকায় নির্বাসিত করেছিলেন লোপ ডি ভেগা তার প্রশংসা করেছেন। ভেলাজকুয়েজ একে এক স্মারক চিত্রে চিত্রিত করেছেন, এমনকি নম্র ও উদার কারভানটেস এটিকে নায্য প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, তারা তাদের স্বর্ণপ্রসবিনী রাজহংসীকে হত্যা করেছে। বহু শতাব্দী ধরে স্পেন ছিল সভ্যতার কেন্দ্র, শিল্প ও বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা ও সকল প্রকার মার্জিত জ্ঞানালোকের পীঠস্থান। ইউরোপের আর কোন দেশই মুরদের সুসভ্য রাজ্যের এত নিকটবর্তী হতে পারেনি। ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা এবং পঞ্চম চার্লসের সাম্রাজ্যের স্বল্পকালীন গৌরব এমন স্থায়ী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারেনি। মুরগণ নির্বাসিত হল; খ্রিস্টান শাসিত স্পেন কিছুদিনের জন্য ধার করা আলোকে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতি বিকীরণ করল। তারপর চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হল এবং সেই থেকে স্পেন ঐ অন্ধকারেই ডুবে রয়েছে। মুরগণ একদা যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ দ্রাক্ষা, জলপাই ও হলুদ শস্যছড়া উৎপন্ন করত তার অনুর্বর বিরান অবস্থার মধ্যে যেখানে একদিন জ্ঞান ও বুদ্ধি চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিল সেখানে নির্বোধ ও অজ্ঞ জনসাধারণের অবস্থিতিতে এবং যে জাতি অন্যান্য জাতির তুলাদণ্ডে শোচনীয়রূপে অধঃপতিত হয়েছে এবং যারা এইরূপ অবমাননার যথোপযুক্ত, তাদের সাধারণ স্থবিরতা ও অপমানের মধ্যে মুরদের প্রকৃত স্মৃতিচিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়।[২]

---

[১] তিনি নিজেও স্পেন দেশীয় ছিলেন।

[২] লেনপুল।

অধ্যায়-৩১
[পুনরালোচনা]

গ্রানাডা রাজ্য : আল-হাম্‌ব্রা প্রাসাদ : আল-জেনারেলিফ : গ্রানাডায় শিল্পকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান : পোশাক : আরব আমলে স্পেন সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা : সরকার : সরকারি কর্মচারীগণ : অর্থনৈতিক অবস্থা : শিল্পজাত দ্রব্য : কৃষি : চারুকলা : জ্ঞানচর্চা : নারীর অবস্থা : মহিলা পণ্ডিতগণ : আমোদ-প্রমোদ।

গ্রানাডা রাজ্য

স্পেনের যে অংশ উপদ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত ছিল তা নিয়ে গ্রানাডা রাজ্য গঠিত হয় এবং এর চরমোৎকর্ষের সময়েও এটি দৈর্ঘ্যে পূর্ব-পশ্চিমে সত্তর লীগ ও প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে পঁচিশ লীগের বেশি ছিল না। এই সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যেই এতে এক বিরাট সাম্রাজ্যের সকল প্রাকৃতিক সম্পদ বিদ্যমান ছিল। এর প্রশস্ত উপত্যকাগুলো ছিল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ পর্বতমালা দ্বারা বিভক্ত যার কর্মঠ অধিবাসীগণ রাজ্যের কৃষক ও সৈনিকের কাজ করত। এর চারণভূমিগুলো ছিল অসংখ্য নদী দ্বারা বিধৌত এবং উপকূল ভাগ সুবিধাজনক বন্দরসমূহে সুশোভিত ছিল। উক্ত বন্দরগুলো ছিল ভূমধ্যসাগরের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে ছিল তিরিশটি নগর, আশিটি সুরক্ষিত শহর এবং বহু সহস্র প্রাচীর বেষ্টিত শহর ও গ্রাম।[১] অধুনা ভেগা দ্য গ্রানাডা বা মরণ যুদ্ধের রণাঙ্গন নামে অভিহিত গ্রানাডার প্রান্তর বা তৃণভূমি (গোতাত) তিরিশ লীগ স্থান জুড়ে অবস্থিত ছিল। জাবাল শুলায়রের (সিয়েরা নেভাডা) নিকটবর্তী পবর্তমালা থেকে উৎপন্ন শেনিল[২] (জেনিল), দারোহ (দারো)[৩] ও অন্য তিনটি নদী দ্বারা বিধৌত এবং চতুর্দিকে ফলের বাগান, উদ্যান, কুঞ্জবন, প্রাসাদ, অট্টালিকা বাগানবাড়ি ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত এই প্রান্তর বিলাস ও সৌন্দর্যের অপূর্ব শোভা প্রদর্শন করত। উদ্যানের চতুর্দিক চিরহরিৎ গাছপালায় আচ্ছাদিত ছিল। আরবগণ ভেগা প্রান্তরে তাদের কৃষিবিষয়ক যাবতীয় উন্নত শক্তি নিঃশেষ করেছিল। জেনিল ও দারো নদীর পানি অসংখ্য খালে বিভক্ত করে তারা নৈপুণ্য ও পরিশ্রমের সহিত সারা বছরই পর্যায়ক্রমে ফল ও খাদ্যশস্য উৎপাদন করত। তারা সাফল্যের সহিত অতি বিপরীত অক্ষাংশের উপযোগী শষ্যের চাষ করত। আলমারিয়া ও মালাগার বন্দরগুলো থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ রেশম ও শন ইতালির ক্রমবর্ধমান বন্দরসমূহে রপ্তানি হত। তাদের শিল্পজাত দ্রব্য ছিল বিভিন্ন প্রকারের এবং প্রত্যেক নগর কোন একটি বিশেষ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। আহমারীয় রাজ্যের বন্দরগুলো ইউরোপ, লেভান্ট ও আফ্রিকা হতে সমাগত জাহাজে পরিপূর্ণ থাকত এবং এর রাজধানী উল্লেখযোগ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে সকল জাতির সাধারণ নগরে পরিণত হয়েছিল।[৪] সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য গ্রানাডার অধিবাসীগণ সর্বজনীন সুখ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছিল এবং তাদের একটিমাত্র কথার মূল্য স্পেনীয় খ্রিস্টানদের দলিলের চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হত।

---

[১] আরবদের শাসনামলেই কেবল গুয়াদালকুইভারের তীরেই বার হাজার গ্রাম বা ছোট শহর ছিল।

[২] শিনজিল নামেও অভিহিত, রোমকদের সিনজিলিস।

[৩] ইবনুল খাতিবের হাদারাহ এবং রোমকদের সালোন।

[৪] গ্রানাডায় জেনোয়া ও ফ্লোরেন্সবাসীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল।

তাঁত বস্ত্র ও মূল্যবান ধাতু ছাড়াও তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল বিশেষ করে শন ও রেশম রপ্তানি করত। ফ্লোরেন্স আলমারিয়া ও মালাগার বন্দর থেকে তারা এই কাঁচামালের প্রধান অংশ সরবরাহ করত।

গ্রানাডা নগরী

আরবগণ কর্তৃক গারনাতা নামে অভিহিত গ্রানাডা নগর ঐ প্রান্তরে প্রহরী দুর্গের ন্যায় অবস্থিত ছিল। এখনকার মত তখনো এটি আংশিকভাবে ভেগা প্রান্তরে এবং আংশিকভাবে পাহাড়ের ঢালু অংশে অবস্থিত ছিল। এই ঢালু অংশে নগরের সম্পূর্ণ উঁচু ও জনাকীর্ণ শহরতলীগুলো নির্মিত হয়েছিল। তরঙ্গায়িত দারো নদী নগরীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এর অসংখ্য অট্টালিকা, বাজার, কলকারখানা ও শৌচাগারে জল সরবরাহ করে এঁকেবেঁকে নিচের সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হত। বনু নাসরের সময় গ্রানাডা বিশটি প্রবেশপথ বিশিষ্ট এক মজবুত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং এক হাজার তিরিশটি প্রহরী দুর্গ তাকে রক্ষা করত। প্রাসাদ-দুর্গটি (কসাবা) অবস্থিত ছিল মধ্যস্থলে। নগরীর প্রত্যেক বাড়িতে কমলালেবু, লেবু, জামীর, লরেল, মেহেদী ও অন্যান্য সুগন্ধি গাছ ও চারাবিশিষ্ট নিজস্ব উদ্যান এবং তাতে পৃথকভাবে প্রবাহমান পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। জনসাধারণের আরাম ও সুবিধার জন্য প্রতিটি রাস্তায় বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর ঝর্ণা পরিদৃষ্ট হত। গৃহগুলো ছিল অত্যন্ত রুচিসম্মত এবং দামাস্কীয় কারুকাজ দ্বারা সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নগরীর লোকসংখ্যা ছিল চার লক্ষ।

গ্রানাডার বিপরীত দিকে একটি পর্বত চূড়ায় ইবনুল আহমার আল-হামরা[১] দুর্গ বা নগরী নির্মাণ করেছিলেন। এর বেষ্টনীর মধ্যে চল্লিশ হাজার লোকের স্থান সঙ্কুলান সম্ভব ছিল।

পুস্তকের সল্প পরিসরে এই 'অলৌকিক অট্টালিকা'র প্রতি সুবিচার করা অসম্ভব। এর সুউচ্চ চূড়া, দুর্গ ও প্রাসাদ, সেগুলোর সূক্ষ্ম ও সুচারু স্থাপত্যকলা, মনোরম বারান্দা ও স্তম্ভ, অদ্যাবধি চাকচিক্যময় বিভিন্ন বর্ণের গম্বুজ ও ছাদ, যার প্রাথমিক চাকচিক্য এতটুকু বিনষ্ট হয়নি; পার্শ্ববর্তী উদ্যানের সুগন্ধ আসতে পারে এভাবে নির্মিত বায়ুপূর্ণ হলঘর; অসংখ্য ঝর্ণাধারার উপর এর মালিকদের এমন নিয়ন্ত্রণ ছিল যে পানিকে ইচ্ছানুযায়ী উঁচু বা নিচু, দৃশ্যমান বা অদৃশ্য করা যেত, কখনো কখনো বাতাসে নিক্ষিপ্ত, আবার কখনো এমন বৃহৎ লম্বালম্বি খণ্ডে বিস্তৃত করা যেত যে তাতে দালান, ঝর্ণা ও মেঘমুক্ত নীলাকাশ প্রফিলিত হত; মনোরম আরবীয় নকশা, চিত্রকলা এবং পাথরের করুকার্যময় গৃহতল এমন যত্ন ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হত যে ক্ষুদ্রতম প্রকোষ্ঠটিও মনোমুগ্ধকর এবং সোনালী, ফিকে লাল, হালকা নীল ও কৃষ্ণাভ বেগুণী বর্ণে ঝলমল করত; বিভিন্ন বর্ণ ও প্রকৃতির চীনা কারুকাজ বিশিষ্ট দেওয়ালের মনোরম নিম্নাংশ; ১২৮টি সরু ও সুচারু স্তম্ভ বিশিষ্ট নিভৃত প্রকোষ্ঠসহ সুন্দর সিংহপ্রাসাদ, এর নীল ও সাদা রঙের শান বাঁধানো ফুটপাত, টকটকে লাল, আকাশী ও সোনালী বর্ণের সমন্বয়; কাশ্মীরী শালের নকশার মত আরবীয় কারুকাজের উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা, এর খিলানের উপর মনোরম মার্বেল পাথরের কারুকাজ, সুরম্য গম্বুজ, কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিখ্যাত শ্বেত পাথরের বাটি, মনোহর সঙ্গীত প্রকোষ্ঠ– যেখানে দরবার বসত এবং উপরের মঞ্চস্থিত গায়কদের সঙ্গীত শোনা যেত; এর অপূর্ব ছাদ এবং পিতলের সূক্ষ্ম ও সুদৃশ্য কারুকার্যময় জাফরী বিশিষ্ট মনোরম অন্তঃপুর, বৃহদাকার হলঘরগুলোর চুনকাম ও ক্ষুদ্রাকার প্রকোষ্ঠগুলোর মোচাকৃতি রেখার চমৎকার বর্ণ— এসব বিষয় বর্ণনা করতে হলে একজন সিদ্ধহস্ত লেখকের লেখনীর প্রয়োজন।

---

[১] মদীনাতুল-হামরা (আলহামব্রা রূপে বিকৃত), লাল নগরী বা প্রাসাদ– আল-আহমারের (লাল মানুষের পুত্র) পুত্রের নামানুসারে কিংবা এটি নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত লাল রঙের উপকরণ থেকে এর নামকরণ হয়েছে।

আল জেনারেলিফ

আল-হামরার বিপরীত দিকে একটি খাড়া পর্বতের পাশে সুবিখ্যাত রাজকীয় বাগান বাড়ি আল-জেনারেলিফ[১] বিরাজমান এবং লাল প্রাসাদের মতই এটি নগর প্রকারের অভ্যন্তরে অবস্থিত। জনৈক কুশলী লেখকের ভাষায় বলা যায়, এটি ছিল ঝর্ণা, কুঞ্জবন ও পুষ্পরাজি সমন্বিত সৌন্দর্যের এক বিস্ময়কর সমাহার– যদিও কয়েকটি প্রকাণ্ড সাইপ্রাস[২] ও মেহেদীবৃক্ষ ব্যতীত এর পূর্ব গৌরবের সবকিছুই বিনষ্ট হয়েছে। উদ্যানগুলো রঙ্গমঞ্চের মত শ্রেণীবদ্ধভাবে তৈরি হয়েছিল এবং পর্বত চূড়া থেকে নির্গত স্রোতস্বিনীসমূহ এটিকে সিঞ্চিত করে অসংখ্য জলপ্রপাত সৃষ্টি করে অবশেষে বৃক্ষ ও পুষ্পিত গুল্মের মধ্যে হারিয়ে যেত।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ব্যয়বহুল জনহিতকর কার্য সম্পাদনে গ্রানাডার রাষ্ট্রপ্রধানগণ[৩] কর্ডোভার খলিফাদের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। তাঁদের উদার ও সুশাসনে গ্রানাডা হয়ে উঠেছিল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বিশিষ্ট কবি, গুনান্বিত যোদ্ধা প্রমুখ প্রতি বিষয়ে আদর্শ স্থানীয় পুরুষদের আবাস্থল ও উৎসস্থল।

মহিলা পণ্ডিতগণ

গ্রানাডার নারীগণও সাহিত্যে কম খ্যাতি অর্জন করেননি– নাজহুন[৪], জয়নাব, হামদা[৫] হাফসাহ, আল-কালাইয়াহ[৬], সাফিয়া[৭] ও মারিয়ার[৮] নাম তাঁদের জন্মভূমির উপর চিরস্থায়ীভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। গ্রানাডার আরব অধিপতিগণ শুধু সুসাহিত্যেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেননি– ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, জ্যোতিষ, সাধারণভাবে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও সঙ্গীত সমান আগ্রহসহকারে চর্চা হত।

---

[১] আরবী আল-জামিউল আরিফ ধার্মিকের (তত্ত্বাবধানকারীর) মসজিদ থেকে বিকৃত; বাগানবাড়ি সংলগ্ন একটি সুদৃশ্য মসজিদ থেকে এই নাম হয়েছে।

[২] এখনো রানীর সাইপ্রাস নামে অভিহিত।

[৩] তাঁরাও খলিফা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়।

[৪] আবু বকর আল গাসসানীর কন্যা নাজহুন কুশলী কবি এবং ইতিহাস ও সাহিত্যে বিশারদ ছিলেন; ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর শেষদিকে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

[৫] . জযনাব ও হামদা ছিলেন পুস্তক বিক্রেতা জিয়াদের কন্যা এবং তাঁরা গ্রানাডার নিকটবর্তী ওয়াদিউল হামা (ওয়াওদি বলে উচ্চারিত) নামক স্থানে বাস করতেন। ইবনুল আব্বার তাঁর তুহফাতুল কাদীম গ্রন্থে বলেন, তাঁরা উভয়েই ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি এবং তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন; তাঁরা ছিলেন সুন্দরী, ধনবতী, শিষ্টাচারিণী ও সচ্চরিত্রা। তাঁদের জ্ঞানানুরাগ তাঁদেরকে পণ্ডিত লোকদের সংস্পর্শে নিয়ে আসে, যাঁদের সঙ্গে তাঁরা পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে গভীর স্থৈর্য ও মর্যাদারে সাথে মেলামেশা করতেন এবং কেউই তাঁদের সম্পর্কে শালীনতার নীতি বিস্মৃতির অভিযোগ আনতে পারেনি।

[৬] হাফসাহ ও কালাইয়াহ উভয়েই ছিলেন গ্রানাডার অধিবাসী।

[৭] সাপিয়া ছিলেন সেভিলের অধিবাসী। বাগ্মিতা ও কবিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ছাড়াও হস্তলিপিবিদ্যায় তিনি সবাইকে এমনভাবে অতিক্রম করেছিলেন যে, তাঁর লিপি কৌশল সবচেয়ে সুদক্ষ লিপিকারের জন্য একাধোরে বিস্ময় ও অনুকরণীয় ছিল।

[৮] আবু ইয়াকুব আল ফয়সলির কন্যা মারিয়াকে আরবদের করিনা বলা হয়; তিনিও তাঁর বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যেক শিক্ষায়তনের শাসনভার অধ্যক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকত। তিনি সবচেয়ে প্রথিতযশা পণ্ডিতবর্গের মধ্য থকে নির্বাচিত হতেন। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিরাজউদ্দিন আবু জাফর উমর আল-হাকামী গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এসব নিযুক্তির ব্যাপারে কোন ধর্মীয় পার্থক্য করা হত না এবং শিক্ষিত ইহুদী ও খ্রিস্টানরা প্রায়শই অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হতেন। আরবদের মতে, বিদ্বানের ধর্মমত অপেক্ষা প্রকৃত জ্ঞানের মূল্য অনেক বেশি ছিল।

স্পেনের আরবীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাৎসরিক স্মৃতি সম্মিলনী ও সাময়িক সভা আহ্বানের রীতি ছিল। এই সকল সভায় জনসাধারণ আমন্ত্রিত হত। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা কবিতা আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রদান করতেন। প্রত্যেক মহাবিদ্যালয়ের তোরণ দ্বারে নিম্নলিখিত পঙক্তি উৎকীর্ণ থাকত। পৃথিবী চারটি বস্তুর উপর ভর করে আছে, যেমন : বিদ্বানের জ্ঞান, মহতের ন্যায়পরায়ণতা, ধার্মিকের উপাসনা এবং বীরের বীরত্ব।

শৌর্যবীর্য

কর্ডোভার পতনের পর গ্রানাডা শৌর্যবীর্যের উপযুক্ত আবাস্থল হল। এখানে এর সর্বাধিক উন্নতি ঘটে। খলিফাদের রাজধানীর ন্যায় স্ত্রীলোকেরা এখানে উচ্চস্থান অধিকার করেছিল, তারা পুরুষদের সমাজে অবাধে মেলামেশা করত এবং আনন্দ-উৎসব, মল্লযুদ্ধ ও নিত্যনৈমিত্তিক যেসব দৃশ্য পরম্পরা গ্রানাডাবাসীদেরকে আনন্দ দান করত তাতে নারীদের উপস্থিতিতে প্রাণসঞ্চার হত। যে বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য গ্রানাডার আরবগণ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, নিঃসন্দেহে তা মহিলাদের মহান প্রভাবেরই ফলেই হয়েছিল। আরব অশ্বারোহীরা তাদের বাহুতে বর্ষা ফলক বিদ্ধ অন্তঃকরণ বা জাহাজে নির্দেশদানকারী তারকা বা প্রণয়িনীর নামের আদ্যক্ষর সমন্বিত একটি নকশা অঙ্কিত করে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হত বা যুদ্ধে যোগদান করত। বীরপুরুষগণ সাহসিকতার পুরস্কারের জন্য প্রকাশ্যে প্রণয়িনীর সামনে যুদ্ধ করত এবং প্রায়শই জামব্রা নামক মনোহরী নৃত্যে তার সাথে যোগদান করত। কথিত আছে, মহিলারা সুশ্রী, সুদর্শনা, প্রায়ই মধ্যমাকৃতি, কৌতুকপ্রিয় ও বাক্যালাপে চটুল ছিল। সূক্ষ্মতম ক্ষৌমবস্ত্র, রেশম বা সুতোয় তৈরি মূল্যবান জামা, কটিবন্ধ ও মস্তকাবরণ ছিল তাদের পরিচ্ছদ। ঐতিহাসিক ইবনুল খাতিব তাদের পেশাকের বিলাসিতাকে বাতুলতা বলে উল্লেখ করেন। ব্যাপকভাবে সুগন্ধী ব্যবহৃত হত এবং স্ত্রীলোকেরা, বিশেষকরে অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা সোনা ও মূল্যবান পাথরের অলঙ্কারের সাথে নীল কমল, পীত পাথর, পান্না ও অন্যান্য রত্ন দ্বারা নিজেদেরকে সুশোভিত করতে অত্যন্ত ভালবাসত; মসজিদে তাদের উপস্থিতি এত বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য সৃষ্টি করত যে তাদেরকে সুন্দর মাঠে বাসন্তী ফুলের সহিত তুলনা করা হয়েছে।

পুরুষদের মস্তকাবরণী

যেসব পুরুষ যুদ্ধের পেশা অবলম্বন করত তাদের মধ্যে মাথার পোশাক হিসেবে পাগড়ীর ব্যবহার বহু আগেই উঠে গিয়েছিল। ভ্যালেন্সিয়া, মুরসিয়া ও পূর্বাঞ্চলের

প্রদেশসমূহে সাধারণভাবে কাজী ও ফকীহগণ পর্যন্ত এর ব্যবহার ছেড়ে টুপি[১] পরিধান শুরু করেছিলেন। জনৈক সমসাময়িক লেখক[২] অনাবৃত মস্তকে মুরসিয়ার সুলতানের নিকট একজন খ্যাতনাম আল্লামা'র (উলেমা) উপস্থিত হওয়ার কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, ইবন হুদ[৩] বা ইবনুল আহমার কখনো পাগড়ী পরতেন না।

কর্ডোভা ও সেভিলের ন্যায় পশ্চিমাঞ্চলে কাজী ও ফকীহগণ সচরাচর পাগড়ী পরিধান করতেন, কিন্তু এশিয়ায় প্রচলিত পাগড়ী অপেক্ষা সেগুলো ছিল অনেক ক্ষুদ্রায়তন। ঐতিহাসিকগণ আমাদের বলেন যে, স্পেন দেশীয় মুসলমানগণ তাদের পূর্বাঞ্চলীয় ভ্রাতাদের বৃহদাকার পাগড়ী দেখে হাসি সংবরণ করতে পারত না। রাজা-বাদশাহ, শাহজাদা, অভিজাত শ্রেণী, সামরিক বিভাগের লোকজন ও জনসাধারণের অধিকাংশই পোশাক-পরিচ্ছদে তাঁদের প্রতিবেশী ফ্রাঙ্কদের অনুসরণ করতেন এবং তাদের ন্যায় পোশাক পরতেন। আরব অশ্বারোহীরা তাদের পূর্বপুরুষদের ধনুক ও তরবারী ব্যবহার না করে ফ্রাঙ্কদের মত ভারী বর্ম পরিধান করত এবং তাদের মতই চক্রধনু, বর্শা ও ঢাল ব্যবহার করত।[৫] বর্মের উপর তারা সাধারণত টুকটুকে লাল রঙের একটি খাটো বুটিদার জামা পরিধান করত।

কথিত আছে যে, শরীর, পোশাক ও গৃহাভ্যন্তরের পরিচ্ছন্নতায় স্পেন দেশীয় মুসলমানরা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত জাতি; বাস্তবিকই পরিচ্ছন্নতাকে তারা এমন চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল যে নিম্নশ্রেণীর একজন লোকের পক্ষে তাঁর দৈনিক আহারে খাদ্য না কিনে সাবানের জন্য শেষ দিরহাম ব্যয় করা অস্বাভাবিক ছিল না। এভাবে জনসাধারণের নিকট ময়লা পেশাকে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে অভুক্ত থাকা অস্বাভাবিক ছিল না।

সাধারণ আলোচনা

আমি এ পর্যন্ত গ্রানাডা ও কর্ডোভা সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। এবার স্পেন দেশীয় আরবদের শাসন-পদ্ধতি, সরকারের কাঠামো, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তাঁদের সময়ের সংস্কৃতির হাল সম্বন্ধে একটি সাধারণ আলোচনা করা আবশ্যক।

সরকার

সুলতান সরকারের সর্বোচ্চ কর্তা হলেও প্রকৃত শাসনকার্য সম্পাদিত হত প্রাচ্যদেশের ন্যায় উজির উপাধিধারী মন্ত্রীদের দ্বারা। রাজ্যের প্রতিটি কর্মবিভাগ পৃথক পৃথক মন্ত্রীর দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল। চারটি প্রধান বিভাগ ছিল বলে মনে হয়, যেমন : অর্থ, পররাষ্ট্র, বিচার বা অভিযোগ প্রতিকার বিভাগ এবং সৈন্যবাহিনীর ব্যবস্থাপনা, বেতন ও তত্ত্বাবধান বিভাগ। মন্ত্রণাসভার সদস্যদেরকেও উজির[৬] উপাধি দেয়া হত; কিন্তু দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদেরকে খলিফার মন্ত্রণা পরিষদের সাধারণ সদস্য থেকে পৃথক করার জন্য

---

[১] সম্ভবত কালানসুয়াকে (পূর্বে দেখুন) পরিমিত আকারে কমিয়ে কতকটা পারসি কুলাহের মত করে এসব টুপি তৈরি হত, কিন্তু বোধ হয় অত উঁচু ছিল না। ডোজি তাঁর Dictionnaire des Noms des Vetements Arabes গ্রন্থে নুওয়াইরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, কালানসুয়াহ স্পেনে প্রচলিত ছিল (পৃ. ৩৭১)।

[২] ইবনুস সাঈদ, ইবনুল আহমারের সমসাময়িক।

[৩] পূর্বে দেখুন।

[৫] মারিনীয় বংশের প্রভাবে সৈনিকদের সাজ-সজ্জার পরিবর্তন প্রতীয়মান হয়, যার কারণ সম্ভবত পরবর্তী কয়েকটি পরাজয়। সীমান্ত রক্ষীদের সম্বন্ধে পরিশিষ্ট দেখুন।

[৬] আরবী 'জাল উজির' শব্দকে স্পেনীয়রা তাদের প্রথামত আলগুয়াজিল রূপে বিকৃত করেছিল।

পূর্বোক্তরা উজির জুল বিজারাতাইন নামে অভিহিত হতেন। পরিষদের সভাপতিকে এশিয়ার প্রধান উজির বলা হত; স্পেনে তাঁর নাম ছিল হাজীব বা রাজ সরকার। তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতেন, রাজাজ্ঞা গ্রহণ করতেন এবং সাধারণত মন্ত্রীদের প্রধান হিসেবে কাজ করতেন। তাঁরা সবাই একটি হলঘরে বসলেও সভাপতির আসন অন্যদের আসন অপেক্ষা উঁচু ছিল। মন্ত্রীদের ন্যায় মন্ত্রণা পরিষদের সদস্যগণও পরিষদ কক্ষে খলিফার সাথে বসার সুযোগ পেতেন।

রাজ্যের সচিবগণ

রাজ্যে বিভিন্ন সচিব বা কাতিবুদ দাওয়াল ছিলেন, যাঁদের মধ্যে পত্র বিনিময় বিভাগের প্রধান (কিতাবাতুর রাসাইল) সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। কাতিবুজ জিমাম নামে আরেকজন কর্মচারী অমুসলমানদের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সাহিবুল আশগাল[১] নামে অভিহিত একজন কর্মচারীর উপর জনসাধারণের হিসাব নিরীক্ষণের দায়িত্ব ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন অর্থমন্ত্রী; কারণ তাঁর দপ্তর রাজস্ব আদায়, কর নির্ধারণ, ব্যয় নির্বাহ ও জোর-জুলুম প্রতিরোধ করত। গ্রানাডা রাজ্যে হিসাব রক্ষা, সুলতানের ব্যক্তিগত ব্যয় ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ওয়াকিল বলা হত। গ্রানাডায় কোন কর্মসচিব না থাকায় পত্র বিনিময় বিভাগ উজিরের তত্ত্বাবধানে ছিল এবং রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং নিযুক্তিপত্র ও চিঠিপত্রে সীলমোহর দিতেন। আফ্রিকার বনু আহমার ও বনু মারীনের শাসনকালে সাহিবুল আশগাল শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়কারীতে পরিণত হন।

কাজী

স্পেনে কাজীর পদ ছিল অতীব সম্মানজনক এবং প্রধান কাজীকে কাজীউল কুজ্জাত না বলে সচরাচর কাজীউল জামায়াত (জনসাধারণের কাজী) বলা হত।

পুলিশী বাহিনী

প্রাচ্য দেশের ন্যায় পুলিশ বিভাগের কর্তাকে বলা হত সাহিবুশ শুরতা এবং কর্ডোভার খলিফাদের আমলে তাঁকে প্রভূত ক্ষমতা দেয়া হত। পরবর্তী রাজবংশের আমলে তিনি কেবল পুলিশ বিভাগের অধিকর্তায় পরিণত হন। নগরেরর শাসনকর্তাকে সাহিবুল মদীন[২] বলা হত, কখনো কখনো সাহিবুল লাঈল[৩] বলা হত এবং তাঁরা কাজীর নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণাধীনে থাকতেন। মুহতাসিব এশিয়া ও আফ্রিকার নগরসমূহে অনুরূপ কাজ সম্পাদন করতেন। তিনি ব্যবসায়ীদের দাড়িপাল্লা ও বাটখারা পরীক্ষা, বাজার পরিদর্শন, উপদ্রব প্রতিরোধ এবং দোকানদারদের প্রতারণার বিচার করতেন। নৈশ প্রহরীদের বলা হত আদ দারাবুন বা দ্বাররক্ষী। এশার নামাজের পর নগরীর অভ্যন্তরীণ ফটকগুলো বন্ধ করার দায়িত্ব তাঁদের উপর নিযুক্ত থাকত। তারা সর্বদাই সশস্ত্র থাকত এবং তাদের সঙ্গে থাকত লণ্ঠন ও বৃহদাকার প্রহরী কুকুর।

---

[১] কাজকর্মের অধিকর্তা।

[২] নগরের শাসনকর্তা।

[৩] নৈশ শাসক। তাদেরকে কখনো কখনো আল-কায়িদও বলা হত, যাকে স্পেন দেশীয় খ্রিস্টানরা আল-কালদ রূপে বিকৃত করেছেন।

প্রাথমিক যুগে নৌবাহিনীর অধ্যক্ষকে বলা হত আমীরুল মা।[১] ফ্রাঙ্ক ও স্পেনীয়রা একে আলমিরান্ত রূপে বিকৃত করে। এটি পুনরায় আল মিলান্দ রূপে আরবদের নিকট আমদানি হয়। আবদুর রহমান আন-নাসির ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে এই উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে কায়িদ-উল আসাতিল বা নৌবহরের অধ্যক্ষ বলা হত। উমাইয়া ও আলমোহেডরা অত্যন্ত সুদক্ষ নৌ বাহিনী রাখতেন এবং তাঁদের সামুদ্রিক শক্তি সকল খ্রিস্টান জাতির সম্মিলিত শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। ইবন খালদুন বলেন, এই শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হওয়ায় প্রকৃতপ্রস্তাবে মুসলিম শক্তির ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।[২]

কৃষি

পৃথিবীর কোন দেশই আরব শাসিত স্পেন অপেক্ষা অধিকতর কৃষি বিষয়ক সমৃদ্ধি উপভোগ করেনি।[৩] তারা কৃষিকার্যকে বিজ্ঞানে উন্নীত করেছিল এবং অসাধারণ পরিশ্রম, দক্ষতা ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে বিস্ময়কররভাবে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল। কোন বিশেষ জমিতে কোন ফসলের খাপ খাইয়ে নেয়ার গুণ এবং নির্দিষ্ট প্রকার গাছ ও চারা ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রকার সার প্রয়োগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকায় তারা সবচেয়ে উর্বর ভূমিকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করেছিল। ধান, ইক্ষু, কার্পাস, জাফরান ও পালংশাক এবং অসংখ্য রকমের সুন্দর সুন্দর ফলের চাষ স্পেন উপদ্বীপে আমদানির জন্য স্পেনীয়রা আরবদের নিকট ঋণী। ঐ সকল ফল এক্ষণে প্রায় স্পেন উপদ্বীপের দেশজ ফলের ন্যায় হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে তাদের অনেকগুলোর ব্যবহার ও আবাদ ক্রমশ ইউরোপের বিভিন্ন অংশে প্রবর্তিত হয়।

স্পেনের অর্থনৈতিক অবস্থা

যে জমি যে ফসল আবাদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী তাতে সেই ফসলই লাগানো হত। ভ্যালেনসিয়া প্রদেশের এলচার নামক স্থানে তারা তমাল বৃক্ষের বিশাল কুঞ্জবন রেখে গেছে। আলবুফেরা নামক স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান চাষ হত। অলিভা ও গ্যানডিয়াতে ইক্ষু ও কার্পাস জন্মাত। জেরেস, গ্রানাডা ও মালাগা দ্রাক্ষাকুঞ্জে আচ্ছাদিত ছিল। সেভিলের চতুর্দিকস্থ অঞ্চলে এবং আন্দালুসিয়ার অধিকাংশ স্থানে জলপাইয়ের গাছ লাগানো হত।[৪]

স্পেনীয় আরবগণ মারহিফাল নামক এক রকম যন্ত্রের সাহায্যে মাটি সমান করত এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে জলসেচন পদ্ধতির সাহায্যে চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সমগ্র দেশ জলপ্রণালী ও খাল দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।[৫] তারা বিপুল পরিমাণ লোহা ও ইস্পাত তৈরি করত এবং তাদের ইস্পাত এত উৎকৃষ্ট ছিল যে স্পেনের অন্যান্য স্থানের চেয়ে গ্রানাডার তরবারী বেশি সমাদৃত ছিল। আরবরা স্পেনে

---

[১] সমুদ্রের অধিনায়ক

[২] ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে (বহরু রুম, বহরুশ শাম বলেও অভিহিত) মুসলিম শক্তির উত্থান ও পতন সম্পর্কে ইবন খালদুনের অভিমত অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তাঁর সময়ে (তিনি তৈমুর লঙ্গের সমসাময়িক ছিলেন) মুসলিম নৌ বাহিনীকে লক্ষণীয়ভাবে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হয়।

[৩] এই বিষয়ে মারফির সুস্পষ্ট মন্তব্য তুলনীয়।

[৪] আরবদের আমলে কৃষির কিরূপ উন্নতি হয়েছিল তা এই ঘটনা থেকে সম্যকভাবে প্রমাণিত হয় যে, ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ফার্দিনান্দ যখন সেভিল অধিকার করেন, তখন ঐ প্রদেশে লক্ষ লক্ষ জলপাই গাছ এবং জলপাইয়ের তেল নিষ্কাশনের জন্য প্রায় ১,০০,০০০ কল ছিল।

[৫] কারমোনার জলপ্রণালী দিয়ে কয়েক লীগ দূর পর্যন্ত জল নিয়ে যাওয়া হত।

রেশম ও সুতো শিল্পের প্রবর্তন করে। স্পেনে অতি উৎকৃষ্ট পশমী বস্ত্রও প্রস্তুত হত। তারা রং করার কাজে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে এবং কথিত আছে, নীলের সাহায্যে রং করার কৌশল তারাই আবিষ্কার করে। আল-হামব্রার প্রাসাদে বিশিষ্ট অলঙ্কার স্বরূপ চকচকে টালির ব্যবহার চীনামাটির শিল্পে তাদের অগ্রগতির পরিচয় দেয়। তাদের রপ্তানির মধ্যে ছিল সোনা, রূপা, তামা, কাঁচা ও শিল্পায়িত রেশম, চিনি, লাক্ষা, পারদ, অপরিষ্কৃত ও ঢালাই লোহা, জলপাই, পশমী বস্ত্র, স্ফটিক তেল, পীত স্ফটিক, চুম্বক পাথর, সুরমা, অভ্র, সবুজ স্ফটিক, স্ফটিক পাথর, তেল, গন্ধক, জাফরান, আদা, সুগন্ধী নির্যাস ও বিভিন্ন ওষুধজাতীয় দ্রব্যাদি; আন্দালুসিয়ার উপকূল থেকে আহরিত প্রবাল, ক্যাটালোনিয়ার উপকূল থেকে প্রাপ্ত মুক্তা, মালাগা ও বেজার খনি থেকে চুনী এবং কার্থাজেনার নিকট হতে সংগৃহীত মূল্যবান প্রস্তর। তারা চামড়া পাকা করা, পালিশ করা, রং করা ও পরিশোভিত করার জন্য বিশেষভাবে খ্যাত ছিল– যা স্পেন থেকে মুরদের বিতাড়নের পর সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়। স্পেন থেকে ফেজ হয়ে এটি ইংল্যান্ডে নীত হয়। এটি এখনো মরক্কো ও কর্ডোভান নামে পরিচিত। তারা স্পেনে বারুদ, চিনি এবং কাগজ শিল্পেরও প্রবর্তন করে।

চারুশিল্প

চারুশিল্পও অবহেলিত ছিল না এবং স্পেনীয় আরবরা ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে তাদের খ্রিস্টান প্রতিবেশীদেরকে অতিক্রম করেছিল। কীভাবে কর্ডোভায় খলিফাদের প্রাসাদ, বিশেষকরে আজ-জাহরা প্রাসাদ খোদিত প্রতিমূর্তি ও চিত্রশিল্প দ্বারা সুসজ্জিত ছিল তা আমরা জানতে পারি। পক্ষান্তরে আলহামব্রায় অদ্যাবধি সংরক্ষিত সিংহমূর্তি ও ঐতিহাসিক চিত্রশিল্প[১] থেকে গ্রানাডায় এই উভয় শিল্পের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন প্রত্যেক শহরে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় ছিল। প্রতিটি প্রধান নগরে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। কর্ডোভা, সেভিল (ইসবিলিয়া)[২], মালাগা, সারাগোসা, লিসবন (আলিশবুনা), জেন ও সালামানকার বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিল।

স্পেন যে অসংখ্য মুসলিম ঐতিহাসিকের জন্মদান করেছে তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজন সবচেয়ে বিখ্যাত–

ইবন হাইয়ান[৩], ইবনুল আব্বার[৪], আবু উবায়দুল্লাহ্ আল-বাকরী, ইবন বুশকুয়াল (আবুল কাসিম খালপ[৫] ইবন আবুদল মালিক ইবন মাসউদ ইবন মুসা), ইবনুস সাঈদ (আবুল হাসান আলী[৬]), আশ শাকান্দী (আবুল ওয়ালিদ ইসমাঈল, শাকুন্দার অধিবাসী[৭]) ও ইবনুল খাতিব (লিসানুদ্দিন[৮])। পূর্ববর্তী কোন পৃষ্ঠায় আমি গ্রানাডার

---

[১] চিত্রশিল্পগুলো এক প্রকার পুড়িয়ে রং করা পদ্ধতিতে তৈরি এবং এতে মন্ত্রণা পরিষদের সভা, যুদ্ধক্ষেত্র, অশ্বারোহীদের মিছিল ও বিভিন্ন রকম শিকারের দৃশ্য প্রদর্শিত হয়েছে।

[২] রোমকদের হিসপালিস।

[৩] তিনি স্পেনের দুটি ইতিহাস লিখেছেন; একটি দশ খণ্ডে, অন্যটি ষাট খণ্ডে।

[৪] ১০৭৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হয়।

[৫] ১১০১ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভায় জন্ম; মৃত্যু ১১৮৩ খ্রিস্টাব্দে।

[৬] ১২১৪ খ্রিস্টাব্দে গ্রানাডায় জন্ম; মৃত্যু ১২৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি সেভিলে শিক্ষালাভ করেন।

[৭] মৃত্যু ১২৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে।

[৮] জন্ম ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি গ্রানাডার সপ্তম সুলতান ইউসুফ আবুল হাজ্জাজ ও তাঁর উত্তরাধিকারী আল-গণির উজির ছিলেন। রাজদ্রোহীতার সন্দেহে ১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ইবন খালদুন যেহেতু তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন সেহেতু আমি তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পরিশিষ্টে দিয়েছি।

কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী মহিলার নাম উল্লেখ করেছি। প্রাথমিক যুগে যেসব খ্যাতনামা কবি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মহিলা কর্ডোভা ও অন্যান্য স্থানে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের নাম এখানে যোগ করলে চিত্তাকর্ষক হবে। গুয়াদালাক্সারার দুইজন অধিবাসিনী কবি আবুল হুয়াসনের কন্যা হাসনা আত-তামীমিয়াহ ও উম্মুল উলা হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে খ্যতিলাভ করেন। পয়গাম্বরের বংশধর বলে আশ-শরীফা উপাধিপ্রাপ্ত আম্মাতুল আজিজ ও আলমারিয়া প্রদেশের বেজেনাহ নামক স্থানের বাশিন্দা আল গুসানিয়াহ পঞ্চম শতাব্দীতে খ্যাতিলাভ করেন। এসব মহিলা তৎকালীন পণ্ডিতদের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন।

ভ্যালেনসিয়ার অধিবাসিনী আল-আরুজিয়াহ ছিলেন প্রখ্যাত বৈয়াকরণবিদ ও আলঙ্কারিক। তিনি ৪৫০ হিজরিতে ডেনিয়ায় পরলোকগমন করেন। সৌন্দর্য, প্রতিভা, আভিজাত্য ও ঐশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত হাফসাহ আর রাকুনিয়াহ আলমোহেডদের আমলে খ্যাতিলাভ করেন। গুয়াদালাক্সার আরেক অধিবাসিনী হামদুনের কন্যা হাফসা হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। ওয়াদি আশের (গডিক্স) অধিবাসিনী জয়নাব আল মুরাবিয়া হাজিব আল মুজাফফিরের সময় জীবিত ছিলেন এবং হজিবের পরিবারের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আবু ইয়াকুব আল আনসারির কন্যা মরিয়ম সেভিলের অধিবাসিনী ছিলেন; তিনি ছিলেন বিদুষী ও সদগুণসম্পন্না মহিলা এবং তিনি অলঙ্কারশাস্ত্র, কবিতা ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এই গুণ তাঁর ধার্মিকতা, নৈতিক সততা ও অমায়িক ব্যবহারের সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে মহিলাদের মধ্যে আদরণীয় করে তুলেছিল এবং অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকে তাঁর মৃত্যু হয়। সেভিলের আরেক অধিবাসীনী আসমা আল আমারিয়া ছিলেন একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। কাজী আবু মুহম্মদ আবদুল হক ইবন আতিয়াহর কন্যা উম্মুল হিনা একাধারে কবি ও আইনজ্ঞ ছিলেন। আল মুসতাকফির কন্যা ওয়াল্লাদাহর[১] বন্ধু কর্ডোভাবাসিনী বাহজা তাঁর সৌন্দর্য ও কবিতার জন্য সমানভাবে বিখ্যাত ছিলেন। সেভিলের শেষ সুলতান মুতামিদের সহধর্মিণী ও কন্যা ইতিমাদ আররামিকিয়াহ ও বুসিনাও তৎকালীন পণ্ডিতদের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন।

যেসব খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক তাঁদের জন্মভূমি স্পেনকে গৌরবোজ্জ্বল করে গেছেন তাঁদের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বর্ণনা ব্যতীত স্পেনীয় মুসলমানাদের বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ইবনুস সাইগ (স্বর্ণকারের পুত্র) উপাধিপ্রাপ্ত ও সাধারণভাবে ইবন বাজা (আভেন পেস বা আভেমপেস) নামে পরিচিত আবু বকর মুহম্মদ ইবন ইয়াহিয়া ছিলেন সারাগোসার অধিবাসী এবং তাজিব বংশোদ্ভূত। তিনি চিকিৎসাবিদ, দার্শনিক, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কৃতিত্বের সাথে সাথে তিনি সঙ্গীতে চরম পারদর্শিতা যুক্ত করেন। তিনি ফেজে ৫৩৩ হিজরিতে (১১৩৮ খ্রিস্টাব্দ) পরলোকগমন করেন।

ইবন তুফাইল (আবু বকর মুহম্মদ ইবন আবদুল মালিক ইবন তুফাইল) স্পেনের আরবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন। তিনি ওয়াদি আশে (গডিক্স) জন্মগ্রহণ করেন এবং চিকিৎসাবিদ, গণিতবিদ, দার্শনিক ও কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি

[১] পূর্বে দেখুন।

আলমোহেড বংশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়ক আবু ইয়াকুব ইউসূফ কৃর্তক অত্যন্ত সম্মানিত হয়েছিলেন। ইবন তুফাইল ৫৮১ হিজরিতে (১১৮৫ খ্রিস্টাব্দ) মরক্কোয় পরলোকগমন করেন এবং ইউসূফের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইয়াকুব আল মনসুর স্বয়ং তাঁর দাফন-কাফনে সহায়তা করেছিলেন। ইবন তুফাইলের বিখ্যাত গ্রন্থ হাই ইবন ইয়াকজান[১] সম্ভবত যুক্তিবাদী ধর্ম সম্বন্ধে লিখিত প্রথম গ্রন্থগুলোর অন্যতম।

ইবন জুহর[২] (আবু বকর আল ইয়াজী) সেবিলের অধিবাসী ছিলেন এবং এক প্রতিভাবান পরিবারে তাঁর উদ্ভব ঘটেছিল। উক্ত পরিবারের সকল লোকই ছিলেন পণ্ডিত, চিকিৎসাবিদ ও উজির। তাঁদের অনেকেই সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হয়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন এবং সেই সাথে লাভ করেছিলেন বিশেষ প্রতিপত্তি । ইবন জুহর ছিলেন আবু ইউসূফ ইয়াকুব আল মনসুরের প্রধান চিকিৎসক। ৫৯৫ হিজরিতে (১১৯৯ খ্রিস্টাব্দ) তিনি পরলোকগমন করেন।

ইবন রুশদ বিখ্যাত আভিরোস (আবুল ওয়ালিদ মুহম্মদ ইবন আহমদ ইবন রুশদ) ৫২০ হিজরিতে (১১২৬ খ্রিস্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ ও পিতা আলমুরাবিতের আমলে আন্দালুসিয়ার কাজী ছিলেন। ইবন রুশদ আবু মারওয়ান ইবন জুহর ও ইবন তুফাইলের বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন; ইবন তুফাইল তাঁকে আবু ইয়াকুব ইসূফের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ১১০৯ খ্রিস্টাব্দে ইবন রুশদ সেবিলের কাজী ছিলেন। ১১৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কর্ডোভায় কাজীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি ৫৯৫ হিজরির ৯ সফর (ডিসেম্বর, ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দ) পরলোকগমন করেন।

---

[১] এই গ্রন্থ পোকক কর্তৃক লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং অ্যাশওয়েল কর্তৃক ইংরেজিতেও সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত হয়েছে (১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দ)।

[২] অ্যাভেনজোর, পূর্বে দ্রষ্টব্য। তাঁর পিতার নাম আবু মারওয়ান আবদুল মালিক আলমোহেড বংশের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল মোমিনের প্রধান চিকিৎসক। তাঁর পিতামহ ছিলেন তৎকালীন উজির ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, সেকালের দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদ। তিনি কর্ডোভায় ৫২৫ হিজরিতে (১১৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দ) পরলোকগমন করেন। তাঁর প্রপিতামহ আবদুল মালিক পূর্বাঞ্চল পরিভ্রমণ করে দীর্ঘদিন চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন এবং বাগদাদে চিকিৎসা বিভাগের প্রধান হন; অতঃপর তিনি মিশর এবং সেখান থেকে কায়রোয়ানে গমন করেন। পরবর্তীকালে তিনি ডেনিয়াতে বসবাস করেন, সেখান থেকে তাঁর খ্যাতি স্পেন ও পশ্চিমাঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এত স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল যে, তিনি তাঁর সমসাময়িক সকল চিকিৎসককে ম্লান করে দিয়েছেন। তিনি ডেনিয়ায় পরলোকগমন করেন।

অধ্যায়-৩২
আফ্রিকায় আরবগণ
[১৬৯-৫৬৭ হিজরি; ৭৮৫-১১৭১ খ্রিস্টাব্দ]

ইদ্রিসী বংশ : আগলাবী বংশ : সিসিলি আক্রমণ : বিজয় : আগলাবী বংশের পতন : ফাতিমীদের অভ্যুদয় : মিশর বিজয় : কায়রো নগরীর পতন : সিরিয়া, হিজাজ ও ইয়েমেন বিজয় : ফাতিমীদের অবনতি : বংশের অবসান : কায়রো : ইসমাঈলীদের জমকালো বাসভূমি।

ইদ্রিসী বংশ : প্রথম ইদ্রিস

আব্বাসীয় বংশের তৃতীয় খলিফা মাহদীর সময় পর্যন্ত আফ্রিকার সমগ্র অঞ্চল আব্বাসীয়দের আধিপত্য স্বীকার করত। হাদীর রাজত্বকালে প্রথম হাসানের বংশধর ইদ্রিস পশ্চিম মরিটানিয়ায় পালিয়ে যান[১] এবং সেখানকার বার্বার গোত্র তাঁকে তাদের সর্দার ও আমির বলে গ্রহণ করলে তিনি তাদের সহায়তায় একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন, যা উত্তর আফ্রিকায় দীর্ঘদিন সগৌরবে বিদ্যমান ছিল। তিনি ফেজ নগরী নির্মাণ করে সেখানে নিজের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সুশাসনে শীঘ্রই এই রাজ্য সভ্যতা ও জ্ঞানের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় ইদ্রিস

কথিত আছে যে, তিনি একজন আব্বাসীয় গুপ্তচর কর্তৃক বিষ প্রয়োগে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর শিশুপুত্র ইদ্রিস মাতা ও উজির গালিবের অভিভাবকত্বে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন । দ্বিতীয় ইদ্রিস নিজেকে বিখ্যাত যোদ্ধা হিসেবে প্রতিপন্ন করেন এবং দক্ষিণাঞ্চলে অনেক স্থানে বিজয়লাভ করেন। ইবন খালদুন বলেন, 'এই সময় আব্বাসীয় শাসন (আদ দাওয়াত) পশ্চিমে (মরিটানিয়া) সুসুল-আকসা থেকে শিলফ (সিলভস) পর্যন্ত অঞ্চলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ইদ্রিসের মৃত্যু [২১৩ হি; ৮২৫ খ্রি.]; মুহম্মদের সিংহাসনারোহণ

২১৩ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র মুহম্মদ খলিফা হন। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের উপর প্রাদেশিক শাসনকার্যের ভার দেয়ার যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা বিস্ময়করভাবে সফল হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ তাঁর যেসব ভাইকে তিনি শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ব্যতীত আর সকলেই শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুগত ছিলেন।

মুহম্মদের মৃত্যু [২২১ হি; ৮৩৩ খ্রি.]; আলীর সিংহাসনারোহণ

২২১ হিজরিতে মুহম্মদ মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পুত্র আলী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সে সময় আলীর বয়স ছিল মাত্র নয় বছর। আলীর সিংহাসনারোহন সকল প্রজা কর্তৃক আনুগত্যের সাথে গৃহীত হয় এবং তাঁর পিতার বিশ্বস্ত কর্মচারীরা এরূপ কৃর্তকার্যতার সাথে শাসনকার্য চালান যে এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন, তাঁর শাসনকাল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল।

---

[১] পূর্বে দেখুন।

আলীর মৃত্যু [২৩৪ হিজরি; ৮৫৬ খ্রি.]; ইয়াহিয়ার সিংহাসনারোহণ

তিনি বাইশ বছর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃতুমুখে পতিত হন এবং তাঁর ভাই ইয়াহিয়া ইবন মুহম্মদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি চতুর্দিকে তাঁর ক্ষমতা বিস্তার করেন এবং রাজ্যে সম্পদ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়। তিনি ফেজ[১] নগরীকে সম্প্রসারিত ও সুশোভিত করেন, যেখানে চারদিক থেকে দলে দলে লোকজন এসে বসবাস করতে থাকে।

ইয়াহিয়ার মৃত্যু [২৬৪ হি; ৮৭৮ খ্রি.]

দ্বিতীয় ইয়াহিয়ার সিংহাসনারোহণ ও তাঁর সিংহাসনচ্যুতি

২৬৪ হিজরিতে ইয়াহিয়ার মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র ইয়াহিয়া তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর অত্যাচারের ফলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এর ফলে তিনি রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। তিনি স্পেনে পালিয়ে যান এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় ইয়াহিয়ার সিংহাসনচ্যুতির পর তাঁর পিতৃব্য পুত্র আলী ইবন উমর[২] রাজধানীতে নিজের প্রভুত্ব কায়েম করেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন ফেজ নিজের অধিকারে রাখতে পারেননি। কারণ এক খারিজী বিদ্রোহের ফলে তিনি স্পেনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

তৃতীয় ইয়াহিয়া

আলীর পলায়নের পর ফেজের জনসাধারণ ইয়াহিয়া[৩] নামক দ্বিতীয় ইদ্রীসের এক পৌত্রকে তাদের আমির ও খলিফা বলে ঘোষণা করে। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও আইনজ্ঞ এবং হাদীস বিশারদ। কিছুদিন পর্যন্ত তিনি পূর্ববর্তী ইদ্রিসী রাজ্যের সমগ্র অঞ্চল নিজের কর্তৃত্বাধীনে রাখতে সমর্থ হন।

তাঁর বিতাড়ন ও মৃত্যু

কিন্তু ৩০৯ হিজরিতে অকস্মাৎ তাঁর শানসকালের অবসান ঘটে। কারণ ঐ বছর তিনি মিকনাসার ফাতিমী শাসনকর্তা কর্তৃক তাঁর রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। অতঃপর তিনি নির্জনবাস অবলম্বন করে ৩৩১ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মাহদীয়াতে বসবাস করেন। তৃতীয় ইয়াহিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইদ্রিসীয় খিলাফতের অবসান হয়। এই বংশের বিভিন্ন শাহজাদা সীমান্তবর্তী প্রদেশসমূহ অধিকার করে রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। ৩১৯ হিজরিতে তৃতীয় আবদুর রহমান (আন-নাসির) আফ্রিকায় একটি অভিযান প্রেরণ করেন। মরিটানিয়ার এক বিরাট অংশ অধিকৃত হয় এবং বহু ইদ্রিসীয় শাহজাদা কর্ডোভায় নির্বাসিত হন। এভাবে পশ্চিম মরক্কো স্পেনীয় খলিফাদের হাতে চলে যায়, অন্যদিকে পূর্ব মরক্কো ফাতিমীদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে।

১৮৪ হিজরিতে ইফ্রিকিয়া[৪] কীভাবে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয় তা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

---

[১] আরবীতে ফাস।

[২] উমর ছিলেন প্রথম ইয়াহিয়ার ভাই।

[৩] তাঁর পিতার নাম ছিল কাসিম।

[৪] পূর্বে দেখুন।

আগলাবী বংশ (আগালিবা) [মুহররম ১৮৪ হি; ৮০১ খ্রি]. ইব্রাহীম আগলাবের মৃত্যু [১৯৬ হি.; ৮১২ খ্রি]; আবুল আব্বাস আবদুল্লাহর সিংহাসনারোহণ; তাঁর মৃত্যু [৬ জুল হিজ্জা, ২০১ হি.; ৮১৭ খ্রি.]; জিয়াদাতুল্লাহর সিংহাসনারোহণ।

এ বংশের প্রথম আমীর ইব্রাহীম ইবন আগলাব ছিলেন বিরাট শাসন প্রতিভা ও চারিত্রিক বলের অধিকারী। তিনি কায়রোয়ানের সন্নিকটে আব্বাসীয়া নামক একটি নতুন নগরীর পতন করে এটিকে তাঁর রাজধানীতে পরিণত করেন। তিনি বারো বছরেরও বেশিকাল সময় রাজত্ব করেন এবং তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর উত্তরাধিকারী হন। তাঁর শাসনকালে কোন প্রকার যুদ্ধ ও গোলযোগ ছিল না। রাজ্যে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত ছিল এবং জনসাধারণ সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী হয়েছিল।[১] ২০১ হিজরিতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁর ভাই জিয়াদাতুল্লাহ তাঁর উত্তরাধিকারী হন। তিনি মহা প্রতিভাবান ও উচ্চাভিলাষী এবং শিল্প ও জ্ঞান-চর্চার প্রখ্যাত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর উদ্ধত ও বেপরোয়া স্বভাবের ফলে এক ভয়াভহ বিদ্রোহ দেখা দেয়। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা শেষবারের মত পরাজিত হয় এবং ২০৮ বা ২০৯ হিজরিতে পুনরায় দেশে শান্তি স্থাপিত হয়।

সিসিলি বিজয়

সিসিলি[২] দ্বীপের দক্ষিণাংশে বহুদিন যাবৎ আরবদের একটি উপনিবেশ ছিল। এই আগলাবী সুলতানের আমলে দ্বীপটিতে নিয়মানুগ শানাধিকার শুরু হয়। ২১৩ হিরজিতে তিনি কায়রোয়ানের কাজী আসাদ ইবন ফুরাতের[৩] নেতৃত্বে সিসিলিতে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। এই আক্রমণের প্রাথমিক কারণ সম্পর্কে আরব ও খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ কিছুটা ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।[৪] খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ইউফেমিয়াস নামক এক বাইজান্টাইন যুবক একজন অতি আগ্রহশীলা সন্ন্যাসীকে তাঁর মঠ থেকে চুরি করায় সম্রাট তার জিহ্বা কাটার শাস্তি প্রদান করেন। সে ইফ্রিকিয়ার আরবদের নিকট পালিয়ে যায় এবং সিসিলি দ্বীপে অভিযান পরিচালনা করার জন্য তাদেরকে প্ররোচিত করে। এই অভিযানের ফলে অবশেষে সমগ্র সিসিলি আরবদের অধিকারে আসে। আরব ঐতিহাসিকগণ সন্ন্যাসিনী সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি।

৮২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দ

ইবনুল আসির বলেন, রোমানদের সম্রাট কনস্ট্যান্টিনোপল বা কুসতুতুনিয়ায় বসবাস করতেন। তিনি ২১১ হিজরিতে কনস্ট্যান্টটাইন নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সিসিলির শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেন। কনস্টান্টটাইন ফিমী (ইউফেমিয়াস) নামক একজন সাহসী ও বিচক্ষণ রোমান সৈনিককে নৌ বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং তিনি ইফ্রিকিয়া আক্রমণ করে মুসলমানদের বিপুল ক্ষতিসাধন করেন। ইতিমধ্যে ফিমীকে কারাগারে নিক্ষেপ করে যন্ত্রণাদানের জন্য কনস্ট্যান্টাইন সম্রাটের নিকট হতে আদেশ প্রাপ্ত হন। তা শুনে ফিমী অস্ত্রধারণ করে কনস্ট্যান্টাইনকে ক্যাটানিয়ায় (কাতানিয়া) বিতাড়িত করেন এবং নিজেকে সিসিলির রাজা বলে ঘোষণা করেন । অতঃপর ফিমী ও তাঁর সহকারী বালাতার[৫] মধ্যে যুদ্ধ বাধে। বালাতা পালারমোর[৬]

---

[১] ইবনুল আসির, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৮।

[২] আরবগণ কর্তৃক সিকিলিয়া নামে অভিহিত।

[৩] আসাদিয়া নামক মালিকী মতবাদ ও আইন সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থের লেখক।

[৪] অধ্যাপক আমারী তাঁর স্টোরিয়া ডেই মুসুলমানী ডি সিসিলিয়া গ্রন্থে উভয় মতই উল্লেখ করেন।

[৫] আমারী এক্কে পালাতা বলে উল্লেখ করেছেন।

[৬] আরবদের বালারাম।

শাসনকর্তা মাইকেলের (মিখাইল) সাহায্য প্রাপ্ত হন। ফিমী বালাতার হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন এবং বালাতা নিজেকে সিরাকুসের (সারাকুসা)[১] অধিপতি বলে প্রচার করেন। অতঃপর ফিমী জিয়াদাতুল্লাহ আগলাবকে সিসিলির প্রভুত্ব দানের প্রস্তাব দিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই চমৎকার প্রস্তাবে প্ররোচিত হয়ে জিয়াদাতুল্লাহ সিসিলিতে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। আরবগণ ২১২ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে মাজুরা (আরবদের মাজার) নামক স্থানে অবতরণ করেন। ফিমীর শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী বালাতা এখানে তাদের সম্মুখীন হন এবং শোচনীয় পরাজয়বরণ করেন। তিনি ক্যালাব্রিয়ায়[২] (কালুরিয়া) পালিয়ে যান এবং সেখানে কিছুদিন পরই তাঁর মৃত্যু হয়। মুসলমানরা দ্বীপের বিপুল সংখ্যক দুর্গ দ্রুত নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসে। সিরাকুস অবরুদ্ধ হয়, কিন্তু আরব শিবিরে মহামারী আরম্ভ হওয়ায় আসাদ ও তাঁর বহু সংখ্যক সৈন্য কালগ্রাসে পতিত হয়। তখন সিরাকুজের উদ্ধারের জন্য প্রেরিত বাইজান্টাইন সৈন্যদল আসাদের স্থলাভিষিক্ত মুহম্মদ ইবন আবিল জাওয়ারীকে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য করে। তবুও মুসলমানরা মিনিও (মিনাও) এবং জিরজেনটিও (জুরজন্ট) দখল করতে সমর্থ হয়। তারা এসব স্থানে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে।

ফিমীর মৃত্যু

কাসর ইয়ানা (আধুনিক ক্যাস্ট্রোজিয়োভানি)[৩] নামক স্থানে তারা তাদের মিত্র ফিমীকে হারায় এবং তিনি ঐ স্থানের অধিবাসীগণ তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করে। কিছুদিন পর মুহম্মদ ইবন আবিল জাওয়ারী মুমূর্ষু অবস্থায় পৌছলে জুহাইর ইবন গাউস সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে বাইজান্টাইনরা কনস্ট্যানটিনোপল থেকে নতুনভাবে বিপুল সংখ্যক সৈন্য প্রাপ্ত হয়ে এবার তারা আক্রমণকারীদেরকে দ্বীপ থেকে বিতাড়নের জন্য চূড়ান্তভাবে চেষ্টা করে। আরবরা মিনিওতে অবরুদ্ধ হয় এবং সেখানকার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে । সৌভাগ্যক্রমে স্পেন ও আফ্রিকা থেকে তাদের জন্য নতুন সৈন্য সাহায্য এসে পৌঁছায়। বাইজান্টাইনগণ সিরাকুসে প্রত্যাবর্তন করে এবং আরবরা পুনরায় আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে।

পালার্মো বিজয় [রজব, ২১৬ হি: ৮৩১ খ্রি.]

২১৬ হিজরির রজব[৪] মাসে রাজধানী পালার্মো সুবিধাজনক শর্তে আত্মসমর্পণ করে। পালার্মো অধিকার প্রকৃতপক্ষে উক্ত দ্বীপ অধিকারের প্রারম্ভ ছিল।[৫]

১৫ রমজান, ২২০ হিজরি; ১১ সেপ্টেম্বর, ৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ

দেশের ব্যাপক অংশ আরবদের শাসনাধীনে এলেও যে পর্যন্ত জিয়াদাতুল্লাহর আত্মীয় আবুল আগলাব ইব্রাহীম ইবন আবদুল্লাহ সিসিলির সামরিক ও অসামরিক শাসনকর্তা হয়ে না আসেন, সে পর্যন্ত নিয়মানুগ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। তাঁর শাসনকালে এটনা পর্বতের (আগ্নেয়গিরি)[৬] পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অধিকৃত হয়।

---

[১] ইতালীয় সিরাকুসা।

[২] কালাভরিয়াও পড়া হয়।

[৩] রোমানদের ক্যাস্ট্রাম এনা।

[৪] ১৩ আগস্ট থেকে ১১ সেপ্টেম্বর, ৮৩১ খ্রিস্টাব্দ।

[৫] আমারী।

[৬] জাবলুন নার।

আবু ইকাল আগলাবের সিংহাসনারোহণ [১৪ রজব, ২২৩ হি.; ১০ জুন, ৮৮৩ খ্রি.]
২২৩ হিরজিতে জিয়াদাতুল্লাহ পরলোকগমন করেন এবং তাঁর ভাই আবু ইকাল আগলাব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর শাসনকাল ছিল সমৃদ্ধশালী ও সাফল্যজনক। সিসিলিতে নতুন সৈন্য সাহায্য প্রেরিত হয় এবং এই অঞ্চলে বিজয়ের কাজ দ্রুত চলতে থাকে। আরবরা এই সময় দক্ষিণ ইতালিতে অবতরণ করে এবং ক্যালাব্রিয়ার উপকূলে বহু শক্তিশালী স্থান দখল করে নেয়।

আগলাবের মৃত্যু [রবিউসসানি, ২২৬ হি.]; আবুল আব্বাস মুহম্মদের সিংহাসনারোহণ
দুই বছর সাত মাসের স্বল্পকালীন রাজত্বের পর আগলাব ২২৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস মুহম্মদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা ও বিচক্ষণ শাসক।

৯ অক্টোবর, ৮৪২ খ্রি.; ২৮ সেপ্টেম্বর, ৮৪৩ খ্রি.
২২৮ হিজরিতে হিজরিতে সিসিলির রাজ প্রতিনিধির সহকারী ফজল ইবন জাফর হামদানী সমুদ্র পথে অভিযান করে মেসিনার (মেসিন) নিকটে অবতরণ করেন। নেপলস (নাবিল) থেকে সাহায্য পেয়ে মেসিনা দুই বছর পর্যন্ত আরব আক্রমণ প্রতিরোধ করে। কিন্তু অবশেষে আত্মসমর্পণ করে উদার শর্ত লাভ করে।

৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ
২৩২ হিরজিতে ফজল লেনটিনি নগর অধিকার করেন এবং মূল ভূখণ্ডের (আরজুল কুবরা) বহুদূর পর্যন্ত তাঁর বিজয়ের হাত প্রসারিত করেন। ক্যালাব্রিয়া ও ক্যাম্পানিয়া বিধ্বস্ত হয় এবং একশত পঞ্চাশটি শহর অধিকৃত কিংবা করদানে স্বীকৃত হয়। একটি আরব নৌবহর টাইবার নদীতে ভাসমান হয়ে ফুনী ও রোমের উপকণ্ঠ লুণ্ঠন করে এবং গেটা অবরুদ্ধ হয়। কিন্তু আরবদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে রাজধানী রোম রক্ষা পায়। ২৩৩ হিজরিতে আরবরা টারান্ট (টোরেন্টো) নগরে বসতি স্থাপন করে।

৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ
২৩৪ হিজরিতে রাগুসা (রাগুস) তাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। ২৩৫ হিজরিতে তারা পুনরায় রোম আক্রমণ করে। এক আকস্মিক ও ভয়াবহ ঝটিকা সবচেয়ে নির্ভীক নাবিকদের দক্ষতা ও সাহসকে বিভ্রান্ত করে দেয়ায় পোপ (চতুর্থ লিঁও) রক্ষা পান। আরব নৌবহর শত্রুপক্ষীয় উপকূল সংলগ্ন ডুবো পাহাড় ও দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। রাজপ্রতিনিধি ইবন আবদুল্লাহ ২৩৬ হিজরির রজব মাসে পলার্মোতে পরলোকগমন করেন। অতঃপর আরব ঔপনিবেশিকরা ফজলের পুত্র আব্বাসকে তাদের সেনাপতি নির্বাচিত করে এবং তাদের নির্বাচন ইফ্রিকিয়ার শাসনকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। আব্বাস সিসিলি ও ইতালীয় ভূখণ্ড বিজয়ের কাজ পূর্নোদ্যমে চালিয়ে যান।

৮৫৩-৫৫ খ্রিস্টাব্দ
২৩৯ ও ২৪০ হিজরিতে ক্যাটানিয়া, ক্যালটাভটুরো (কালাত আবি সুর) ও অন্যান্য অনেক স্থান পরপর দ্রুত অধিকৃত হয়।

সিসিলির শাসনকর্তা আব্বাস ২৪৭ হিজরিতে পরলোকগমন করেন; অতঃপর ঔপনিবেশিকরা তাঁর স্থানে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে নির্বাচিত করে এবং তাদের মনোনয়ন আগলাবী সুলতান কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিছুকাল পর খুফাজা ইবন সুফিয়ান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

নোটো বিজয়

২৫০ হিজরিতে মুসলমানরা প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ নগরী নোটো (নোটোস[১]) অধিকার করে এবং পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে অধিকার করে এযাবৎকাল তাদের শক্তি প্রতিরোধকারী সিরাকুজ এবং আব্বা, স্যাটাস ও ক্যাস্টিলনোভো (কাসরুল জাদিদ)।

৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ

২৫৪ হিজরিতে খুফাজার পুত্র মুহম্মদ পুনরায় গেটা অবরোধ করেন এবং রোমের উপকণ্ঠে কর আরোপ করেন।

মাল্টা

২৫৫ হিজরিতে খুফাজা পরলোকগমন করেন এবং তাঁর পুত্র মুহম্মদ শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনকালে আহমেদ ইবন উমারের নেতৃত্বে একটি নৌবাহিনী মাল্টা দখল করে।

৮৭০ খ্রিস্টাব্দ

২৫৭ হিজরির ৩ রজব খুফাজার পুত্র মুহম্মদ তাঁর প্রাসাদে আততায়ীর হাতে নিহত হন।

২৭ মে, ৮৭১ খ্রি.; আবু ইব্রাহীম আহমেদের সিংহাসনারোহণ

সিসিলি সম্বন্ধে বর্ণনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আমাকে পূর্বেই ইফ্রিকীয় রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়েছে। কারণ আবুল আব্বাস মুহম্মদ ২৪২ হিজরিতে পরলোকগমন করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র আবু ইব্রাহীম আহমেদ। তাঁর শাসনকালে রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল এবং কোন যোগাযোগ ছিল না। তিনি প্রজাদের সাথে সদব্যবহার করতেন এবং তারা সুখী ও সমৃদ্ধ ছিল। তিনি দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পাথর, ইট ও সুরকি দ্বারা দশ হাজার দুর্গ ও ঘাঁটি নির্মাণ করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যু [২০ জুলকাদা, ২৪৯ হি; ৮৬২ খ্রি.]; জিয়দাতুল্লাহ (আল আসগর) খর্বকায়-এর সিংহাসনারোহণ; তাঁর মৃত্যু [১৯ জুলকাদা, ২৫০ হি.; ৮৬৩ খ্রি.]; আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদের সিংহাসনারোহণ; আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদের মৃত্যু [জামাদিউস সানী, ২৬১ হি.; ৮৭৪ খ্রি.], ইব্রাহীমের সিংহাসনারোহণ

আবু ইব্রাহীম আহমদ ২৪৯ হিজরিতে পরলোকগমন করেন এবং তাঁর ভাই আবু মুহম্মদ জিয়াদাতুল্লাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন। কিন্তু মাত্র আঠার মাস রাজত্ব করেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর তাঁর ভাই[২] আবু আবদুল্লাহ[৩] মুহম্মদকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। ইবনুল আসির বলেন, তিনি বিদ্বান, জ্ঞানী ও সদগুণাবলিতে বিভূষিত ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বাইজান্টাইনগণ সিসিলিতে তাদের কতকগুলো হৃতস্থান পুনরুদ্ধার করে। ফলে

---

[১] আরবগণ এটিকে নাবলুসও বলত।

[২] ইবন খালদুন বলেন, তিনি ছিলেন আহমদের পুত্র, ভাই নন; চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২০১।

[৩] ইবন খালদুন তাঁর পদবী আবুল গারানিক বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, তিনি আমোদ-প্রমোদ ও মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন, আর তাঁর সময়ে যুদ্ধ ও গোলযোগ শুরু হয়।

তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য মুহম্মদ কতগুলো দুর্গ ও ঘাঁটি নির্মাণ করেন। কথিত আছে, তিনি মূল ভূখণ্ডের কিছু স্থান অধিকার করেছিলেন। আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ২৬১ হিজরিতে পরলোকগমন করেন এবং তাঁর ভাই ইব্রাহীম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

রাজত্বের প্রথম দিকে তিনি প্রজাবর্গের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু শেষের দিকে তিনি এক হিংস্র নরঘাতী উন্মাদনায় আক্রান্ত হন। এর ফলে তিনি নিজের সন্তানদেরও হত্যা করেন। তাঁর নিষ্ঠুরতার কাহিনী খলিফা মুতাজিদের ক্রোধ উদ্রেক করে। তিনি ইব্রাহীমকে পদচ্যুত করে এক কঠোর আদেশ পাঠান।

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ইফ্রিকিয়ার রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত [২৮৯ হি.; ৯০২ খ্রি.]

খলিফা সিসিলিতে অবস্থানরত তাঁর (ইব্রাহীম) পুত্র আবুল আব্বাস আবদুল্লাহকে ইফ্রিকিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইব্রাহীম ফকিরের পোশাক পরে যে অসংখ্য বন্দিকে তিনি কারারুদ্ধ করেছিলেন তাদেরকে মুক্তি দেন এবং বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সিসিলিতে গমন করেন। এখানে তিনি কিছুদিন পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শেষ আগলাবী আবু মোজার জিয়াদাতুল্লাহ

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ছিলেন সদয় ও ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনায়ক এবং যুদ্ধবিদ্যা ও রাজ্যশাসনে সমান পারদর্শী। কিন্তু নিজের পুত্র আবু মোজার (মোদার) জিয়াদাতুল্লাহর প্ররোচনায় তাঁর কয়েকজন দাস তাঁকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে। এই পিতৃহত্যাই ইফ্রিকিয়া তাঁর বংশের শেষ শাসক। পিতৃহত্যার জন্য নিযুক্ত দাসদেরকে কতল করে তিনি ব্যভিচারে নিমগ্ন হন এবং ভাঁড় ও অসভ্য প্রকৃতির লোকদের সংসর্গে নিমগ্ন হন। এইভাবে তিনি রাজ্যকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করেন । ইতিমধ্যে উত্তর আফ্রিকায় একটি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে।

ফাতিমীদের অভ্যুদয়; ইসমাঈলী সম্প্রদায়; মুহম্মদ আল মাকতুম

ইমাম জাফরের[১] মৃত্যুতে শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধর্মীয় বিভেদ দেখা দেয় তা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম জাফর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈলের মৃত্যুর পর মূসাকে (আল-কাজিম) তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করলে অধিকাংশ লোক তাঁর ইমামতি মেনে নেয়, কিন্তু অবশিষ্টরা ইসমাঈলের পুত্র আলী মাকতুম (গুপ্ত বা অপ্রকাশিত[২]) উপাধিপ্রাপ্ত মুহম্মদের প্রতি তাদের আনুগত্য জ্ঞাপন করে। অতঃপর ইসমাঈলী সম্প্রদায় নামে অভিহিত এই ব্যক্তিরা কালক্রমে াদের মতবাদের সাথে মানির (মানেস)[৩] দর্শন থেকে গৃহীত বহু গূঢ় তত্ত্ব মিশিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মতবাদের দিক দিয়ে

---

[১] পূর্বে দেখুন।

[২] ইসমাঈলী সম্প্রদায় তাঁদের পরবর্তী পাঁচজন ধর্মীয় নেতাকে গুপ্ত বা অপ্রকাশিত ইমাম বলে আখ্যায়িত করে। কারণ, তাঁরা শত্রুদের অত্যাচারের জন্য নিজেদেরকে প্রকাশ (প্রকাশ্যে উপাধি গ্রহণ) করেননি।

[৩] তিনি ছিলেন খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে খ্যাত বিরাট সৃজনী শক্তি ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক পারসি দার্শনিক। তাঁর শিক্ষার প্রভাব খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং পরবর্তীকালের সকল গূঢ় তাত্ত্বিক ধর্মীয় সম্প্রদায় তাঁকে অনুসরণ করেছে।

মানিপন্থী[১] হয়ে পড়ে এবং প্রকৃত ধর্মীয় আইনের চেয়ে ধর্মপুস্তকের গূঢ়ার্থকে বেশি মর্যাদা দেয় এবং সাধারণ মুসলিম সমাজ থেকে ভিন্ন হয়ে তারা ধারণা করে যে, বিশ্বাসেই মুক্তিলাভ ঘটে, কর্মের দ্বারা নয়।[২] এই চরমপন্থী ইসমাঈলীরা গুহ্যবাদী (ব্যতিনীয়া[৩]) নামে পরিচিত। তাদের গুপ্ত শিক্ষা ও দাবিদাওয়া স্বাভাবিকভাবেই আব্বাসীয়দের সন্দেহ উদ্রেক করে। এর ফলে তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখা হয় এবং কখনো কখনো নির্যাতনও চলে।

জাফর আল-মুসাদাক, মুহম্মদ আল হাবীব

মুহম্মদ আল মাকতুমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জাফর ওরফে আল মুসাদাক (সত্যবাদী) ইসমাঈলীদের ঈমাম হন । তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহম্মদ, আল-হাবিব (বন্ধু) উপাধি ধারণ করে তাদের ইমাম হন। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন এবং তাঁর চরিত্র ছিল সাফফাহ ও মনসুরের পিতা মুহম্মদের চরিত্রের ঠিক অনুরূপ। তিনি হিমসের (এমেসা) নিকট সালামিয়াহ নামক স্থানে বাস করতেন এবং এখান থেকে তিনি শিষ্য সংগ্রহ ও ইসমাঈলী মতবাদ প্রচারের জন্য চারদিকে প্রচারক প্রেরণ করেন। এভাবে তার সম্প্রদায়ের মতবাদ ইয়েমেন, ইয়েমামা, বাহরাইন, সিন্ধু, ভারতবর্ষ, মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

আবু আবদুল্লাহ শিয়া

তাঁর সবচেয়ে উদ্যমী ও অক্লান্ত প্রচারকদের মধ্যে আবু আবদুল্লাহ হুসাঈন[৪] ছিলেন অন্যতম। এক সময় তিনি ছিলেন বসরার মুহতাসিব এবং পরবর্তীকালে শিয়া[৫] নামে খ্যাত হন। ২৮৮ হিজরিতে আবু আবদুল্লাহ আফ্রিকায় গমন করেন এবং তাঁর অদ্ভুত প্রচারণা ও সংবেদনশীল চরিত্রবলের সাথে ধার্মিকতা ও কঠোর তপস্যা যুক্ত হয়ে বাস্তববাদী বার্বারদের মধ্যে তাঁকে বিশেষ প্রতিপত্তি দান করে। অচিরেই তিনি শক্তিশালী কিতামা গোত্রকে আহনুল বায়তে'র ইমামের অনুগত করে তোলেন। এই সময় ইফ্রিকিয়ার শাসক ছিলেন ইব্রাহীম ইবন মুহম্মদ এবং তিনি ইসমাঈলী আন্দোলন দমন করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু আবু আবদুল্লাহ সব বাধা অতিক্রম করেন এবং অযোগ্য জিয়দাতুল্লাহর সিংহাসনারোহণে তাঁর সাফল্যের পথ প্রশস্ত হয়। আগলাবী সুলতান যখন রাক্কাদায় আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন ছিলেন তখন দেশে আবু আবদুল্লাহর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর প্রচারকগণ অধিবাসীদের নিকট মাহদীর আশু আগমন বার্তা ঘোষণা করে।[৬] আশ-শিয়াকে বাধাদানের জন্য জিয়াদাতুল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত দুটি

---

[১] মানি থেকে উদ্ভূত।

[২] অন্য ভাষায়, যতদিন তারা ইমামের প্রতি অবিচল আস্থা রাখবে, ততদিন পারলৌকিক মঙ্গলপ্রাপ্তির জন্য তাদের ধর্মের অনুশাসন পালন করার প্রয়োজন নেই। এ রকমই ছিল ধর্মীয় নেতাদের প্রতি তাদের অন্ধ আনুগত্য। বিশ্বাসেই মুক্তি– এই মতবাদ চরমপন্থী ইসমাঈলীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

[৩] কারমিতা (কারমাতী) ও অ্যাসাসিন হল এই সম্প্রদায়ের দুইটি উপশাখা। আরব ইতিহাসে শেষোক্তরা বরাবরই বাতিনীয়া বলে অভিহিত হয়।

[৪] ইবন মুহম্মদ ইবন জাকারিয়া।

[৫] আশ-শিয়ী সর্বোত্তম শিয়া; তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদের জন্য তাঁকে প্রায়শই সূফী বলা হত এবং লোকজনকে শিয়া মতবাদ শিক্ষা দিতেন বলে তাঁকে মুয়াল্লিম (উপদেষ্টা) বলা হত।

[৬] ইবন খালদুন, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪। রাক্কাদা কায়রোয়ান থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানটি পরম স্বাস্থ্যকর ও আরামদায়ক আবহওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে অগণিত সুরক্ষিত প্রাসাদ, পরিবেষ্টিত সুন্দর বাগান, হাম্মাম, ঝর্ণা ও বৃহৎ জলাধারের সমাবেশ ছিল।

সৈন্যবাহিনী শোচনীয় পরাজয়বরণ করে। জিয়াদাতুল্লাহ প্রথমে ত্রিপলীতে এবং তৎপর এশিয়ায়[১] পালিয়ে যান।

২৬ মার্চ, ৯০৯ খ্রিস্টাব্দ

২৯৬ হিজরির ১ রজব শনিবার আবু আবদুল্লাহ বিজয়ীর বেশে আগলাবী বংশের রাজধানীতে প্রবেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নগরসমূহের শাসনভার গ্রহণ করে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সমগ্র প্রদেশে শাসনকর্তা প্রেরণ করেন। আবু আবদুল্লাহ যে বিচক্ষণ ও উদার নীতির অবতারণা করেন তাতে জনমত সুপ্রসন্ন হয় এবং যে প্রভুর নামে বিজয় সংঘটিত হয়েছে তাঁকে হৃদ্যতাপূর্ণ ও আনুগত্যমূলক সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য লোকেরা প্রস্তুত হয়।

প্রথম ফাতিমী খলিফা উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর শেষদিকে আল-হাবীব মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁর পুত্র উবায়দুল্লাহকে[২] ইমামের পদ দিয়ে যান। মুমূর্ষু পিতা বললেন, তুমিই মাহদী; আমার মৃত্যুর পর তোমাকে দূরদেশে চলে যেতে হবে, সেখানে তুমি কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। কিন্তু যে পর্যন্ত শিয়া কিতামা গোত্রকে সম্পূর্ণ প্রভাবাধীনে এনে মাহদীকে আফ্রিকায় এসে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে দূত প্রেরণ না করলেন সে পর্যন্ত উবায়দুল্লাহ সালামিয়ায় শান্তিতে অবস্থান করেন। উবায়দুল্লাহ তৎক্ষণাৎ তাঁর পুত্র আবুল কাসিম, আবুল আব্বাস (শিয়ার ভাই) ও কয়েকজন অনুরক্ত শিষ্যসহ সওদাগরের ছদ্মবেশে যাত্রা করেন। আবু আবদুল্লাহ মাহদীর সাথে যোগাযোগে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে চললেও আব্বাসীয়রা সালামিয়া থেকে উবায়দুল্লাহর পলায়নের আভাস পেয়ে যান। খলিফা মুকতাফী রাজ্যের সর্বত্র পলাতকের বর্ণনা প্রচার করে অনুরূপ বর্ণনার যে কোন লোককে পাকড়াও করে বন্দি করার আদেশ দেন। ত্রিপলিতে মাহদীর দল ছেড়ে আবুল আব্বাস কায়রোয়ানে গমন করেন। এখানে তিনি ধরা পড়ে ভূগর্ভস্থ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। উবায়দুল্লাহ ও তাঁর পুত্র শত্রুর অনুসরণ বা দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে সমর্থ হন এবং ২৯৬ হিজরিতে এটলাস পর্বতমালার দক্ষিণদিকস্থ ঢালুর উপর অবস্থিত তৎকালীন মিদরার বংশের রাজধানী ও সুন্দর নগরী সিজিলমাসায়[৩] পৌঁছান। এখানে ভাগ্য তাঁদেরকে পরিত্যাগ করে। এই সময় সিজিলমাসা শাসন করতেন ইলিসা ইবন মিদরার নামক এক বার্বার সর্দার। তিনি প্রথমে তাঁদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করলেও জিয়াদাতুল্লাহর নিকট হতে পত্র পেয়ে তাঁদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

---

[১] ইবন আসাকিরের মতে ২৯৬ হিজরীতে (৯০৮-৯ খ্রিস্টাব্দ) তিনি রাক্কায় পরলোকগমন করেন।

[২] এই পুস্তকে প্রদত্ত বংশতালিকা মাকরিজী ও ইবন খালদুনের মতানুসারে দেয়া হয়েছে। ইবনুল আসির জাফর আল-মুসাদাক ও মুহম্মদ আল হাবীবের দুটি পৃথক নাম উল্লেখ করেন। আব্বাসীয় খলিফা কাদিরের রাজত্বকালে বাগদাদের খলিফার সভাপতিত্বে সুন্নী আইনজ্ঞ ও ধর্মতত্ত্ববিদরা ফাতিমা ও আলীর প্রকৃত বংশধরের দাবি অস্বীকার করে প্রতিদ্বন্দ্বী মিশরীয় খলিফাদের বিরুদ্ধে অভিসম্পাত প্রচার করেন। এটি যে পরনিন্দা এবং বংশগত ঈর্ষার ফল তা কোন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক অস্বীকার করেননি। মাকরিজী, ইবনুল আসির, আবুল ফিদা ও ইবন খালদুন সকলেই উবায়দুল্লাহকে আলীর প্রকৃত বংশধর বলে গ্রহণ করেন। ইবন খালদুন কর্তৃক আব্বাসীয় নিন্দাবাদের অসারতা উদ্ঘাটন ঐতিহাসিক সমালোচনার শ্রেষ্ঠ অবদান, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩১।

[৩] আল বাকরী বলেন, সিজিলমাসা ১৪০ হিজরিতে স্থাপিত হয়েছিল। এটি আধুনিক মরক্কো থেকে বেশি দূরে নয়।

আগস্ট, ৯০৯ খ্রিস্টাব্দ

তবে আশ-শিয়া শীঘ্রই এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রওনা হন। তিনি কায়রোয়ানস্থ জিয়াদাতুল্লাহর ভূগর্ভস্থ কারাগার থেকে তাঁর ভাই আবুল আব্বাসকে মুক্ত করে ইলিসার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। অতঃপর আবু আবদুল্লাহ দ্রুত চলে যান কারাগারে। সেখানে মাহদী ও তাঁর পুত্র আবদ্ধ ছিলেন। পিতা ও পুত্রকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহিত করে স্বয়ং তাঁদের সম্মুখ দিয়ে হেঁটে কিতামা দলপতিগণসহ তাঁদেরকে শিবিরে নিয়ে আসেন। পথিমধ্যে তিনি আনন্দাশ্রু বর্ষণ করছিলেন এবং রাস্তায় সমবেত জনসাধারণকে সম্বাধন করে বলছিলেন, 'এই তোমাদের প্রভু।'[১]

মাহদী [জুন, ৯১০ খ্রি.]

তাঁরা চল্লিশ দিন সিজিলমাসায় অবস্থান করে তারপর রাক্কাদায় আসেন। সেখানে কায়রোয়ানবাসীগণ খলিফা হিসেবে মাহদীর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। এক্ষণে ইফ্রিকিয়ার সর্বত্র তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কতিপয় লোক ব্যতীত আর সবাই তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে। সিসিলিসহ বিভিন্ন প্রদেশ শাসনের জন্য ওয়ালী নিযুক্ত হয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য গ্রহণ করা হয় নতুন উদ্যোগ। যে তেজস্বিতার সাথে উবাবদুল্লাহ শাসনকাজে মনোনিবেশ করেন তা আবু আবদুল্লাহর ভাই আবুল আব্বাসের বিদ্বেষ উদ্রেক করে। তিনি মাহদীকে নামমাত্র রাজা রূপে দেখার আশা করেছিলেন। নিজের ক্ষমতালোপে রুষ্ট হয়ে তিনি ফাতিমী খলিফাকে পদচ্যুত করার জন্য কয়েকজন কিতামা সর্দারের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এমনকি তিনি এযাবৎ বিশ্বস্ত আবু আবদুল্লাহকেও তাঁর দুষ্কর্মের সঙ্গী করেন। মাহদী দুই ভাইয়ের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের একগুঁয়েমির জন্য তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁকে হত্যা করার এক ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে মাহদী তাঁদের হত্যা করার সংকল্প করেন এবং তদনুসারে তাঁদের প্রাসাদেই তাঁদেরকে হত্যা করা হয়।

শিয়ার মৃত্যু [জমাদিউস সানী, ২৯৮ হি; ফেব্রুয়ারি, ৯১১ খ্রি.]

রাজস্রষ্টার মৃত্যুর পরও রাজ্যের বিজয় বন্ধ হয়নি এবং উবায়দুল্লাহ লিবিয়ার মরুভূমি থেকে পশ্চিম মরিটানিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকাংশ স্থান নিজের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসতে সমর্থ হন। তিনি শৃঙ্খলা রক্ষা ও বাড়াবাড়ি প্রতিরোধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও তাঁর সৈন্যদলের অধিকাংশ দুর্ধর্ষ বার্বাদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল এবং তারা যুদ্ধের সময় অত্যন্ত নৃশংস আচরণ করে। এর ফলে পরবর্তী খলিফার শাসনকালে দারুণ বিদ্রোহ দেখা দেয়। মাহদী উপলব্ধি করেন যে, তাঁর বংশের বিরুদ্ধে কোন আকস্মিক বিদ্রোহ দেখা দিলে তাঁর একটি সুরক্ষিত রাজধানী থাকা দরকার। একটি দুর্ভেদ্য স্থান নির্বাচন করার উদ্দেশে তিনি টিউনিস থেকে যাত্রা করে সমগ্র সমুদ্রোপকূল পরিদর্শন করেন এবং অবশেষে সমুদ্রের ভেতরে লম্ববান একখণ্ড জমি নির্দিষ্ট করেন।

৯১৬ খ্রিস্টাব্দ

এখানেই ৩০৩ হিজরিতে মাহদীয়া[২] নগরীর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং তা পাঁচ বছরে সম্পূর্ণ হয়। লৌহফটক সমন্বিত এক সুদৃঢ় প্রাচীর একে বেষ্টন করেছিল এবং এর অভ্যন্তরে নির্মিত হয়েছিল মার্বেল পাথরের জমকালো প্রাসাদরাজি, সুবৃহৎ পুষ্করিণী ও রসদে পরিপূর্ণ ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডারসমূহ। সুসম্পন্ন নগরীটি দেখে উবায়দুল্লাহ বলেছিলেন,

---

[১] ইবনুল আসির।

[২] নর্মানগণ ৫৪৩ হিজরিতে (১১৪৮ খ্রিস্টাব্দ) মাহদীয়া দখল করে নেয়। আবদুল মোমিন ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে তাদের কাছ থেকে এটি ছিনিয়ে নেন।

আমি এখন ফাতেমীদের (ফাতিমী) ভাগ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত। উবায়দুল্লাহর শাসন ছিল সুদৃঢ় ও তেজোদৃপ্ত। এমনকি গোঁড়া মতাবলম্বী সুন্নীতীও স্বীকার করেন যে, উবায়দুল্লাহ জনসাধারণের প্রতি ন্যায়বিচার ও উদার নীতি গ্রহণ করেন এবং তারাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

৯২২ খ্রিস্টাব্দ

৩০৯ হিজরিতে তিনি ইদ্রিসী বংশীয়দেরকে নিজের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসেন, কিন্তু মিশর জয়ে ব্যর্থ হন। মরিটানিয়া দখলে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি যখন স্পেনের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তখনই মৃত্যু এসে তাঁর স্বপ্নের অবসান ঘটায়।[১]

উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর মৃত্যু [১৫ রবিউল আওয়াল, ৩২২ হি.; মার্চ, ৯৩৪ খ্রি.] আবুল কাসিম মুহম্মদ নিজার আল কায়িম বি আমরিল্লাহর সিংহাসনারোহণ

চব্বিশ বছর যাবৎ সাফল্যের সাথে রাজত্ব করার পর উবায়দুল্লাহ আল মাহদী ৩২২ হিজরিতে পরলোকগমন করেন এবং তাঁর পুত্র আবুল কাসিম নিজার আল কায়িম বি আমরিল্লাহ[২] উপাধি গ্রহণ করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন বিরাট যোদ্ধা এবং তাঁর অধিকাংশ যুদ্ধ তিনি নিজেই পরিচালনা করতেন। তিনিই প্রথম ফাতিমী খলিফা যিনি ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য স্থাপনের জন্য একটি শক্তিশালী নৌবহর তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইদ্রিসীদের দ্বারা পুনরাধিকৃত ফেজ জেলা ব্যতীত সমগ্র মরিটানিয়ায় নিজের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি ইউরোপ মহাদেশের প্রতি মনোনিবেশ করেন। লিগুরীয় উপকূল, পিসা ও অন্যান্য স্থানে ইতালীয় জলদস্যুরা তাঁর বন্দরগুলোতে উৎপাত চালাত। প্রতিশোধস্বরূপ কায়িম দক্ষিণ ইতালির গেটা অঞ্চল পর্যন্ত আক্রমণ করেন এবং তাঁর রণতরী জেনোয়া দখল করে নেয়– যেটি বেশ কিছুদিন আরবদের অধিকারে ছিল। লোম্বার্ডির (আল-আনকা বুরদা) কিয়দংশও অধিকৃত হয়। একটি গৃহ বিপ্লবের ফলে তাঁর সমুদয় শক্তি ও সামরিক নৈপুণ্য ব্যয়িত না হলে তিনি যে ইতালিকে তাঁর ক্ষমাধীনে আনতে পারতেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ঠিক যখনই তাঁর ভাগ্য অত্যন্ত সুপ্রসন্ন বলে মনে হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে তখনই অসভ্য বার্বারদের বাড়াবাড়িতে জনসাধারণের ধূমায়িত অসন্তোষ লেলিহান শিখায় রূপান্তরিত হয়। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন কিরাদের পুত্র আবু ইয়েজিদ মাখলাদ নামক একজন খারিজী। তিনি পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁর প্রচারনার সাহায্যে আরেস (আরবদের অরাস) পর্বতের বার্বারদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক শিষ্য সংগ্রহ করেন। ধর্মান্ধদের মধ্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল খুবই বিরল কিন্তু তিনি অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে ধর্মদ্রোহীকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর রাজ্য কেড়ে নেয়ার জন্য স্পেনের খলিফা আন-নাসিরকে আহ্বান জানান।

---

[১] ফাতিমীদের অভ্যুদয়ের ফলে নিঃসন্দেহে উত্তর আফ্রিকার সভ্যতার উন্নতি হলেও অনেক দিক দিয়ে তা ইসলামের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। কারণ এই বংশের পরবর্তী রাষ্ট্রনায়কদের সাথে এশিয়ার সেলজুক সুলতানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে শেষোক্তদের বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য জয় করে পূর্ব ইউরোপে ক্ষমতা বিস্তার প্রতিহত করেছিল। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সম্ভবত ক্রুসেডাররাও বিতাড়িত হয়েছিল।

[২] আল্লাহর আদেশে দৃঢ়।

আবু ইয়েজিদ মাখলাদের বিদ্রোহ [৩৩৩ হি; ৯৪২-৪৩ খ্রি.]

শিষ্যদের নিকট হতে শায়খউল মুসলিমীন[১] উপাধিপ্রাপ্ত আবু ইয়েজিদ ৩৩৩ হিজরিতে অগণিত অসভ্য যাযাবরকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুতবেগে পর্বত থেকে নেমে আসেন। ফাতিমী সৈন্যদল বারবার পরাজিত হয়, নগরের পর নগর জোরপূর্বক অধিকৃত হয় এবং ধর্মান্ধরা ভয়ঙ্কর নৃশংসতা সংঘটিত করে। মাহদী পূর্বেই যা অনুধান করেছিলেন অনতিবিলম্বে তা ঘটে যায়। দেশের অধিকাংশ স্থান খারিজী স্কুল শিক্ষকের করতলগত হয়, অন্যদিকে কায়িমের শাসন মাহদীয়া প্রাচীরের অভ্যন্তরে ও সমুদ্রোপকূলের কয়েকটি সুরক্ষিত শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আবু ইয়োজিদ প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে রাজধানী দখলের চেষ্টা করেন। চারবার তিনি মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালান এবং প্রতিবারই প্রতিহত হন। অবরোধ কঠোরতর করে আবু ইয়েজিদ সুসার (আরবদের সুস) দিকে অগ্রসর হন এবং অতর্কিত আক্রমণে সেটি দখল করার চেষ্টা করেন।

কায়িমের মৃত্যু [১৩ শাওয়াল, ৩৩৫ হি; ১৮ মে, ৯৪৬ খ্রি.]
আবুত তাহির ইসমাঈল আল মনসুর বি আমল্লিাহর সিংহাসনারোহণ

আবু ইয়েজিদ যখন সুসা অবরোধ করছিলেন তখন কায়িমের মৃত্যু হয়। সিংহাসনে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন আল-মনসুর বি আমরিল্লাহ[২] উপাধিধারী তাঁর পুত্র আবুত তাহির ইসমাঈল। তিনি অসাধারণ উদ্দীপনা ও সংকল্পের অধিকারী এক যুবক ছিলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি ধর্মান্ধ যাযাবরদের বিতাড়িত করেন। তাদের বিজয়ের সময় তারা কোন দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেনি এবং তাদের পরাজয়ের সময়ও তাদের প্রতি তা প্রদর্শন করা হয়নি। কেবল যারা আত্মসমর্পণ করেছিল তাদেরকে অবিলম্বে ক্ষমা ও পূর্ণ নিরাপত্তা দান করা হয়।

৩৩৬ হিজরি; ৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ

আবু ইয়েজিদ জাবাল সালাতে[৩] পালিয়ে যান। এটি ছিল অনুর্বর মরুভূমি থেকে উত্থিত এক খাড়া ও দুর্গম পাহাড়, যেটি অতিক্রম করতে এগার দিন সময় লাগত। মনসুর তীব্র উন্মত্ততার সাথে তাঁকে অনুসরণ করেন এবং অবশেষে ধর্মান্ধ ব্যক্তি ও তার ক্ষয়িষ্ণু শিষ্যদেরকে কিতামার[৪] পার্বত্য অঞ্চলে একটি দুর্গে আবদ্ধ করেন।

আবু ইয়েজিদের মৃত্যু

এই স্থানের চারদিকে দীর্ঘদিন ভীষণভাবে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবু ইয়েজিদ অবরোধকারীদের ভেদ করে পথ করে নেয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু ধরা পড়ে নিহত হন। আবু ইয়োজিদের পুত্র ও তাঁর কিছু অনুগামী কিছুদিন ঝামেলা চালিয়ে গেলেও প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ইফ্রিকিয়া পুনরায় ফাতিমীদের শাসনাধীনে আসে। এতদিন যাবৎ সিসিলি ও ক্যালাব্রিয়ায় আরব ঔপনিবেশিকগণ আংশিকভাবে তাঁদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে আসছিল। এই দুটি স্থানও এবার তাদের পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে আসে।

---

[১] মুসলমানদের নেতা বা সর্দার।

[২] আল্লাহর আদেশে বিজয়ী।

[৩] 'সিন'- এর সাহায্যে লিখিত।

[৪] আমারী এটিকে কিয়ানা পড়েছেন।

৯৫০ খ্রিস্টাব্দ

৩৩৯ হিজরিতে মনসুর আবুল কাসিম হাসান ইবন আলী ইবন আবিল হুসাইন আল কালবীকে সিসিলি ও তাঁর অধীনস্থ অঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। পদটি হাসান বংশে দীর্ঘদিন বজায় থাকে।[১] ফ্রাঙ্কগণ ক্যালাব্রিয়া আক্রমণ করলে তারা ইতালীয় উপকূলের অনতিদূরে এক নৌ যুদ্ধে পরাজিত হয়। কিন্তু মরিটানিয়া মনসুরের হাতছাড়া হয়, কারণ আবু ইয়েজিদের বিদ্রোহের ফলে স্পেনের উমাইয়া বংশীয় খলিফা আন-নাসির ইদ্রিসী বংশের সমগ্র রাজ্য দখল করতে সক্ষম হন।

মনসুরের মৃত্যু [রমজান, ৩৪১ হি.; মার্চ, ৯৪৩ খ্রি.]
আবু তামীম মা'দ আল মুঈজ লী দীনিল্লাহর সিংহাসনারোহণ

৩৪১ হিজরিতে মনসুরের[২] মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র আবু তামীম মা'দ আল মুঈজ লি দীনিল্লাহ[৩] উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর বংশের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ঐতিহাসিকরাও আল-মুঈজকে জ্ঞানী, উদ্যমী ও বীরব্রতী রাষ্ট্রনায়ক এবং বিদগ্ধ পণ্ডিত, বিজ্ঞান ও দর্শন-বিশারদ এবং শিল্প ও জ্ঞানের উদার পৃষ্ঠপোষক বলে বর্ণনা করেছেন। প্রশ্নাতীতভাবেই তিনি ছিলেন পশ্চিমাঞ্চলের মামুন এবং তাঁর আমলে উত্তর আফ্রিকা সভ্যতা ও সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। জনসাধারণ সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল; অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা কঠোরভাবে দমন করা হয়েছিল; শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি নিয়মানুগত ভিত্তির উপর; কার্যনির্বাহের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল; প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করে সেগুলোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল উপযুক্ত কর্মচারীদের উপর। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এদের অধীনে কিছু সংখ্যক দেশরক্ষী ও স্থায়ী সৈন্য ছিল। সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর পুনর্গঠন করা হয় এবং শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়। তিনি দয়ালু প্রকৃতির এবং বিস্ময়কর বিচক্ষণতা ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন বলে যেসব দলপতি তাঁর পিতা ও পিতামহের ঘোরতর শত্রু ছিলেন তিনি তাঁদের আন্তরিকতা অর্জন না করলেও বন্ধুত্ব অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁদের প্রতি বিশেষ সৌজন্য ও দয়া প্রদর্শন করে তাঁদেরকে শত্রু থেকে মিত্রে পরিণত করেন।[৪] আন-নাসির যখন স্পেনের উত্তরাঞ্চলে খ্রিস্টান বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন ঠিক তখনই তাঁর (মুঈজ) সেনাধ্যক্ষ জওহর[৫] মরিটানিয়া পুনরুদ্ধার করেন, অন্যদিকে সানহাজা দলপতি জিরী ইবন মানাদ ওরান ও বুগিয়া জেলায়

---

[১] ১৮০ বছর ধরে এই পদ হাসান বংশে বহাল ছিল। আমীর আবুল ফাতাহ ইউসুফের পুত্র আমীর হাসানের রাজত্বকালে এই দ্বীপে যে অরাজকতা দেখা দেয় তার ফলে নর্মানরা কাউন্ট রজারের (আরবদের রুজার) নেতৃত্বে ১১৫২ খ্রিস্টাব্দে তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হয়।

[২] মনসুর সুসার সন্নিকটে একটি জমকালো নগর নির্মাণ করেন, তাঁর নামানুসারে যার নাম রাখা হয় আল মনসুরিয়া।

[৩] আল্লাহর ধর্মকে মহিমা দানকারী।

[৪] ইবন খালদুন।

[৫] কাতিবুর রুমী উপাধি ধারণকারী আবদুল্লাহর পুত্র কায়িদ-উল-কুয়াদ আবুল হাসান জওহর সিসিলির অধিবাসী ছিলেন। তিনি ৩৮১ হিজরির ২০ জুলকাদা (২৯ জানুয়ারি, ৯৯২ খ্রিস্টাব্দ) মিশরে পরলোকগমন করেন। তিনি উদার ও দানশীল ছিলেন। ইবন খাল্লিকান বলেন, তাঁর বদান্যতা শুধু তাঁর মৃত্যুতেই শেষ হয়েছিল।

বিদ্রোহীদের ধ্বংস করেন এবং ইফ্রিকিয়া ও মাগরিবে মুঈজের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

৩৪৪ হিজরি; ৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ

৩৪৪ হিজরিতে আন্দালুসীয় জাহাজ মাগরিবে সংবাদবাহী আল মুঈজের একটি জাহাজ দখল করে। এই অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে ফাতিমী খলিফা সিসিলির রাজপ্রতিনিধি হাসান ইবন আলীকে স্পেনের দিকে অগ্রসর হয়ে আলমারিয়া উপকূল ধ্বংস করার আদেশ দেন। আন-নাসিরের সেনাপতিরা সুসা ও মারসিখিজরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লুণ্ঠন করে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তখন থেকে দুই মুসলিম খলিফা ইউরোপ বিজয়ের জন্য তাঁদের শক্তি একত্র করার পরিবর্তে পারস্পরিক যুদ্ধে তাঁদের শক্তির অপচয় ঘটান।

ক্রিট অধিকারচ্যুত

মামুনের শাসনামলে কর্ডোভা থেকে নির্বাসিত আরবগণ ক্রীট জয় করেছিল। তখন থেকেই এটি ছিল তাদের দখলে; তারা সেখানে সভ্যতা, চারুকলা ও শিল্প প্রবর্তন করে একে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী করে তোলে। ৩৫০ হিজরিতে বাইজান্টাইনরা এটি পুনরাধিকার করতে প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। সাতশ' রণতরীর এক নৌবহরে অগণিত সৈন্য অবতরণ করলে আরবরা সংখ্যাধিক্যের কাছে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। গ্রিকদের দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতার কথা অবর্ণনীয়; পুরুষদের আলকাতরা মাখিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়; কোলের শিশুর প্রতিও কোন দয়া প্রদর্শন করা হয়নি এবং স্ত্রীলোকদের প্রতিও ভীষণ অত্যাচার চালানো হয়।

সিসিলিতে চূড়ান্ত বিজয়

সিসিলিতে বাইজান্টাইন শক্তি নির্মূল করার মাধ্যমে ক্রিট অধিকারচ্যুত হওয়ায় কিছুটা ক্ষতিপূরণ সাধিত হয়। তখনো এই দ্বীপে কয়েকটি সুরক্ষিত স্থান তাদের দখলে ছিল, যেখান থেকে তারা আরবদের হয়রান করত। রাজপ্রতিনিধি আহমেদ ইবন হাসান এই নগরগুলো জয় করার জন্য তেজস্বিতার সাথে আত্মনিয়োগ করেন। বাইজান্টাইন রাজ্য থেকে গ্রিকদের সাহায্যার্থে প্রেরিত সৈন্যদল স্থলযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এবং তাদের জাহাজগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই জাহাজগুলো নোঙর তুলে পালানোর চেষ্টা করলে অনুসৃত হয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিমজ্জিত হয়।

৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ

৩৫১ হিজরির শেষদিকে সমগ্র দ্বীপ মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে। কালব বংশীয় আমীরদের আমলে সিসিলি যে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল পূর্বে তেমন আর কখনো হয়নি। চারদিকে মসজিদ, মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয় নির্মাণ হতে থাকে; বিদ্যা ও শিল্পকলাকে উৎসাহিত করা হয় এবং জনসাধারণের সমৃদ্ধি সাধিত হয়। পালার্মো চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিশ্ববিদ্যালয় কর্ডোভা ও বাগদাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করত।

মিশর; ৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ

৩৫৬ হিজরিতে মিশরে ভয়ানক গোলযোগ দেখা দেয়[১] এবং রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মুঈজকে এই দেশ দখল করে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করতে আহ্বান জানান। তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুঈজ তাঁর সহকারী জওহরের নেতৃত্বে একটি সুনির্বাচিত সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। ফাতিমী সেনানায়ক বিনা বাধায় রাজধানীতে (ফুসতাত) প্রবেশ করেন এবং ৩৫৮ হিজরির ১৫ শাবান মুঈজের নামে জুমা মসজিদে খুৎবা পাঠ করেন। ৩৫৯ হিজরিতে তিনি 'প্রার্থনার (আজান) মধ্যে উত্তম কাজের জন্য ত্বরান্বিত হও'[২] এই অতিরিক্ত বাক্য যোগ করেন।

কায়রো নগরীর পতন

জওহর আল-কাহিরা[৩] (আধুনিক কায়রো) নগরীর পতন করে ফাতিমী শাসনের সূচনা করেন, যা পরে মুঈজ ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের রাজধানীতে পরিণত হয়। জওহর হিজাজ ও সিরিয়াকেও শাসনাধীনে নিয়ে আসেন এবং পবিত্র নগরীদ্বয়ে মুঈজের নামে খুৎবা পঠিত হয়। যে কারমাতীগণ তখনো তাদের নাগালের মধ্যে অস্থানকারী মুসলিম আমীরদের নিকট হতে অন্যায়ভাবে উৎকোচ আদায় করত ফুসতাতের সন্নিকটে এক যুদ্ধে তারা বিধ্বস্ত হয়। এ যাবৎ মুঈজ ইফ্রিকিয়াতেই অবস্থান করেছিলেন কিন্তু জওহরের জরুরি আবেদনে তিনি মিশর যাত্রা করতে মনস্থ করেন।

জুলহিজ্জা, ৩৬১ হি; অক্টোবর ৯৭২ খ্রি.

যাত্রার পূর্বে তিনি পৈতৃক রাজ্য সতর্কভাবে পরিদর্শন করেন। বিশ্বস্ত জিরীর পুত্র বুলুক্কীনকে[৪] তিনি সাইফুদ্দৌল্লাহ (সাম্রাজ্যের তরবারি) উপাধি দিয়ে ইফ্রিকিয়ার রাজপ্রতিনধি নিযুক্ত করেন, আহমদকে সিসিলির শাসনকর্তার পদে বহাল করেন এবং উত্তর আফ্রিকার নিরাপত্তা ও দায়িত্বপূর্ণ শাসনের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

মুঈজের মিশর যাত্রা [নভেম্বর, ৯২৭ খ্রি.]; কায়রো প্রবেশ [১৯ জুন, ৯৭৩ খ্রি.]

অতঃপর ৩৬২ হিজরির সফর মাসে তিনি পূর্বাঞ্চলের উদ্দেশে রওনা হন। মুসলমানদের রোজার সময় তিনি কায়রো নগরে প্রবেশ করেন এবং ১৫ রমজান একটি সেনার তখতে বসে মিশর, সিরিয়া ও হিজাজের সমবেত প্রতিনিধিদের নিকট হতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

জওহরের হাতে পরাজিত হলেও কারমাতীদের দাম্ভিকতা তখনো ছিল সীমাহীন। তারা এ যাবৎকাল দামিশক থেকে অন্যায়ভাবে উৎকোচ আদায় করত; ফাতিমী

---

[১] কাফুর আল ইখশিদীর মৃত্যুর পর।

[২] হায় আলা খায়রুল আমল। আজানে এই অতিরিক্ত উক্তি তৎকালে শিয়া ও সুন্নীদের পার্থক্য সূচিত করেছিল।

[৩] আল-কাহিরা (বিজয়ী নগর)।

[৪] কর্কশ বার্বার নামের পরিবর্তে মুঈজ তাঁকে ইউসুফ আবুল ফুতুহ (বিজয়ের জনক) বলে সম্বোধন করতেন। আল-মুরাবিদদের অভ্যুদয় কাল পর্যন্ত যে প্রসিদ্ধ জিরী বংশ (প্রায়শই বনু বাদিস বলেও অভিহিত হয়) ইফ্রিকিয়ায় জাঁকজমকের সাথে রাজত্ব করেছিল বুলুক্কীন তার প্রতিষ্ঠাতা।

শাসনকর্তা তা দিতে অস্বীকার করলে তারা বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁর সম্মুখীন হয়। তিনি পরাজিত ও নিহত হন এবং গিলটি তাদের অধীনস্থ হয়। অতঃপর তারা মিশর আক্রমণ করতে অগ্রসর হলে মুঈজ আইনুশ শামস (হেলিও পোলিস) নামক স্থানে তাদের মোকাবিলা করেন এবং ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে বিধ্বস্ত করেন। এই পরাজয়ে শেষবারের মত তাদের ক্ষমতা ধ্বংস হয়।[১] ফাতিমীরা যখন কারমাতীদের সাথে যুদ্ধে ব্যাপৃত তখন ইফতিকীন নামে বুওয়াইহী বংশীয় মুঈজুদ্দৌল্লাহর[২] ইফতিকিন নামক এক তুর্কী অনুচর দামিশক ও তার পার্শ্ববর্তী দেশের প্রভু হয়ে বসেন।

মুঈজের মৃত্যু [১৫ রবিউস সানী, ৩৬৫ হি: ২০ ডিসেম্বর, ৯৭৫ খ্রি.]
আবুল মনসুর নিজার আল আজিজ বিল্লাহর সিংহাসনারোহণ

৩৬৫ হিজরির ১৫ রবিউস সানী শুক্রবার মুঈজ পরলোকগমন করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র আবুল মনসুর নিজার, যিনি আল আজিজ বিল্লাহ[৩] উপাধি ধারণ করেছিলেন। বর্ণিত আছে, তিনিও সদাশয়, সাহসী, জ্ঞানী ও উদার এবং শাস্তি দানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমাপ্রবণ ছিলেন। তিনি বুলুক্কীন ইবন জিরী ও পিতার অন্যান্য কর্মচারীদেরকে নিজ নিজ পদে বহাল রাখেন। প্যালেস্টাইন ও ফিনিশীয় উপকূলের দিকে ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করে ইফতিকীন পরাজিত ও বন্দি হন। আজিজ তাঁর প্রতি এমন সদয় আচরণ করেন যে তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত ফাতিমী খলিফার বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে থাকেন।

আজীজের আমলে ফাতিমীরা সমগ্র সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার কিয়দংশ জয় করতে সমর্থ হন। আর তাঁর নামে কেবল হিজাজ ও ইয়েমেনেই নয়, মসুল, আলেপ্পো, হামা, শায়জার এবং অন্যান্য স্থানেও খুৎবা পঠিত হয়। এই সময় ফাতিমীয় সাম্রাজ্য ইউফ্রেটিস নদীর কিনারা থেকে আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং আরব দেশের অধিকাংশ স্থান এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। যে কিতামা গোত্রের লোকেরা ফাতিমী বংশ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিল তারাই এ যাবৎকাল ফাতিমীদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সৈন্য ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত বেশি। কিন্তু আজীজ বার্বারদের সাথে ক্ষমতার সমতা রক্ষার জন্য তুর্কী ও পারসিকদের (দায়লামী) একটি বাহিনী গঠন করেন।

আল-আজিজের মৃত্যু [২৮ রমজান, ৩৮৬ হি.; ১৪ অক্টোবর, ৯৯৬ খ্রি.]
আবু আলী আল মনসুর আল-হাকিম বি আমরিল্লাহর সিংহাসনারোহণ

আজিজ ৩৮৬ হিজরিতে সিরিয়া যাওয়ার পথে বিলবাইস বা বিলবিস নামক স্থানে পরলোকগমন করেন এবং তাঁর সাথেই ফাতিমীদের গৌরবের অবসান ঘটে। তিনি

---

[১] নাসিরী খুসরুর সফরনামা'য় তাদের রাজধানী (আল-আহসা) সম্পর্কে মনোজ্ঞ বর্ণনা রয়েছে।
[২] পূর্বে দেখুন।
[৩] আল্লাহর দয়ায় মহিমান্বিত।

মৃত্যুশয্যায় তাঁর নাবালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী মনসুরকে প্রধান কাজী মুহম্মদ ইবন আন নোমান[১] এবং আমিনুদ্দৌল্লাহ (সাম্রাজ্যের প্রহরী) উপাধিপ্রাপ্ত আবু মুহম্মদ হাসান ইবন আম্মারের[২] নিকট এই আশায় সমর্পণ করেন যে, তাঁদের তত্ত্বাবধানে বালকটি নিজেকে জ্ঞানী ও সার্থক শাসকরূপে প্রতিপন্ন করতে পারবে। মনসুরকে আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ[৩] উপাধি দিয়ে আমির ও খলিফা বলে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু অচিরেই তিনি বুরজওয়ান নামক এক অসৎ প্রকৃতির ষড়যন্ত্রকারীর খপ্পরে পড়েন। ইবন আম্মার তাঁর বিরোধিতা করেন। তাঁদের ঝগড়া ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার ফলে সিরিয়া ও মিশর উভয় স্থানেই মারাত্মক গোলযোগ শুরু হয়। অনতিবিলম্বে হাকিম নিজেও পাগলামীর লক্ষণ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি প্রায়শই অদ্ভুত ও পরস্পর বিরোধী ফরমান জারি করেন। সামান্য ত্রুটির জন্য অপরাধীকে মৃদ্যুদণ্ড দেয়া হয়। কালক্রমে এই মানসিক বিকার নরহত্যার বাতিকে পরিণত হয় এবং অকারণে অনেক বিশিষ্ট লোককে তিনি হত্যা করেন। তবুও তিনি সুস্থতার মুহূর্তে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উদার ও মহানুভব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন[৪] এবং সিরিয়া ও মিশর উভয় স্থানেই তিনি বহু মসজিদ, মহাবিদ্যালয় ও মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। পঁচিশ বছর পর্যন্ত হাকিম এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় পূর্বপুরুষদের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। অবশেষে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

হাকিমের মৃত্যু [২৭ শাওয়াল, ৪১১ হি.; ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১০২১ খ্রি.]

তিনি নির্জনতা ভালবাসতেন এবং রাত্রিকালে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্থ ছিলেন। অনেক সময় তিনি মোকাত্তম[৫] পাহাড়ের উপর একট নির্জন গৃহে গমন করতেন– ইবন খালদুন বলেন, তিনি হয় নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে, না হয় উপাসনা করতে সেখানে যেতেন। একদিন ৪১১ হিজরির ২৭ শাওয়াল রাতে তিনি অভ্যাস মত দুইজন অনুচর নিয়ে সেখানে যান, কিন্তু তিনি পর্বতের পাদদেশেই তাদেরকে বিদায় দেন। মোকাত্তম পাহাড়ের এই যাত্রা থেকে তিনি আর কখনো ফিরে আসেননি। তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে ভয়ের সঞ্চার হল এবং সমগ্র দেশের উপর দিয়ে দ্রুত গমনের জন্য একটি অনুসন্ধানকারী দল প্রেরণ করা হয়। পাহাড়ের শীর্ষদেশে তারা দেখতে পেলেন, তিনি যে ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলেন; তার সামনের পা দুটি তরবারি দিয়ে কাটা এবং অনতিদূরে একটি চৌবাচ্চায় ছুরিকা দ্বারা বিদীর্ণ তাঁর জামা, যার বোতামগুলো তখনো আটকানো ছিল, কিন্তু তাঁর দেহ আর পাওয়া যায়নি। তিনি যে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৬]

---

[১] মুহম্মদ ইবন আন-নোমান ছিলেন সমগ্র মিশর, হিজাজ ও সিরিয়ায় সামরিক উপনিবেশগুলোর প্রধান কাজী। তাঁর বংশের অনেকেই পরবর্তী খলিফাদের আমলে বিচার বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

[২] তিনি কিতামা সৈনিকদের শায়খ ও সেনাপতি ছিলেন এবং স্বয়ং ঐ গোত্রের লোক ছিলেন।

[৩] আল্লাহর আদেশে শাসনকারী।

[৪] তিনি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ইবন ইউনুসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

[৫] কায়রোর সন্নিকটে।

[৬] বিভিন্ন গ্রন্থকার এই মর্মে একটি গল্প চালু করেছেন যে, হাকিম তাঁর বোন সিত্তুল মূলকের (সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রমণী) প্ররোচনায় গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন, অকুতোভয়তার জন্য যাঁকে তিনি (হাকিম) প্রাণের ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সমসাময়িককালে জীবিত মাকরিজী এই গল্পকে ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, চার বছর পর (৪১৫ হিজরি) আপার মিশরে বিদ্রোহ করার জন্য একজন

প্রকৃতপক্ষে হাকিম ছিলেন একটি নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁকে কেন্দ্র করেই এই ধর্ম গড়ে উঠেছিল এবং তাঁকে স্রষ্টার অবতার মনে করা হত। তাঁর অনুগামী ও শিষ্যরা বিশ্বাস করত যে, তিনি পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন মাত্র, সময় হলে তিনি পুনরায় আবির্ভূত হবেন। তাঁদের নিজের ভাষায় বলতে গেলে, যখন তাঁর খুশি হবে তখনই তিনি আসবেন। লেবাননের[১] দ্রুজদের[২] মধ্যে এই ধর্ম এখনো বিদ্যমান।

আবু হাশিম আলী আজ-জাহির লি-ইজাজ দীনিল্লাহর সিংহাসনারোহণ

অতঃপর হাকিমের পুত্র আবু হাশিম আলীকে আজ-জাহির লি ইজাজ দীনিল্লাহ[৩] উপাধি দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। তাঁর রাজত্বের প্রথম চার বছর তাঁর পিসিমা সিত্তুল মূলক তাঁর অভিভাবক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পর মিজাদ ও নাফির নামক হাকিমের আমলের দুজন কর্মচারী শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই রাজত্বকালে সিরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল ফাতিমীদের হাতে চলে যায় এবং সালেহ ইবন মিরদাস নামে এক আরব সর্দার আলেপ্পো ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিপতি হয়ে ওঠেন।

জাহিরের মৃত্যু [১৫ শাবান, ৪২৭ হি; জুন, ১০৩৬ খ্রি.] আবু তামিম মাআদ আল মুসতানসির বিল্লাহর সিংহাসনারোহণ

জাহির তাঁর জীবনের একত্রিংশ বছর বয়সে এবং তাঁর রাজত্বের ষষ্ঠদশ বছরে পরলোকগমন করেন এবং তাঁর পুত্র আবু তামিম মাআদ আল- মুসতানসির বিল্লাহ[৪] উপাধি ধারণ করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। কাজেই শাসনকার্য চলে গিয়েছিল কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারীর হাতে, যাদের অপশাসনে সাম্রাজ্যের শক্তি ও সমৃদ্ধির দ্রুত অবনতি ঘটে। ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র নগরদ্বয় ফাতিমী খলিফার আনুগত্য অস্বীকার করে এবং পাঁচ বছর পর ইফ্রিকিয়ার জিরী বংশীয় আমীর শরফুদ্দৌল্লাহ উপাধিধারী মুঈজ ইবন বাদিস[৫] ফাতিমীদের অধীনতা পাশ ছিন্ন করেন এবং মুসতানসিরের নামে খুৎবা পাঠ বন্ধ করে দিয়ে[৬] আব্বাসীয় খলিফা আল-কায়িমকে ইসলাম জগতের খলিফা বলে স্বীকার করেন।

লোককে গ্রেপ্তার করা হলে সে স্বীকার করে যে, আল্লাহ ও ধর্মের গৌরব রক্ষার জন্য সে তিনজনের সহায়তায় হাকিমকে হত্যা করেছে। এই লোকটির প্রদত্ত খুঁটিনাটি বিবরণ এত প্রাসঙ্গিক যে তার স্বীকারোক্তি নিঃসন্দেহে খাঁটি বলে প্রমাণিত হয়।

[১] তাদের ধর্মপুস্তকে তাঁকে 'আমাদের প্রভু আল-হাকিম, তাঁর নাম গৌরবান্বিত হউক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

[২] আরবদের আদ দুরজিয়াহ, দুরজী বা দরুজ রাদ্দুল মুহতার দেখুন।

[৩] আল্লাহর ধর্মকে গৌরবান্বিত করতে সাহায্যকারী।

[৪] আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনাকারী।

[৫] বুলুক্কীনের পুত্র মনসুর, তাঁর পুত্র বাদিস, তাঁর পুত্র আবু তামিম মুঈজ (পূর্বে দেখুন)।

[৬] নাসিরী খুসরু যখন সাময়িকভাবে কায়রোতে বাস করছিলেন তখন এটি ঘটে।

৪৫২ হিজরি; ১০৬০ খ্রিস্টাব্দ

বাসাসিরীর[১] বিদ্রোহ ও বাগদাদ থেকে কায়িমের পলায়নে মুসতানসিরের অনুকূলে ঘটনার পরিবর্তন হয় এবং পুরো এক বছর ইরাক ও তার অধীনস্থ অঞ্চলে তাঁর নামে খুতবা পঠিত হয়। কিন্তু শীঘ্রই তুগরিল পশ্চিম এশিয়ায় আব্বাসীয় খলিফার ধর্মীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং তুগরিলের উত্তরাধিকারী আলপ আর্সলানের নেতৃত্বে সেলজুকরা ফাতিমীগণকে আল-আরিশের অপর প্রান্তে বিতাড়িত করে।

৪৬৬ হিজরি; ১০৭৪ খ্রিস্টাব্দ

জনসাধারণের দুর্দশার মাত্রা বৃদ্ধি করতে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মিশরকে জনশূন্য করে দেয় এবং আমাদের ঐতিহাসিকের মতে তা সাত বছর স্থায়ী হয়। শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বিকল হয়ে পড়ে এবং দেশের অধিকাংশ অঞ্চল পরিত্যক্ত বা ধ্বংস হয়। এই ঘোর বিপদের সময় মুসতানসির একরের শাসনকর্তা বিখ্যাত বদরুল জামালীকে[২] সাহায্যের আহ্বান জানিয়ে তাঁকে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করেন। ফাতিমী ফারাওয়ের নিকট বদরুল জামালী দ্বিতীয় যোসেফ রূপে প্রতিপন্ন হন। তিনি রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন, জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করেন এবং সমগ্র মিশরে রাষ্ট্রপ্রধানের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দামিশক পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হলেও ফিনিশীয় উপকূলের নগরসমূহ পুনরাধিকার করতে সক্ষম হন।

মুসতানসিরের মৃত্যু [১৮ জুল হিজ্জা, ৪৮৭ হি; ৬ জানুয়ারি, ১০৯৫ খ্রি.]
আবুল কাসিম আহমদ আল মুসতালী বিল্লাহর সিংহাসনারোহণ

১০৯৪ খ্রিস্টাব্দে[৩] বদরুল জামালী পরলোকগমন করেন এবং এর এক মাস পরই তাঁর প্রভু খলিফারও মৃত্যু হয়। খলিফা জীবনে এত দুর্দশা ভোগ করেছিলেন যে, এক সময় বসার জন্য নামাজের মাদুরটি ব্যতীত তাঁর আর কিছুই ছিল না।[৪]

মুসতানসির তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নিজারকে[৫] সিংহাসনে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিল। কিন্তু বদরুল জামালীর পুত্র আল আফজাল, যিনি তাঁর পিতার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন; তিনি আবুল কাসিম আহমেদ নামক নিজারের এক অনুজপ্রতীমকে আল-মুসতালী বিল্লাহ[৬] উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসান। নিজার আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তার কাছে পালিয়ে গেলে তিনি তাঁকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন।[৭]

---

[১] পূর্বে দেখুন।

[২] মহিমান্বিত প্রভু, প্রধান সেনাপতি, মুসলিম বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক, বিশ্বাসীদের মুখ্য প্রচারক, দায়উদ দাওয়াতিল মোমিনীন এসব উপাধি থেকেই তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

[৩] ইবন খালদুনের মতে, ৪৮৭ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে তাঁর মৃত্যু হয়, পক্ষান্তরে ইবন খাল্লিকান এটিকে উল্লেখ করেন ৪৮৮ হিজরি বলে।

[৪] ইবনুল আসির, দশম খণ্ড, পৃ. ১৬১।

[৫] প্রাচ্য দেশীয় ইসমাঈলী আলামুতের অ্যাসাসিনগণ (হাসান সাবাহর শিষ্য) নিজারের ইমামতিই স্বীকার করত– তাঁর ভাইয়ের নয়। তাদের ইমাম বা ধর্মীয় নেতারা তাঁর বংশধর বলে দাবি করতেন।

[৬] আল্লাহর কৃপায় শ্রেষ্ঠ।

[৭] তাঁর উপাধি হল আল-মুস্তাফা লি দীনিল্লাহ (আল্লাহর ধর্মের জন্য মনোনীত)।

শাবান, ৪৮৯ হিজরি; ১০৯৬ খ্রিস্টাব্দ

তাঁরা উভয়েই আফজাল কর্তৃক পরাজিত ও বন্দি হন। শাসনকর্তাকে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়, পক্ষান্তরে নিজারের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা কেউ জানে না।[১] ১০৯৬ খ্রিস্টাব্দে আল-আফজাল জেরুজালেম পুনরাধিকার করেন, যা দামিশকের সেলজুক খলিফার অধীনস্থ অর্টক বংশীয়রা দখল করে নিয়েছিল।

ক্রুসেড [জুলকাদা, ৪৯০ হি.; নভেম্বর, ১০৯৭ খ্রি.]

কিন্তু তিনি তা বেশিদিন দখলে রাখতে পারেননি। কারণ অচিরেই ক্রুসেডের ঝঞ্ঝা সিরিয়া ও প্যালেস্টইনের উপর আপতিত হয়ে সেলজুক ও ফাতিমী– উভয় বংশকেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

মুসতালীর মৃত্যু [১৬ সফর, ৪৯৫ হি; ডিসেম্বর, ১১০১ খ্রি.]

আবু আলী আল-মনসুর আল আমির বি আহকামিল্লাহর সিংহাসনারোহণ

৪৯৫ হিজরির সফর মাসে মুসতালী মৃত্যুমুখে পতিত হলে ফাতিমী রাজ্যের প্রকৃত অধিপতি আল-আফজাল মৃত খলিফার শিশুপুত্র আবু আলী আল-মনসুরকে আল-আমীর বি আহকামিল্লাহ উপাধি দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। আমীরের বয়ঃপ্রাপ্তির কাল পর্যন্ত আফজাল পূর্ণ কর্তৃত্বের সাথে সাম্রাজ্য শাসন করেন এবং তাঁর শাসন মোটামুটিভাবে সফল ও সমৃদ্ধ ছিল বলেই মনে হয়। আফজালের পুত্র শরফুল মাআলীর নেতৃত্বে মিশরীয়গণ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কয়েকবার সাফল্য লাভ করলেও মাত্র কিছুদিন পূর্বে বদরুল জামালী কর্তৃক পুনরধিকৃত ফিনিশীয় উপকূলের নগরগুলো ক্রমান্বয়ে ক্রুসেডারদের শাসনাধীনে চলে যায়।

১১ জিলহজ্জ, ৫০২ হিজরি; ১২ জুলাই, ১১০৯ খ্রিস্টাব্দ

ত্রিপলির লুণ্ঠনের কথা[২] পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। ত্রিপলির সাহায্যার্থে প্রেরিত মিশরীয় সৈন্যবাহিনী যখন সেখানে পৌছায় তখন সবই শেষ হয়ে গেছে।

বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে আমির নিজেকে দুশ্চরিত্র, পাপাসক্ত, হীন আমোদ- প্রমোদে আসক্ত, স্বেচ্ছাচারী, উদ্ধত ও অবিবেচক যুবকরূপে প্রতিপন্ন করেন। সর্বশক্তিমান উজিরের অভিভাবকত্বে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি কৌশলে তাঁকে হত্যা করেন।

৫১৫ হিজরি; ১১২১ খ্রিস্টাব্দ

নয় বছর পর তাঁরও অনুরূপ পরিণতি ঘটে; দ্বীপে অবস্থিত একটি বাগানে যাওয়ার পথে তিনি কয়েকজন ফিদায়ী[৩] (অ্যাসাসিন) কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে আক্রান্ত ও ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

---

[১] কেউ কেউ বলেন, তিনি গোপনে নিহত হন, পক্ষান্তরে প্রাচ্য দেশীয় ইসমাঈলীরা বিশ্বাস করে যে, তিনি এশিয়ায় পালিয়ে যান এবং আলনুতের ইসমাঈলী ইমামদের আদি পুরুষরূপে গণ্য হন; *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম দেখুন*, পৃ. ৪৬২।

[২] পূর্বে দেখুন।

[৩] ইবনুল আসির তাদেরকে বাতিনী নামে অভিহিত করেন।

আবুল মায়মুন আবদুল মজিদ আল হাফিজ লি দীনিল্লাহ

আমীরের রানী সন্তান সম্ভবা থাকায় তাঁর পিতৃব্য পুত্র আবুল মায়মুন আবদুল মজিদ[১] আল হাফিজ লি দীনিল্লাহ[২] উপাধি ধারণ করে সিংহাসনের ভাবী উত্তরধিকারীর জন্মকাল পর্যন্ত অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সন্তানটি একটি মেয়ে হওয়ায় হাফিজ নিজের অধিকারবলেই ফাহিমীদের খলিফা ও আমির বলে ঘোষিত হন। জনসাধারণ তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণের কিছুদিন পরই তিনি আল আফজালের পুত্র উজির আবু আলী আহমদ কর্তৃক পদচ্যুত ও বন্দি হন। উজির আবু আলী এক জন অতি সুদক্ষ ও উচ্চাভিলাষী পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মীয় ইমামদের[৩] মতানুসারী। উজির আবু আলী কতকটা মিশরের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার অভিপ্রায়ে এবং কতকটা নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মুদ্রায় ও উপাসনায় শেষ ইমাম[৪] সামারার গুহায় অন্তর্হিত হতভাগ্য বালকের নাম সন্নিবেশিত করেন।[৫]

মহররম, ৫২৬ হিজরি; ডিসেম্বর ১১৩১ খ্রিস্টাব্দ

এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হলে হাফিজ কারাগার থেকে উজিরকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করেন এবং ৫২৬ হিজরির ১৫ মহররম তিনি রাজধানীর বহির্ভাগে অবস্থিত বৃহৎ উদ্যানে (আল বুসতানুল কবীর) আক্রান্ত ও নিহত হন। আবু আলী আহমদের মৃত্যুর পর হাফিজ পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তাঁর পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্তিতে রাজ্যের কোন মঙ্গল হয়নি, কারণ কোন চরিত্রবল না থাকায় তিনি তাঁর উজির আমিরুল জুয়ুস ইয়ানিস আল হাফিজীর হাতের ক্রীড়নকে প্রতিপন্ন হন– তবে ভয়াবহ ও অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক[৬] হলেও তিনি (হাফিজ) ছিলেন দূরদর্শী।

১১৩২ খ্রিস্টাব্দ

কথিত আছে, ৫২৬ হিজরির জুল হিজ্জা মাসে ইয়ানিস হাফিজের ইঙ্গিতে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। এরপর হাজিফ বিরহাম নামক একজন আর্মেনিয়ানকে উজির পদে নিযুক্ত করেন। বিরহাম ও রিজওয়ান নামক রাজ্যের এক প্রধান কর্মসচিবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ফলে দেশ অভ্যন্তরীণ কলহ ও যুদ্ধে নিমজ্জিত হয়। বিরহাম হাফিজ কর্তৃক ধৃত ও বন্দি হলে রিজওয়ান উজির হন।[৭]

---

[১] তাঁর পিতা মুহম্মদ ছিলেন মুসতানসিরের পুত্র।

[২] আল্লাহর ধর্মের তত্ত্বাবধানকারী।

[৩] বারো জন ধর্মীয় ইমামের মতানুসারীদেরকে ইসনা আশারিয়া বা দ্বাদশিক বলা হয়; *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম* দেখুন, পৃ. ৩১৪।

[৪] পূর্বে দেখুন।

[৫] তিনি আজান থেকে 'উত্তম কর্মের জন্য দ্রুতগামী হও' এই কথাগুলিও তুলে দেন। এই উচ্চাভিলাষী উজিরের উপাধি গ্রহণ সম্পর্কে ইবনুল আসির পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন (দশম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩) এবং তাতে এই যুগ ও তার মানুষের অসাধারণ দাবি-দাওয়া সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

[৬] কাসিরুশ শার।

[৭] রিজওয়ান উজির থাকাকালে আমির উসামা মিশরে গিয়েছিলেন (৫৩৯ হিজরি, ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দ)।

১১৪৮ খ্রিস্টাব্দ

তিনিও তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ হারান। এসব কর্মচারীদের আচরণের ফলে হাফিজ সকল ক্ষমতা নিজের হাতে রাখতে এবং ভবিষ্যতে কোন উজির নিয়োগ না করতে সংকল্প করেন। এই সিদ্ধান্ত তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বহাল রাখেন।

হাফিজের মৃত্যু [৫ জমাদিউস সানী, ৫৪৪ হি.; ১০ অক্টোবর, ১১৪৯ খ্রি.]

১১৪৯ খ্রিস্টাব্দে হাফিজ মৃত্যুবরণ করেন। রাজধানীর অভ্যন্তরীণ কলহজনিত হতাশায় তাঁর শেষ দিনগুলো ছিল তমসাচ্ছন্ন। ইবনুল আসির বলেন, তাঁর সমগ্র রাজত্বকালে তিনি তাঁর চুতস্পার্শ্বস্থ লোকদের, বিশেষত তাঁর উজিরদের প্রভাবাধীন ছিলেন।

আবু মনসুর ইসমাঈল আজ জাফির বি আমরিল্লাহর সিংহাসনারোহণ

হাফিজের পুত্র আবু মনসুর ইসমাঈল আজ জাফির বি আমরিল্লাহ[১] উপাধি ধারণ করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সব রকমের আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে অপদার্থ প্রিয়জনদের সাথে সময় অতিবাহিত করতেন। এই জন্য রাজ্যে তিনি ছিলেন অপদার্থের সামিল এবং সমস্ত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আল মালিকুল আদিল উপাধিধারী উজির আবুল হাসান আলী ইবনুস সালারের হাতে চলে গিয়েছিল।[২]

মহররম, ৫৪৮ হিজরি; ৩ এপ্রিল, ১১৫৩ খ্রিস্টাব্দ

১১৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইবনুস সালার তাঁর স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর পুত্র আব্বাস কর্তৃক নিহত হন। অতঃপর আব্বাস জাফিরের উজির হন। এই সময়কার মিশরীয় খলিফাদের অবস্থা সম্পর্কে ইবনুল আসির মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। মিশরে যাঁর হাতে ক্ষমতা থাকত তিনিই উজির হতে পারতেন। খলিফাগণ ছিলেন ক্ষমতাহীন, আর উজিরগণই ছিলেন রাজার ন্যায়। আল আফজালের পর যুদ্ধ, হত্যাকাণ্ড বা অনুরূপ (অপরাধ) কাজ ব্যতীত কেউই (মিশরে) উজির পদ লাভ করেননি। নিজের প্রাসাদের বাইরে খলিফার কর্তৃত্ব খুবই সীমিত ছিল। উসামা জেরুজালেম রাজ্যে যে অধপতনের চিহ্ন দেখেছিলেন তার বর্ণনায় আমরা মিশরেও অনুরূপ চিহ্নের প্রতিফলন দেখতে পাই। বিদ্রোহ, প্রতিদ্বন্দ্বীতা, ষড়যন্ত্র, পাল্টা ষড়যন্ত্র এবং যে অরাজকতার কারণে কায়রো ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলের হানাহানির জন্য রণক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল তাতে আশু ধ্বংসের প্রাথমিক সূচনা হয়।

৫৪৮ হিজরি; ১১৫৩ খ্রিস্টাব্দ

এই সময় পর্যন্ত মিশরীয়রা আসকালন নিজেদের অধিকারে রাখতে সমর্থ হয়েছিল, কিন্তু ইবনুস সালারের হত্যার পর মিশরে যে বিরোধ দেখা দেয় তাতে ক্রুসেডারগণ এই গুরুত্বপূর্ণ নগরটি দখলে করে নেয়ার সুযোগ পায়।[৩]

---

[১] আল্লাহর আদেশে বিজয়ী।

[২] এই উজির কর্তৃক উসামা নূরুদ্দিন মাহমুদের দরবারে দূত নিযুক্ত হয়েছিলেন।

[৩] মাকাদ্দাসী বলেন, আসকালন (আসকালান) হল সমুদ্রোপকুলের একটি সুন্দর নগরী। এই নগরীতে শস্য ও ফল প্রচুর। কাপড় বিক্রয়ের বাজারস্থিত মসজিদটি মার্বেল পাথরে তৈরি অতি মনোহর এক মজবুত অট্টালিকা। এখানকার জীবনযাত্রা সরল, বাজারগুলো ভাল এবং দেশটি মনোমুগ্ধকর। ৫৪৯ হিজরী (১১৫৪ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত শহীদ হুসায়ন (রা.)-এর মস্তক আসকালনে একটি মাসহাদে (সমাধি) রাখা হয়েছিল, পরে এটি কায়রোতে নিয়ে যাওয়া হয়।

আজ জাফিরের হত্যা [মহররম, ৫৪৯ হি.; এপ্রিল ১১৫৪ খ্রি.]

৫৪৯ হিজরির মহররম মাসে আব্বাসের পুত্র নাসর কর্তৃক জাফির নিহত হন।[১] বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর উজির নিজেকে ও নিজের পুত্রকে সন্দেহ থেকে রক্ষা করা জন্য খলিফাকে হত্যার মিথ্যা অভিযোগে তাঁর দুই ভাই জিব্রাঈল ও ইউসূফকে হত্যা করেন।

আবুল কাসিম ঈসা আল ফাইজ বি নাসরিল্লাহর সিংহাসনারোহণ

অতঃপর তিনি জাফিরের শিশুপুত্র আবুল কাসিম ঈসাকে আল ফাইজ বি নাসরিল্লাহ[২] উপাধি দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে শাসন চালাতে প্রয়াসী হন। কিন্তু তাঁর পাপের শাস্তি আসতে বিলম্ব হয়নি। অচিরেই জাফিরের বোনদের নিকট সত্য ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। তাঁরা কেশ কর্তন করে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটি পাত্রে তা আপার মিশরের শাসনকর্তা তালাই ইবন রুজ্জিকের[৩] নিকট পাঠিয়ে জাফিরের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তালাই শোক করতে করতে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ও একদল যাযাবর আরবকে সঙ্গে নিয়ে কায়রো আক্রমণ করেন। আব্বাস ও নাসর সৈন্যদল কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে তাঁদের সমুদয় ধনরত্ন নিয়ে সিরিয়ার দিকে পালিয়ে যান। আমির উসামা ও অনেক অনুচর তাঁদের সঙ্গে গমন করে। ইতিমধ্যে আজ জাফিরের বোনেরা আসকালনে ক্রুসেডারদের কাছে চিঠি লিখে আব্বাস ও তাঁর পুত্রকে ধরে নেয়ার জন্য প্রচুর অর্থ দেয়ার প্রস্তাব করেন। প্রতিশ্রুত পুরস্কারে উৎসাহিত হয়ে ফ্রাঙ্কগণ পলাতকদের মোকাবিলায় সবেগে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ চালায়; যুদ্ধে কয়েকজন অনুচরসহ আব্বাস নিহত হন এবং নাসর বন্দি হন।[৪]

৬ মার্চ, ১১৫৬ খ্রিস্টাব্দ

ফ্রাঙ্কগণ নাসরকে একটি লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করে কায়রোয় প্রেরণ করেন। সেখানে নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার চালানোর পর তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। অতঃপর আল মালিকাস সালিহ উপাধি ধারণ করে তালাই উজির পদ গ্রহণ করেন এবং শিশু খলিফার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

আল ফাইজের মৃত্যু [১৭ রজব, ৫৫৫ হি; জুলাই, ১১৬০ খ্রি.]

আবু মুহম্মদ আলী আল আজিজ লি দীনিল্লাহর সিংহাসনারোহণ

আল ফাইজ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজ পরিবারের বয়স্কদের মধ্যে অনেক যোগ্য ব্যক্তি থাকলেও উজির তাঁদের কাউকে সিংহাসনে না বসিয়ে জাফিরের ভাই ইউসূফের শিশুপুত্রকে খলিফার মর্যাদা দানের জন্য মনোনীত করেন। শিশুটির নাম ছিল আবু মুহম্মদ আবদুল্লাহ আলী এবং তাঁকে আল আজিজ লি দীনিল্লা[৫]

---

[১] জাফির বহু ওয়াকফ প্রতিষ্ঠা করেন, তার মধ্যে কায়রোর জাবিলা ফটকে নির্মিত আজ-জাফিরী নামক মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের ওয়াকফটি সুবিখ্যাত। তিনি খাজানাতুল বুনুদ (নিশানের ভাণ্ডার) নামে একটি কারখানাও প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য তিন হাজার দক্ষ কর্মচারি নিযুক্ত হয়েছিল। মাকরিজী, আল-খিতাত।

[২] আল্লাহর সাহায্যে কৃতকার্য। ফাইজ শব্দটি একটি 'জে' দিয়ে লিখিত।

[৩] অথবা রুজ্জাইক। তিনি ছিলেন আর্মেনীয় বংশধর।

[৪] উসামা ও তাঁর সঙ্গীরা পালিয়ে যান।

[৫] আল্লাহর ধর্মের রক্ষক। আজিদ শব্দটি 'জোয়াদ'-এর সাহায্যে লিখিত।

উপাধি দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। আস সালিহ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চালাতে থাকেন এবং তাঁর আচরণ ক্রমশ অত্যন্ত কঠোর হয়ে ওঠে।[১]

রমজান [৫৫৬ হি.; সেপ্টেম্বর, ১১৬১ খ্রি. রমজান, ৫৫৮ হি.; আগস্ট, ১১৬৩ খ্রি.]
ইবন খালদুনের মতে, আস সালিহ রাজপ্রাসাদের এক ষড়যন্ত্রের ফলে এবং মাকরিজীর মতে, একজন বাতিনী কর্তৃক ১১৬১ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন। অতঃপর তাঁর পুত্র রুজ্জিক আল মালিক আল আদিল উপাধি গ্রহণ করে উজির নিযুক্ত হন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁকে শাওয়ার আস সাদী[২] পদচ্যুত করেন। এই শাওয়ার আব্বাসী দরবারে হাজির পদের অনুরূপ সাহিবুল বাব[৩] পদে অধিষ্ঠিত প্রাচীন হীরার মুনজির বংশের জিরগাম[৪] নামক এক আরব কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছিলেন। শাওয়ার দামিশকের নূরুদ্দিন মাহমুদের নিকট পালিয়ে যান এবং জঙ্গীর পুত্রের সহায়তায় আবার ফিরে আসেন। জিরগাম তাঁর সৈন্যদল ও সিরীয়দের মধ্যে সংঘটিত এক যুদ্ধে নিহত হন এবং শাওয়ার পুনরায় উজির পদে অধিষ্ঠিত হন। ফাতিমীদের অবশিষ্ট কাহিনী পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।[৫]

১২ মহররম ৫৬৭ হি.; সেপ্টেম্বর, ১১৭১ খ্রি.
১১৭১ খ্রিস্টাব্দে আল আজিজের মৃত্যু হয় এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের অবসান ঘটে।

কায়রো
৩৫৯ হিজরির ২৪ জমাদিউস সানী (১৪ মে, ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ) জওহার কায়রো নগরীর পরিধি নির্দেশ করেন এবং আল মুঈজের আগমনের পূর্বেই প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হয়। বিজয়ী নগরীকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলতে দ্রুত এর চারদিকে চমকপ্রদ অট্টালিকাসমূহ গড়ে ওঠে। এর মধ্যে দিয়ে অসংখ্য সড়ক ও রাস্তা চলে গেছে; শহরতলীর দিকে প্রসারিত সড়কগুলোকে বলা হত হারাত, পক্ষান্তরে নগর প্রাচীরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়া রাস্তাগুলোকে আখতাত[৬] বলা হত। দ্বাদশ চত্বর সমন্বিত খলিফার প্রধান প্রাসাদ ছিল কায়রোর পূর্বদিকে অবস্থিত এবং সেটিকে বলা হত আল কাসরুল কবিরুশ শারকী (পূর্বদিকের সুবিশাল প্রাসাদ) বা কাসরুল মুঈজী (মুঈজের প্রসাদ)। দশটি ফটকের মধ্যে দিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করতে হত, যেগুলোকে পাহারা দিত পাঁচশত পদাতিক ও সমসংখ্যক অশ্বারোহীর এক নির্বাচিত সৈন্যদল। বারো হাজার ভৃত্য প্রাসাদের লোকজনের ফাইফরমাশ খাটত। এই প্রাসাদ থেকে একটি ভূগর্ভস্থ রাস্তা নগরীর পশ্চিমদিকে নীল নদের তীরে অবস্থিত আরেকটি জমকালো প্রাসাদের দিকে চলে গিয়েছিল এবং সেটিকে বলা হত কাসরুল গারবী (পশ্চিমদিকের প্রাসাদ) বা কাসরুল বাহর (সামুদ্রিক প্রাসাদ)। শহর ও শহরতলীতে অবস্থিত খলিফার

---

[১] ইবন খালদুন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৩।
[২] সাদ বংশীয়।
[৩] ফটকের অধিপতি বা প্রাসাদাধ্যক্ষ।
[৪] আবুল আশবাল জিরগাম– শাবকের পিতা সিংহ, তাঁর উপাধি ছিল আল-ফারিসুল মুসলিমীন। মুসলমানদের অশ্বারোহী।
[৫] পূর্বে দেখুন।
[৬] খাত্ত এর বহুবচন।

নিজস্ব অন্যান্য প্রাসাদ ও বাগানবাড়িগুলো ছিল তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ কর্তৃক বহুমূল্যে সুসজ্জিত। আমীরদের অট্টালিকাগুলো আকারে ও বিস্তারে না হলেও জাঁকজমকের দিক দিয়ে খলিফাদের প্রাসাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করত। ধনী ও বিত্তবান নগরবাসীদের গৃহের চারদিকে সুন্দর সুন্দর বাগান ছিল। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপ থেকে যেসব পর্যটক কায়রো পরিদর্শনে এসেছিলেন এসব বাগানের সংখ্যা ও গৃহগুলোর জাঁকজমক তাঁদের বিস্মিত করেছিল বলে মনে হয়।[১] বিশাল বিশাল মসজিদ, মহাবিদ্যালয়, হাসপাতাল ও সরাইখানা নগরের শোভা বর্ধন করত। বিশেষভাবে চারটি জুমা মসজিদ[২] ছিল প্রকাণ্ড ও নয়নাভিরাম। ফাতিমীদের আমলে কায়রোর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল হুসায়নিয়াহ[৩] ভবন, যেখানে কারবাল প্রান্তরে শহীদ হুসাইনের (রা.) মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শোকসভা অনুষ্ঠিত হত। শহরের প্রত্যেক অংশে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য সুচারুরূপে নির্মিত বিপুল সংখ্যক সাধারণ স্থানাগার দেখা যেত। কারুকার্যের দ্বারা মেয়েদের স্থানাগারগুলোকে সহজেই পুরুষদের স্থানাগার থেকে আলাদাভাবে চিনে নেয়া যেত। বিশ সহস্র বিপণি সমন্বিত বাজারগুলো ছিল জমকালো এবং বিশ্বের যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্যে পরিপূর্ণ। নগরীর চারদিক সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল, আর ঐ প্রাচীরকে ভেদ করেছিল অনেকগুলো তোরণ।[৪]

বাহিরের আমোদ-প্রমোদের মধ্যে বাজপাখির সাহায্যে শিকার এবং সাধারণত শিকরী কুকুররের সাহায্যে কৃষ্ণসার মৃগ ও অন্যান্য সকল প্রকারের হরিণ শিকার ছিল ধনী লোকদের প্রধান আমোদ-প্রমোদ; পক্ষান্তরে নদীর তীরস্থ ফেল্লাহীন (কৃষক গণ) প্রায়শই সিন্ধুঘোটক শিকারে ব্যাপৃত থাকত।

শাসনপ্রণালী ছিল আব্বাসীয় আমলের অনুরূপ। তবে কয়েকটি বিভাগের অন্য রকম নাম ছিল।[৫] মিশরে আমিরুল জুয়ুশ নামক সেনাপতির অপ্রতিহত প্রভাবে দুই শাসন পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। তিনি একাই ব্যক্তিগতভাবে উজির ও প্রধান সেনাপতির পদ দখল করেছিলেন এবং ফাতিমী বংশের দুর্বল খলিফাদের আমলে রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিত্ব মুছে দিয়েছিলেন। তবে প্রথম দশ খলিফার আমলে তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পাদন করতেন। মুসতানসিরের রাজত্বকালে

---

[১] কলা বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত এবং ধর্মতত্ত্বে ডক্টর জেহান থেনড (Jehan Thenound), যাঁকে দ্বাদশ লুই Audre le Roy'র সাথে মামলুক সুলতান ঘোরীর দরবারে প্রেরণ করেছিলেন, তিনি কায়রো নগরী এবং এর উদ্যান ও প্রাসাদসমূহের এক মনোজ্ঞ বর্ণনা রেখে গেছেন।

[২] (১) আল-জামাউল আজহার (জমকালো মসজিদ), (২) আল-জামাউন নূর (আলোর মসজিদ), (৩) জামাউল হাকিম (হাকিমের মসজিদ) ও (৪) জামাউল মুঈজ (মুঈজের মসজিদ)।

[৩] মাশ-হাদ বা মেশেদ বলা হত। ভারবর্ষে এই ভবনগুলোকে বলা হয় ইমামবাড়া। ফাতিমীদের আমলে সিরীয় উপকূলের সকল নগরেই মাশ-হাদ ছিল। কায়রোতে একটি হুসায়নিয়াহ এখনো বিদ্যমান আছে।

[৪] কায়রোর কয়েকটি সুবিখ্যাত তোরণ– (১) বাবউন নাসর (সাহায্যের তোরণ), নীল নদের দিকে অবস্থিত, (২) বাব-উল ফুতুহ (বিজয় তোরণ), (৩) বাব-উল কানতোরা (সেতুর তোরণ) (৪) বাব-উজ জাবিলাহ (জাব্বিলা নগরীর তোরণ) ও (৫) বাব-উল খালিজ (খালের তোরণ), ঘিজার দিকে অবস্থিত।

[৫] পরিশিষ্ট দেখুন।

ফাতিমীদের পতন শুরু হয়। তাঁর সময় থেকে রাজনীতিতে স্থান করে নেয় ষড়যন্ত্র। চরিত্র ও নৈতিক গুণের কোন মূল্যই ছিল না, রাজনৈতিক কার্যকলাপই সম্মান ও পদোন্নতির দ্বার খুলে দিয়েছিল, গুপ্তচর ও তাবেদাররা পণ্ডিতের স্থান দখল করেছিল; সৎ, স্বাধীনচেতা ও রাজভক্তের স্থান গ্রহণ করেছিল চাটুকার ও পরান্নভোজীরা। জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করে শাসকরা রাজ্য শাসনের চেষ্টা করতেন; তাঁদের প্রয়াস মারাত্মক পরিণাম নিয়ে কেবল তাদের উপরই আপতিত হয়েছিল।

দারুল হিকমত

প্রাথমিক যুগের ফাতিমীগণ প্রাচীন উলেমী শাসকদের মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা মহাবিদ্যালয়, সাধারণ গ্রন্থাগার এবং বিপুল সংখ্যক গ্রন্থরাজি, অঙ্ক বিষয়ক যন্ত্রপাতি ও বহু পেশাদার কর্মচারী নিয়ে বিজ্ঞান ভবন (দারুল হিকমত) স্থাপন করেছিলেন। এসব সাহিত্য ভাণ্ডারে প্রবেশ এবং সেগুলোর ব্যবহার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। আর লিখন সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহ করা হত । খলিফাগণ প্রায়শই জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক সভা আহ্বান করতেন, যাতে এসব বিদ্যায়তনের অধ্যাপকবৃন্দ নৈয়ায়িক, গণিতজ্ঞ, আইনজ্ঞ ও চিকিৎসাবিদ হিসেবে নিজেদের শাখায় বিভক্ত হয়ে তাঁদের 'খালা' বা পেশাগত পোশাক[১] পরে উপস্থিত হতেন। সুনিয়ন্ত্রিত করপ্রথা দ্বারা আদায়ীকৃত দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার ডুকাট ছিল এই মহাবিদ্যালগুলোর বার্ষিক আয় এবং তা অধ্যাপক ও কর্মচারীদের বেতন প্রদান, শিক্ষা সরঞ্জাম ও সাধারণের বিজ্ঞান শিক্ষার যন্ত্রপাতি কেনার কাজে ব্যয় করা হত। এসব প্রতিষ্ঠানে তাঁরা মানবীয় জ্ঞানের সকল শাখায় শিক্ষা দিতেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য বিভিন্ন স্থানে মানমন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং এসব মুসলিম ফারাওদের রাজত্বকালকে দ্যুতিময় করে তোলার জন্য এশিয়া ও স্পেন থেকে সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদেরকে আহ্বান করা হত।

ফাতিমীয়গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অসাধারণ প্রচারণা বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা ব্যতীত তাঁদের ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারে না। কারণ প্রজাদের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারে আগ্রহান্বিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা নিজের সম্প্রদায়ে দীক্ষিতদের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা রাজনৈতিক সুবিধা লাভের কথাও উপেক্ষা করতে পারেননি। কেন্দ্রীয় দারুল হিকমতের'র (বিজ্ঞান ভবন) সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল একটি বিশাল গৃহ, যেখানে ইসমাঈলী গূঢ়তত্ত্বে দীক্ষা লাভ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরকে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ শিক্ষা দেয়া হত। সপ্তাহে দুই বার– প্রতি সোমবার ও বুধবার ঐ গৃহের আচার্য দায়উদ দাওয়াত[২] সভা আহ্বান করতেন, যাতে সাদা পোশাক পরে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই সমবেত হয়ে পৃথক পৃথক আসন গ্রহন করতেন। এই সভার নাম ছিল মাজালিস উল হিকমত বা দার্শনিক সম্মিলনী। দীক্ষাদানের পূর্বে দায়উদ দাওয়াত সর্বোচ্চ শিক্ষাদাতা ইমামের (খলিফা) নিকট গমন করে যে বক্তৃতা তিনি নবদীক্ষিতদের নিকট পাঠ করার প্রস্তাব

---

[১] ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পোশাকে এখনো মূল আরবি খালা'র আকৃতির রক্ষিত হচ্ছে।

[২] সাধারণত উজির বা প্রধান কাজী এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতেন।

করতেন তা তাঁকে পড়ে শোনাতেন এবং পাণ্ডুলিপির আবরণীতে তাঁর স্বাক্ষর নিতেন। ভাষণদানের পর শিষ্যরা আচার্যের হাত চুম্বন করে সশ্রদ্ধভাবে নতমস্তকে আমিরের স্বাক্ষর স্পর্শ করতেন। এই গৃহে দীক্ষাদানের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে মাকরিজীর বর্ণনা ভ্রাতৃসংঘ গঠনের এক অমূল্য দলিল স্বরূপ। বস্তুত কায়রোর এই দীক্ষাগৃহ পরবর্তীকালে খ্রিস্টান জগতে স্থাপিত সকল দীক্ষাগৃহের আদর্শস্বরূপ হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থাপিত ফাতিমী দারুল হিকমত তাঁদের বংশের কাছে ঋণী হলেও এই বংশের পতনের সাথে সাথে এরও অবসান ঘটে; কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি এর অনুরাগ মিশরের নগরসমূহকে আলোকিত করেছিল। শেষ মামলুক শাসনকর্তাদের আমলে অরাজকতার ফলে এর আলোক রশ্মি নির্বাপিত হয়। পক্ষান্তরে দারুল হিকমার গুপ্ত জ্ঞানস্পৃহা বহু শতাব্দী পরও বেঁচেছিল এবং সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রতিভায় সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি ও দেশে তা বিকাশ লাভ করেছে।

এ শর্ট হিস্ট্রি অব দি
স্যারাসিন্স: আরব
স্যার সৈয়দ আমীর ...
29320#1451004-2
ROK-STK